ভাওয়াল মামলার রায়

ও

কুমারের আত্মকথা

শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
সম্পাদিত

মডার্ণ বুক এজেন্সি

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

১০, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মূল্য ২৷৷০ টাকা

প্রকাশক—
শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
৫৭-২ সি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মহালয়া—১৩৪৩ সাল

ছবি ও কভার অপরাজিতা প্রেস, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। ভূমিকা এবং রাণী বিভাবতীর জেরা ক্লাসিক প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত। পরিশিষ্টের সত্য ব্যানার্জ্জি ও আশু ডাক্তারের জেরা প্রভৃতি মানসী প্রেস হইতে শ্রীঅম্বিকাচরণ বাগ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। রায়ের অংশ ১—৫৩৬ পৃষ্ঠা কলিকাতা ১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচী

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা		১/০—।০
২।	ভাওয়াল কাহিনী ও জয়দেবপুর রাজ-পরিবার	...	১—৭
৩।	ভাওয়ালের মধ্যম কুমারের মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্ব্বালোচনা		৮—১৪
৪।	ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ ও প্রধান প্রধান সাক্ষী	...	১৫—২২
৫।	ভাওয়াল মামলার উপসংহার	...	২৩—২৫
৬।	মামলার বিচার্য্য বিষয়, বাদীর প্রার্থনা, মামলার প্রতিবাদী, বিচারক	...	২৬—২৮
৭।	ভাওয়াল মামলার সম্পূর্ণ রায়	...	১—শেষ
৮।	বাদীর আরজী	...	১—৮
৯।	বিবাদিনীগণের লিখিত বর্ণনা	...	৮—২২
১০।	রাণী বিভাবতীর জেরা	...	১—৮০
১১।	আশু ডাক্তারের জেরা	...	৮১—৮৫
১২।	সত্য ব্যানার্জ্জির জেরা	...	৮৫—৯১
১৩।	কুমারের আত্মকথা	...	৯১—১০২
১৪।	মেজরাণীর শরীর পরীক্ষার জন্য বাদীর দরখাস্ত	...	১০৩
১৫।	কুমারের জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাসমূহ	...	১০৪
১৬।	কুমারের তথাকথিত মৃত্যুর পর হইতে প্রকাশিত কবিতাবলীর অংশ	...	১০৫—১১৬

প্রকাশকের নিবেদন

বিগত ১৯০৯ সালে দার্জ্জিলিংএ জয়দেবপুরের মধ্যম রাজকুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায়ের তথাকথিত মৃত্যুর অভিনয় হইতে দেশবাসী প্রায় ২৮ বৎসর কাল সন্দেহ দোলায় দুলিয়া আজ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। নানারূপ শোনাকথায় তর্কজালের অবতারণাই হইত, কিন্তু স্থির সিদ্ধান্ত কেহই করিতে পারিতেন না। কারণ যে ধৈর্য্য থাকিলে এরূপ জটিল বিষয়ের মীমাংসা হয় সেরূপ ধৈর্য্য জনসাধারণের নাই। বিচারে বাদী রমেন্দ্রনারায়ণ বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় তিনিই জয়লাভ করিয়াছেন। বহুদিক্ দিয়াই এই মামলা জগতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম ও বৃহত্তম।

এই মামলার বিচারক শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু, তাঁহার সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই সুবিচারের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত হইলেন। চিরদিন তাঁহার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শোভা পাইবে। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান। সকলেই তাঁহার নামে ভক্তিভরে শির অবনত করিবে। তিনি ন্যায়-ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতীক। নিরপেক্ষতা, সূক্ষ্মবিচার-শক্তি, অসীম ধৈর্য্য, সহাস্য বদন ও অমায়িকতার জন্য এই দীর্ঘ মামলার বিচার কালে তিনি ঢাকাবাসী হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের আন্তরিক শ্রদ্ধা পাইয়াছেন।

পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে, তাহার সকল বিষয়ের সকল সংবাদ কাহারও রাখা সম্ভবপর নহে। এই বাঙ্গালা দেশেরই "বর্দ্ধমানে" প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে "জাল প্রতাপ" বলিয়া এক মামলা হইয়াছিল। সে ক্ষেত্রেও বর্দ্ধমানের রাজকুমার প্রতাপ চাঁদের 'মৃত্যু' ঘোষণা করা হয়; কিন্তু কয়েক বৎসর পরে জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়া নিজেকে 'প্রতাপচাঁদ' বলিয়া পরিচয় দেন। তখনকার বিচারে ফৌজদারী আদালতে তিনি দণ্ডিত হন, এবং প্রতারক বলিয়া

সাব্যস্ত হন। বর্ত্তমান মামলার ফল দেখিয়া অনেকে মনে করিতেছেন 'প্রতাপ-চাঁদের' মামলায় হয়ত ভুল হইয়াছিল সংসারে কিছুই অসম্ভব নহে। ভগবানের বিধানে মৃতব্যক্তি পুনর্জ্জীবন লাভ করে—পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, আর বামণ চাঁদ ধরিতে সমর্থ হয়। তাঁহার ইচ্ছায়ই সব হইয়া থাকে। আর কুমারের মৃত্যু ত স্বার্থান্ধের ষড়যন্ত্র মাত্র।

ভগবানের বিচার ও মানুষের ন্যায়বিচার চিরদিন একই, এই কথা সাধারণের অবগতির জন্য "ভাওয়াল মামলার রায়ের" অবিকল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম। আশা করি সুধী পাঠকপাঠিকাগণের আনন্দ ও কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য এই পুস্তকখানি সকলের নিকট আদৃত হইবে। এই মোকদ্দমার বিচারকালে স্বার্থশূন্য বিভিন্ন ব্যক্তি যে সকল কবিতা গান প্রভৃতি লিখিয়াছেন ইতিহাসের দিক হইতে তাহারও যথেষ্ট মূল্য আছে মনে করিয়া পরিশিষ্টে তাহা মুদ্রিত হইল। বিবাদিনী মেজরাণীকে প্রায় একমাস কাল জেরা করায় যে সব কথা বাহির হইয়াছে তাহার অধিকাংশই পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। আশা করি এই রহস্যময় সুবৃহৎ ইতিহাসখানি হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক গৃহে আদরের সহিত গৃহীত ও রক্ষিত হইবে।

আমাদের এই নিবেদন পত্রে সম্পূর্ণ প্রসঙ্গানুমোদিত না হইলেও কতগুলি বিষয় না বলিয়া আমরা থাকিতে পারিতেছি না। এস্থলে আমরা মেজরাণী বিভাবতী সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিব। বিচারক পান্নাবাবু রাণীর বিশেষ কোন অপরাধ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন "রাণী ভ্রাতার হাতের পুতুল।" কিন্তু সাধারণে বলে রাণী তাঁহার ভ্রাতা সত্যবাবুর ষড়যন্ত্র না বুঝিয়া আশু ডাক্তার ও সত্যবাবুর কার্য্যের সহায়তা করিয়া শেষ অবধি সে পাপ হইতে অব্যাহতির উপায় নাই দেখিয়া বাধ্য হইয়া শেষ পর্য্যন্ত সত্য বাবুর সাহায্য করিয়াছেন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে ভগবানের বিচারই শ্রেষ্ঠতম। কিন্তু যখন ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানি ও গবর্ণমেণ্ট—রাণী, সত্যবাবু ও আশু ডাক্তারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা আনিবেন, তখন এই মামলার গতি কি হইবে?

ভাওয়াল সন্ন্যাসী

প্রথম অধ্যায়

ভাওয়াল কাহিনী ও জয়দেবপুর রাজপরিবার

ভাওয়ালের ইতিহাস লিখিবার প্রথমেই মনে পড়ে, ভাওয়ালের—জয়দেবপুরের কৃতি-সন্তান স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসকে। তিনি ভাওয়ালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন,—তাঁহার জন্মভূমি জয়দেবপুরের যে সৌন্দর্য্যের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীকে তাহার জন্মভূমির প্রতি আকৃষ্ট করিতে শিক্ষা দেয়। কবি মনের আবেগে জন্মভূমি জয়দেবপুরকে 'স্বর্গপুর' বলিয়া উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"বাংলাদেশে আছে এক 'স্বর্গপুর' গ্রাম,
গাছ গাছরায় ভরা তাহা নবীন-ঘনশ্যাম,
উত্তরে তার রূপার রেখা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী,
মন্দাকিনীর মত তাহার মন্দ মন্দ গতি
দেবপুর নিবাসী কত দেবের দেহ ছাই,
ধরি বুকে মনের সুখে বহিছে চিলাই,
তার উত্তরে শোভা করে বিশাল গজার বন,
বাঘ ভালুক বেড়ায় কত খেলায় হরিণগণ।"

ইত্যাদি সুদীর্ঘ কবিতায় জয়দেবপুরের শোভা, রাজবাড়ীর সৌন্দর্য্য, রাজা-রাণীদিগের বিবরণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভাওয়ালের প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

"ভাওয়ালে বেলাই বিলে, কিবা সন্ধ্যা কি সকালে,
বাজায় মরাল-কণ্ঠে শঙ্খ অনিবার।"

* * *

"রাঙ্গামাটী, পলাকাটি, খাঁটি সোণার মত
স্থানে স্থানে ভ্রম হ'য়ে যায় মৈনাক শত শত।"

"রাঙ্গামাটী, পলাকাটি, ঢালগড়ান ভূঁই
দুধ খেতে মায়ের বুকে কাপড় ঠেলে থুই।"

* * *

এহেন অনন্যসাধারণ নৈসর্গিক শোভাসম্পন্ন প্রকৃতির লীলাভূমি ভাওয়ালের জয়দেবপুর! দিকে দিকে বনবিহঙ্গের কাকলী-ধ্বনি। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলাগুলি নানাবিধ বন্য বৃক্ষ সমাচ্ছাদিত অপরূপ সৌন্দর্য্যের আধার জয়দেবপুর—সেই পুণ্যভূমিতে জন্মিয়াছিলেন স্বভাবকবি গোবিন্দদাস—আর সেখানে রাজ কুমারদের শিক্ষা দীক্ষার আকাশে ধূমকেতু হইয়া উদয় হইয়াছিলেন বঙ্গের চিন্তাশীল লেখক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর। তিনি হয়ত কোন স্বার্থ প্রণোদিত হইয়াই ভাওয়াল কুমারদের শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করেন, যাহার ফলে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজকুমার প্রকাশ্য আদালতে প্রায় নিরক্ষর সাব্যস্ত হইতে চলিয়াছিলেন;—হয় ত বিধাতার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশ্যেই এমন বিপর্য্যয় হইয়াছে।

জয়দেবপুর একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল, ঘোষ মহাশয় গিয়াই তাহা উঠাইয়া দেন। তাহার ফলেই কুমারদিগের তেমন শিক্ষা লাভ হয় নাই—

'অঙ্কুরে মজিল যেই,—
কেমনে সে হবে মহীরুহ?'

যাক্ সে সকল বিষয়ের অবতারণা পরে করা যাইবে। এখন ভাওয়ালের—জয়দেবপুরের ইতিহাস আলোচনা করা যাইতেছে।

মহাভারতের বর্ণিত শিশুপালের রাজধানী চেদীরাজ্য, এই ভাওয়াল পরগণায় ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। এই ভাওয়াল পরগণা বুড়ীগঙ্গার উত্তর তীর হইতে আরম্ভ। আর বর্ত্তমান ই, বি, রেলের কাওরাইদ ষ্টেশন ভাওয়াল পরগণার সর্ব্বোত্তর সীমা। কোন্ সময় কি ভাবে ভাওয়াল পরগণা দিল্লীশ্বরের অধিকার ভুক্ত হইয়া ছিল, তাহার সঠিক বিবরণ জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে ভাওয়ালের অন্তর্গত 'চৈরী' নামক স্থানে মুসলমান গাজীবংশ অতি সম্ভ্রান্ত ছিলেন, রাজধানী ঢাকার নবাব সাহেবের অধীনে ঢাকা জেলার কয়েকটী পরগণার শাসন ভার গাজীবংশের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ঐ বংশের 'ভাওয়ালগাজী' নামক জনৈক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে কতক জায়গীর প্রাপ্ত হন। সেই ভাওয়াল গাজীর নামানুসারেই 'ভাওয়াল' পরগণার নামকরণ হইয়াছে। বিক্রমপুর পরগণার বজ্রযোগিনী গ্রামের কুশধ্বজ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ,

ভাওয়াল গাজীর বংশধর ফজল গাজীর পুত্র দৌলত গাজীর সরকারে দেওয়ানের কাজে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে তিনি জয়দেবপুরের পশ্চিমে চান্না বা চান্দনা নামক স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বলরামও পিতার দেওয়ানীর কাজ করিতে থাকেন। নানা ঘটনা বিপর্য্যয়ে ভাওয়াল পরগণার নয় আনা অংশ দৌলত গাজীর হস্তচ্যুত হইয়া বলরাম রায়ের হস্তগত হয় এবং তিনি নবাব সরকার হইতে "রায়চৌধুরী" উপাধি প্রাপ্ত হন। **এই বলরাম রায় হইতেই জয়দেবপুর রাজবংশের সূত্রপাত হয়।** তাহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী চান্না হইতে বাসস্থান "পীড়াবাড়ী" নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন। জয়দেবপুর রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বংশাবলী এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণ রায়, তাঁহার তিন পুত্র, জগৎ, শ্যাম ও জয়দেব রায় (ইহার নামানুসারেই **'পীড়াবাড়ীর নাম জয়দেবপুর হয়**)। ইনি পলাসোণার ঘোষদিগের দুইআনী জমিদারী ক্রয় করিয়া ভাওয়াল পরগণার নয় আনার মালিক হইলেন। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ রায়, (ইনিই জয়দেবপুরে "ইন্দ্রেশ্বর শিব" প্রতিষ্ঠা করেন)। বিজয়নারায়ণ, চন্দ্রনারায়ণ ও কীর্ত্তিনারায়ণ নামে তাঁহার তিন পুত্র। কীর্ত্তিনারায়ণের তিন পুত্র হরিনারায়ণ, লোকনারায়ণ, নরনারায়ণ বিষ-প্রয়োগে নিহত হইলে তাহার জ্যেষ্ঠতাত উদয়নারায়ণের পুত্র রাজনারায়ণ জমিদারী শাসন করেন। উক্ত রাজনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর তাহার খুল্লতাত লোক নারায়ণের হস্তে জমিদারীর ভার অর্পিত হয়। ইহার মৃত্যু হইলে তদীয় বিধবা পত্নী সিদ্ধেশ্বরী দেবী চৌধুরাণী একমাত্র নাবালক পুত্র গোলকনারায়ণকে লইয়া জ্ঞাতিশত্রুর অত্যাচারে অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়েন। কতিপয় কুচক্রী ষড়যন্ত্র করিয়া বিধবা সিদ্ধেশ্বরী দেবী ও তদীয় নাবালক পুত্রের উপর বিষম অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে।

তাঁহার অংশ বাকী করের জন্য নিলাম করাইয়া দেয়। উহাদেরই পরামর্শে রাজনারায়ণ রায়ের বিধবা পত্নী এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে যখন ক্রমে ক্রমে সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন সদাশয় গবর্ণমেণ্টের ন্যায় বিচারে সিদ্ধেশ্বরী দেবী তাঁহার অংশ পুনঃ প্রাপ্ত হন। এই সময় কতিপয় মহানুভব ব্যক্তি সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পক্ষ সমর্থন করেন। ফলে তারিণী দেবীকে দত্তকসহ পূবাইল গ্রামে গিয়া বাস করিতে হয়। এই দত্তকের নাম দেব নারায়ণ রায়। মোকদ্দমার ফলে এই দত্তক অসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন

হয়। ইতিপূর্ব্বে এই রাজবংশে আর দত্তক গ্রহণ করা হয় নাই। সদাশয় গোলোকনারায়ণ রায় অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সংসার হইতে সরিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন। অনেক সময় ঈশ্বর চিন্তা ও নানাপ্রকার ধর্ম্মালোচনায় সময় কাটাইতেন। ইহা দেখিয়া সিদ্ধেশ্বরী দেবী অল্প বয়সেই গোলোকনারায়ণের পুত্র কালীনারায়ণের হাতে জমিদারীর শাসন সংরক্ষণের ভার অর্পণ করিলেন।

একদিন গোলকনারায়ণ রায় কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঢাকায় চলিয়া আসেন এবং ওয়াইজ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পূর্ব্বে জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সকল দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে (যাহার ফলে দুই উভয় পক্ষের লোক ক্ষয় ও অর্থব্যয় হইয়াছে) তাহার মীমাংসা করিবার প্রস্তাব করেন। ওয়াইজ সাহেব গোলোকনারায়ণ রায়কে সবিশেষ জানিতেন বলিয়াই, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাজ পরিবারের সঙ্গে সন্ধি করিলেন, এবং তাঁহার জমিদারী যথোপযুক্ত মূল্যে কালীনারায়ণ রায়কে কওলা করিয়া দিলেন। ইহার পর গোলোকনারায়ণ রায়, পুত্র কালীনারায়ণ রায়ের হস্তে জমিদারীর ভার দিয়া, নিজে নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে রত হইলেন। প্রাসাদের পশ্চিম দিকের বৃহৎ দীঘী, ঘাট, **মাধব বিগ্রহ ও দেব মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন।** এই সঙ্গে নিজ বাস ভবনও দ্বিতল অট্টালিকা করিয়া ফেলেন। তিনিই ঢাকা সহরে বুড়ী গঙ্গার তীরে নলগোলা নামক স্থানে সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। বাঙ্গলা ১২২৬ সালের ১৩ই পৌষ সদাশয় ধর্ম্মপ্রাণ গোলকনারায়ণ রায় পরলোক গমন করেন।

কালী নারায়ণ রায় দেখিতে যেমন সৌম্যদর্শন ছিলেন তেমনি রাজকার্য্য পরিচালনা ও বৈষয়িক সমস্ত ব্যাপারে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

কোনও বিশেষ কারণে একবার কালীনারায়ণকে ম্যাজিষ্ট্রেট্ ওয়াল্টার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল, তখন তিনি ৯।১০ বৎসরের বালক মাত্র। তাঁহার কথা বার্ত্তা ও আদব কায়দায় সাহেব অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ওয়াল্টার সাহেবের সঙ্গে সৌহৃদ্য বৃদ্ধি পাইল, ইংরেজী বলিবার ও লিখিবার অভ্যাস হইল। সাহেব তাঁহাকে বন্দুক চালাইতে শিক্ষা দিলেন। তাঁহার সময় জমিদারীর আয় বহুল পরিমাণে বাড়িয়া যায়, এবং তিনি জমিদারীর নানাপ্রকার সুশৃঙ্খলা বিধান করেন। তিনি

একটী সুপ্রশস্ত রাজপথ, একটী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্টাফিস্ ও অতিথিশালা নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত কতক গুলি স্থানে কয়েকটি বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় তদীয় অর্থানুকূল্যেই স্থাপিত হইয়াছে।

তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন, জমিদারীর আয়ের প্রতি টাকাতে দুই পয়সা হিসাবে প্রজারহিতে ব্যয় করা হইবে। তাঁহার মৃত্যুর পর এই 'আয়' জমিদারীর আয় মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তিনি ভাওয়াল পরগণার সাতআনার মালিক। গাছার জমিদার, 'পূবাইল'ও 'বলধা'র জমিদার, এই সকল জমিদারের সহযোগিতায় জয়দেবপুরে ইনি 'প্রজাহিতৈষিণী সভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন। তিনি শিকার করিতে বিশেষ উৎসাহী ও পারদর্শী ছিলেন। গানবাজনার প্রতি তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। নিজেও একজন উচ্চদরের সমজদার ছিলেন। ঢাকা নগরীর পার্শ্বে প্রবাহিত বুড়ীগঙ্গা নদীর পাড় বান্ধাইবার জন্য তিনি বিশহাজার টাকা দান করেন, এবং বাক্‌লাণ্ড সাহেবের নামানুসারে ঐ বাঁধের নাম বাক্‌লাণ্ড বাঁধ হয়।* ভাওয়াল পরগণার ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিয়া রাজবাড়ীতে (বিক্রমপুর) প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেনের তাম্র শাসন আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনিই নিজ ব্যয়ে ভাওয়ালের ইতিহাস মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ গুণে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। কালীনারায়ণ পরিণত বয়সে ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য একমাত্র প্রিয়তম নাবালক পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণকে রাজ্য বুঝাইয়া দিলেন, এবং ভূতপূর্ব্ব বান্ধব সম্পাদক সাহিত্যিক রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া দিলেন। রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ শিক্ষিত ও সুশাসক ছিলেন; কিন্তু

* পিতামহের এই কীর্ত্তিমূলে বসিয়া কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ লোকচক্ষে পরিচিত হইয়াছিলেন। পিতা পিতামহ, প্রপিতামহদের কীর্ত্তিসমূহ দেখিয়া হয়ত তিনি মনে মনে রামচন্দ্রের মত বলিয়াছিলেন :—

"সগরাৎ সাগরঃকীর্ত্তি, গঙ্গাকীর্ত্তির্ভগীরথাৎ
অস্মাকং সাদৃশীকীর্ত্তি—মেকাভাব্যা পরহিতা।"

বিধি বিড়ম্বনায় এই সময়ে ভাওয়ালের স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস রাজার ম্যানেজার সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় আলোচনা যুক্ত পুস্তকাদি রচনা করার ফলে কবি জন্মভূমি ভাওয়াল হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সুদূর মধুপুরে আত্ম-গোপন করিয়াও ভাওয়ালেরই কথা লিখিলেন”—

‘ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা ভাওয়াল আমার প্রাণ,
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান।
তার সে মধুর প্রীতি, মনে জাগে নিতি নিতি,
তাহার মমতা মায়া বুকে ডাকে বান।
ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা ভাওয়াল আমার প্রাণ।”

লোকে কথায় বলে, এক বিলে নাকি দুই ‘কোঁড়া’ চরে না। সেইজন্যই হয়ত এক জয়দেবপুরে সাহিত্যিক রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ও স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের একত্র মিলন বোধ হয় ভগবানের অভিপ্রেত ছিল না। তাই ‘পরগাছা’ মূল বিদ্ধ করিয়া স্থায়ী পাট্টা লইয়া বসিল। আর কবি? ‘নিজ বাস ভূমে পরবাসী’। **রাজা রাহাদুর জয়দেবপুরে ‘রাজবিলাস’ নামক প্রাসাদ ও জলের কল নির্ম্মাণে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।** তিনি নানাগুণের আধার ছিলেন। চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ও বাদ্যাদিতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি শিকারে বিশেস ওস্তাদ ছিলেন। জয়দেবপুর ও তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত কালীগঞ্জ নামক স্থানে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, এবং তাঁহার এই উৎসাহের ফলেই জয়দেবপুরে “সাহিত্য সমালোচনী” সভা স্থাপিত হয়। দেশের অনেক সাহিত্য সেবী তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্য পাইয়াছেন। কবি রাজকৃষ্ণরায়কে রাজাবাহাদুর মহাভারত অনুবাদের জন্য ১২০০০ হাজার টাকা দান করেন। **পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের জন্য তিনি বহু অর্থ দান করেন।** ঢাকা কলেজেও তিনি কয়েকটী বৃত্তি দান করিয়াছেন। ঢাকা হাসপাতালে তিনি বহু লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বাংলা ১২৮০ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ‘রাজা বাহাদুর’ উপাধি প্রদান করেন। ইং ১৯০১ সালে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। ইঁহার জেষ্ঠপুত্র কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায়, কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় মধ্যমপুত্র, এবং কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায় কনিষ্ঠপুত্র, এবং জ্যোতির্ম্ময়ী, ইন্দুময়ী ও তাড়িন্ময়ী এই তিন কন্যা রাখিয়া রাজা বাহাদুর পরলোক গমন করেন।

স্বার্থান্ধ রাজশ্যালক সত্যেন্দ্র বানার্জ্জি, ডাক্তার আশু, রাণী বিভাবতীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। অতঃপর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে আশুডাক্তার কর্ত্তৃক কুমারকে আর্সেনিক বিষপ্রদান, শবরূপী কুমারের দেহ শ্মশান হইতে নিরুদ্দেশ হইলে, অন্য একটা শব-দেহ দাহ করন ; ডাঃ কালভার্ট হইতে মিথ্যা রিপোর্ট আদায়, বিভাবতীকে বাধ্য করা ও মামলার পক্ষে লোকজন ও সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য বিরাট ষড়যন্ত্রই প্রধান। প্রকাশ্য আদালতে আশু ডাক্তার বলিয়াছে "মরি মরব কিন্তু সত্যবাবুকে বাঁচাইতেই হইবে।"

কুমারের তথাকথিত মৃত্যুর পরে রাণী বিভাবতী দেবী কিভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহা আদালতে প্রমাণ হইয়াছে। সত্যেন্দ্র বানার্জ্জি, যোগেন বানার্জ্জি, আশু ডাক্তার, প্রভৃতির সাক্ষ্যে ভ্রাতা ভগ্নীর আচার ব্যবহার লোকসমাজে প্রকাশ হইয়াছে।

ইতিমধ্যেই ঢাকা কলিকাতায় অসংখ্য পুস্তক বাহির হইয়াছে—একখানা বইতে দেখিলাম, বোধ হয় রাণীকে লক্ষ্য করিয়া লেখা "কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর" ইত্যাদি কত কথা। সদাশয় বিচার পতির সুদীর্ঘ রায়ই সকল রহস্য বিবৃত করিয়াছেন। সুতরাং এই পুস্তকে এ সব বিষয়ের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। রাণীকে লক্ষ্য করিয়া জনৈক কবি লিখিয়াছেন।

"আফিং, কলসী, দড়ি লয়ে কবি কয়,
নে গো ধান, বেছে তোর যেটি মনে লয়।
তারপর তার সনে হাতে বাঁধ দিয়া
ডুবে মর্ একসঙ্গে লেক-পুলে গিয়া।

আমরা বলি—

কাজ নাই ম'রে ধনি, আরো বেঁচে থাক,
রেখে যা পাষাণে লিখে তোর কীর্ত্তি আঁক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাওয়ালের মধ্যম কুমারের মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা *

শ্রীযুত রমেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর তথাকথিত মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটন

[১৩৩৯ সালে প্রকাশিত পুস্তিকা হইতে]

[১৯৩৩ সালের প্রকাশিত এই বইখানিতে কুমারের মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে মামলার রায় পাঠের সুবিধা হইবে।]

প্রকাশকের নিবেদন :—

"ভাওয়ালের মধ্যম কুমার শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বিগত ১৯০৯ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিং যান। ঐ সময়ে কারণাধীনে তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন আপনার জন তাঁহার সঙ্গে ছিল না। **তাঁহার পত্নীর দরিদ্র গৃহশূন্য ভ্রাতা সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** ও ২।১ জন কর্ম্মচারী ডাক্তার আশু এবং ভৃত্যাদি কুমারের সঙ্গে দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। তথায় কুমার অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন বলিয়া জয়দেবপুরে সংবাদ আইসে। কুমারের মৃত্যু এত আকস্মিক হইয়াছিল যে, কুমারের জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিম্বা অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন নিতান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও কেহ যাইয়া কুমারকে দেখিবার সময় পর্য্যন্ত পান নাই। তৎপর কুমারের মৃত্যু সংবাদ নানাভাবে প্রচারিত হয় এবং কুমারের তথাকথিত মৃত্যু সময়ে যে সমস্ত কর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত ছিল, তাহারা ডাক্তার কেলভার্ট হইতে তাহাদিগের প্রশংসাবাদযুক্ত একখানা পত্র সংগ্রহ করিয়া কুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমার রণেন্দ্র নারায়ণ রায় বরাবরে পাঠাইয়া দেন।

ভাওয়ালের তদানীন্তন অবস্থা এদেশবাসী সকলেই অবগত আছেন; স্বর্গীয় রাজা কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুরের জীবনকালেই তিনি পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যরথী রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরকে ভাওয়াল ষ্টেটের প্রধান কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বয়স মাত্র ১৭।১৮ বৎসর হইবে বোধ হয়।

রাজা কালীনারায়ণ তাঁহার ষ্টেটে উপযুক্তরূপ শাসন সংরক্ষণ উপযোগী শিক্ষা ও যোগ্যতা জন্মাইবার উদ্দেশ্যেই রাজেন্দ্রনারায়ণকে প্রধান কর্ম্মচারী কালীপ্রসন্ন

ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করেন। কিন্তু তাঁহার দ্বারা রাজেন্দ্রনারায়ণের কোন সুশিক্ষা হয় নাই এবং তিনি বিষয়কার্য্যে কোনরূপ লিপ্ত না হইয়া অসার আমোদ প্রমোদে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট থাকিতেন। তাহার ফলে এই হইয়াছিল যে, রাজেন্দ্রনারায়ণের পুত্রত্রয়েরও শিক্ষার কোন বিশেষ বন্দোবস্ত হয় নাই। কুমারগণ বাংলা কিম্বা ইংরাজী কোন ভাষাতেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন না, তবে রাজপুত্র বলিয়া পার্টি ইত্যাদিতে যাতায়াত করার দরুণ ইংরাজীর বোলচাল কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়াছিলেন মাত্র। তাহারা কুসঙ্গী পারিষদবর্গে দিবারাত্র পরিবেষ্টিত থাকিয়া অন্যান্য আমোদ প্রমোদে নিবিষ্ট থাকিতেন। এমন কি নিজ নাম দস্তখত করিতেও উহাদিগের হইতে অত্যন্ত কষ্ট হইত এবং দায় সময় অতিবাহিত হইত। পূর্ব্ববঙ্গে অনেকেই ভাওয়ালের পক্ষে কুমারগণের বিষয় অবগত আছেন।

এই সময়ে মধ্যম কুমারের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তির পর পারিষদবর্গের পরামর্শে বড় কুমার ভ্রাতার শোক ভুলিয়া থাকিবার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত মদ্যপান আরম্ভ করেন এবং বাহিরবাটীতে অবস্থান করিতে থাকেন। শালাবাবুর সহিত মধ্যম কুমারের পত্নী ও সঙ্গের লোক সকল জয়দেবপুরে ফিরিয়া আসিলে **কুমারের মৃত্যু সম্পর্কে সঙ্গীয় লোকগণ দ্বারা নানা কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং কুমারের দেহ দাহ করা হয় নাই বলিয়া সঙ্গীয় লোক কেহ কেহ প্রকাশ করে।** তখন কুমারের দশাহ ও শ্রাদ্ধ সম্পর্কে গোলযোগ ঘটে, এই বিষয় পূর্ব্ববঙ্গের অনেকেই জানেন।

দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মধ্যম কুমারের পত্নী শ্রীযুক্তা বিভাবতী দেবী কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ভ্রাতা সত্যবাবুর মুখ দর্শন করেন নাই। এবং **"তিনিই তাঁহাকে পথের ভিখারিণী করিবার মূল"** এইরূপ উক্তি করিতেন। এদিকে সত্যবাবু কুমারের দশাহের পূর্ব্বেই ভগ্নী বিভাবতী দেবীর স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে অর্থাগমের চিন্তায় মুকুন্দ গুণ সহ উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতা চলিয়া যান। ২০ বৎসর বয়স্কা নিঃসন্তান কনিষ্ঠা ভগিনী অকস্মাৎ বিধবা, এই সংবাদ অন্যের হৃদয়ে শেলাঘাত করিলেও সদ্যঃ বিধবা ভগ্নীর স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে নিজ অর্থোপার্জ্জনের কল্পনায় উকীলের পরামর্শের জন্য কলিকাতা গমন **সত্যবাবুর পক্ষে স্বাভাবিকই বটে।** এ বিষয়ে পরে এই পুস্তকে বিস্তারিত আলোচিত হইবে।

কুমারদ্বয় অসচ্চরিত্র পারিষদবর্গ দ্বারা ঐরূপ ভাবে দিনযাপন করিতে থাকিলেন। অথচ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট জানা গেল যে, মধ্যম কুমার জীবিত আছেন এবং তিনি সন্ন্যাসীদিগের সহিত সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতেছেন এবং এই অবস্থায় রাজপরিবারের জ্ঞাতি জনৈক ব্যক্তির সহিত হরিদ্বারে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া তিনি জয়দেবপুরে প্রকাশ করেন।

কুমারদিগের বৃদ্ধা পিতামহী পূজনীয়া রাণী সত্যভামা দেবী এরূপ নানা কথা শুনিয়া মধ্যম কুমারের মৃত্যু ও শবদেহ দাহ সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের নিকট একখানা পত্র লিখেন, কিন্তু তদুত্তরে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই।

পর বৎসর শীতকালে একদিন দেখা গেল, বুড়ীগঙ্গার তীরে বাকলণ্ড বাঁধের ধারে ঢাকার প্রসিদ্ধ জমিদার ৺রূপলাল দাস মহাশয়ের বসত বাটির সম্মুখে এক নবীন সন্ন্যাসী উপবিষ্ট আছেন। সন্ন্যাসীর কান্তি অতি কমনীয়, সন্ন্যাসীর অঙ্গ ভস্ম-লিপ্ত, দেহ উন্নত এবং শরীরের প্রতি অঙ্গ সুগঠিত। সন্ন্যাসী প্রতিদিন স্নানার্থ বুড়িগঙ্গা নদীর গর্ভস্থ দূরবর্ত্তী চরে গমন করিতেন এবং তথায় স্নানাদি সমাপনান্তে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষভাবে ভস্মানুলিপ্ত করিয়া প্রত্যাগমন করিতেন। এইভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল, তৎপর সন্ন্যাসীকে কোন কোন কারণে কাশিমপুর জমিদার বাটীতে নেওয়া হয়। কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় কাশীমপুরের জমীদার সারদাবাবুর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। কাশীমপুর অবস্থান কালে উক্ত সন্ন্যাসীর ভাবভঙ্গি চাল-চলন এবং আকৃতি প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ সন্ন্যাসীকে ভাওয়ালের মধ্যম কুমার বলিয়া সন্দেহ করেন। ইহার কতিপয় দিবস পরে উক্ত সন্ন্যাসীকে জয়দেবপুরে লইয়া গেলে তাঁহার শরীরের গঠন, চক্ষুর দৃষ্টি, চালচলন এবং শরীরের রং ইত্যাদি দেখিয়া পূর্ব্বপরিচিত সকলেই উক্ত সন্ন্যাসীকে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ বলিয়া সন্দেহ করেন। তৎপর পরীক্ষা দ্বারা কুমারের গাত্রের চিহ্ন সমস্তই সাধুর অঙ্গে বিদ্যমান থাকা দৃষ্ট হয়। তৎপর ভাওয়ালের সম্ভ্রান্ত কতিপয় ব্যক্তি ও স্থানীয় সবরেজেষ্টার এবং প্রায় তিন চার শত প্রজার সমক্ষে ভাওয়ালের এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী এবং ডাক্তার আশুতোষ দাসগুপ্তের উপস্থিতিতে বর্ত্তমান সময়ে সেক্রেটারী বলিয়া পরিচিত

মিঃ (ইদানীং রায় সাহেব) জে, এন, ব্যানার্জ্জি এবং অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি সন্ন্যাসীকে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় দিতে বলেন, তখন সর্ব্ব সমক্ষে সন্ন্যাসী নিজ পরিচয়ে, তিনিই **ভাওয়ালের মধ্যম কুমার বলিয়া প্রকাশ করেন।** তখন সর্ব্বসমক্ষে উক্ত আশুতোষ দাসগুপ্ত ডাক্তার (যিনি দীর্ঘকাল রাজ পরিবারের চিকিৎসক ছিলেন এবং কুমারের তথাকথিত মৃত্যুসময়ে কুমারের সহিত দার্জ্জিলিং ছিলেন) উক্ত সন্ন্যাসীকে পরীক্ষা করিতে চাহেন এবং বলেন যে 'সন্ন্যাসী যদি মধ্যম কুমার হয় তবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন" এই কথা বলিয়া উক্ত আশু ডাক্তার সন্ন্যাসীকে কতিপয় প্রশ্ন করেন এবং সন্ন্যাসী তাহার উত্তর প্রদান করেন, ফলে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী স্থির করিলেন যে, কুমারের দেহ সৎকার করা হয় নাই, এবং এই **সন্ন্যাসীই ভাওয়ালের মধ্যম কুমার,** সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যখন ভাওয়ালের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং মধ্যম কুমারের পিতামহী পূজনীয়া শ্রীযুক্তা রাণী সত্যভামা দেবী, ভগিনী শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ভগিনীপতি শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং (তড়িন্ময়ীর স্বামী) শ্রীযুত ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারের ভাগিনেয়গণ এবং ভাওয়ালের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ স্থির নিশ্চিত হইলেন যে এই **সাধুই কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়।** তখন ভাওয়ালের সম্ভ্রান্ত তালুকদারগণ সাধুকে কুমার বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণার উদ্দেশ্যে বিগত ১৯২০ সনের ১৫ই মে তারিখে এক সভায় আহ্বান করেন। ঐ দিন সন্ন্যাসী, শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে উচ্চে স্থাপিত আসনে উপবিষ্ট ছিলেন এবং অবিরাম জনস্রোত সাধুকে দর্শন করিতেছিল। সন্ন্যাসী জনসঙ্ঘের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য প্রকাশ্য স্থানে দীর্ঘ সময় উপবিষ্ট থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐদিন বেলা ৩॥ ঘটিকার সময় রাজবাড়ীর সম্মুখস্থ বৃহৎ ময়দানে এই বিরাট সভা বসিয়াছিল। উক্ত সভায় ভাওয়ালের বারিষাব গ্রামের সম্ভ্রান্ত তালুকদার শ্রীযুক্ত আদিনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঐ সভা উপলক্ষে জয়দেবপুরে ঐ দিন অনুমান ৪০ হাজার লোক সমবেত হয়। সবডিভিশনেল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু হরেন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয় ঐ দিন জয়দেবপুরে উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি ঐরূপ লোকের ভিড বশতঃ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনবরতঃ জন সঙ্ঘকে সন্ন্যাসী সম্পর্কে তাহাদিগের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলা ঢাকা ফিরেন এবং ফিরিবার সময় রেলগাড়ীতে ঢাকার

স্বনামখ্যাত উকীলবাবু আনন্দচন্দ্র রায় এবং ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডের উকীল বাবু গগনচন্দ্র ঘোষ ও জ্ঞানদাকিশোর রায় এবং কবি বাবু কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহুলোক সমক্ষে প্রকাশ করেন যে, তিনি অনবরত সমবেত লোকমণ্ডলীকে সন্ন্যাসী সম্পর্কে তাহাদিগের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু **প্রত্যেকেই উক্ত সন্ন্যাসীকে কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ বলিয়া বলিয়াছে, এক ব্যক্তিও সাধু কুমার নহে, এমন কথা বলে নাই।**

১৫ই মে তারিখের সভাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত সন্ন্যাসী ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলিয়া গৃহীত হন।

ইহার পর ঢাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল শ্রীযুত বাবু সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কুমারের বা রাম, মৃত্যু এবং দেহ-সংকার প্রভৃতি বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান জন্য দার্জ্জিলিং যান। তিনি কুমারের বাল্যকাল হইতেই বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে কুমারকে চিনিতেন। সুরেন্দ্রবাবু ঢাকাতে বিশেষ পরিচিত এবং দশের নিকট বিশেষ গণ্যমান্য বটেন। তাঁহার সততা এবং সাহসিকতার বিষয় ঢাকার অনেকেই অবগত আছেন, সুতরাং নূতন করিয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। উক্ত সুরেন্দ্রবাবুই ডাঃ ক্যালভার্টের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য বিলাত গিয়া কুমারের তথাকথিত মৃত্যুর অনেক গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবু দার্জ্জিলিং যাইয়া কতক সময় পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কুমারের পীড়া, মৃত্যু এবং তাঁহার দেহ শ্মশানে লওয়া এবং সংকার করা সম্পর্কে বহু সংবাদ এবং প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তিনি দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীর সম্মুখস্থ বৃহৎ মাঠে ভাওয়ালের তালুকদার এবং প্রধান প্রজাবৃন্দের সভাতে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেন।

১। এই সন্ন্যাসী ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ ভিন্ন অপর কেহ নহেন।

২। কুমারের দেহ যে সংকার হয় নাই, সেই সম্বন্ধে সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

৩। নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের সাক্ষ্যে প্রমাণ হইবে যে, এই সন্ন্যাসীই ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়।

৪। তাঁহার নিকট যে সমস্ত প্রমাণ রহিয়াছে, তাহা দ্বারা সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-প্রেরকগণের যাবতায় তর্ক মীমাংসিত হইতে পারে।

ইহার কিছুকাল পরে কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী নামধেয় কোন এক ব্যক্তি কোথা হইতে 'ভাওয়ালী কাণ্ড' নাম দিয়া একখানা পুস্তিকা প্রনয়ণ করিয়া প্রকাশ করেন এবং অন্যান্য স্থানে ডাকযোগেও তাহা বিতরিত হয়। পুস্তকখানা দেখিলাম, ইহাতে মূল্য লেখা নাই।

কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত না হইলেও অনেকেই তাঁহাকে বিশেষরূপে চিনেন। তাঁহাকে নাকি কেহ কেহ পত্র লিখিতেছেন, আজ ভাওয়ালের কথায় চুপ রহিয়াছেন কেন? "তিনি নাকি নীরব থাকায় কাহারও কাহারও অনুযোগভাজনও হইয়াছেন ইত্যাদি অজুহাত দেখাইয়া এবং তিনি নাকি সঠিক তথ্য পূর্ব্বে সুনিশ্চিতরূপে অবগত না হইয়া এবং পাকা ভিত্তির উপরে ভিন্ন কথা বলেন না। এবং তিনি ভাওয়ালের ব্যাপারের সঠিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়ার জন্যই এতদিন অপেক্ষা করিতেছিলেন। ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার নাকি তাঁহার বিশেষ পরিচিত এবং প্রীতিভাজন ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মনোবেদনায় ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার পর বড় রাজকুমারের সহিত নাকি তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে তখন কোন দিন কুত্রাপি এমন কথা শুনেন নাই, যে "দ্বিতীয় কুমারের মৃত্যুতে সন্দেহ করিবার মত ব্যাপার আছে।' অনুসন্ধানে তিনি "যে সকল জানিতে পারিয়াছেন, তাহা নাকি বাস্তবিকই কৌতূহলপ্রদ এবং উপন্যাসের গল্পের মত চমৎকার" ইত্যাদি রূপ লম্বা লম্বা কথায় মুখ বন্ধ করিয়া কেদার নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সত্যের অনুরোধে যে প্রস্তাবের অবতরণা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিরপেক্ষতা দূর হইয়া অতি অল্প সময়েই তাঁহার কপটতা প্রকাশ পাইয়াছে। কেদার বাবুর ভূমিকায় এবং নিজের নিরপেক্ষতার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া তাঁহার লিখিত ভাওয়ালী কাণ্ডের কয়েক পৃষ্ঠা আলোচনা করিলেই তাঁহার জন্য দুঃখও হয় এবং হাসিও পায়। অর্থাৎ অর্থস্য পুরুষো দাসঃ। কেদার বাবুর দোষ কি? তবে নিজের নিঃস্বার্থতা এবং

নিরপেক্ষতার সম্পর্কে এত গলাবাজি না করিলেই পারিতেন। লজ্জাশূন্যতারও একটা মাত্রা আছে। তাঁহার পুস্তকের কতিপয় পৃষ্ঠ পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, কেদারবাবু সমদর্শী ত নহেনই, পরন্তু মধ্যম কুমারের শালা সত্যের প্রেরণায় সত্যের কল্পিত বিবরণ ঐ পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র, সেই বিষয়ে কেদার বাবুর বিবেচনা করিবার সময় হয় নাই। কেদারবাবু প্রথমে বাগাড়ম্বরে মেষ-চর্ম্ম দ্বারা নিজের ব্যাঘ্র মুর্ত্তি ঢাকিয়া নিরীহ মেষশাবকের ন্যায় উপস্থিত হইয়া পরে নিজ মুর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। নতুবা তিনি রাজকুমারীদিগের প্রতি যে সমস্ত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অন্য কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, অনেকেই ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইহা কুমারের শালা সত্যের স্বার্থে, অর্থে এবং অনুরোধে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং আমরা ইহার প্রতিবাদ করা আবশ্যক মনে করি নাই। বর্ত্তমান সময়ে কুমার সম্বন্ধে সংগৃহীত বিষয় সকল জানিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের উৎকণ্ঠা হওয়ায় ভাওয়াল তালুকদার ও প্রজা সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত কতিপয় বিষয় পুস্তক আকারে প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকে সুরেন্দ্রবাবুর সংগৃহীত তথ্যগুলি প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার নিকট ঐ সমস্ত বিষয় জানিতে চাহিলে তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার সংগৃহীত তথ্যের কতক দিয়াছেন। ঐগুলি এবং এই সম্পর্কে সুরেন্দ্রবাবু, সমিতির সভাপতি শ্রীযুত বাবু দিগিন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন, এই সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হইলে সর্ব্বসাধারণের নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, ভাওয়ালী কাণ্ডের লিখিত বিষয়গুলি নিতান্তই অমূলক এবং ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থরক্ষার্থ লিখিত কুমারের মৃত্যু সন্দেহজনক, তাঁহার দেহ সৎকার হয় নাই, এবং **ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার শ্রীযুত রমেন্দ্রনারায়ণ রায় স্বয়ং সশরীরে বর্ত্তমান সময়ে ঢাকা নগরীতে উপস্থিত আছেন।**

তৃতীয় অধ্যায়

ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ

প্রায় আড়াই বৎসর ধরিয়া ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার শুনানী চলিয়াছে এবং গত ২০শে মে বুধবার তাহা শেষ হইয়াছে। শুনানীর দীর্ঘতায়, সাক্ষীদের সংখ্যাবাহুল্যে, ঘটনার বৈচিত্র্যে এই মামলা জগতের মামলার ইতিহাসে একটী স্মরণীয় ব্যাপার হইয়া রহিবে।

ইংরাজী ১৯০৯ সালের ৮ই মে দার্জ্জিলিংয়ে ভাওয়ালের মেজকুমারের "মৃত্যু" হয়; বঙ্গীয় ১৩২৭ সনের মাঘ কি ফাল্গুন মাসে ঢাকার বাকলাণ্ড বাঁধে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়; ১৩২৭ সনের চৈত্র সংক্রান্তির দিন ঐ সন্ন্যাসী জয়দেবপুরে গমন করেন। ইংরাজী ১৯২১ সালের ৪ঠা মে তারিখে তিনি জয়দেবপুরে ভাওয়ালের মেজকুমার বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। বঙ্গাব্দ ১৩৩৬ হইতে তিনি প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজী ১৯৩০ সালের ২৪শে এপ্রিল ঢাকা কোর্টে তিনি বর্ত্তমান মামলা দায়ের করেন।

ইংরাজী ১৯৩৩ সালের ২৭শে নবেম্বর প্রকাশ্য আদালতে বাদীপক্ষে এই মামলার নিয়মিত শুনানী আরম্ভ হয় এবং ১৯৩৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী বাদী-পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়। ইংরাজী ১৯৩৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে বিবাদীপক্ষের শুনানী আরম্ভ হয় এবং ইংরাজী ১৯৩৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিবাদীপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়। তখন বিচারকের বিশেষ অনুমতিক্রমে ধর্ম্মদাস নাগার পরিচয় সম্পর্কে বাদীপক্ষে আরো কতিপয় ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হয়। অতঃপর বিগত ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ হইতে বিবাদী পক্ষের ব্যারিষ্টার মিঃ এ এন চৌধুরী সওয়াল আরম্ভ করিয়া ৩১শে মার্চ্চ উহা শেষ করেন, এবং ঐ দিনই বাদীপক্ষের ব্যারিষ্টার সওয়াল আরম্ভ করেন।

সাক্ষীর সংখ্যা এক হাজারের উপর

এত দীর্ঘকালব্যাপী মামলার শুনানী জগতে আর কোন মামলায় ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। এই মামলার সাক্ষীর সংখ্যাও ভারতের যে কোন মামলার সাক্ষীর

সংখ্যা ছড়াইয়া গিয়াছে। বাদীপক্ষে মোট ১০৬৯ (আদালতে ১০৪২ জন এবং কমিশনে ২৭ জন) এবং বিবাদীপক্ষে মোট ৪৭৯ জন (আদালতে ৪৩৫ এবং কমিশনে ৪৪ জন) সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। এই মামলায় প্রায় ২০০০ একজিবিট দাখিল হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় ১০০ ফটো আছে।

সুবিজ্ঞ বিচারকের পদোন্নতি

এই মামলার একটী প্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, বিচারক শ্রীযুত পান্নালাল বসুর এজলাসে যখন শুনানী আরম্ভ হয়, তখন তিনি ঢাকার ৫ম সাবজজ ছিলেন ; কিন্তু ১৩২৫ সালে তিনি অতিরিক্ত জজের পদে উন্নীত হন ; এই মামলার বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা বিবেচনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে এই মামলা অন্য কোর্টে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঢাকার জনসাধারণের মধ্যে ঔৎসুক্য

এই মামলার সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার—ইহার ঘটনাবলী সম্পর্কে ঢাকার জনসাধারণের মধ্যে ঔৎসুক্য ও চাঞ্চল্য সমগ্র বঙ্গদেশ, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে প্রবল ঔৎসুক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঢাকা সহরে ত কথাই নাই—পথে, ঘাটে, খেলার মাঠে, নদীর পারে, চায়ের দোকানে, বার লাইব্রেরীতে, অফিসে, মুদীর দোকানে, নিমন্ত্রণ বাড়ীতে, যেখানে যাওয়া যায়, সেইখানেই সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে এই সম্পর্কে আলোচনা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে গাড়োয়ানদের আড্ডা, মুদী দোকানে বা মুসলমানদের চায়ের দোকানে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইত, একজন পরম উৎসাহভরে দৈনিক পত্রিকা পড়িতেছে এবং সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী পরম উৎসাহভরে মামলার বিষয়ে টীকা টিপ্পনী করিতেছে এবং "রাজা" জিতিবে, না "রাণী" জিতিবে, তাহা নিয়া গম্ভীরভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে। সময় সময় এই বিষয় নিয়া মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া যাইত। আরমানীটোলার একজন প্রবীণ উকিলের বৈঠকখানায় প্রত্যহ সান্ধ্য সম্মিলনীর আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল এই মামলা। ঐ রাস্তা দিয়া যে কোন ব্যক্তি গেলেই টের পাইত যে, উহাদের উৎসাহ কি প্রকার। সময় সময় ঐ সব প্রবীণ ব্যক্তির মধ্যে মৌখিক আলোচনা একেবারে চরমে উঠিয়া গরম হইয়া যাইত।

"ঢাকা সহরে দৈনিক"

এই মামলার বিবরণ ছাপাইয়া ঢাকা সহরে এক সময়ে ৪ খানা দৈনিক পত্রিকা চলিত। তন্মধ্যে "বাংলার রূপসাধক" এখনও আছে।

কলিকাতার পত্রিকার মধ্যে প্রথমে আনন্দবাজারই এই মামলার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন তাঁহারা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রথম হইতেই সমস্ত শুনানীর বিবরণ টেলিগ্রামে আনিয়া পরদিন প্রাতে বিমান ডাকে পত্রিকা ঢাকাবাসীদিগকে সংবাদ পরিবেশন করিতেন। বিমান ডাক বন্ধ হইবার পরেও তাঁহার ঘণ্টায় ঘণ্টায় শুনানীর বিবরণ টেলিগ্রামে লইতেন। ইহার ফলে পরদিনই পূর্ব্বদিনের প্রায় সমস্ত শুনানীর বিবরণ 'আনন্দবাজারে' পাওয়া যাইত। প্রথমতঃ 'আনন্দবাজার' এই মামলার বিষয়ে প্রাধান্য দিবার পরে, কলিকাতায় আরও ২।১ খানি দৈনিক পত্রিকা মাঝে মাঝে শুনানীর বিবরণ টেলিগ্রামে লইতেন।

বিচারকালে আদালতে জনতা

এত দীর্ঘ শুনানীর মধ্যেও কোনদিন মামলা শুনিবার জন্য জনতার অভাব হয় নাই। মামলার প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আদালতে শ্রোতাদের ভিড় সমানে চলিয়াছে। বিশেষ বিশেষ সাক্ষীদের সাক্ষ্যের সময়ে লোকের এত ভিড় হইত যে, পুলিশ সাহায্যে আদালতে প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করা হইত। দর্শন দাস নাগা, মাঃ র্যাঙ্কিন, রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্র ব্যানার্জ্জি, ধরমদাস নাগা ও ডাঃ আশুতোষ দাশগুপ্তের, এলোকেশীর, সোমেশ বসুর সাক্ষ্যের সময়ে আদালতের বাহিরে ও ভিতরে অভূতপূর্ব্ব জনতা হইয়াছিল।

মামলার নিয়মিত শ্রোতা

এই মামলার নিয়মিত শ্রোতা প্রায় ৫০।৬০ জন ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন পেন্সনভোগী সরকারী কর্ম্মচারী। দ্বিপ্রহরে বাড়ীতে বসিয়া দিবা নিদ্রা উপভোগ করা অপেক্ষা তাঁহারা এই মামলা শোনাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। ঝড় হউক, ঝঞ্ঝা হউক, বাদল হউক, বৃষ্টি হউক—কিছুতেই 'নিয়মিত শ্রোতাদের আদালতে আসা বন্ধ থাকিত না; মামলার পক্ষীয় উকিলদের কোনদিন হয়ত আদালতে আসিতে দেরী হইত। সাক্ষী হয়ত ঠিক সময়ে আসিয়া পৌছিত না, কিন্তু আদালতে আসিয়া দেখা যাইত যে, "নিয়মিত শ্রোতার" ঠিক সময়ের

পূর্ব্বেই তাঁহাদের নিজ নিজ আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। মেজরাণী, ছোটরাণী, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রভৃতির সাক্ষ্যের সময়ে এই আদালতের কার্য্য যখন নলগোলা রাজবাড়ীতে বা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে বসিয়াছে, তখন জনসাধারণকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। তখন এই সব নিমন্ত্রিত শ্রোতাদের' এবং জনসাধারণের যে কষ্ট হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহারা আসিয়া হয়ত রাজবাড়ীর সদর দরজার সামনে ভিড় করিতেন। এই আশায় যে, যখন শুনানী ৫টায় শেষ হইবে, তখন যদি উকিল ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নিকট হইতে সেইদিনের কিছু বিবরণ শুনিতে পারা যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাত্রে 'ভাওয়ালী দৈনিকগুলি মামলার বিবরণ লইয়া না বাহির হইত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জনসাধারণ বিষম আগ্রহে পত্রিকা অফিসের সম্মুখে বসিয়া থাকিত এবং পত্রিকা বাহির হইলে কে কার পূর্ব্বে উহা কিনিবে, তাহা লইয়া মহা হৈ চৈ ও কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত।

পত্রিকার রিপোর্টারদের বিপদ

কার্য্যব্যপদেশে যাহাদিগকে আদালতে প্রত্যহ ১২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত মামলার শুনানী শুনিতে হইত, জনসাধারণের এই অতিরিক্ত উৎসাহের ফলে সময়ে সময়ে তাহাদের অশান্ত বিব্রত হইতে হইত। ৫টার পরে হয়ত ক্লান্তদেহে কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি সাইকেলে বাসায় ফিরিতেছেন, পথিমধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি মহাব্যস্ততায় ডাকিলেন, "মহাশয় একটু শুনবেন, বিশেষ জরুরী কথা আছে মনে করিয়া তিনি সাইকেল হইতে নামিলেন; ভদ্রলোক কিন্তু বিনা ভূমিকায় বলিতে সুরু করিলেন, "আজকে নাকি রায় বাহাদুরকে এক দফা খুব শুনিয়ে দিয়েছেন? মামলাটা কেমন বুঝছেন?" ইত্যাদি

সর্ব্বশ্রেণীর ও সর্ব্বপ্রকার লোকের সাক্ষ্য

এই মামলায় সাক্ষীদের মধ্যে প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্বধর্ম্মের নরনারী ছিলেন। ২১ বৎসর বয়সের যুবক হইতে আরম্ভ করিয়া শতবর্ষের বৃদ্ধ বৃদ্ধার সাক্ষ্য, সাক্ষীদের উক্তি আদালতের উপস্থিত লোকদের প্রচুর হাস্যরসের উদ্রেক করিত এবং আদালতের আবহাওয়াকে শীতল করিত। 'আনন্দবাজারে'র ও মামলা সংক্রান্ত অন্যান্য পত্রিকার যাঁহারা নিয়মিত পাঠক, তাঁহাদের সাক্ষীদের হাস্যোদ্দীপক উক্তির সহিত পরিচয় আছে।

সাক্ষীদিগের লাঞ্ছনার অভিযোগ

বিবদী পক্ষ মাঝে মাঝে অভিযোগ করিয়াছেন যে তাঁহাদের পক্ষীয় সাক্ষীদিগকে আদালত গৃহের বাহিরে জনসাধারণের হাতে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। তাঁহারা ধরমদাস নামক যে ব্যক্তি দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিকে আদালতের বাহিরে জনতা ঢিল ছোড়ে এবং গালাগালি করে। সেই ব্যক্তিকে যে মোটরে আদালত হইতে লইয়া যাওয়া হয়, সেই মোটরও না কি জনসাধারণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল পক্ষান্তরে বিবাদী পক্ষীয় সাক্ষী—সত্যবাবু, আশু ডাক্তার, রায় সাহেব উমেশধর, অখিল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কলঙ্কিত হইয়াছেন। অনেক সাক্ষী অভিযোগ করিয়াছিল, বিবাদী পক্ষের লোক তাহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে বারণ করিয়াছে এবং ভীতি প্রদর্শনও করিয়াছে।

আদালতে সাক্ষীর মূর্চ্ছা

একদিন বাদীপক্ষের একজন ১১০ বৎসর বয়স্কা সাক্ষী শ্রীযুক্তা শিবসুন্দরী মিত্র বিশ্বাস আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তাঁহাকে সেবা ও শুশ্রূষা করিয়া ভাল করা হয়; সেইজন্য কয়েক ঘণ্টা আদালতের কাজ বন্ধ থাকে।

উভয়পক্ষের কৌঁসুলীগণ

বাদীপক্ষে ব্যারিষ্টার মিঃ বি সি চাটার্জ্জি, এডভোকেট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি, শ্রীযুত নলিনীকমল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত মন্মথকুমার বসু, শ্রীযুত অরবিন্দ গুহ, শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুত চুণীলাল চৌধুরী, শ্রীযুত ফণীভূষণ বসু, শ্রীযুত সুবোধ কুমার মুখোটি, শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি উকিলগণ এবং বিবাদী পক্ষে মিঃ এ, এন, চৌধুরী, সরকারী উকিল রায় বাহাদুর শশাঙ্ককুমার ঘোষ, শ্রীযুত পঙ্কজকুমার ঘোষ, শ্রীযুত সুধীরকুমার ঘোষ, শ্রীযুত উপেন্দ্র বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি উকিলগণ মামলা পরিচালনা করিয়াছেন।

বিবাদীপক্ষের প্রধান প্রধান সাক্ষিগণ

সাক্ষীদের মধ্যে বাঙ্গালা ও বাঙ্গলার বাহিরের কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও এই মামলার বিচার্য্য বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। বাদীপক্ষের সাক্ষীদিগের মধ্যে

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, অধ্যাপক ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র (অবসর প্রাপ্ত আই, ই, এস, ও ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ), ডাঃ হীরালাল রায় (যাদবপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক,) মিঃ নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত (টাটা ফাউণ্ডারী লিমিটেডের ম্যানেজার), কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের লেকচারার মুনীন্দ্রনাথ বসু, মেঃ কর্ণেল ম্যাকাগনক্রাইষ্ট, ডাঃ ব্রাডলি (পি এণ্ড ও কোম্পানীর চীফ মেডিকেল অফিসার), লেঃ কর্ণেল কে, কে, চাটার্জ্জি (কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ) লেঃ কর্ণেল বার্কলেহিল (প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ ও রাচি ইউরোপীয়ান বাতুলাশ্রমের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট), প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী মিঃ জে, পি, গাঙ্গুলী, মিঃ উইণ্টার-টন (কলিকাতার ফটোগ্রাফার এডনা লরেন্স কোম্পানীর মালিক), মিঃ এস, সি চৌধুরী (বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব হস্তাক্ষর বিশারদ) বাবা দর্শনদাস নাগা, ভাওয়ালের বড় রাণী সরযূবালা দেবী, রাজকুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী (মেজকুমারের ভগ্নী), শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে বিল্লু বাবু (মেজ কুমারের ভাগিনেয়), শ্রীযুত কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্য (মেজকুমারের মামা), শ্রীযুক্তা সুধাংশুবালা দেবী (মেজকুমারের মামী) শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী (মেজরাণীর মামী) শ্রীযুক্তা পুরসুন্দরী দেবী (মেজরাণীর মামাতো ভগ্নী), শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি (অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন), শ্রীযুত হেমন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী (জমিদার, ময়মনসিংহ), এলোকেশী (মেজকুমারের রক্ষিতা শ্রীযুত চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে বিভূতি (জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জামাতা), শ্রীযুত সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে সাগর বাবু (জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জামাতা ও রায় সাহেব যোগেন্দ্র বাঁড়ুয্যের ভ্রাতা), শ্রীযুত বসন্তকুমার মুখার্জ্জি (দার্জ্জিলিং ডেপুটি কমিশনারের অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট), শ্রীযুত পদ্মিনী কুমার নিয়োগী (ম্যানেজার, কালীপুর এষ্টেট, শ্রীযুত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (জমিদার ও উত্তরবঙ্গ জমিদার সমিতির সেক্রেটারী), মিঃ পি, সি, গুপ্ত (কলিকাতা করপোরেশনের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার). মিঃ রামরতন ছিব্বা (কলিকাতা টেলিফোন কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার), ব্যারিষ্টার মিঃ এন, কে নাগ, ব্যারিষ্টার মিঃ সত্যধন ঘোষাল (ভূকৈলাসের জমিদার), মিঃ হরেন্দ্রকুমার ঘোষ (অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট), রায় সাহেব সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (অবসর প্রাপ্ত ভি, এস, পি); মিঃ গিরিশচন্দ্র সেন (মেজকুমারের জীবন বীমার এজেণ্ট ভাগ্যকুলের জমিদার

ও ব্যাঙ্কার শ্রীযুত হলধর রায়, শিল্প গণিতবিদ শ্রীযুত সোমেশচন্দ্র বসু প্রসিদ্ধ কবি গায়ক শ্রীযুত হরিচরণ আচার্য্য, প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা শ্রীযুত উমাকান্ত ঘোষাল শ্রীযুক্তা শরৎকামিনী চৌধুরী (ঢাকা জগন্নাথ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কিশোরী-মোহন চৌধুরীর পত্নী), শ্রীযুত বাউলচাঁদ বসাক (ঢাকা উকিল স্কুলের প্রধান শিক্ষক), শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী, হাইকোর্টের এডভোকেট (নাটোরের মহারাজার জামাতা), শ্রীযুত গোবিন্দ দেব রায় (কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট) কলিকাতা "ঘড়ি ঘরের" মালিক শ্রীযুত যদুনাথ মল্লিক, ব্যারাকপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

বিবাদীপক্ষের প্রধান প্রধান সাক্ষী

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও দার্জ্জিলিংয়ের ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন লেঃ কর্ণেল ক্যালভার্ট, কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট (অবসরপ্রাপ্ত আই,এম,এস), মেজর টমাস (আই, এম, এস, ঢাকার ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন), মিঃ ক্রফোর্ড (দার্জ্জিলিংয়ের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কমিশনার), মিঃ জে, টি, র‍্যাঙ্কিন (অবসরপ্রাপ্ত আই সি এস এবং ঢাকা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার ইনি বিলাত হইতে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সাক্ষ্য দিবার সঙ্গে সঙ্গেই অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং কলিকাতা হাসপাতালে মারা যান। তিনি তাঁহার প্রদত্ত সাক্ষ্যে স্বাক্ষর করিয়াও যাইতে পারেন নাই), মিঃ লিণ্ডসে (অবসরপ্রাপ্ত আই সি এস, ইনি বাদীর আসিবার সময় ১৯২১ সালে ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ছিলেন), মিঃ কে, সি, দে (অবসরপ্রাপ্ত আই, সি এস ও ভূতপূর্ব্ব রভিনিউ বোর্ডের মেম্বর), মিঃ কে সি চন্দ্র, আই সি এস, মিঃ জে এন গুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত আই, সি, এস), মেজর ধনজীভাই (আই, এম, এস ও রাঁচি ভারতীয় বাতুলাশ্রমের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট) মিঃ অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী (এটর্ণি ও প্রসিদ্ধ চিত্র সমালোচক), রায় বাহাদুর হেমাঙ্গচন্দ্র রায় চৌধুরী (জমিদার, সেরপুর), কাশিমপুরের জমিদার রায়বাহাদুর অতুলপ্রসাদ রায় চৌধুরী, সর্দ্দার রঘুবীর সিং (পাঞ্জাবের এম, এল, সি), মিঃ পার্শি ব্রাউন (কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ), মিঃ মার্সেল হোয়াইট (কলিকাতা ফটোগ্রাফার বোর্ণ এণ্ড সেফার্ড কোম্পানীর অংশীদার), মিঃ চার্লস হার্ডলেস (এলাহাবাদের হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ) শ্রীযুত শরদিন্দু মুখার্জ্জি (ভূতপূর্ব্ব এম এল এ), রায় সাহেব যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন

চক্রবর্ত্তী (বাদী যখন জয়দেবপুর আসেন, তখন ইনি ভাওয়াল এষ্টেটের এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার ছিলেন), মিঃ মায়ার (ভাওয়াল এষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার), মিসেস মায়াস, কর্ণেল পুলি (ভূতপূর্ব্ব পূর্ব্ববাঙ্গলার ও আসামের লেফটেনান্ট গবর্ণর সাহেবের এডিকং) লেফটেনান্ট হোসেন (ময়মনসিংহ জিলাবোর্ডের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান), ভাওয়ালের মেজকুমারের শ্যালক রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী (আলিপুরের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট) ভাওয়ালের মেজরাণী বিভাবতী দেবী, ভাওয়ালের ছোটরাণী আনন্দকুমারী দেবী আলতা দেবী (মেজরাণীর মামাতো ভগ্নী), রায়বাহাদুর রমেশচন্দ্র দত্ত (অবসর প্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ বিজলী ভূষণ সরকার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার, ব্যারিষ্টার মিঃ রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, ব্যারিষ্টার মিঃ রমেশচন্দ্র সেন, গীতা দেবী, কলিকাতা পুলিশের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কমিশনার বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে পত্নী, বাবা ধরমদাস নাগা, বাবা হরনাম দাস, মিঃ রাজেন্দ্রনাথ শেঠ (বালা মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান) রায়বাহাদুর সারদাপ্রসন্ন ঘোষ (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট), রায় সাহেব মহাতাপ ঘোষ ম্যাজিষ্ট্রেট (ইনি কিছু দিন পূর্ব্বে আত্মহত্যা করিয়াছেন), মিঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত সাব জজ) মিঃ হিরণ্মলাল মুখার্জ্জি (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের এসিষ্টান্ট সেক্রেটারী) প্রভৃতি।*

---

* সত্যেনবাবু, আশু ডাক্তার, ধর্ম্মদাস প্রভৃতির সাক্ষ্য দানের দিনগুলিতে আদালতে লোকের আধিক্য পুলিশের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা হইত। মেজরাণী ও ছোটরাণীর সাক্ষ্য নলগোলা রাজবাটিতে লওয়া হইত, সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না কিন্তু সমস্ত দিন রৌদ্র বৃষ্টিতে লোক রাস্তায় দাঁড়াইয়া লোক মুখে সাক্ষ্য শুনিত। ইহাতেই ঐ কয়েকজন সাক্ষীর মূল্য বুঝিতে পারা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার উপসংহার।
বাদীসন্ন্যাসীই ভাওয়ালের মেজকুমার।
বাদী সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের মালিক।..

এই অধ্যায়ে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা রায় প্রদানের দিন ১৯৩৬ সালে ২৪শে আগষ্ট আদালতে ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানে কিরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা দেখাইয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে চিরস্মরণীয়, চিন্তাশীল বাঙ্গালী জজ শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু মহাশয়ের সুদীর্ঘ রায় প্রকাশিত করিব।

রায় শুনিবার পূর্ব্বে আদালতের অবস্থা

নির্দ্দিষ্ট সময়ে বহু পূর্ব্বে সহস্র সহস্র লোক আদালত প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হয়। নিকটবর্ত্তী রাস্তা ও স্থানসমূহ লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। রাস্তা দিয়া যানবাহন চলাচল একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। বেলা ১১টার সময় দেখা গেল, আদালত প্রাঙ্গণ যেন নরসমূদ্রে পরিণত হইয়াছে। অতিকষ্টে জনতা ভেদ করিয়া আদালতে প্রবেশ করিতে সকলকেই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য মোড়ে মোড়ে পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছিল। যথাসময়ে বিজ্ঞ জজ শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু আসিয়া উপস্থিত হন। ভগবদ্‌বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ বলিতেছিলেন ভগবান যখন সত্যই আছেন তখন কুমারের জয় ও অধর্ম্মাচারিণী রাণীর পরাজয় হইবেই হইবে।

আদালতে জজের আগমন

আদালতে উপবেশন করিয়া অতিরিক্ত জেলা জজ শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু মহাশয় ঠিক ১১ টার সময় রায় প্রকাশ করেন। সুদীর্ঘ রায়ের সমস্ত না পড়িয়াই তিনি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন, তিনি ঘোষণা করেন যে, **বাদীই ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ** এবং তিনি ভাওলালের সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাইবার অধিকারী।

রায় হইবার পরের অবস্থা

রায় বাহির হইবার পরই সমবেত জনতা বাদীর বাসস্থান অভিমুখে ধাবিত হয়! শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীও এই বাড়ীতেই আছেন। আগ্রহাকুল জনতা উৎসাহের আতিশয্যে কুমারের বাড়ীর সম্মুখস্থ সমগ্র পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় তাঁহারা ঘন ঘন আনন্দধ্বনি করিতে থাকে।

কুমারের অবস্থা

জনসাধারণের অনুরোধে বাদী কুমার বাহাদুর বাড়ীর বাহিরে আসিয়া সকলকে দর্শন দান করেন সর্ব্বসাধারণের সাহায্য সহানুভূতি লাভের জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ দেন, "তাঁহারই অনুগ্রহে আমাদের জয় হইয়াছে।"

কথাগুলি বলিবার সময় তিনি নিজেই ভাবাবেগে বিচলিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। ঢাকা সহরের সর্ব্বত্র আজ আনন্দ উল্লাস পরিলক্ষিত হইতেছে। হিন্দু-মুসলমান সকলে মিলিয়া এই মামলার রায় শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।

রায় শুনিবার জন্য সহস্রাধিক লোক আদালত প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিল। জজের সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইয়া তাহারা সমস্বরে "ভাওয়াল কুমারকী জয়" "মেজ কুমারকী জয়"—ইত্যাদি ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত করে। দেখিতে দেখিতে এই সংবাদ ঢাকা নগরীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে তখন আর্ম্মাণিটোলার কুমার বাহাদুরের বাসস্থানে লোক সমবেত হয়। তাহারা নানাভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে।

আদালতের মধ্যে কেবল উকীল ও সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণকে প্রবেশ করিতে, দেওয়া হইয়া ছিল তাঁহারা সকলেই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জজের সিদ্ধান্ত শুনিবার প্রতীক্ষায় ছিলেন। জজ সাহেব বলেন যে, তাঁহার রায় সুদীর্ঘ; ৫৩২ পৃষ্ঠা ফুলসকেপ কাগজে তাহা টাইপ করা হইয়াছে। অতএব তিনি সমগ্র রায় না পড়িয়া কেবল তাঁহার সিদ্ধান্তের কথাই আদালতে পাঠ করিবেন।

বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানের বার-লাইব্রেরীর সদস্যগণ, ঢাকা বার লাইব্রেরীর সদস্যের নিকট টাকা পাঠাইয়া অনুরোধ করিয়াছিল। "ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার রায়ের সারমর্ম্ম যেন তারযোগে তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করেন।"

রায়ে ঢাকার অধিবাসিগণ বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন বহু লোক বাদীর আবাসে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে—পরে কয়েকটি সঙ্কীর্ত্তনের দল ঢাকার প্রধান প্রধান রাস্তায় পরিভ্রমণ করে।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী মূর্চ্ছিতা

কুমারদের ভগ্নী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যখন শুনিলেন যে, বাদী মেজকুমার বলিয়া আদালত কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়াছেন, তিনি তখনই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। ক্ষণকাল পরে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকেন।

মেজকুমার রায় শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠেন তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য ভাওয়ালের হাজার হাজার প্রজা আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। কুমার মৃদু হাস্য সহকারে সকলের অভিনন্দনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বাঙ্গলার নানাস্থান হইতে সম্বর্দ্ধনা সূচক বার্ত্তা আসিতেছে বহু উকীল সভা হইতেও মেজকুমারকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া তারবার্ত্তা আসিতেছে।

জয়দেবপুরে শোভাযাত্রা

মেজকুমারের পক্ষে মামলার ডিক্রি হইয়াছে, জয়দেবপুরে এই খবর আসিয়া পৌছান মাত্র কুমারের জয়ে আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য নানাস্থান হইতে শোভাযাত্রা বাহির হইতে থাকে।

আশু ডাক্তারও মূর্চ্ছিত

ডাঃ আশু দাশগুপ্তকে রায়ের খবর জানান মাত্র তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। কেহ কেহ বলে যে সত্যবাবু ও মেজরাণী ও বিবাদি পক্ষের অনেক সাক্ষী সেদিন মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।

টেলিগ্রাফ আফিসের অবস্থা :

এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ঢাকা টেলিগ্রাফ অফিস হইতে এই মামলার রায় সম্পর্কে হাজার হাজার শব্দ বাহিরে প্রেরিত হইয়াছে। ঢাকা টেলিগ্রাফ অফিস হইতে এবিষয়ে যথেষ্ট তৎপরতা ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

মামলার বিচার্য্য বিষয়

ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার বিচার্য্য বিষয়সমূহের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) বাদীর মামলা দায়ের করিবার কোন কারণ ঘটিয়াছে কি না।

(২) এই মামলা তমাদি দোষে বারিত কি না।

(৩) দখলে নাই বলিয়া বাদী সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত কিনা।

(৪) বাদী ভাওয়ালের মেজকুমার কিনা।

(৫) বাদী ও ভাওয়ালের মেজকুমারের মধ্যে সাদৃশ্য আছে কিনা।

(৬) প্রতিবাদী পক্ষের লিখিত জবানবন্দী অনুসারে সন্ন্যাসগ্রহণের ফলে বাদী ঐহিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে কি না ; প্রতিবাদী পক্ষের অথবা লিখিত বিবৃতি অনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণের কথা মানিয়া লইয়াও বাদীকে ঐহিক অধিকার সম্পর্কিত সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে কি না।

(৭) বাদী স্থায়ীভাবে ইঞ্জাংসনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছে ; তাহা সে পাইতে পারে কিনা।

(৮) সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত মামলায় বাদীর কোন স্বত্ব প্রতিপন্ন হয় কি না।

(৯) মেজকুমারের শবদেহের সংকার হইয়াছিল কি না।

(১০) বাদী কোন সুবিধা পাইতে পারে কি না এবং তাহার কোন পাওয়ার অধিকার থাকিলে তাহা কিরূপ ধরণের।

বাদীর প্রার্থনা

ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার বাদী আদালতের নিকট নিম্নলিখিত প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—

(১) বাদীকে ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া ঘোষণা করা হউক।

(২) বিবাদী রাণী বিভাবতী দেবীর উপর এই মর্ম্মে একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করা হউক যে, ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের তৃতীয়াংশ এবং তাহা হইতে উৎপন্ন সম্পত্তি ভোগ দখলের ব্যাপারে তিনি যেন বাদীকে কোন প্রকারে বাধা প্রদান না করেন।

(৩) সমস্ত বিবাদীর উপর এই মর্ম্মে একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করা হউক যে, এই মামলার শুনানীর সময় তাঁহারা যেন বাদীর ভোগ দখলে কোন প্রকারে বিঘ্ন উৎপাদন না করেন।

(৪) যে অবস্থায় এবং যে কারণে মামলা আনয়ন করা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া আইন অনুসারে বাদীর আর যদি কোন প্রকারে কোন কোন কিছু সাহায্য প্রাপ্য হয়, তাহা প্রদান করা হউক।

(৫) মামলায় বাদী পক্ষের যে ব্যয় হইবে তাহা বিবাদী পক্ষ হইতে আদায় করিবার জন্য বাদীর অনুকূলে ডিক্রি দেওয়া হউক।

মামলার প্রতিবাদিগণ

মূল প্রতিবাদিনী—রাণী বিভাবতী দেবী, ভাওয়ালের মেজকুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায়ের সহধর্ম্মিণী।

এতদ্ব্যতীত রাণী সরযূবালা দেবী (ভাওয়ালের বড়কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সহধর্ম্মিণী), রাণী আনন্দকুমারী দেবী (ভাওয়ালের ছোটকুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের সহধর্ম্মিণী) এবং কুমার রামনারায়ণ রায় (রাণী আনন্দ-কুমারী দেবীর দত্তক পুত্র)—এই তিনজন মামলার অন্যান্য প্রতিবাদী

মামলার বিচারক

ঢাকার অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজ শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু এই মামলার বিচার করিয়াছেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। এম, এ ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি কিছুদিন অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন্। ১৯১০ সালের ২১শে মার্চ্চ তারিখে তিনি মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালের প্রথম হইতে ১৯২৬ সালের শেষ পর্য্যন্ত তিনি ঢাকায় মুন্সেফের পদে

বহাল ছিলেন। ১৯৩২ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি সাবজজের পদে উন্নীত হন।

১৯৩৩ সালের ১১ই মার্চ্চ তারিখে তিনি পুনরায় ঢাকায় বদলী হইয়া আসেন ঐ বৎসর ২৭শে নভেম্বর হইতে তাঁহার এজলাসে ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার শুনানী আরম্ভ হয় গত বৎসর তিনি অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজের পদের উন্নীত হন। শেষে অস্থায়ী জেলা জজ হন।

শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসুর বাড়ী কলিকাতা আমহার্ষ্ট রো'তে। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুবাদ খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল।

কিরূপ স্ত্রী শিক্ষা চান ?

একালের না সেকালের ?

সে বিচার আপনি করুন

কিন্তু

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ভারতের নারী

ষষ্ঠ সংস্করণ

কিনিতে ভুলিবেন না। ইহাতে স্ত্রীশিক্ষোপযোগী সকল রকম উপাদান আছে। পাতায় পাতায় ছবি।

মূল্য ১৷৷৹ টাকা মাত্র।

বিচারক—মিঃ পান্নালাল বসু

[illegible]

Aparajita Press

ভাওয়াল মামলার রায়

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার বিস্তৃত রায় নিম্নে প্রদত্ত হইল—

জিলা ঢাকা

ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত জজ শ্রীযুত পান্নালাল বসুর আদালতে

তাং—২৪শে আগষ্ট, ১৯৩৬ টি সুট নং ৩৮—১৯৩৫

বাদী—কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়

বিবাদিগণ—১। শ্রীমতী বিভাবতী দেবী, তৎপক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ ঘোষ—প্রধান বিবাদী।

২। শ্রীমতী সরযূবালা দেবী, তৎপক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৩। শ্রীরামনারায়ণ রায়, নাবালক, তৎপক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৪। শ্রীমতী আনন্দকুমারী দেবী তৎপক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

এই মামলায় উত্থাপিত প্রধানতম প্রশ্ন হইল ঘটনা বিষয়ক। এই ঘটনা পূর্ব্বে যে কখন ঘটে নাই তাহা নহে, তবু ইহা প্রায়শঃ ঘটে না। বিশাল এক সম্পত্তি এই মামলায় যে বিজড়িত এবং কতকগুলি ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর যে ইহার ফল ফলিবে ইহাতেই এই মামলা গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে।

বাদী আপনাকে জয়দেবপুরের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ২য় পুত্র কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলিয়া পরিচয় দিয়া দাবী করিতেছেন যে, তাহাকে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেওয়া হউক এবং তাহাকে ভাওয়াল রাজ সম্পত্তির তৃতীয়াংশ প্রদান করা হউক, এবং আদালত যদি মনে করেন যে, উক্ত সম্পত্তিতে তাহার দখল নাই, তবে তাহাতে তাঁহাকে দখল দেওয়া হউক।

বিবাদীপক্ষ বলিতে চাহেন যে, কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় মারা গিয়াছেন। বর্ত্তমান বাদী 'প্রতারক' মাত্র।

এই মামলায় উভয় পক্ষের বক্তব্য বুঝিতে এবং বর্ত্তমান দাবী কি অবস্থায় উদ্ভূত হইয়াছে ও তৎফলে কাহারা বিপন্ন হইতেছে তাহা বুঝিতে হইলে ভাওয়াল রাজ্যের পারিবারিক ইতিহাসের সবিশেষ বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভাওয়াল রাজপরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পূর্ব্ব বঙ্গের শ্রেষ্ঠতম জমিদার ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল মারা যান, 'রাজা' তাঁহার ব্যক্তিগত উপাধি হইলেও এই রাজবংশ অতি প্রাচীন এবং ঢাকার প্রধান হিন্দু জমিদার বংশ বলিয়া ভাওয়াল জমিদাররা প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই রাজ বংশের বাসস্থান হইল জয়দেবপুরে। ইহা ঢাকা হইতে ২০ মাইল দূরে ভাওয়াল পরগণার মধ্যে অবস্থিত। ঢাকা ও ময়মনসিংহ উভয় জিলায় এই জমিদারী পরিব্যাপ্ত। ঢাকায় রাজার একটি বাড়ী থাকিলেও তিনি সাধারণতঃ তাঁহার পল্লী ভবনেই থাকিতেন। ঐ অঞ্চলে তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অসামান্য ছিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ভাওয়াল এষ্টেটের আয় ছিল প্রায় ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩৫৩ টাকা, রাজার সময় আয় ইহা অপেক্ষা বড় কম ছিল না।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু

বিধবা রাণী বিলাসমণি, রণেন্দ্রনারায়ণ, রমেন্দ্রনারায়ণ ও রবীন্দ্রনারায়ণ এই তিন পুত্র এবং ইন্দুময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী ও তড়িন্ময়ী এই তিন কন্যা রাখিয়া রাজা মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজা যে অছিনামা ও উইল করিয়া যান তাহার ঠিক ঠিক সর্ত্ত জানিতে পারা না গেলেও, সর্ব্বসম্মত ব্যাপার এই যে, তাঁহার মৃত্যুর পর বিধবা রাণী—তিন পুত্রের পক্ষ হইতে সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ২১শে জানুয়ারীতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাণী বিলাসমণি অছিরূপে সম্পত্তি চালাইতে থাকেন। রাণী বিলাসমণির মৃত্যুর পর তিন কুমার বিধিমত সম্পত্তির মালিক হন। ইহাতে আপত্তি তোলা হয় নাই যে, রাজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়—সম্পত্তির তৃতীয়াংশের অধিকারী ছিলেন এবং যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন এবং হিন্দু আইন অনুসারে সামাজিক মৃত্যু যদি তাঁহার না হইত, তবে তিনি উক্ত অংশের অধিকারী হইতেন।

তিন রাজকুমার এক অন্নে

জননীর মৃত্যুর পর তিন কুমার পূর্ব্ববৎ যৌথ পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতেন। পূর্ব্বেই তাঁহাদের বিবাহ হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়া বিবাদিনী শ্রীমতী সরযূবালা দেবীর সহিত বড় কুমারের বিবাহ হয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রথমা বিবাদিনী শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর সহিত মধ্যম কুমারের বিবাহ হয় এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে চতুর্থা বিবাদিনী শ্রীমতী আনন্দকুমারী দেবীর সহিত ছোট কুমারের বিবাহ হয়। জয়দেবপুর-ভবনে রাজ পরিবার রহিতেন এবং বিবাহিতা তিন পিসীই উক্ত পরিবারভুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেন। রাজা রাজেন্দ্রের মৃত্যুর পরও তাঁহার জননী রাণী সত্যভামা দেবী পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতেন। রাজার ভগিনী শ্রীমতী কৃপাময়ী দেবী আপন স্বামীসহ রাজবাড়ীর পৃথক অংশে বাস করিলেও, তিনিও একপ্রকার রাজপরিবারভুক্তই ছিলেন।

স্বাস্থ্যলাভের জন্য দার্জ্জিলিংএ মেজকুমার

১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই অবস্থাই চলিতেছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল মধ্যমকুমার দার্জ্জিলিং গমন করেন। ২০শে এপ্রিল তিনি প্রথমা বিবাদিনী আপন স্ত্রী, শ্যালক বাবু [বর্ত্তমানে রায় বাহাদুর] সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কতিপয় আমলা, একজন ডাক্তার ও ভৃত্যাদি সহ দার্জ্জিলিং পৌঁছেন। ৮ই মে অল্পকাল রোগ-ভোগের পর তাঁহার নাকি মৃত্যু হয়। তৎপর ১১ই মে তারিখ রাত্রিতে সকলে জয়দেবপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

রাজকুমারদের মৃত্যুর পর

প্রথমা বিবাদিনী বিভাবতী দেবী নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহার স্বামীর অংশের সম্পত্তির মালিক হন। ইহার পর বড় কুমার ২৮ বৎসর বয়সে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মারা গেলে তাঁহাদের বিধবা পত্নীগণ আপন আপন স্বামীর অংশের সম্পত্তির মালিক হন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ মধ্যম রাণী ও ছোট কুমারের অংশের এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বড় রাণীর অংশের তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করেন। এই ভার গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই বড় ও মধ্যম রাণী কলিকাতায় গিয়া বাস করিতেছিলেন। এষ্টেটের আয় হইতে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ তাঁহাদিগকে প্রচুর টাকা দিতেন। ছোট কুমারের মৃত্যুর পরই ছোট রাণী ঢাকা ত্যাগ করেন, কিন্তু কয়েক বৎসর পর ফিরিয়া আসিয়া ঢাকাতেই অবস্থান করিতেছেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তৃতীয় বিবাদী রামনারায়ণ রায়কে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। একটি চুক্তির ফলে দত্তক গ্রহণের পরও তিনি আপন স্বামীর

অংশের এক ভাগের উত্তরাধিকারী আছেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্তৃত্বের বহির্ভূত হইলেও এই অংশটুকুও কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। আইনতঃ বাদীর দাবী সাব্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সম্পত্তির অবস্থা এইরূপ—এষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডের কর্ত্তৃত্বে আছে, তিন রাণী ও দত্তক পুত্র আপন অংশ ভোগ করিতেছেন, ছোট রাণীর ব্যাপারে একটু গোল থাকিলেও, সকল রাণী হিন্দু বিধবারূপে সম্পত্তির আপন অংশ ভোগ দখল করিতেছেন।

অবস্থা যখন এইরূপ তখন ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে বা ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে ঢাকায় এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়। ঢাকায় বুড়ীগঙ্গার তীরে বাকল্যাণ্ড বাঁধে বহুলোক প্রাতে ও সন্ধ্যায় আরাম ও স্বাস্থ্যের জন্য ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই বাঁধের নিকট এক স্থানে ধুনী জ্বালিয়া একটী সন্ন্যাসী দিন রাত বসিয়া থাকিতেন। সন্ন্যাসীর পরণে একটি লেংটি, অঙ্গ ভস্মাবৃত, মুখে সুদীর্ঘ শ্মশ্রু, মস্তকে সুদীর্ঘ জটা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আসিয়া পড়িয়াছিল। এই সন্ন্যাসীই বর্ত্তমান মামলার বাদী।

আরজীতে বাদী দাবী করিয়াছেন যে, তিনিই প্রথমা বিবাদিনী শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর স্বামী ভাওয়ালের মধ্যমকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। তিনি বলিয়াছেন যে, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্ত্রী এবং কতিপয় আমলা ও আত্মীয়সহ হাওয়া বদলের জন্য তিনি দার্জ্জিলিং গমন করেন। তথায় অসুস্থ হইয়া পড়িলে, চিকিৎসাকালে তাঁহার উপর বিষ প্রয়োগ করা হয়। ইহাতে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। মৃত মনে করিয়া রাত্রিকালে তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। শব শ্মশানে নীত হইলে প্রবল ঝড় বৃষ্টি হইতে থাকে, তাহাতে শববাহীদল শব ফেলিয়া অন্যত্র গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া আর শব দেহটি খুঁজিয়া পায় নাই। ইহার কয়েক দিন পর বাদী চৈতন্যলাভ করিয়া তাহার চারিদিকে কতকগুলি নাগা সন্ন্যাসীকে দেখিতে পান। সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে শুশ্রূষা করে। তিনি তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিতে থাকেন। বিষ প্রয়োগের ফলে তাঁহার পুরাতন স্মৃতি প্রায় নষ্ট হইয়া যায়। নানা সঙ্গীদের সঙ্গে বাদী নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বা ১৯২১ খৃ অব্দের প্রথম ভাগে ঢাকায় আসিয়া সন্ন্যাসীবেশে ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধের নিকট অবস্থান করিতে থাকেন।

বাদীর দাবী

বাদী আরও বলেন—বাকল্যাণ্ড বাঁধে অবস্থানকালে অনেকে তাঁহাকে মধ্যম কুমার বলিয়া চিনিতে পারে। অবশেষে তাঁহার আত্মীয়বর্গ ও স্থানীয়

জমিদারগণ তাঁহার আত্ম-পরিচয় প্রদানের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে তিনি আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেন। ইহাতে সকলে তাঁহাকে সংসারী হইতে বলে, প্রজারা তাঁহাকে মানিয়া লইয়া খাজানা ও নজর দিতে থাকে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে জয়দেবপুরের এক বিরাট জন সভায় তাঁহাকে মধ্যম কুমার বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। ইহার পর তিনি এষ্টেটে আপন অংশের খাজানা আদায় করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ও শ্যালক ষড়যন্ত্র করিয়া তদানীন্তন ঢাকার কালেক্টার মিঃ লিণ্ডসেকে দিয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন ঘোষণা করাইলেন যে, বাদী 'প্রতারক'। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর রেভিনিউ বোর্ডের নিকট বাদী এক আবেদন করিলে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ তাহা অগ্রাহ্য হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাদীকে সুন্দর দাস ওরফে ভাওয়াল সন্ন্যাসী নামে অভিহিত করিয়া ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১৪৪ ধারা তাঁহার উপর জারি করিয়া আদেশ প্রদান করা হয় যে, তিনি যেন, জয়দেবপুর থানার এলাকা মধ্যে প্রবেশ না করেন। বাদী বলিতে চাহেন, খাজানা আদায় করিতেছেন ইহাতেই সম্পত্তির উপর তাঁহার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কাজেই ১নং বিবাদিনী ও তৎপক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার প্রজাদের বিরুদ্ধে যে সার্টিফিকেট জারি করিতেছেন তাহা বে-আইনী।

কুলোকের পরামর্শে মেজরাণী বিভাবতী

বাদী বলিতেছেন যে, কুলোকের পরামর্শে এবং লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে একেবারে না দেখিয়াই অস্বীকার করিতেছেন ও তাঁহার স্বত্ব নষ্ট করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। দ্বিতীয়া বিবাদিনী বড় রাণী বাদীকে মেজকুমার বলিয়া মানিয়া লইলেও এ ষ্টেটে তাঁহার অংশের পরিচালক কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার তাহা মানিতে চাহেন না। ৩নং বিবাদী এবং ৪নং বিবাদিনী স্পষ্টতঃ কিছু না বলিলেও তাঁহাদের আচরণ হইতে মনে হয় যে তাঁহারা বাদীর বিরুদ্ধ। ছোটরাণীর দত্তক সিদ্ধ কি না বাদী তাহা জানেন না, তবে ইহা ঠিক যে, এই দত্তকপুত্র এষ্টেটের অংশ ভোগ করিতেছেন, এইজন্য দত্তক পুত্রকেও বিবাদী করা হইয়াছে।

বিবাদীগণের বক্তব্য বিষয়

৩নং বাদী এবং ৪নং বিবাদিনী এই মামলার বিরুদ্ধে দাড়াইয়া আদালতে লিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। ২নং বিবাদিনী বড়রাণী বাদীর দাবীর

প্রতিবন্ধক হন নাই, বাস্তবিক পক্ষে তিনি হলফ করিয়া বাদী ও মেজ কুমারকে অভিন্ন ইহা আদালতে বলিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিবাদীপক্ষ বলিতেছেন যে, দার্জ্জিলিংএ কুমার রমেন্দ্র পিত্তশূলে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে প্রায় মধ্য রাত্রিতে মারা যান এবং পরদিবস প্রাতে তাহার শব সংকার করা হয়। বাদীকে কেহ মধ্যম কুমার বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। তিনি মোটেই বাঙ্গালী নহেন। বাঙ্গালা ভাষা তিনি কখনও জানিতেন না। কতিপয় মতলবী লোক আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে দাঁড় করাইয়াছে। ছোট রাণী বলিতে চাহেন যে, কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ কুমারদের তিন ভগিনীকে রাজপরিবার হইতে বিতাড়িত করেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দত্তক গ্রহণে তাহাদের সকল আশা বিলুপ্ত দেখিতে পাইয়া এই ভগিনীগণ এক পঞ্জাবী সন্ন্যাসীকে মধ্যম কুমার বলিয়া দাড় করাইয়াছেন। বিবাদীদিগের বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, কতকগুলি কাজের জন্য রাজপরিবারের আত্মীয়বৃন্দ ও প্রজাদের নিকট কোর্ট অব ওয়ার্ডস অপ্রিয় হইয়া পড়ে। বিবাদী পক্ষের আরও বক্তব্য এই যে, বাদীকে মেজকুমার বলিয়া মানিয়া লইলেও এই মামলা তামাদি দোষে দুষ্ট। কারণ, প্রথমা বিবাদিনী ১২ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া তাঁহার অংশে বিরুদ্ধ স্বত্ব ভোগ করিতেছেন। আরও বাদী নিজেই যখন বলিয়াছেন যে, তিনি সংসার ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার দাবী নষ্ট হইয়াছে।

মামলার বিচার্য্য বিষয়গুলি এই—

১। বাদী মামলা দায়ের করিতে পারেন কি না ?

২। মামলা তামাদি দুষ্ট কিনা ?

৩। স্পেসিফিক রিলিফ আইনের ৪২ ধারা অনুসারে মামলা বাতিল হইতে পারে কিনা ?

৪। মধ্যম কুমার রমেন্দ্রনারাণ রায় জীবিত আছেন কি না ?

৫। বর্ত্তমান বাদী ভাওয়ালের মধ্যম কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় কি না ?

৬। মামলার তায়দাদ ও ষ্ট্যাম্প ঠিক আছে কি না ?

৭। ভাওয়াল এষ্টেটের কোন অংশে বাদীর কখনও দখল ছিল কি না ? যদি না থাকে তাহা হইলে মামলা টিকে কি না ?

৮। বাদীর আরজীর দ্বিতীয় প্যারার শেষ অংশে যে অভিযোগ করা হইয়াছে—তদনুসারে কোনও প্রতিকার বাদী পাইতে পারেন কি না ?

১নং বিচার্য্য সম্বন্ধে আমি সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, আরজি হইতে বুঝা যায় যে বাদীর মামলা রুজু করিবার কারণ বর্ত্তমান।

৩নং বিষয় সম্বন্ধে কোন পক্ষ সওয়াল করেন নাই। কাজেই ইহা আলোচ্য নহে; ইহা স্বত্ব সাব্যস্তের মামলা নহে। স্পেসিফিক রিলিফ আইনের ৪২ ধারা ইহার প্রতিবন্ধক নহে।

২, ৬, ৭ ও ৮নং বিচার্য্য সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে ৪ ও ৫নং বিষয়ের বিচার হইবার পর এই বিচার্য্যগুলির আলোচনা করিতে হইবে।

প্রধান বিচার্য্য, বাদী মধ্যম কুমার কিনা?

৪র্থ ও ৫ম বিচার্য্য সম্বন্ধে ইহাই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রশ্ন যে, বাদী ভাওয়ালের মধ্যম কুমার কি না? বিবাদীদের আপত্তি সত্বেও আমি ৫ম বিচার্য্যটি বাতিল করি নাই, এই দুই ইস্থ অনুসারে বাদীকে প্রমাণ করিতে হইবে মধ্যম কুমার জীবিত আছেন এবং বাদীই সেই মধ্যম কুমার। যদি তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, তিনিই মধ্যমকুমার তবে তিনি জীবিত। যদি প্রমাণ করিতে না পারেন যে, তিনি মধ্যমকুমার, তাহা হইলে মধ্যমকুমার জীবিত থাকুন বা মরিয়াই যান মামলার এখানেই অবসান ঘটিবে। উদাহরণ-স্বরূপ আপনার কোন বন্ধু যদি জীবিত দেখিতে পান, যদি আপনার ঠিক থাকে যে, যাহাকে আপনি দেখিতেছেন তিনিই আপনার বন্ধু, তাহা হইলে বন্ধুর মৃত্যু হইতে পারে না।

বিষয়টি অত্যন্ত সহজ ও সরল হইলেও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর হইতে আরম্ভ হইয়া ছুটী ও আমার অসুস্থতার প্রভৃতি জন্য ১৫ দিন অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত প্রত্যহ এই মামলার শুনানী হইয়া আসিয়াছে। বাদী পক্ষে ১ হাজার ৪২ জন ও বিবাদী পক্ষে ৪৩৩ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, একদল সাক্ষী বাদীকে মধ্যমকুমার বলিয়া মানিয়াছেন। আর একদল সাক্ষী তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছেন। বিবাদী পক্ষ বাদীকে নানা প্রকারে পরীক্ষা করিয়াছেন। বিবাদী পক্ষ আদালতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাদীর সহিত মেজকুমারের কোন মিল নাই। সাক্ষীগণ মাত্র মুখ ও শারীরিক গঠনাদি ও আরও কয়েকটি অসাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। বাদীকে রাজ পরিবারের ইতিহাস, কুমারের দৈহিক গঠন, তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাঁহার শিক্ষা ও অভ্যাসাদি, তাঁহার নীতি ও চরিত্র, তাহার সঙ্গী ও রোগাদি, স্ত্রী ও ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়গণের সহিত তাহার সম্পর্কাদি প্রমাণ করিতে হয়। কি প্রকার লোকজনের সহিত তিনি মিশিতেন, কিরূপ বসন-ভূষণ তিনি পরিধান

করিতেন, কি খাদ্য তিনি খাইতেন এবং কি প্রকারে আহার করিতেন ইহার প্রমাণও বাদীকে প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। এই ধরণের মামলায় এই প্রকার প্রমাণের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক হইলেও মেজ কুমারের স্মৃতি সম্বন্ধে বিশেষ জেরা না করিয়া তাঁহার মোটামুটি সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধেই জেরা করা হইয়াছে। মেজ কুমারের জীবনের ঘটনা বা তাঁহার পারিবারিক ঘটনা সম্বন্ধে তেমন জেরা করা হয় নাই। মাত্র কি কি জিনিষ তিনি চিনিতেন এবং তাহার ইংরেজী নাম কি ইহার প্রশ্নের উপরই জোর দেওয়া হয়। এই সকল জেরার বিস্তৃত আলোচনা আমাকে করিতে হইবে। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে তদন্ত করা যে দরকার তাহার বিবেচনার জন্য বাদী ইংরেজী 'ক্রুয়েট' শব্দ জানিতেন কি না তাহার উল্লেখ করিতেছি। এখানে মাত্র লেখাপড়া জানা ও ইংরেজী ভাষা জ্ঞানের প্রশ্ন আসে না, ইহাতে জীবন যাত্রার ধরণ সম্বন্ধেও বুঝা যায়। ইহাতে প্রশ্ন উঠে যে, তিনি এমন জীবনযাপন করিতেন কি না যাহাতে 'ক্রুয়েট,' 'মেনু', 'যার্ক' 'লোঞ্জ সুট' বা 'মিস-ইন-বাক্স' কথাগুলি শিখা যায়। ক্রীড়াদি সম্বন্ধেও ইহা বলা যাইতে পারে যে, ক্রীড়াগুলি কি তিনি মাত্র জানিতেন, না তাহাদের ইংরেজী ভাষার নামও জানিতেন?

রাজপরিবারের ইতিহাস, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে—সে যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা অতি সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় কুমারের দার্জ্জিলিং যাত্রা, তাঁহার অসুখ, চিকিৎসা, মৃত্যু, শবদাহ সম্বন্ধেও বহু প্রমাণ প্রযুক্ত হইয়াছে। হস্তাক্ষরের মিল প্রমাণ ও অপ্রমাণ করিবার জন্য উভয় পক্ষ হইতে লিপি-বিশারদদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। বিবাদীপক্ষ কুমারের পারিবারিক ইতিহাস ও জীবনের অনেক ব্যাপার অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অনেক ঘটনা প্রমাণিত হইবার পর বিবাদী পক্ষকে তাহা মানিয়া লইতে হইয়াছে। বিচারকালে এক সময়ে বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলী বাদীপক্ষের প্রমাণ গ্রহণ শেষ করিবার জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিতে থাকেন। ইহাতে কতকগুলি বিবদমান বিষয় সম্বন্ধে প্রমাণ অগ্রাহ্য করিতে বলা হয়। বিবাদীর কৌঁসুলী বাদীপক্ষের সাক্ষীকে সমন যাহাতে দেওয়া না হয় তৎবিষয়ে জিদ ধরেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ করা হইতেছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আদালতের অপব্যবহার না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে না, এই কথায় আদালত সম্মত হইতে পারেন না।

ইহা এখন একেবারে সুস্পষ্ট যে, জনসাধারণের সহানুভূতি সম্পূর্ণ বাদীর দিকে। আদালতে দর্শকের যেরূপ ভীড় হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যায় যে,

জনসাধারণের আগ্রহ কত বেশী। কিন্তু জনপ্রিয়তায় বাদীর আর কি লাভ হইবে? আদালতে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদির উপরই বিচার্য্য বিষয়ের মীমাংসা হইবে। বাদীর কাহিনী যেন উপন্যাস। কিন্তু সর্ব্বশ্রেণীর শত শত ব্যক্তি এবং ছয়জন বাদে আর সকল আত্মীয় শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, বাদীই মেজকুমার। আত্মীয়দের মধ্যে আছেন কুমারের ভগিনী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, ভ্রাতৃবধূ বড় রাণী, এমন কি মেজরাণীর নিজের মাতুলানী বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত মহিলা শ্রীমতী সরোজিনী দেবী। কাজেই এইরূপ মামলার প্রযুক্ত প্রমাণাদি সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে।

সনাক্ত সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয় সমূহ।

বাদীকে সনাক্ত করা সম্বন্ধে কি কি বিষয় কি ভাবে আলোচনা করিব, আমি তাহা উল্লেখ করিব—

১। রাজপরিবার, পৈত্রিক বাসভূমি, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে দ্বিতীয়কুমারের তথাকথিত মৃত্যুকাল পর্যন্ত পারিবারিক ইতিহাস, এই তারিখের পূর্ব্বে মধ্যমকুমার, তাঁহার শিক্ষা, আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, চরিত্র, স্ত্রীর ও ভগিনীগণের সহিত সম্পর্ক প্রভৃতি (রায়ের ১৯ পৃঃ হইতে ৬২ পৃঃ পর্য্যন্ত)।

২। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মে হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর বাদীর ঢাকায় আবির্ভাবের সময় পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা। (রায়ের ৬৩ পৃঃ হইতে ৮৫ পৃঃ)।

৩। এই মামলা দায়েরের সময় পর্য্যন্ত বাদী ও বিবাদীদের কার্য্যাবলী (রায়ের ৮৬ পৃঃ হইতে ১৬০ পৃঃ)।

৪। সনাক্ত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ (রায়ের ১৬৩ পৃঃ হইতে ২৪১ পৃ পর্য্যন্ত)।

৫। কুমার ও বাদীর অঙ্গ বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য (রায়ের ২৪২ পৃঃ হইতে ২৬৫ পৃঃ পর্য্যন্ত)।

৬। ফটো হইতে অঙ্গবৈশিষ্ট্য (পৃঃ ২৬৬ হইতে ২৮৫ পৃঃ)।

৭। বাদীর অঙ্গচিহ্ন (পৃঃ ২৮৬ হইতে ৩০৯ পৃঃ)।

৮। চলিবার ভঙ্গি, হাবভাব ও কণ্ঠস্বর (পৃঃ ৩০৯ হইতে ৩১১ পৃঃ)।

৯। সনাক্তি অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (পৃঃ ৩১১ হইতে পৃঃ ৩১৩)।

১০। বাদীর মন (পৃঃ ৩১৩ হইতে পৃঃ ৩৪৬)।

১১। কুমার কি নিরক্ষর ছিলেন (পৃঃ ৩৪৬ হইতে পৃঃ ৩৭৭)।

১২। স্বীকারোক্তি ও আচরণ (পৃঃ ৩৭৭ হইতে পৃঃ ৩৮৩)।

১৩। দার্জ্জিলিং (পৃঃ ৩৮৩ হইতে পৃঃ ৪৮৯)।

১৪। বাদী কি আউজলার মাল সিং? তিনি কি অ-বাঙ্গালী? (পৃঃ ৩৯৫ হইতে পৃঃ ৫২৩)।

১৫। সনাক্ত সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত (পৃঃ ৫২৩ হইতে পৃঃ ৫২৫)।

স্বর্ণময়ীর বংশ কথা

মামলার প্রমাণে ভাওয়াল রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ গোকুলচন্দ্রের কথা খুব কমই শুনা গিয়াছে। তাঁহার কন্যা স্বর্ণময়ী ছিলেন রাজা কালীনারায়ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী। স্বর্ণময়ী বিবাহিতা হইলেও রাজবাড়ীতেই থাকিতেন। রাজারা শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ। যে সকল কুলীন ঘরজামাই থাকিতে সম্মত হইতেন, তাঁহাদের সহিতই এই বংশের কন্যাদের বিবাহ দেওয়া হইত। স্বর্ণময়ী, তাঁহার দুই কন্যা এবং কন্যাদের সন্তানগণ, কুমারদের জন্মের পর ১৩০০ বা ১৩০৩ সালে অন্য ভবনে গমন করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণময়ীর মৃত্যু হয়। তাঁহার কন্যা কমলকামিনী বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। স্বর্ণময়ীর অপর কন্যা মোক্ষদা মারা গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র ফণীবাবু ও অপর কন্যা শৈবলিনী বিবাদী পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। ফণীবাবু ও শৈবলিনীর জন্ম রাজবাড়ীতে। তাঁহারা ১৩০০ বা ১৩০৩ সাল পর্যান্ত রাজপরিবারভুক্ত ছিলেন। ছোটকুমারের জন্মের ২৬ দিন পর ফণীবাবুর জন্ম হয়।

রাজা কালীনারায়ণ রায়

এক্ষণে আমরা রাজা কালীনারায়ণের কথা উল্লেখ করিব। যে সকল সাক্ষী রাজা কালীনারায়ণকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, রাজা কালীনারায়ণের রং ফর্সা, কেশ লালচে বা পিঙ্গলা এবং চক্ষু কটা রংয়ের ছিল। অশীতিপর বৃদ্ধ-সাক্ষী উমানাথ ঘোষাল বলিয়াছেন, রাজা কালীনারায়ণের চক্ষু ও চুলের রং পিঙ্গলা এবং দেহের রং খুব ফর্সা ছিল। এই জিলায় পিঙ্গলা কথাটী বিশেষ চলিতশব্দ। পিঙ্গলা শব্দের অর্থে বাদামি বা তামাটে বুঝায়। বিবাদী পক্ষের সুবিজ্ঞ কৌঁসুলী এক সময় বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, বর্ত্তমান মামলার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পিঙ্গলা শব্দটী আবিষ্কার করা হইয়াছে; কিন্তু বিবাদী পক্ষের সাক্ষীর ও তাহাদের জবানবন্দীতে এই শব্দ ব্যবহার করায় এই সম্পর্কে সকল বিতর্কের অবসান হয়। রাজা কালীনারায়ণের ফটো দেখিলেই সুস্পষ্ট বোঝা যায়, তাঁহার চেহারা খাঁটী বাঙ্গালী ধরণের এবং তিনি চতুর ও হুঁসিয়ার লোক ছিলেন। রাজা কালীনারায়ণের দেহের ও মাথার চুলের রং ব্যতীত শরীরের এমন এক বৈশিষ্ট্য ছিল যাহার সহিত দ্বিতীয় কুমারের দেহের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। রাজা কালীনারায়ণ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন,

তৎকালে পূর্ব্ব বাঙ্গলার গর্ব্বের বস্তু ঢাকার প্রসিদ্ধ থিয়েটার হলে লর্ড নর্থব্রুক স্বয়ং রাজা কালীনারায়ণকে 'রাজা' সনদ প্রদান করেন। রাজা কালীনারায়ণ ১২৮৫ বঙ্গাব্দে দেহত্যাগ করেন।

কুমারদের পিতামহী রাণী সত্যভামা দেবী

রাজা কালীনারায়ণ দুই পত্নী—জয়মণি ও সত্যভামা, এক পুত্র রাজা রাজেন্দ্র ও এক কন্যা কৃপাময়ীকে রাখিয়া লোকান্তরিত হন। উপরোক্ত দুই বিধবা পত্নী ব্যতীত, ব্রহ্মময়ী নামে রাজার অপর এক পত্নী ছিল, ব্রহ্মময়ীর কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। জয়মণি রাজা কালীনারায়ণের প্রথমা স্ত্রী, সত্যভামা কনিষ্ঠা। এই কারণে রাণী সত্যভামার ছোট্‌ঠাকুরমা নাম, চিঠিপত্রে এবং এই মামলার সাক্ষ্যে বহুবার উল্লেখ রহিয়াছে। রাণী সত্যভামা রাজা রাজেন্দ্রের জননী এবং কুমারদের পিতামহী। বাদী যখন ফিরিয়া আসেন তখন সত্যভামা জীবিতা ছিলেন এবং সাক্ষ্য প্রমাণে প্রকাশ, তিনি বাদীকে চিনিতে পারিয়া ছিলেন এবং ঢাকায় আসিয়া বাদীর সহিত বাস করিতে থাকেন। রাণী সত্যভামা ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর বাদীর বাড়ীতেই দেহত্যাগ করেন।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের দেহত্যাগ

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৪৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইহা হইতে মনে হয়, তিনি যখন উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তির কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন তৎকালে তাঁহার বয়স আনুমানিক ২১ বৎসর ছিল। ইহার পূর্ব্বে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ বিলাসমণি দেবীকে বিবাহ করেন। রাণী বিলাসমণির বয়স তৎকালে ১৪ বৎসর ছিল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী তারিখে রাণী বিলাসমণি পরলোক গমন করেন। বরিশাল জিলার বানরীপাড়া গ্রামে রাণী বিলাসমণি এক দুঃস্থ কুলীন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই ভগ্নী ও দুই ভ্রাতা জীবিত আছেন। দুই ভগ্নী ও এক ভ্রাতা বাদী পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। অপর ভ্রাতা বসন্ত ভট্টাচার্য্য কোর্ট অব ওয়ার্ডসের লাইসেন্সপ্রাপ্ত। তিনি রাজবাড়ীতে বাস করেন। কোন পক্ষই তাঁহাকে সাক্ষী আহ্বান করেন নাই।

ম্যানেজার রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ

রাজা কালীনারায়ণ রায় মৃত্যুর পূর্ব্বে ভাওয়াল এষ্টেটের একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া যান। এই ভদ্রলোক রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন পর্য্যন্ত ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজারী করেন। এই মামলায় অনেকবার

এই ম্যানেজার রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষের নামোল্লেখ হইয়াছে। রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ লেখক হিসাবে তাঁহার মনিব অপেক্ষাও জনসমাজে অধিক পরিচিত।

রাজকুমারদের জন্মকাল

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের সন্তানদের জন্মকাল নিম্নে উল্লেখ করা হইল :—ইন্দুময়ী দেবী—১২৮৫ সালের কার্ত্তিক (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর-নবেম্বর ;) জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—১২৮৭ সালের ভাদ্র (১৮৮০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর) ; কুমার রণেন্দ্র (বড়কুমার)—১২৮৯ সাল, ৪ঠা আশ্বিন, (১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর) ; কুমার রমেন্দ্র (মেজকুমার—১২৯১ সাল ১৪ই শ্রাবণ, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই) ; কুমার রবীন্দ্র (ছোটকুমার—১২৯৩ সাল, ২৯শে শ্রাবণ, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট) ; তড়িন্ময়ী (কনিষ্ঠা কন্যা—১৩০০ সাল, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ)। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের সন্তানদের উপরোক্ত জন্মকাল সম্বন্ধে দুইপক্ষে কোনও মতভেদ দেখা যায় নাই।

ভাওয়ালে জয়দেবপুর রাজবাড়ী

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ঢাকা হইতে বিশ মাইল দূরে জয়দেবপুর গ্রামে রাজবাড়ীতে বাস করিতেন। জয়দেবপুরস্থ ভাওয়াল রাজবাড়ীতে যেখানে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের পুত্রকন্যা আবাল্য বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, তথাকার বিবরণ উল্লেখ করার সার্থকতা আছে। কারণ তাহা হইতে কিরূপ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহারা দিনযাপন করিতেন, তাঁহারা কিরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতিশক্তি কি রকম ছিল, তাঁহারা কি কি জানিতেন, কোন কোন বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, এ সম্বন্ধে ধারণা জন্মিলে, বাদী 'প্রতারক' তাহা সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া, কি আসল কুমারকে পরাভূত করিবার সঙ্কল্প লইয়া বাদীকে জেরা করা হইয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা অনেকটা সহজ হইবে।

ঢাকার বিশ মাইল দূরে জয়দেবপুর একটি প্রকাণ্ড গ্রাম। ঢাকা হইতে ট্রেণযোগে এক ঘণ্টার পথ। রেল লাইন জয়দেবপুর গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ভাওয়াল রাজবাড়ী রেল লাইনের পূর্ব্ব পার্শ্বে কিঞ্চিদধিক সিকি মাইল দূরে অবস্থিত। রেল ষ্টেশন রাজবাড়ী হইতে হাঁটাপথে প্রায় ১ মাইল হইবে। এই মামলা সংশ্লিষ্ট কোন কোন ঘটনা বুঝিবার পক্ষে জয়দেবপুর গ্রামের ভূসংস্থানের বর্ণনা একান্ত আবশ্যক। ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া খানিক উত্তর মুখে গেলে গ্রামের প্রধান রাস্তা বা রাজবাড়ী রোড পাওয়া যায়। এই রাস্তা পূর্ব্ব ও

পশ্চিমে লম্বিত। এই রাস্তা ধরিয়া পূর্ব্বদিকে সিকি মাইলের একটু অধিক অগ্রসর হইলে বাম পার্শ্বে রাজবাড়ী পাওয়া যায়। রাজবাড়ীর পূর্ব্বদিক দিয়া এক রাস্তা উত্তরমুখে যাইয়া পূর্ব্বদিকে মোড় ঘুরিয়াছে। খানিক উত্তরপূর্ব্বে যাইয়া এই রাস্তা অপর এক রাস্তার সহিত মিলিয়াছে। এই সম্মিলিত রাস্তা শ্মশানবাড়ী বা চিলাই নদীর তীরস্থ ভাওয়াল রাজ পরিবারের শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। যেস্থানে উপরোক্ত দুইটা রাস্তা মিশিয়াছে, তথায় স্বর্ণময়ীর বাসস্থান 'নয়াবাড়ী' অবস্থিত। এই বাড়ীতে স্বর্ণময়ীর দৌহিত্র ফণিভূষণ ব্যানার্জ্জি ও তাঁহার ভাগিনেয়দের বাস।

'নয়াবাড়ী' রাজবাড়ী হইতে অর্দ্ধ মাইলের কিছু বেশী ও শ্মশানবাড়ী হইতে প্রায় এক শত বিশ গজ দূরে, উত্তরে রাজবাড়ী হইতে পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত চিলাই নদীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম অংশ পোয়া মাইল দূর এবং এইখানে কালাই সরদারের ঘাট রহিয়াছে। চিলাই নদীর সর্ব্বোচ্চ বিস্তার অনধিক ৫০ গজ মাত্র, বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় নৌকা চলে না। অন্যান্য ঋতুতে হাতে ঠেলিয়া বা দড়ি টানিয়া নৌকা চালাইতে হয়।

জয়দেবপুর রাজবাড়ীর দৃশ্য

প্রাঙ্গণসহ ভাওয়াল রাজবাড়ীর বিস্তার—দৈর্ঘ্যে ২২ গজ চেনের মাপে সাড়ে তের চেন ও প্রস্থে পাঁচ চেন, রাজ বাড়ীর মাঝখানের বিস্তার একটু বেশী। রাজার সময়ে ভাওয়াল রাজবাড়ীতে দশটী 'মহল' ছিল প্রত্যেক মহল আড়ম্বর বর্জ্জিত বহু কক্ষ সমন্বিত দ্বিতল অট্টালিকা ছিল। গেটের সম্মুখে সদর মহল বা বড় দালান। গেট ও বড় দালানের মধ্যে তৃণাচ্ছাদিত ডিম্বাকৃতি প্রাঙ্গণ ঘিরিয়া গাড়ীর রাস্তা দেউড়ীতে যাইয়া মিশিয়াছে রাজ পরিজন বড় দালানে থাকিতেন না, বাদীর জেরা সম্পর্কে পুনরায় এই বড় দালানের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন হইবে। সাধারণতঃ রাজার জঙ্গলে শিকারের সখ লইয়া যে সকল শ্বেতাঙ্গ অতিথি রাজবাড়ীতে আসিতেন তাঁহারা বড় দালানে থাকিতেন। রাজার মৃত্যুর পর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মায়ার সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত হইবার পর ইহা ম্যানেজারের কোয়ার্টার্স রূপে পরিগণিত হইতে থাকে।

বড় দালানের পিছনের আঙ্গিনায় কাঠের পাটাতনে টিনে ছাওয়া মস্ত নাট-মন্দির। নাট মন্দিরে বাইনাচ, থিয়েটার, যাত্রা বা কবি গান হইত। নাট মন্দিরের উভয় পার্শ্বে চৌতালা বাড়ী। উভয় তলায় অনেকগুলি ঘর এই সকল ঘর সংলগ্ন অলিন্দে বসিয়া মহিলারা নাটমন্দিরের গান শুনিতেন ও আমোদ উৎসব দেখিতেন।

নাটমন্দিরের উত্তরে আর একটি দোতালা দালান ছিল। ঐ দালানের নীচে যে তিনটি ঘর ছিল তাহার একটি ঠাকুর ঘর সেখানে প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হইত। সেই উপলক্ষে গান হইত, আর একটা উপলক্ষ ছিল পুণ্যাহ—জমিদারী বৎসরারম্ভ ও নূতন খাতা আরম্ভ। এই উপলক্ষে ছোট বড় প্রজারা আসিয়া মিলিত হইত, টাকাপয়সাদি দিত এবং গান শুনিত। অন্য দুইটি ঘরের একটিতে ছিল সাজঘর এবং আর একটি পূজার ভাঁড়ার ঘর; উপরতলায় রাজার বসিবার ঘর ছিল। এবং আরও কয়েকটি ঘর ছিল।

এই দালানের পিছনে ছিল অন্দরমহল। ঐ সকল লইয়া একটি ব্লক ছিল, উহা এখন 'পুরাণ বাড়ী' বলিয়া পরিচিত উহা এখনও আছে। উহার পশ্চিমে আর একটি ব্লক ছিল। উহাকে পশ্চিম খণ্ড বলা হইত, উহাতে রাজা কালীনারায়ণ রায়ের ভগিনী কৃপাময়ী দেবী বাস করিতেন। স্বর্ণময়ীর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

রাজবাড়ীর পিছনদিকে একটা বাগান ছিল। উহা এখনও আছে। পূর্ব্বদিকে একটা রাস্তা নদী অভিমুখে গিয়াছে। পশ্চিমে একটি সুন্দর দীঘি। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ½ মাইল এবং প্রস্থে ৬৬ গজ। উহা রাজবাড়ীর দৈর্ঘ্য ছাড়াইয়া আরও কিছুদূর গিয়াছে। উত্তরদিকে বাগানের দিকের দরজা খুলিয়া মেয়েরা দীঘিতে যাইতে পারিতেন। উহার পূর্ব্বতীরে বাড়ীর মধ্যে বড় দালানের প্রায় ত্রিশ গজ উত্তর পশ্চিমে মাধববাড়ী। (গৃহ দেবতাদের গৃহ) অবস্থিত। মাধববাড়ী দক্ষিণ দরজা গৃহ, উহাতে একটি দেওয়াল ঘেরা ছোটউঠান আছে। উঠানের দক্ষিণদিকে একটি দরজা আছে। মাধববাড়ীর প্রধান মূর্ত্তি মাধব। উহা প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি। অন্য একটি মূর্ত্তির নাম জয়দুর্গা ; উহা কোন ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি—জানা যায় না। আরও একটা মূর্ত্তি আছে, তাহা তারা মূর্ত্তি ; ঐ মূর্ত্তির গৃহ মাধববাড়ীর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। উহাকে মাধববাড়ীর অংশই বলা যাইতে পারে। কিন্তু উহার পৃথক উঠান আছে, দীঘির পূর্ব্বতীরে যে রাস্তা আছে সেই দিকে ঐ উঠান খোলা। পরে যে বিস্ময়কর ব্যাপার বিবৃত হইবে তাহার কতকটা এই মাধববাড়ীতে হইয়াছিল, মাধব বাড়ীর পিছনে একটি খোলা প্রাঙ্গণ আছে। উহার অন্যদিকে ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের পরে 'রাজবিলাস' (একটি আধুনিক ধরণের বাড়ী) নির্ম্মিত হইয়াছিল রাজা যখন মারা যান তখন বাড়ী নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল বা কেবলমাত্র শেষ হইয়াছিল রাজার মৃত্যুর পর পরিবারস্থ লোকেরা রাজবিলাসে বাস

করিতেন এতৎসম্পর্কে কতকগুলি বিষয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু এখন সে সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন নাই।

রাজা যে বাড়ীতে বাস করিতেন এবং যে বাড়ীতে তাঁহার সন্তানেরা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে আরও বহু বিভাগ ছিল ভৃত্য ও কর্ম্মচারীর অন্তই ছিল না রাজবাড়ীর মধ্যে নাটমন্দিরের পশ্চিম দিকে একটি ঘরে একটি পারিবারিক ডিস্পেন্সারী ছিল, উহাতে একজন ডাক্তার থাকিতেন। রাজবাড়ীর মধ্যে খাজাঞ্চিখানা বা ধনাগারও ছিল রাজবাড়ীর পূর্ব্বের একটি ঘরে ফরাসখানা ছিল। অন্দরের অবস্থিত রন্ধনগৃহ ছাড়া, বড় দালানের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটি বাবুর্চ্চিখানা ছিল ও রাজার জীবিতকালে অন্ততঃ ধনঞ্জয় নামক একজন হিন্দু বাবুর্চ্চি ছিল এইরূপ বলা হইয়াছে যে, প্রত্যোগত ইউরোপীয় অথবা সাহেবীভাবাপন্ন অতিথিদের জন্য উহাকে রাখা হইয়াছিল। প্রথম বাহির বাড়ীতে এবং পরে পুরাণ বাড়ীর ছাদে একটি ষ্টুডিও ছিল। নাটমন্দিরে নাট্যাভিনয়ের জন্য একটি রঙ্গমঞ্চ ছিল।

রাজবাড়ীর বাহিরে—তোরণ দিয়া বাহির হইয়া আসিলেই সম্মুখে একটি ময়দান পড়ে। স্থানীয় ভাষায় উহাকে 'চটান' বলা হয়। উহা রাজার সময় একটি জঙ্গলা ও অসম ফাঁকা জায়গা ছিল। পরে পলো খেলার জন্য পরিষ্কার করা ও সমতল করা হয়। উহার উত্তর দিকে রাজবাড়ীর রাস্তা। উহার পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকেও রাস্তা। বাদী জয়দেবপুর যাওয়ার পরে ১৯২১ সালের ১৫ই মে যে বিরাট সভা হয়, (বিবাদী পক্ষ উহাকে বহুলোক সমাগম বলিয়াছিলেন), তারা এই ময়দানেই হইয়াছিল।

রাজবাড়ীর সঙ্গে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি ছিল :—

ঠিক রাজবাড়ীর উত্তরে রাস্তার পরে চীফ অথবা ম্যানেজারের অফিস; পশ্চিমদিকে দীঘির দক্ষিণে দেওয়ানখানা। উহার দরজা রাজবাড়ীর রাস্তার দিকে ছিল। পরে ১৯০৫ সালে উহা মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। ঐ মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়টিকে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয় এবং উহার নামকরণ করা হয় "রাণী বিলাসমণি স্কুল"। উহার দক্ষিণে অপর দিকে স্কুল-বোর্ডিং। উহাতে একটি বাঁধা পুষ্করিণী ছিল। উহার দক্ষিণস্থ একটি যায়গায় যে আস্তাবলগুলি ছিল এবং রাজার মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় কুমার চটানের দক্ষিণে যে আস্তাবল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে ৪০টি ঘোড়া থাকিত এবং সব রকমের গাড়ী থাকিত তন্মধ্যে একটি রৌপ্যমণ্ডিত গাড়ীও ছিল। চটানের পূর্ব্বের রাস্তার একটি স্থানে জয়দেবপুর ডিহি অফিস, দীঘির পশ্চিম পাড়ে খাস অফিস। রাজার সময়কার ম্যানেজার রায় বাহাদুর

কালীপ্রসন্ন ঘোষের বাসভবন ঐখানে ছিল। রেল ষ্টেশনের নিকটে দাতব্য-চিকিৎসালয়। হাটের দক্ষিণে রেল লাইনের অন্য পার্শ্বে অতিথিশালা, হাটটিও রাজার সম্পত্তি। সোমবার ও শুক্রবার হাট বসে। সাধারণতঃ যেরূপ থাকে ঐখানেও সেইরূপ দোকান, হোটেল, আবগারী দোকান ও থানা ছিল। পরিবারস্থ শব দাহ করিবার স্থান 'শ্মশান বাড়ী'তে রাজরাজেশ্বরী দেবী মূর্ত্তি 'বুড়া বুড়ী' নামে পরিচিত। এক জোড়া গাছের নিকট রাজবাড়ীর উপরেই জল সরবরাহের কারখানা। সেখানে দীঘি হইতে জল পাম্প করিয়া পুরাণ বাড়ীর ছাদের উপর অবস্থিত সাতটি ট্যাঙ্ক ভর্ত্তি করা হইত। রাজার মৃত্যুর পূর্ব্বে পিলখানা, রাজবাড়ী হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী বোরদহতে অবস্থিত ছিল। পরে চটানের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটা স্থানে পিলখানা করা হয়। পিলখানার নিকটে মাহুতদের জন্য চালা ঘর ছিল। পিলখানাটি ছিল একটি খোলা ইটবাঁধা জায়গা। ১৯০৪ সালে সেখানে ২০টি হাতী ছিল। ১৯০৯ সালে যখন দ্বিতীয় কুমার দার্জ্জিলিংয়ে ছিলেন, তখন সেখানে ছিল প্রায় ১৬টি হাতী। প্রত্যেকটি হাতীরই নাম ছিল এবং প্রত্যেকটিরই একজন করিয়া মাহুত, একজন মেট এবং দুইজন ঘেসেল ছিল। রেল ষ্টেশনের দক্ষিণ-পূর্ব্বে মিঃ ট্র্যান্সবেরী নামক এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটী চা-বাগান (রাজার সম্পত্তি) ছিল এবং প্রায় ১ মাইল দূরে একটি বাগান ছিল। পরিবারের বাসস্থানের সঙ্গে যে বিভাগ ও গৃহাদি ছিল তন্মধ্যে এইগুলিই প্রধান। এপর্য্যন্ত যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহা সেই সমস্ত সাক্ষ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে, যাহা খণ্ডন করিবার কিছুই নাই। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বাদীকে দিয়া সমস্ত সম্বন্ধেই প্রমাণ উপস্থিত করাইয়াছেন। যখন বিবরণ সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হয় কেবলমাত্র তাহার পরেই রাজবাড়ীর দালানগুলির একটি নক্সা তাঁহারা দাখিল করেন এবং ৯৭৭নং সাক্ষীকে দিয়া কতকগুলি ঘরের পারস্পরিক অবস্থান বলান। সাক্ষী যাহা স্বীকার করিয়াছে, তাহা ছাড়া উপর তলা ও নীচের তলার নক্সা প্রমাণিত হয় নাই। এই নক্সাগুলি স্বাক্ষরশূন্য, উহাতে কোন তারিখ নাই। কে উহা করিয়াছে তাহাও কেহ জানে না। পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তনগুলি উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া স্পষ্টতঃ অল্পদিন পূর্ব্বে করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

জয়দেবপুরের রাজকর্ম্মচারীবর্গ

যে সমস্ত বিভাগের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে মফঃস্বলের কর্ম্মচারীর সংখ্যা গণনার মধ্যে না আনিয়াও কেবল জয়দেবপুরের কর্ম্মচারীর সংখ্যার একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। জয়দেবপুরে বহুসংখ্যক কেরাণী, ভৃত্য, রক্ষী, আরদালী,

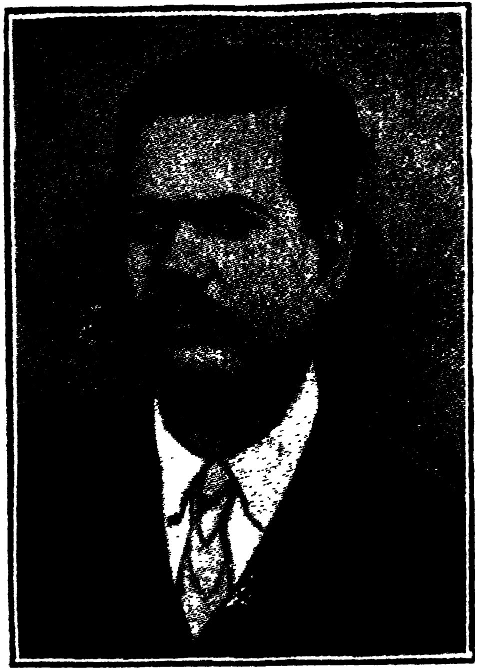

ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রসিদ্ধ নেতা—আশু ডাক্তার

সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার—মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জ্জি

Aparajita Press

দারোয়ান, মালী, পাচক, অতিথিশালার কর্ম্মচারী, বড়দালানের কর্ম্মচারী, ডিস্পেন্সারীর ফরাসখানা ও অফিসসমূহের কর্ম্মচারী, গানবাজনার ওস্তাদ (রাজা সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন), পালোয়ান, সহিস, মাহুত, পূজারী, শিক্ষক, ডাক্তার ও অন্যান্য বহু বিষয় যাহার সমস্ত উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে, তৎসম্পর্কিত লোকজন ছিল। মফঃস্বলে ৪৪টি ডিহি ছিল। প্রত্যেক ডিহিতে একজন নায়েব, একজন কেরাণী, কখন কখনও একজন ঠিকা কেরাণী এবং একজন বা দুইজন পিয়ন। কুমারকে যাহারা জানে এরূপ অসংখ্য লোক এখনও নিশ্চয়ই জীবিত আছে। আমি নিম্নে দেখাইব যে, সেই সকল ব্যক্তিদের মধ্য হইতে সাক্ষী সংগ্রহ করা হইয়াছে। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে সংখ্যা যদি সীমাবদ্ধ করিয়া না দেওয়া হইত তাহাহইলে ঐরূপ আরও সাক্ষী উপস্থিত হইতে পারিত তাহারা সত্য কথা বলিয়াছে কি না সে অন্য কথা। কিন্তু বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলী সমস্ত মামলা শুনিয়াও প্রজা সাক্ষীদের জেরার সময়ও কখনও ইঙ্গিত করেন নাই যে, কুমার দুর্লভদর্শন বা অনধিগম্য অভিজাত ব্যক্তি ছিলেন এবং প্রজারা কদাচিৎ তাঁহাকে দেখিয়াছে। যখন সনাক্ত করণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণাদির আলোচনা করিব তখন এই ইঙ্গিত সম্বন্ধে আমি পুনরায় উল্লেখ কবিব।

ঢাকা নলগোলার বাড়ী

এই পরিবারের ঢাকা নলগোলা নামক স্থানে বুড়ীগঙ্গার উত্তরে একটি বাড়ী আছে। রাজা এবং তাঁহার মৃত্যুর পর কুমারেরা যখন সহরে আসিতেন তখন ঐ বাড়ীতে থাকিতেন। সহরে তাঁহারা প্রায়ই আসিতেন। ঐ বাড়ীর রোখ উত্তরদিকে, নদী উহার পিছনে। ঐ বাড়ীর প্রায় বিপরীত দিকে একটি আস্তাবল ও 'মোক্তার অফিস' নামক একটি অফিস অবস্থিত ঐ মোক্তার অফিস ঐ পরিবারের আইন অফিস। নদীতে একটি বজরা ও 'মোতিয়া' নামক একটি ষ্টিমলঞ্চ থাকিত। সাক্ষ্যে এই বাড়ীর বহু উল্লেখ আছে।

কুমারদের পিতার আকৃতি বর্ণনা

কুমারেরা যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে বাড়ী সম্বন্ধে এই খানেই বিবত থাকা যাক। এখন তাঁহাদের পিতার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার এবং ১৯০৯ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঘটনাগুলি বিবৃত করা দরকার।

নথিতে ৫৪নং ও ৩৯নং একজিবিট রাজার দুইখানা ফটোগ্রাফ। তিনি ফর্সা ছিলেন। একটু ময়লা বা যাহাকে শ্যামবর্ণ বলে তাহাই ছিলেন। (বাদীপক্ষের ৩৮৮, ৫১৪, ৪৯৭, ৮৪নং সাক্ষী)। মনে হয় তাঁহার বড় ছেলে, বড়কুমার'এর চেয়েও তাঁহার রং ময়লা ছিল।

তাঁহার দাড়ি ছিল এবং গম্ভীর রাশভারী চেহারা ছিল। তাঁহার ছেলে দ্বিতীয়কুমার তাঁহার মত 'কান' পাইয়াছিলেন বলিয়া বলা হইয়াছে। যখন কুমারের দেহের বিষয়ে আসিব তখন আমি এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিব। কিন্তু ইহা বলা যথেষ্ট নহে যে, এই বৈশিষ্ট্যটুকু ও আর একটি চিহ্ন ছাড়া অন্য কোন সাদৃশ্যের কথার কেহ ইঙ্গিত করে নাই। যাহাকে শিক্ষিত ব্যক্তি বলা যায়, রাজা তাহা ছিলেন না। যদিও একজন সাক্ষী তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে এরূপ বলিয়াছে; কিন্তু তিনি ইউরোপীয়দের সহিত দেখাশুনা করিতে ও মিশিতে পারিতেন। তাঁহার কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু খুব শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহার শিক্ষা সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে মেলামেশা করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।" তাঁহার কতকগুলি চিঠি দেখিয়া বুঝা যায় যে, তিনি নিশ্চয়ই ইংরাজী লিখিতে পারিতেন কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল হইবে যে, তিনি সাহেবী ধরণের লোক ছিলেন অথবা সাহেবদের বাড়ীর মত তাঁহার বাড়ী ছিল অথবা তাঁহার জীবন যাপন প্রণালী সাহেবদের মত ছিল একটি ফটোতে তাঁহার খালি গা, তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন। মধ্যে মাঝে যদিও তিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করিয়াও থাকেন, তথাপি তিনি বাঙ্গালী ছিলেন এবং বাঙ্গালীর মত জীবন যাপন করিয়াছেন। আমি তাঁহার বাড়ীর বর্ণনা দিয়াছি। বড় দালান নিশ্চয়ই ইউরোপীয় ধরণে সজ্জিত করা হইয়াছে; কিন্তু বাড়ীর অন্যান্য অংশে কোন প্রকারের ইউরোপীয় ধরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজবাড়ীর আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্ত 'কাপ বোর্ড", 'সাইড বোর্ড' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ সম্বন্ধে বাদীর অজ্ঞতাতে এই প্রশ্নের সৃষ্টি হইয়াছে যে, উক্ত বাড়ীর লোকদের অথবা কুমারদের আসবাবপত্রের ইংরেজী নাম জানা ছিল কি না ঐ প্রশ্ন সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হইবে কিন্তু ইহা বলাই যথেষ্ট যে, রাজবাড়ীতে কি কি আসবাবপত্র ছিল সে সম্বন্ধে পক্ষদ্বয়ের কথায় কোন গুরুতর পার্থক্য নাই। একজন মোটামুটি সঙ্গতিপন্ন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, যিনি ২০টি হাতী তো দূরের কথা একটি গাড়ীও রাখিতে পারেন না, তাঁহার বাড়ীতে যে সব আসবাবপত্র দেখা যায়, তদপেক্ষা বেশী কিছু সেখানে ছিল না।

মহিলাদের কথা

মহিলারা অন্দরেই থাকিতেন, তাঁহারা পর্দ্দানশীন বা অসূর্য্যম্পশ্যা ছিলেন। রেল ষ্টেশনে গেলে তাঁহাদের পর্দ্দার আড়ালে রাখা হইত, ষ্টীমারে যাইতে হইলে তাঁহাদিগকে পাল্কীতে ঘাটে পৌঁছাইয়া দিতে হইত; এমন কি

দার্জ্জিলিংয়ের মত স্থানে যেখানে পর্দ্দাপ্রথার হাঙ্গামা নাই, তথায়ও মেজরাণী বড় বেশী বাহির হইতেন না। একান্ত বাড়ীর বাহির হইলেও তাহা রাত্রিতে এবং রিক্সাযোগে ছাড়া নহে। একখানি ফটোগ্রাফে ছোটকুমারকে এবং আর একখানিতে বড়কুমারকে খালি গায়ে দেখা যায়। বাড়ীব মেয়েদের বার বৎসর পার না হইতেই বিবাহ দেওয়া হইত এবং তাহাও ভাল কুলীনের সঙ্গে। ছেলেরা গুরুমশায়ের নিকট ফরাসে বসিয়া শিক্ষালাভ করিত; তাহাদের টেবিলের কাজ চলিত একটা বাক্সদ্বারা এবং তাহারা পাতায় লিখিতে শিখিত (বাদী পক্ষের সাক্ষী বিল্লু, ৯৩৮ নং ; এই পরিবারের চালচলন সাধারণ হিন্দু ভদ্রলোকদের মতই ছিল। বৃদ্ধ দেওয়ান রসিক রায়, ইন্দুময়ী দেবীর পুত্র বিল্লু, জ্যোতীর্ম্ময়ী দেবী, এমন কি মেজরাণী নিজে এবং উভয় পক্ষের যে সমস্ত সাক্ষী ঐ পরিবারের বিবরণ দিয়াছেন তাঁহাদের কথা হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। এই পরিবারের বিলাতী হালচাল ছিল, এইরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। তাঁহাদের বাবুর্চ্চি ছিল; সাহেবদের সঙ্গে দেখা করিবার সময় বা কোন উৎসবে রাজাবাহাদুর নিজে ও তাঁহার মৃত্যুর পরে কুমারেরা বিলাতী পোষাক পরিতেন; কখনও কখনও শিকারের পোষাক পরিয়া তাঁহারা শিকারে বাহির হইতেন; কিম্বা রাজাবাহাদুর একবার কলিকাতায় গিয়া বিলাতী হোটেলে অবস্থান করিয়াছিলেন—এই সমস্ত ধরিয়া লইলেও ঐরূপ ধারণা করা ঠিক হইবে না।

স্বর্ণময়ী দেবীর দৌহিত্র ফণীবাবু (বিবাদী পক্ষের ৯২নং সাক্ষী) ১৮৯৩ সাল হইতে ১৮৯৫ সাল পর্যান্ত রাজবাড়ীতেই ছিলেন এবং তাঁহার কথায় জানা যায় যে, কুমারের জীবদ্দশায় এই পরিবারের সহিত তাঁহার মেলামেশাও ছিল। তিনি সাক্ষ্যে বলিয়াছেন, রাজাবাহাদুর ইউরোপীয় পোষাকে থাকিতেন, ও কদাচিৎ বাঙ্গালী পোযাক পরিতেন, তাঁহার হাবভাব চালচলন সবই বিলাতী কায়দার ছিল। বাদীকে যেরূপভাবে জয়ী করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল, এই সাক্ষীর উদ্দেশ্য ছিল তাহার জন্য মালমশলা যোগান দেওয়া। ফণীবাবুর মত কোন সাক্ষীকেই এত নাকাল হইতে হয় নাই এবং তাঁহার সাক্ষ্য মোটেই নির্ভরযোগ্য নহে। এই রায়ে যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে তাহা হইতে এবং শুনানীর সময় বিবৃত নানা ঘটনার মধ্য দিয়া তাঁহার জবানবন্দী যে সত্য নহে তাহা বুঝা যাইবে।

রাজা বাহাদুরের চরিত্রের দুইটি লক্ষণের কথা জানা যায়; এই লক্ষণ দুইটি মেজকুমারকে চিনিয়া লইতে সাহায্য করিবে। রাজা বাহাদুর খুব ভাল শিকারী ছিলেন এবং তিনি গান বাজনা ভালবাসিতেন। তিনি গান

গাহিতে পারিতেন না, তবে ভাল তবলা বাজাইতে পারিতেন। অল্প অল্প সেতার ও ক্লারিওনেট রাজাইতে পারিতেন; অনেক ওস্তাদ বেতন দিয়া রাখিতেন। ইন্দ্রমোহন সেতারী, বিলু ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সাক্ষ্য হইতে এই সমস্ত কথা জানা যায়। রাজা বাহাদুর উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের ছিলেন; ফলে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ এই:—

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও ইন্দুময়ী দেবীর ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ২৫শে কি ২৬শে ফাল্গুন (১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৮ই কি ৯ই মার্চ্চ) বিবাহ হয়। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বয়স তখন নয় বৎসরের একটু বেশী ছিল; ইন্দুময়ী তাঁহার দুই বৎসরের বড় ছিলেন। এই জিলার রোয়াইল গ্রামের কুলীন ব্রাহ্মণ জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের সহিত (তখনও তাহার ছাত্রাবস্থা) জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বিবাহ হয় ইন্দুময়ী দেবীর বিবাহ হয় গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত। এই দুইজনে কেহই স্বামীর ঘর করিতে যান নাই। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৩১শে শ্রাবণ জ্যোতির্ম্ময়ী বিধবা হন। এই মামলায় তাঁহার কথাই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বিবাদী পক্ষ হইতেও বলা হইয়াছে যে, তাহার সমর্থন পাইয়াই বাদী এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছে।

জয়দেবপুরে দ্বিতীয়বার গমনের পর হইতে বাদী ইহার গৃহেই বাস করিয়াছে। বাদী জয়দেবপুরে ইহার আশ্রয়ে ৩৭ দিন এবং পরে ঢাকায় (কলিকাতায় অবস্থান সময় বাদ দিয়া) এক বাড়ীতেই বাস করিয়াছেন। বিবাদী পক্ষের যুক্তি এই যে, এই মহিলাই পিছনে থাকিয়া মামলা চালাইতেছেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এক পুত্র জলদ ওরফে বুদ্ধুবাবু এবং দুই কন্যা প্রমোদবালা (মণি) ও বিভুবালাকে (হেনী) লইয়া বিধবা হন। ১৯৩৩সালে মামলার বিচার আরম্ভের পূর্ব্বেই বুদ্ধুর মৃত্যু হয়।

১৮৯০ সালের ৮ই কি ৯ই মার্চ্চ রাজা বাহাদুরের দুই কন্যার বিবাহ এবং তৎপরে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর স্বামীর মৃত্যু—এই ঘটনাদ্বয়ের পরেই ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে (১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারী কি মার্চ্চ) বড় কুমারের বিবাহের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সরযূবালা দেবীর সহিত বড় কুমারের বিবাহ হয়, ইহার পিত্রালয় কলিকাতায়। তিনি এই মামলার ২নং বিবাদিনী। বিবাহের সময় বড় কুমারের বয়স ছিল কিঞ্চিদধিক আঠার এবং সরযূবালা দেবীর বয়স ছিল প্রায় বার। সরযূবালা দেবীর পিতা সুরেন্দ্রলাল মল্লিক কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট ছিলেন; সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, তাঁহার কিছু সম্পত্তিও ছিল। কিন্তু জয়দেবপুর

রাজবাটীতে এই বিবাহ হয়, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজকে রাজা বাহাদুরের সমমর্য্যাদাসম্পন্ন মনে করিতেন না। সমান মর্য্যদাসম্পন্ন লোকদের মধ্যে বর ক'নের বাড়ীতে বিবাহ করিতে যায়, ক'নে বরের বাড়ীতে যায় না (বিবাদী পক্ষের ১২০নং সাক্ষী শরদিন্দুবাবুর সাক্ষ্যে)।

এই বিবাহের পূর্ব্বে ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের পর 'রাজবিলাসে'র নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল উহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, এমন সময় রাজা পীড়িত হইয়া ঢাকা যান এবং তথায় নলগোলা রাজবাড়ীতে ১৯০১ সালের ২৬শে এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয় তাঁহার শব স্পেশ্যাল ট্রেণে জয়দেবপুরে লইয়া গিয়া চিলাই নদীর তীরে শ্মশানবাড়ীতে দাহ করা হয়।

রাজার মৃত্যুর পর রাণী বিলাসমণি পুত্রগণের অছিস্বরূপ জমিদারী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তখন বড়কুমারের বয়স ১৮ বৎসর ৭ মাস ৭ দিন, মেজকুমারের বয়স ১৬ বৎসর ৮ মাস ২১ দিন এবং ছোট কুমারের বয়স ১৪ বৎসর ৮ মাস ১৪ দিন ছিল। অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই তখন প্রায় বালক ছিলেন। ১৯১০ সালে ২৮ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে বড়কুমার মারা যান। এই মামলা সম্পর্কে যে সকল বিষয়ের বিচার করিতে হইবে তাহাতে কুমারদের বয়সের কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র "বড়কুমার", সুতরাং কর্ত্তা ছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়াই তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর ছিল না!

রাজার মৃত্যুর পূর্ব্বে কুমারদের দুইজন গৃহ শিক্ষক ছিল, কুমারদিগকে শিক্ষা দানই তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। কুমারেরা যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা বাড়ীতেই লাভ করিয়াছিলেন; তবে মধ্যে এক বৎসরের কম সময় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে গিয়াছিলেন; কিন্তু এই বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত নহে, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, গৃহ শিক্ষকের নিকট কুমারেরা যে শিক্ষা পাইতেছিলেন তাহা রাজার মৃত্যুর পরে অথবা বড়কুমারের বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়াছিল, যদিও বাদী পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণের সময় অন্যরূপ প্রমাণের যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল বিবাদী পক্ষের ৯২নং সাক্ষী ফণীবাবুও এই কথা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং বাদী পক্ষের সাক্ষী কুমারদের ভাগিনেয় বিল্লুর সাক্ষ্য বিচার করিলে দেখা দেখা যায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কুমারের সম্বন্ধে উভয় পক্ষই এই কথা মানিয়া লইয়াছে। অবশ্য বিল্লু বলিয়াছেন, বড়কুমার ১৩০৭ সালের কিছু পূর্ব্ব হইতে আর গৃহশিক্ষকদের নিকট পড়িতেন না।

গৃহশিক্ষকদের নাম দ্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায় ও অনুকূলবাবু কুমারদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদের চেষ্টার ফলাফল বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বাদী বলেন, তিনি এবং তৃতীয় কুমার ইংরাজী ও বাঙ্গালা

বর্ণমালা এবং সামান্য বানান ছাড়া আর কিছুই শিখেন নাই এবং সেই বিদ্যার মধ্যেও শেষ পর্যান্ত একমাত্র নিজ নাম স্বাক্ষর করা ছাড়া আর সবই তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বাদী সম্পর্কে বলা যায় যে, শুনানীর সময়ও দেখা গিয়াছে, তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিতে যেসব ইংরেজী অক্ষর লাগে, অবশ্য তিনি কুমার হইলে,—একমাত্র 'N' ছাড়া আর কোন অক্ষর তাঁহার মনে নাই; কিন্তু এবিষয়েও মতদ্বৈধ আছে। Sunday

কমিশনে যখন মিঃ এস ঘোষাল ব্যারিষ্টারের সাক্ষ্য লওয়া হয় তখন তিনি বাদীর সহিত কুমারের সাদৃশ্য সম্পর্কে শপথ করেন। সেই সময় সুবিজ্ঞ কৌসুলী বিবাদী পক্ষের বক্তব্য উপস্থিত করিয়াছিলেন। মিঃ ঘোষাল তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, গত ১৯০৪ ও ১৯০৫ সালে কলিকাতায় কুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় তিনি কুমারের কথাবার্ত্তায় ও আচারব্যবহারে কুমারকে তাঁহার নিজের মতই একজন বলিয়া দেখিতে পান। মিঃ চৌধুরী কথাটা ঠিক এইরূপভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন:— "আপনি তাঁহাকে একজন সুশিক্ষিত ও সুমার্জ্জিত বাঙ্গালী যুবক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন কি?" মামলার শুনানী চলিবার সময় ক্রমে ক্রমে এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি গাঢ়ো করা হইয়াছিল। কুমারের বর্ণজ্ঞান সম্পর্কে আমি যখন আলোচনা করিব, তখন ইহা দেখা যাইবে। বর্ণজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়টি অতি প্রয়োজনীয় তাই বর্ত্তমান কাহিনীর মধ্যস্থলে তাহার আলোচনা না করিয়া পৃথকভাবে এক স্থলে এই বিষয়টির আলোচনা করাই আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তবে বিবাদী পক্ষ আগাগোড়াই ইহা বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় কুমার ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষা লিখিতে ও বলিতে পারিতেন এবং তিনি ইংরাজী ভাষায় কথাবার্ত্তাও চালাইতেন যদি কুমার তাহা করিতে পারিতেন এবং যদি তাঁহার বর্ণজ্ঞান এতটা অগ্রসর হইয়া থাকিত যে, সেই অবস্থা হইতে আর তাঁহার নিরক্ষর হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহা হইলে এই মামলার বাদী কুমার হইতে পারেন না, পক্ষান্তরে যদি তিনি ইংরাজী না জানিতেন এবং ইংরাজী না জানা সত্ত্বেও জেরার সময়ে কোন কোন ইংরাজী শব্দ শিখিয়া লইতে পারেন বলিয়া অনুমান করা না যাইত, তাহা হইলে তিনিই স্বয়ংই কুমার বলিয়া ধরিলে তিনি নিশ্চয়ই জেরায় সমস্ত প্রশ্ন এড়াইয়া যাইতেন।

এস্থলে এটুকুই বলা যথেষ্ট যে, যেটুকু শিক্ষা কুমারেরা পাইতেছিলেন তাহাও ১৩০৭ বঙ্গাব্দের পূর্ব্বে তাঁহাদের পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত অপর শিক্ষক মিঃ হোয়ারটন যদি কুমারদের জন্য কিছুই করিয়া থাকিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের

পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের শিক্ষা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বলিতে পারা যায় এই ঘটনার পর বহু ব্যাপারই ঘটিতে লাগিল। ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কিছু পূর্ব্বে কুমারগণকে কথ্য ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য মিঃ হোয়ারটন নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়। তাহার পর সেপ্টেম্বর মাসে কিম্বা তাহার কাছাকাছি সময়ে রাণী বিলাসমণি তাঁহাদের ম্যানেজার রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বরখাস্ত করেন, ইনি রাজা কালীনারায়ণের সময় হইতে ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁহাকে ডিসমিস করার যে তারিখ আমি দিয়াছি, তাহার কোন প্রতিবাদ হয় নাই। রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষের পুত্র রায়বাহাদুর সারদাপ্রসন্ন ঘোষ এখন বাঙ্গলাদেশের অন্যতম জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি এই মামলায় কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহার জবানবন্দীতে তাঁহার পিতাকে ম্যানেজারী হইতে বরখাস্ত করার কথা উল্লেখ আছে। মিঃ হোয়ারটন ১৯০২ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে পদত্যাগ করেন। ১৯০২ সালের ২৫শে জুলাই তারিখে তিনি যে পদত্যাগপত্র লিখেন, তাহাতে তিনি বলেন,—"মাননীয়া মহাশয়া,—আগামী ১লা আগষ্ট হইতে আমি আপনার চাকুরী ছাড়িয়া দিতে চাই, এজন্য এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইয়াছি বলিয়া আমি নিজেই দুঃখিত। কিন্তু আপনার অধীনে চাকুরীতে প্রবেশ করার পর হইতে অদ্য পর্যন্ত আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতে আমার অভিপ্রায়ের কথা শুনিয়া বোধ হয় আপনি বিস্মিত হইবেন না; কারণ একজন ভদ্রলোক হিসাবে আমার সম্মুখে আর দ্বিতীয় পথ খোলা নাই।

"আমি আপনাকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বিভাগীয় কমিশনার ও মিঃ গার্থ যখন আমাকে আপনার অধীনে চাকুরী লইতে বলেন, তখন আমাকে পরিষ্কার করিয়াই বলা হইয়াছিল যে, আপনার বালক তিনটি সম্পূর্ণরূপে আমারই তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং আমিই সম্পূর্ণরূপে তাহাদের কাজ-কর্ম্ম এবং দৈনিক সাধারণ অভ্যাস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করিব, আমাকে ইহাও বলা হইয়াছিল যে, আপনার ম্যানেজার রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের প্রত্যক্ষ আজ্ঞাধীনে আমাকে থাকিতে হইবে। এই সকল সর্ত্ত স্বীকার করিয়াই আমি আপনার চাকুরী গ্রহণ করি, কিন্তু আপনি জানেন, আমার চাকুরী গ্রহণের অল্প সময় পরেই আপনি রায় বাহাদুরকে বরখাস্ত করেন। তখন একমাত্র মিঃ স্যাভেজের অনুরোধেই আমি আপনার বালকদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতে রাজী হই। আমার আশা ছিল যে আমার শিক্ষার গুণে তাহারা ভদ্র ব্যবহার করিতে শিখিবে এবং পড়াশুনায়

মনোযোগী হইবে। বিভাগীয় কমিশনারের অনুরোধেই আমি আপনার ঘোড়াশালার পরিচালনভার গ্রহণ করি; আপনার ঘোড়া ও গাড়ীগুলিকে যেরূপ কদর্য্য অবস্থায় রাখা হইত, সম্ভবপর হইলে তাহার প্রতিকার ও উন্নতি-বিধান করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, পরিষ্কারভাবে এই সর্ত্তে আমি ঘোড়াশালার পরিচালনভার গ্রহণ করি যে, এ কার্য্যের জন্য আমাকে মাসিক ৯০০৲ টাকা বেতন দেওয়া হইবে।

আপনার ছেলেরা যত প্রকারে সম্ভব পড়াশুনায় অবহেলা করিয়াছে, কেবল তাহাই নহে, অতি শোচনীয় বদ্ অভ্যাসগুলি পরিত্যাগের জন্যও তাহারা কোন প্রকার চেষ্টা করে নাই। অতএব ইহা অতি পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে, যে আমার উপদেশ অথবা শিক্ষা গ্রহণ করার কোন অভিপ্রায়ই তাহাদের নাই।"

মিঃ হোয়ারটনের পত্রের অবশিষ্টাংশে তাঁহার প্রাপ্য বেতন ইত্যাদির কথা রহিয়াছে। সে যাহাই হউক, এই পত্র হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাজার মৃত্যুর পর মিঃ হোয়ারটনকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং রাণীই তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আদালতে এই পত্রখানি প্রমাণিত হইবার পূর্ব্বে বিবাদীপক্ষ বলিয়াছেন যে, রাজাই মিঃ হোয়ারটনকে নিয়োগ করিয়াছিলেন যে সাক্ষীর নিকট এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল তিনি (বাদীপক্ষের ৩৫নং সাক্ষী) বলেন,—রাণী অথবা বড়কুমারই সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তবে তিনি কুমারদিগকে শিক্ষাদানের পরিবর্ত্তে পিলখানা এবং অন্যান্য জিনিষের তত্ত্বাবধান করিতেন, মিঃ হোয়ারটনের পত্র, অন্যান্য প্রমাণ, ঘোড়াশালা তত্ত্বাবধান বিষয়ক চিরকুট (১৬নং হইতে ১৬। ১০ নং একজিবিট) ইত্যাদি হইতে মনে হয় যে, সাক্ষীর উক্তিই সত্য।

রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষকে ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কিম্বা কাছাকাছি সময়ে চাকরী হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁহার বিরুদ্ধে হিসাব দাখিলের মামলা করা হয় তাঁহার স্থলে বাবু সুরেন্দ্রলাল মতিলালকে ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়। মিঃ মতিলাল ছিলেন বড়কুমারের শ্যালক।

ইতিমধ্যে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে দ্বিতীয় কুমারের বিবাহ হয়। ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের তারিখ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ স্থির করিয়া ১নং বিবাদীর মাতার আত্মীয়গণের নিকট পত্র ও তার (একজিবিট ২৯৬ ও ২৯৭। প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখই বলিয়াছিলেন; কিন্তু জেরার সময় যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তারিখটা ৮ই হইতে পারে কি না, তখন তিনি বলেন যে, একথা অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে তাঁহার ধারণা এই যে, ১৭ই তারিখেই বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর

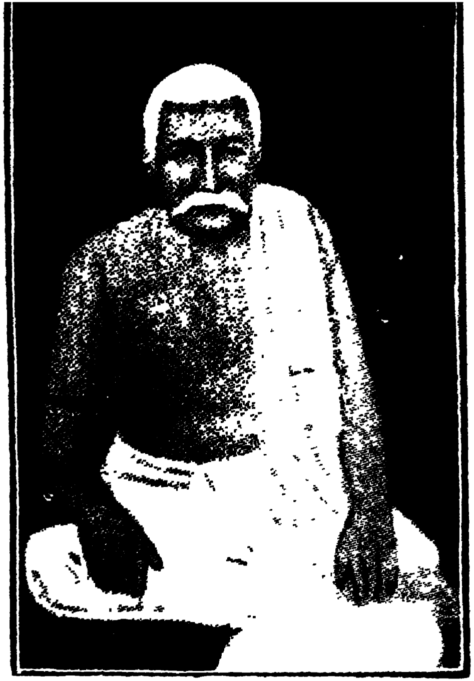

রাজা কালীনারায়ণ—বাদীর পিতামহ

রাণী সত্যভামা—কুমারের পিতামহী

তাঁহাকে রাণী জয়মণির তার এবং রাণী বিলাসমণির পত্র দেখান হয় তাহাতে তিনি এই পত্রের কিম্বা পত্রে উল্লিখিত ৮ই আষাঢ় তারিখের কোন প্রতিবাদ করেন নাই অতঃপর তিনি এমন কতকগুলি উত্তর দেন, যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, ১৭ই তারিখের কথাই তাহার স্মরণ হইতেছে না। ইহা কতকটা অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় যে, মেজরাণী তাঁহার বিবাহের তারিখ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইবেন, ইহাতে এইরূপ সমালোচনার সূত্র ঘটে যে, মেজরাণী তাঁহার মামীমার উক্তির প্রতিবাদ করিবার জন্যই নিজের বিবাহের তারিখটা একটু পিছাইয়া বলিয়াছেন। তাঁহার মামীমা সরোজিনী দেবী বিবাহের যাত্রীদলের সঙ্গে আসিয়া প্রায় ২২ দিন জয়দেবপুরে ছিলেন, তাঁহার সাক্ষ্যে একথা আছে দ্বিতীয় কুমারকে তিনি সেইবারেই যে প্রথম দেখিলেন, তাহা নহে। অতএব বিবাহ উপলক্ষে তিনি কতদিন ছিলেন, তাহা তেমন গুরুত্বব্যঞ্জক নহে। বিবাহ উপলক্ষে তিনি ২২ দিন ছিলেন বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ১নং বিবাদীর বেলায়ও বর তাঁহার বাড়ীতে যান নাই, তিনিই বিবাহের তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইবার পর বরের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মামা প্রতাপনারায়ণ রায় ও তাঁহার স্ত্রীসরোজিনী দেবী (পূর্ব্বোক্ত বাদী পক্ষের ১০২৬ নং সাক্ষী), মেজরাণীর নিজের মাতা ফুলকুমারী দেবী, ভ্রাতা সত্যেন্দ্র এবং কতিপয় ভৃত্য আসিয়াছিল, বিবাহের সময় মেজরাণীর বয়স ১৩ বৎসর ছিল। মেজরাণীর ভ্রাতা সত্যেন্দ্র এই মামলায় বিশেষভাবে তাঁহার কথা বিবৃত হইবে। বিবাহের সময় সত্যেন্দ্রের বয়স প্রায় ১৭ বৎসর ছিল—অর্থাৎ দ্বিতীয় কুমার হইতে তখন তিনি এক বৎসরের ছোট ছিলেন।

সত্যেন্দ্র ব্যানার্জ্জি

এই ভদ্রলোক এখন ধনী হইয়াছেন। বাদীর বক্তব্য এই যে, এই ভদ্রলোকই বর্ত্তমানে প্রকৃত প্রস্তাবে ভাওয়ালের সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ ভোগ করিতেছেন। নামে অবশ্য সত্যেন্দ্রের ভগিনীই এই এক তৃতীয়াংশের মালিক। প্রকৃতপক্ষে সত্যেন্দ্রই এই মামলা চালাইতেছেন। ভ্রাতার আধিপত্যের কথা বিচার করিতে গেলে ভগিনীর নিজস্ব কোন মতামত নাই। ভ্রাতা অথবা ভগিনীর মধ্যে কেহই কুমারের অভ্যুদয়কে একটা অনর্থপাত ব্যতীত আর কিছুই ভাবেন নাই।

রাণী বিভাবতী

এই মহিলার পরিচয় সম্পর্কে কয়েকটি কথা বিবেচ্য। সাক্ষ্য প্রমাণের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার সহায়তা হইবে, এই কারণেই মেজরাণীর পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। তিনি তাঁহার মাতা ফুলকুমারীর চারিটি সন্তানের অন্যতমা। এই ফুলকুমারী ছিলেন হুগলী উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার পরিবারের বাবু নবকৃষ্ণ মুখুজ্যের কন্যা। মেজরাণীর পিতা বিষ্ণুপদ বাঁড়ুয্যে হুগলী জেলারই নোয়াপাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। মেজরাণীর বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, মেজরাণীর মাতা সন্তানগণসহ ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার ভ্রাতা প্রতাপনারায়ণের বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহার অপর ভ্রাতা রামনারায়ণের বাড়ীতে ছিলেন। ১নং বিবাদী বলেন,—তাঁহার মাতা বিধবা হইবার পর সন্তানগণকে সঙ্গে লইয়া ভ্রাতার বাড়ীতে বাস করিতে আসিয়াছিলেন। ১নং বিবাদীর ভ্রাতা সত্যেন্দ্রও তাহাই বলিয়াছেন। সত্যেন্দ্র আরও বলিয়াছেন যে, তাহার পিতা সম্পত্তিশালী ছিলেন। ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, সত্যেন্দ্রের পিতার কিছুই ছিল না। যদি তাহাই হইত, তবে ফুলকুমারী নিশ্চয়ই বাড়ীতে থাকিতেন। কিন্তু ফুলকুমারী কখনও স্বামীর গৃহে থাকেন নাই—এমন কি, স্বামীর জীবদ্দশায়ও তিনি স্বামীগৃহে বাস করেন নাই। কারণ সত্যেন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন,—উত্তরপাড়ায়ই তাহার লেখাপড়া সুরু হয়। শ্যামাপদ বাঁড়ুয্যের মাতা ছিলেন ফুলকুমারীর সম্পর্কিতা ভগিনী। এই শ্যামাপদ বাঁড়ুয্যের সাক্ষ্য কমিশনে গৃহীত হইয়াছে। তিনি বিবাদী পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সারাজীবনই ফুলকুমারী তাহার ভাইয়ের বাড়ীতে কাটাইয়াছেন, তবে কোন কোন সময় স্বামীর বাড়ীতেও তিনি গিয়াছেন; কিন্তু সাক্ষীর এবিষয়ে কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই। সঙ্গতিপন্ন কোন লোকের স্ত্রী সারাজীবন তাহার ভ্রাতার বাড়ীতে বাস করে না। সত্যেন্দ্র বলিয়াছেন যে, তাহার পিতা সম্পত্তি রাখিয়া মারা গিয়াছিলেন। ইহা কেবল জনশ্রুতি ছাড়া আর কোন প্রমাণের দ্বারাই সমর্থিত নহে। তবে দেখা যায় যে, তাহার মাতা মৃত্যুকালে কিছু টাকাকড়ি রাখিয়া গিয়াছিলেন। তবে ইতিমধ্যে তাহার কন্যা মেজরাণী ভাওয়াল এষ্টেট হইতে যে টাকা পাইতেছিলেন, সেই টাকাই ফুলকুমারী সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন কিনা তাহা বিচার করিয়া

দেখিতে হইবে। তাহার পত্রগুলির মধ্যে ১-১২-০৮ তারিখে লিখিত এক একখানি পত্রে তিনি অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, তাহার ছেলে অনর্থক জয়দেবপুরে সময় নষ্ট করিয়াছিলেন,"সত্যেন্দ্র যদি এইভাবেই পড়াশুনায় অবহেলা করে তবে কিভাবে তাহার জীবিকার্জ্জনের উপায় হইবে।" (একজিবিট নং ২৯৩ (৬)।) অন্যান্য দিক হইতেও মনে হয় যে, প্রকৃত অবস্থাটা এইরূপই ছিল বিষ্ণুপদ বাঁড়ুয্যের চারিটি সন্তানই মাতুলালয়ে প্রতিপালিত তাহাদের মধ্যে ১নং বিবাদী অন্যতম। সত্যেন্দ্রবাবুই একমাত্র ছেলে, অপর তিনটিই মেয়ে, এই মেয়েদের মধ্যে মলিনার বিবাহ হয় কান্তিচন্দ্র মুখুজ্যের পুত্রের সঙ্গে, কান্তিচন্দ্র ছিলেন জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী। বিভাবতীকে ভাওয়ালের মেজকুমারের সহিত বিবাহ দেওয়া হয় এবং প্রভাবতীকে উমাকালী মুখার্জ্জির পুত্র হাইকোর্টের উকীল সুশীলের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, তাহাদের মাতুলগণ উচ্চপদস্থ লোক ছিলেন এইজন্য এবং তাহাদের কৌলীন্য ও বালিকাদের সৌন্দর্য্যের জন্যই এইসব সম্পর্ক সম্ভব হইয়াছিল দ্বিতীয় বিবাদী ভাওয়াল এষ্টেটের তাহার অংশের ভার গ্রহণ সম্পর্কে আপত্তি জানাইয়া বোর্ড অব রেভিনিউর নিকট যে একখানি দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিজেকে উত্তরপাড়ার মুখার্জ্জি বংশের লোক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহা এষ্টেট পরিচালনা সম্পর্কে তাঁহার যোগ্যতার অন্যতম কারণ বলিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি ঐ দরখাস্তে তাঁহার পিতার কথা উল্লেখ করেন নাই।

মেজরাণীর তিন মাতুলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মাতুল প্রতাপনারায়ণ বিভাবতীর বিবাহ উপলক্ষে বিভাবতীকে সঙ্গেই জয়দেবপুর আসেন। প্রতাপ নারায়ণের সঙ্গে তাহার স্ত্রী এবং বিভাবতীর ভ্রাতা সত্যবাবুও আসিয়াছিলেন। সত্যবাবু ঐ সময় ছাত্র ছিলেন। বিবাহ হইয়া গেলে কন্যাপক্ষ সকলেই চলিয়া যায়; কিন্তু বিভাবতী দেবী থাকেন। ১৯০২ সালের মে মাসে মিঃ সুরেন্দ্র মতিলাল ম্যানেজার ছিলেন ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রাণী (মেজরাণীর শাশুড়ী) ঐ সময় জীবিতা ছিলেন এবং তিনিই গৃহকর্ত্রী ছিলেন। কিন্তু পুরাপুরী ভাবে নহে; কারণ ঐ সময় রাণী সত্যভামা দেবী (রাণী বিলাসমণির শাশুড়ী) ও জয়মণি দেবীও জীবিত ছিলেন।

বিবাহের প্রায় একমাস পর মেজরাণী, বড় কুমার, রাণী সত্যভামা এবং জয়মণি ও কৃপাময়ীর সঙ্গে কলিকাতা যান। তথা হইতে তিনি তাঁহার মা'র নিকট উত্তরপাড়া যান এবং তথায় প্রায় তিন সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি জয়দেবপুর আসার পথে এক সপ্তাহকাল কলিকাতা

থাকিয়া, পরে জয়দেবপুর ফিরেন। তাহা ৭ই শ্রাবণ হইবে—মেজরাণীর উক্তিতেই তাহা দেখা যায়।

চিঠি-পত্র

১৯০২ সালের ১০ই আগষ্ট মেজকুমার তাঁহাকে বাঙ্গালা একখানি চিঠি লিখেন বলিয়া বলা হইয়াছে। বিভাবতী দেবীর উক্তিতে দেখা যায়, মেজকুমার তাঁহাকে মোট ৯খানি চিঠি লিখিয়াছেন, অবশ্য প্রভাবতীর নিকট যে চিঠি লেখা হইয়াছে সেইখানা বাদে এবং ইহা (ঐ বাঙ্গালা চিঠি) তাহার মধ্যে অন্যতম। মেজকুমারের বর্ণজ্ঞান যে মোটেই ছিল না তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বাদীপক্ষে বলা হইয়াছে যে, প্রতারণার উদ্দেশ্যে ঐসব চিঠি জাল করা হইয়াছে। কুমারের বর্ণজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনার সময় ইহার উল্লেখ করা হইবে।

জয়দেবপুর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রথম বিবাদীনী, যাঁহাকে আমি দ্বিতীয় রাণী বলিয়া অভিহিত করিতে ইচ্ছা করি, বাঙ্গলা ১৩১১ সনের (১৯০৪ সালের অক্টোবর) আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত জয়দেবপুরই অবস্থান করেন ঐসময় কয়েকটি ঘটনা ঘটে। ১৯০২ সালের নবেম্বর মাসে মিঃ মেয়ার, (যিনি বিবাদী পক্ষে কমিশনে জবানবন্দী দিয়াছেন। ম্যানেজার নিযুক্ত হন একজিবিট ২৮৩)। ১৩০৯ সনের আশ্বিন মাসে (সেপ্টেম্বর অক্টোবর) বড়কুমারের একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তিনমাস বয়সেই তাহার মৃত্যু হয় ১৩০৯ সনের পৌষ মাসে (১৯০২ সালের ডিসেম্বর) মেজরাণীর মাতা শিশু-সন্তানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া একখানি চিঠি লিখেন, এই শিশু জকি বলিয়া পরিচিত ছিল এবং জয়দেবপুরে তাহার নামানুসারে জকি প্রাইমারী স্কুল নামে একটি স্কুল আছে।

১৯০৩ সালের জানুয়ারী মাসে বড়কুমার দিল্লী দরবারে যোগদান করেন। মিঃ মেয়ার বলিয়াছেন যে, ইহার পর তাঁহাকে (বড়কুমারকে) রাজা, করিবার কথা হয়।

১৩১০ সনের ১০ই মাঘ (১৯০৪ সালের ২৪শে জানুয়ারী) একই তারিখে ছোট কুমার ও কনিষ্ঠা ভগ্নি তড়িন্ময়ীর (ডাকনাম মটর) বিবাহ হয়। ছোট কুমারের সহিত ৪র্থ বিবাদিনী আনন্দকুমারীর বিবাহ হয়। আনন্দকুমারীর বয়স তখন ১৩ বৎসরের কিছু বেশী ছিল এবং ঢাকা জিলায় হারিয়া নামক কোন গ্রামের এক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিন রাণীর মধ্যে আনন্দকুমারীই ঢাকা জিলার মেয়ে। অপর দুইজনের মধ্যে একজন কলিকাতার এবং আর একজনকেও কলিকাতার মেয়েই বলা যাইতে পারে; কারণ

উত্তরপাড়া কলিকাতা হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। বাবু ব্রজলাল ব্যানার্জ্জির সহিত মটরের বিবাহ হয়, বর্ত্তমান সময়ে তিনি ঢাকার উকীল। ব্রজলাল বাবু আধা-ঘরজামাই ছিলেন, কারণ তিনি প্রায়ই শ্বশুরবাড়ী থাকিতেন না। যদিও পরে তাঁহার স্ত্রী মটর ঢাকা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে বাস করিতে থাকেন। ১৩১০ সালের ১০ই ফাল্গুন ইন্দুময়ীর কন্যা মণিকে সাগরের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়।

সুতরাং ১৯০৪ সালের প্রথমভাগে রাজপরিবারে তিন কুমার। তাঁহাদের তিন ভগ্নী, ছেলে মেয়ে এবং দুই জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর দুই স্বামী। ঠাকুরমা রাণী সত্যভামা, জয়মণি ও রাজার ভগ্নী কৃপাময়ী এবং তাঁহার স্বামী বিলাসবাবু প্রভৃতি ছিলেন। বিলাসবাবুর বাড়ী ফরিদপুর জিলায়, তাঁহার আর একটী স্ত্রী ছিল এবং তাঁহার গর্ভজাত পুত্র কন্যাও ছিল তাঁহার পুত্র কন্যার মধ্যে দুইজন বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। আমি যখন সাক্ষ্যপ্রমাণাদি আলোচনা করিব তখন এই সব বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন হইবে। কৃপাময়ী দেবীর কোন সন্তান ছিল না। রাজার মৃত্যুর পর রাজবাড়ীতে দুইটি জিনিষ সংযোজিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কুমার চটানের দক্ষিণ দিকে একটি নূতন আস্তাবল প্রতিষ্ঠা করেন। আমি বলিয়াছি যে, ইহার ফলে পিলখানা অনেকটা নিকটে আসিয়া পৌছাইয়াছে। দ্বিতীয়, কুমার একটি চিড়িয়াখানা স্থাপন করেন এই চিড়িয়াখানায় দুইটি বাঘ, দুইটি চিতা বাঘ এবং অন্যান্য একদল পশু ছিল। এইগুলির মধ্যে একটি সাদা রংএর শিয়াল, যাহার কথা বাদী উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ শিয়াল সম্বন্ধে এই মামলায় আলোচনা হওয়াতে যথেষ্ট সময় লাগিয়াছে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় কুমারকে চিড়িয়াখানায় দেখিয়াছে, তাহাকে অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই, ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে কারণ এই লোকটি উপরোক্ত সাদা শিয়ালটিকেও দেখিয়াছিল। বিবাদী পক্ষের একজন সাক্ষীও (বিবাদী পক্ষের সাক্ষী নং ২৬৭) এই পশুটিকে (সাদা শিয়াল) দেখিয়াছে।

১৯০৪ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে কিছু করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ১৯০৪ সালের ১৫ই জুন তারিখে মিঃ মেয়ার ঢাকার কালেক্টরের নিকটে এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন (একজিবিট ২৮৪)। এই রিপোর্টে কুমারদের জননী রাণীর খাস কর্ম্মচারী মিঃ মেয়ার ষ্টেট পরিচালনে তাঁহার মনিব হস্তক্ষেপ করেন বলিয়া অভিযোগ করেন; রাণী অর্থের অপব্যয় করিতেছেন এবং ষ্টেটের পক্ষে ক্ষতিকর অনেক কার্য্য করিতেছেন বলিয়াও ঐ অভিযোগে বর্ণনা করেন। বড়কুমারের প্রশংসা করায় বড়কুমারও এ বিষয়ে তাঁহার অভিযোগ সমর্থন করিতেছেন বলিয়া মিঃ মেয়ার কালেক্টরকে জানান; কিন্তু তিনি ঐ অভিযোগে ছোট দুই কুমারের যে চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহা

বিবাদিগণ কুমারের যে চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা হইতে এরূপ বিভিন্ন যে, মেয়ার ঐরূপ রিপোর্ট পাঠাইবার কথা স্বীকার করিলেও তিনি বাদী কর্ত্তৃক ঐ রিপোর্টের যে নকল প্রমাণস্বরূপ দাখিল করা হইয়াছে তাহা মানিয়া লন নাই। মূল রিপোর্ট কালেক্টরীতে চাহিয়া পাঠাইলেও দাখিল করা হয় নাই। যাহা হউক, ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর র‍্যাঙ্কিন কর্ত্তৃক ঐ রিপোর্ট প্রমাণিত হইয়াছে, কারণ উক্ত রিপোর্টখানা তাঁহার নিকটেই প্রেরিত হইয়াছিল; ঐ রিপোর্ট প্রাপ্তির পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহার স্মরণ থাকিবারই কথা এবং বিবাদীপক্ষের সাক্ষী হিসাবে তাঁহার সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল। এই রিপোর্টের ব্যাপারে মিঃ মেয়ার এবং বড়কুমার এক পক্ষে ছিলেন এবং রাণী ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় এক পক্ষে ছিলেন, মিঃ র‍্যাঙ্কিন এবং যামিনীর (বাদী পক্ষের ৩৪ নং সাক্ষী) সাক্ষ্য হইতে তাহা জানা যায়। যামিনী মেয়ারের অধীনে কেরাণীর কাজ করিতে এবং তাহার কথা মেয়ারের এখনও স্মরণ রহিয়াছে। ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাণী মেয়ার সাহেবকে কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিলে, মেয়ার বড কুমার এবং এই যামিনী কেরাণী ঢাকার নবাব সলিমুল্লার নিকট হইতে একখানি চিঠী লইয়া দার্জ্জিলিং গমন করেন। মিঃ র‍্যাঙ্কিনও এইরূপ মনে করেন যে, ইতিমধ্যে তিনি মেয়ারের রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই যে, উহারই ফলে রেভিনিউ বোর্ড হইতে এই আদেশ হয় যে, বোর্ড ষ্টেটের ভার গ্রহণ করিবেন। বোড মেয়ার সাহেবকে ম্যানেজার পদে নিযুক্ত না করিয়া মিঃ হার্ড নামে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেব। অক্টোবর মাসের কোনও একদিন মিঃ র‍্যাঙ্কিন এবং ষ্টেটের তদানীন্তন এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার মিঃ হিলিগান ষ্টেট দখল করিবার জন্য জয়দেবপুর গমন করেন। মেয়ারের কোন কাজ না থাকিলেও সেই সঙ্গে তিনিও জয়দেবপুর গিয়াছিলেন। মিঃ মেয়ার বলেন, সমস্ত ব্যাপারটাই রাণীকে তাক্ লাগাইয়া দিবার জন্য করা হইয়াছিল। মিঃ র‍্যাঙ্কিন ষ্টেট এবং রাজবাটী দখল করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহারা যাহাতে গৃহে প্রবেশ করিয়া কাগজপত্র তল্লাস করিতে পারেন তজ্জন্য স্ত্রীলোকদিগকে একটি ঘরে লইয়া যাইবার জন্য রাণীকে মাত্র দশ মিনিট সময় দিয়াছিলেন। মিঃ র‍্যাঙ্কিন কোথায় কাগজপত্র রহিয়াছে তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য মেয়ারকে সঙ্গে লইয়াছিলেন, মিঃ র‍্যাঙ্কিন বলিয়াছেন, মেয়ার কাগজপত্র কোথায় আছে বাস্তবিক পক্ষে কিছু জানিত না। যেই মনিব তাঁহাকে কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিতে সাহসী হইয়াছেন, মেয়ার তাঁহার এই অবস্থা উপভোগ করিতেই শুধু সেখানে গিয়াছিলেন। সেই সময়কার

ঘটনাবলীর স্মৃতি যেরূপ তিক্ত হওয়ার কথা তাহাতে ঐ সমস্ত কথা মেয়ারের কম মনে থাকিবে। র‍্যাঙ্কিনের চেয়েও এই সব কথা তিনি কম স্মরণ করিতে পারেন, উহা বড়ই অদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। ঐ ঘটনার পূর্ব্বে এবং পরে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায়, বড়কুমার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বশে আসিয়াছিলেন এবং র‍্যাঙ্কিনের স্বীকারোক্তি হইতে জানা যায়, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কুমার এ বিবাদে রাণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা যে মেয়ারের পক্ষে খুব তিক্ত হইয়াছিল, মেয়ারের সাক্ষ্য হইতেও তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

কলিকাতা নগরীতে রাজপরিবারের অবস্থিতি

মিঃ র‍্যাঙ্কিন যখন সম্পত্তির দখল লন তখন মধ্যম কুমার জয়দেবপুরে ছিলেন না, তখন তিনি কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পরিচালনাধীনে দিবার জন্য মিঃ মেয়ারের সহিত বড় কুমারের যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাহা প্রতিরোধকল্পে মধ্যমকুমার কলিকাতায় ইতিপূর্ব্বে যে সকল কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছিলেন, সেই কর্ম্মচারীদিগের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যেই মেজকুমার কলিকাতায় গিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণতঃ অনুমান করা হইয়াছিল। তখন কলিকাতায় মেজকুমার পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকিতেন। পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকাকালে, তাহাদের সম্পত্তির ভার কোর্ট অব ওয়ার্ডসকে দেওয়া হয়।

এই সময় মেজরাণী জয়দেবপুরে ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি রাণী সত্যভামা, রাণীর ভ্রাতা যিনি পূর্ব্বে জয়দেবপুর গিয়াছিলেন এবং ছোট রাণীর এক ভ্রাতার সহিত মধ্যমকুমার পার্ক ষ্ট্রীটের যে বাড়ীতে ছিলেন, সেই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। রাণীর উক্তি অনুসারে বুঝা যায় ঐ ঘটনা ১৩১১ সালের আশ্বিন ঘটিয়াছিল। মেজো রাণী আরও বলেন—এক মাস পরে রাণী কলিকাতায় আসেন। উভয় পক্ষের অনুমোদিত সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, ছোট কুমার আরও পরে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। মেজকুমার পার্ক ষ্ট্রীটের যে বাড়ীতে থাকিতেন সে বাড়ী ছোট বলিয়া রাণী ৩নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে থাকেন। এখানে রাজপরিবারে রাণী, তাঁহার কন্যাগণ, তিন কুমার এবং কুমারদের তিন রাণী ১৯০৪ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত বসবাস করেন।

কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাত হইতে সম্পত্তির পুনরুদ্ধার

কলিকাতায় আগমনের পর রাণী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বিরুদ্ধে ভাওয়ালের রাজ এষ্টেট দখল পাওয়া সম্বন্ধে এক নালিশ দায়ের করেন। হাইকোর্টের

নালিশের আর্জ্জিতে বলা হয়,—কোর্ট অব ওয়ার্ডস যেভাবে সম্পত্তির শাসন সংরক্ষণে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহারা সপ্রমাণ করিতে চান যে, সম্পত্তিতে বাদিনী রাণীর কোনও বিষয় স্বত্ব দখল নাই সুতরাং কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিকট হইতে বাদিনীকে সম্পত্তি দখল দেওয়া হউক; এই মামলা দায়ের হইবার পর, ১৯০৫ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডস সম্পত্তি ছাড়িয়া দেন। বাদীর ৯৭৭ নং সাক্ষী সাগরবাবুর সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায়, ঐ বড়কুমার মট লেনের এক বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তখন বড় কুমারের স্ত্রী এবং পরিবারের অপরাপর সকলে ৩নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ীতেই থাকিতেন।

রাজ-পরিবারের লোকদিগের কলিকাতা ত্যাগ

মধ্যম কুমার এই সময়ে কিরূপভাবে গতিবিধি করিতেন, কিরূপ লোকজনের সহিত মেলামেশা করিতেন, কিরূপ খেয়ালে চলিতেন এবং কোন সময় কিভাবে কি করিতেন, তৎসংক্রান্ত সাক্ষ্যের আলোচনা পরে করা যাইবে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এতটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ২৩।৩।১৯০৬ তারিখের পূর্ব্বেই বড়কুমার এবং রাজপরিবারের অন্যান্য সকলে জয়দেবপুরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ১৩।৩।১৯০৫ তারিখে বড়কুমার কর্তৃক লিখিত পত্র (একজিবিট ৩৩৫) হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু মধ্যমকুমার যে অন্যান্য সকলের সহিত ঐ সময় জয়দেবপুরে ফিরেন নাই, তিনি যে সকলে চলিয়া আসিবার পরও কয়েক দিন কলিকাতায় ছিলেন, তাহা অনুমান করা যায় কারণ, রাজপরিবারের সকলে চলিয়া আসার পর মেজকুমার কয়েকদিন কলিকাতায় থাকা কালে যে সম্পন্ন হয়, এই মামলায় তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং মামলা সম্পর্কে তাহার যোগ্যতা অপরিসীম।

মধ্যম রাজ কুমারের জীবন বীমার কথা

১৯০৫ সালের ২৫শে মার্চ্চ মধ্যমকুমার এক বীমার কাগজ স্বাক্ষর করেন। ১৯০৫ সালের ২রা এপ্রিল, হ্যারিংটন ষ্ট্রীটে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ডাক্তার মিঃ আর্ণল্ড কে ডি মধ্যমকুমারকে পরীক্ষা করেন। সেই ডাক্তারী রিপোর্টে সচরাচর যেমন হইয়া থাকে রাজপরিবার সংক্রান্ত কতকগুলি বিবরণ বিস্তৃতভাবে লেখা হইয়াছিল। উক্ত রিপোর্টে কুমারের জন্মের তারিখ এবং অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীরের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং শরীরের মধ্যকার কতকগুলি চিহ্নের উল্লেখ ছিল। এখন দেখিতে হইবে, বাদীর শরীরে চিহ্নের সহিত ঐ সকল চিহ্নের মিল আছে কি না এবং ঐ সকল চিহ্ন

বাদীকে মধ্যমকুমার বলিয়া সনাক্ত করিবার পক্ষে কতটা সহায়তা করে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, বিবাদিগণ ইনসিওরেন্সের যে সকল কাগজপত্র তলব করিয়াছিলেন এবং তাহার যেগুলি আদালতে দাখিল করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে পলিসীর টাকা (ত্রিশ হাজার টাকার পলিসী করা হয়) লইবার সময় মধ্যমকুমারের মৃত্যুর যে এফিডেভিট করা হইয়াছিল এবং মৃত্যু সম্বন্ধে যে বাদ প্রতিবাদ চলিয়াছিল, সেই এফিডেভিট ভিন্ন বিবাদী পক্ষ কোম্পানীর মেডিকেল রিপোর্ট দাখিল করেন নাই ; কিন্তু আমি পরে দেখাবার চেষ্টা করিব যে, ১০ই মে অর্থাৎ বাদী আপনাকে ভাওয়ালের মধ্যমকুমার বলিয়া ঘোষণা করিবার ছয় দিন পরে, রেভিনিউ বোর্ড উক্ত মেডিকেল রিপোর্ট তলব করেন এবং ১৯২১ সালের ১৫ই জুলাই রেভিনিউ বোর্ড উক্ত মেডিকাল রিপোর্ট পরীক্ষা করিয়া দেখেন। বাদীপক্ষের সনাক্তকারী সাক্ষীদিগের অধিকাংশের সাক্ষ্য হইয়া যাওয়ার পর এবং বাদীপক্ষের ৯৭৭নং সাক্ষী যখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিতেছিলেন, সেই সময় বাদীই স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এডিনবরা অফিস হইতে উক্ত মেডিকেল রিপোর্ট তলব দিয়া আনেন এবং আদালতে দাখিল করেন।

রায়সাহেব যোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা

রাজপরিবারের কলিকাতা থাকা কালে রাণী দুইজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন ; তাহাদের একজন এই মামলার কাহিনীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তিনি বাবু (এখন রায় সাহেব) যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার উক্তি অনুসারে তিনি তিন কুমারের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু প্রথম হইতেই যোগেন্দ্রবাবু ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন কি না, তাহা বিচার সাপেক্ষ হইলেও, তিনি 'ভাওয়াল রাজ্যের সেক্রেটারী' বলিয়াই নিজের পরিচয় দিতেন। তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জামাতা বাবু সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (সাগরবাবু বলিয়াই ভালরূপ পরিচিত) ভ্রাতা। সাগরবাবু, ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাসে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর কন্যা প্রমোদবালা ওরফে মণিকে বিবাহ করেন এই বিবাহ উপলক্ষেই যোগেনবাবু সর্ব্বপ্রথম জয়দেবপুরে আসেন। যোগেন্দ্রবাবুর উক্তিতেই এ সকল প্রকাশ ; তারপর যোগেন্দ্রবাবু ভাওয়াল রাজার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। ১৯০৫ সালের মার্চ্চ মাসে অথবা ঐরূপ সময়ে যোগেন্দ্রবাবু স্থায়ীভাবে জয়দেবপুর বাস করিতে আরম্ভ করে, অপর যে একজন কর্ম্মচারী রাণীর কলিকাতা থাকাকালে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন,

তাঁহার নাম—রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র মিত্র : তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ,: তিনি ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রাজ কুমারদিগের শিক্ষার কথা

শেষোক্ত ভদ্রলোক, কুমারদিগের ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলিকাতায় বিনোদবাবু নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু বিনোদবাবু কুমারদিগকে কিছুতেই নিকটে আনিতে পারেন নাই, কুমারদিগের লেখাপড়া শিক্ষা এই শিক্ষকের দ্বারাই কতকটা হইয়াছিল বলিয়া সময় সময় প্রমাণের চেষ্টা হইলেও, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, শিক্ষক বিনোদবাবু কুমারদিগকে কিছুই শিখাইতে পারেন নাই। ইহাও সকলে প্রমাণ করিয়াছেন যে, একমাত্র হোয়ারটন কর্ত্তৃক শিক্ষার চেষ্টা হওয়া ভিন্ন (মিঃ হোয়ার্টন শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারেন নাই বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও) রাজার মৃত্যুর পর কুমারদিগের শিক্ষার পক্ষে কেহই কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। বিনোদবাবু প্রথমে মাইনর স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তারপর বিদ্যালয়টী ৯.১১.১৯০৫ তারিখে উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইলে, তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার (বিবাদীপক্ষের ১৭নং সাক্ষী) নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কুমারদিগের চিঠিপত্রের প্রসঙ্গ

১৯০৫ সালের ডিসেম্বরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। ডিসেম্বরের কোন এক তারিখে, (অবশ্য এ সম্বন্ধে মতান্তর আছে) কুমারগণ কলিকাতায় গমন করেন। মধ্যমকুমার প্রকৃতপক্ষে কতকাল কলিকাতায় ছিলেন, সেই সময়ের সহিত বিবাদী পক্ষ কর্ত্তৃক মধ্যম কুমারের লিখিত বলিয়া উল্লিখিত অপিচ বিবাদীপক্ষের সাক্ষী ব্যারিষ্টার মিঃ আর, সি, সেন কর্ত্তৃক সত্য বলিয়া প্রমাণিত এবং বাদী কর্ত্তৃক জাল বলিয়া অস্বীকৃত, নয় খানা পত্রের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এখানে যাহা কিছু বলিবার আবশ্যক, তাহা এই—কি করিয়া ইহা স্বীকার করা যায় যে কুমারেরা সকলে এবং বিশেষভাবে মধ্যম কুমার, ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় গমন করিয়াছিলেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এইবার তাঁহারা ১৯নং ল্যান্সডাউন রোডে অবস্থান করেন। মধ্যমরাণী বলেন—তাঁহার নিজের টাকায় মধ্যম রাণীর ভ্রাতা ঐ বাড়ীর সংস্কার এবং জায়গাজমির উন্নতি করেন, কুমারদের কলিকাতা থাকা সময়ে ইংলণ্ডের যুবরাজ ২রা জানুয়ারী কলিকাতায় উপস্থিত হন। যুবরাজের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন জন্য ২রা ও ৩রা জানুয়ারী ছুটি থাকে। বিবাদী পক্ষের জনৈক সাক্ষীর বর্ণনানুসারে প্রতিপন্ন হয়—ঐ উপলক্ষে ল্যান্সডাউন রোডের

বাড়ী সাজান হইয়াছিল। (বিবাদীপক্ষের ৩৯৬নং সাক্ষী গৌরচন্দ্র মজুমদারের সাক্ষ্য।)

সর্ব্বপ্রকারে বিচার করিয়া দেখা যায়, কুমারগণ অথবা দ্বিতীয় কুমার ১৯০৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতায় ছিলেন, প্রকাশ, ঐ দিন তিনি একখানি চিঠি স্বাক্ষর করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। (বিবাদীপক্ষ কর্ত্তৃক দাখিলী ৪৭০নং একজিবিট) কুমারগণ কোন সময় জয়দেবপুরে ফিরিয়া যান, সে তারিখ সঠিক নির্দ্ধারণ করা কঠিন। ২৫।১২।১৯০৬ তারিখে দেখা যায়, রাজপরিবারের কয়েকজন কলিকাতায় আছেন। রাণীর নিকট ইন্দুময়ী দেবী কর্ত্তৃক ১৫ই পৌষ অর্থাৎ ৩০-১২ ১৯০৬ তারিখে লিখিত পত্র (একজিবিট ২৩৬) হইতে বুঝা যায়, কুমারের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ইন্দুময়ী, দ্বিতীয়া রাণী, বড়কুমার এবং তাঁহাদের সঙ্গেরপ্রায় ৬৫ জন লোক ঐ দিন ভাওয়ালে, পৌছিয়াছেন। অন্যান্য প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, ঐ বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেস ও শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল। রাজপরিবার ঐ সময় কলিকাতায় আসিয়া মিঃ এ, এম, বসুর ১৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ছিলেন, সাক্ষ্য প্রমাণে তাহা পাওয়া যায়। তখন রাণী বিভাবতী রক্তশূন্যতায় ভুগিতেছিলেন বলিয়া ঐ সময় তাঁহারা কলিকাতায় আসেন। অনেকে রাণীর রক্ত দূষিত হইয়াছে বলিয়াও অনুমান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়া রাণীর তাঁহার কলিকাতা পরিদর্শনের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে রাণীর মাতা কর্ত্তৃক লিখিত তিনখানি পত্র আছে। একজিবিট (৩০২, ৩০৪, ৩০৫) ঐ তিনখানি পত্র হইতে জানা যায়, ১৯০৭ সালের ৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্তও রাণী বিলাসমণি কলিকাতায় পৌছেন নাই। ঐদিন দ্বিতীয় কুমারের কলিকাতায় আসার কথা ছিল ; কিন্তু তিনিও পৌছেন নাই। তিনি ঐদিনের পরে কলিকাতায় পৌছিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রাণী বিলাসমণি মধ্যম কুমারের সহিত ৯ই জানুয়ারী কলিকাতা পৌছেন, কিন্তু এই বিষয়টী আমার পূর্ব্বোল্লিখিত নয়খানি পত্রের সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলেই দেখা যায়, রাণী বিলাসমণি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কেবল তিনি নহেন ; অন্যান্য মহিলাগণ এবং আত্মীয় স্বজন, ১৯০৭ সালের ১৪ই জানুয়ারী অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

রাণী বিলাসমণি দেবীর লোকান্তর প্রাপ্তি

১৯শে জানুয়ারী রাণী বিলাসমণি কলেরায় আক্রান্ত হন। ২১শে জানুয়ারী তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মধ্যম রাণীর এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সাক্ষ্য হইতে এই

বিবরণ পাওয়া যায়। কোনও পক্ষই ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। এই সময়ে রাজ পরিবারের সহিত রাণীর তিন পুত্র, তিন কন্যা, বড় দুই কন্যার স্বামী, কৃপাময়ী, সত্যভামা, কৃপাময়ীর স্বামী (এই মামলার সাক্ষী), তাহার ভ্রাতা বসন্ত মুখার্জ্জির স্ত্রী প্রভৃতি আসিয়াছিলেন,—তৎসম্পর্কে যে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। তাঁহারা সকলে ১৫৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে ছিলেন, কিন্তু বড়কুমার ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটেরই স্বতন্ত্র এক বাড়ীতে থাকিতেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার নিকটে থাকিতেন না।

রাণী বিলাসমণির মৃত্যুর পরদিন, ২২শে জানুয়ারী (১৯০৭) রাজপরিবারের সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন কুমারেরাই সম্পত্তির সর্ব্বময় মালিক হইলেন এবং রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র মিত্র ম্যানেজার রহিলেন। ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর পর্য্যন্ত তিনি ম্যানেজার ছিলেন। তারপর তিনি কাজ ছাড়িয়া দেন (বাদী পক্ষের ৯৫২নং সাক্ষী—যোগেশবাবুর কেরাণী)। ১৬ই অক্টোবর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্ঞানশঙ্কর সেন ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত গেজেটেড অফিসারদিগের চাকুরীকালের ইতিবৃত্তের মধ্যে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যকালের নির্দ্দেশ আছে। এবৎসর কুমারগণ কলিকাতায় যান নাই। এবৎসরের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, এবৎসর ফাল্গুন মাসে জ্যোতির্ম্ময়ীর কন্যা হেনীর এবং ইন্দুময়ীর কন্যা কেনীর বিবাহ হয়। কালমুধার বীরেন্দ্র ব্যানার্জ্জির সহিত কেনীর বিবাহ হইয়াছিল। ১৩২৬ সালের ভাদ্র মাসে কেনী বিধবা হয়। চন্দ্রশেখর ব্যানার্জ্জির সহিত হেনীর বিবাহ হইয়াছিল। চন্দ্রশেখরবাবু বর্ত্তমানে ঢাকার উকীল। এই মামলায় তিনি সাক্ষ্য দিয়াছেন। চন্দ্রশেখরবাবু, সাগরবাবুর নিকটআত্মীয় ভ্রাতা। সাগরবাবু, আর এক জামাতা এবং রায় সাহেব যোগেন্দ্র ব্যানার্জ্জির ভ্রাতা, পাবনা জেলার এক পল্লীতে ইহাদের তিনজনের বাড়ী।

মধ্যম কুমার রমেন্দ্রনারায়ণের পীড়া

১৯০৭ সালে কুমারেরা কলিকাতা যান নাই কেন, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু মধ্যম কুমার যদিও যথাপূর্ব্ব সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন, ঐ সময় তিনি উপদংশে ভুগিতেছিলেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, কুমার মৃত্যুর—যে মৃত্যু সম্বন্ধে নানা বিতর্কের বিষয় আছে—পূর্ব্ব হইতে উপদংশে ভুগিতেছিলেন এ প্রসঙ্গ অতি বিস্তৃত। যখন কুমারের শরীরের চিহ্নগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিব, সেই সময় এ বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিব। কিন্তু ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, কুমারের উপদংশ ব্যাধি হইয়াছিল।

সেই উপদংশ ক্রমে অর্ব্বুদে পরিণত হয়—শরীরে গুটি বাহির হয় না, কুমারের কনুই এবং কুমারের পায়ে উপদংশ অর্ব্বুদ জন্মে। সর্ব্বপ্রকারেই সপ্রমাণ হয় যে, কুমার ১৯০৮ সালে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলেন। ঠিক কোনও সময়ে কুমার উপদংশে আক্রান্ত হন, যখন আমি পুনরায় এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিব, সেই সময়ে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইবে। বাদী বলেন, দার্জ্জিলিং যাইবার ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার উপদংশ হইয়াছিল। বিবাদীর ৯২নং সাক্ষী ফণীবাবু,—যাঁহার এ বিষয় জানা খুবই উচিত ছিল এই সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন,—বলেন, কুমারের দার্জ্জিলিং যাওয়ার তিন বৎসর পূর্ব্বে কুমারের উপদংশ হইয়াছিল। রাজ-পরিবারের ডাক্তার আশুতোষ দাসগুপ্ত, যিনি দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন এবং ঐ ব্যাধির ও তাহার চিকিৎসার সাক্ষ্য দিয়াছিলেন,—বলেন, ১৯০৭ সালে যখন তিনি সহকারী পারিবারিক ডাক্তার নিযুক্ত হন, তখনই তিনি কুমারকে উপদংশ ব্যাধিতে আক্রান্ত দেখেন। কখন কুমারের প্রথম উপদংশ হয়, তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

বিবাদী পক্ষের বক্তব্য

বিবাদী পক্ষের বক্তব্য এই যে, ঐ সময় হইতে কুমারের মধ্যে মধ্যে জ্বর হইত। পেটের যন্ত্রণাও তখন হইতেই হয়। কিন্তু বাদী পক্ষে তাহা স্বীকার করা হয় নাই। ১৯০৭ সালে অথবা অনুমিত মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত, একমাত্র উপদংশ ছাড়া কুমার অন্য কোনও ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন কি না, তাহা বাদীকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। বাদীর বক্তব্য এই যে, দার্জ্জিলিংএ তাঁহার পীড়িতাবস্থায় ডাঃ আশুতোষ যে ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সেই ব্যবস্থাপত্র সমর্থনের জন্যই ঐ সকল ব্যাধি বিবাদী পক্ষের উদ্ভাবনা। নিম্নোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে, আশু ডাক্তারের ঐ ব্যবস্থাপত্র সকলেই অস্বীকার করিয়াছেন। বাদীর বক্তব্য—আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত এবং রহস্যপূর্ণ মৃত্যুর কারণ সমর্থনের জন্যই বিবাদী পক্ষে কুমারের আন্ত্রিক বেদনার পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

মৃত্যু হইয়াছিল কিনা, সেই প্রসঙ্গ আলোচনার সময় এই বিষয়টিও আলোচনা করিব। কিন্তু ১৯০৭ সালে তাঁহার শুধু উপদংশই থাকুক, আর, তৎসহ অন্য দুইটি পীড়াই থাকুক তখন তাহাকে চলচ্ছক্তি রহিতের ন্যায় দেখাইতও না এবং তিনি চলচ্ছক্তি রহিতের ন্যায় আচরণও করিতেন না। তিনি শিকার করিতে যাইতেন ; তাঁহার স্বাভাবিক কাজকর্ম্মের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই।

এই সকল বিষয় একটু পরেই বর্ণনা করিতেছি। তখন তিনি গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইতেন, শিকারে যাইতেন, ঢাকা আসিতেন, এবং এই বৎসরই তিনি নবাব সলিমুল্লার সঙ্গে ১০০০৲ টাকার বাজীতে টমটম চালাইয়া ঐ বাজী জিতেন (বাদী পক্ষের ৬৭৬ ও ৮১৩নং সাক্ষীর সাক্ষ্য)। বিবাদী পক্ষও এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছেন যে, মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও অপরিচিত লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ণ স্বাস্থ্যবান লোক বলিয়া মনে করিত। ১৯০৮ সালে কতকগুলি ব্যাপার ঘটিতে থাকে ; কিন্তু ঐ সকল ঘটনা, এবং উহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি সম্যক বুঝিবার নিমিত্ত রাজপরিবারের ও কুমারদের তাৎকালিক অবস্থা এবং তাঁহাদের চালচলন কাজকর্ম্ম এবং নৈতিক চরিত্র বর্ণনা করিব।

এই সময় রাজপরিবারে ছিলেন তিন কুমার ও তাঁহাদের পত্নীগণ, কুমারদের তিন ভগিনী, প্রথম দুই ভগিনীর সন্তানগণ এবং কুমারদের পিতামহী রাণী সত্যভামা দেবী। আর ছিলেন কুমারদের পিসীমাতা কৃপাময়ী দেবী, তিনি তাঁহার স্বামী সহ কুমারদের আবালস্থলের পার্শ্ববর্ত্তী অংশে থাকিতেন ; তখন রাজকুমারীদের সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। বড় কুমারী ইন্দুময়ীর স্বামী গোবিন্দবাবু রাজবাড়ীতেই থাকিতেন ; তিনি এম-এ, বি, এল ছিলেন। কিন্তু নির্জ্জনে থাকিতেন, কাহারও সঙ্গে মেলামিশা করিতেন না। রাজবিলাসের দোতলায় ছিল অন্দরমহল ; তথায় রাজপরিবারের মহিলারা থাকিতেন ও শয়ন করিতেন। পর্দ্দাপ্রথা এমন কঠোর ছিল যে, নেহাৎ ছোট ছেলে না হইলে চাকরবাকরেরাও উপর তলায় যাইতে পারিত না। অবশ্য কুমারেরাই ছিলেন মালিক ; কিন্তু অন্দরমহলের কর্ত্রী ছিলেন, কুমারদের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইন্দুময়ী দেবী, (যেমন রাণী বিলাসমণি তাঁহার পূর্ব্বে অন্দর মহলের কর্ত্রী ছিলেন)। ছোটরাণীর কোনও কোনও পত্র হইতে দেখা যায়। ইন্দুময়ীকে তাঁহারা শাশুড়ীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন (একজিবিট ৩২০ ও ৩২৯) ১৯০৯ সালেও ছোটরাণী ঢাকা হইতে ইন্দুময়ীকে চিঠি লেখার অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বাড়ী নেওয়া হউক। (একজিবিট ৩২৭) সমস্ত নজর মহিলাদিগকে দেওয়ার নিয়ম ছিল। ইন্দুময়ী উহা রাখিতেন (একজিবিট ৩৩৭)। তাঁহার নিকট আমানতখানার চাবি থাকিত, আমানতখানা অন্দরের একটি ঘর, তথায় মূল্যবান্ দ্রব্যাদি রাখা হইত। বৌ'দের অলঙ্কারাদি তিনিই তৈয়ার করাইতেন এবং উহার ব্যয় এষ্টেট হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেন। (একজিবিট ৩২৪)। কুমারেরা ভগিনীদিগকে ভালবাসিতেন বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। (একজিবিট ৬৯ ও ৭১—বড় কুমারের পত্র) ; সমস্ত অবস্থা দৃষ্টে বুঝা যায়, ইন্দুময়ীই অন্দরের

কর্ত্রী ছিলেন ; মেজো রাণীর সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে যে সকল উক্তি করিয়াছেন, উহার কোনও উক্তি দ্বারা এই বিষয়ক সাক্ষ্যের বিন্দুমাত্রও ইতরবিশেষ হয় নাই।

রাজকুমারদের স্বভাবচরিত্রের কথা

বিবাদীপক্ষের সাক্ষী মিঃ মায়ার যাহাকে বলেন "উচ্ছৃঙ্খল জীবন", প্রত্যেক কুমার তদ্রূপ জীবনযাপন করিতেন। ১৯০৪ সালে যখন মিঃ মায়ার তাঁহার মনিব রাণী বিলাসমণির বিরুদ্ধে কালেক্টরের নিকট নালিশ করিয়াছিলেন, তখন বড়কুমারকে ভাল লোক বলিয়া মেজকুমার ও ছোটকুমারের সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"আপনি নিজেই জানেন মেজকুমার ও ছোটকুমারের সঙ্গে কিছু করা অসম্ভব। তাঁহারা সর্ব্বদা নীচ সংসর্গে থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গীরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার দুষ্কার্য্য কবিতে প্ররোচনা দেয়। মিঃ মায়ার বলেন, মেজ ও ছোটকুমারদের দ্বারা বিষয়কার্য্য করান সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাঁহারা লেখাপড়া প্রায় একটুও শিখেন নাই। মিঃ মায়ার ১৯০২ সালের নবেম্বর হইতে ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। সাক্ষ্যদানপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—বড়কুমার অত্যন্ত মদ্যপান করিতেন এবং বেশ্যাসক্ত ছিলেন। বড়কুমার নিশ্চয়ই খুব কম বয়সে ঐ সকল কুক্রিয়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন, এজন্য বড়কুমার আর বেশী দিন বাঁচিবেন না। সুতরাং উইল করা আবশ্যক মনে করিয়া মিঃ মায়ার ১৯০২ সালে কলিকাতায় তাঁহাকে পরীক্ষা করাইয়াছিলেন। মিঃ মায়ার বলেন, মেজকুমার ও ছোটকুমার ঠিক বড় কুমারের মতই মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত ছিলেন—যদিও এই মামলায় স্বীকার করা হইয়াছে যে, তাঁহাদের দুইজনের কেহই সুরাপান করিতেন না। সকলেই স্বীকার করেন, তাঁহাদের চরিত্র খারাপ ছিল, এবং উপদংশ হইতে মেজকুমারের চরিত্র যত খারাপ ছিল বলিয়া মনে হয়, তাঁহার চরিত্র তাহা অপেক্ষাও খারাপ ছিল। ম্যানেজার রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ রাজার মৃত্যুর পরও জয়দেবপুরে ছিলেন। তাঁহার পুত্র রায়বাহাদুর সারদাপ্রসন্ন ঘোষ বলেন, পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে মেজকুমার কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার পর তিনি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন। পিতৃবিয়োগের সময় তাঁহার বয়স ১৮ বৎসরেরও কম ছিল, তখনই তাঁহার চরিত্র খারাপ হয়। কুমারের মামা কেদারেশ্বর (বাদী পক্ষের সাক্ষী) বলেন ১৯০২ সালে বিবাহের পরও মেজকুমারের চরিত্র খারাপই ছিল। ১৯০২ সালের মে মাসে মেজকুমারের বিবাহ হয়। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে রাজবাড়ীর একটি ঘরেই তিনি

এলোকেশী নাম্নী একটি রক্ষিতা রাখিয়াছিলেন। এই কথার অনেক প্রতিবাদ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অবসরপ্রাপ্ত এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন রায় সাহেব আনন্দ গাঙ্গুলী ১৯০৩ সালের ঢাকা জেলের ডাক্তার ছিলেন। ঐ বৎসর তিনি চিকিৎসার জন্য আহূত হইয়া এলোকেশীকে দেখিতে ঢাকা জেলের নিকটস্থ বেগমগঞ্জে এক বাড়ীতে যান; তথায় তিনি দেখিতে পান, মেজকুমার এলোকেশীর শুশ্রূষা করিতেছেন। বলা হইয়াছে যে, এই স্ত্রীলোকটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু যাদব বসাক (বাদী পক্ষের ৯২০ নং সাক্ষী) বলেন, বাঙ্গালা ১৩১০ সনের মাঘ মাসে (ইংরাজী ১৯০৩, জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী) মেজকুমার ও ফণীবাবু (বিবাদীপক্ষের ৯২ নং সাক্ষী) এক পতিতালয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন দোল উপলক্ষে তাঁহারা যাদব বসাকের রক্ষিতা কুসুমের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, তারপর মেজকুমারও তাঁহাকে মেজকুমারের রক্ষিতা এলোকেশীর বেগমবাজারের বাড়ীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন; কিন্তু তাঁহার সাক্ষ্যের পরও বলা হইতে থাকে যে এলোকেশী সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র। তৎপর এলোকেশীর একখানা ফটো প্রমাণ করা হয়; কিন্তু তথাপি বলা হইতে থাকে যে, এলোকেশী কাল্পনিক। তারপর এলোকেশীকে হাজির করা হইল, কিন্তু বলা হইতে লাগিল, এলোকেশীর কাহিনী মিথ্যা। সর্ব্বশেষে বিবাদী পক্ষের একজন সাক্ষীই স্বীকার করিলেন যে, এলোকেশী রাজবাড়ীতে একবার নাচিতে গাহিতে গিয়াছিল, তারপর বিবাদী পক্ষের সাক্ষী ফণী বাবুও স্বীকার করিলেন যে, এলোকেশী নামে একজন বাইজী ছিল; সে রাজবাড়ীতে একবার নাচিতে গাহিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে রাজবাড়ীতে রক্ষিতা রাখা হইয়াছিল, এই কথা তিনি অস্বীকার করেন। তিনি আরও বলিলেন, তিনি পতিতালয়ে যানই নাই, মেজকুমারও যান নাই এই ফণীবাবু যে পুস্তক তৈয়ার করিয়াছিলেন, অথবা কিরূপ সাক্ষ্য দিতে হইবে, তাহা শিখাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পাঠ্যপুস্তকের ন্যায় যে পুস্তক তৈয়ার করা হইয়াছিল, সেই পুস্তকে ফণীবাবু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এলোকেশী মেজকুমারের অন্যতম রক্ষিতা ছিল। এই স্ত্রীলোকটি বলিয়াছে, বড়কুমারের পুত্রের জন্ম উপলক্ষে তাহাকে রাজবাড়ীতে নাচ গান করিতে নেওয়া হইয়াছিল ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে বড়কুমারের পুত্রের জন্ম হইয়াছিল এলোকেশী বলে, মেজকুমার তাহাকে নাচঘরের পূর্ব্ব দিকে দোতলায় একঘরে গোপনে রাখিয়া দেন ঐ ঘর রাজবাড়ীর উক্ত অংশের 'হাওয়াখানা' নামে পরিচিত। তারপর ১৯০৩ সালে একদিন তাহাকে তথায় দেখিতে পাওয়া যায়, সে বলিয়াছে যে, ছোটকুমারের বিবাহের কিছু পূর্ব্বে

তাহাকে তথায় দেখা গিয়াছিল, ইহাতেই বুঝা যায় যে, ১৯০৩ সালে তাহাকে তথায় দেখা গিয়াছিল। তার পর তাহাকে ঢাকা লইয়া গিয়া প্রথমে বেগমবাজারেএবং পরে চাঁদমারীতে এক বাড়ীতে রাখা হয়। মেজকুমারকে তথায় পদব্রজে যাইতে দেখা যাইত (উকীল নলিনীবাবুর সাক্ষ্য)।

মেজকুমারের শরীরের কতকগুলি চিহ্ন প্রমাণকল্পে এই বিষয়টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ; এই প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করিব। যাহা হউক, প্রায় ১৮ বৎসর বয়সেই এই যুবকের চরিত্র খারাপ ছিল ; বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার চরিত্র খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং বিবাহের পরই তিনি রক্ষিতা রাখিতে আরম্ভ করেন—যদি এই স্ত্রীলোকটি তাঁহার প্রথম রক্ষিতা হইয়া থাকে। ১৯০৩ সালে, ১৯০৪ সালের জুনমাস পর্যান্ত এবং ১৯০৫ সালের জুন হইতে ঐ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত তিনি বাজারের স্ত্রীলোক লইয়া নৌকাবিহারে যাইতেন। শুধু যে কয়দিন কলিকাতা ছিলেন সেই কয়দিন যান নাই। নৌকাবিহারে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন, মিঃ এন, নাগ (বাদী পক্ষের ৪৫৯নং সাক্ষী) এবং রাজেন্দ্র রায় (বাদী পক্ষের ৭৯২নং সাক্ষী) রাজেন্দ্র রায় গম্ভীর প্রকৃতির প্রাচীন লোক, ঢাকার লক্ষপতি। তাঁহারা কিরূপে মেজকুমারের সহিত পরিচিত হইলেন, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁহাদের এই সকল কাহিনী বর্ণনা করিতে হইয়াছিল। কলিকাতায়ও মেজকুমার ও ছোটকুমার এইরূপ স্ফূর্ত্তি করিতেন। ১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে মেজকুমার ১০০০০৲ টাকা কর্জ্জ করিয়া তাহার অধিকাংশ মালকাজান নাম্নী একটি স্ত্রীলোককে দেন (বীমার দালাল বাদী পক্ষের ৯নং সাক্ষী মিঃ জি, সি, সেনের সাক্ষ্য ; তিনিই ঐ কর্জ্জের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং খতে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করেন) মেজকুমার প্রায়ই বাড়ীতে থাকিতেন না। ছোট কুমারের চরিত্রও প্রায় ঐরূপ খারাপ ছিল। কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া বড়কুমার ১৯০৫ সালের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে সেক্রেটারী যোগেন্দ্রবাবুর নিকট লিখেন যে, তিনি যেন মেজকুমারের উপর নজর রাখেন ; কারণ তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল যে, মেজকুমার "কাহাকেও"—স্পষ্ট বুঝা যায় একটি স্ত্রীলোককে—জয়দেবপুর লইয়া যাইবেন। (একজিবিট ৩৭৫)।

১৯০৫ সালে শীতকালে কলিকাতা বেড়াইতে গিয়া তিনি ঐরূপ স্ফূর্ত্তি করেন ; ১৯০৭ সালের শীতকালে কলিকাতা বেড়াইতে গিয়াও ঐরূপ স্ফূর্ত্তি করেন। এইবার কলিকাতায় গেলে তথায় তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। ঢাকার বিশিষ্ট ভদ্রলোক মিঃ আবদুল মন্নানের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, ১৯০৮ সালের শীতকালও ঐরূপে কাটিয়াছিল। এই সকল সাক্ষ্য খণ্ডিত হইতে পারে বিবাদী

পক্ষে এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নাই এবং এই সকল সাক্ষ্যে এমন কিছু অসঙ্গতিও নাই যে, ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হইতে পারে। মিঃ মায়ার যে 'স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত' কথা বারবার ব্যবহার করিয়াছেন এবং ঢাকার তৎকালিক কালেক্টর মিঃ রেস্কিন যে তাঁহাদিগকে 'উচ্ছৃঙ্খল' বলিয়াছেন, উহা হইতেই ঐ দুইটি ঐ উক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। ঢাকার অন্যতম সিনিয়র উকিল রেবতীবাবু বলিয়াছেন, মেজকুমারের চরিত্র "জঘন্য" ছিল।

নিজ গৃহে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ

তাঁহাদের চরিত্র ছিল এই,—গৃহে তাঁহারা কিরূপ দৈনন্দিন জীবন-যাপন করিতেন, সাক্ষ্যে তাহাও সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। মহিলারা উপরতলায় অন্দরে থাকিতেন। কুমারেরা তাঁহাদের বৈঠকখানায় থাকিতেন। রাজবিলাসের নীচের তলায় সকলের পূর্ব্বদিকে মেজকুমারের বৈঠকখানা ছিল। উহার পিছনে একটি শয়নকক্ষ ছিল। উহার পিছনে একটি বারান্দা—মেজকুমার সাধারণতঃ তথায় আহার করিতেন। উহার উত্তরদিকে ছিল তাঁহার বাথরুম। তথায় ছিল দুইটি শৌচাগার, এবং একটি জলের কল, ছোট কুমারের বৈঠকখানা ছিল রাজবিলাসের নীচের তলায় সকলের পশ্চিম দিকের ঘর, উহার উত্তরের দিকের ঘরে ছোট কুমার আহার করিতেন। উহার উত্তরের দিকের ঘরে তাঁহার শুইবার ঘর ছিল এবং ঐ শয়নকক্ষের পিছনে ছিল বাথরুম। বিল্ল ও সাগর সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে এই বর্ণনা দিয়াছেন। (উভয়েই বাদীপক্ষের সাক্ষী) বিল্লকুমারের ভাগিনেয়; কুমারেরা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিনই বিল্ল রাজ বাড়ীতে ছিলেন এবং ১৯০৩ সালে বিবাহের পর হইতে সাগরও জয়দেবপুরে গিয়া রাজবাড়ীতে বাস করিতেন এই বর্ণনার কোনও বিষয় বিবাদীপক্ষ অস্বীকার করেন নাই। তবে তাঁহারা বলিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ণিত ঐ শয়নকক্ষ বাস্তবিক শয়নকক্ষ ছিল। কুমারেরা রাত্রিতে তথায় শুইতেন, উহা বিশ্রামাগার ছিল, বিবাদীপক্ষ আরও বলিয়াছেন, মেজকুমারের বাথরুম যেখানে ছিল বলিয়া বিল্ল ও সাগর বলিয়াছেন, উহা তথায় ছিল না, মেজরাণী বলিয়াছেন, রাজ বিলাসের উপরের তলায় প্রত্যেক রাণীর শয়নকক্ষ ছিল, কুমারেরা রাত্রিতে তথায় রাণীদের সহিত শয়ন করিতেন এবং দুপুর বেলায়ও তথায় নিদ্রা যাইতেন, শুধু তাঁহারা বৈঠকখানার নিকটবর্ত্তী বিশ্রাম ঘরে দিবা-নিদ্রা যাইতেন। বড়কুমারেরও ঐরূপ একটী বৈঠকখানা ছিল, বৈঠকখানার নিকট শুইবার

ঘর ছিল, তাঁহারও ঐরূপ বাথরুম ছিল; এবং তাঁহার শুইবার ঘরের বিপরীত দিকে তাঁহার খাবার ঘর ছিল। এক কথায় বলা যায়, প্রত্যেক কুমারের নিজস্ব বৈঠকখানা, শুইবার ঘর, খাবার ঘর এবং বাহিরের বাড়ীতে নিজ নিজ চাকরদের থাকার ঘর ছিল; মেজরাণী যে বলিয়াছেন, কুমারেরা উপরতলায় শুইতে রাণীদের সঙ্গে কিছু সময় অবস্থান করিতেন, অর্থাৎ সুখময় দাম্পত্য জীবনের যে চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সত্য নহে। তাঁহার মা ও ভগিনী কর্ত্তৃক লিখিত কয়েকখানা পত্র তাঁহাকে দেখান হইলে, তাঁহার অঙ্কিত ঐ চিত্র বিলীন হইয়া গিয়াছিল (একজিবিট ৩০০, ৩০৩, ২৯৩, ২৯৩, ৩০২, ৩০৪) মেজরাণীর বিবাহিত জীবনের আগাগোড়াই তাঁহার মা ও ভগিনী ঐরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন. পত্রে দেখা যায় মাতা তাহার জন্য সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতেন। পত্রে আরও দেখা যায়, তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মেজকুমার মেজ রাণীর সহিত ভাল ব্যবহার করেন কিনা, (মেজকুমার স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনকে ঘৃণা করিতেন বলিয়া) ঐ সকল পত্রে দেখা যায়, দিনের বেলা মেজকুমারের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছে কিনা, যদিও মেজরাণীর মা জানিতেন যে, ভাওয়াল রাজবাড়ীতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দিনের বেলা সাক্ষাৎ অত্যন্ত নির্লজ্জতা বলিয়া নিন্দিত ছিল। মেজরাণীর ভগিনী মেজরাণীকে এক পত্রে উপদেশ দিয়াছেন যে, তিনি যেন ভাল কাপড় চোপড় পরেন। যেন হাসিমুখে থাকেন এবং মেজকুমার উপরে শুইতে না গেলে যেন নিজেই নীচে মেজকুমারের নিকট শুইতে যান।

মেজকুমারের পুরাতন খানসামা প্রতাপ, তাহাকে নস্যাও ডাকা হয়, (বাদী পক্ষের ৪৮নং সাক্ষী) এবং প্রভাত (বাদী পক্ষের ৫২নং সাক্ষী) বলিয়াছে যে, কুমারদের প্রত্যেকেই বৈঠকখানা ঘরের সংলগ্ন শয়ন কক্ষে নিদ্রা যাইতেন। রাণীদিগকে ডাকিলেই তাঁহারা তথায় যাইতেন—যদিও বড়কুমার কখনও কখনও উপরের তলায় তাঁহার স্ত্রীর সহিত শয়ন করিতেন বলিয়া মনে হয়, প্রতাপ ও প্রভাত সত্য কথাই বলিয়াছে। মেজরাণীর সম্পর্কে ঐ দুইজন পুরাতন খানসামা বলিয়াছে যে তিনি মাঝে মাঝে স্বামীর নিকট আসিতেন এবং রাত্রিতে বালক বিপিন খানসামা (বিবাদী পক্ষের ১৪০নং সাক্ষী) দ্বারা ডাকাইয়া পাঠান হইলেই' তিনি আসিতেন। একটী সিড়ি ছোট কুমারের বৈঠকখানার দিকে নামিয়া আসিয়াছে, দ্বিতীয় রাণী ও তৃতীয় রাণী ইহা অস্বীকার করিয়াছেন বিবাদী পক্ষের সাক্ষী (২১নং) ছোটকুমারের খানসামা রুক্মিণী (বিবাদী পক্ষের ৪১নং সাক্ষী), পাখাওয়ালা মদন মোল্লা এবং

ইন্দুময়ীর ভৃত্য হরেন্দ্র (বিবাদী পক্ষের ৩৮৬নং সাক্ষী), বীরেন্দ্র (যিনি ১৯০৮ সালে মেজকুমারের পার্সন্যাল ক্লার্ক নিযুক্ত হন এবং বিবাদী পক্ষের ২৯০নং সাক্ষী) এবং মেজরাণীর খানসামা বিপিন ইহা অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহারা বৈঠকখানার নিকটবর্ত্তী শয়নকক্ষে শুধু একটী বিশ্রামাগার ছিল, বলিয়াছে। মেজরাণীর ভাই সত্যেন্দ্র বাবু ইহাও বলিয়াছেন যে, তিনি জয়দেবপুর আসিলে বৈঠকখানার সংলগ্ন শয়নকক্ষে শয়ন করিতেন। কিন্তু বাদী পক্ষের সাক্ষী ভগ্নী, বিল্লু, সাগর এবং কুমারের দুইজন খানসামা এই সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অপর পক্ষেব সাক্ষীদের উক্তি দ্বারা অনেকটা সমর্থিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিবাদী পক্ষের একজন সাক্ষী (বিবাদী পক্ষের ৪১নং সাক্ষী—যে নীচের শয়নকক্ষে পাখা টানিত) স্বীকার করিয়াছে যে, দিনের বেলা মেজকুমার কদাচিৎ উপরের তলায় যাইতেন। দার্জ্জিলিং যাত্রীদের অন্যতম বীরেন বাবু যাঁহার উক্তি অত্যন্ত সন্দেহজনক,—পরে তাহা দেখান হইবে) তিনি বলিয়াছেন যে, মেজকুমার কখনও নীচের শয়নকক্ষে কখনও উপরে শয়ন করিতেন। বিবাদী পক্ষের ৪১নং সাক্ষী ইহাকে কুমারের শয়নকক্ষ বলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, কুমার সাধারণতঃ তথায় শয়ন করিতেন না, উপরের তলায় শয়ন করিতেন, বড়কুমারের একজন বৃদ্ধ খানসামা বলিয়াছে যে, তিনি কখনও তাঁহার বৈঠকখানাব সংলগ্ন শয়নকক্ষে কখনও অন্দরে শয়ন করিতেন। একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, বর্ত্তমানে মেজকুমারের এই ঘর এবং বড়কুমারের শয়নকক্ষ তাঁহাদের স্মরণার্থে রাত্রিতে আলো ও ধূপধুনা দেওয়া হয়, আসবাবপত্রের ধূলা ঝাড়া হয়, ঘর ঝাঁট দেওয়া হয়; ইহা দ্বারা দেখান হইয়াছে যে এই সব ঘর তাঁহাদের স্মৃতির সহিত জড়িত, কিন্তু উপরের কোন ঘর নহে।

কুমারেরা বাহিরের বাড়ীতে বাস করিতেন, বাহিরেব বাড়ীতে শয়ন করিতেন এবং বাহিরের বাড়ীতে আহার করিতেন। তাঁহাদের স্ত্রীদের অথবা অন্য কোন মহিলাদের খাওয়ার সহিত কোন সংস্রব ছিল না। পুরাতন খানসামা (বাদী পক্ষের ৩৮নং সাক্ষী) বলিয়াছে যে, বাড়ীর মহিলারা কুমারদের আহারের তত্ত্বাবধান করিতেন না। খানসামারাই করিত, কিন্তু ইহা স্বীকার করা হয় নাই। বিবাদী পক্ষে যে-সব ভৃত্য সাক্ষ্য দিয়াছে তাহারাও ঐ কথাই বলিয়াছে। প্রত্যেক কুমারের ১৫।২০ জন করিয়া খানসামা, দুইজন করিয়া বেয়ারা, ৪ জন করিয়া পাখাওয়ালা এবং একজন করিয়া আর্দ্দালী ছিল। খানসামাগণ চা তৈরী করিত, পান, তামাক সাজাইয়া দিত, (কুমারেরা

তামাক খাইতেন), কুমারদের আহারের জন্য আসন পাতিয়া দিত, তাঁহাদিগকে স্নান করাইয়া দিত, কাপড় ধুইয়া দিত এবং বেয়ারাগণ তাঁহাদিগকে পোষাক পরিতে সাহায্য করিত। মেজকুমার তাঁহার শয়নকক্ষের উত্তর দিকস্থ বারান্দার মেজেতে বসিয়া আহার করিতেন। অন্দরের পাকশালা, বাবুর্চ্চি খানা এবং অস্থায়ী কি স্থায়ী গোছের একটি রান্নাঘর হইতে (যেখানে খানসামারাও পাক করিত) মেজকুমারের জন্য খাবার আসিত। তিনি হাত দিয়া খাইতেন, কাঁটা চামচের সাহায্যে খাইতেন না, প্রত্যেক কুমারের সম্পর্কেই উহা সত্য। উভয় পক্ষের সাক্ষীদের (বিবাদী পক্ষের ৯৮, ১৪০, ২৯০, ৩৭৭, ৩৮৬, ২১, ৪১, ৪৩, ৩১০ নং সাক্ষী এবং বাদী পক্ষের ৯৩৮, ৪৭৭, ৬৬০ এবং ৯১৭নং সাক্ষী) উক্তি হইতেই ঐ সব কাহিনী এই পর্য্যন্ত সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে কোন বিতর্ক উপস্থিত হয় নাই ; কিন্তু যখন বাদী পক্ষের ৯৭৭নং সাক্ষী কাঠগড়ায় ওঠে, তখন কোন প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে খাবার ঘরের পরিবর্ত্তে (যেখানে কুমার মেজেতে বসিয়া হাত দিয়া খাইতেন) ডাইনিং রুম কথাটা আসে—যেখানে কুমার হাত দিয়া খাইতেন না, কাঁটা চামচ দিয়া সাহেবী খানা খাইতেন ; সঙ্গে সঙ্গে 'কাটলারী', 'ক্রোকারি', 'নেপারি' এবং 'মেনু' শব্দের আমদানী হয় এমন কি "লিভারী" ও "সান্ধ্য পোষাকের" অস্পষ্ট ইঙ্গিতও করা হইয়াছে। কুমারেরা সাহেবী খানা জানিতেন কি না এবং সাহেবী ধরণে তাহা খাইতেন কি না তৎসম্পর্কে আমি পরে বাদীর জেরা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব এবং ঐসব জিনিস সম্পর্কে কুমারের জ্ঞানের মাত্রা কতটা ছিল শুধু তাহাই নহে, তিনি তাহার ইংরেজী নাম জানিতেন কিনা তৎসম্পর্কে আমি ঐসময় আলোচনা করিব। কুমারদের সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে এখন স্বীকার করা হইয়াছে যে, মেজকুমার সাধারণতঃ বাঙ্গালীর মত পোষাক পরিতেন। তিনি কাপড় দোভাঁজ করিয়া লুঙ্গির মত তাহা পরিতেন, অথবা বাহিরে যাইবার সময় তিনি ব্যানিয়ানও পরিতেন। তাঁহার ভগ্নী বলিয়াছেন যে, তিনি লাল, হলুদ ও বেগুণী রংএর চটকদার পোষাক ব্যবহার করিতে পছন্দ করিতেন এবং চন্দ্রশেখরবাবুও (বাদী পক্ষের ৯৫৯নং সাক্ষী) লুঙ্গির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মেজরাণী কখনও তাঁহাকে লুঙ্গি পরিতে দেখেন নাই বলিয়াছেন। ফণী বাবু (বিবাদী পক্ষের ৯২নং সাক্ষী) রেশমী লুঙ্গির কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং যখন দর্জ্জির বিল উপস্থিত করা হইল, তখন অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বে রায়সাহেবও (বিবাদী পক্ষের ৩১০ নং সাক্ষী) বেগুণী রংয়ের লুঙ্গির কথা স্বীকার করেন। 'অনিচ্ছা

সত্ত্বে' একথা বলিবার কারণ এই—লুঙ্গি পরার কথা সাহেবী পোষাকের সহিত খাপ খায় না। তৃতীয় কুমার ঢিলা পায়জামা পছন্দ করিতেন এবং বড়কুমার সাধারণভাবে ধুতি পরিতেন। শুধু সাহেব অথবা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী-দের সঙ্গে দেখা করিতে হইলে তাঁহার সাহেবী পোষাক পরিতেন। এ পর্যান্ত কোন বিতর্ক নাই। (বিবাদী পক্ষের ৭নং সাক্ষী রাণী, বিবাদী পক্ষের ২৯০ নং সাক্ষী বীরেন্দ্র, ২১ নং সাক্ষী রুক্মিণী এবং ৪১ নং সাক্ষী পাখাওয়ালার সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য)।

বিবাদী পক্ষ শুধু এই কথা বলিতে চাহিতেছেন যে, শিকারে বাহির হইবার সময় কুমার সাহেবী পোষাক পরিতেন, অথবা খাকী শিকারের পোষাক পরিতেন। বাদী পক্ষ ইহা অস্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিতে চাহিয়াছেন যে, সব শিকারের সময়ই কুমার এইরূপ পরিতেন না, শুধু ব্যাঘ্র শিকার অথবা ঐরূপ কোন শিকারের সময় ঐ পোষাক পরিতেন। কুমার সাহেবী পোষাক অথবা বিভিন্ন পোষাক সম্পর্কে কিরূপ জ্ঞান ছিল অথবা ঐসবের নাম তিনি জানিতেন কি না তৎসম্পর্কে আমাকে আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু ব্যাঘ্র-সহ একটা ফটোতে আমি তাহাকে ধুতি পরিহিত অবস্থায় দেখিতেছি।

মেজকুমারের দৈনন্দিন অভ্যাস ও সাধারণ কাজকর্ম্ম সম্পর্কে বাদীপক্ষ যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। উহাতে একমাত্র রাণীর উক্তি ভিন্ন আর কিছুই খণ্ডন করিবার নাই।

কুমারের ভগ্নী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী কুমারের ছেলেবেলা হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী জীবনের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই :—

বাল্যকালে দ্বিতীয় রাজকুমার দুর্দ্দান্ত ও একগুঁয়ে ছিল, কিন্তু বড়কুমারও ছোটকুমার সেইরূপ ছিল না। পাঁচ বৎসরের সময় তাহার হাতে খড়ি হয় এবং দ্বারকানাথ মুখার্জ্জির অধীনে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয় দুই বৎসর পর ও ঐ শিক্ষকের অধীনেই তিনি পড়াশুনা করেন। মাঝখানে আর একজন শিক্ষকও ছিলেন এবং ইহা দেখা দরকার এই সব শিক্ষকদের চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছিল। ঐ সব শিক্ষকের শিক্ষাকার্য্য যখন চলিতেছিল তখন অন্যান্য বালকদের মত সে ছাগল, পাতি হাস, ভেড়া, কবুতর, ইত্যাদি লইয়া খেলা করিত। ফলে ১৯০১ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর সে দুইটা ব্যাঘ্র, দুইটা চিতাবাঘ, দুইটা ভল্লুক, একটা সাদা শিয়াল, একটা উটপাখী, তিনটা তিতিরপাখী, এবং দুইটা ওরাংওটাং সংগ্রহ

করে। ১৯০৪ সালে এষ্টেট প্রথম কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে গেলে মিঃ হাড উহা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন।

চালচলন

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে মোটর গাড়ী চালাইত, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিত, টমটম চালাইত, হস্তিপৃষ্ঠে উঠিয়া বেড়াইত, সে শিকার ভালবাসিত, ইহা উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়াছেন। ভাওয়ালে বনের অভাব ছিল না এবং যথেষ্ট শিকার মিলিত। সে প্রতিদিন অথবা প্রায়ই হস্তিপৃষ্ঠে বন্দুক লইয়া বাহির হইত এবং শূকর, হরিণ, শিয়াল, খরগোস এবং ব্যাঘ্রও শিকার করিত। সে ভাল শিকারী একথা উভয়পক্ষই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যে ভাল ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন, বাদীপক্ষ তাহা বলিয়াছেন।

সে প্রতিদিন প্রাতঃকালে চা পান করিত এবং বিস্কুট ও রুটি খাইত। ইহার পর আস্তাবলে যাইয়া ঘোড়া, পিলখানায় যাইয়া হাতী, এবং গো-শালায় যাইয়া গরুর তত্ত্বাবধান করিত। বহু সাক্ষী কুমারকে আস্তাবলে অথবা পিলখানায় দেখিয়াছে। তাঁহাকে সাধারণতঃ ঐ সব স্থানে পাওয়া যাইত (বাদীপক্ষের ১৮, ২৯, ২, ৩, ৮, ৫৭৩, ৯৫৯নং সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য) এই সম্পর্কে সমস্ত সাক্ষীর তালিকা দিবার প্রয়োজন নাই। কারণ কেহ ইহা অস্বীকার করেন নাই এবং আশুতোষ ডাক্তারও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

বিবাদীপক্ষের ৬১নং সাক্ষী মাহুত আমানুল্লা স্বীকার করিয়াছে যে, সাধারণতঃ নিম্ন শ্রেণীর লোক কুমারের সঙ্গী ছিল না। মেজকুমার প্রাতঃকালে পিলখানায় আসিতেন এবং মাহুত হাতীর প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের আদেশ আনিতে যাইত, অথবা কোন হাতীর অসুখ হইলে তাহা তাহাকে বলিতে যাইত।

যদি দ্বিতীয় কুমার পিলখানা, অশ্বশালা ও বাথান প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, যদি ২০টী হাতীর মাহুত, ৪০টি ঘোড়ার সহিস, কোচ্‌ম্যান, যতদিন চিড়িয়াখানা ছিল ততদিন চিড়িয়াখানার কর্ম্মচারীবৃন্দ আদেশ লইবার জন্য কুমারের নিকট আসিতেছিল, তাহা হইলে কুমার নিম্নশ্রেণীর লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন, এই প্রমাণের মধ্যে সত্য আছে বলিতে হইবে। এই সমস্ত লোককে কুমারের সঙ্গী বলা যাক কিম্বা না যাক, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

এই সমস্ত লোককে বাদ দিলে স্বাভাবিক সঙ্গী কাহারা ছিল? নিম্নস্তরের একদল যুবক, যাহারা নিজেদিগকে কুমারের কেরাণী বলিয়া

পরিচয় দিত। ইহাদের মাত্র একজন লোক (বীরেন্দ্র, বিবাদীপক্ষের ২৯০নং সাক্ষী) কুমারের ব্যক্তিগত কেরাণী বলিয়া ভাওয়াল এষ্টেট হইতে বেতন পাইত। ফণীবাবু বলেন,—দ্বিতীয় কুমার জয়দেবপুরের কতিপয় ভদ্রলোক, তাঁহার ব্যক্তিগত কর্ম্মচারীবৃন্দ এবং এষ্টেটের কয়েকজন কর্ম্মচারীর সহিত মিশিতেন। বিবাদী পক্ষের ৩৮৬নং সাক্ষী হরেন্দ্র কর্ত্তৃক উল্লিখিত কর্ম্মচারীদের মধ্যে বীরেন্দ্র (বিবাদী পক্ষের ২৯০নং সাক্ষী), সাক্ষীগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালী সাহেব বলিয়া বর্ণিত তিনজন দেশীয় খৃষ্টান এণ্টনি মরেল, এডুইন ফ্রেজার, ম্যাকবিন এবং মনি সাহেব নামক আরও একজন বাঙ্গালী সাহেব, কেরাণী বাবুগণ বলিয়া বর্ণিত অন্যান্য লোকগণ ছিলেন। এতদ্ভিন্ন আরও দুইজন—নিক্কার পুত্র অবনী এবং পোলাসানার নিশি ডাক্তারের পুত্র অবনীর নামও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা দুইজন হইতেছে বিবাদীপক্ষের সাক্ষী। প্রথমোক্ত অবনী জয়দেবপুরের অধিবাসী। সে তাহার নিজের শিক্ষা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, পিতার মৃত্যুর পর আর সে দ্বিতীয় কুমারের সহিত মেলামেশা করিতে পারিত না। বর্ত্তমানে সে ভাওয়াল এষ্টেটের অন্যতম নায়েব; বীরেন্দ্র এখন রেকর্ড কিপার। অবনীদ্বয়ের মধ্যে উভয়েই ২৫ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক ছিল। বীরেন্দ্র জয়দেবপুরেরই লোক। ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সে দ্বিতীয় কুমারের অধীনে চাকুরীতে যোগদান করে। সে বলিয়াছে যে, তাহার বেতন ৩০ টাকা ছিল, কুমারই এই টাকা দিতেন, এষ্টেট হইতে ইহা দেওয়া হইত না। কুমারের আশেপাশে যে সকল যুবক থাকিত তাহাদের মধ্যে একমাত্র ম্যাকবিনই এষ্টেট হইতে মাহিনা পাইত। সে কুমারের হিসাবপত্র রাখিত। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে অর্থাৎ ১৯০৯ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে ম্যাকবিনের মৃত্যু হইলে মুকুন্দ গুণ কুমারের ব্যক্তিগত কেরাণীর পদে নিযুক্ত হয়। দার্জ্জিলিংএ কিন্তু মুকুন্দ গুণ কুমারের প্রাইভেট সেক্রেটারী পদবী গ্রহণ করিয়াছিল।

মেজকুমারের সঙ্গিগণের কথা

এই সমস্ত যুবকই কুমারের সঙ্গী ছিল; সত্যবাবু বলেন, ইহারা কুমারের উপর নির্ভরশীল 'পরগাছাবিশেষ।' তাহারা কুমারের ব্যক্তিগত কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিত। নিম্নস্তরের এক দল যুবক, যাহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় "মোসাহেব" বলা যায়। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ ধনী যুবকের আসে পাশে আসিয়া সমবেত হইয়া থাকে।

মিঃ মেয়ার তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন,—"কুপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট এক দল সঙ্গী সর্ব্বদা তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকে, তাহারা সর্ব্বদা তাহাদিগকে বঞ্চনা করে এবং সর্ব্ব প্রকারের বোকামির কাজ করিতে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করে।" প্রকৃত পক্ষে মিঃ মেয়ার এই সকল সঙ্গীর কথাই বলিয়াছিলেন। কুমারের সঙ্গীবৃন্দের স্বরূপ এই। বিবাদী পক্ষের ৯নং সাক্ষী ফণীন্দ্রবাবু ব্যতীত আর কোন ভদ্রলোকের নাম কুমারের সঙ্গীবৃন্দের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমি যখন ফণীবাবুর সাক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করিব, তখন দেখা যাইবে, কুমারের প্রকৃতি কিরূপ ছিল এবং এই মামলায় তাঁহার দ্বারা কিরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

১৯০৮ সালে কুমারগণ সকলেই ২০ বৎসর বয়সের মধ্যে ছিলেন; কিন্তু তখনই তাঁহারা একেবারে উচ্ছৃঙ্খল যুবকে পরিণত হইয়াছিলেন। বড় কুমার ছিলেন বদ্ধ মাতাল, তৃতীয় কুমার মদ্যপান না করিলেও এতদপেক্ষা বড় ভাল ছিলেন না এবং দ্বিতীয় কুমার ১৯ বৎসর অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই লাম্পট্যে পরিপক্ব, দুশ্চরিত্র এবং উপদংশ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই উপদংশ আবার দুষ্ট ক্ষতে পরিণত হইয়াছিল। দ্বিতীয় রাণী নিজেই বলিয়াছেন, ১৯০৬ সালে তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হয়। ইন্দুমতি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। এই ইন্দুমতির পত্রে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় রাণী তখনও উপদংশের সংক্রামতা-বিমুক্ত ছিলেন এবং রক্তাল্পতা রোগে ভুগিতেছিলেন বলিয়া ডাক্তারগণ ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিবাদী পক্ষের সুবিজ্ঞ কৌসুলী মিঃ চৌধুরী এই পত্রের বিষয় ও চিকিৎসার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী নিশ্চয়ই কুমারের উপদংশ রোগের কথা জানিতেন এবং সাক্ষ্যে যে তিনি বলিয়াছেন, কুমার দার্জ্জিলিং গেলে পর সত্যই তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, ক্ষতগুলি সাধারণ ক্ষত নয়, বিষাক্ত দুষ্ট-ক্ষত, ইহা ছলনা মাত্র। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এমন কথা বলেন নাই যে, তিনি উপদংশ রোগের কথা জানিতেন না; তবে এই উপদংশের ফলেই ক্ষত দেখা গিয়াছে, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার ন্যায় আরও অনেকেরই এ বিষয়ে অজ্ঞতা ছিল।

১৯০৮ সালে পূর্ব্বের ন্যায়ই তিন রাণী কঠোর পর্দ্দা প্রথার মধ্যে অন্দর মহলে বাস করিতেছিলেন; কেহ তাঁহাদের নিকট যাতায়াত করিতে পারিত না; তাঁহারা অন্যান্য স্ত্রীলোকদের মধ্যে বয়স্থা মহিলাদের তত্ত্বাবধানে রাজবাড়ীর আত্মীয় স্বজনের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছিলেন। এদিকে তাঁহাদের স্বামিগণ বাহিরেই বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের শয়ন, ভোজন,

রাত্রিযাপন—সমস্তই বাহিরে চলিতেছিল। কুপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট মোসাহেব-শ্রেণীর একদল লোক সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া থাকিত, বহু চাকর তাহাদের ফরমাইসে খাটিত; যেমন খুসী আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রচুর অর্থ তাঁহাদিগকে দেওয়া হইত। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে জেরা করিবার সময় মিঃ চৌধুরী বলেন,—১৯০৯ সালে কুমারগণ তাহাদের পরিবারের জন্য ৮০ হাজার টাকার গহনাপত্র ক্রয় করিয়াছিলেন। সত্য সত্যই গহনাপত্র ক্রয় করা হইয়াছিল; তবে এই গহনা ক্রয়ের ব্যাপারে শেষ পর্য্যন্ত একটা মামলায় ডিক্রি হইয়াছিল। এই গহনা কিন্তু কুমারদের পত্নীগণ পান নাই। রাণী নিজেই একথা বলিলেন। গহনা যদি রাণীদের জন্যই হইত, তাহা হইলে বড়রাণী যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা লিখিত হইত না, এবং বিবাদিগণ স্বয়ং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বালিকাদের কথা উত্থাপন করিতেন না। এই বালিকাদের জন্য ৭০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে, একরূপ বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এমন কোন প্রমাণই নাই যাহাতে বলা যায় যে, দ্বিতীয় কুমার কখনও তাঁহার স্ত্রীকে কোন কিছু উপহার দিয়াছেন; সর্ব্বোপরি দ্বিতীয় কুমারের উপদংশ রোগ হইল; এই রোগ সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল, এবং কুমারের দুষ্ট ক্ষত উৎপন্ন হইল। সন্তানহীনা এই ভদ্র মহিলার (মেজরাণীর) অল্পকাল স্থায়ী বিবাহিত জীবনের মধ্যে আমি এমন কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, যাহার কথা স্মরণ করিয়া তিনি সুখ অনুভব করিতে পারেন। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিবার পর হইতে এই মামলার শুনানী আরম্ভ হইবার সময় পর্য্যন্ত আমি কোন দিক দিয়াই এমন কোন কিছু দেখিতে পাইতেছি না, যাহার সংস্রব অথবা স্মৃতি তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর গৃহের দিকে আকৃষ্ট করিতে পারে।

তিনি তাঁহার বিবাহিত জীবনের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সত্য নহে। যে সমস্ত তথ্য কাহারও বিশ্বাস-প্রবণতার উপর নির্ভর করে না, এমন কি তাঁহার ভগিনীর পত্রে প্রদত্ত মর্ম্মস্পর্শী উপদেশাবলীরও অপেক্ষা রাখে না, সেই সমস্ত তথ্য দ্বারাই এই চিত্র অপসারিত হইয়াছে। ১৯১১ সালে তিনি যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিজেই কুমারদের অপরিমিত অভ্যাস ও অমিতব্যয়িতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে,তাহাদের প্রত্যেকের আয় এক লক্ষ টাকা হইলেও অমিতব্যয়িতার ফলে ভাওয়াল এষ্টেট ক্রমশঃ ঋণগ্রস্ত হইতেছে।

কুমারদের অভ্যাস ও নৈতিক চরিত্র ছাড়াও তাঁহাদের আচরণ এবং বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে বহু প্রমাণ রহিয়াছে। দ্বিতীয় কুমার ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলা-

মেশা করিতে লজ্জা বোধ করিতেন। তবে যখন তিনি ভদ্রলোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন তখন কিরূপ আচরণ করিতে হয় তাহা জানিতেন।

বিশিষ্ট সাক্ষী

(বাদী পক্ষের ৩২৬ নং, ১৬৭ নং, ২৬২ নং এবং ৩০২ নং সাক্ষী) এই বন্ধনীর মধ্যে যে সকল সাক্ষীর কথা বলিয়াছি তাহারা হইতেছেন, ২৪ পরগণার কোনও গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের সহকারী হেডমাষ্টার চারুচন্দ্র দাসগুপ্ত, ময়মনসিংহের জমিদার হরেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, জয়দেবপুর স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সহকারী হেডমাষ্টার যোগেশচন্দ্র রায়, ঢাকার একজন সম্মানিত নাগরিক রমেশচন্দ্র চৌধুরী। এই প্রশ্নটি সম্পর্কে যাহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন, ইহারা হইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন। আমি আরও দুইজন সাক্ষীর উক্তির বিষয় এখানে উল্লেখ করিব। তাঁহাদের মধ্যে একজন হইতেছেন, মিঃ ষ্টিফেন, ঢাকার পাট-ব্যবসায়ী ; ঢাকাতে ইনি কুমারদের প্রতিবেশী ছিলেন।

মেজকুমারের চালচলন কিরূপ ছিল

তিনি সাক্ষ্যে বলেন,—'দ্বিতীয় কুমারকে বুদ্ধিমান বলিতে পারেন না, তবে কুমার নির্ব্বোধ ব্যক্তিও ছিলেন না। তাহাকে একটুখানি বোকা বলা যাইত বটে, তবে তাহার চালচলন রাজার ছেলের মতই ছিল।' একথা সত্য যে, রাজার ছেলের চালচলন আরও একটু ভাল হওয়াই উচিত ছিল। বাদী পক্ষের ৩২০ নং সাক্ষী রমেশচন্দ্র চৌধুরী বলেন,—'কুমার নির্ব্বোধ ছিলেন না ; কোন কোন বিষয়ে—যেমন সাহিত্য চর্চ্চায় তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলা চলিত ; কিন্তু অশ্বারোহণ, গাড়ী চালনা, হস্তী আরোহণে, তিনি বেশ বুদ্ধিমানই ছিলেন বলাযায়। বিবাদী পক্ষের ৪৬১ নং সাক্ষী মিঃ পি সি গুপ্ত বিলাতে শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার, মর্য্যাদাসম্পন্ন লোক। তিনি বলেন, 'মেজো কুমার বুদ্ধিমান লোক ছিলেন না, তিনি নেহাৎ বোকাও ছিলেন না, মার্জ্জিত রুচির লোক না হইলেও খোলাসা মেজাজের লোক ছিলেন। সমাজে মিশিবার যোগ্যতা না থাকিলেও সাধারণ ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার যোগ্যতা তাঁহার ছিল। রাজার ছেলের মত শিষ্টতা তাঁহার ছিল না, কোনও ভদ্রলোককে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতেন না। এইরূপ আদব-কায়দা আমি তাঁহার নিকট প্রত্যাশা করিতাম না। তিনি অনেকটা লাজুক ছিলেন। সাধারণতঃ রাজ-প্রাসাদের ভিতরেই থাকিতেন ; ভৃত্য, কোচম্যান, মাহুত ও সহিস প্রভৃতির সঙ্গে মিশিতেন। দ্বিতীয় কুমার ভদ্রলোকের নিকট যাইতে লজ্জা বোধ

করিতেন এবং তাহাদের এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন।' এই ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকের সহিত দ্বিতীয় কুমারের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহাদের পরিবার মধ্যে পরস্পরের যাওয়া আসাও চলিত। বয়সের পার্থক্য থাকিলেও কেবল তাঁহারই সাক্ষ্যের উপর এবিষয়ে নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই। বহু সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে এবং তাঁহার সম্পর্কে পরিজ্ঞাত অন্যান্য তথ্য হইতে ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কুমার যদি শিক্ষিত হইতেন, তিনি যদি ইংরাজী জানিতেন এবং (কমিশনে সাক্ষ্য লইবার সময় মিঃ চৌধুরী যেমন মিঃ ঘোষালকে বলিয়াছিলেন) শিক্ষিত ভদ্রলোকের ন্যায় সবলতা যদি তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ ধারণা ভুল হইত। আমি যখন কুমারের বর্ণবিষয়ক জ্ঞান ও ভাষা জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করিব, তখন আমি দেখাইব যে, সাক্ষ্য প্রমাণ—বিবাদিগণের নিজেদের সাক্ষ্যাদির উপরও নির্ভর করিয়া এই বিষয়ে বিসম্বাদ করা চলে না।

মেজো কুমারকে কিপ্রকার দেখাইত

মেজোকুমারের দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও অবয়ব সম্পর্কে পরে আলোচনা করিব। আপাততঃ আমি তাঁহার অবয়ব সম্পর্কে সমস্ত বিশ্লেষণ ক্ষান্ত রাখিয়া দ্বিতীয় কুমারকে কিরূপ দেখাইত, তাহাই সাধারণভাবে উল্লেখ করিব। সর্ব্বশেষে গৃহীত তাঁহার ফটো হইতেছে একজিবিট এ—১০। দার্জ্জিলিংএ যাইবার পূর্ব্বে গৃহীত। ইহাই সর্ব্বশেস ফটো, জলারপার শিকারের পর ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে এই ফটো তোলা হয়, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একজিবিট এ(২) হইতেছে এই ফটোর ঠিক আগেকার ফটো। এখন আমি কোন বর্ণনার প্রয়াস পাইব না; তবে ফটোতে যাহা দেখা যাইতেছে না এমন কয়েকটি কথা বলিতে পারি প্রত্যেকেই স্বীকার করিয়াছেন যে, কুমারের দেহ সুগঠিত এবং পেশী-বহুল ছিল। বিবাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল পুলির মতে কুমারের চুল ছিল স্বর্ণাভ পিঙ্গল—একটা সুস্পষ্ট রক্তাভা বিশিষ্ট। বহু সংখ্যক সাক্ষী ইহাকে বলিয়াছেন, পিঙ্গলা অথবা বাদামী। তাহার গোঁফও এই রংএরই ছিল; তবে কিছুটা পাতলা রং বিশিষ্ট ছিল। তাহার চক্ষু ছিল কটা—অর্থাৎ সাধারণতঃ বাঙ্গালীদের যে কালো চক্ষু থাকে তাহা নহে, তবে কুমারের চক্ষের সঠিক রং সম্পর্কে গুরুতর মতভেদ আছে। বাদীর মতে কুমারের চক্ষু ছিল বাদামী অথবা বাদামী ধরণের; কিন্তু বিবাদী পক্ষের মতে তাহার চক্ষু ছিল নীলাভ। কুমারের গাত্র চর্ম্মের রংই সাক্ষীদিগেক সর্ব্বাধিক অভিভূত করিয়াছে। এই রংটা ঠিক

কেমন ছিল, নির্দ্দিষ্টভাবে আমি তাহার বর্ণনা করিব না। তবে উভয় পক্ষের সাক্ষীরাই বলিয়াছেন যে, ইহা সাহেবী রং অথবা ইউরোপীয়ানের রংএর কাছাকাছি রং। মিঃ র‍্যাঙ্কিন একজন ইংরাজ। তিনি বলেন যে, 'কুমারের মুখমণ্ডলের বর্ণ ফর্সা।' লেফ্টেন্যান্ট কর্ণেল পুলি বলেন, 'বাঙ্গালীর পক্ষে অত্যন্ত ফর্সা।' বিবাদীপক্ষের ২৯২ নং সাক্ষী একজন বিশিষ্ট সম্মানিত লোক; তিনি বলেন যে, কুমারের রং ছিল 'অদ্ভুত রকমের ফর্সা।' বাদী পক্ষের সাক্ষিগণ যে ভাষায় কুমারের রং বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি কথা হইতেছে "ইংরাজের মত ফর্সা"। "সাহেবের মত সাদা" "অত্যন্ত ফর্সা"। "নরওয়েবাসীর রংএর মত।" কিন্তু বিবাদী পক্ষের বক্তব্য এই যে, কুমারের শরীরের রংএর মধ্যে একটু পীতাভা যুক্ত ছিল। সঠিক রংএর জ্যতি কিরূপ ছিল, তাহার কথায় আমি যাইব না; তবে ভারতীয়দের মধ্যে তিনি অত্যন্ত ফর্সা ছিলেন এসম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠে না। শরীরের রং এবং চুলের রং বিবেচনা করিলে (আমি সঠিক বর্ণাভা কি ছিল তাহার আলোচনা করিতেছি না) দ্বিতীয় ও তৃতীয় কুমারের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল। তৃতীয় কুমারের চক্ষুও কটা ছিল এবং দ্বিতীয় কুমারের বেলায় সঠিক রংটা ছিল নীলাভ।

আকৃতিগত সাদৃশ্য

বাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পুত্র বুদ্ধুবাবুর সহিত এই দুইটি কুমারের চেহারার সাদৃশ্য আছে, তাহাদের একরকম গায়ের রং এক রকম চুল এবং একরকম কটাচোখ অর্থাৎ স্বাভাবিক কালবর্ণের নহে, অন্যরকম। এই তিনজনের গায়ের রং, চুল এবং চক্ষু (অর্থাৎ কটা) যে একরকম সে সম্পর্কে এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা হইয়াছে এবং আমি পরে তাহা উল্লেখ করিব, কিন্তু বিবাদিগণ এবং তাহাদের সাক্ষীদের জবানবন্দী হইবার পূর্ব্বেই বাদীপক্ষের শত শত সাক্ষী এই বিষয়ে একরকম বলিয়াছে এবং সওয়ালের সময় মিঃ চৌধুরী এই তিনজনের চেহারার সাদৃশ্য এবং বুদ্ধুবাবুর সহিত তাহার চেহারার আর একজন লোককে ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়া লোকের মনে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে বা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাহার উপর বিশেষ জোর দেন। প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে দেখা যায়, বাদী সেই একই ব্যক্তি। বাদীর ভগ্নী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর গায়ের রংও খুব ফর্সা, পিঙ্গল চক্ষু এবং কটাচুল। বড়কুমার এবং সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর চেহারা এক রকম।

গায়ের রং কালো অথবা কৃষ্ণাভ। বড়কুমার ছিল লম্বায়, ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। মাথায় চুল ছিল না, মোটা, সাধারণতঃ বাঙ্গালীদের যেরূপ চোখ থাকে সেরূপ কালো চোখ, টেরা চাহনি এবং মুখ একদিকে মোচরান। ছোট-কুমারও মোটা ছিল, কিন্তু মধ্যম কুমার অপেক্ষা খাট। ১৯০৫ ২রা ২রা এপ্রিল জীবন বীমার জন্য ডাঃ কে, ডি যে মেডিকেল রিপোর্ট লেখেন, তাহাতে দেখা যায় তখন মধ্যম কুমারের উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। বিবাদীপক্ষের ৮২নং সাক্ষী একজন গ্রামিক, তাহার সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলে যে, মধ্যমকুমার দেখিতে আমাদের দেশী লোকের (সাধারণ লোকের মত ছিল না; তাহার চেহারা ছিল 'সাহেবসুবা'র মত) এক কথায় বলিতে গেলে তাহার চেহারা,—গায়ের রং, চোখ এবং চুল—অতীব অসাধারণ ছিল এবং চেহারার এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, দেখিলেই নজরে পড়ে।

গায়ের রং

বিশেষ করিয়া তাহার গায়ের রং সম্বন্ধে একজন সাক্ষী বলিয়াছে, "এমন দুধে আলতা রংয়ের মানুষ আর আমি দেখি নাই।" (বাদী পক্ষের ৫১নং সাক্ষী) কুমারকে সনাক্ত করণের পক্ষে এই সাক্ষী বিশেষ কোন কাজে আসে না। সে শুধু রাস্তায় কুমারকে দেখিয়াছিল: কিন্তু রাজবাড়ীর সদর দরজায় দাঁড়াইয়া সে যেদিন প্রথম কুমারকে দেখিয়াছিল —সেদিনের কথাই সে বলিতেছিল।

এখানে বিচার্য্য বিষয় হইল এই যে, সে কুমারকে ভুলিয়া যায় নাই। তাহাকে একবার দেখিলে ভুলিয়া যাওয়া সহজ নয়; তাহাকে যাহারা চিনিত, তাহাদের সামনে কুমার বলিয়া আর একজনকে দাঁড় করানও সহজ নয়।

বাদীর জীবন-যাত্রানির্ব্বাহ প্রণালী

এই আশ্চর্য্য গায়ের রং, অস্বাভাবিক চক্ষু এবং চুল ও সুদৃঢ় মাংসপেশী বিশিষ্ট ২৩ বৎসরের এই যুবক ১৯০৮ সালে যে ভাবে জীবন যাপন করিত, তাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি। তখন দেখা যায়, সে ঘোড়ায় চড়িত, শিকার করিত, মোটর চালাইত, বেশ্যাগমন করিত, তাহার প্রিয় হাতী ফুলমালায় চড়িয়া বেড়াইত, আমোদের জন্য বড়দিনের ছুটি অথবা ঐরূপ কোন বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে কলিকাতা আসিত, প্রায়ই ঢাকায় যাতায়াত করিত, মোসাহেব এবং চাকরবাকর পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিত, জলের মত টাকা খরচ করিত,

যাহার ফলে এষ্টেটের বিষম ক্ষতি হইয়াছিল, সঙ্গীরা তাহাকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া গিয়াছিল এবং অর্থের দ্বারা যতরকম ভোগবিলাস করা সম্ভব সে করিত।

সে আর কি ছিল এবং আর কি জানিত

সে শিক্ষিত ছিল কি না এবং সে ইংরাজীতে কথা বলিতে পারিত কি না, সে গানবাজনা জানিত কি না অথবা ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস পোলো বা বিলিয়ার্ড খেলিতে পারিত কিনা, ক্যামেরা সে চিনিত কি না বা ফটো তুলিতে পারিত কি না, ইংরেজী পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সে কিছু জানিত কি না, বহুতর ইংরেজী বুলি তাহার জানা ছিল কি না—প্রভৃতি যে সকল প্রশ্ন বাদী সম্পর্কে এই মামলায় উঠিয়াছে সে বিষয়ে বহু তর্কবিতর্ক রহিয়াছে—কারণ জেরার সময় সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে এমন সব কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, যাহা একমাত্র কুমার কিংবা তাহার পরিবারের কাহারও পক্ষে স্মরণে থাকা সম্ভব নয়। তাহার বিদ্যার সীমা ও সত্যতা সম্বন্ধে জেরার যে সকল প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহা পরীক্ষা করার পর এই সকল বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত। এ পর্য্যন্ত আমি সাধারণভাবে ঘটনার পূর্ব্বাভাষ এবং বাদী যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইল ও যেভাবে কাহিনীটির সূত্রপাত হইল তাহা বলিয়াছি; কারণ ইহার পশ্চাতে যে অভিসন্ধি রহিয়াছে, যাহারা এ নাটকের প্রধান নট এবং যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আসিয়া বাদী আত্মপ্রকাশ করিল, তাহার কার্য্যকারণ এবং যে উত্তেজনা সে সৃষ্টি করিয়াছিল—সেই সব ইহাতে বুঝা যাইবে। সনাক্ত করণের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ লওয়ার পূর্ব্বে ঘটনার ইতিহাস বর্ণনা আবশ্যক।

কুমারের শালা সত্যবাবুর বিবাহ

বাঙ্গালা ১৩১৫ সালের ২১শে বৈশাখ (ইং তাং ৪-৫-০৮) মেজরাণীর ভাই সত্যবাবুর বিবাহ এবং ২৮শে বৈশাখ ইন্দুময়ী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র বিল্লুর বিবাহ হয়। এই তারিখ রাণী নিজেই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভাইয়ের বিবাহ উপলক্ষে তিনি জয়দেবপুর হইতে ভাইয়ের সঙ্গে উত্তরপাড়া গিয়াছিলেন এবং সেখানে তিন সপ্তাহ থাকিয়া তিনি ২৯শে বৈশাখ উত্তরপাড়া হইতে জয়দেবপুর রওনা হন। রাণী বলেন যে, মধ্যমকুমার ৬ই মে উত্তরপাড়া গিয়াছিলেন এবং তাহারা একসঙ্গে জয়দেবপুর ফিরিয়াছিলেন মধ্যমকুমারের এই উত্তরপাড়া গমন লইয়া মতানৈক্য আছে,—কিন্তু তাঁহার এইবার উত্তরপাড়া যাওয়ার পূর্ব্বে ১৩১৫ সাল, ১৩ই বৈশাখ (ইং তাং ২৬-৪-০৮) তারিখে তাহার স্ত্রীর নিকট নাকি একখানি চিঠি লিখে; এই চিঠি লইয়াও মত দ্বৈধ আছে।

রাজকুমারদের ঋণ গ্রহণ সম্বন্ধে কথা

১৯০৮ সালের ১২ই এপ্রিল তিনকুমার ২৫ হাজার টাকা ধার করেন এবং এই 'প্রমিসরি নোটে' তাঁহাদের যে স্বাক্ষর আছে, তাহা অন্যান্য দলিলাদির মত সনাক্তকরণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

কর্ম্ম সন্ধানে সত্যেন্‌বাবু

সত্যেন্ বাবু সাক্ষ্যদানের সময় বলিয়াছেন যে, তাঁহার ভগ্নীর সহিত মধ্যমকুমারের বিবাহের পর তিনি প্রায় কলিকাতা, ঢাকা, উত্তরপাড়া এবং কখনো জয়দেবপুর যাইয়া তিন কুমারের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। কুমারদের সহিত তাঁহার খুব ভাল ভাব ছিল। ১৯০৮ সালের মার্চ্চ মাসে বি-এ পাশ করেন এবং অক্টোবর মাসে বি-এল পড়িতে থাকেন। ১৯০৮ সালের অক্টোবব মাসে তিনি জয়দেবপুর আসেন এবং তৎপর একটা সরকারী চাকরীর সন্ধানে শিলং যান। ২২-১০-০৮ তারিখে তাঁহার মা মেজরাণীকে একখানি পত্র লিখেন, উহাতে বলা হয় যে, তিনি সত্যেন্দ্রের নিকট হইতে একটা তার পাইয়াছেন। সে শিলং গিয়াছে এবং সত্য একটা চাকুরী চাহিতেছে এবং বড়কুমারের সুপারিশে সে উহা পাইবে বলিয়া আশা করে। এই পত্রে (একজিবিট ২৯৩ (৪) ইহাও উল্লেখ ছিল যে, সে যে পুলিশের চাকুরী চাহিতেছে, উহা তাহার পছন্দমত হইবে না, বড়কুমার যেন তাহার জন্য বিশেষভাবে ডেপুটীম্যাজিষ্টেটের চাকুরীর জন্য চেষ্টা করেন। সত্যবাবু বাড়ী যাইতেছেন না এবং লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া জয়দেবপুরে অবস্থান করিতেছেন, ইহাতে তাহার মা তাঁহার উপর অত্যন্ত চটিয়া যান। তাঁহার ২৭শে নবেম্বর, ১লা ও ২রা ডিসেম্বর (একজিবিট ২৯৩ (৮) ২৯৩ (৬) ২৯৩ (৯) পত্র হইতে উহা বুঝা যায়। শিলং গিয়াছেন বলিয়া সত্যেন্দ্রবাবুও স্বীকার করিয়াছেন এবং ২২শে অক্টোবরের চিঠিতে উহা উল্লেখ আছে। যদিও উক্ত মহিলাকে ইহা বলা হইয়াছে যে, জয়দেবপুরে মধ্যমকুমার অসুস্থ আছেন এবং জ্বরে ভুগিতেছেন। কিন্তু ঐসকল পত্র হইতে উহাই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, উক্ত মহিলা ঐগুলি টালবাহান বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্রের জয়দেবপুর অবস্থান ভাল বলিয়া তিনি মনে করিতেছেন না।

সত্যবাবুর মায়ের শেষপত্র অর্থাৎ ২রা ডিসেম্বরের পত্রের পূর্ব্বেও তিনি উত্তরপাড়া ফিরিয়া যান নাই। তিনি ৫ই ডিসেম্বর রওনা হইয়া ৬ই ডিসেম্বর কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। তিনি বড়কুমার ও মধ্যমকুমারের জয়দেবপুর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার দিকে রওনা হইয়াছেন

বলিয়া মনে হয়। কলিকাতার একটা জুয়েলারী ফারমের লাভচাঁদ মতিচাঁদের নিকট প্রেরিত একটা তার হইতে এই তারিখ (একজিবিট জেড ১৯৫ জেড এবং ১৯৫ (২) জানা যায়। উক্ত তারে একটা বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিবার জন্য এবং ৬ই তারিখ ষ্টেশনে লোক পাঠাইবার জন্য বলা হইয়াছিল।

দুই কুমার কলিকাতায় পৌছিয়া পুলিশ হসপিটাল ষ্ট্রীটস্থ লাভচাঁদ মতিচাঁদের বাড়ীতে অবস্থান করিতে থাকেন, বিবাদীপক্ষের ৮৭নং সাক্ষী লাভচাঁদের পুত্র সৌভাগ্যচাঁদের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা দুই রাণীকে লইয়া তথায় পনর দিন ছিলেন। এই বাড়ীটী তাঁহাদের গেষ্ট্ (অতিথিশালা) হাউস ছিল। তারপর তাঁহারা ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটের একটা বাড়ীতে চলিয়া যান। ইহার কিছুদিন পর ছোটকুমার তাঁহার দলবল সহ আসেন এবং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন, অতঃপর বড়কুমার তাঁহার প্রকৃতির অনুকূলমত ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটস্থ ওয়াটার ওয়ার্কসের নিকট আর একটা বাড়ীতে চলিয়া যান। ইহা বাদী পক্ষের ১৩৮ নং সাক্ষী বিল্লু. ২৬২নং সাক্ষী যোগেশ রায় এবং বিবাদী পক্ষের ৮৭নং সাক্ষী সৌভাগ্য, ৩৬৫নং সাক্ষী আশু ডাক্তার, ১৪০নং সাক্ষী মেজরাণীর খানসামা বিপিন, ২১নং সাক্ষী ছোটকুমারের খানসামা রুক্মিণী এবং ৮৯নং ছোট রাণীর সাক্ষ্য হইতে জানা যায়। কোন্ দলে কে গিয়াছিল, সাক্ষীদের সাক্ষ্য হইতে তাহা সঠিক বুঝা যায় না, সকল কুমার একসঙ্গে গিয়াছে বলিয়া রুক্মিণী বলিয়াছে। কিন্তু অন্য কেহ তাহা স্বীকার করে না। ছোটরাণী বলিয়াছেন যে, তিনি প্রথম দলের সহিত গিয়াছিলেন এবং বড়রাণী ও মেজরাণী দ্বিতীয় দলের সহিত গিয়াছিলেন। তবে উক্ত পরিবার যে দুইভাগে গিয়াছিলেন, উহা ঠিকই, দ্বিতীয় দলে ডাঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত এবং জয়দেবপুর হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ২৬২নং সাক্ষী যোগেশ রায় গিয়াছিলেন, ইহা আশু ডাক্তারও স্বীকার করিয়াছেন।

কলিকাতায় মেজোকুমারের চিকিৎসা সম্বন্ধে কথা

এইবার মেজকুমারের চিকিৎসার জন্যই তাঁহারা কলিকাতা গিয়াছিলেন। উভয়পক্ষই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে যে, তাহার উপদংশ ইতিমধ্যেই অর্ব্বুদে পরিণত হইয়াছে। বিবাদী পক্ষ বলেন যে, পিত্তশূল রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং তৎসঙ্গে জ্বরও ছিল। তাঁহারা তাঁহার উপদংশ ছিল বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন। বাদী পক্ষ

হইতে বলা হইয়াছে যে, কুমারের কল্পিত মৃত্যুর পর তাঁহার পিত্তশূল রোগ হইয়াছিল বলিয়া আবিষ্কার করা হইয়াছে এবং উহা এখন প্রয়োগ করা হইতেছে। ১৯০৮ সালের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে মেজকুমারের শাশুড়ী যে পত্র লিখিয়াছিলেন, উহাতে কুমারের জ্বর হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা এখন ব্যবহার করা হইতেছে। আর ইহা খুবই সত্য যে, জ্বর হইয়া থাকিলেও তিনি জ্বরের চিকিৎসার জন্য আর কলিকাতা যান নাই, আমি যখন তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কিত প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করিব, তখন এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। এই সময়কার সহিত জড়িত দুইজন সাক্ষীর অন্যতম সাক্ষী, এণ্টনি মরেলের সাক্ষ্য এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই লোকটী বাঙ্গালী খৃষ্টান। বাড়ী ভাওয়াল। সে সময় সে ৩০৲ টাকা বেতনে চাকুরী করিত ও ঘোড়া হাতী প্রভৃতির খাবারের প্রতি দৃষ্টি রাখিত, কমিশনে তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে; সে বিবাদী পক্ষেই সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, কুমার টমটমে সন্ধ্যার পর এদিকে সেদিকে ঘুরাঘুরি করিত। মেসার্স লালচাঁদ মতিচাঁদের শো রুমে একটী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবতীকে দেখা গিয়াছিল এবং তাহার জন্য মূল্যবান জিনিষ-পত্র আনা হইয়াছিল। বিবাদী পক্ষের ৮৭নং সাক্ষী সৌভাগ্যচাঁদের সাক্ষ্য হইতে ইহা জানা গিয়াছে। কুমারের নৈতিক-চরিত্র খারাপ ছিল, উহা বিশ্বাসযোগ্য; কিন্তু এই সকল সাক্ষ্য হইতে কুমার যে ইংরেজী জানেন, তাহা প্রমাণ করিতেও চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু কুমারের হাতে পায়ে উপদংশ-জনিত ক্ষতের জন্য পটি বাঁধা ছিল। এ অবস্থায় একটা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবতী তাহার নিকট গিয়াছিল কি না তৎসম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই জন্যই এই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবতী লইয়া যাওয়ার কাহিনী সত্য বলিয়া মনে হয় না।

ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড কিচেনার জয়দেবপুর যাইবেন বলিয়া স্থির হয়। তজ্জন্য রাজপরিবার ১০ই তারিখ জয়দেবপুর চলিয়া যান। লর্ড কিচেনারও ১৫ই অথবা ১৬ই তারিখ তথায় যান। বাদীপক্ষের ৯০৭, ৯৫২নং সাক্ষী এবং বিবাদীপক্ষের ৩১০নং সাক্ষী রায় সাহেব যোগেন্দ্র ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ৬৮ নং একজিবিট দেখিয়া মনে হয়, তিনি ১৪ই তারিখ গিয়াছেন, তিনি যে তথায় গিয়াছেন, উহা কোন পক্ষই অস্বীকার করেন নাই। বাদীপক্ষের ৯৫২নং সাক্ষী ম্যানেজারের কেরাণী বলিয়াছেন যে, তিনি নারায়ণগঞ্জ হইতে স্পেশাল—ট্রেণযোগে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কর্ণেল বার্ডউড, কাপ্টেন ফিটজ জার, এবং একজন ইংরেজ ডাক্তার ছিল, ষ্টেশনে বড়কুমার তাঁহাদিকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, এবং বিকাল বেলায় একখানি রোপ্য নির্ম্মিত গাড়ী করিয়া

তাঁহাদিকে রাজবাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। লর্ড কিচেনার ও তাঁহার সঙ্গিগণ বড় দালানে ছিলেন এবং তথায় আহারাদি করিয়াছিলেন। কলিকাতার মেসার্স পেলিটি খাওয়ার জিনিষের বন্দোবস্ত করিয়াছিল, তৎপর দিবস লর্ড কিচেনার ও তাঁহার সঙ্গিগণ হাতীতে কড়্‌ডা যান এবং বাগবাড়ীর জঙ্গলে প্রবেশ করেন; মেজকুমার ও অপর একটি হাতীতে উক্ত দলের সঙ্গে ছিলেন। লর্ড কিচেনার একটা শম্বর শিকার করিয়া জয়দেবপুর ফিরিয়া আসেন এবং উক্ত দিনই জয়দেবপুর ত্যাগ করেন।

যে সব কর্ম্মচারীর উপর ঐসব কাজের ভার ছিল এবং হাতীর সঙ্গে যেসব মাহুত গিয়াছিল তাহাদের সাক্ষ্য হইতে ঐ সকল বিবরণসংগ্রহ করা হইয়াছে। নাজীর গঙ্গাচরণ বাদীপক্ষের ৬৭নং সাক্ষী, দিলবর (জঙ্গল চেঙ্গাইয়া এই ব্যক্তি শিকারীদিগের জন্য শিকার বাহির করে) এবং আবদুল জমাদার বাদীপক্ষের ৯৯, ৯৭৩, ৯৫২নং সাক্ষী এবং বিবাদীপক্ষের ৩১০, ৩৭, ৪৩, ৬১নং সাক্ষী (সকলেই মাহুত) এই সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়াছে।

মেজকুমার ও অপর দুই কুমার বিশিষ্ট মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন ও সুশিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর লোক ছিলেন, ইহা দেখাইবার জন্য যদি বিবাদীপক্ষের সাক্ষিগণ এই কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ না দিতেন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত যে কাহিনী সম্পর্কে সকলেই একমত; অথবা যে কাহিনী সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ হয় নাই তাহার, এবং লর্ড কিচেনারের আগমনের সহিত আদালতের বিচার্য্য বিষয়ের কোন সম্পর্কই থাকিত না। বলা হইয়াছে যে, লর্ড কিচেনারের আগমনের দিন তাঁহারা লর্ড কিচেনার ও তাঁহার কর্ম্মচারী বর্গের সহিত খানা-খাইয়াছেন, তাঁহাদের ম্যানেজার মিঃ জি, এস, সেনও (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট) লর্ড কিচেনারের সহিত খানা খান। শিকারে বাহির হইলে তাঁহারা তাঁহার সহিত প্রাতরাশ ও খানা খাইয়াছেন, ইহা রায় সাহেব যোগেন্দ্র (বিবাদী পক্ষের ৩১০নং সাক্ষী), মাহুত (বিবাদী পক্ষের ৪৩নং সাক্ষী) এবং পাচক আলেক দেও-কস্তের উক্তি। এইসব সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিতর যে অসত্যের ছাপ রহিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট। ইয়োরোপীয়ান সঙ্গে মেলামিশা দ্বারা কুমারদের ইংরেজী-জ্ঞানের পরিচয় কতদূর পাওয়া যায়, তাহা পরে আলোচনা করা হইবে; সমস্ত একত্র করা হইলে কয়েকটি ঘটনা প্রকাশ পাইবে।

সত্যেন্ বাবুর কথা

১৪ই ফেব্রুয়ারী লর্ড কিচেনার ভাওয়াল আসেন ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে সত্যবাবু জয়দেবপুর আসেন। অক্টোবর ও নবেম্বর

মাস পর্য্যন্ত (কুমারের কলিকাতা আগমন পর্য্যন্ত) তিনি কুমারের সঙ্গে ছিলেন। কলিকাতায় তিনি কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, বাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, তিনি আসিয়া কুমারকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহাকে দার্জ্জিলিং যাইতে প্রলুব্ধ করেন, গৃহ-চিকিৎসক আশু ডাক্তারের সাহায্যে তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হন—যদিও বাদী রক্ষা পান। বাদী নিজেকে মেজকুমার বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রায় অব্যবহিত পরেই সত্যেন্‌বাবু ও আশু ডাক্তারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়। সত্যবাবু বলিয়াছেন যে, ডাক্তারগণ শীতপ্রধান স্থানে হাওয়া পরিবর্ত্তন করিবার পরামর্শ দেওয়ায়, কলিকাতায় মেজকুমারের দার্জ্জিলিং যাওয়ার কথা স্থির হয়। তিনি বলিয়াছেন যে, সরকারী চাকুরী সংগ্রহের জন্য তিনি জয়দেবপুর গিয়াছিলেন এবং প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিয়া শিলং প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর তাঁহাকে মেজকুমারের কর্ম্মচারী মুকুন্দ গুপ্তের সঙ্গে দার্জ্জিলিং যাইয়া বাসা ঠিক করিতে বলা হয়। ১৯০৮ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখের তাঁহার (সত্যবাবুর) মাতার একখানি চিঠি তাহাকে দেখান হয়। ঐ চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার পুত্রের নিকট হইতে—সে ইতিমধ্যে শিলং চলিয়া গিয়াছে বলিয়া এক তার পাইয়াছেন। সত্যবাবু স্বীকার করেন যে, তখন তিনি শিলং গিয়াছিলেন, কিন্তু এই উপলক্ষে নহে। তিনি রাণীর সাক্ষ্য পাঠ করিতেছিলেন এবং খুব সম্ভব ইহা তাঁহার নজরে পড়ে নাই যে, ডাক্তার মেজকুমারকে দার্জ্জিলিং অথবা মুসৌরী যাইবার পরামর্শ দিলে, বড়কুমার স্থির করেন যে, মেজকুমার দার্জ্জিলিংই যাইবেন এবং রাণীর ভাইকে চিঠি লেখা হইলে তিনি আসেন, ইহাকে যদি পৃথক করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে অবশ্য ইহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নাই। ইহা বিসদৃশ যে, সত্যবাবু এই বিষয়ে মিথ্যা উক্তিদ্বারা আরম্ভ করিবেন, সত্যবাবুই যে মেজকুমারের কেরাণী অথবা সেক্রেটারী মুকুন্দ গুপ্তের সঙ্গে দার্জ্জিলিং যান, ইহা আমি সত্য ঘটনা বলিয়া মনে করি এবং সত্যবাবু তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, বিল্লু, পুরাতন দেওয়ান রসিক রায়, এই সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং আমি সত্যবাবুর নিজের উক্তি অপেক্ষা ইহাদের কথাই অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করি।

সত্যবাবুর দার্জ্জিলিংএ বাসা ঠিক করিতে যাইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ মেজকুমার দার্জ্জিলিং রওনা হইবার প্রায় ১৫ দিন পূর্ব্বে, শেষবারের জন্য মেজকুমারের বৃহৎ শিকার অনুষ্ঠান হয়, শালনা কাছারীর নিকট জোলারপাড়ে ঐ শিকার হয় এবং মেজকুমার একটী রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিকার করেন। ইহা কুমারের দ্বিতীয়বারের ব্যাঘ্র-শিকার। কারণ বিবাদী পক্ষের ২৪নং সাক্ষী

কলিমুদ্দি হাজি বলিয়াছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অক্টোবর কি নবেম্বর মাসে নাগরগড়ে কুমার প্রথমবার ব্যাঘ্র শিকার করেন। সাক্ষীর এই শিকারের কথা স্মরণ আছে। সাক্ষী জোলারপাড়ের শিকারও দেখিয়াছে। এই সাক্ষী বলিয়াছে যে, জোলারপাড়ের শিকার ফাল্গুন বি চৈত্রমাসে হইবে অর্থাৎ এপ্রিল মাসের প্রথমভাগে। অপর সাক্ষিগণও ইহাই বলিয়াছে উভয় শিকারেরই ব্যাঘ্রসহ কুমারের ফটো তোলা হইয়াছে একজিবিট 'এল' নগরগড় শিকারের পর তোলা ফটো। এই ফটোতে কুমারের পরিধানে ধুতি ও পাঞ্জাবী; দ্বিতীয়বারের ফটোতে কুমারের পরিধানে পায়জামা ও পট্টি। দার্জ্জিলিংএ কুমারের মৃত্যু অথবা তথাকথিত মৃত্যুর পূর্ব্বের ইহাই শেষ ফটো। শেষবারের শিকারের সময় ঐ দলের সহিত সত্যবাবুও যে ছিলেন তাহা সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু বলা হইয়াছে যে, সত্যবাবু ভীত হওয়ায় তাহাকে কোন একস্থানে রাখিয়া যাইতে হইয়া ছিল। এক শিকার সম্পর্কে বহু সাক্ষ্য প্রমাণ রহিয়াছে। এই মামলা সম্পর্কে ইহার ফটোই প্রয়জোনীয়। এই শিকার এবং অন্যান্য শিকারের দ্বারা দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বে কুমারের স্বাস্থ্য কিরূপ ছিল তাহাই বুঝা যায়। তিনি ক্রমাগত শিকারে যাইতে ছিলেন। তিনি কাসিমপুর গিয়াছিলেন (বিবাদী পক্ষের সাক্ষী এ, পি, রায় চৌধুরীর কমিশন জবানবন্দী দ্রষ্টব্য) তিনি কোড্ডা বারুণী স্নানে গিয়াছিলেন (বিবাদী পক্ষের ৩৮নং সাক্ষী) তিনি ঢাকা আসিতেছিলেন এবং ১লা এপ্রিল তাঁহার ভাইদের সঙ্গে ৫০০০৲ টাকার একটি হ্যাণ্ডনোট পরিবর্ত্তন করিয়া দেন এবং ভাইদের সঙ্গে একত্র হইয়া ৯ই এপ্রিল ৫০ হাজার টাকা ধার করেন। (একজিবিট 'ও' হইতে 'ও' (৪) পর্য্যন্ত) ১৬ই এপ্রিল তিনি গৃহচিকিৎসক মোহিনী বাবুর বাড়ীতে আহার করেন এবং ১৭ই এপ্রিল মোহিনীবাবুর পুত্র আশুবাবুকে গোয়ালন্দে খাবার ব্যবস্থা রাখিবার জন্য ৩০৲ দিবার আদেশ দেন। ১২ই এপ্রিল দার্জ্জিলিং রওনা হইবার পূর্ব্বে বাবু দিগিন্দ্র ঘোষের বরাবরে তিনি একটী দলিল সম্পাদন করিয়া দেন। এইসব নিঃসংশয়িত ঘটনার দিকে লক্ষ্য করিলে এবং এই সম্পর্কে যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, দার্জ্জিলিং রওনা হইবার সময় কুমারের কোন অসুখ ছিল না। বড়রাণী বলিয়াছিলেন যে, 'তিনি (কুমার) হাসিমুখে' চলিয়া যান কোন ব্যক্তি ফিরিয়া না আসিলে এইসব খুটিনাটি ব্যাপার মনে থাকে? কুমার প্রকৃতপক্ষে ১৮ই এপ্রিল তারিখ দার্জ্জিলিং রওনা হন।

দার্জ্জিলিং যাত্রার কথা

ফরাসখানার নিশি (বাদীপক্ষের ১৮৯নং সাক্ষী) তাঁহার বিছানা পত্র বাঁধে। জয়দেবপুর রেল ষ্টেশনে তিনি ষ্টেশনমাষ্টার আশুবাবুকে (বাদী পক্ষের ৫৯নং সাক্ষী) বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করেন, 'মাষ্টর, আমার গাড়ী কই ?" ষ্টেশনে বাদী পক্ষের ২২০, ৮৮১, ৯৪৯ নং সাক্ষী, ৯নং সাক্ষী যতীন, সাগর, মান্নুক, একজন রেলকর্ম্মচারী (বাদী পক্ষের ২৩১ নং সাক্ষী) এষ্টেটের মোক্তার সর্ব্বমোহন চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাঁহারা সকলেই সাক্ষ্য দিয়াছেন। যতীনবাবু তাঁহার সঙ্গে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত, সাগর ও মান্নুক ঢাকা ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ট্রেণ ফতুল্লায় থামিলে ২৩১ নং সাক্ষী তাঁহাকে অভিবাদন জানাইয়া ছিলেন এবং সর্ব্বমোহন নারায়ণগঞ্জে তাঁহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি নারায়ণগঞ্জে গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টীমারে আরোহণ করেন। এই সকল সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, তখন কুমারের একমাত্র উপদংশ ছাড়া আর কোনও পীড়া ছিল না। এখন বিবাদী পক্ষ এই কথা অস্বীকার করেন না। কিন্তু বিবাদী পক্ষের সাক্ষী এণ্টনী মোরেল, এবং মিঃ আর, এন, ব্যানার্জ্জী কমিশনে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, মামলার শুনানী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এক সময় বিবাদী পক্ষের বক্তব্য এই ছিল যে, কুমার যখন দার্জ্জিলিং পৌছেন, তখন তিনি পীড়িত ছিলেন, এবং দার্জ্জিলিং এর পূর্ব্বাপর তিনি পীড়িত ছিলেন; কিন্তু বিবাদী পক্ষের এই সকল সাক্ষ্যের পর বিবাদী পক্ষের ঐ উক্তি আর টিকিল না,—যতটুকু টিকিল তাহাও মাত্র এক খানা ডাক্তারী সার্টিফিকেট অবলম্বনে, তারপর বিবাদী পক্ষই সাক্ষ্য দেওয়াইলেন যে ১৩০৯ সালের ৫ই মে শেষ রাত্রিতে পীড়িত হইবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত কুমার দার্জ্জিলিংএ প্রায় সুস্থই ছিলেন। কুমারকে দার্জ্জিলিংএ বাড়ীর বাহির হইতে দেখা গিয়াছিল, ইহা প্রমাণের কোনও উদ্দেশ্য ছিল, বলিয়াই যে বিবাদী পক্ষ এই সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছেন তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায়। কোনও কোনও সাক্ষী তাঁহার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, তাঁহাকে পূর্ণ স্বাস্থ্যবান লোকের ন্যায় দেখাইয়াছিল। মৃত্যু হইয়াছিল কি না তাহা আলোচনার সময় এই বিষয়টিও আলোচনা করিব। কিন্তু সাক্ষ্যে দেখা যায় ১৮ই এপ্রিল তারিখে কুমার যখন দার্জ্জিলিং যাত্রা করেন, তখন উপদংশের ঘা ছাড়া দৃশ্যতঃ কুমারের আর কোনও পীড়া ছিল না এবং কুনুইয়ের ও পায়ের ঘা অন্ততঃ বাহুর ঘায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। বিবাদী পক্ষ এই সাক্ষ্য খণ্ডন করিতে পারেন নাই।

দার্জ্জিলিং যাত্রা-পথে তাঁহার পরণে লুঙ্গী অথবা লুঙ্গীর মত ভাঁজ করা কাপড় ও গায়ে পাঞ্জাবী ছিল।

(বাদী পক্ষের ৮৮১ নং সাক্ষী এবং বিবাদী পক্ষের ২৯০ নং সাক্ষী বীরেন্দ্র বাবুর সাক্ষ্য—বীরেন্দ্র কুমারের সঙ্গে দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন।)

১৯০৯ সালের ২০শে এপ্রিল কুমার সদলবলে দার্জ্জিলিং যাত্রা করেন। তিনি চৌরাস্তার নিকটবর্ত্তী "ষ্টেপ এসাইড" নামক বাড়ীতে উঠেন। সত্যবাবু ও মুকুন্দ তাঁহার জন্য ঐ বাড়ী ভাড়া করিতে গিয়াছিলেন। সত্য জয়দেবপুর ফিরিয়া গিয়া কুমারের সহিত দার্জ্জিলিং যান; কিন্তু মুকুন্দ দার্জ্জিলিংই থাকিয়া যান। ঐ বাড়ীর মালিক মিঃ ওয়াণিকলের কর্ম্মচারী রামসিং স্থভার সাক্ষ্যে দেখা যায়, উহার পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্বে বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল।

কুমার ও তাঁহার দলবল এই বাড়ীতে অবস্থান করিতে থাকেন; ৫ই মে তারিখে শেষ রাত্রিতে তাঁহার পীড়া হয় এবং ৮ই তারিখে তিনি মারা যান—অথবা মারা যান বলিয়া ধরা হয়। "পীড়া", "চিকিৎসা," "মৃত্যু" এবং "সৎকার" সম্পর্কে বহু সাক্ষ্য উত্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু বাদীর বক্তব্য এই যে, সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৮টার মধ্যে এই হিসাবে তাঁহার মৃত্যু হয় বা তাহাকে মৃত বলিয়া ধরা হয়; ঐ রাত্রিতেই ৯টার পর তাঁহাকে শ্মশানে নেওয়া হয় এবং তাঁহার বর্ণিত অলৌকিক উপায়ে তাঁহার জীবন রক্ষা হয়।

শ্মশান-রহস্য

এদিকে বিবাদীপক্ষ বলেন এবং দার্জ্জিলিংএর তৎকালিক সিভিল সার্জ্জন কর্ণেল ক্যালভার্টের এফিডেভিট দিয়া বিবাদী পক্ষ সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছেন যে, রাত্রি পৌণে বারটার সময় কুমারের মৃত্যু হয়; শব সমস্ত রাত্রি বাড়ীতেই রাখা হয় এবং পরদিন প্রাতঃকালে মিছিল করিয়া শব শ্মশানে লইয়া গিয়া যথারীতি সৎকার করা হয়। মিছিলের কথা বাদী পক্ষও স্বীকার করিয়াছেন, এবং ঐদিন শ্মশানে যাহা দাহ করা হইয়াছিল তাহা যে মানুষের শব তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বাদী বলেন, তাঁহার দেহ দাহ করা হয় নাই, অপর কাহারও দেহ দাহ করা হইয়াছিল; তাঁহার শব শ্মশান হইতে উধাও হইবার পর, ঐ রাত্রিতেই উক্ত শব সংগ্রহ করা হয়, বীমার টাকা আদায় প্রভৃতি উদ্দেশ্যে না হউক, অন্ততঃ কেলেঙ্কারী এড়াইবার জন্য উহা দাহ করা হয়, কারণ নতুবা জয়দেবপুরে সকলে মনে করিত, কুমারের কর্ম্মচারীরা তাঁহার শব দাহ করাও আবশ্যক মনে করে নাই; হিন্দুদের মতে ইহা গুরুতর অপরাধ।

মধ্যম কুমারের সহযাত্রিগণ

কুমারের সঙ্গে দার্জ্জিলিংএ ইহারা ছিলেন :—

কুমারের পত্নী (তখন ২০ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই এবং কুমারের বয়স তখন ২৫ বৎসরও হয় নাই)।

কুমারের শ্যালক সত্যবাবু (বয়স প্রায় ২৪ বৎসর), ডাঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত (বয়স প্রায় ২৫ বৎসর), মুকুন্দ গুণ, (তখন বয়স প্রায় ৩০ বৎসর এখন হত), বীরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী (কেরাণী, বয়স প্রায় ২১ বৎসর, তাঁহার কাকা কুমারদের কোনও আত্মীয়ের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন), সি, জে, ক্যাব্রাল (একজন দর্জ্জি ; মাঝে মাঝে কুমারদের ঢাকার বাড়ীর তত্ত্বাবধান করিত, ক্যাব্রাল একজন দেশী খৃষ্টান, সাক্ষ্যে দেখা যায় সে নিরক্ষর ছিল ; এখন মারা গিয়াছে। বাদী পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে) ; এণ্টনি মোরেল (এই ব্যক্তিও দেশী খৃষ্টান, বয়স তখন প্রায় ৪১ বৎসর), জলধর, যামিনী (মারা গিয়াছে), অখিল, প্রসন্ন (মারা গিয়াছে), বিপিন (বিবাদী পক্ষের ১৪০ নং সাক্ষী) ইহারা সকলেই খানসামা অথবা ব্যক্তিগত ভৃত্য। শরিফ খাঁ (আন্দালী, হিন্দুস্থানী মুসলমান), পাচক অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ; নরবীর, কালান সিং, হরি সিং,—ইহার গুরখা প্রহরী, জিওনলাল ও ঝঙ্গড়ী—, ইহারা বেয়ারা ; একজন বাবুর্চ্চী (বাদী পক্ষ বলেন, ইহার নাম আলামুদ্দি এবং বিবাদীপক্ষ বলেন, ইহার নাম আবদুল), তীর্থ দাই (দাসী এখন মারা গিয়াছে), কামিনী (আর একজন দাসী এখন জয়দেবপুরে থাকে), বাবুর্চ্চীর একজন মেট, বিবাদীপক্ষের মিঃ কৌসুলী চৌধুরী, সত্যই বলিয়াছেন, কুমারের সঙ্গে ছিল নানা ধরণের লোকের এক বিরাট জনতা।

৮ই মে সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৮টার মধ্যে অথবা রাত্রি পৌণে বারটার সময় কুমারের মৃত্যু হয় বা তিনি মারা যান বলিয়া বুঝা যায়। পরদিন প্রাতঃকালে কৃত্রিমই হউক বা বাস্তবই হউক একটী মিছিল হয়। তাহার পরদিন অর্থাৎ ১০ই মে মেজরাণী তাঁহার ভ্রাতা এবং অন্যান্য লোকজন সহ মেলট্রেণে দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করেন। তখন বেলা আড়াইটার সময় মেল ট্রেণ দার্জ্জিলিং ছাড়িত। কুমারের মৃত্যু সংবাদ তারযোগে জয়দেবপুরে জানান হইয়াছিল ; যদিও ৯ই তারিখে বেলা ৯টার পূর্ব্বে ছোটকুমারকে ঐ টেলিগ্রাম দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ঐ টেলিগ্রাম দার্জ্জিলিং হইতে কখন করা হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে গুরুতর মতদ্বৈধ আছে ; পূর্ব্বদিন জয়দেবপুরে তার গিয়াছিল" যে, মেজকুমারের পীড়া অত্যন্ত গুরুতর ঐ সংবাদ পাইয়া

ছোট কুমার দার্জ্জিলিং যাইবার জন্য ট্রেণ ধরিতে যাইতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার হাতে মেজকুমারের মৃত্যু সংবাদের তার দেওয়া হয়। যে সকল কার্য্যের ফলে দার্জ্জিলিংএ কুমারের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া বুঝা গিয়াছিল, তাহা আলোচনার সময় আমি টেলিগ্রাম সম্পর্কেও আলোচনা করিব।

মেজরাণী প্রভৃতি ট্রেণে দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা পোড়াদহে আসিয়া অন্য ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; এমন সময় জয়দেবপুর হইতে আগত একদল লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এই দলে ছিলেন ইন্দুময়ীর পুত্র বিল্লু, প্রাইভেট সেক্রেটারী যোগেন্দ্রবাবু; নিরুণ নামক আর একজন কর্ম্মচারী, দ্বারিক মাষ্টার, (বৃদ্ধ দ্বারিক মাষ্টার তখনও রাজপরিবারের কার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন,) তিনি তখন বাড়ীর ছেলেমেয়েদিগকে পড়াইতেন, অথবা রাজপরিবারের মহিলারা তীর্থ গমন করিলে তাঁহাদের সঙ্গে যাইতেন। বিল্লুবাবু বলেন, তাঁহাদের সঙ্গে নিরুর স্ত্রী, আর একটি স্ত্রীলোক এবং কয়েকজন দারোয়ানও ছিল, এতলোক পাঠাইবার কারণ এই যে, দার্জ্জিলিং অথবা উত্তরপাড়া হইতে তার পাইয়া বড়কুমারের মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, সত্যবাবু মেজরাণীকে সোজা কলিকাতা লইয়া যাইবেন। ঐরূপ লোকজন যে প্রেরিত হইয়াছিল, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। গাড়ী জয়দেবপুর ষ্টেশনে পৌছিলে তথায় এক ভীষণ দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল।

সত্যবাবুর ডায়েরী

ইহা সত্যবাবুর একখানি রোজনামচায় লিখিত হইয়াছে। বাদী অথবা ঐ পক্ষের কেহ ঐ রোজনামচা হস্তগত করিয়াছেন। ঐ রোজনামচা ৭ই মে অর্থাৎ কুমারের অসুখের দ্বিতীয় দিন ও তাহার তথাকথিত মৃত্যুর পূর্ব্বদিনের ঘটনা হইতে সুরু হইয়াছে; সত্যবাবু স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ঐ ডায়েরী লিখিয়াছিলেন, এবং উহাতে সত্য ঘটনা ও তাঁহার মতামত লিখিত হইয়াছে। তিনি বলেন, জয়দেবপুরে ১৯শে বা ২০শে মে তারিখে, তিনি স্মৃতি হইতে ৭ই তারিখের ঘটনা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং জয়দেবপুরে তিনি যে অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন তজ্জন্যই তাঁহার ডায়েরী লিখিতে হইয়াছিল। পরে আমি এই ডায়েরী সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

সত্যবাবুর ডায়েরীতে দেখা যায়, দার্জ্জিলিং হইতে আগত লোকজনদের সহিত জয়দেবপুর হইতে আগত লোকজনদের পোড়াদহে সাক্ষাৎ হইলে

ক্রন্দনের সোরগোল ওঠে. ডায়েরীতে বলা হইয়াছে যে, "আমি যাহাতে বিভাকে কলিকাতা না লইয়া যাই, তজ্জন্যই জয়দেবপুর হইতে অত লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে পোড়াদহে রাখা হইয়াছিল।" সত্যবাবু নিজেকে অত্যন্ত উপেক্ষিত মনে করেন, কারণ, তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া অপর এক ব্যক্তি (সত্যবাবু তাঁহার ডায়েরীতে এই ব্যক্তির নামও উল্লেখ করিয়াছেন)। মেজরাণীকে বাড়ী লইয়া যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার যে প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল, তাহা হস্তগত করাই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য। তাঁহাকে ধরিবার জন্য পোড়াদহে যে লোকজন পাঠান হইয়াছিল, তাহাতেই সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে রাজপরিবারের লোকেরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন না, এবং তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, রাণীকে হাত করার অর্থ জমিদারী হাত করা—রাণীর অংশের বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা হাত করা। তাঁহার নিজ ডায়েরী হইতে এবং তাঁহার ডায়েরীদ্বারা সমর্থিত অন্যান্য সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহাদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না, এবং ইহাও সত্য যে কলেজের ছাত্র এই দরিদ্র যুবকের হৃদয়ে যৌবনোচিত কোন ঔদার্য্য ছিল না, বরং তাঁহার মাথার ভিতরে এমন চালবাজি, বজ্জাতি ও হীনতা ছিল—যাহা ষাট বৎসর বয়সের বৃদ্ধ মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

জয়দেবপুরে প্রত্যাবর্ত্তন

পোড়াদহ হইতে প্রেরিত একখানা টেলিগ্রাম এবং দামুকদিয়া ঘাট হইতে প্রেরিত আর একখানা টেলিগ্রামে দেখা যায়, পোড়াদহ হইতে তাঁহারা চাঁদপুর মেলে যাত্রা করেন ও ১১ মে দুপুর রাত্রিতে জয়দেবপুর পৌঁছেন, নারায়ণগঞ্জ হইতে তাঁহাদের গাড়ী ঢাকা হইয়া যায়, এদিকে বড়কুমারও ডাউন ট্রেণে ঢাকা আসিতেছিলেন। মিঃ চৌধুরী বলিয়াছেন, উহাতে বড়কুমারের ঔদাসীন্যই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, মেজরাণী বাড়ী পৌঁছিয়া অন্যান্য মহিলাদের সহিত সাক্ষাৎ কালে যে কান্নার রোল উঠিবে, তাহা যাহাতে না শুনিতে হয়; তজ্জন্যই বড়কুমার ঢাকা আসিতেছিলেন।

সত্যবাবুর ডায়েরীতে দেখা যায়, ১১ই মে রাত্রিতে তিনি ছোটকুমারের সঙ্গে বড় দালানে ছিলেন।

পরদিন প্রাতে সত্যবাবু, ম্যানেজার মিঃ সেনের সহিত দেখা করেন, এবং তৃতীয় কুমারের সাক্ষাতেই বলেন,—'দ্বিতীয়কুমার কোন উইল করিয়া যান নাই, তবে তাঁহার স্ত্রীকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়া গিয়াছেন।' ইহা মিথ্যাকথা, উভয় পক্ষের স্বীকৃতি অনুসারেই ইহা মিথ্যা বলিয়া দেখা যাইতেছে।

সত্যবাবু বলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক লক্ষ্য করিয়া তিনি কেবলমাত্র পরিহাসচ্ছলে দত্তকের কথা বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কুমারের মৃত্যুকে পরিবারের লোকেরা একটা ভীষণ অমঙ্গল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাণে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা দূর হইবার পূর্ব্বেই সত্যবাবু এই ক্ষুদ্র পরিহাসটুকু করিয়াছিলেন!

মেজোরাণীর চালচলন

এই সময়ে দ্বিতীয় রাণীর আচরণ ঠিক 'সদ্য-বিধবা' হিন্দু স্ত্রীর মতই দেখা গিয়াছিল। তিনি উপরের তালার শয়নগৃহে পড়িয়া থাকিয়া অবিরত রোদন করিতেন। সত্যবাবুর ডায়েরীর একস্থলে যাহা লিখিত আছে তাহাতে দেখা যায় যে, মেজোরাণী এতই শোকসন্তপ্তা হইয়াছিলেন যে, তিনি অনেকটা উন্মাদের মত হইয়া গিয়াছিলেন। এই সময় তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে পর্য্যন্ত নাকি চিনিতে পারিতেন না। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, বিল্লু এবং অপর কয়েক জন বয়স্থা মহিলা—যাঁহারা এই সময়ে রাণীকে দেখিতে আসিতেন,—তাঁহাদের সাক্ষ্য হইতে স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, দ্বিতীয় রাণী এই সময় বিশেষ শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা সত্যবাবু সময় সময় তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, কিন্তু রাণী তাঁহার মুখ ফিরাইয়া লইতেন এবং বলিতেন,—**"আমার নিকট আসিও না। তুমি আমাকে রাণী করিয়াছিলে, এবং তুমিই আমাকে ভিখারিণী করিয়াছ।"** এই কথাদ্বারা অবশ্য কিছুই প্রমাণিত হয় না। তবে ইহাতে প্রয়োজনীয় কথা একটু আছে যে, দ্বিতীয় রাণী ঠিক সদ্য-বিধবার ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে এমন কোনই ইঙ্গিত নাই যে, যে ষড়যন্ত্রের ফলে বিষ প্রয়োগে কুমারকে মৃত্যুর দ্বারে পৌছান হইয়াছিল বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে, রাণী সেই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোন কথা জানিতেন অথবা তিনি নিজেই এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন। এই সব রাণীর আচরণ সম্পর্কে যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একটা কথায় একমত হইয়াছেন। কথাটা এই যে, কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী প্রায়ই বলিতেন যে, মৃত্যুর পুর্ব্বে তিনি কুমারকে ভাল করিয়া দেখিতে কিম্বা শুশ্রূষা করিতেও পান নাই। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন,—কি ঘটিয়াছে এই সম্পর্কে সামান্য একটু কথা জিজ্ঞাসা করিলেই রাণী কাঁদিয়া আকুল হইতেন। তাই তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যাইত না। রাণী নিজেই তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, বিধবা অথবা কাল্পনিক 'বিধবা' হইবার পর তিনি যখন সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার মাতার সহিত দেখা করেন, তখন তাঁহার কি ঘটিয়াছিল, এই সম্পর্কে

কোন আলোচনা করেন নাই, কারণ এই প্রসঙ্গটি অত্যন্ত মনঃপীড়াদায়ক ছিল। দার্জ্জিলিংএ কি ঘটিয়াছিল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত বিবরণ দ্বারা বিশেষ কিছুই প্রমাণিত হয় না। দার্জ্জিলিংএর ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেলে এই বিস্তৃত বিবরণের যে মূল্য হয়, তাহা আর কিছুতেই হয় না। বাদীর আত্মপরিচয় প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁহাকে সত্য সত্যই যদি দ্বিতীয় কুমার বলিয়া বিশ্বাস করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্মৃতির রাজ্যে চাঞ্চল্য আরম্ভ হয়, পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠে এবং এই বিস্তৃত বিবরণকে অতি অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে থাকে।

পরিকল্পিত মৃত্যুর পর ১১ দিবসে দ্বিতীয় কুমারের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়। তথাপি ইহাকেই কুমারের মৃত্যুর চূড়ান্ত প্রমাণ বলা যায় না; ইহাকে কুমারের মৃত্যু সম্পর্কে লোকের বিশ্বাসের একটা প্রমাণ বলা চলে। ১৮ই মে তারিখে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়। এই শ্রাদ্ধের একঅংশ হইতেছে একোদ্দিষ্ট, দ্বিতীয় রাণী বিভাবতী তারা বাড়ীতে ইহা সম্পন্ন করেন। রাজবাড়ীর নিকটস্থ মাধববাড়ীতে তৃতীয় কুমার বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ সম্পাদন করেন।

বাদী যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, এই শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই এইরূপ গুজব রটে যে, দ্বিতীয় কুমারের শব দাহ হয় নাই; অতএব কুশপুত্তলিকা দাহ না করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইতে পারে কি না? ইহার প্রায় চারিমাস কাল পরে কেবল ভাওয়ালের সর্ব্বত্র নয়—বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ জনরব উঠে যে, ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায় জীবিত আছেন।

মেজো রাজকুমার সম্বন্ধে বিভিন্ন গুজব

একটা জনরব, কেবল জনরবের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই প্রমাণ করিতে পারে না; জনরবে যাহা বর্ণিত হয়, তাহা জনরব দ্বারা প্রমাণিত হয় না, তবে অন্যান্য তথ্যের ন্যায় জনরবও এমন কি তথ্য, যাহাদ্বারা প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রমাণের সহায়তা হইতে পারে। এই দুইটি জনরব প্রমাণ করিবার জন্য আমি সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছি; জনরবে বর্ণিত তথ্যের প্রমাণ হিসাবে তাহা করি নাই; অন্য কোন উপায়ে যাহার ব্যাখ্যা করা যায় না, সেইরূপ একটা তথ্যের ব্যাখ্যা করার জন্য এই শ্রেণীর প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাদীর অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা দেখাইবার জন্যই এরূপ প্রমাণের প্রয়োজন হইয়াছে।

বাদী যেরূপ দৃঢ়তার সহিত এই দুইটি জনরব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন, বিবাদী-ও সেইরূপ সমান সমান দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিয়াছেন। তবে আমি

এস্থলে একখানি পত্রের কথা উল্লেখ করিব, এই পত্রই বিবাদীকে স্বীকার করিতে বাধ্য করে যে, ১৯১৭ সালে, বাদীর অভ্যুদয়ের চারিবৎসর পূর্ব্বে অল্প সময়ের জন্য একটা গুজব রটিয়াছিল যে, দ্বিতীয় কুমার জীবিত আছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯১৭ সালেই যে এরূপ একটা গুজব রাষ্ট্র হইয়াছিল, বাদী পক্ষ তাহার যথারীতি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন।

কুশপুত্তলিকা

এই কুশপুত্তলিকা দাহ সম্পর্কে জেরায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হয় যে, এই প্রথা অজ্ঞাত, অপ্রচলিত, অথবা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। জেরা দ্বারা ইহা প্রমাণের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হইয়াছে। শাস্ত্রে কুশপুত্তলিকার কথা আছে, এই পথ রক্ষাও করা হয়; তবে কদাচিৎ এরূপ ব্যাপার ঘটে। কোনও লোক মারা গিয়াছে, অথবা তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এই বলিয়া অনুমান করিবার কারণ ঘটিয়াছে; অথচ তাহার শব সংকার হয় নাই, কিম্বা হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই,—এরূপ স্থলে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে তাহার শবের অনুকল্প কুশ (একপ্রকার ঘাস) দ্বারা নির্ম্মিত আকৃতি যথারীতি দাহ না করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পাদিত হইতে পারে না। যথারীতি শব দাহের অনুকল্প এই অনুষ্ঠান তাহার শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই করিতে হয়। বিবাদী পক্ষের ৯২নং সাক্ষী ফণীবাবু স্বীকার করিয়াছেন,—তাঁহার ভ্রাতা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, এই ব্যক্তির মৃতদেহ নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাই তাঁহার ভ্রাতার শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে কুশপুত্তলিকা দাহ করিতে হইয়াছিল।

শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে দ্বিতীয় কুমারের কুশপুত্তলিকা দাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, এই বিষয়ে যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহারা জয়দেবপুরেই ছিলেন। এই সাক্ষীদের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, তাহার জামাতা। কুমারের ভাগিনেয় বিল্লু (বাদী পক্ষের ৯৩৮নং সাক্ষী) ব্যতীত পুরাতন ভৃত্য, কর্ম্মচারী এবং আত্মীয়গণ আছেন। ইঁহারা ঘটনার সময়ে জয়দেবপুরে ছিলেন। (বাদী পক্ষের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ৯, ১৫, ১৬, ৩৫, ৩২, ৪৮, ৫২, ৩৭, ৮৭, ১৫৫, ২৬২, ৮৫২, ৫২২, ৫৫৭, ৮৯২, ৯৫৮, ৮৫২ নং সাক্ষী) ইহাদের মধ্যে স্থূলের জমিদার এবং বিল্লুর শ্বশুর অখিলবাবু ছিলেন। শ্রাদ্ধের সময় তিনি নিশ্চয়ই সেখানে ছিলেন। ১৯০৯ সালের ১১ই মে তারিখে প্রেরিত তাঁহার তারে (২৬২নং একজিবিট) তিনি বলিয়াছিলেন যে ১৩ই মে তারিখে তিনি আসিতেছেন। ইহা হইতেই তাহার উপস্থিতির কথা প্রমাণিত হয়। ১৮ই মে তারিখে

শ্রাদ্ধ হয়। মৃত্যুর দিনকে প্রথম দিন ধরিয়া হিসাব করিয়া ১১শ দিবসে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই সাক্ষী বলেন, তিনি আসিয়া সত্য-বাবুকে জয়দেবপুরে দেখিতে পান। এবং তাঁহার আগমনের ২ কিম্বা ৩ দিন পরে সত্যবাবু কলিকাতা চলিয়া যান। অতএব সত্যবাবু যখন বলেন যে, তিনি শ্রাদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন না, ১৬ই তারিখে কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কথা সত্য। শ্রাদ্ধের কাছাকাছি সময়ে সত্যবাবু সেখানে ছিলেন, ইহা নিশ্চিত। তথাপি সত্যবাবু নিজেই কুমারের শব দাহ করিয়াছেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান এবং কেলেঙ্কারী এড়াইবার আগ্রহ হইতেই কুশপুত্তলিকা দাহের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ার যে প্রমাণ আছে, তাহার মধ্যে বিশ্বাসের অযোগ্য কিছু নাই। কোন কোন সাক্ষী ভুল করিয়া বলিয়াছেন যে, সত্যবাবু শ্রাদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি যে শ্রাদ্ধের সময় হাজির ছিলেন না, একথা এমন কি রাণীর পর্য্যন্ত মনে উঠে নাই; সত্যবাবু সাক্ষীর কাঠগড়ায় না আসা পর্য্যন্ত এই কথাটি বলার বিষয় কাহারও মনে স্থান পায় নাই।

অপরদিকে সাক্ষীদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, কুশপুত্তলিকা সম্বন্ধে এই আলোচনা হয় নাই। এই সকল সাক্ষী হইতেছেন রাণী এবং সত্যবাবু ব্যতীত, রায়সাহেব যোগেন্দ্র বাঁড়ুযো (বিবাদীপক্ষের ৩১০নং সাক্ষী), ফণীবাবু এবং এষ্টেটের আরও কয়েকজন বর্ত্তমান কর্ম্মচারী। বাহিরের সাক্ষী বলিয়া একমাত্র যে ব্যক্তিকে ধরা যায়, সে হইতেছে শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে ব্রাহ্মণকে আনা হইয়াছিল, সে অর্থাৎ বিবাদীপক্ষের ২৮৩নং সাক্ষী। সে বলিয়াছে যে, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং টঙ্গী হইতে সে ট্রেণে গিয়াছিল এবং তাহাকে ট্রেণের ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু দেখা যায় যে, তখনও টঙ্গী-ভৈরব লাইন খোলা হয় নাই। সুনিশ্চিত কথা তথ্য দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভাওয়াল এষ্টেটের বর্ত্তমান কর্ম্মচারীদের কিম্বা কোনও সাক্ষী বিশেষের বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করিয়া এই মামলায় কোন কিছু নির্দ্ধারণ না করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এই কুশপুত্তলিকার যে প্রস্তাব, তাহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও অন্যান্য উপায়ে ইহা প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার দ্বারা কোনই প্রমাণের ভিত্তিতে উপনীত হওয়া যায় না। কুমারের শব দাহ হইয়াছে কিনা, তাহাই এস্থলে আসল প্রশ্ন। যদি প্রমাণিত হয় যে, শব দাহ হইয়াছে, তাহা হইলে কুশপুত্তলিকার প্রস্তাব দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। আর যদি শব দাহ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, কুশপুত্তলিকার কথা হইয়াছে। কারণ দার্জ্জিলিংএ সমবেত জনতার মধ্যে কেহ কেহ বলিতে সুরু করিয়াছিল যে, শব দাহ হয়

নাই, এই বিষয়ে যে সকল প্রমাণ আছে সেগুলি অগ্রাহ্য করিবার কোন উপযুক্ত কারণ দেখিতেছি না।

মেজোকুমার সম্বন্ধে নানা গুজব

মেজো কুমার জীবিত আছেন, এই গুজবের দ্বারা কিছু প্রমাণিত না হইলেও একথা ঠিক যে,ইহা রটিয়াছিল। বিবাদীপক্ষ বলিয়াছেন, এই গুজব ১৯১৭ সালে রটিয়াছিল, তাহা ঠিক নহে। ১৯০৯ সালেই এই গুজব রটিয়াছিল। কেবল যে শত শত সাক্ষীই ইহা শুনিয়াছিল এমন নয়, ইহা যাহারা শুনিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ঢাকার আর্ম্মেনিয়ান ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় আর্ম্মেনিয়ান গীর্জ্জার সভাপতি মিঃ ষ্টীফেন (বাদীপক্ষের ১১২ নং সাক্ষী), এই রাজ পরিবারের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত, ময়মনসিংহের জমিদার হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, ১৯০৯ সালে জয়দেবপুর স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেশ রায় (বাদীপক্ষের ২৬২নং সাক্ষী), কলিকাতার লক্ষপতি শ্রীযুত হলধর রায় (বাদী পক্ষের ২৪৮নং সাক্ষী), সরকারী স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত। ঢাকার জমিদার নবেন্দু বসাক (বাদী পক্ষের ৪২৬ নং সাক্ষী), ঢাকা-প্রকাশ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বাদী পক্ষের ৩৫৫নং সাক্ষী), জগদ্বিখ্যাত গণিতজ্ঞ শ্রীযুত সোমেশচন্দ্র বসু (বাদী পক্ষের ৪৩৫নং সাক্ষী), ঢাকার প্রবীণ উকিল রেবতীবাবু (বাদী পক্ষের ৬২নং সাক্ষী), অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইনস্পেক্টর শ্রীযুত শরৎচন্দ্র ঘোষ (বাদী পক্ষের ৭৮৯ নং সাক্ষী), অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কালীমোহন ঘোষ, প্রবীণ উকিল এবং ঢাকা সহরের প্রতিষ্ঠাপন্ন এবং বিত্তশালী জমিদার হারাণ বিশ্বাস, অবসরপ্রাপ্ত মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু হরেন্দ্রকুমার ঘোষ, ব্যারিষ্টার মিঃ এস, কে, নাগ, জমিদার ও ব্যাঙ্কার রাজেন্দ্রকুমার রায়, ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন রায় সাহেব আনন্দকুমার গাঙ্গুলী, জয়দেবপুর স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র বসু, ঢাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ দেবেন্দ্র বসু, কলিকাতার বিশিষ্ট বিত্তশালী ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পি, সি, গুপ্ত, ঢাকার জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল বসাক প্রভৃতির ন্যায় দেশ-প্রসিদ্ধ লোকও আছেন। আমি যাহাদের নাম করি নাই, তাঁহাদের মধ্যে আরও এমন বহু বিশিষ্ট, পদস্থ ও প্রবীণ ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিবার বিন্দুমাত্র কারণও নাই। আমি তাঁহাদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করি।

কেবল যে তাঁহাদের বিশ্বস্ততার দিকে চাহিয়াই সাক্ষ্য বিশ্বাস করা হইতেছে এমন নহে। ১৯১৭ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বাদীর আত্মপ্রকাশের

তিন বৎসরেরও পূর্ব্বে রাজকুমারদের পিতামহী রাণী সত্যভামা দেবী বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের নিকট নিম্নের চিঠিখানা লিখিয়াছিলেন :—

রাণী সত্যভামা দেবীর পত্র

জয়দেবপুর রাজবাটী
ভাওয়াল, ঢাকা,
১৮ই ভাদ্র, ১৩২৪

"কল্যাণ ভাজনেষু

"আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। আমাদের উভয়ের মধ্যে বহুদিন যাবৎ জানাশুনা থকো সত্ত্বেও, ইহার পূর্ব্বে আর আমরা কোনদিন চিঠিপত্র লিখি নাই। আমি স্বর্গীয় রাজা কালীনারায়ণ রায়ের পত্নী, কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায়, কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায় নামে আমার তিন পৌত্র ছিল। তাহারা আমার পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের তিনটি ছেলে। তিনটী পৌত্রই সাবালক হইয়া অকালে মারা যায়। তিনজনেরই বিবাহ হইয়াছিল। তাহাদের কাহারও কোন পুত্র-কন্যা হয় নাই, কাজেই এই রাজ পরিবারটি নির্ব্বংশ হইল।

"আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পৌত্র জয়দেবপুর তাহার নিজ বাড়ীতে মারা যায়, এবং দ্বিতীয়টি দার্জ্জিলিংয়ে ও কনিষ্ঠটি ঢাকায় মারা যায়। প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে আমার দ্বিতীয় পৌত্র তাহার স্ত্রী ও স্ত্রীর ভাইকে লইয়া দার্জ্জিলিং যায়। সে সেখানে রক্তাতিসারে মারা যায়।"

"গত দুই মাস যাবৎ একটি গুজব রটিয়াছে যে, 'ভাওয়ালের মধ্যম-কুমার জীবিত আছে'; মৃত্যুর পর তাহাকে নাকি একটি গুহার নিকটে দাহ করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; কিন্তু সে সময় তুমুল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় তাহার শবদাহ করা হয় নাই। মুখাগ্নি করিয়া তাহাকে সেখানে ফেলিয়া আসা হয়। ইহার পর সদলবলে একজন সন্ন্যাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করে। বর্ত্তমানে নাকি সে সেই সন্ন্যাসীদের সহিত আছে; সংসারের প্রতি সে উদাসীন এবং সংসার ক্ষেত্রে পুনঃপ্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক। সে যে ঠিক কোথায় আছে, আমি জানি না; নানা লোকে নানা স্থানের কথাই বলিতেছে। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলার সর্ব্বত্র এই গুজব রটিয়াছে। এ সম্বন্ধে অসংখ্য লোক আমার নিকট সংবাদ জানিতে চাহিতেছে। আমি কি করিব বুঝিতে না পারিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছি।

"যাহারা স্বর্গীয় দ্বিতীয় কুমারের সহিত দার্জ্জিলিং গিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতে আমি জানিতে পারিলাম যে, আপনি তাহার মৃত্যুর সময় দার্জ্জিলিংয়ে উপস্থিত ছিলেন এবং আপনিই গঙ্গাজল ও তুলসীপাতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই কথা সত্য কি না তাহা জানিবার জন্যই আমি আপনার নিকট চিঠি লিখিতেছি; সত্যই কি দ্বিতীয় কুমারের শব দাহ করা হইয়াছিল? আপনি অবশ্যই ইহা জানেন। আপনি যতদূর সত্যঘটনা জানেন, আমাকে যদি তাহা জানান, তবে আমি কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি। আমি আশা করি, আপনার সুবিধামত আমাকে এবিষয় জানাইতে আপনি ক্রটি করিবেন না। আমার আর কিছু লিখিবার নাই।" ইতি।

বিবাদী পক্ষও এই পত্রের উপরই প্রধানতঃ জোর দিয়াছিলেন। তাঁহারাও এই পত্রের লিখিত বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। মধ্যমকুমারের সত্য সত্যই যে মৃত্যু হইয়াছিল এবং কুমারের জীবিত থাকা সম্বন্ধে যে গুজব রটিয়াছিল, ঐ পত্রে তাহা উল্লিখিত আছে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন, এই চিঠি লিখিবার কিছু দিন পূর্ব্বে এক মৌনি-সন্ন্যাসী জয়দেবপুরে আসেন। যে সন্ন্যাসী বাক্য বন্ধ করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত সন্ন্যাসীর আগমন উপলক্ষ করিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজার নিকট পত্র লিখিবার আবশ্যক হইয়াছিল। মধ্যমকুমার জীবিত আছেন কি না,সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে উক্ত সন্ন্যাসী তদুত্তরে কাগজের উপর কি যেন লিখিয়া দেন, তাহাতে আশার সঞ্চার হয়। তবে ঐ লেখার ফলেই যে গুজব রটিয়াছিল, তাহা নহে; বরং সন্ন্যাসীর লেখার জন্য সে গুজবের ভিত্তি অধিক দৃঢ় হইয়াছিল।

কুমারের জীবিত থাকা সম্বন্ধে নানা গুজব

দ্বিতীয় কুমারের কাল্পনিক মৃত্যুর চারি মাস পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে সেই গুজবের সৃষ্টি হয় কারণ, কোনও এক সন্ন্যাসী ঐ সময় মাধববাড়ীতে আসেন এবং মধ্যম কুমারের সম্বন্ধে কি যেন বলিয়া যান। ১৯২৭ সালে এই সন্ন্যাসীর অগমনের ·বিষয় বিবাদীপক্ষ স্বীকার করেন। সন্ন্যাসীর আগমনের পরই যে গুজব রটিয়াছিল, বিবাদীপক্ষ তাহা অস্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, ঐ গুজবের জন্য জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীই উক্ত সন্ন্যাসীকে মধ্যম কুমার বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাহা স্বীকার করেন না। কিন্তু বর্দ্ধমানের মহারাজা ২০-৯-১৭ তারিখের পত্রে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, তিনি দার্জ্জিলিংএর শ্মশান ঘাটে কতকগুলি লোকের জনতা দেখিয়াছিলেন, এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সেখানে দ্বিতীয়

কুমারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হইতেছে, তবে তাহা সন্ধ্যায় কি প্রাতঃকালে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই (২৫৬ নং একজিবিট), উক্ত পত্রের প্রমাণের উপর জোর দিয়াই বিবাদী পক্ষের সাক্ষ্যে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, ঐ ঘটনার পর মধ্যম কুমারের জীবিত থাকার গুজব লোপ পায়।

কিন্তু একবার যে রটনা হয়, অকস্মাৎ তাহা বিলুপ্ত হয় না। মানুষ সহজে তাহা ভুলিতে পারে না। মধ্যম রাণী ঐ রটনার আধুনিকতার বিষয় বর্ণনা করিলেও, ইহা নিঃসন্দেহ যে, পূর্ব্ব হইতে যদি ঐ ধরণের কোনও গুজব প্রচারিত না থাকিত, তাহা হইলে ১৯২১ সালের মৌনি-সন্ন্যাসীসংক্রান্ত কাহিনী এবং দ্বিতীয় কুমার জীবিত আছেন কি না—এরূপ প্রশ্ন কখনও কাহারও মনে আসিত না। এ সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, দ্বিতীয় কুমার জীবিত আছেন বলিয়া তখন ভাওয়ালে জোর গুজব চলিয়াছিল এবং কুমারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কীয় প্রশ্ন কেবল যে বাদীর আত্ম প্রকাশের পরই উঠিয়াছিল, তাহা নহে। সে প্রশ্নের আলোচনা পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল।

তখন সত্য কি করিলেন

মধ্যম কুমারের শ্রাদ্ধ দিনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাই, সে এক শোচনীয় ব্যাপার; সে শ্রাদ্ধে কোনও আড়ম্বর নাই। ১৮ই মে কুমারের শ্রাদ্ধ হয়, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১৬ই মে অথবা প্রায় ঐ সময়ে সত্যবাবু কলিকাতায় চলিয়া যান। মুকুন্দ গুণও সত্যবাবুর সহিত ঐ সময় কলিকাতায় যায়। প্রকাশ থাকে যে, এই মুকুন্দ গুণ কুমারের লোকজনের সহিত দার্জ্জিলিং গিয়াছিল। সত্য বাবু বলেন, তাঁহার মা তখন পীড়িতা ছিলেন, সেইজন্য এবং উকিলের সহিত পরামর্শ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি কলিকাতা গিয়াছিলেন। যে কারণে তাঁহার উকীলের পরামর্শ লইবার আবশ্যক হয় এবং মধ্যম কুমারের শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই এত তাড়াতাড়ি তাহা আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা এই যে, বড়কুমার সম্পত্তি শাসন সংরক্ষণের জন্য এক খানি দলিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং সেই দলিল অনুসারে সম্পত্তি পরিচালনায় সত্য বাবুর ভগ্নী রাণী বিভাবতী দেবীর কোনও হাত ছিল না। মাসিক তাঁহার জন্য হাজার টাকা হিসাবে মাসোহারা বরাদ্দ হইয়াছিল। ঐ প্রকারের এক দলিল যে প্রস্তুত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ দলিলের উদ্দেশ্য ছিল; মধ্যম রাণীর ভ্রাতাকে দূরে রাখা; কারণ, তাঁহার মনোভাব সকলেই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন সত্যবাবুর নিজের ডাইরীতে (দৈনন্দিন কার্য্যবিবরণী)

লিখিত তাঁহার কার্যাকলাপ হইতে বেশ বুঝা যাইবে, তখন তিনি ভাওয়াল-এষ্টেটের এক বিষম আপদ্‌ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বড় কুমারের দলিল

বড়কুমার যে দলিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও স্বত্ব বা অধিকার নষ্ট হওয়ার কিছুই ছিল না। এষ্টেটের তদানীন্তন আর্থিক অবস্থায় এষ্টেটের প্রত্যেক মালিককে কি পরিমাণ মাসোহারা দেওয়া যাইতে পারে, দলিলে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছিল। ১৯১১ সালে ভাওয়াল এষ্টেট যখন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে যায় তাহার পর হইতেই পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেটের মালিকানদিগের প্রত্যেককে মাসিক ১১০০৲ হিসাবে মাসোহারা দিয়াছেন, দেখা যায়। এই অঙ্কের অনুপাতে বড় কুমারের কৃত দলিলে উল্লিখিত মাসোহারার পরিমাণ প্রায় সমান দেখা যায়। অতঃপর সে দলিল সহসা উড়িয়া যায়।

বিভাবতীকে বাধ্য করিবার বন্দোবস্ত

কলিকাতা হইতে ভাওয়ালে ফিরিবার পর, আপনার ভগ্নীকে আয়ত্ত করিবার জন্য, সত্য বাবু তৎকালিক ম্যানেজার মিঃ সেনের সহিত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন মিঃ সেনের হিসাব নিকাশের মামলায় পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। মিঃ সেনকে পাওয়া সত্য বাবুর পক্ষে সহজ হইয়া ছিল। কারণ মিঃ সেন বুঝিয়াছিলেন, সত্য বাবুর সহযোগে তাঁহার ভগ্নীকে হাত করিতে পারিলে, তিনি অনেকটা নিরাপদ হইতে পারেন। ১৯০৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর সত্যসত্যই মধ্যম রাণীর নিকট হইতে ছাড়পত্রের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। একজিবিট ৩৯৯ (১৪) ১৯০৭ সালের ১১ই জুলাই তাঁহার ভ্রাতা সত্য বাবুকে এই অনুরোধ জানান যে, কুমারেরা মিঃ সেনকে যাহাতে "অল্প রেহাই দেন," সত্য বাবু যেন সে ব্যবস্থা করেন ৬-৮-১৯০৯ তারিখে মিঃ সেন, সত্য বাবুকে জানান যে, তহবিল তছরুপের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার উপযুক্ত যথেষ্ট প্রমাণ তাঁহার আছে (১৯০৯ সালের ১৬ই আগষ্টের হিসাব দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বে না হইলেও জুন মাস হইতে মিঃ সেনের কার্য্যকালের অবসান ঘটে। কারণ প্রমাণে দেখা যায়—মিঃ সেন ঐ সময় ঢাকায় আসিয়া বাস করিতেছেন, সূত্রাপুরে এক বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন এবং তাঁহার কেরাণী (বাদী পক্ষের ৯৫২ নং সাক্ষী) মনোমোহনের সহায়তায় হিসাবপত্র মিলাইতেছেন এবং ১৯শে জুলাই হইতে তিনি ম্যানেজারের পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন।

ইতিমধ্যে মিঃ সেন এবং সত্যবাবু তাঁহার মাতাকে ভাওয়ালে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, মধ্যম রাণীকে রাজপরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ণরূপে সত্যবাবুর আয়ত্তাধীনে আনা। সত্যবাবু মিঃসেনের নিকট হইতেই মাতার আগমনের তারিখ জানিতে পারেন ১৩ই জুন সত্যবাবুর মাতার পৌছিবার কথা থাকায়, ঐদিন কলুটোলার এক বাড়ী ভাড়া করা হয়। এই সময় মিঃ সেন তাঁহাব পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। ২রা জুন ঐ পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয় (২২শে জুনের লেখা দ্রষ্টব্য) সত্যবাবুর মাতা ঢাকায় পৌছিয়া কলুটোলার বাড়ীতে উঠেন। পরে তাঁহাকে সদরঘাটের এক বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঢাকার বাড়ীতে রাণী বিভাবতী

১৯শে জুন মধ্যম রাণী এই বাড়ীতে আসিয়া পৌছেন। **মধ্যম রাণীকে এই বাড়ীতে আনিবার সময় ঢাকা রেল ষ্টেশনে এক অতি লজ্জাকর ও কলঙ্ক-জনক দৃশ্যের অভিনয় হইয়াছিল।** রাজপরিবারের লোকেরা প্রস্তাব করেন, আহারাদির পর রাণীকে ঐ বাড়ীতে পাঠান হবে। **কিন্তু সত্যবাবু বলপুর্ব্বক রাণীকে জাপটাইয়া ধরিয়া টানিয়া আনিবার চেষ্টা করেন। এই জন্য দারোয়ানের দ্বারা গলাধাক্কা দিয়া সত্যবাবুকে তাড়াইয়া দিবার আবশ্যক হয়।** এই সকল ইতর ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদানের আবশ্যক নাই। সত্যবাবু, সত্যবাবুর মাতা এবং সত্যবাবুর স্ত্রী, ঢাকায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কিন্তু পরে তাঁহারা নলগোলার এক বাড়ীতে আসেন। মধ্যম রাণী এই বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করেন, কিন্তু ইহা বেশ বুঝা যায়, মধ্যম রাণী বেশী সময় মা'র কাছে থাকা পছন্দ করিতেন না।

২রা অক্টোবর সত্যবাবু তাঁহার ডাইরীতে লেখেন,—'এখনও ভগ্নীর প্রতিপক্ষের দিকে ঝোঁক আছে। তিনি এখানে থাকিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি চুপ করিয়া থাকেন।" মধ্যম রাণী যখন ঢাকায় আসা যাওয়া আরম্ভ করিলেন, রাণীর মন কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয়—ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বড়কুমার রাণীর সঙ্গে আসিতেন এবং যাইবার সময় রাণীর পদ গৌরবের উপযুক্ত আরদালী এবং পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া যাইতেন। কিন্তু সত্যবাবু বড়কুমারের মনোভাব বুঝিতে পারিতেন না। সত্যবাবু ঐ সকল আরদালি, এবং পরিচারিকাদিগকে গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করিতেন। একবার বড়কুমার মধ্যম রাণীর সঙ্গে আসিতে পারেন নাই। এই উপলক্ষে

সত্যবাবু তাঁহার ডাইরীতে লেখেন,—"পাছে আমি এষ্টেটের কোনও অনিষ্ট করি, এই আশঙ্কায় বড়কুমার তাঁহার ভ্রাতার বিধবা পত্নীর প্রহরীরূপে আসিতে পারিলেন না। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।"

(২২।৯ তারিখের লেখা দ্রষ্টব্য)

২৩শে সেপ্টেম্বর সত্যবাবু সংবাদ পান,—ছোটকুমার সময় সময় বড়রাণীকে কড়া কথায় তিরস্কার করেন। সত্যবাবু আনন্দের সহিত ডাইরীতে লেখেন,—"পারিবারিক কলহ পাকাপাকি ভাবেই বাধিবার উপক্রম হইয়াছে।" তারপর বড়রাণী এবং ছোটরাণীর মধ্যে ঝগড়ার সংবাদ পাইয়া সত্যবাবু লিখেন,—"বড়ই শুভ সূচনা।" (১৭-১০-১৯০৯)। ইন্দুময়ী দেবী কি উপায়ে রাণীকে এমন আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন—তাহা ভাবিয়া একস্থানে সত্যবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। মাতাকে আনিবার কি প্রয়োজন হইল, সত্যবাবুকে জিজ্ঞাসা করা হইলে, উত্তরে সত্যবাবু বলেন, তাঁহার ভগ্নী একাকী থাকিতে পারেন না বলিয়া তিনি তাঁহার মাতাকে লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আসল কথা এই যে, মাতাকে ভগ্নীর নিকট না আনিলে রাজপরিবার হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর হয় না। মিঃ সেনের সহযোগে সত্যবাবুর কার্য্যকলাপ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁহার ভগ্নীর তখন অন্যান্য পরিবারের প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল; ভগ্নীকে আয়ত্তাধীন করিয়া তাঁহার সম্পত্তি হাত করিবার জন্যই সত্যবাবু যত কিছু আয়োজন করিতেছিলেন। সত্যবাবুর লেখায় প্রকাশ,—এই বিপদের বিষয় অবগত হইয়াই সত্যবাবুকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য অন্য পক্ষ চেষ্টা করিতেছিল। সত্যবাবুর গৃহ সজ্জিত করিবার জন্য তাঁহারা সরঞ্জামাদি পাঠাইতেছিলেন; বিছানাপত্র সরবরাহ করিতেছিলেন; চড়িবার জন্য ঘোড়া পাঠাইয়াছিলেন।

জীবন বীমার টাকার কথা

১৯০৯ সালের ১লা নবেম্বর মিঃ নীডহাম ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন। মেজরাণী ৪ঠা নবেম্বর তাঁহার ভাইকে তাঁহার এজেণ্ট নিযুক্ত করেন, এবং তৎপর দিবস ইনসিওরেন্স কোম্পানীর নিকট মেজকুমারের প্রাপ্য ত্রিশ হাজার টাকার জন্য আবেদন করেন। এই সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে হিসাব দিয়াছি। ১৫ই তারিখ মিঃ নীডহাম বড়কুমারের নিকট এক পত্র লিখেন। উহাতে এষ্টেট হইতে প্রিমিয়ম দেওয়া হইয়াছে কি না, এবং দেওয়া হইয়া থাকিলে বড়কুমার তাঁহাদের অংশ ছাড়িয়া দিতে রাজী আছেন কি না, তাহা জানিতে চাহেন। ডায়েরী হইতে দেখা যায় যে, সত্যবাবু উত্তরাধিকারী গণ্য হওয়া সম্পর্কিত

সার্টিফিকেট লইয়াছেন; এবং ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে, অপর দুই কুমার ইনসিওরেন্সের টাকার অংশের দাবী করেন নাই। এবং ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বড় কুমারের মৃত্যুর পূর্ব্বে কলিকাতাতেই টাকা তুলিয়াছেন। ডায়েরী উপস্থিত করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই মামলায় ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, এষ্টেটই টাকা তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনি শুধু চেকখানি লইয়াছেন। এখন ইহা নিঃসন্দেহ যে, তিনিই টাকা তুলিবার জন্য ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর নিকট মৃত্যু সম্পর্কিত এফিডেভিট পাঠাইয়াছেন। সর্ব্বপ্রথম কর্ণেল ক্যালভার্টের নিকট হইতে এফিডেভিট নেওয়া হইয়াছিল। তিনিও এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়াছেন। কুমারের অসুখ এবং মৃত্যু সম্পর্কে এই এফিডেভিটটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দলিল। কর্ণেল ক্যালভার্টের নিকট এফিডেভিটের জন্য কুমারের লোকগণ গিয়াছিল বলিয়া বলা হইয়াছে। আবার বলা হইয়াছে যে, ডাঃ শিশির পালের অনুরোধে তিনি অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চন্দের নিকট এফিডেভিট পাঠাইয়াছিলেন, মিঃ চন্দ এখনও দার্জ্জিলিংএ বাস করিতেছেন। ডাঃ ক্যালভার্টের প্রদত্ত মৃত্যু সম্পর্কিত এফিডেভিট নেওয়ার জন্য এষ্টেট হইতে কোনও লোককে দার্জ্জিলিং পাঠান হইয়াছে বলিয়া, কোন সাক্ষী, এমনকি রায় সাহেব যোগেন্দ্রনাথও বলেন নাই, এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ৪ঠা মে বাদী আত্মপরিচয় দেওয়ার পর ১০ই মে সত্যবাবু রেভিনিউ বোর্ডের অফিসে যান এবং তাঁহার নিকট যে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর নিকট প্রেরিত এফিডেভিটের নকল ছিল, উহা তিনি তখন দাখিল করেন।

সত্যবাবুর চালচলন

কুমারদের দুইজনই সত্যবাবুর সহিত ভাল ব্যবহার করিতেছিলেন। তাঁহারা তাঁহার জন্য আসবাবপত্র, বিছানা, টাকা পয়সা ও ঘোড়া পাঠাইয়াছিলেন। ইনসিওরেন্সের ত্রিশ হাজার টাকা হইতে কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই, এবং নামমাত্র পনর শত টাকা সেলামী লইয়া এই সহরে এক বিঘার উপর জমি বন্দোবস্ত দিয়াছেন, এই পনর শত টাকাও তাঁহার ভগ্নীর তহবিল হইতে গিয়াছে। ১৯১৩ সালে সত্যবাবু এই জায়গার জন্য ১৪৫০০৲ টাকা দর পাইয়াছিলেন। (একজিবিট নং ৭৭) ডায়েরী প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কুমারগণই প্রীতিবশতঃ তাঁহাকে এই সকল জিনিষপত্র, জায়গা জমি দিয়াছিলেন বলিয়া বলা হইত। ডায়েরী হইতে এইগুলি পরিষ্কার বুঝা যায়। বড়কুমারের বয়স তখন সাতাশের (২৭) মত ছিল এবং তিনি মদ্যাসক্ত ছিলেন। সত্যবাবুর

সহিত তাঁহার 'ইয়ারকী' চলিত না, কারণ তিনি বয়সে ছোট ছিলেন, সত্যবাবু সকল সময় রাণীদের মধ্যে একটা বিরোধ হোক্ এই ইচ্ছা করিতেন, এবং মধ্যম কুমারের মৃত্যুর পর সেই সুযোগও উপস্থিত হয়। সম্পত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব পাইয়া তিনি ভগ্নীর নামে টাকার তাগিদ দিতে থাকেন। ৪ঠা নবেম্বর তিনি হাজার টাকা দাবী করেন। মনোমোহনের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাস হইতে মেজরাণীর জন্য মাসিক এক হাজার একশত টাকা ভাতা নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। ২৫-৫-১১ তারিখে মেজরাণী রেভেনিউ বোর্ডের নিকট যে আবেদন করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই তিনি মাসিক ১১০০৲ করিয়া পাইতেছিলেন। ১৯১০ সালের ২২শে এপ্রিল তিনি তাঁহার ভ্রাতার সহিত কলিকাতা যান। (একজিবিট ৬৪) তাঁহার পায়ের অসুখ ডাঃ হলকে দিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য মিঃ নীডহাম বলেন, তাঁহার যাইবারকালে মিঃ নীডহাম তাঁহাকে ৮০০৲ টাকা দিয়াছিলেন (একজিবিট ৬২)। সত্যবাবু আরও টাকা চাহিয়াছিলেন। মিঃ নীডহাম আরও ৫০০৲ টাকা দিতে চাহেন। (একজিবিট ৬৩) তিনি কলিকাতাতে ৩০নং হ্যারিসন রোডস্থ একটী ভাড়াটীয়া বাড়ীতে ছিলেন, ডাঃ ব্রাউন তাঁহাকে চিকিৎসা করেন। আরোগ্য লাভ করার পর ১৪-৭-১০ তারিখে তাঁহার ভ্রাতার বাড়ী ঢাকাতে যান। (একজিবিট ৩০৭ মেজরাণীর পত্র) আমি বলিয়াছি যে, ৬-৮-১০ তারিখে সত্য ঢাকায় সম্পত্তি পাইয়াছিল। মেজরাণী কয়েকদিনের জন্য ঢাকা হইতে জয়দেবপুর যান। তখন বড় কুমার মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। ১৯১০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর বড় কুমারের মৃত্যুর পর তিনি ঢাকা চলিয়া আসেন। তিনি চৈত্রের শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত ঢাকায় থাকিয়া বরাবরের জন্য কলিকাতা চলিয়া যান। ১৯৩৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঢাকা ফিরিয়া আসেন নাই। বড়রাণীও স্বামীর মৃত্যুর পর চলিয়া যান, আর ফিরিয়া আসেন নাই।

কলিকাতায় রাণী বিভাবতী

মেজরাণী কলিকাতাতে ৮৯নং হ্যারিসন রোডে একটা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেন। তিনি, তাঁহার মা, ভাই, ভ্রাতৃবধূর সহিত বাস করিতে থাকেন। তিনি মাসিক ১১০০৲ টাকা করিয়া পাইতে থাকেন।. তিনি ইনসিওরেন্সের বাবদ ত্রিশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ১৯০৯ সালের নবেম্বর হইতে ১৯১১ সালের

৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ইনসিওরেন্সের টাকা ব্যতীত ছত্রিশ হাজার টাকা আনাইয়াছিলেন। ঐ অর্থের মধ্যে মেজকুমারের শ্রাদ্ধের ব্যয় বাবদ দুই হাজার টাকাও ছিল। তিনি ১৩২০ সনের পৌষ মাসে তাঁহার মাতার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১১০০৲ করিয়া পাইতেছিলেন। ইনসিওরেন্সের ত্রিশ হাজার টাকা ধরিলে, তিনি অথবা তাঁহার ভাই একলক্ষ টাকার মত পাইয়াছেন। সত্যবাবু বলেন যে, তাঁহার মা তাঁহার জন্য চাল্লিশ হাজার টাকা রাখিয়াছেন। অথচ তিনি আজীবন তাঁহার কন্যা বা পুত্রের মুখাপেক্ষী ছিলেন! তিনি কোন টাকা রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। উত্তরাধিকারী গণ্য হওয়া সম্পর্কিত সার্টিফিকেট নেওয়া সম্পর্কে অবাঞ্ছিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সত্যবাবু বলিয়াছেন যে, তাঁহার মাতা জীবিতকালেই তাঁহাকে টাকা দিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি তাহা করিয়া থাকেন, বা তাঁহার কোন টাকা থাকে, তবে তাঁহার কন্যারাই ঐ টাকার মালিক হইতেন।

১৯১১ সালে তিনি কলিকাতা চলিয়া যান, তাহার পর আর ফিরিয়া আসেন নাই। তাহার কলিকাতা যাত্রার পরই কোর্ট অব ওয়াডস তাঁহার অংশের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার কলিকাতা গমনের পূর্ব্বেই কোর্ট অব ওয়াডস তাহার অংশের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে উক্তি মিথ্যা। আমার মনে হয়, মিঃ নীডহাম তার করিয়া সেই সংবাদ জানাইলে উহা যেন তাঁহাদের মধ্যে বোমার ন্যায় আপতিত হইয়াছিল। সত্যবাবু তাহাই বলেন; যাহা হইক, এ সংবাদ বোমার মত হউক আর না হউক, কিন্তু মেজ রাণীর পক্ষ হইতে তাঁহার সলিসিটর মেসার্স ওর ডিগনাম এণ্ড কোম্পানী তাঁহার ভ্রাতার পরামর্শক্রমে তাঁহার অংশ কোর্ট অব ওয়ার্ডস হইতে খালাস করিবার জন্য রেভেনিউ বোর্ডে দরখাস্ত করিয়াছেন। অতঃপর লর্ড সিংহ (তৎকালে মিঃ এস পি সিংহ) তাঁহার পক্ষে ঐ দরখাস্ত সম্পর্কে সওয়াল করেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। উক্ত দরখাস্তের তারিখ ২৫-৫-১১। তাঁহার অংশ কোর্ট অব ওয়ার্ডসেই রহিয়া গেল, এখন পর্য্যন্ত উহা কোর্ট অব ওয়ার্ডসে আছে।

ছোট কুমারের অংশ ১৯১১ সালের মে মাসে এবং বড়রাণীর অংশ প্রবেটের মামলার নিষ্পত্তি হইবার পরই ১৯১২ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যায়। এই রূপে ১৯১২ সালে সমস্ত এষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যায়। তখন ছোটকুমারের বয়স ২৬ বৎসর, তাঁহার জীবনও ফুরাইয়া আসিতেছিল।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ—কুমারের পিতা

রাণী বিলাসমণি—কুমারের জননী

১৯১৩ সালে তিনি নলগোলার বাড়ীতে থাকিতেন। প্রায় ১৮ দিন রোগ-ভোগের পর ১৯১৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তথায় তিনি মারা যান। তখন তাঁহার তিন ভগিনী, পিতামহী ও পিসী কৃপাময়ী দেবী নলগোলা রাজবাড়ীতে ছিলেন। তাঁহারা ছোটকুমারের মৃত্যুর পরক্ষণেই ঐ বাড়ী পরিত্যাগ করেন। ছোটরাণী শক্রতা প্রমাণের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছিলেন, তিনি তখন পীড়িতা হইলেও এই সকল মহিলা তাঁহাকে একা ফেলিয়া নিষ্ঠুরভাবে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন, সিভিল সার্জ্জনের উপদেশে তিনিও ঐ দিনই নলগোলা রাজবাড়ী পরিত্যাগ করেন। ছোটরাণী স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার স্বামীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কুমারদের ভগিনীদের সহিত ছোটরাণীর সদ্ভাব ছিল। ছোট কুমারের মৃত্যুর সময় কি ঘটিয়াছিল, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; ছোটরাণীরও তাঁহার উপর নির্ভরশীল একদল দরিদ্র ও অশিক্ষিত ভাই ছিল; তাঁহাকে হাত করিয়া ফেলে এবং ঢাকায় এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে, তৎপর আর একটী বাড়ীতে এবং তারপর কলিকাতা লইয়া যায়। ঢাকার কালেক্টর এবং রেভেনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ মার তাঁহাকে ঢাকা ফিরিতে অনুরোধ করিলেও তিনি ঢাকা ফিরেন নাই। এই সময় তিনি রেভেনিউ বোর্ডের নিকট লিখিত একপত্রে এক উইল করিবার অভিপ্রায় ও উহার মর্ম্ম প্রকাশ করেন; কিন্তু উহা কখনও সম্পাদিত হয় নাই। তিনি চারি বৎসরকাল নানা স্থানে ঘুরিতে থাকেন; বা তাঁহাকে নানা স্থানে ঘুরান হইতে থাকে। তারপর তিনি ঢাকা ফিরিয়া আসিয়া এখানে অবস্থান করিতে থাকেন, এবং বাঙ্গালা ১৩২৬ সনের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ (ইংরাজী ১৯১৯ সালের ৩০শে মে) তাঁহার ভ্রাতা কুমুদের পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন।

রাজকুমারদের ভগ্নিগণ

পূর্ব্বেই কুমারদের ভগ্নীরা রাজবাড়ী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এই সময়ের মধ্যে তাঁহারা নিজ নিজ সংসার পাতিয়া বসেন। তৃতীয় কুমারের যে দিন মৃত্যু হয়, সে দিনই রাজকুমারীরা নলগোলা রাজবাড়ী পরিত্যাগ করেন। তাহার পর তাঁহারা নলগোলা রাজবাড়ীতে বা জয়দেবপুর রাজ বাড়ীতে আর প্রবেশ করেন নাই। তাঁহারা প্রথমে কয়েকদিন ঢাকাতেই, তৎপর জয়দেবপুর চলিয়া যান। ইন্দুময়ী চক্করে তাঁহার নিজবাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। চক্কর জয়দেবপুরের একটি স্থান—বড়কুমারের জীবদ্দশায় ইন্দুময়ীর বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেখানে জ্যোতির্ম্ময়ী

দেবীর বাড়ীও নির্ম্মিত হইতেছিল। ২৯শে ফাল্গুন তিনি ঢাকা পরিত্যাগ করেন। ছোটকুমারের মৃত্যুর পর তিনি ঢাকার এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করেন, তারপর বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত কৃপাময়ীর বাড়ীতে থাকেন। অতঃপর ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে নিজের বাড়ীতে যান। ইন্দুময়ী দেবী, ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীর মধ্যে তাঁহাদের কনিষ্ঠা ভগিনী তড়িন্ময়ী দেবীর বাড়ী। এইখানে রাজকুমারীরা নিজ নিজ সংসার পাতেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এই বিবরণ দিয়াছেন, এবং ছোটরাণীর সাক্ষ্যেও ইহা সমর্থিত হইয়াছে। ছোটরাণী নিজেও বলেন নাই এবং রায় সাহেব যোগেন্দ্র ব্যানার্জ্জী বা ফণীবাবু প্রভৃতি বিবাদী পক্ষের অন্য কোন সাক্ষীও বলেন নাই যে, রাজ-কুমারীরা ছোটকুমারের মৃত্যুর পর রাজবাড়ী গিয়াছিলেন, বরং সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কালেক্টর তাঁহাদিগকে রাজবাড়ীতে বাস করিতে অনুরোধ করিলেও, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাহাতে অসম্মতা হইয়া বলেন, বৌয়েরা যখন রাজবাড়ীতে থাকেন না, তখন তিনিও রাজবাড়ীতে থাকিবেন না, ছোটরাণী যে বলিয়াছেন, কোর্ট অব ওয়ার্ডস রাজকুমারীদিগকে রাজবাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সেইকথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সত্যকথা এই যে, ইন্দুময়ী দেবী পূর্ব্বেই চকরে তাঁহার বাড়ী তৈয়ার করাইয়া ছিলেন, এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীও ছোটকুমারের মৃত্যুর পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে যে মতলব ঠিক হইয়াছিল, ছোট কুমারের মৃত্যুতে তাহা শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইল মাত্র। ছোটরাণীর সাক্ষ্যে স্পষ্টই দেখা যায়, ছোটকুমারের মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার ও ছোটরাণীর সঙ্গে রাজকুমারীদের খুব ভাল ভাবই ছিল, ছোটরাণীর লিখিত পত্র হইতেও দেখা যায়, তিনি কিরূপ ভালবাসাপূর্ণ ভাষায় ইন্দুময়ী দেবীর নিকট পত্র লিখিতেন, বৌয়েরা শাশুড়ীর নিকট যে ভাষায় পত্র লিখে, ইন্দুময়ীর নিকট লিখিত ছোটরাণীর পত্র আরও ভালবাসাপূর্ণ। (একজিবিট ৩২০, ৩২২ এবং ৩২৬—৩৩৮)। ছোটকুমারের মৃত্যুর পর ছোটরাণীর ভ্রাতারা ছোটরাণীকে ধরিতে গেলে একেবারে উধাও করিয়া ফেলিলেন। ইন্দুময়ী ছোটকুমারের শ্রাদ্ধে যান নাই, কুমারদের ভগিনীরা কেহই যান নাই। বুঝা যাইতেছে, তাহার কারণ এই যে, তাঁহাদিগকে ডাকা হয় নাই, এবং ছোটরাণীর ভ্রাতারাই কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছিলেন। ছোটরাণী যখন দত্তক গ্রহণ করেন, তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার ও রাজকুমারীদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় নাই, দত্তক গ্রহণের সময় তাঁহার ও ইন্দুময়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন (ছোটরাণীর সাক্ষ্য)। উহাতে প্রমাণ হয় না যে, ছোটরাণী ও তাঁহার ননদের মধ্যে কোনও অসদ্ভাব ছিল, অসদ্ভাব ঘটিবার কোনও সুযোগই হয় নাই। কতকগুলি পত্র

ছোটরাণীকে দেখাইয়া তাঁহাকে বলা হয় যে, তিনি কলিকাতা বা অন্যত্র থাকিতেও ননদের সহিত পত্র-ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল পত্র পুনঃ পুনঃ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখেন এবং বলেন, তিনি ঐ সকল পত্র লেখেন নাই, তবে তাঁহার হস্তাক্ষরের সহিত ঐ সকল পত্রের হস্তাক্ষরের সাদৃশ্য আছে। যদি এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হইত, তবে তিনি যে সকল লেখা তাঁহার হস্তাক্ষর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, উহার সহিত সেই সকল পত্রের হস্তাক্ষর তুলনা করিতাম; যাহা হউক, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহার সহিত রাজকুমারীদের অসদ্ভাব ছিল, তাহা প্রমাণকল্পে কোনও সাক্ষ্য নাই এবং তাঁহাদের আচরণেও তাহা প্রমাণিত হয় না, পক্ষান্তরে এমনও প্রমাণ নাই যে, তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল।

তৃতীয় কুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার ভগিনীরা চক্করে নিজ নিজ বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। কুমারদের পিসী কৃপাময়ী দেবী ছোটকুমারের মৃত্যুতে এমন শোক পাইয়াছিলেন যে, ১৯১৩ সালের ৩রা অক্টোবর তিনি উইল করেন ও তৎপর অগ্রহায়ণ মাসে কাশী যাত্রা করেন; আর তিনি ফিরিয়া আসেন নাই। সত্যভামা দেবীও ১১ই অক্টোবর তারিখে তাঁহার উইল করিয়া কৃপাময়ী দেবীর সঙ্গে কাশী যাত্রা করেন। কৃপাময়ী দেবী ফিরিলেন না; কিন্তু সত্যভামা দেবী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; ১৯২১ সালে যখন বাদী আসেন, তখন সত্যভামা দেবী জয়দেবপুরে ছিলেন। কৃপাময়ী দেবী ১৯২০ সালের ২০শে এপ্রিল কাশীতে মারা যান।

বড়রাণী ও মেজরাণী কলিকাতায় ছিলেন। জয়দেবপুরে কি ঘটিত না ঘটিত, তাহার সঙ্গে তাঁহাদের কোন সংশ্রবই ছিলনা; বড়রাণী ৮নং মধু গুপ্ত লেনে তাঁহার পিত্রালয়ে ছিলেন, বাঙ্গালা ১৩২০ সনের ৬ই আষাঢ় অর্থাৎ ইংরাজী ১৯১৩ সালের জুন মাসে তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর নিকট শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন—অবশ্যই উহা যদি শেষ পত্র হইয়া থাকে; কিন্তু তিনি যে তৎপর আরও পত্র লিখিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ নাই। এই পত্রখানা একটু কঠোর ধরণের। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বড়রাণীকে লিখিয়াছিলেন, বড়রাণী যেন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পুত্র বুদ্ধুর বিবাহের খরচ দিতে কোর্ট অব ওয়ার্ডসকে অনুরোধ করেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর ঐ পত্রের উত্তরে বড়রাণী উক্ত পত্র লিখিয়াছিলেন। বড়রাণী ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত মধু গুপ্ত লেনে পিত্রালয়ে ছিলেন। তৎপর তিনি ১১২নং রিপণ রোডের বাড়ীতে উঠিয়া যান। এখনও তিনি তথায় আছেন।

মেজরাণী কলিকাতা গিয়া ৮নং হ্যারিসন রোডে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে

তাঁহার মাতা ও ভ্রাতার সহিত বাস করিতে থাকেন. ১৯১৪ সাল তিনি ১৯নং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে উঠিয়া যান, এখনও তিনি তথায় আছেন।

১৯২০ সাল পর্য্যন্ত এই দুই রাণীর সহিত রাজকুমারদের কোনও অসদ্ভাব ছিলনা। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন, বড়রাণীর ছিল ঔদাসীন্যের ভাব, এবং তিনি কাছে ঘেঁষিতে চাহিতেন না। কিন্তু কখনও ঝগড়া হয় নাই, মেজরাণীর ভাব আরও হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে মনোভাব সম্পর্কে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর উক্তি যে, তাঁহার সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই। তাঁহারা পরস্পরের নিকট পত্র লিখিতেন, এইরূপ একখানা পত্র বিবাদী পক্ষ আদালতে দাখিল করিয়াছেন। (একজিবিট জেড ৩২)। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ১৯১৬ সালের ২৫শে মার্চ্চ কাশী হইতে মেজরাণীর নিকট ঐ পত্র লিখিয়াছিলেন। মেজরাণীর এক পত্রের উত্তরে এই পত্র লেখা হইয়াছিল। এই পত্রে তাঁহার লিখিত অন্যান্য পত্রের উল্লেখ আছে। মেজরাণীকে কাশী গিয়া তিনি যে বাড়ীতে ছিলেন সেই বাড়ীতে থাকিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। ভ্রাতৃবধূকে মৃত ভ্রাতার স্মৃতি বলা হইয়াছে। অলকা দাইয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পিসীমা কৃপাময়ী দেবী, মেজরাণীকে দেখিতে চাহিয়াছেন. এক কথায় বলা যায় ননদ ও ভ্রাতৃবধূর মধ্যে ভালবাসা থাকিলে ননদ ভ্রাতৃবধূর নিকট যেরূপ পত্র লিখিতে পারে, এই পত্রখানাও সেইরূপ। তাহা ছাড়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যখনই কলিকাতা যাইতেন, বা যখনই কলিকাতা হইয়া কাশী যাইতেন, তখনই মেজরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রায়ই কাশীতে কৃপাময়ী দেবীর নিকট যাইতেন, ছোটরাণী একবার বুদ্ধুর স্ত্রীকে (জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পুত্রবধূ) সামান্য কয়েকখানা গয়না দিয়াছিলেন এবং বধূ তাঁহার নিকট যাইবার পূর্ব্বেই তিনি উহা তৈয়ার করাইয়া রাখিয়াছিলেন; তদ্রূপ মেজরাণীও একবার বুদ্ধুর স্ত্রীকে একজোড়া ব্রেসলেট উপহার দিয়াছিলেন; জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন, সত্যবাবুর ভয়ে মেজরাণী উহা স্নানের ঘরে বুদ্ধুর স্ত্রীকে দিয়াছিলেন; কিন্তু মেজরাণী বলেন, তিনি প্রকাশ্যেই উহা দিয়াছিলেন। মেজরাণী অস্বীকার করেন না যে, বুদ্ধু কলিকাতায় তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইত এবং তিনি একবার বুদ্ধুকে মেজকুমারের কোনও কোনও পুরাতন পোষাকও দিয়াছিলেন। এই সকল পোষাক কোর্টেও দাখিল করা হইয়াছে, এইগুলি যে মেজকুমারের তাহা অস্বীকার করা হয় নাই। বাদীর পরিচয় আলোচনায় এইগুলি বিশেষ কাজে লাগিবে। বুদ্ধু চিকিৎসার জন্য কলিকাতা গেলে মেজরাণীও বুদ্ধুকে দেখিতে গিয়াছিলেন এবং তাহার চিকিৎসার জন্য কিছু

টাকাও দিয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে, বাদীর আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও মেজরাণীর মধ্যে খুব সদ্ভাব ছিল; তাঁহাদের মধ্যে যে অসদ্ভাব ছিল, এমন কথা কেহই বলে নাই। এই বিষয়ে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহার বিশেষ কোনও প্রতিবাদ হয় নাই, শুধু মেজরাণী বুদ্ধুর স্ত্রীকে গোপনে ব্রেসলেট উপহার দিয়াছিলেন, কি প্রকাশ্যে দিয়াছিলেন, এই বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে, সুতরাং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যে বলিয়াছেন, বড় রাণীর সঙ্গে তাঁহার অসদ্ভাব ছিল না, আবার হৃদ্যতাও ছিল না, এবং পিতার উইল অনুসারে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যে মাসোহারা পাইতেছিলেন, বাদী আসিবার পূর্ব্বে বড়রাণী একবার তাহাতে আপত্তি তুলিয়াছিলেন, বা উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,—তাঁহার এই সকল কথা অবিশ্বাস করিবার পক্ষে আমি কোনও কারণ দেখি না। বড় রাণীর জেরা হইতে এমন কিছু দেখা যায় না যে, তাঁহাদের মধ্যে মনোভাব অন্যরূপ ছিল: বড় রাণীর যে পত্রগুলি বিবাদী পক্ষ দাখিল করিয়াছেন (অনেকগুলি পত্রই দাখিল করা হইয়াছে। এইগুলি সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করিব) তাহা হইতে দেখা যায়, তিনি তাঁহার অধিকার এক চুলও ছাড়িবার পাত্রী নহেন। সুতরাং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যদি ১৯২১ সালে একটী প্রতারককে কুমার স্বীকার করিয়া তাহার বিধবা ভ্রাতৃ-জায়ার উপর একটি স্বামী চাপাইয়া ভ্রাতৃজায়ার সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেন, এবং ছোটরাণীর পোষ্যদের না হউক তাঁহার পোষ্য পুত্রের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া পরোক্ষভাবে ছোট রাণীরও সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে রাণীদের সহিত তাহার শত্রুতা ছাড়া অন্য কোনও কারণ আবিষ্কার করিতে হইবে। বিবাদীপক্ষ বলিয়াছেন এবং এখনও বলেন, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী একজন প্রতারককে সমর্থন করিয়াছেন, কারণ হিন্দু আইন অনুসারে কুমারদের ভাগিনেয়গণই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতেন, কিন্তু ছোটরাণী দত্তক গ্রহণ করায় তাঁহাদের সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়া যায়। রাজকুমারীরা যখন নিজ নিজ সংসার পাতেন, তখন তাঁহাদের আয় কত ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় না, কিন্তু দেখা যায়, পিতার উইল অনুসারে তাঁহারা বার্ষিক ২৪০০ টাকা অর্থাৎ মাসিক ২০০ টাকা করিয়া পাইতেন, হয়ত তাঁহারা আরও কিছু বেশী পাইতেন, কারণ ১৯২১ সালে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পুত্র বুদ্ধুর জুরীগাড়ী ছিল। যাহা হউক পল্লী গ্রামে মাসিক দুইশত টাকা আয় বিশিষ্ট লোক ধনী না হইলেও, পল্লীগ্রামে মাসিক ২০০ টাকা আয় নিতান্ত কমও নহে।

অবশ্যই ভাওয়াল এষ্টেটের উত্তরাধিকারী হইবার সম্ভাবনার সহিত তুলনা করিলে উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

রাণীদের সম্পর্কে কথা এই যে, ছোটরাণী ঢাকায় বাস করিতেছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম রাণীও কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহারা ভাওয়ালের সহিত এক প্রকার অপরিচিতা হইয়া উঠিতেছিলেন। ১৯১৩ সালে দ্বিতীয় রাণীর মাতার মৃত্যু হয়; পৌস মাসে —অর্থাৎ ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারী মাসে দ্বিতীয় রাণীর মাতৃবিয়োগ হয়। চিরতরে ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে, দ্বিতীয়া রাণী প্রায় এক লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। এই টাকা ছাড়া ১৯১১ সালের এপ্রিল মাস হইতে তিনি মাসিক ১১০০৲ টাকা করিয়া পাইতে থাকেন। ১৯১৩ সালে এই টাকার পরিমাণ বাড়িয়া ২৫০০৲ টাকা হয়। ১৯১৫ সালের কাছাকাছি সময়ে এই টাকার পরিমাণ ৪০০০৲ টাকায় গিয়া দাঁড়ায়। দুই বৎসর পরে ইহা বাড়িয়া ৫০০০৲ টাকা হয়। ১৯১৯ সালে এই টাকার পরিমাণ প্রতি মাসে ৭০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। সেই বৎসর হইতে দ্বিতীয় রাণী মাসিক ৭০০০৲ টাকা করিয়া পাইতেছেন।

মেজরাণী কত টাকা পাইয়াছেন

এই মাসিক ভাতা ব্যতীত, দ্বিতীয় রাণী অতিরিক্ত এবং বাড়্‌তি টাকাও পাইয়াছেন। তিনি নিজে যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, এই টাকার পরিমাণ গড়ে ৩॥ লক্ষ কিম্বা চারিলক্ষ হইবে। এই যে হিসাব, তাহা আমি দ্বিতীয় রাণীর সাক্ষ্য হইতে এবং হিসাব সম্পর্কে উত্থাপিত যে কোন কাগজপত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু সত্যবাবু নিজে এই টাকার পরিমাণ এবং প্রাপ্তির সময় সম্পর্কে তাঁহার ভগিনী অপেক্ষা অধিকতর অস্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। তিনি অপেক্ষা তাঁহার ভগিনীই বেশী কথা জানেন, এই যে ছলনা, তাহা রক্ষা করিবার জন্যই সত্যবাবু এরূপ অস্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। দ্বিতীয় রাণী টাকার অঙ্কগুলি জানেন; কিন্তু এই টাকার কি হইল, তাহা তিনি জানেন না। তিনি কলিকাতার ১৯নং ল্যান্সডাউন রোডে থাকেন এবং এই বাড়ীটি তাঁহার ভ্রাতার সম্পত্তি বলিয়াই বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এই বাড়ী ক্রয় এবং ইহার উন্নতি বিধানের জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহা আমার ভ্রাতাকে আমি উপহার দিয়াছি। বাড়ীর জন্য কত টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় রাণী জানেন না। তাঁহার ভ্রাতা আসিয়া বলেন, এই সম্পত্তি তাঁহারই; ইহার জন্য দুই লক্ষ

হইতেও বেশী টাকা ব্যয় হইয়াছে। আরও মূল্যবান সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছে; কিন্তু সমস্তই সত্যবাবুর নামে। রাণী বলেন, এক লক্ষের অধিক টাকা ব্যয় করিয়া এই সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছে; তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার নিজের টাকা দ্বারাই এই সমস্ত ক্রয় করিয়াছেন। ভ্রাতা সত্যবাবু আসিয়াও এই কথাই বলেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, রাণী একটা সাহায্য করিয়াছিলেন বটে; তবে ১৯নং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ী তিনি নিজের টাকা দিয়াই ক্রয় করিয়াছেন। তাহার ভগিনী বিধবা হইবার পর এই সমস্ত ক্রয় করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় রাণী এপর্য্যন্ত নিজের হিসাব মতেই ভাওয়াল এষ্টেট হইতে তিনি **১৯ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন**!

ব্যাঙ্কে কোন হিসাব নাই

দ্বিতীয় রাণীর নামে ব্যাঙ্কে কোন হিসাব নাই। তিনি কখনও ইন্‌কাম-ট্যাক্স দেন নাই। এই পরিমাণ অর্থ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইলে কোন না কোন প্রকার কাগজপত্রের প্রয়োজন; তথাপি রাণীর টাকাকড়ি সম্পর্কে কোন হিসাব কিম্বা কোন কাগজপত্র নাই। ভারতবাসীর সাধারণ অভ্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে, সত্যসত্যই কোন কাগজপত্র নাই। রাণী বলেন,—"আমি নিজেই নিজের টাকাকড়ি রাখি। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই আমি এরূপ করিয়া আসিতেছি।" উপরের তলায় একটি লোহার সিন্দুক আছে তাহার চাবি আমিই রাখি।" সংক্ষেপে বলিতে গেলে ব্যাঙ্কে মজুদ করা কিম্বা কোন প্রকারে কাজে লাগানোর অর্থই ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া। জেরার সময় রাণী কতকগুলি কোম্পানীর কাগজ লোহার সিন্দুকে রাখিয়া দেওয়ার কথা বলেন। রাণীর সাক্ষ্যের পর তাঁহার ভ্রাতা সাক্ষ্য দিতে আসিয়া অনেকটা অস্পষ্টভাবে, ব্যাঙ্কে একটা হিসাব রাখার এবং তাহা সমাপ্ত করিয়া দেওয়ার কথা বলেন। তিনি আরও বলেন যে, রাণীর উপর কোনও ইনকাম ট্যাক্স ধার্য্য হয় নাই; তবে তিনি কোম্পানীর কাগজের সুদের উপর ইনকাম ট্যাক্স দিয়াছেন। এই মামলার শুনানী আরম্ভ হইবার পরে রাণীর নামে একটা হিসাব ব্যাঙ্কে খোলার কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা অসম্ভব যে, এইরূপ মোটা টাকা থাকা সত্বেও তাঁহার নামে কোন দলিলের প্রয়োজন হইল না। এরূপ দলিলপত্র থাকিলে তাহা এই মামলায় পেশ করা হইত। সত্যবাবু কখনও কোন অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন কিনা, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া রাণী বলেন, সত্যবাবু শেয়ারের কাজ করিতেন, তাঁহার নিজের কোন অভিজ্ঞতা নাই।

রাণীর ভ্রাতা সত্যবাবু বলেন,—দুইটি বাদে কলিকাতার অন্যান্য মূল্যবান সম্পত্তিগুলি তাঁহার নিজের টাকায় ক্রয় করা হইয়াছে। সত্যবাবু বলেন, তিনি তাঁহার মাতার নিকট হইতে ৪০ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। ইহাকে মূলধন করিয়া ১৯১০ সালে তিনি শেয়ার ক্রয় বিক্রয় আরম্ভ করেন। এইরূপেই তিনি তাঁহার সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। সত্যবাবুর মুখের কথায় মাত্র বিশ্বাস না করিলে বলিতে হয়, তাঁহার মাতার এমন কোন অর্থ ছিল না, যাহা তিনি ছেলেকে দিয়া যাইতে পারেন, কারণ বিবাহিত জীবনেও তিনি পুত্রকন্যাসহ তাঁহার ভ্রাতাদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁহার লিখিত পত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে পরিষ্কার দেখা যায় যে, তাহাতে দুঃখদারিদ্র্যের কথা আছে। এই অবস্থায়ও তিনি যদি কোন অর্থ রাখিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা তাঁহার হস্তস্থিত কন্যার অর্থ ছাড়া আর কিছুই নহে। সত্যবাবুর নিজের বর্ণনা অনুসারেই ১৯১৩ সালে একলক্ষের অধিক টাকা সত্যবাবুর হাতে না আসিলেও তাঁহার মাতার হাতে (কন্যার সম্পত্তি হইতে) আসিয়াছে। সত্যবাবু একথা অস্বীকার করেন না যে, বাড়ীর সমস্ত ব্যয়ই তাঁহার ভগিনী বহন করেন; এমন কি দুইখানি মোটর গাড়ী পর্য্যন্ত তাঁহার নামে লিখিত আছে।

রাণীর আয় কোথায় গেল

ইহা অতিশয় সুস্পষ্ট যে, দ্বিতীয় রাণীর আয়ের সমস্ত টাকাই তাঁহার **ভ্রাতার পকেটে গিয়াছে**। রাণী বলেন,—"আমার যে ইচ্ছা ভ্রাতারও সেই ইচ্ছা। কিন্তু রাণীর অবস্থা বিবেচনায়—এই রাজোচিত আয়ের কোনও একটা অংশের উপর যে তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি একটু ছেঁড়া কাগজ পর্য্যন্ত দাখিল করিতে পারেন নাই,—এই অবস্থা বিবেচনায় উল্টা কথাই প্রমাণিত হয়। ভ্রাতার ইচ্ছাই রাণীর ইচ্ছা ইহা প্রমাণিত হয়।

১৯২০ সাল আসিল। ২৭শে এপ্রিল তারিখে কাশীতে কৃপাময়ীর মৃত্যু হইল। কুমারদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ভগিনী ইন্দুময়ী ২৯শে আগষ্ট তারিখে মারা গেলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বামী ও সন্তানগণ তাঁহার বাড়ীতেই বাস করিতেছিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে লইয়া তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নির্জ্জন রাজবাড়ীর এক অংশে কুমারদের পিতামহীর থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু প্রায়ই তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর নিকটে আসিয়া থাকিতেন। দ্বিতীয় কুমারের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। তাঁহার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সমাপ্ত

হইয়াছিল। বিধবা পত্নী সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। রাজপরিবারের কোন বংশধর নাই বলিয়া বৃদ্ধা মহিলারা উইল করিয়াছিলেন। ইহাই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া, কোর্ট অব ওয়ার্ডস সম্পত্তির দখল লইয়াছিলেন। যথোচিত-রূপে পরিচালিত হওয়ার ফলে সম্পত্তির দেনা পরিষ্কার হইয়াছিল, ভাওয়ালের পুরাতন আমলে প্রচলিত বে-আইনী ট্যাক্স ও খাজনা গ্রহণের কথা (বাদীপক্ষের ১৫৫, ১৯০, ১৭৬ নং সাক্ষী) বিলুপ্ত হইয়াছিল। মোসাহেবের দল অন্তর্হিত হইয়াছিল, ভাওয়াল এষ্টেটের যে অংশ দ্বিতীয় কুমারের প্রাপ্য, তাহা তাঁহার বিধবা পত্নীর দখলকৃত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে রাণীর ভ্রাতাই এই সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন। দ্বিতীয় কুমার সম্পর্কে যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল, তাহা হইতেছে তাঁহার স্মৃতি। পুরাতন ভৃত্য আনন্দ খানসামা প্রত্যহ সন্ধ্যায় রাজবাড়ীতে দ্বিতীয় কুমারের শয়নগৃহে ধূপধুনা জ্বালাইত, এবং গুজব রটিত যে, দ্বিতীয় কুমার জীবিত আছেন, তিনি সন্ন্যাসীদের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এই সমস্ত দ্বারাই কুমারের স্মৃতি জাগরূক রাখা হইয়াছিল; কেহই এই জনরবে বিশ্বাস করিত না। এই গুজবের ফলে কোন কাজেরই ব্যবস্থা হইত না। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যখন বলেন, তিনি এই গুজব বিশ্বাস করিতেন, তখন তিনি তাঁহার আশাকেই বিশ্বাস বলিয়া ভ্রম করেন। পরলোকগত কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে কিম্বা জাহাজ ডুবিতে নিমগ্ন কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে সাধারণতঃ প্রিয়জনের এরূপ আশাই জাগিয়া থাকে, এরূপ আশা যাহার মনে জাগে, সে ব্যক্তি কোন নাবিককে পাইলেই জিজ্ঞাসা করে। ঠিক সেইরূপই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী কিংবা কৃপাময়ী দেবী কুমারের কথা সন্ন্যাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তবে এই জিজ্ঞাসার মধ্যেও প্রকৃত কোন বিশ্বাস ছিল না; আর যদিই বা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রমাণ হিসাবে তাহার কোন মূল্যই নাই।

সন্ন্যাসীর ঢাকায় উপস্থিতি

এই মামলার বাদী, সন্ন্যাসী যখন ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হন, তখনকার অবস্থা এইরূপই ছিল।

সন্ন্যাসীর ঢাকায় আসার তারিখ সঠিক জানা যায় না। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসের অথবা ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসের কোনও একদিনে সন্ন্যাসী ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হন। বাদী ঠিক কোন দিন ঢাকায় আসেন, বাদীও তাহা সঠিক বলিতে পারেন না, কিন্তু যে সকল সাক্ষ্য সম্বন্ধে আদৌ কোন আপত্তি উঠে নাই, সেই সকল সাক্ষ্যের বিশ্লেষণে সন্ন্যাসীর ঢাকায় উপস্থিতির একটা দিন অনুসন্ধানে ঠিক করিয়া লওয়া যায়।

সন্ন্যাসীর সাহচর্য্যে

দার্জ্জিলিংএর ঘটনার পর হইতে নেপালের যে স্থান 'ব্রহ্মোসত্র' নামে পরিচিত, সেই স্থানে উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে, বাদী কোন কোন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, বাদী তাহার এক বিবৃতি দিয়াছেন। সেই বিবৃতি সম্পূর্ণ উল্লেখ করিতে হইবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার বিশ্লেষণও প্রয়োজন হইবে, কিন্তু উপাখ্যানের এই স্থলে প্রধানতঃ যাহা বলা আবশ্যক, তাহা এই যে—বাদী বলিয়াছেন যে, 'ব্রহ্মোসত্রে' উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্মরণ হয় নাই—তিনি কে; তবে তাঁহার বাড়ী যে ঢাকায়, সে কথা তাঁহার স্মৃতি পথে আসিয়াছিল। তখনও বাদী তাঁহার গুরু ধর্ম্মদাস নাগা সমেত চারিজন সাধুর সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন। কিন্তু এইখানেই বাদীকে তাঁহার বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য বলা হয়।

"ব্রহ্মোসত্রে আসিয়া আমার স্মরণ হয় যে, আমার বাড়ী ঢাকায়। আমি আমার গুরুকে সে কথা বলি। গুরু আদেশ দেন,—"বাড়ী যাও। তোমার বাড়ী যাইবার সময় আসিয়াছে। তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও।" তিনি তখন গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, পুনরায় কোথায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে? তাহাতে গুরু উত্তর দেন,—হরিদ্বারে তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে।

গুরু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি এই বুঝিয়াছেন যে, যদি তিনি মায়াকে (সংসারে আসক্তি) পরাভব করিতে পারেন তবেই তাঁহাকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়া হইবে। তখন তিনি সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী যাত্রা করেন। বহু দেশ বিদেশের মধ্য দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হন।

ঢাকায় আসিয়া কি করিলেন

রাত্রি ১২টায় কি ১টায় সন্ন্যাসী (বাদী) ঢাকা রেলষ্টেশনে পৌছেন, এবং ষ্টেশনেই রাত্রিযাপন করেন। বাদী বলেন,—'যখন আমি ষ্টেশনে আসিয়া নামিলাম, আমার মনে হইতে লাগিল পূর্ব্বে সেখানে বহুবার যাওয়া আসা করিয়াছিলাম।' রেল ষ্টেশনে সারারাত্রি কাটাইয়া, তিনি সদর ঘাটের দিকে রওনা হন, নদীর অপর পার হইতে চর অতিক্রম করিয়া বেলা ১০টায় তিনি নদীর এপারে আসেন এবং রূপ বাবুর বাড়ীর দরজার সম্মুখে ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধের উপর উপবেশন করেন।

বাকল্যাণ্ড বাঁধে

বাদীর পূর্ব্বোক্ত উক্তিসমূহ, অর্থাৎ আলোচ্য উপাখ্যানের এতটা অংশ বাদীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে। তাঁহার নিরুদ্দেশ কালের অবশিষ্ট অংশের যে কাহিনী তিনি বিবৃত করিয়াছেন, যদি তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে বাদীর পূর্ব্বোক্ত উক্তি অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই। ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধে যখন তিনি উপবিষ্ট হইলেন, সেইখান হইতে এই কাহিনীর (যেখানে আমি অন্য প্রকার বর্ণনা করিব তাহা ছাড়া) আর সকলই সাধারণের বলিয়া স্বীকৃত। তিনি দিবারাত্রি সেখানে বসিয়া থাকিতেন। রৌদ্র বৃষ্টিতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ক্রমাগত তিন চারি মাস—প্রায় ৫ই এপ্রিল অথবা ১৭ সালের চৈত্র মাস শেষ হওয়ার কয়েকদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি একভাবে সেখানে বসিয়াছিলেন।

ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, চৈত্রমাস শেষ হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে বাদী কাসিমপুরে গিয়াছিলেন, এবং বিবাদীপক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়াই তিনি বলেন যে, তিনি বারুণীর দিন কাশিমপুর অভিমুখে রওনা হন; কিন্তু বাদীর কাশিমপুর যাওয়ার যে কাহিনী বিবাদীপক্ষ বর্ণনা করেন, বাদী তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,—৫ই এপ্রিল বা ঐরূপ সময়ে তিনি কাশিমপুর গিয়াছিলেন। সুতরাং বাদীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্য অনুসারে, বাদী, বাকল্যাণ্ড বাঁধে তিন চারি মাস অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া ধরিয়া লইলেও প্রতিপন্ন হয়,—বাদী অবশ্যই ডিসেম্বর মাসের কোনও এক নির্দ্দিষ্ট দিনে ঢাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। মিঃ নিডহামও তাঁহার রিপোর্টে (একজিবিট ৫৯) সেই কথাই বলিয়াছেন।

প্রায় চারিমাসকাল বাদী দিবারাত্রি বাকল্যাণ্ড বাঁধে বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে সন্ন্যাসীর ন্যায় দেখাইত, লেংটি ছাড়া তাহার পরণে আর কিছু ছিল না। তাঁহার সুদীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফ; মাথার চুল, জটা বাঁধিয়া পৃষ্ঠদেশে বহুদূর বিলম্বিত। তাহা প্রায় জানু পর্য্যন্ত ঠেকিয়াছে। (১৯এ নং একজিবিটের ফটো দ্রষ্টব্য) জলন্তধুনির সম্মুখে তিনি অহরহঃ উপবিষ্ট। আপাদমস্তক সন্ন্যাসীর সমস্ত শরীর ভস্ম-বিলেপিত। শত শত লোক, যাঁহারা বাকল্যাণ্ড বাঁধ দিয়া যাতায়াত করেন, অবশ্যই সেখানে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া থাকিবেন।

দেবব্রত বাবুর মন্তব্য

সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে বাবু দেবব্রত মুখোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি সাব-জজ ছিলেন, এখন তিনি অবসর প্রাপ্ত; কিন্তু তখন তিনি ঢাকার আদালতের বিচারাসনে সমাসীন ছিলেন। বাঁধ হইতে তাঁহার বাড়ী যাইতে

সামান্য কয়েক মিনিট লাগিত। প্রত্যাহ সকালে এবং বিকালে তিনি বাঁধে বেড়াইতে যাইতেন। বাঁধের উপর সন্ন্যাসী যতদিন ছিলেন (অবশ্য দেবব্রত বাবুর হিসাবে তাহা দুই মাস বা চারিমাস) ততদিন তিনি প্রত্যহ সন্ন্যাসীকে সেখানে দেখিতেন।

বিবাদী পক্ষে কমিশনে দেবব্রত বাবুর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। বাকল্যাণ্ড বাঁধে উপবিষ্ট থাকা কালে তিনি সন্ন্যাসীকে যেমন দেখিয়াছিলেন, দেবব্রতবাবু তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। ফটোর সহিত সেই বর্ণনা মিলাইলে, (অবশ্য সে ফটো দেবব্রত বাবুর থাকা কালে লওয়া হয় নাই, পরন্তু তাহার পরে লওয়া হইয়াছিল এবং তখনও সন্ন্যাসী লেংটি পড়িয়াই থাকিত) তখন সন্ন্যাসী যেমন ছিল, তাহার এক সুন্দর এবং সঠিক চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিঃ মুখার্জ্জি বলিয়াছেন,—"আমি ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের ও কৌতূহলের বিষয় বলিয়া মনে করিতাম যে, এমন সুন্দর সুপুরুষ, রৌদ্রবৃষ্টিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কি করিয়া দিবারাত্রি একই ভাবে খালি গায় বসিয়া থাকিতে পারে! সর্ব্বপ্রথম তাহার মার্জ্জিত এবং মহত্ত্বব্যঞ্জক আকৃতির প্রতি আমার দৃষ্টি পতিত হয়। আমি প্রত্যহ যাইবার ও আসিবার সময় তাঁহার চেহারার প্রতিই লক্ষ্য করিতাম। দুপুরবেলা যখন আমি একাকী যাইতাম, তখনও আমি তাঁহাকে একই অবস্থায় একই যায়গায় বসিয়া থাকিতে দেখিতাম।"

মিঃ মুখার্জ্জি বলেন,—একদিন রাত্রিতে ফিন্‌ফিনে বৃষ্টি হইতেছিল এবং প্রবল ঝড় বহিতেছিল, সেদিন অত্যন্ত ঠাণ্ডাও বোধ হইতেছিল। রাত্রি ২॥ টা কি ৩ টার সময়, সাধু কি করিতেছে দেখিবার জন্য মিঃ মুখার্জ্জি বাহিরে যান।

তখনও সাধুর ধুনি জ্বলিতেছিল। সাধু তখনও উপবিষ্ট। শান্ত, সৌম্য, —যেন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার স্মরণ হয় না—আমি আর কখনও ঢাকায় এমন সুন্দর সুপুরুষ জটাধারী সন্ন্যাসী দেখিয়াছি কি না?

মিঃ মুখার্জ্জি বলিয়াছেন, তিনি দুই চারিবার সাধুর সঙ্গে কথা কহিয়াছেন। বাঙ্গালা পদ্ধতিতে বলিতে হইলে ৩।৪ বার বলিতে হয়। একদিন সাধুর নিকট মিঃ মুখার্জ্জি কতকগুলি লোক দেখিতে পান। তাঁহারা সাধুকে জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনি কেমন করিয়া বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম সহ্য করেন?" সাধু ১০।১২ বৎসরের একটি বালকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন,—

"যব হম ইত্‌না বড়া থা, হামরা মুলুক পাঞ্জাব ছোড় দিস ঔর সাহা—সাঁলা হো গয়া। হৈকা বংগলা মুল্লুককা পানী বহুত খরাব হৈ।" তারপর

সাধু তাঁহার নিজের মাথা হাত দুইটি দিয়া ধরিয়া কহিলেন,—"শির দুখতা হৈ য়া জগা খরাপ হৈ। অর্থাৎ (আমি এই বালকের মত বয়সে, আমি আমার দেশ পাঞ্জাব ছাড়িয়া আসি। সকলই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালার জলবায়ু অত্যন্ত খারাপ, আমার মাথা ব্যথা করে, এ জায়গা বড় খারাপ)। যত দূর স্মরণ হয়, মিঃ মুখার্জ্জি সাধুর নাম জিজ্ঞাসা করেন নাই। অথবা তাহার বাড়ী কোথায় তাহাও তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই। তিনি যে পক্ষে সাক্ষ্যদিবার জন্য আহুত হন, সেই পক্ষ তাঁহাকে কতকগুলি জবানবন্দী না দেখান পর্য্যন্ত, মিঃ মুখার্জ্জির স্মরণ হয় নাই যে, সাধু কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁহার গুরু কে, তাহা তিনি বলিয়াছিলেন কি-না, ১৯২১ সালের ২৬শে মে ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ, রমেশচন্দ্র দত্তের নিকট তিনি যে জবানবন্দী দিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল।

মিঃ মুখার্জ্জির সাক্ষ্যের সমালোচনা

ঐ দিন বাদী জয়দেবপুরে ছিলেন। ৪ঠা মে, বাদী তাঁহার পরিচয় প্রকাশ করেন, অথবা ঐ দিন বাদী নিজ পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। ২৬শে মে এক বিতর্কের সূত্রপাত হয়। ঠিক কোন দিন যে বিতর্ক উঠে, নিম্নে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। অপিচ মিঃ মুখার্জ্জি যখন জবানবন্দী দিলেন, তখন পূর্ব্বে যে মাস দিন প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে সময়ও তাহার উপরই জোর দেন এবং নন জুডিশিয়েল তদন্তে তিনি সে জবানবন্দী দিয়াছিলেন। নিম্নে আমাকে এই বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইবে। কমিশনারের নিকট মিঃ মুখার্জ্জি যে জবানবন্দী দেন, সাক্ষ্য গ্রহণ আইনের ১৫৭ ও ১৫৯ ধারা অনুসারে সে জবানবন্দী তাহার আদালতের সাক্ষ্য সমর্থনের জন্য, অথবা তাঁহার স্মৃতির সাহায্য কল্পে ব্যবহৃত হইতে পারে না। যে ভাবেই বিচার করা হউক না কেন, কোনও অবস্থাতেই সেই জবানবন্দী দেখিয়াও মিঃ মুখার্জ্জি স্মরণ করিতে পারেন নাই যে, বাদী গুরু নানকের শিষ্য বলিয়া তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল কি না। মিঃ মুখার্জ্জি ঐ জবানবন্দী দেখিয়া এই মাত্র স্মরণ করিতে পারিয়াছিলেন যে, সাধু তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'আমার পিতা মাতা কেহ নাই। সুতরাং আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না'। মিঃ মুখার্জ্জি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন,—একদিন সাধু কয়েকজন পশ্চিমাকে, 'তোমরা আমাকে কি দিতে পার? আমি আমার পিতা মাতা ও স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়াছি। 'আমি বাস করিবার জন্য একখানি ঘরও পাই না।' এই কথা বলিতে শুনিয়াছি।

তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি এই কথা বলিয়াছেন। তিনি এখন বলেন

যে, সাধুর পিতা মাতা নাই এ কথা বলেন নাই, যাহা হউক বাদী পাঞ্জাবী কি হিন্দুস্থানী তৎসম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করিব, মিঃ মুখুজ্জ্যে সাক্ষ্যদান কালে বলিয়াছেন যে, সাধু পাঞ্জাবী বা দুর্ব্বোধ্য হিন্দী বলেন নাই, সাধুকে কয়েকজন বাঙ্গালীর সহিতও হিন্দীতেই কথা বার্ত্তা বলিতে তিনি শুনিয়াছেন, বাঙ্গালীরা কিন্তু বাঙ্গালাতে কথা বলিয়াছে, তাহারা সন্ন্যাসীর নিকট ঔষধ চাহিয়াছিল, তাহাদিগকে ঔষধ দিয়াছেন কি-না তাহা তাঁহার মনে নাই, বিবাদী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, যে মাসে যখন বাদী আত্মপরিচয় দেন, তখন তিনি বাঙ্গালা বলিতে পারেন নাই। অতুলবাবু কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তিনিও বলিয়াছেন ঐ সময় বাদী অদ্ভুত রকমের হিন্দুস্থানীতে কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন।

বাদীর স্মৃতিশক্তির কথা

বাদী নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধে যে সকল লোক তাহাকে বিরক্ত করিয়াছে, তাহাদের সহিত তিনি হিন্দীতেই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

আমার নিকট বহুলোক আসিয়াছে। তাহারা তাহাদের মধ্যে বলাবলি করিত—'এই ভাওয়ালের কুমার, ইনিই মেজকুমার।' যাহারা সেখানে আসিয়াছিল তাহাদের অনেককেই আমি চিনিতাম, তাহারা কিছু না বলিলে আমি কিছুই জানিতাম না। তাহারা বাঙ্গালাতে কথা বলিত এবং আমি হিন্দীতে বলিতাম, "আমার গুরু আত্মপরিচয় দিতে নিষেধ করিয়াছেন তাই বলিয়া আমি হিন্দী বলিতাম।"

জেরার উত্তরে তিনি বলেন, যখন আমি ঢাকা পৌঁছি এবং যখন আমি জয়দেবপুরে যাই তখন আমি বুঝিতে পারি যে, আমি বাঙ্গালী, ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশন আমরা নিকট পরিচিত বলিয়া মনে হইয়াছিল। কি ভাবে আমি জায়গাটা চিনিলাম, তাহা ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইয়া যাই। আমার সন্ন্যাস নেওয়ার পর আমি কখনও ঢাকা আসি নাই, রেলওয়ে ষ্টেশনে আমি রাজার পুত্র বলিয়া ভাবিতেও পারি নাই, স্মরণেও আনিতে পারি নাই। পরদিন আমি বাকল্যাণ্ড বাঁধে গিয়া বসি। আমার কাছ দিয়া যে সকল লোক যাইতেছিল, তাহাদিগকে আমি চিনিতে পারিয়াছিলাম। তাহাদের নাম মনে পড়িতে লাগিল, ঢাকা আসিবার পূর্ব্বে আমি গরু, মানুষ ও জিনিষ পত্র চিনিতাম, আমি যে রাজার পুত্র তাহা আমি জানিতাম না।

তিনি ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধে খোলা জায়গায় তিন মাস বাস করিয়াছেন, বলিয়া

অতঃপর তিনি বলেন, আমি যে এই অঞ্চলের লোক, এই কথা আমার ক্রমে ক্রমে স্মরণে আসিত লাগিল।

প্র—আপনি যে মেজকুমার একথা কি তখন আপনার স্মরণে আসিয়াছিল ?

উ—আমার মনে নাই। (পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হয়) যে সকল লোক আমার পাশ দিয়া যাইত, তাহাদিগকে আমি চিনিতে পারি ; আমি যে মেজকুমার, তখন ইহা আমার স্মরণে আসে, প্রথমে ইহা আমার মনে পড়ে, তার পর লোকে বলাবলি করিত 'ইনিই ভাওয়ালের মধ্যম কুমার।'

প্রঃ—আপনি বুঝি তখন মনে করিয়াছিলেন যে, আপনার মায়া কাটিয়া যাইতেছে ? উহা কি একটী কঠিন সমস্যা বলিয়া মনে হইতেছে ?

উঃ—না, এখানে আমার পুরাণ-স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে। আমার বাড়ী, আমার আত্মীয়স্বজনের কথা মনে পড়িতে লাগিল। যখন আমি কাশিমপুর যাই, তখন বাড়ী ঘর দুয়ার আত্মীয়স্বজনের কথা আমার মনে পড়িল।

প্রঃ—যখন আপনি জয়দেবপুর গেলেন, তখন মায়ার মোহ কাটিয়া যাওয়াতেই কি সকলের কথা মনে পড়িয়াছিল ?

উঃ—হাঁ, তাহা গুরুর আদেশেই হইয়াছে। তখন কেহ আমাকে মনে করাইয়া দেয় নাই। আমি দেখিলাম যে, আমিই মনে করিতে পারিতেছি। এই উত্তরগুলি শুনিতে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনেহয়, কিন্তু বাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, দার্জ্জিলিংএ যখন তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে, তখন তিনি তাঁহাকে চারিজন নাগার মধ্যে দেখিতে পান, এবং তিনি যে কে ছিলেন, তিনি আর সেকথা মনে করিতেই পারেন নাই, একটু আবছা আবছা মনে পড়িতেছিল, তবে তিনি যখন বহ্নিসত্রে পৌছেন, তখন তাঁহার মনে পড়ে যে তাঁহার বাড়ী ঢাকা। ইহার বেশী আর কিছুই মনে পড়ে নাই। তারপর তিনি—যখন ঢাকা পৌছেন, তখন ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্মৃতি ফিরিয়া আসিতে থাকে। বাদীর উক্তি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। বার বৎসরের জন্য স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহা সম্ভব কি-না, তাহাও দেখিতে হইবে।

এই সম্পর্কে আদালতকে বিশেষজ্ঞদের মতামত সম্পর্কেও বিবেচনা করিতে হইবে। এই রকম অবস্থায় বাদীর পক্ষে তাঁহার মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা সম্ভব কি-না, তাহা দেখিবার জন্য আইন এবং এই সম্পর্কিত বইপত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে, এই ব্যাপারটা অযৌক্তিক তর্কালোচনার বিষয় নহে। যুদ্ধের পর বোমা ফাটার ফলে যে সকল লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, সেই সকল লোকের ঘটনাগুলিও এই সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়। মৃত্যুর পর জীবন লাভ করা যে প্রকার অসম্ভব, সেই প্রকার স্মৃতিশক্তি ফিরিয়া

পাওয়াটাও অসম্ভব, এই প্রকার ধারণা করা ঠিক নহে। কিছু সময়ের জন্য এই প্রকার জটিল আলোচনা বন্ধ রাখিয়া, আমি ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধের ঘটনা সম্পর্কেই আলোচনা করিতে চাহি এবং যে সকল ঘটনা স্বীকার করা হইয়াছে বা যে সকল ঘটনা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিবে না, বা যে সকল ঘটনা সম্পর্কে সন্দেহ আছে, অথচ যে সকল ঘটনা সম্পর্কে সত্যতা সহজেই বুঝা যায় এই সকল ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাই।

জনসাধারণের সহিত কথাবার্ত্তার প্রসঙ্গ

বাদী তিনমাসের অধিক সময় ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধে ছিলেন, তথায় শত শত লোক তাঁহাকে দেখিয়াছে, তাঁহার অঙ্গুলী, চুল এবং গলার স্বরের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

যাহারা আসিয়া বাদীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিত, শুধু তাহাদের সহিতই তিনি হিন্দীতে কথা বলিতেন। সাধারণতঃ সন্ন্যাসী দেখিয়া লোক যেমন করিয়া থাকে, তেমনি সকলে আসিয়া তাঁহার নিকট ঔষধ চাহিত, এবং তিনি সময় সময় তাহাদিগকে কিছু ভস্ম দিয়া দিতেন। কখনও কাহাকে কবচ দেওয়ার কথা তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহাকে জেরা করা হয় নাই, তিনি বরঞ্চ অধিক ক্ষেত্রেই আশিষ দিয়া থাকিতেন।

সন্ন্যাসী-বেশে মধ্যম কুমার

অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ দেবব্রত বাবুর সহিত রাজপরিবারের পরিচয় ছিল না, এবং তিনি কুমারদিগকেও চিনিতেন না। বাদীপক্ষে এমন ২১ জন সাক্ষ্য দিয়াছে, যাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাহারা কুমারকে চিনিত এবং আলোচ্য সময়ে বাদীকে বাকল্যাণ্ড বাঁধের উপর দেখিয়াছিল। বিবাদীপক্ষের যুক্তি এই যে, বাকল্যাণ্ড বাঁধে বাদীকে কেহ চিনিতে পারে নাই, বা তাঁহাকে কেহ দ্বিতীয় কুমার বলিয়া সন্দেহও করে নাই। বিবাদীপক্ষে আরও বলা হইয়াছে যে, ১৯২১ সালের ৪ঠা মে জয়দেবপুরে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে বাদী তাঁহাকে দ্বিতীয় কুমার বলিয়া ঘোষণা না করা পর্য্যন্ত, কেহ তাঁহাকে মধ্যমকুমার বলিয়া বলে নাই, বা সেরূপ কোন সন্দেহও করে নাই। তাঁহার চেহারা সম্পূর্ণ পৃথক রকমের ছিল, এবং তিনি বাংলা একটী কথাও বুঝিতেন না বা বলিতে পারিতেন না, তিনি বিড়্ বিড়্ করিয়া এমন অবোধ্য কিছু বলিতেন; যাহা কেহই বুঝিতে পারিত না।

এই মামলায় বাকল্যাণ্ড বাঁধের ঘটনা সম্পর্কে বাদীপক্ষের ৩২৬, ৩৫৮, ৪৩৭, ৪৭২, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৯৯, ৬৩৫, ৬৩৪, ৬৬৬, ৬৮৩, ৭৭৯, ৮৫৮, ৮৮৮, ৮৯৩,

এবং ৯১৯নং সাক্ষী বলিয়াছে যে, বাদীকে দেখিয়া তাহাদের মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, ইনিই দ্বিতীয় কুমার কি না। এই চিন্তা তাহাদের মনকে আলোড়িত করিয়াছিল। কোন কোন সাক্ষীর মনে অবশ্য এই চিন্তার উদয় হয় নাই ; কিন্তু মনে হয় সে সকল সাক্ষী কুমারকে খুব ভাল ভাবে চিনিত না। তাহারা হয়ত রাস্তায় বা ঘটনাচক্রে অন্য কোথাও কুমারকে কদাচিৎ দেখিয়া থাকিবে। আর বাকী সকল সাক্ষী যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য। তাহারা দ্বিতীয় কুমারকে মুখ দেখিয়া চিনিত, এবং বাকল্যাণ্ড্ বাঁধে বাদীকে দেখিয়া তাহাদের অনেকের মনেই ইহাকে 'কুমার' বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল ; কিন্তু তাহারা ঠিক তখন চিনিয়া উঠিতে পারে নাই। বাকল্যাণ্ড বাঁধে থাকিবার সময় বাদীকে কুমার বলিয়া সন্দেহ করা হইয়া থাকিলেও কুমারের সাদৃশ্য সম্বন্ধে কোন কিছু প্রমাণ হয় না। তবে তাঁহাকে যে কুমার বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল, একথা কেবল বাদীপক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বাদী যখন বাকল্যাণ্ড বাঁধে অবস্থান করিতেছিলেন তখন নবাব এষ্টেটের তৎকালীন ম্যানেজার মিঃ মেয়ার বাকল্যাণ্ড বাঁধের উপর অবস্থিত ওয়াইজ হাউসে বাস করিতেন ; বিবাদীপক্ষে তিনি সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বাকল্যাণ্ড বাঁধে এই সাধুকে তিনি অনেকবার দেখিয়াছেন, একটি কারণে সাধুর প্রতি তিনি বিশেষ নজর রাখিতেন ; সেই কারণটি হইতেছে এই যে, তাঁহাকে আসিয়া একজন বলিয়াছিল যে, এই সাধু নিজেকে নাকি 'ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার' বলিয়া বলিতেছে, মিঃ মেয়ার বলিয়াছেন,—"এই কথা শুনিবার পর আমি যখন বাকল্যাণ্ড বাঁধে বা অন্য কোথাও বেড়াইতে যাইতাম, তখন তাহার সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহসহকারে অনুসন্ধান করিতাম, এবং আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, সে একজন প্রতারক।" ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বাদী যখন বাকল্যাণ্ড বাঁধে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনই তাঁহাকে দ্বিতীয় কুমার বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছিল। যে সকল সাক্ষী এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে, তাহারা সত্য কথাই বলিয়াছে, এবং বাদী যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের উক্তিতে সমর্থিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিবাদীপক্ষ বাকল্যাণ্ড বাঁধ সম্পর্কিত ব্যাপার লইয়া আদালতে খুবই তুমুল-ভাবে লড়িবার ফলেও একমাত্র দেবব্রত বাবু ছাড়া, ঢাকা হইতে এমন একজন সাক্ষীকেও আনিতে পারেন নাই, যে ব্যক্তি বাদীকে সেই অবস্থায় দেখিয়াছে। বাদী কিন্তু এই ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ দেখান নাই ; আর তা ছাড়া দেবব্রতবাবুও কুমারকে চিনিতেন না, ঢাকায় কুমারকে লইয়া যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি

হইয়াছিল, তাহা শত শত ঢাকাবাসীর অবশ্যই মনে আছে ; কিন্তু বিবাদীপক্ষ ঐ বিষয়ে, সতীশ মিত্র (বিবাদীপক্ষের ১২৪নং সাক্ষী) নামে এক ব্যক্তি ভিন্ন দ্বিতীয় সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারিলেন না। তাহার বাড়ীও আবার ঢাকায় নহে। তাহার সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখিয়া আমার সন্দেহ হয় যে, সে কুমারকে আদৌ চিনিত কি-না, অথবা বাদীকে বাকল্যাণ্ড বাঁধে দেখিয়াছিল কি না ?

বুদ্ধুবাবুর সহিত বাদীর সাক্ষাৎ

একদিন বুদ্ধুবাবু, শ্রীযুত রমেশ চৌধুরী এবং ভুলুবাবু ওরফে অতুলপ্রসাদকে (কাশিমপুর) লইয়া বাদীকে দেখিতে যান ; কিন্তু তাঁহাকে তাঁহারা ঠিক চিনিতে পারেন না ; কিন্তু অতুল বাবু বলেন যে, 'বাদীকে ঠিক দ্বিতীয় কুমারের মতই দেখা যায়।' ইহার পূর্ব্বে রাজপরিবারের আর কেহ বাদীকে বাকল্যাণ্ড বাঁধে দেখিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। এই কথা বিবাদী পক্ষ স্বীকার করেন না। বাকল্যাণ্ড বাঁধে বাদীকে দেখিয়া কুমার বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল—এই কথা সত্য হইলে, ইহাতে বাদীর সাদৃশ্য প্রমাণে অবশ্য কিছু সুবিধা হয় না, কিন্তু তিনি জীবিত বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল, এবং তাঁহার চেহারার যে মিল আছে—ইহা প্রমাণে উহাই যথেষ্ট সাহায্য করে। যাহারা একজন প্রতারকের মুখোস খুলিয়া দিতে চায়, আমার মনে হয়, তাহারা বাদী এবং কুমারের চেহারার মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে, এবং যে গুজব রটিয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার বুঝাইয়া বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতে পারে যে, বাদী কুমার নহেন। কিন্তু বিবাদীপক্ষ এই দুইটীর কোনটিই স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা সাক্ষীর পর সাক্ষী আনিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, কোন গুজব রটে নাই। এবং বাদী ও কুমারের চেহারায় এত পার্থক্য আছে যে, একজনকে আর একজন বলিয়া ভুল করিবারও কোন সম্ভাবনা নাই ; আর কিছু যদি নাও ধরা যায়, তথাপি ইহাই যথেষ্ট যে, তিনি বাঙ্গালায় কথা বলিতে পারেন না, এবং বাঙ্গালা বোঝেনও না।

বাদীর কাশিমপুরে গমন

ইহার পর দেখা যায়, ৫ই এপ্রিল বাদীকে কাশিমপুরে লইয়া যাওয়া হয়। বাদীকে কে কাশিমপুরে লইয়া যায়, ইহা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। বাদী বলেন যে, কাশিমপুরের জমিদার বাবু অতুলপ্রসাদ রায় চৌধুরী তাঁহাকে কাশিমপুরে লইয়া যান। কাশিমপুর জয়দেবপুর হইতে বেশী দূর নহে। জয়দেবপুর হইতে ৪ মাইল গেলে কোড্ডা গ্রাম পাওয়া যায়। সেখান হইতে তোরাগ নদী পার হইয়া দুই মাইল গেলেই কাশিমপুর। অতুলবাবু সেখানকার একজন জমিদার।

এই জমিদার পরিবারের সহিত ভাওয়াল রাজপরিবারের যথেষ্ট সৌহার্দ্দ্য ছিল, এবং মধ্যম কুমার ও অতুল বাবু উভয়েই উভয়কে খুব ভালভাবে চিনিতেন। বাদী বলিয়াছেন যে, অতুল বাবু তাঁহাকে 'মেজকুমার' মনে করিয়া কাশিমপুর লইয়া যান।

বাদী জয়দেবপুরে

তিনি সেখানে ৫।৬ দিন থাকিবার পর, হাতীতে করিয়া তাঁহাকে জয়দেবপুরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বাকল্যাণ্ড বাঁধ হইতে যে বাদী কাশিমপুরে গিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠে নাই। বাদী জয়দেবপুরে আসিয়া পৌছিবার তারিখ ব্যতীত, অন্য কিছু লইয়া বিবাদী পক্ষ এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন তোলেন নাই। বাদী ১৩২৮ সনের ৩০শে চৈত্র আসিয়া জয়দেবপুরে পৌছেন; কিন্তু বিবাদী পক্ষ বলিয়াছেন যে, বাদী চৈত্র মাসের শেষ তারিখে আসিয়া জয়দেবপুর পৌছেন; অর্থাৎ তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে, সব সময়েই চৈত্র মাস ৩০ দিনে হয়। কিন্তু সেই বৎসর ৩১ দিনে চৈত্রমাস হইয়াছিল, এবং ইহার পরে আমি দেখাইব যে, বাদীর জয়দেবপুরে আগমনের পরদিন কোনও দেনা পাওনা ব্যাপারে এই ভুল ধরা পড়িয়াছিল। সেই প্রসঙ্গে না আসা পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কিছু বুঝা যাইবে না। কাজেই কাশিমপুরে কি ঘটিল, তাহা লইয়াই এখানে আলোচনা করিব।

অতুল প্রসাদের কৈফিয়ৎ

ভুলুবাবু (অতুলপ্রসাদ) নিজে বাদীকে কাশিমপুর লইয়া গিয়াছিলেন, ইহা তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কোন কর্ম্মচারী দ্বারা বাদীকে মেজকুমার বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় তিনি তাঁহাকে কাশিমপুর পাঠান নাই। তাঁহাকে (বাদীকে) তথায় পাঠাইবার কারণ এই যে, তাঁহার খুড়া সারদাপ্রসাদ নিঃসন্তান ছিলেন, এবং তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনি পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ করান। ভুলুবাবু ইহাও স্বীকার করেন যে, বাদী পুত্রেষ্টিযজ্ঞের সম্পর্কে কিছুই জানেন না, ইহা বলার পর তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে করিয়া জয়দেবপুর পাঠাইয়া দেন। অনেকে অনেক সময় অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপারের গৌণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য উপহাস করিয়া থাকেন, এবং ইহা তাহার একটা দৃষ্টান্ত। বাবু অতুলপ্রসাদ (ভুলুবাবু) ঋণ-জর্জ্জরিত, কারণ তাঁহার ঢাকার বাড়ী অগ্রিম ক্রোকাবদ্ধ। তিনি প্রাচীন জমিদার বংশের লোক, এবং ভাওয়াল পরিবারকে নিশ্চয়ই তিনি জানিতেন। তিনি অপেক্ষাকৃত যুবক এবং তিনি যখন কমিশনে জবানবন্দী

দেন, তখন তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর। বাদী পক্ষে এইরূপ সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি সুস্থ ছিলেন এবং সাক্ষ্য দিতে আদালতে আসিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহাকে আদালতে ডাকা হয় নাই, এবং মামলা যখন শেষ হয়, তখন ঐ জবানবন্দী দাখিল করা হয়, এবং প্রশ্ন উঠে যে, তাঁহার প্রমাণ গৃহীত হইতে পারে কিনা। এক ব্যক্তি সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসিয়া বলে যে, সে একজন ডাক্তার। অতুলবাবু পীড়িত হওয়ায় কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। পরে দেখা যায় যে, ঐ ডাক্তার অতুলপ্রসাদেরই একজন গোমস্তা। কিন্তু অতুলবাবু যে এলাকার বাহিরে চলিয়া যান, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে, **অতুলবাবু পলায়ন করিয়া তাঁহার প্রমাণ গ্রহণযোগ্য করেন**। বোধ হয় পলায়ন করিবার তাঁহার যথেষ্ট কারণও ছিল। বাদীর চেহারার সহিত মেজ কুমারের চেহারার সাদৃশ্য আছে কিনা, তৎসম্পর্কে বিবাদীপক্ষে যে ১০ জন সাক্ষী উপস্থিত করা হইয়াছে, অতুলবাবু তাহাদের অন্যতম। তাহাদের সকলেরই বাড়ী ঢাকা জিলায়। ঐ সময় কোন কোন বিষয়ে কমিশন সাক্ষিগণ যে সব কথা বলিয়াছেন, মামলা আরম্ভ হইবার পর মামলার ক্ষতি না করিয়া কিছুতেই তাঁহাদের ঐসব উক্তি সমর্থন করিবার উপায় ছিল না। এই অতুলপ্রসাদ, বাদী ও মেজ কুমারের চেহারার মধ্যে যে সব পার্থক্য আছে, তাহার একটা ফিরিস্তি দিয়াছেন; তাহার মধ্যে একটা পার্থক্য এই দেখান হইয়াছে যে, কুমারের চুল কটা ছিল, কিন্তু বাদীর চুল কালো; কিন্তু বাদীর চুল কালো নহে, কটা বটে। কালো হওয়া দূরের কথা—এমনকি, মিঃ লিণ্ডসে ১৯২১ সালের মে মাসে বাদীর সুন্দর গায়ের চামড়া এবং সোনালী কটা চুল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অতুলবাবুর কালো চুলের কাহিনীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, লাহোরের দশজন সাক্ষীও বলিয়াছেন যে, মালসিংহের চুলও (বাদীকে উজলার মালসিংহ বলা হইয়াছে)। কালো বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী এই কালো'র কাহিনী বাঁচাইবার পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ চেষ্টার পর সে সম্পর্কে অনেক সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন,—বলেন যে, মেজকুমারের সহিত বাদীর চুলের আর কোন মিল নাই। অতুলবাবু আদালতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার এই 'কালো' রংয়ের কাহিনীর কথা বলিতে পারেন নাই। ইহা একটী দৃষ্টান্ত মাত্র; কিন্তু কমিশন সাক্ষ্যদ্বারা ইহা বেশ ধরা যাইতেছে যে, সাক্ষীদের উক্তিতে এমন অনেক বিষয়ই আছে, যাহা তাহাদের পরবর্ত্তী চিন্তার ফল—বিশেষ করিয়া এই সাক্ষীর (অতুলবাবুর) প্রায় প্রত্যেক উক্তিতেই সুস্পষ্টভাবে 'মিথ্যার ছাপ' রহিয়াছে। এই সম্পর্কে যখন আমি আলোচনা

করিব, তখন ইহা আমি দেখাইব, বর্ত্তমান প্রসঙ্গ সম্পর্কে অবশ্য তিনি (অতুল প্রসাদ) স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনিই সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া পাঠান। যে কর্ম্মচারী বাদীকে কাশিমপুর লইয়া যায়, তাহাকে হাজির করা হয় নাই। অতুলবাবু স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি বাদীকে জয়দেবপুর পাঠান: তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ী গিয়াছিলেন। ১৯২১ সালের মে মাসে বাদী তথায় বাস করিতেছিলেন। তিনি স্বীকার করেন যে, বাদী ঢাকায় যে বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তিনি তথায় গিয়াছিলেন। বাদী আরও পরে এই বাসায় আসিয়া থাকেন। তিনি এই বাড়ীতে এত বেশী যাতায়াত করিতেছিলেন যে, তাঁহার প্রতিবেশী, ঢাকার একজন উকীল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, 'গবর্ণমেণ্ট বাদীকে 'প্রতারক' বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও তিনি কেন সাধুর জন্য এত বেশী ঘুরাফিরা করিতেছেন।' তাহাতে তিনি উত্তর দেন যে, **সাধু কুমার স্বয়ং** (বাদীপক্ষের ১০৩২ নং সাক্ষী ভুবনমোহন পালিত) বাদী যখন কাশিমপুর যান তখন কাশিমপুর রাজপরিবারের কর্ত্তা সারদাবাবু তথায় ছিলেন। বাদী তাঁহার নামে সমন দেওয়া সত্ত্বেও তিনি হাজির হন নাই; বিবাদী পক্ষও তাঁহাকে হাজির করিতে সাহস পান নাই। কিন্তু অতুলবাবুর শালা, উকীল বীরেন্দ্র বসু দরখাস্ত দ্বারা বাদীপক্ষ ত্যাগ করিয়া নীরবে বিবাদী পক্ষে চলিয়া যান; এবং মিঃ চৌধুরীর জুনিয়রদের সহিত যাইয়া বসেন! পরে সওয়ালের সময় দেখা যায় যে, ঐ উকীলটী ওকালতনামাই দাখিল করেন নাই। অতঃপর আমি ইহাই সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, এই অতুলবাবু বাকল্যাণ্ড বাঁধে সাধুকে দেখিতে আসেন, এবং তিনি সাধুকে কাশিমপুর লইয়া যান ও পরে তিনিই ঢাকা হইতে তাঁহাকে জয়দেবপুর লইয়া যান। ১৯২১ সালে ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজার মিঃ নীডহাম তাঁহার রিপোর্টে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। বাদীপক্ষের ৬৬৬নং সাক্ষী হেমেন্দ্র বাবু, চৈত্র মাসের কোন একদিন অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় তিনি (অতুল বাবু) সাধুকে বাকল্যাণ্ড বাঁধ হইতে লইয়া যাইতেছেন ইহা দেখিতে পান।

যোগেন্ বাড়ুয্যের আরও কথা

এই পুত্রেষ্টি যজ্ঞের কাহিনী এবং এই সন্ন্যাসী পরিবর্ত্তনের কথা (যাহার ফলে বাদীকে জয়দেবপুর আনা)। এত অসম্ভব যে বিবাদীপক্ষ মামলা আরম্ভ করিবার পর আর এক কাহিনী সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। রায় সাহেব

যোগেন্দ্র—যিনি ১৩৩৪ সাল পর্য্যন্ত জয়দেবপুরে বিবাদী পক্ষের কর্ম্মচারী ছিলেন, এবং এই মামলায় প্রধান তদ্বিরকারক। ইঁহারই পুত্র দার্জ্জিলিংএ বাঙ্গালার গভর্ণর স্যারজন এণ্ডারসনের উপর আক্রমণ করার ফলে তাঁহাকে (যোগেন্‌কে) ডিস্‌মিস্‌ করা হয়। তিনি যাহাতে পুনর্ব্বহাল হইতে পারেন, তজ্জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন এবং তাহা এখনও মুলতুবী আছে। তিনি এই মামলা সম্পর্কে কিরূপ প্রাণপণে আশ্চর্য্য-জনক তদ্বির করিয়াছেন, আমি নিম্নে সেইগুলির মধ্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিব।

এই সাক্ষীটি (যোগেন্দ্র ব্যানার্জ্জি) আসিয়া বলেন, প্রথমদিন তিনি বাদীকে বারুণী মেলায় কাশিমপুর যাইবার রাস্তায় হস্তিপৃষ্ঠে দেখেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সাব ডেপুটী কালেক্টর মিঃ তমসারঞ্জন (মৃত) এবং কাশিমপুরের একজন কর্ম্মচারী (তাহাকে ডাকা হয় নাই) ছিলেন। মিঃ তমসারঞ্জন তাঁহাকে বলেন যে, সাধুকে যজ্ঞ করাইবার জন্য এবং সারদাবাবুর স্ত্রীর চিকিৎসা করাইবার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে। তিনি (যোগেন্‌বাবু) সাধুকে জয়দেবপুর পাঠাইয়া দিতে বলেন ; বাদীকে চিনিতে পারেন নাই, ইহাপ্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, কুমারের ভাগিনেয় বুদ্ধু তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বাদীকে এই সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করাহয় নাই। এই তদ্বিরকারকের হয়ত বিবাদী পক্ষের কৌসলীদিগকে এইসব কথা বলিবার খেয়াল পূর্ব্বে হয় নাই। **আমি এ ব্যক্তির একটী কথাও বিশ্বাস করি না**। আমি সাব্যস্ত করিতেছি যে, অতুল বাবু বাদীকে বাকল্যাণ্ড বাঁধ হইতে লইয়া যান, বাদী পক্ষের এই উক্তি সত্য। কাশিমপুরে কি হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে বিতর্ক আছে। একদিকে বাদীর সাক্ষ্য এবং অপর দিকে অতুল বাবুর সাক্ষ্য ; কারণ এই সম্পর্কে মাত্র আর একজন সাক্ষী আছেন, (বাদী পক্ষের ৮৫৭নং সাক্ষী) এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে তথায় উপস্থিত ছিলেন কিনা, তৎসম্পর্কে সন্দেহও আছে। এই সাক্ষীর উক্তিদ্বারা কাশিমপুরে বাদীকে যে কেহ চিনিতে পারিয়াছিল, তাহা মনে হয় না। কারণ দেখা যায় যে, বাদী সারদা বাবুর সহিত সাক্ষাতের পর কাশিমপুরেও একটী গাছতলায় বাস করেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার্য্য যে, বাদীকে কাশিমপুর লইয়া যাওয়া হইয়াছিল,এবং তথা হইতে তাঁহাকে জয়দেবপুর পাঠাইয়া দেওয়া হয়,এবং পুত্রেষ্টি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে লইয়া যাওয়া হয় নাই, ততক্ষণ এই সাক্ষীর উক্তির উপর কিছু নির্ভর করে না। যে কারণে মিঃ মেয়ার বাকল্যাণ্ড বাঁধে বাদীর চেহারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন, সেই কারণেই বাদীকে কাশিমপুরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল ; এবং পরে তাঁহাকে জয়দেবপুর পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

কাশিমপুরে অতুলবাবু বাদীকে দিয়া কতকগুলি স্বীকারোক্তি করাইয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন যে, বাদী নানা প্রকার অবোধ্য হিন্দীতে কথা বলিতে ছিলেন; এবং তাহার অনুবাদ করিয়া দিতে হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন, বাদী তথায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ জানেন না, তাঁহার গুরু ধরমদাস ও তাঁহার বাড়ী পাঞ্জাবে। এবং তাঁহার নাম সুন্দরদাস। বাদীর এই সব উক্তি সমস্তই সত্য। বাদীকে এই সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করা হয় নাই। ১৯২১ সালের জুন মাসের পাঞ্জাবে তদন্তের পর সুন্দরদাসের নাম বাদীর সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হয় যে কারণে বিবাদী পক্ষ, বাদী পাঞ্জাবী, ইহার অধিক দূর আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তাহার কারণ নিম্নে বর্ণনা করিতেছি। বাদী সুন্দর দাস অথবা মাল সিং, বর্ণনাতে তাহার উল্লেখ নাই—যদিও বিবাদীপক্ষ বাদী উজলার মাল সিংহ্ এবং দীক্ষা গ্রহণের পর সুন্দব দাস নামে পরিচিত—ইহা পরে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বাদী বাকল্যাণ্ড বাঁধে হিন্দীতে কথা বলেন—যে হিন্দীর কথা দেবব্রত বাবু বলিয়াছেন এবং এমন বহু প্রমাণ রহিয়াছে যে, ১৯২১ সালের মে মাসে বাদী তাঁহার আত্মপরিচয় প্রকাশ করিবার পর—কাশিমপুর হইতে আগমনের প্রায় একমাস পর—তিনি বাঙ্গালাতে কথা বলিতে আরম্ভ করেন। এইসব প্রমাণ পরীক্ষা করা দরকার। বাদী একজন পাঞ্জাবী অথবা হিন্দুস্থানী মাল সিং অথবা সুন্দর সিং, এই সমস্ত প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইবে। কিন্তু এই সাক্ষী দ্বারা বাদীর যে সব স্বীকারোক্তি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা কোন কাজেই লাগিবে না। কারণ তাহার সাক্ষ্যের উপর ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যদি ঐ সাক্ষী এপ্রিল মাসে সুন্দর দাসের নাম জানিতেন, এবং আত্মপরিচয় প্রকাশের পর মে মাসে জয়দেবপুর আসিয়া বাদীকে প্রতারক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকিতেন, এবং রায় সাহেব ও অন্যান্য যেসব কর্ম্মচারী ঐ সময় বাদীর বিরুদ্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে সুন্দর দাসের নাম আগুনের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত, এবং পাঞ্জাবের সুদূর পল্লীতে অনুসন্ধানের পর ১৯২১ সালের ২৭শে জুন ঐ রিপোর্টে সুন্দর দাসের নাম প্রথম দেখা যাইত না।

আমি ইহাই সাব্যস্ত করিতেছি যে, বাদী অনুমান ৫ই এপ্রিল কাশিমপুর যান, এবং অতুলবাবু তাঁহাকে তথায় লইয়া যান, এবং বাংলা ১৩২৭ সনের ৩০শে চৈত্র (১৯২১ সনের ১২ই এপ্রিল) তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে জয়দেবপুর আনা হয়, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বলিয়াছেন যে, বাদী ৩১শে

চৈত্র জয়দেবপুর যান। তারিখের এই সামান্য গরমিল কি উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে আমি দেখাইব ; কিন্তু ইহাও স্বীকার করেন যে, যেদিন বাদী জয়দেবপুর পৌছেন, সেদিন ৩০শে চৈত্র অথবা ৩১শে চৈত্রই হউক—তিনি সন্ধ্যা ৬টার সময় তথায় পৌছেন। তিনি রাজবাড়ীতে অবতরণ করেন, এবং মাধববাড়ীর কামিনী ফুল গাছের নীচে পোস্তার উপর বসেন। মাধববাড়ী রাজবাড়ীর ভিতরকার ঠাকুরবাড়ী। বাদী তখনও ভস্মমাখা, জটাধারী, ন্যাংটা সাধু। তাঁহার সঙ্গে মাত্র একখানা কম্বল, চিমটা ও কমণ্ডলু ছিল। রায় সাহেব যোগেন্দ্র বাবু ও মোহিনীবাবু এই কাহিনী বর্ণনা করেন। বাদীর আগমনের দিনই তাঁহারা সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছেন, এবং তাঁহাদের এই উক্তি মিথ্যা, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে যে, সাধু ঐ দিন রাত্রিতে, পরদিন এবং তার পরদিন অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত জয়দেবপুরে ছিলেন। এই যাত্রা ঠিক কি ঘটিয়াছিল, তৎসম্পর্কে দুইটি বিষয় ব্যতীত গুরুতর বিতর্ক রহিয়াছে।

সাক্ষীগণের মোটামুটি রিপোর্ট

বাদীর এইবারের জয়দেবপুর আগমন সম্পর্কে কমিশনে গৃহীত সাক্ষী মোক্ষদাসুন্দরী দেবী (৭০), কুলদাসুন্দরী দেবী, বাদীপক্ষের ১৪নং সাক্ষী রামকানাই শীল, বাদীপক্ষের ৮৫২নং সাক্ষী লালমোহন গোস্বামী, বাদীপক্ষের ৯২২নং সাক্ষী সতীশ রায়,৯৩৭নং সাক্ষী অবিনাশ মুখার্জ্জি, বিল্লুবাবু, বাদীপক্ষের ৯৫৮নং সাক্ষী প্রফুল্লকুমার মুখুটী, ৯৭৩নং সাক্ষী সীতানাথ মুখার্জ্জি এবং ৯৭৭নং সাক্ষী সাগরবাবু সাক্ষ্য দিয়াছেন।

এই সব সাক্ষীদের সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। মোক্ষদাসুন্দরী চণ্ডী নিয়োগীর বিধবা পত্নী। চণ্ডী নিয়োগী এই এষ্টেটের নায়েব ছিলেন। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর। তিনি জয়দেবপুরেই থাকিতেন। তাঁহার স্বামী ডিহিতে গেলে তখন তিনি তাঁহার স্বামীর সঙ্গে যাইতেন। তিনি কুমারদের মাতা বিলাসমণির সহিত প্রতিবেশিনী হিসাবে মেলামেশা করিতেন। কুলদাসুন্দরী, রাজা রাজেন্দ্রের জ্ঞাতি ভাই প্রসন্ন ব্যানার্জ্জির বিধবা পত্নী। প্রসন্নবাবু রাণী সত্যভামার (রাজার মাতা) এক ভগ্নীর পুত্র। এই প্রসন্ন বাবুর নাম অনেকস্থলে উল্লেখ আছে। প্রসন্ন (ডাক নাম নিক্কা) নামক অপর এক ব্যক্তির নামের সহিত যাহাতে গোলমাল না হয়, এই জন্য তাঁহাকে জংবাহাদুর ডাকা হইত। এই মহিলা তাঁহার বিবাহের পর হইতে (১১ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়।) সারাজীবন জয়দেবপুরেই বাস করিতেছেন। তাঁহার

বাড়ী রাজবাড়ীর সংলগ্ন উত্তর দিকে। তিনি ইন্দুময়ী ও অপরাপর শিশুদিগকে স্তন্য পান করাইয়াছেন। তাঁহার স্বামীকে যে জমি দান করা হইয়াছিল, তিনি এখনও সেই জমি ভোগ করেন। এই দুইজন মহিলা এবং একজন পুরাতন কর্ম্মচারীর বিধবা পত্নী অনন্তকুমারীর কমিশনে জবানবন্দী গৃহীত হয়। রামকানাই শীল (৭১) রাজপরিবারের নাপিত। রাজবাড়ী হইতে ৫ মিনিটের রাস্তা দূরে সে বাস করে। লালমোহন গোস্বামী, রাণী সত্যভামার ভ্রাতুষ্পুত্র; সতীশ রায়, দিগিন্দ্র ঘোষের (হারবাইদের) একজন কর্ম্মচারী এবং বাদী পক্ষের একজন সমর্থক। অবিনাশ মুখার্জ্জি, পূর্ব্বে ভাওয়াল এষ্টেটের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন এবং পরে রাণী সত্যভামার (তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত) কেরাণী ছিলেন।

বাদী পক্ষের ৯৬৮নং সাক্ষী বিল্লু, ইন্দুময়ী দেবীর পুত্র।

বাদী পক্ষের ৯৫৮নং সাক্ষী প্রফুল্ল মুখুটী, জয়দেবপুর রাজপরিবারের প্রতিবেশী ও বর্ত্তমানে বাদীর একজন কর্ম্মচারী।

কুমারদের বৃদ্ধ গৃহশিক্ষক দ্বারকার পুত্র সীতানাথ মুখার্জ্জি ১৯২৯ সালের সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এষ্টেটে চাকুরী করিয়াছেন। ঐ সময় তাঁহাকে কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলার জন্য ছাড়াইয়া দেওয়া হয় (একজিবিট জেড্ ৫৭)। ১৯২২ সালে একটি মামলায় বাদী নিজের যে পরিচয় দাবী করেন, সীতানাথ তখন বাদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিল, সে তখন চাকুরীতে নিযুক্ত ছিল।

সাক্ষ্যে কি পাওয়া গেল

কথিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়:—

সাধু ৩০শে চৈত্র (১২-৪-২১) তারিখে আসিয়াছিলেন। রাধিকা (বাদীপক্ষের ৮৫২ নং সাক্ষী) ব্যতীত বাদীপক্ষের অপর কোন সাক্ষী ঐ দিন তাঁহাকে দেখেন নাই। তিনি প্রায় অপরাহ্ণ ৬টার সময় আসিয়াছিলেন। যেদিন বাদী আসিয়াছিলেন সেইদিনের একমাত্র এই বিবরণ পাওয়া যায় যে, (সে বিবরণের সহিত রাধিকার প্রদত্ত বিবরণের বিশেষ অমিল নাই)। বাদী কামিনী গাছের নীচে বসিয়াছিলেন; তাঁহার লেংটি পরা ছিল এবং সর্ব্বশরীরে ছাই ভস্ম মাখা ছিল। **রাধিকা** বলিয়াছে যে, ঐদিন বাদী সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন (বাদীর আগমনের যে সময় মানিয়া লওয়া হইয়াছে তাহার সহিত ঐ সময়ের মিল আছে)। সে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল এবং তাঁহার হাত ও পা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু সে তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। তাহার কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার সন্দেহ হইয়াছিল যে, তিনি কুমার। বাকল্যাণ্ড বাঁধে মিঃ মেয়ারের আচরণও অনেকটা এইরূপ।

লালমোহন এই দিন সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, উহা চৈত্র সংক্রান্তির ২।৩ দিন পূর্ব্বে। কিন্তু তিনি পরের দুই দিনের যে বিররণ দিয়াছেন। তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি তাঁহার আগমনের দিনের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। পরের দিন ৩১শে। **সাগরবাবু** ৩১শে তারিখের কথা বলিয়াছেন। উহা আপাততঃ মানিয়া লওয়া যাউক। এবংঐ দিন কি ঘটিয়াছিল সাগর বাবুর কথা হইতে তাহা দেখা যাউক।

প্রাতে সাগর বাবু তাঁহার ভ্রাতা রায় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য রাজবাড়ীতে যান। রায় সাহেবের বাসা রাজবাড়ীতে ছিল, এবং কুমারের মাতুল বসন্ত বাবু ব্যতীত তিনিই প্রকৃতপক্ষে ঐ বাড়ীর একমাত্র বাসিন্দা ছিলেন। কুমারের মাতুল এখনও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের লাইসেন্সী হিসাবে সেখানে বাস করিতেছেন। কেহ বলে নাই যে তিনি ঐসময়ে ঐখানে বাস করিতেছিলেন। কোন ঘটনা সম্পর্কেও কেহ তাঁহার উল্লেখ করে নাই। যাহা হউক, সাগর বাবু তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং **তাঁহার ভ্রাতা যোগেন্ বাবু বলিলেন যে, কাশিমপুর হইতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। লোকেরা তাঁহাকে 'দ্বিতীয় কুমার'** বলিয়া **সন্দেহ করিতেছে। চল, তাহাকে দেখিয়া আসা যাক্‌।** তাঁহারা দুইজনেই গোল বারান্দায় (রাজবিলাসের দক্ষিণ দিকের বারান্দার পূর্ব্বাংশ) **যান এবং সেখানে সাধুকে উপবিষ্ট দেখিতে পান। তখন বেলা ৮টা।**

"সাধু বসিয়াছিলেন। তাঁহার কোঁকড়ানো পিঙ্গলবর্ণ চুল হাটু পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। তাঁহার দাড়ি ছিল। তাঁহার মুখে ও সর্ব্বশরীরে ভস্ম মাখা ছিল। তাঁহার দিকে মুখ করিয়া আমরা যখন দাঁড়াইয়াছিলাম তখন তিনি আমাদের দিকে তাকাইয়াছিলেন। আমি তাঁহার চোখের রং দেখিতে পাইয়াছিলাম। উহার রং কটা ছিল। আমি তাঁহার শরীরের গঠন, বসিবার ভঙ্গী এবং তাঁহার চাহিবার ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আমার সন্দেহ হইয়াছিল যে, এই 'দ্বিতীয়কুমার'। আমার সন্দেহের কথা আমি যোগেন বাবুকে বলিয়াছিলাম। **তিনি বলেন যে, ব্যাপারটা গুরুতর বলিয়া মনে হয়।** তিনি বলেন—**"সোরগোল করিও না। অপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে আরও দেখা যাক্‌।**

গোল-বারান্দাতে এই কথাবার্ত্তা হয়। সাধু সেখানে বসিয়াছিলেন। তিনি সেখানে থাকিতে থাকিতেই বুদ্ধ ঐখানে আসেন।

আমার সম্মুখে বুদ্ধু বাবুর সহিত আমার ভ্রাতার কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই তাঁহারা একটি ঘরের ভিতরে গিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন।

অতঃপর বুদ্ধু চলিয়া গেলেন—কিন্তু যাওয়ার পূর্ব্বে তিনি (কেশব বাবু) বলিলেন যে, **তাঁহার মাতা সাধুকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহেন**। সাধুকে একথা বলা হইলে তিনি উত্তর দেন, এখন নয়, বৈকাল বেলায় যাইব। ইহার পর সাগরবাবু ও যোগেনবাবু আহার করিতে যান। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা দেখেন যে, সাধু তখনও সেখানে আছেন। আমি যতই তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম, ততই আমার সন্দেহ বাড়িতে লাগিল। **যোগেন্দ্রবাবুও সেখানে ছিলেন। তিনি এবং আমি প্রায় ৫টা কি ৫॥০ পর্য্যন্ত সেখানে ছিলাম**। এই সময় বুদ্ধুবাবু আসিয়া তাঁহার গাড়ীতে করিয়া সাধুকে লইয়া গেলেন।

এই যে বিবরণ, ইহার সহিত লালমোহনের সাক্ষ্যের সামঞ্জস্য আছে। লালমোহন বলেন যে, ঐ দিবস সূর্য্যোদয়ের সময় তিনি সাধুকে রাজবাড়ীর রাজ বিলাসের দিকে যাইতে দেখেন, গোল বারান্দায় আরোহণ করিতে দেখেন, এবং গায়ে ভস্ম মাখিতে দেখেন। লালমোহন আরও বলেন যে, মধ্যাহ্নকালে তিনি সাধুকে মাধববাড়ীতে দেখিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ প্রদোষ-কালেও তিনি সাধুকে দেখিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত সাক্ষীর উক্তির সহিত বর্ণিত কাহিনীর কোন অসামঞ্জস্য নাই। তবে প্রদোষকালে মাধববাড়ীতে সাধুকে দেখার যে কথা, তাহার সহিত বর্ণিত ঘটনার মিল নাই; কারণ সেই সময়ে বুদ্ধু বাবু আসিয়া সাধুকে লইয়া গিয়াছিলেন। একটা স্বীকৃত তথ্যের সহিত সাগরবাবুর সাক্ষ্যেরও মিল হয় না। সেই দিন—অর্থাৎ আগমনের দিন অপরাহ্নে **বাদী সহকারী ম্যানেজার মোহিনীবাবুর বাড়ীতে গমন করেন; ইহা একটা সর্ব্বসম্মত ভিত্তি**। ইহার সহিত যে বর্ণনার মিল নাই, তাহা গ্রহণ করা যায় না।

সীতানাথ বলেন, তিনি সেদিন বাদীকে সহকারী ম্যানেজারের বাড়ীতে দেখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ডায়েরীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, সেদিনের তারিখ ছিল ১৩-৪-২১ ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ৩১শে চৈত্র। সহকারী ম্যানেজার মোহিনীবাবুও বলেন, **বাদী সেদিন বৈকালে আন্দাজ পাঁচটার সময় তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন**। ইহাও সর্ব্বসম্মত একটা ভিত্তি। সাক্ষী সতীশ রায়ের মতে, তথা হইতেই সাধুকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়।

বাদী ও ভগ্নী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর দেখা

একটা বিষয় অতি পরিষ্কার যে, আন্দাজ ৫টার সময় সাধু মাধববাড়ী হইতে কয়েক মিনিটের পথ দূরে সহকারী ম্যানেজারের বাড়ীতে ছিলেন। সহকারী ম্যানেজারের কথায় দেখা যায়, তাহার পর তিনি মাধববাড়ীতে গিয়াছিলেন। রাত্রিকালে তাঁহাকে গোল বারান্দায় এক চা-পার্টিতে আনা হইয়াছিল; তথায় তিনি কয়েকটী কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। **এই সাক্ষী, রায় সাহেব যোগেন্দ্র** এবং **ফণীবাবু** (বিবাদীপক্ষের ২১নং সাক্ষী) এবং **অপর তিনজন সাক্ষীর** কথা আমি বলিয়া ইহারা সকলেই এই চা-পার্টির কথা সমর্থন করিয়াছেন। ১লা বৈশাখ বাঙ্গালা নববর্ষ উপলক্ষে এই চা-পার্টির আয়োজন করা হইয়াছিল। বাদীপক্ষের সাক্ষ্য এই যে, সহকারী ম্যানেজার মোহিনী বাবুর বাড়ী হইতে বৃদ্ধ বাবু কর্ত্তৃক বাদী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে নীত হইয়াছিলেন। **সেখানেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও বাদীর মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়: এই শেষোক্ত ব্যাপারটিই সত্য; কয়েকটী তথ্য দ্বারা** চা-পার্টির কথা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। যাঁহারাই এই চা-পার্টির কথা বলিয়াছেন, তাঁহারাই একটা আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত বিবরণ পরীক্ষা করিলেই সত্য কথাটী স্পষ্ট হইবে :—

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন,—তিনি কোন বিষয় শুনিয়া সাধুকে আনিতে পাঠান। সাধুকে আনিবার জন্য বৃদ্ধ টমটম্ লইয়া বাহির হন; কিন্তু একাকী ফিরিয়া আসেন, সন্ধ্যার সময় সন্ন্যাসী আসেন। ইহা চৈত্র মাসের শেষ দিবসের কথা। তিনি দেখেন যে, তাঁহার বাড়ীর দক্ষিণের বারান্দায় একখানি মাদুরের উপর সাধু বসিয়া আছেন। তাঁহার নিকটেই তাঁহার কন্যা, পিতামহী সত্যভামা দেবী, তাঁহার মৃত ভগিনী ইন্দুময়ী দেবীর তিন পুত্র এবং স্বামী গোবিন্দ বাবু বসিয়াছিলেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, তিন ভগিনীর বাড়ীই চক্করের পাশাপাশি জায়গায় অবস্থিত। পশ্চিমে অবস্থিত বাড়ীটি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর, পূর্ব্বে অবস্থিত বাড়ীটি ইন্দুময়ীর, এবং মধ্যস্থিত বাড়ীটি কনিষ্ঠা ভগিনীর। তিনি এই সময়ে বাড়ী ছিলেন না। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীর দেয়াল কাদা মাটির, চালা ঢেউটিনের এবং একটা উঠান আছে। পরে এই বাড়ীর সম্পূর্ণ বর্ণনার প্রয়োজন হইবে। ইহা দক্ষিণ মুখী বাড়ী এবং রাজবাড়ী হইতে পোয়া মাইল দূরে অবস্থিত।

সাধুর সহিত আলাপ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বাহিরে আসিয়া তাঁহার বাড়ীর দক্ষিণ বারান্দার সন্ন্যাসীকে একটা মাদুরের উপর আসীন দেখিতে পাইলেন,

এবং সমগ্র পরিবারই সন্ন্যাসীর চারিপাশে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী বলেন,—সন্ন্যাসী মস্তক অবনত করিয়া এক পাশে দৃষ্টি দিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত কি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, মেজকুমার যেভাবে লোকের দিকে চাহিতেন, তাহাই আমার মনে হইতে লাগিল। ইহাতে আমার সন্দেহ বর্দ্ধিত হইল, আমি অভিনিবেশ সহকারে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম,—তাঁহাব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ঠোঁট, হাতের আঙ্গুল, হাত পা এবং মুখমণ্ডলের রেখাসমূহ—সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলাম, অন্যান্য যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আমার ন্যায় তাঁহাদের মনেও সন্দেহ জাগিল। তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। অতএব আমরা তাঁহার চক্ষের বর্ণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না। **হিন্দী ভাষায় তাঁহার সহিত কিছু কথাবার্ত্তা হইল।**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুম কই রোজ হিঁয়া রহেঙ্গা ?"

তিনি বলিলেন—'হাম কাল ব্রহ্মপুত্র স্নানমে চলা যায়েঙ্গা নাঙ্গলবন্দ।

আমি তাঁহাকে কিছু ফল এবং দুধের সর খাইতে দিলাম। তিনি কিছু সর খাইলেন; আর কিছুই খাইলেন না। খাওয়ার পর সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

আমি তাঁহার গতিভঙ্গী লক্ষ্য করিলাম;—**দ্বিতীয় কুমারের গতিভঙ্গীর সহিত মিলিয়া গেল।** আমি তাহার দেহের দৈর্ঘ্য লক্ষ্য করিলাম; মনে হইল যেন একটুখানি সবল হইয়াছে এবং কিছুটা বাড়িয়াছে; ১৯ ও ২০ বৈষম্য হইয়াছে। তাঁহার মুখে সেদিন ভস্মমাখা ছিল।

তিনি চলিয়া গেলে, আমরা সন্ন্যাসীর বিষয়ে আলোচনা করিলাম এবং স্থির করিলাম যে, পর দিবস তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইব, এই সুযোগে দিবালোকে আর একবার তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লইব। সেই রাত্রিতেই আমার কর্ম্মচারী যতীন্ ভট্টাচার্য্যকে আমি তাঁহার নিকট পাঠাইলাম এবং পরদিন আমার বাড়ীতে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিলাম। তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে কোন কথা বলিলেন না।

পরদিন ছিল ১লা বৈশাখ। জ্যোতির্ম্ময়ীর পুত্র বুদ্ধু বাবু চ-পানের পর সাধুকে আনিতে গেলেন। কিন্তু তিনি তখন না আসিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে কিম্বা তাহারও একটু পরে আসিলেন।

সকাল বেলায় সাধু কি করিতেছেন, তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। রাজপরিবারের পরামাণিক রামকানাই শীল, দেখিতে পায় যে, সাধু সকাল বেলায় রাজবিলাসের দিকে যাইতেছেন। সেখানে যাইয়া তিনি বারান্দায়

উঠেন, বারান্দা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া ২য় কুমারের ঘরের নিকটে উপস্থিত হন, দরজার খড়খড়ি তুলিয়া ধরিয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। অতঃপর আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পায়খানায় প্রবেশ করেন। এই পায়খানার বর্ণনা পূর্ব্বে দিয়াছি। তারপর বাথরুমে আসিয়া একটা কলের তলায় বসিয়া স্নান করেন। বাহির হইয়া আসিয়া সাধু চিলাই নদীর তীরবর্ত্তী শ্মশানেশ্বরী মন্দিরে গমন করেন। তথা হইতে তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে আসেন। এই দিবস প্রাতে বৃদ্ধা মহিলা **মোক্ষদাও তাহাকে দেখিতে পান**। তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, একজন সাধু আসিয়াছেন, **দেখিতে দ্বিতীয় কুমারের মতন**। এই কথা শুনিয়া তিনি তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। মোক্ষদা কি দেখিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এই :—

বৃদ্ধা মোক্ষদা দেবীর সাধু দর্শন

আমার কন্যা, আমার পুত্রবধু এবং আমি সাধুকে মাধববাড়ী যাইতে দেখি। আমরা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ দেখিতে পাই। তাঁহার চলিবার ভঙ্গী দেখিয়া আমার প্রাণে পুলকের সঞ্চার হয়। আমার **মনে হইল ইহা দ্বিতীয় কুমারের চলিবার ভঙ্গী**। তিনি চলিয়া যাইতে লাগিলেন, এবং আমরা তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি যখন মাধববাড়ীর ঘাটে গিয়া জলে নামিলেন আমি তখন মাধববাড়ীর দক্ষিণ দিকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। কুমার আসিলেন এবং কামিনী ফুল গাছের পাশে একটি মাদুরে বসিলেন। সম্মুখে একটা ধুনী জলিতেছিল। তিনি উহা টানিয়া লইয়া নিজের সম্মুখে রাখিলেন। তাঁহার কাঁধে একখানি তোয়ালে ছিল। তিনি উহা লইয়া মুখ মুছিয়া নীচে নামাইয়া রাখিলেন। আমি তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, দেখিলাম সেই **একই মুখ, একই চোখ, একই চিবুক, একই কটা রঙের গোঁফ, আমার বড়ই সন্দেহ হইল, হয়ত ইনিই দ্বিতীয় কুমার**। সেখানে অনেক লোক থাকায় তখন আমি আর তাঁহার কাছে যাইতে পারিলাম না।"

ইহা একটি আবিষ্কার বলিয়া আমার মনে হয় না। এই স্মৃতিশক্তি শিক্ষার চাপে নত হয় নাই। একথা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তাহার মনে যত সন্দেহই হউক না কেন, সে বাদীকে ঠিক চিনিতে পারে নাই।

বাদী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে

মধ্যাহ্ন প্রায় ১২টার সময় সাধু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে আসিলেন। এই পথে আসিবার শেষ দিন যে তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে

আসিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকৃত হইয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন, সাধু ভাওয়াল এষ্টেটের একখানি গাড়ীতে চড়িয়া সেখানে আসেন। **তাঁহার সঙ্গে রায় সাহেব যোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র রাম ছিল।** অতঃপর জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পুত্রের বৈঠকখানায় একখানি চেয়ারে সন্ন্যাসী বসেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর ভগ্নীপতি গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় একখানি চৌকির পাশে বসেন। **সাক্ষী (জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী), সত্যভামা দেবী** চেয়ারে বসেন, এবং বাকী সকলে দাঁড়াইয়া থাকে।

সাক্ষী বলেন, আমার পিতামহীকে চৌকির উপর উঠিয়া বসিবার জন্য সন্ন্যাসী হিন্দীতে বলেন। তিনি উঠিয়া চৌকির একধারে বসিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, **'ওঠ্‌কে বৈঠ' (উঠে বস)** তিনি উঠিয়া সন্ন্যাসীর মুখামুখি হইয়া বসিলেন, সন্ন্যাসী আমার পিতামহীকে আরও কাছে যাইতে বলিলেন এবং **তাঁহার পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে নিজের সামনে টানিয়া লইলেন। ইহার পর** তিনি বলিলেনঃ—

"**বুড়ীকা বড় দুঃখ হৈ (বৃদ্ধার বড় দুঃখ)** ইহার পর সন্ন্যাসী আমার দুই কন্যাকে দেখাইয়া বলিলেন, **এই তোমারা দোনো বেটি হৈ (ইহারা বুঝি তোমার দুই কন্যা?)** এবং আমার পুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন, **এই বুঝি তোমার পুত্র?** এবং আমার ভগ্নীর ছেলেদিগকে দেখাইয়া বলিলেন, **ইহারা তোমার বোনের ছেলে?** এবং আমার ভগ্নীর কন্যা **কেনিকে** দেখাইয়া বলিলেন **'এ কোন্ হৈ?' (এ কে)** আমি বলিলাম, "সে আমার বড় বোনের মেয়ে" এই কথা বলামাত্রই সন্ন্যাসীর দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। অশ্রুতে তাঁহার গণ্ডদেশ ভাসিয়া গেল। 'কেনি' তখন বিধবা হইয়াছিল।

"বাদীকে কাঁদিতে দেখিয়া ইন্দুময়ীর পুত্র টেব্বু তখন **তাঁহার সম্মুখে দ্বিতীয় কুমারের একখানি ফটো তুলিয়া ধরিল।** বাদীর ক্রন্দন যখন একটু থামিয়াছিল, ঠিক তখনই টেব্বু ফটোখানি তুলিয়া ধরিয়াছিল। **বাদী তাহা দেখিয়া পুনরায় কাঁদিতে লাগিল।** টেব্বু তাঁহাকে ছোট কুমারের একখানি ফটোও দেখাইল, সেখানি দেখিয়া **বাদী আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল** এবং হাত দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল। রাম তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। রামও কিছু বলিয়াছিল। দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বেই কুমারকে সে খুব ভালভাবে চিনিত, **সে বলিল, "ইনি যে দ্বিতীয় কুমার তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাকে যাইতে দিওনা দিদিমা।"** বাদীকে কাঁদিতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—**তুমি তো ত্যাগী হৈ, তুম্**

এত্না রোতে কিসিকা ওয়াস্তে (তুমি একজন ত্যাগী, এত কাঁদিতেছ কেন ?)।

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "হাম্ মায়াসে রোতে হৈ" (আমি মায়ায় কাঁদিতেছি)।

সাক্ষী—কিন্তু তুমি তো একজন সাধু—মায়া কার জন্য ?

সন্ন্যাসী এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। ইহার পর সাক্ষী হিন্দীতে বলিলেন—

"আমি শুনি আমার দ্বিতীয় ভাই, দার্জ্জিলিংয়ে মারা যায়, তাহাকে যখন দাহ করিবার জন্য শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়,—তখন নাকি তুমুল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় সকলে তাহাকে সেখানে ফেলিয়া চলিয়া যায়। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া আমার ভ্রাতার দেহ দেখিতে পায় না। দার্জ্জিলিং যাহারা গিয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহ বলে যে, কুমারের শব দাহ করা হইয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলে, শবদাহ হয় নাই।

আমি আমার বক্তব্য শেষ না করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, না, না, সে মিথ্যা কথা, তাহাকে পোড়ান হয় নাই, সে জীবিত আছে।"

ইহার পর সন্ন্যাসী আমার দিকে তাকাইলেন, আমি দেখিলাম, আমার ভাইয়ের মতই তাঁহার কটাচক্ষু, আমি তখন তাঁহাকে বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার সমস্ত অবয়ব মেজভাইয়ের মত দেখি। তবে তুমি কি সেই ?

তিনি হিন্দীতে উত্তর করিলেন, না-না আমি তোমার কেহ নই।

তিনি বাঙ্গালা বুঝেন কি না ইহা পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি তাঁহাকে বাঙ্গালায় প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি সেদিন আমার ওখানে আহার করিলেন। খাইবার সময় দেখিলাম তাঁহার তর্জ্জনীটা আল্‌গা থাকে এবং জিহ্বাটী কিছু বাহির হয়।

আমি তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার কণ্ঠমণি দেখিলাম ! আমি লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার চুলের রং রক্তাভ এবং কটা চক্ষু। আমি তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখের উপর কাটা দাগ এব মুখাবয়ব—সবই বিশেষ নজর দিয়া দেখিলাম। আমি তাঁহার দাঁত দেখিলাম। সেও ঠিক দ্বিতীয় কুমারের দাঁতের মতই মিশান, মসৃণ ও সুন্দর। আমি তাঁহার হাত এবং প্রতিটি নখ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম। আমি তাঁহার হাতের তালু এবং

পিঠও নজর দিয়া দেখিলাম। আমি তাঁহার পা ও পায়ের পাতা এবং পায়ের আঙ্গুলও পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। আমার বেশ স্মরণে ছিল যে, আমার মেজো ভাইয়ের নখ এবং পায়ের আঙ্গুল কেমন ছিল কি করিয়া ভুলিব,—আমরা যে ছোটবেলা হইতে এক সঙ্গে থাকিয়াছি। তাঁহার সমস্ত দেহ,—হাত, পা, মুখ এমন কি, চোখের পাতাটী পর্য্যন্ত বিভূতিমণ্ডিত ছিল। তাঁহার চুল লম্বা ছিল। তখন তাঁহার মুখে দাড়ি ছিল। দ্বিতীয় কুমার যখন দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন, তখন দাড়ি রাখিতেন না। আলোচ্য দিনে তাঁহার উচ্চারণ অস্পষ্ট ছিল। **তাঁহার কণ্ঠস্বর দ্বিতীয় কুমারের মতই শুনাইতেছিল।**

আর আর যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সেদিন তাহারা সকলেই সাধুর সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন। কি আলাপ করা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই। তাঁহার খাওয়া হইলে, আমরা খাইতে বসি। আমাদের যখন দেখা শেষ হইল, তখন বেলা অপরাহ্ণ ৩টা। অষ্টমী স্নান উপলক্ষে ঢাকা যাইবার জন্য সন্ন্যাসী বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়েন। **সন্ন্যাসী যে আমার সহোদর ভ্রাতা —এ ধারণা ক্রমেই আমার মনে বদ্ধমূল হয়।** ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য আরও কয়েক দিন সন্ন্যাসীকে রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। তাহাকে কয়েক দিন রাখিয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল যে, তাহার গায়ে সেই সাবেক দাগগুলি আছে কি না; আমি তাহাকে বাঙ্গালা ভাষায়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তুমি ঢাকা যাইয়া কতদিন থাকিবে?" সন্ন্যাসী বলিয়াছিল,—"সম্ভবতঃ দশদিন।" তারপর-আমার ছেলের টম্‌টমে চড়িয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করে। চলিয়া যাইবার সময়, আমি আমার ছেলেকে গাড়ী চালাইতে দেখিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া আমার ছেলে আমাকে কি যেন কতগুলি কথা বলিয়াছিল।"

সন্ন্যাসী যে ঐ দিন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে ছিল এবং অপরাহ্ণ ৪টার সময় সন্ন্যাসী ঐ বাড়ী হইতে চলিয়া যায়, **সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই।** এ সম্বন্ধে কয়েকটী দলিল থাকার দরুণ (যথা মিঃ নিডহামের রিপোর্ট ৫৯নং একজিবিট দ্রষ্টব্য), ইহা কোনক্রমেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঐপ্রসঙ্গ আমি অল্প পরেই আলোচনা করিব। বিবাদী পক্ষের সাক্ষ্য আরম্ভ হইবার পর, যে বিষয় তাঁহারা অস্বীকার করিতে থাকেন, তাহা এই যে,— **সন্ন্যাসী ঐ দিনের পূর্ব্বদিন অর্থাৎ ১লা বৈশাখ, (৩১শে চৈত্র নহে), জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে যান।** এতদ্বারা বিবাদীপক্ষ 'ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, সন্ন্যাসী ২রা বৈশাখ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে ছিলেন।

বিবাদীপক্ষের মন্তব্য

৩১শে চৈত্রই হউক অথবা ১লা বৈশাখই হউক, যে দিনই হউক, সাধু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে উপস্থিত হইবার পর, যাঁহারা সাধুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, সেই সকল সাক্ষীকে বাদ দিয়া, মিঃ চৌধুরী অথবা বিবাদিগণ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জেরার সময়, তাঁহার মুখদিয়া মামলার এই অংশ সম্পর্কীয় কথাগুলি বলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যথা :—

প্রশ্ন—বৃদ্ধার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দূর করিবার উদ্দেশ্যে এবং কেনীর চোখের জন্য ঔষধ লইবার অভিপ্রায়ে আপনি ১লা বৈশাখ আপনার চক্করের বাড়ীতে সাধুকে আনাইয়া ছিলেন ?

উত্তর।—না, কখনই না।

প্রশ্ন—যখন সাধু আহারে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি থালার উপর হইতে খাদ্য-সামগ্রী লইয়া বাটীর মধ্যে মাখিয়া খাইয়াছিলেন এবং খাওয়া শেষ হইলে বাটীগুলি থালার উপর হইতে লইয়া মেঝেয় রাখিয়াছিলেন ?

উত্তর—না। পাথরের থালায় করিয়া খাবার দেওয়া হইয়াছিল, থালার উপর বাটী সাজাইয়া দেওয়া হয় নাই।

মিঃ চৌধুরী, তারিখ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই। তিনি সন্ন্যাসীর জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে উপস্থিতির, এবং অবস্থানের দুই তারিখ সম্বন্ধেও কোন প্রশ্ন করেন নাই। তিনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর দ্বারা যাহা স্বীকার করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এই যে—ঐ দুই দিনের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, কেবল তাহাই নহে, তিনি তাঁহার প্রশ্নের মধ্যে তারিখের উল্লেখ করিয়া, যে তারিখের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পুনরায় প্রশ্ন করিয়াছেন যে,—১লা বৈশাখ রাণী সত্যভামা দেবী সাধুকে প্রণাম করিয়া প্রণামী স্বরূপ তিনি (রাণী সত্যভামা) সাধুকে দুইটী টাকা দিয়াছিলেন, এ বিষয় সত্য কিনা ?

ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ১লা বৈশাখ সাধুকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। সাধু সেখানে আহারাদি করেন—একথা অনেকে বলিয়াছেন। তখন রাণী সত্যভামা সেখানে ছিলেন, বিবাদীপক্ষ তাহাও সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইহাও স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, সাধু অল্প সময়ের জন্য পূর্ব্বদিন সেখানে গিয়াছিলেন। বিবাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, সন্ন্যাসীর চেহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এবং পাঞ্জাবী

ভাষায় কথা কহিত বলিয়া, কাহারও মনে তাহাকে মধ্যম কুমার বলিয়া সন্দেহ করিবার অবকাশ হয় নাই, বিবাদীপক্ষ আরও বলেন যে,—হেনার চোখের ব্যারাম এবং, বুদ্ধুর স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব আরোগ্য করার জন্যই সন্ন্যাসীকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে আনা হইয়াছিল।

বিবাদী পক্ষের আরও কথা

বাদী পক্ষের মামলার শুনানী শেষ হইবার পর, বিবাদীপক্ষ বাদীর প্রথম উপস্থিতি সম্পর্কিত বিষয় লইয়া মামলায় প্রথম অবতীর্ণ হন। তাঁহারা বলেন,—৩১শে চৈত্র সন্ধ্যার প্রাক্কালে সাধু আগমন করেন। ১লা বৈশাখ তিনি এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের বাড়ীতে যান, ঐ দিন বাংলা নূতন বৎসর বলিয়া, ঐ দিনই সন্ধ্যায় রাজবাড়ীর গোল বারান্দায় রায় সাহেব (যোগেন্ বাবু) এক প্রীতিসম্মেলনের এবং চা পার্টির আয়োজন করেন। ঐ পার্টিতে চা ও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

বাদী সেই চা-পার্টিতে গিয়াছিলেন এবং সেখানে যাইয়া জলযোগ করেন। সেখানে ফণী বাবু (বিবাদী পক্ষের ৯২নং সাক্ষী) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—তাঁহার বাড়ী কোথায়? উত্তরে সাধু বলেন,—পাঞ্জাবে। সেই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হইয়া সাধু বলেন,—তিনি একজন নাগা সন্ন্যাসী। সেই সময় যতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য আসিয়া বলেন,—হেনার চক্ষু রোগের চিকিৎসা এবং বুদ্ধুর স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রতিকারের জন্য, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সাধুকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। সেই মহিলা কে, ফণী বাবু হিন্দী ভাষায় সাধুকে তাহা বুঝাইয়া বলেন, এবং সেখানে যাইবার জন্য সাধুকে অনুরোধ করেন, সাধু যাইতে সম্মত হন।

বিবাদী পক্ষের পূর্ব্বোক্ত উক্তি সমর্থন করিবার জন্য রায় সাহেব যোগেন্দ্র (বিবাদীর ৩১০ নং সাক্ষী), ফণী বাবু (বিবাদীর ৯২নং সাক্ষী) সহকারী ম্যানেজার মোহিনী বাবু, বীরেন্দ্র (বিবাদীর ২৯০ নং সাক্ষী), অবনী (বিবাদীর ৩২৪ নং সাক্ষী) এবং আশু ডাক্তার (বিবাদীর ৩৬৩ নং সাক্ষী) সাক্ষ্য দিয়াছেন। এই সকল সাক্ষীই বিবাদী পক্ষের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন। রায় সাহেব, যিনি পুনরায় চাকুরীতে বহাল হইবার আশা রাখেন, এবং ফণীবাবু, যখন ইহাদের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিব, তখন তাঁহাদের কথা তাঁহাদের মুখেই ব্যক্ত হইবে—ইহারা দুইজন ব্যতীত আর সকলেই ভাওয়াল এষ্টেটের কর্ম্মচারী।

বিবাদী পক্ষীয় মিথ্যা-সাক্ষ্য

উক্ত চা-পার্টি এবং চা-পান ও জলযোগ সম্বন্ধে **ইহারা সকলেই মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন**। বাদীকে ঐ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় নাই।

অন্য বিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছে। বাদীর প্রথম আগমন সম্বন্ধে যাহারা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহাকেও, এ বিষয় জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকেও বিবাদী সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন নাই। ১লা বৈশাখে সন্ন্যাসীর উপস্থিতির কথা, বিবাদী পক্ষের কৌশুলীই স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সীতানাথ তাঁহার ডাইরী দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ৩১শে চৈত্র সন্ন্যাসী এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই সাক্ষাতের কথা, এষ্টেটের কর্ম্মচারীরূপেই সাক্ষী সীতানাথ, বাদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান কালে বলিয়াছিলেন। তারিখ সম্বন্ধে প্রশ্ন করার কথা, কাহারও মনে উদয়ই হয় নাই।

৫ই মে যখন রায় সাহেব ও মোহিনী বাবু উভয়ে এক সঙ্গে বসিয়া মামলার বিষয় সম্বন্ধে রিপোর্ট লেখেন, যে রিপোর্ট মিঃ নিডহাম স্বাক্ষর করেন—এবং যাহা কালেক্টরের নিকট পাঠান হয়, সেই রিপোর্টের অংশে বাদীর জয়দেবপুরে উপস্থিতির বিষয় উল্লিখিত আছে, সেখানে তাঁহারা একবারও বলেন নাই যে, বাদী বলিয়াছেন—তিনি একজন পাঞ্জাবী। প্রকৃতপক্ষে উক্ত রিপোর্টে এমন কিছু বলা হয় নাই, অথবা এমন কিছু অনুমান করিবারও অবকাশ দেওয়া হয় নাই, যদ্দ্বারা বাদীকে ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার বলিয়া স্বীকার করার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি থাকিতে পারে। (১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য, যেখানে এই রিপোর্টের উল্লেখ আছে)। এই চা-পার্টি, মিঃ তমসারঞ্জনের সহিত কাশিমপুর যাওয়ার কাহিনীর ন্যায়ই সুচিন্তিত মিথ্যাভাষণ। প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক মিথ্যা বলিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত সাক্ষীগণ প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেনে। আমি যতই অগ্রসর হইব, আমি দেখাইবার প্রয়াস পাইব, কেবল এই একটী দৃষ্টান্ত নহে; সকল ক্ষেত্রেই তাঁহারা মিথ্যা কথা বলিবার জন্যই যেন প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী যে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন,—বন্ধ্যাত্ব আরোগ্যের জন্য ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধ হইতে তাঁহাকে কাশিমপুর লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, স্ত্রী-রোগ আরোগ্য করিবার জন্য তিনি এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, আর একজনের বন্ধ্যাত্ব দূর করিবার জন্য এবং জ্যোতির্ম্ময়ীর কন্যার চক্ষুর আরোগ্য করিরার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। অবশ্য জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর লিখিত ১৯১৬ সালের পত্রে (৩২ নং একজিবিট) এ বিষয়ের উল্লেখ আছে—এবং সেই সময়, চিকিৎসা উপলক্ষে যাইয়া, ৪ঠা মে সহসা আপনাকে ভাওয়ালের মধ্যম

কুমার বলিয়া ঘোষণা করিলেন,—এই সিদ্ধান্ত, প্রতিকূল অন্যান্য অবস্থা প্রকটিত না হওয়া পর্য্যন্ত বলবৎ। কিন্তু সওয়াল জবাবে তাহা আদৌ উল্লিখিত হয় নাই। বস্তুতঃ, আমার অনুমান হয়, এ কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া, মিঃ চৌধুরী পছন্দ করিবেন না, যাহা হউক, এক্ষণে ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা সমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই প্রয়োজন।

চন্দ্রনাথ তীর্থে বাদী

বাদী বলেন যে, তিনি জয়দেবপুর হইতে চট্টগ্রাম জেলাস্থ চন্দ্রনাথ তীর্থে গমন করেন। তাঁহাকে বাদীপক্ষের ৬৭৫ নং সাক্ষী অনাথবন্ধু বাড়ুয্যে তথায় দেখিয়াছেন, উক্ত সাক্ষী একজন সম্ভ্রান্ত লোক। তিনি তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য তথায় নিজ ব্যয়ে একটা পুল তৈরী করাইতেছিলেন; উহা দেখিবার জন্য তিনি তথায় গিয়াছিলেন। তিনি সাধুকে সীতাকুণ্ডেও দেখিয়াছেন, অতঃপর সাধু অদৃশ্য হইয়া যান। সাধু চন্দ্রনাথ হইতে পুনরায় ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধে ফিরিয়া আসেন, এবং তথায় বাস করিতে থাকেন। ইহা ২৫শে এপ্রিল বা তাহার কাছাকাছি একটা সময়। ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে, একজন বলিয়াছেন যে, তিনি ঢাকার শৈবলিনী দেবী, (পূর্ব্বোল্লিখিত ফণীবাবুর ভগ্নী), তিনি ঢাকাতে তাঁহার নিজ বাড়ীতে থাকিতেন, তাঁহাকে এই বাড়ীটী তাঁহার মাতামহী স্বর্ণময়ী দিয়াছিলেন। যখন সন্ন্যাসী এখানে আসিয়াছিলেন, তখন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাঁহার বাড়ীতে ছিলেন বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কেন সেই বাড়ীতে ছিলেন, কারণ বলা হয় নাই। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর ঢাকাতে কোন বাড়ী নাই। তিনি জয়দেবপুরেই থাকিতেন। এই সম্পর্কে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন,—সন্ন্যাসী ১৪ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ) জয়দেবপুর ত্যাগ করেন; তিনি তথায় ২০।২২ দিন ছিলেন, অতঃপর জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাঁহার পুত্র বুদ্ধু এবং কর্ম্মচারী জিতেন্‌কে ঢাকাতে পাঠান, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পান না। সুতরাং তিনি নিজেই ঢাকাতে আসেন, এবং তাঁহার ভগ্নীপতি উকীল ব্রজলাল বাবুর বাড়ীতে উঠেন। তাঁহার নিজের কোন বাসা নাই বলিয়া তিনি তথায় উঠিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার ভগ্নী মটরকে (তড়িন্ময়ী দেবী) সন্ন্যাসী দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য; তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তিনি সন্ন্যাসীকে ব্রজবাবুর বাড়ীতে আনিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি সন্ন্যাসীকে শৈবলিনীর বাড়ীতে আনিবার জন্য, তাঁহার পুত্র

বুদ্ধকে বলেন। কালা, বুদ্ধ ও জিতেন্ সন্ন্যাসীকে শৈবলিনীর বাড়ীতে আনে। শৈবলিনী বিবাদী পক্ষে সাক্ষী দিয়াছেন! তিনি সবই স্বীকার করিয়াছেন, তবে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর কর্ম্মচারী জিতেনের নাম তিনি উল্লেখ করেন নাই।

শৈবলিনীর বাড়ীতে বাদী

ইহা সত্য যে, শৈবলিনীর পুত্র কালা এবং বুদ্ধ বাদীকে সন্ধ্যার পর শৈবলিনীর বাড়ীতে আনিয়াছিল। এখানে শৈবলিনীর ও ফণীবাবুর মাসীমা কমলকামিনী, কয়েকটী মেয়ে এবং কুমারের কনিষ্ঠা ভগ্নী মটর, তাঁহাকে দেখিয়াছেন। শৈবলিনী এই সব স্বীকার করিয়াছেন, তবে মটর গিয়াছিল কিনা তৎসম্বন্ধে তাঁহার মনে নাই বলিয়াছেন। আমি মনে করি, তিনি তথায় গিয়াছিলেন।

কেন সন্ন্যাসীকে তথায় নেওয়া হইয়াছে? শৈবলিনী বলিয়াছেন যে, কালার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দূর করিবার জন্য তাঁহাকে নেওয়া হইয়াছে। কালার এক পুত্র ছিল। স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর দুই বৎসর পর (১৮-৪-১৭ তারিখে স্বর্ণময়ীর মৃত্যু হয়) অর্থাৎ ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে কালার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। উক্ত মহিলাকে উহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। তৎপর তিনি জরায়ু রোগের কথা তোলেন, এবং বলেন যে সন্ন্যাসী কিছু করিতে পারেন নাই। এইগুলি সবই মিথ্যাকথা। মটর এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী কেন তথায় গিয়াছিলেন? জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সন্ন্যাসীকে মেজকুমার বলিয়া সন্দেহ করিতেন, ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়। সেই জন্যই তাঁহারা তথায় গিয়াছিলেন। স্বর্ণময়ীর কন্যা এবং ফণিবাবুর মাসীমা কমলকামিনী দেবী বাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তিনি সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, তিনি শৈবলিনীর বাড়ীতে **বাদীকে দেখিয়াছেন, তিনিও সন্ন্যাসীকে মেজকুমার বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন।** সন্ন্যাসী তথায় আধঘণ্টার মত ছিলেন। তাঁহার পরণে সেই পোষাক, লেংটী ছিল, এবং তাঁহার লম্বা জটা ও দাড়ি ছিল।

সাধুকে জয়দেবপুরে কে আনিল

ইহার পর যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। ৩০শে এপ্রিল সন্ন্যাসী জয়দেবপুরে পৌছেন, এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে অবস্থান করেন। কে তাঁহাকে তথায় আনিয়াছে, তাহা লইয়া গণ্ডগোল বাধিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন যে, সন্ন্যাসীকে তাঁহার বাড়ীতে আনিবার জন্য তিনি অতুলবাবুকে পাঠাইয়াছিলেন; অতুলবাবু তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তিনিও ঐ

লোকটীকে মেজকুমার বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন এবং তজ্জন্যই তিনি তাহাকে আনিতে স্বীকার করেন। তৎপর তিনি এবং বুদ্ধু ঢাকা যান এবং সন্ন্যাসীকে লইয়া লোক্যাল ট্রেণে সন্ধ্যা ৭টা বা ৭-৩০ মিনিটে জয়দেবপুর পৌছেন। অতুলবাবু আনিয়াছেন বলিয়া এখন অস্বীকার করেন, তবে আমি মনে করি, যিনি তাঁহাকে একবার কাশিমপুর নিয়াছেন, তিনিই এবারও তাঁহাকে তথায় নিয়াছেন, তবে এইবার সঙ্গে বুদ্ধু ছিল। ইহার কিছুদিন পরে প্রত্যেকের মুখেই তাঁহার নাম শুনা যাইতেছিল। প্রত্যেকেই তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা বলাবলি করিতেছিল। বাদী পক্ষের ৬০২ নং সাক্ষী ভূতনাথ বাবু ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশনের পার্শেল ক্লার্ক ছিলেন। তিনি পূর্ব্ব বাঙ্গালার অধিবাসী নহেন, ৭নং আপ্ ট্রেণে যে সন্ন্যাসী গিয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে আছে। ষ্টেশনে বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। তিনিও জনতার মধ্য দিয়া একবার সন্ন্যাসীকে দেখিয়া লইয়াছিলেন, ইহা বলিয়াছেন। বাদীপক্ষের ২৩৭ং সাক্ষী গোপাল বসাক বলেন যে,তিনি রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহাকে, তাঁহার সঙ্গে বুদ্ধু এবং অপর একজন লোককেও দেখিয়াছিলেন, তবে তিনি সময়টা জুন বা জুলাই বলিয়াছেন। ঐদিনও বাদীর গায়ে ভস্ম ছিল, এবং তিনি সন্ন্যাসীর বেশেই ছিলেন। কিন্তু ৪ঠা মে'র পর আর তাহা দেখা যায় নাই। মিঃ আবদুল মন্নান তাঁহাকে দেখিয়াছেন, এবং বুদ্ধু ও অতুলকে ষ্টেশনে একটা গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়াছেন। বাদী পক্ষের ৮০৬নং সাক্ষী নগেন্দ্র বাদীকে এবং অতুল ও বুদ্ধুকে জয়দেবপুর ষ্টেশনে দেখিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে অতুল বাবুর কর্ম্মচারী দুরন্তকেও দেখিয়াছিল। তাঁহারা সন্ধ্যার পর জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে পৌছিয়াছিলেন, বলিয়া উক্ত সাক্ষী বলিয়াছে। এই সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং মিঃ নীডহামের রিপোর্ট (একজিবিট নং ৫৯) দেখিলে পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, উক্ত দিবস বুদ্ধু, অতুলবাবু এবং তাঁহার কর্ম্মচারী দুরন্ত, বাদীর সঙ্গে ছিলেন। এই উপলক্ষে বাদীর সঙ্গে বুদ্ধু ও অতুলবাবু ছিলেন বলিয়া বাদী বলিয়াছেন; তিনি ইহা সত্যই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ঐ দিন রাত্রিতে তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেন; ইহা ৩০শে এপ্রিলের কথা। তিনি ৪ঠা মে পর্য্যন্ত—যেদিন তিনি তাঁহার আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন—তথায় বাস করেন। **ঐ দিন যে বাদী মেজকুমার বলিয়া তাঁহার আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন, ইহা সর্ব্বসম্মতভাবে স্বীকৃত।**

ইতিমধ্যে এই ঘটনার পূর্ব্বের তিন দিন কি ঘটিতেছিল? ঐ তিন দিন বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই বলিয়া বাদীপক্ষ বলিয়াছেন, এবং তাঁহারা সোজা

আত্মপরিচয় প্রকাশের দিনে আসিয়া পৌছেন। বাদী ঐ তিন দিন কি করিলেন, তাহা তাঁহারা বলেন নাই ; কিন্তু ভগ্নী উহার একটী সম্পূর্ণ কাহিনী দিয়াছেন। তাঁহার কাহিনী কতদূর সত্য, তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

তিনি যেরূপ কাহিনী দিয়াছেন আমি একটু সংক্ষেপে, অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশ বাদ না দিয়া, তাহা উল্লেখ করিতেছি।

বাদীর আত্মপরিচয়ের বিবরণ

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন :—

"তিনি (বাদী) সন্ধ্যা ৭টা কি ৭-৩০ মিনিটের সময় পৌছেন। তিনি বৈঠকখানায় আসিয়া বসেন। ভুলুর কর্ম্মচারী তুরন্ত তথায় ছিল। আমার **কর্ম্মচারী, ভুলু (অতুলবাবু), জিতেনবাবু ও অপর কয়েকজন ভদ্রলোক** যাঁহারা প্রত্যহ তাস খেলিতে আমার ছেলের কাছে আসিতেন এবং ঐরূপ **আরও কয়েকজন লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন।**

"আমি অপর ঘরে ছিলাম এবং দরজার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিলাম। আমি সন্ন্যাসীকে কাঁদিতে দেখিয়াছি। আমি জিতেন ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করি যে, সন্ন্যাসী কাঁদিতেছে কেন? সে বলে যে, সে (জিতেন) ঢাকা হইতে কর্ত্তাদের যে **ফটো বাঁধাইয়া আনিয়াছে, সন্ন্যাসী তাহার দিকে তাকাইয়া কাঁদিতেছে।** কর্ত্তা অর্থে ভাইদের কথা বলা হইয়াছে। ঐ রাত্রিতে সন্ন্যাসীর সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই।

"পরদিন অতি প্রত্যূষে সাধু চিলাই নদীতে স্নান করিতে যান এবং ভস্ম মাখিয়া ফিরিয়া আসেন। ঐদিন হেনী ও কেনীর মামলা সম্পর্কে ঢাকা হইতে কয়েক জন উকীল আসিয়াছিলেন! ঐসব উকীল এবং সেক্রেটারী রায় সাহেব যোগেন্দ্র (জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর) বাড়ীতে আহার করেন। বাদী নিরামিষ খান এবং যে বারান্দায় বসিয়া তাঁহারা আহার করিতেছিলেন, সেই বারান্দার সংলগ্ন ঘরে বাদী বসেন। **উকীলগণ চলিয়া গেলে বাদী যে ঘরে বসিয়াছিলেন, রায়সাহেব যোগেন্দ্র সেই ঘরে আসেন।** বাদী তখন হিন্দীতে বলেন, **"আমার বৈঠকখানা ঘর পরিষ্কার করিয়া দেও।"** এই কথার পর সকলের মনেই আরও সন্দেহ হয়, তিনি কেন এই কথা বলিলেন?

"আমি সাধুকে গায়ে ভস্ম মাখিতে নিষেধ করি। তাঁহার গায়ের রং ঠিক দেখিতে না পাওয়ায় ঐকথা বলি, তিনি হিন্দীতে বলেন, 'কেন?' পরদিনও তিনি গায়ে ভস্ম মাখিয়া আসেন। তখন আমি বলি, আমি আপনাকে ভস্ম

মাখিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও আপনি তাহা করিয়াছেন ; আগামীকল্য আপনি আর গায়ে ভস্ম মাখিবেন না।

"পরদিন (৩রা মে) যখন তিনি (বাদী) স্নান করিতে যান, তখন পুরাণ খানসামা আনন্দ ও নগেন ভট্টাচায্য (বাদীপক্ষের ৮০৬নং সাক্ষী) তাঁহার সঙ্গে যান। ঐ দিন তিনি ভস্ম মাখেন নাই। তখন আমি তাঁহার গায়ের রং লক্ষ্য করি। **পূর্ব্বে মেজকুমারের গায়ের রং যেরূপ ছিল, বাদীর গায়ের রংও সেইরূপই লক্ষ্য করি, বরং ব্রহ্মচর্য্য পালন করায় তাঁহার রং আরও ফরসা হইয়াছে।** তারপর ভস্মমুক্ত মুখের দিকে চাহিয়া **তাঁহাকে রমেন্দ্রের মত মনে হইল**। তাঁহার গায়ের রংএর অপেক্ষা চোখের পাতা কালো, ইহাও আমি লক্ষ্য করিলাম। **গাড়ীর চাকা চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার পায়ে যে দাগ হইয়াছিল, আমি তাহাও দেখিলাম** ; আমি তাহার **কব্জির চামড়া খসখসে দেখিলাম। আমার ঠাকুর মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন—যেমন আমি তাঁহাকে চিনিয়াছি।**

সাক্ষী অতঃপর বলেন, যে সব প্রাচীনা স্ত্রীলোক কুমারকে চিনিতেন, তাহারা, বহু প্রতিবেশী, এবং নিকটবর্ত্তী প্রজাবৃন্দ অনেকেই ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন। **তাঁহারা সকলেই বলেন "সাধুই কুমার"**। যে সব প্রজা উপস্থিত ছিল, তাহাদের সংখ্যা ১০০ কি ১৫০ হইবে।

৩রা মে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী মেজকুমারের শরীরে যে সব চিহ্ন ছিল, সেই সব চিহ্ন সাধুর শরীরে পাওয়া যায় কিনা, তাহা দেখিবার জন্য তিনি তাহার পুত্রকে বলেন। কিন্তু সাধু তাহাতে রাজী হন না।

পরদিন ৪ঠা মে বুদ্ধ সন্ন্যাসীর শরীরের চিহ্ন দেখিতে চেষ্টা করেন এবং ঐদিন তিনি কোন আপত্তি করেন না। তিনি তাহার পুত্র ও জব্বুকে যে সব চিহ্ন দেখার কথা বলেন, সেই সব চিহ্ন বাহির করেন। **প্রাতঃকাল ৭টার সময় এই সব কাজ হয়** এবং তখন বাহিরের লোক কেহ উপস্থিত ছিল না। সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তিনি যদি সন্ন্যাসীকে চিনিয়াই থাকিবেন, তাহা হইলে তিনি আর চিহ্ন দেখিলেন কেন ? তদুত্তরে তিনি বলেন যে, **"আমি নিঃসন্দেহ হইবার জন্য ঐ সব চিহ্ন দেখিতে বলি।"**

ঐ দিনই প্রাতঃকাল ৯টার সময় লোকজন আসিতে থাকে। বাদীর সন্ধ্যা সমাপনান্তে যখন আঙ্গিনায় লোকজন আসিয়াছে, তখন আমি বাদীর সহিত আলাপ করি। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি—**"আপনার গায়ের**

চিহ্নসমূহ ও চেহারা আমার মেজ ভাইয়ের মত, আপনি নিশ্চয়ই রমেন্দ্রনারায়ণ হইবেন। আপনি আপনার পরিচয় প্রকাশ করুন।

তিনি বলেন,—"না, আমি রমেন্দ্রনারায়ণ নহি। কেন আমাকে বিরক্ত করেন। আমি চলিয়া যাইব। ইহাতে আমি বলি,—"আপনি কে, ইহা আপনাকে বলিতেই হইবে। আপনার অস্বীকার করিলে চলিবে না।"

আমি আমার পুত্রকে বলি,—"উপস্থিত লোকদিগকে বল যে, মেজকুমারের শরীরের সমস্ত চিহ্নই এই সাধুর শরীরে রহিয়াছে। আমার পুত্র ও আমার বোন-পো এ কথা সকলকে বলে। আমি চিকের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিলাম।

এদিন আমার ভাই—এই বাদী, প্রজাদের মধ্যে যাইয়া বসে এবং তাহারা, তিনি কে, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। আমিও তাহাকে বলি, তিনি কে, ইহা প্রকাশ না করিলে আমি আহার করিব না।" সাধু বলেন যে, তিনি রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। তখন অপরাহ্ণ ৪টা কি ৫টা হইবে। জনতার নিকট তাঁহার (সাক্ষীর) ঘরের সম্মুখের চটানে বসিয়া বাদী কি ভাবে তাহার আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন, সাক্ষী তাহা বর্ণনা করেন।

অন্যান্য বহু স্ত্রীলোকের সঙ্গে তিনি বারান্দায় বসিয়াছিলেন। বাদী বাহিরে উন্মুক্ত স্থানে বসিয়াছিলেন। কেহ বাদীকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনার নাম কি?" তিনি বলেন—রমেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী। পিতার নাম কি?—রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী। মাতার নাম কি? রাণী বিলাসমণি।

জনতার ভিতর হইতে কেহ তাঁহাকে ঐসব প্রশ্ন করিয়া থাকিবে এবং বাদী তাহার উত্তর দেন, অতঃপর কেহ বলে—"রাজা ও রাণীর নাম সকলেই জানে—আপনাকে লালনপালন করিয়াছিল কে? বাদী উত্তরে বলেন—"অলকা"।

তখন জনতা "মধ্যম কুমারের জয়" বলিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠে এবং স্ত্রীলোকগণ "হুলুধ্বনি" করেন। বাদী একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন এবং তাহার 'ফিট' হইবার মত হয়। আমি দৌড়াইয়া তাহার নিকট যাই। ঐ সময় অনুমান ২ হাজার কি ৩ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। আমি যখন বাদীর নিকট যাই, তখন মগ্নমালা আমার সঙ্গে ছিল।

আমি বাদীকে পাখা দিয়া বাতাস করি এবং মাথায় গোলাপজল দেই। আমি প্রায় ১০ মিনিটকাল ঐরূপ করি। আমি একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলাম। বাদীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে, তাহাকে মটরের বাড়ী (কনিষ্ঠা ভগ্নী) লইয়া যাওয়া হয়। জনতাও আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলা হয়।

মেজকুমারের ভগ্নী বাদীর আত্মপরিচয় সম্পর্কে এই বর্ণনা করেন। তিনি আরো বলেন যে, **রায়সাহেব (যোগেন্ বাবু) আত্মপরিচয় প্রকাশের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং যতদিন সাধু তথায় ছিলেন, ততদিনই তিনি একবার করিয়া তথায় যাইতেন।** তিনি ইহাও বলেন যে, কুমারের মামা বসন্ত বাবুও এই সময় উপস্থিত ছিলেন। ইহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কোন পক্ষই এই লোকটাকে হাজির করেন নাই এবং অন্য কোন ঘটনা সম্পর্কেও তাঁহার নামের কোন উল্লেখ করেন নাই, যদিও তিনি বাদীর আয়ত্তেই ছিলেন। এক্ষণে এই কাহিনী বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। শুধু ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য নহে, ইহার ভিতরের তাৎপর্য্য বাহির করিবার জন্যও বটে কোন ব্যক্তি তাহার ভাইকে চিনিতে পারিলে, সে আর তাহার ভাইয়ের চিহ্ন খুঁজিতে যায় না। পক্ষান্তরে ঐ দিনের ভাবাবেগের কথা, ভস্ম, দাড়ি, জটার কথা এবং পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। ঐ মহিলাটি সেদিন যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, সেই অবস্থার কথা বিবেচনা করিতে হইবে। সর্ব্বশেষে ঐসব ব্যাপার কতদূর অতর্কিত তাহাও দেখিতে হইবে।

ঐ দিনের যে কাহিনী দেওয়া হইয়াছে, তাহা মোটামুটিভাবে অনন্তকুমারী দেবী (কমিশন সাক্ষী), মোক্ষদা সুন্দরী (কমিশন সাক্ষী), বাদীপক্ষের ৮০৬ নং সাক্ষী নগেন্দ্র, লালমোহন গোস্বামী অবিনাশ, সাগর ও বিল্লুবাবুর উক্তির দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। তাহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, 'আত্মপরিচয়' প্রকাশের সময় জনতা হইয়াছিল, **প্রজারা উপস্থিত ছিল, তাহারা নজর দিয়াছিল** এবং বাদী 'আত্মপরিচয়' প্রকাশ করিবার পর হইতে বাঙ্গালায় (যদিও হিন্দীটান ছিল) কথা বলিতে আরম্ভ করেন। বহু সাক্ষী তাহার (বাদীর) কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছে যে, তাহার কথা আট্‌কা আট্‌কা, ভার ভার, আড় আড়—মুখে পাথরের টুকরা রাখিলে যেমন হয়, সেই ভাবে কথা বলিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি বিশেষের সাক্ষ্যের সত্যাসত্যের উপর ঐ দিনের ঘটনা নির্ভর করিতেছে না।

ইহা সত্য যে, দুইজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও নগেন্দ্র ভিন্ন অন্যান্য সকল সাক্ষীই

বাদীর স্বার্থ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন নহেন; কিন্তু অপর পক্ষের মামলা কি এবং তাঁহার কিরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা এখন দেখা যাক্।

বিবাদী পক্ষের মন্তব্য কি?

বিবাদী পক্ষের মন্তব্য এই যে, ঐ দিনও বাদী ঔষধপত্র দিতেই গিয়াছিলেন, এবং ঐ বাড়ীতে সন্ন্যাসীর ন্যায় ধুনী জ্বালাইয়া তিন দিন অবস্থান করিবার পর ৪ঠা মে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি মেজকুমার। বিবাদী পক্ষ ইহাও বলেন যে, তাঁহাকে দেখিতে সম্পূর্ণ অন্যরকম, একটা বাঙ্গালা কথাও বলিতে পারেন না, কিংবা বাঙ্গালা কথা বুঝিতে পারেন না।

ফণী বাবু ভিন্ন, তাঁহারা এই সম্পর্কে আরও দুই জন সাক্ষী হাজির করিয়াছেন। ৪ঠা মের পূর্ব্বের ঘটনা সম্পর্কে যাহারা সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহাদের একজনের নাম তসরদ্দি, সে বলে যে, সে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে আড়াই বৎসরকাল চাকুরী করে। সে ১৫ই তারিখের সভার ৩।৪ দিন পূর্ব্বে ঐ বাড়ী হইতে চলিয়া যায়, সে ঐ বাড়ীতে ঘুমাইত না। সে ভোরে আসিত এবং রাত্রি ১০টায় সময় চলিয়া যাইত। সে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীর বর্ণনা করিতে যাইয়া উহাকে মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাদওয়ালা একটী বাংলো বলিয়া বর্ণনা করে। সে বলে, ঐ বাড়ীতে ৭টী ঘর, একটি হল ঘর এবং তাহার উত্তর দিকে বারান্দা, দক্ষিণ দিকে বারান্দা এবং প্রত্যেক বারান্দার উভয় পার্শ্বে একটি করিয়া ঘর। বাড়ীটী দক্ষিণমুখী এবং তাহার সাম্নে বারান্দা আছে। পূর্ব্ব দিকের ঘরে সাগরবাবু স্ত্রীসহ ঘুমাইতেন। পশ্চিমদিকের ঘরে বুদ্ধু বাবু থাকিতেন। হলঘরে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও ছেলেমেয়েরা ঘুমাইতেন।

এখন এই সাক্ষীটি (তসরুদ্দিন) বলিয়াছে যে, ঐ তিন দিন বাদী বাড়ীর সম্মুখের চটানে (সাক্ষ্যদানকালে ২ অথবা ৩ দিন বলে এবং জেরার সময় ৩ দিনের কথা একেবারে বাদ দেয়) ভস্ম মাখিয়া ধুনী জ্বালাইয়া এবং লেংটি পরিয়া বসিয়া থাকিত। মাটিতে চিমটা পোতা ছিল এবং কমণ্ডলুও ছিল। এই তিন দিন সাধু রাস্তা দিয়া শ্মশানে যাইতেন অর্থাৎ নদীর দিকে যাইতেন, এবং সাক্ষীর সহিত ভোরে তাহার দেখা হইত। কারণ ভোরে সে বুদ্ধু বাবুর বাড়ীতে কাজে আসিত। এই তিন দিন বাইরের লোক কেহ তথায় আসে নাই। চতুর্থ দিবসে পরিবারের লোক তাহাকে মামা বলিয়া ডাকে এবং সন্ন্যাসী লেংটী ছাড়িয়া দেয়। তারপর হইতে সাধু সাগরবাবুর শয়নকক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর কন্যা মণির ঘরে শয়ন করিতেন।

সাক্ষী বলিয়াছে যে, এই 'মামা' ডাকা এবং 'মেজকুমার' বলিয়া ডাকা প্রাতঃকালে আরম্ভ হয়। বাহিরে লোক কেহ ছিল না, অপরাহ্ণে ১৫।২০ জন লোক মাত্র আসিয়াছিল। ইহার পর লোকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সাক্ষীর এই কাহিনীর সহিত ইহার আলঙ্কারিক অংশ বাদ দিলে, অপর পক্ষের কথা মিলিয়া যায়। বাদী ঐ বাড়ীতে তিন দিন ছিলেন, প্রত্যহ চিলাই নদীতে স্নান করিতে যাইতেন এবং চতুর্থ দিন তিনি (বাদী) তাঁহার আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন। ইহার পর তিনি লেংটী ত্যাগ করিয়া ধুতি পরেন। (তরুণের মত)। এবং তাহাকে মামা বলিয়া ডাকা হয়। সত্যভামা দেবী ঐ বাড়ীতে তখন ছিলেন। সাক্ষী তাহা অস্বীকার করেন না, এবং তিনি যে মাঝে মাঝে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে বাস করিতেন, তাহা কেহই অস্বীকার করেন নাই।

ঔষধ দেওয়া সাধু

"ঔষধ দেওয়া সাধু"—এই মতবাদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একজন সাক্ষী আসিয়া বলে, সে একদিন ঐ সময় লেংটী পরা একজন সাধুকে চটানে বসিয়া থাকিতে দেখে. এবং তাহার নিকট বাতের ঔষধ চাহে, কিন্তু সাধু বাঙ্গালা বুঝিতে না পারায় বৃদ্ধ হিন্দিতে তাহাকে ঐ কথা বলিলে, তিনি তাহাকে একটী ঔষধ দেন (বিবাদী পক্ষের ১০৮ নং সাক্ষী) ইহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পূর্ব্বোক্ত ফণীবাবু বলেন, তিনি ঐ তিন দিনের কোন একদিন সাধুকে চটানে একটী আমগাছের নীচে বসিয়া থাকিতে দেখেন। সাধু নানা লোককে ঔষধ দিতেছিলেন। তাহাকে দুই একবার হিন্দীতে কথা বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে. ঐ সময় বাদী 'মেজকুমার', এই সন্দেহ কাহারো মনেই জাগে নাই এবং লোকজন কেহ তাহাকে দেখিতে আসে নাই।

আমি শুধু শুনিয়াছিলাম যে, সন্ন্যাসী পুনরায় জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে গিয়াছেন; তিনি যে পুনরায় তথায় গিয়াছেন, তাহাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। আমি মনে করিলাম, তিনি কাহারও পীড়ার চিকিৎসা করিতে গিয়াছেন, সন্ন্যাসীর পুনরাগমনকে আমি এমন কোনও সংবাদ বলিয়া মনে করি নাই, যাহা লোকের কাছে বলা আবশ্যক।" এই দুইজন সাক্ষী আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মাত্র ৪ঠা তারিখ অপরাহ্ণে শুনিতে পান, সাধু নিজেকে ভাওয়ালের মধ্যমকুমার বলিতেছেন। এই মর্ম্মে আরও সাক্ষ্য দেওয়ান হইয়াছে যে, এই সংবাদে এমন কোনও চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয় নাই,—যাহা উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিবাদী পক্ষ বলিতেছেন, বাকল্যাণ্ড বাঁধের এই সন্ন্যাসীকে ঔষধদাতাস্বরূপ কাশিমপুরে শৈবলিনী দেবীর বাড়ীতে, জয়দেবপুর প্রভৃতি নানা জায়গায় লইয়া যাওয়া হইতেছিল, কেহই তাঁহাকে কুমার বলিয়া সন্দেহ করে নাই। তারপর তিনি দ্বিতীয়বার কাহাকেও চিকিৎসা করিবার জন্য জয়দেবপুরে গিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে, তাঁহার বাড়ীর উঠানে বাস করিতে থাকেন। ঔষধ লইবার জন্য আসিয়া নানালোকে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল; তাহার পর জয়দেবপুর গমনের চতুর্থ দিন,—৪ঠা মে তারিখে এই পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী,—যে ব্যক্তি দুর্ব্বোধ্যভাষায় কথা বলে, যাহার আকৃতি মেজকুমার অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সে অকস্মাৎ ঘোষণা করিয়া বসিল, অথবা ঘোষণা করিতে তাহাকে বলা হইল, কিংবা সে ঘোষণা করিয়াছে বলিয়া প্রচার করা হইল যে, সে মেজকুমার। অথচ তখন সে জানিত না, কুমার লম্বা ছিলেন, কি খাটো ছিলেন, ফরসা ছিলেন কি ময়লা ছিলেন, বৃদ্ধ ছিলেন কি যুবক ছিলেন, বিবাহিত ছিলেন কি অকৃতদার ছিলেন। সে নিজেই যদি নিজকে মেজকুমার বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে, তবে সে নিজে যদি ঐ ঘোষণা না করিয়া থাকে, তবে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রভৃতি মেজরাণীর বৈধব্য সত্ত্বেও, এই ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও, সে বাঙ্গালা ভাষা আদৌ না জানিলেও কুমারের সহিত তাহার আকৃতিগত সম্পূর্ণ বৈষম্য সত্ত্বেও এবং কোন ভূমিকায় অভিনয় করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলেও তাহাকে মেজকুমার রূপে দাঁড় করাইলেন, তাহার পর সকলকে দেখাইবার জন্যই হয়ত তাহাকে জয়দেবপুরের মধ্যস্থলে প্রকাশ্যে আনা হইল, কালেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহাকে ঢাকায় পাঠান হইল, এবং সর্ব্বশেষে তাঁহারা কোর্ট অব ওয়ার্ডের বিরুদ্ধে, এবং বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা আয়বিশিষ্ট একটী বিরাট জমিদারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু এইরূপ ব্যাপার সম্ভব কিনা, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, এবং বাদী ও কুমারের মধ্যে আকৃতিগত কোনও সাদৃশ্য নাই বলিয়া বিবাদীপক্ষ বলিলেও কোর্টের বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, অন্ততঃপক্ষে কিয়ৎ পরিমাণ সাদৃশ্য এবং স্ত্রী-সুলভ ভাবপ্রবণতা মিলিয়া এই চাতুরী খেলিয়াছে কিনা, এবং মেজকুমারকে ফিরিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা হইতেই বাদীকে মেজকুমার স্বরূপ দাঁড় করাইবার কল্পনা জাগিয়াছিল কিনা, একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ঘটনা যদি অসম্ভব হইয়া থাকে, তবে বাদীর পরিচয় প্রমাণ হয় না। যাহাহউক বাদীর দ্বিতীয়বার জয়দেবপুর গমন ও মেজকুমার বলিয়া আত্মপরিচয় দান সম্পর্কে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা,

এবং ঐ সম্পর্কে বিবাদী পক্ষের সাক্ষীরা যাহা বলিয়াছেন তাহা বিবেচনা করুন। তৎপর ৫ই মে তারিখে কালেক্টরের নিকট যে নিম্নোক্ত বিবরণ পাঠান হইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন :—

নীডহাম সাহেবের চিঠি

জয়দেবপুর,

৫ই মে,

(গোপনীয়)

প্রিয় লিণ্ডসে,—

এখানে এক অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিতেছে এবং এই ব্যাপারে এষ্টেটের সর্ব্বত্র ও এষ্টেটের বাহিরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে।

প্রায় পাঁচ মাস পূর্ব্বে এক গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী ঢাকায় আসেন। প্রকাশ, তিনি হরিদ্বার হইতে আসেন, ঢাকায় আসিয়া তিনি রূপবাবুর বাড়ীর সম্মুখে নদীতীরে অবস্থান করিতে থাকেন। কাশিমপুরের জমিদার বাবু অতুল-প্রসাদ রায় চৌধুরী তাঁহাকে তথা হইতে কাশিমপুর লইয়া যান। অন্যান্য সন্ন্যাসীরা যেমন জয়দেবপুরে আসিয়া মাধববাড়ীতে থাকেন, এই সন্ন্যাসীও তেমনি এখানে আসিয়া মাধববাড়ীতে থাকেন। তিনি মাধববাড়ীতে থাকিতে তাঁহাকে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে নেওয়া হয়। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সন্ন্যাসীর আকৃতিতে তাঁহার পরলোকগত দ্বিতীয় ভ্রাতার (কুমার রমেন্দ্র-নারায়ণ রায়ের) চেহারার সাদৃশ্য দেখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন, এবং সাধুও কাঁদিয়া ফেলেন। ইহাতে বাড়ীর লোকেদের মনে সন্দেহ হয়। সন্ন্যাসীকে মেজকুমারের একখানা ফটো দেখান হইলে, তিনি অবিরত অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন। পূর্ব্বে যে সন্দেহ হইয়াছিল, ইহাতে সেই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়, অতঃপর বাড়ীর লোকেরা সাধুকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন; কিন্তু তিনি কোনও উত্তর না দিয়া অকস্মাৎ ঢাকা চলিয়া যান। তারপর কয়েক দিন সাধুর কোনও সংবাদ জানা যায় নাই।

দিন সাতেক পরে কাশিমপুরের জমিদার বাবু অতুলপ্রসাদ রায় চৌধুরী পুনরায় সাধুকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে লইয়া আসেন। তদবধি সাধু তথায় বাস করিতেছেন। সাধু আসিবার পর হইতে শত শত লোক তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে যাইতেছে; তাহাদের সকলেরই মনে সন্দেহ হইয়াছে যে, এই **সাধুই মেজকুমার**। এষ্টেটের নানা অঞ্চল হইতে বহু প্রজা এবং এষ্টেটের বাহির হইতে বহু লোক তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিতেছে; তাহারা

বলিতেছে, তিনিই মেজকুমার। তাঁহার উপস্থিতিতে এই অঞ্চলে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে।

গতকল্য সন্ধ্যাকালে কয়েক শত প্রজা সাধুকে তাঁহার পরিচয় দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি বলেন, তাঁহার নাম রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, তাঁহার পিতার নাম রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং তাঁহার ধাত্রীর নাম অলকা ধাই। ইহা বলিয়াই সাধু অচৈতন্য হইয়া পড়েন, উপস্থিত লোকেরা হুলুধ্বনি ও জয়ধ্বনি করিয়া উঠে। তখন সেখানে যত লোক উপস্থিত ছিল, তাহাদের সকলের মনেই নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, তিনিই মেজকুমার; যে সকল প্রজা উপস্থিত ছিল, তাহারা বলিতে থাকে যে, এষ্টেট যদিও তাঁহাকে কুমার বলিয়া গ্রহণ না করে, তথাপি তাহারা তাঁহাকে কুমার বলিয়া গ্রহণ করিবে ও তাঁহার সহিত কুমারের ন্যায় ব্যবহার করিবে। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পরলোকগতা ইন্দুময়ী দেবীর এবং শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীর লোকেরা মোহিনী বাবুকে ও মিঃ ব্যানার্জ্জীকে বলে, সাধু এই এই বলিয়াছেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে গিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করেন সাধু তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই। আজ প্রাতঃকালেও তাঁহারা তথায় গিয়াছিলেন, কিন্তু সাধু তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি অপরাহ্নে তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। বাড়ীর লোকেরা সাধুকে ভয় দেখাইয়া বলেন, তিনি বাক্যে ও আচরণে মেজকুমার বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ পরিচয় ও অতীত ইতিহাস বর্ণনা না করিয়া ঐস্থান পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এমন অবস্থায় এই সাধু সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তদন্ত হওয়া আবশ্যক। প্রাতঃকাল হইতে বিশাল জনতা সাধুকে দেখিতে আসিতেছে; এরূপ তীব্র চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে যে, অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে গুরুতর পরিণতি ঘটিতে পারে।

এই বিষয়ে আপনার নির্দ্দেশের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি

এফ্, ডবলিউ, নীডহাম।

শ্রীযুক্তা বিভাবতী দেবীর নিকট কপি পাঠান হইল।

এফ্, ডবলিউ, নীডহাম, ম্যানেজার।

এই সংবাদ মেজরাণী এবং অপর দুই রাণীকেও জানান হয়, বড় রাণী এই পত্রের যে কপি দাখিল করিয়াছেন, তাহা বাদী প্রমাণ করিয়াছেন। বিবাদীপক্ষ প্রথমে এই পত্র দাখিল করেন নাই, কিন্তু এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার যখন স্বীকার করিলেন যে, মেজরাণীর নিকটও এই পত্রের কপি পাঠান

হইয়াছে, তখন সত্যেন্‌বাবুর জবানবন্দীর পর বিবাদীপক্ষও উহা আদালতে দাখিল করেন। ভগিনী প্রথমে কি সংবাদ চাহিয়াছিলেন, সত্যেন্‌বাবু প্রথমতঃ তাহা জানেন না বলিয়া ভাণ্ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি স্বীকার করেন ; উহা টাইপ্ করা ছিল, স্বীকার করা হইয়াছে যে, উহা ঐরূপই ছিল।

রায় সাহেবের আরও কথা

বিবাদী পক্ষ বলেন, এই রিপোর্ট রায়সাহেব ও এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা যে ব্যক্তিগত ভাবে জানিয়া রিপোর্ট রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বাদে যাহা শুনিয়া ছিলেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই রিপোর্ট রচনা করিয়াছিলেন। এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার কুমারদিগকে চিনিতেন না, কিন্তু একমাত্র ভগিনী ও অন্যান্য আত্মীয় ছাড়া অপরাপর লোকে কুমারকে যেরূপ চিনে, রায় সাহেবও ঠিক তদ্রূপ চিনেন। সেক্রেটারী হিসাবে তিনি সর্ব্বদা রাজবাড়াতে থাকিতেন, ছোট কুমারের মৃত্যুর পর তিনি অফিসের সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট হন, সাধুর বিরুদ্ধে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহা তিনিই অবলম্বন করিয়াছিলেন (ইহা পরে দেখা যাইবে) এবং তিনিই এই মামলায় প্রধান তদ্বিরকারক। বিবাদীপক্ষ মোহিনীবাবুকে ঐ পত্র দেখাইলে তিনি দেখাইয়া দেন, উহার কোন অংশের বিবরণ তিনি নিজে জানিতেন, কোন অংশের বর্ণনা তাঁহার অনুমান ; কোন অংশের বর্ণনা তিনি অন্যের নিকট শুনিয়াছিলেন, এবং কোন অংশ তাঁহার মতামত মাত্র। এষ্টেটের কার্য্যব্যপদেশে ম্যানেজার এই রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং এই পত্রখানা প্রায় একখানা স্বীকৃতিপত্র। বিবাদীপক্ষ দলিল, পত্রে যাহা দেখান হইয়াছে, তাহা বুদ্ধু ও জব্বুর উক্তি মাত্র এবং এই উক্তি মিথ্যা। জব্বু ও বুদ্ধু উভয়েই মারা গিয়াছে। মোহিনীবাবু ও রায় সাহেব বলিতেছেন যে, ৪ঠা মে সন্ধ্যাকালে তাঁহারা যখন টেনিস কোর্টের নিকটে রাজবাড়ীতে ছিলেন, তখন বুদ্ধু ও জব্বু তাঁহাদের নিকট গিয়া তাঁহাদিগকে ঐ কথা বলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে যান, সাধু প্রথমবার জয়দেবপুরে গেলে কি বলিয়াছিল, পথে তাঁহাদিগকে তাহা বলা হয় ; সেই সম্পর্কে তাঁহারা কিছুই জানিতেন না,—শুধু জানিতেন যে, সেইবার সাধু মাধববাড়ীতে ছিলেন। তাঁহারা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে গেলে তাঁহাদিগকে বলা হয়, সাধু এই সকল কথা বলিয়াছেন। ঐ তারিখের পূর্ব্ব হইতেই যে শত শত লোক সাধুকে দেখিতে যাইতেছিলেন, তাহা তাঁহারা জানিতেন না, কিন্তু এই

তারিখ হইতে অর্থাৎ যে তারিখে ঐ পত্র লেখা হইয়াছিল সেই তারিখ হইতে যে বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছিল, তাহা মোহিনীবাবু নিজে জানিতেন; পত্রে বর্ণিত চাঞ্চল্য ও বিপদ সম্পর্কে বক্তব্য এই যে উহা মতামতের কথা, অর্থাৎ উহা কিছুই নহে।

সাধু কর্ত্তৃক ঔষধ দেওয়ার কথা লইয়া মোহিনীবাবু মাথা ঘামাইতেছিলেন। পূর্ব্বে কেহই তাঁহাকে কুমার বলিয়া সন্দেহ করে নাই, এবং তিনি যখন কুমার বলিয়া পরিচয় দেন, তখনও শুধু মৃদু চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, জেরায় তিনি বলিয়াছেন যে, ৫ই তারিখ হইতে ১০।১৫ জন করিয়া লোক সাধুকে দেখিতে যাইতেছিল। উহার পূর্ব্বে শত শত লোক সাধুকে দেখিতে যাইতেছিল কি না, তাহা তিনি জানেন না,—বুদ্ধু ও জব্ব্ প্রভৃতি তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন। জয়দেবপুর একটি ছোট গ্রাম, ঐরূপ গ্রামে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিচিত, তদুপরি বুদ্ধুর বাড়ী, এষ্টেটের কর্ম্মচারীদের বাড়ী এবং ডিহি কাছারী, রাজবাড়ীতে যাইবার রাস্তার উপর অবস্থিত। যদি বুদ্ধু বলিত যে, চক্রে আগ্নেয়গিরি উঠিয়াছে! এবং উহা যদি বুদ্ধুর অসত্য উক্তি হইত, তবে রিপোর্টে নিশ্চয়ই তাহা উল্লিখিত হইত না।

থানার রেজেষ্টরী

কিন্তু যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ঐরূপই বটে। জয়দেবপুর থানার জেনারেল রেজিষ্টারে যাহা লেখা আছে, এখন তাহা দেখা যাউক।

জয়দেবপুর থানার তৎকালীন দারোগা ঐ রেজিষ্টার প্রমাণ করিয়াছেন। জেনারেল রেজিষ্টারে দেখা যায়ঃ—

৪-৫-২১, বেলা ৯টা—জটাধারী সুদর্শন সাধু কয়েকদিন ধরিয়া বুদ্ধুবাবুর বাড়ীতে আছেন। সাধুর নাম ও নিবাস অজ্ঞাত। বহুলোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছে। অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস যে, এই সাধুর আকৃতির সহিত পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্রের আকৃতির সাদৃশ্য আছে। জনসাধারণের বিশ্বাস যে, দ্বিতীয়কুমার মারা যান নাই। গত বার বৎসর ধরিয়া তিনি নানাস্থানে ঘুরিতেছিলেন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে বাড়ী ফিরিয়াছেন (একজিবিট ২৩১)

লক্ষ্য করিবার বিষয়, ৪ঠা মে, যেদিন আত্মপরিচয় দেন উহার পূর্ব্বদিন থানার জেনারেল ডায়েরীতে ইহা লেখা হইয়াছে।

৫-৫-২১, বেলা ৩টা—আকাশে মেঘ নাই এই। এলাকায় কোনও

সংক্রামক রোগ হইয়াছে বলিয়া সংবাদও পাওয়া যায় নাই। জয়দেবপুরে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। লোকেরা বলিতেছে, তিনি মধ্যমকুমার এবং তিনি নিজেও ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি মেজকুমার।

৫ই মে প্রাতঃকালে ডাঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত, বড়রাণীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র মতিলালের নিকট একখানা পত্র লিখেন। ঐ পত্রের তারিখ ৫ই মে। ঐ দিন বেলা সাড়ে দশটার পূর্ব্বে ঐ পত্র ডাকে দেওয়া হইয়াছিল। ডাঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত বিবাদীপক্ষের একজন বিশিষ্ট সাক্ষী। আমি যথা সময়ে তাঁহার কথা আলোচনা করিব; তাহার সাক্ষ্যের স্বরূপ আপনা হইতেই প্রকাশ পায়। তাহার পত্রখানা এই :—

আশু ডাক্তারের পত্র

"ভাওয়ালে এমন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা কোন নভেলেও পড়ি নাই। এখানে বুদ্ধুবাবুর বাড়ীতে এক সাধু আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি মেজকুমার এবং তাহার তাঁহার নাম রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। তিনি অলকা দাইয়ের নামও বলিয়াছেন। প্রজারা দুই লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিবে ও তাঁহার সম্পত্তি উদ্ধার করিবে। **প্রত্যহ পাঁচ ছয় হাজার লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছে এবং কেহ কেহ নজরও দিতেছে।** প্রত্যেক নরনারীর দৃঢ় বিশ্বাস, **তিনিই মেজকুমার**—এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। এই ব্যাপারে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি বলিয়াছিলাম, সাধুর কথা মিথ্যা; তাই **ভাওয়ালের লক্ষ লক্ষ লোক আমার নিন্দা করিতেছে।** আমি অত্যন্ত উদ্বেগে দিন কাটাইতেছি।"

দেখা যাইতেছে যে, ঐ ব্যাপারে তুমুল চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছিল, রিপোর্টেও তাহাই বলা হইয়াছে। ৫ই মে বেলা সাড়ে আটটা কি তাহার পর রিপোর্ট রচনা করা হইয়াছিল। "এষ্টেটের সর্ব্বত্র এবং এষ্টেটের বাহিরেও ঐ চাঞ্চল্য বিস্তৃত হইয়াছিল,"—এক রাত্রিতে তাহা সম্ভব হয় নাই, উহার পূর্ব্ব হইতেই অর্থাৎ তাহার আগমনের পর হইতেই শত শত লোক দেখিতে আসিতেছিল বলিয়াই এষ্টেটের সর্ব্বত্র ও এষ্টেটের বাহিরে চাঞ্চল্য বিস্তৃত হইয়াছিল। রিপোর্টে এবং থানার জেনারেল রেজিষ্টারেও তাহাই বলা হইয়াছে।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সাক্ষ্যে দেখা যায় এবং থানার ডায়েরীতেও দেখা যায়—৪ঠা তারিখে বেলা ৯টার সময় অর্থাৎ বাদীর আত্ম-পরিচয় দিবার

পূর্ব্বদিন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে বহুলোক জমায়েৎ হইয়াছিল। ক্রমেই বেশী লোক জড় হইতে থাকে। কারণ আমার মনে হয় না যে, খঞ্জ ব্যতীত জয়দেবপুরে এমন কোন নরনারী ছিল, যে ঐ চাঞ্চল্যকর দৃশ্য দেখিতে যায় নাই। তারপর জনসাধারণ ও ভগিনী আত্মপরিচয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে, সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে তিনি আত্মপরিচয় দেন এবং তারপর ক্রন্দনরোল উঠে, চারিদিকে জয়ধ্বনি ও হুলুধ্বনি পড়িয়া যায়।

ঐ দিনের ঘটনাবলীর মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্কে অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যে বলিয়াছেন—বাদীর শরীরে এই চিহ্ন ছিল। সেই সম্পর্কে মিঃ চৌধুরী বাদী ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী উভয়কেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনি বাদীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, একথা কি সত্য নয় যে আপনার শরীরের চিহ্নগুলি দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যে বলিয়াছিলেন, মেজকুমারের শরীরেও সেই সকল চিহ্ন ছিল? (জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও বাদীর সাক্ষ্য), বাদী যে একটি অস্পষ্ট বিষয় সম্পর্কে বলিয়াছেন; তখন বাহিরের কেহ উপস্থিত ছিল না, তাহার উপর নির্ভর করিয়া বিবাদী পক্ষ এই আত্মপরিচয় দানের কথা উড়াইয়া দিতে পারেন না। ঐদিনের এবং উহার পরের দিনের যে সকল সুনিশ্চিত দলিলগত প্রমাণ আছে, তাহা বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, তখন বাড়ী লোকজনে পূর্ণ ছিল: যোগেন্দ্রবাবুও যে তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাহাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। কারণ শত শত লোক যদি তথায় গিয়া থাকে, তবে যোগেন্দ্রবাবুও গিয়াছিলেন, কেন না উহার পূর্ব্বেও প্রত্যহ তিনি তথায় গিয়াছিলেন।

এখন বিচার্য্য এই যে, বাদী যখন বলিলেন, তিনি কুমার, তখন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী নিজে এবং তাঁহার ও চন্দ্রময়ী দেবীর মেয়েরা বাদীকে সত্যই কুমার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন কিনা, কিম্বা বিবাদী পক্ষ যে বলিতেছেন বাদী ও মেজকুমারের মধ্যে আকৃতিগত কোনও সাদৃশ্য নাই,—তদ্রূপ বাদীকে সম্পূর্ণ ভিন্নব্যক্তি জানিয়াও, তাঁহারা বাদীকে কুমার বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে প্ররোচনা দিয়াছিলেন। অথবা বিবাদী পক্ষের উক্তির হাস্যকর অসারত্ব কিঞ্চিৎ লাঘবকল্পে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, বাদী ও কুমারের মধ্যে আকৃতিগত কিছু সাদৃশ্য আছে, তবে ঐ সাদৃশ্যবশতঃ তাঁহাকে কুমার বলিয়া চালাইবার সুবিধা হইবে বলিয়া তাঁহাকে ঐরূপভাবে আত্মপরিচয় দিতে প্ররোচনা দিয়াছিলেন কি না, এবং ভ্রাতাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এমনই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন কি না; বাদীকে ভাই

বলিয়া না চিনিতে না পারিয়াও ভাই বলিয়া আত্মপ্রতারণা করিয়াছিলেন? বিবাদী পক্ষ বলিয়াছেন, বাদী ও মেজকুমারের মধ্যে আকৃতিগত কোনও সাদৃশ্য নাই, তাহা ধরিয়া লওয়া হইলে বলিতে হয়, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে যে দাড়ি ও জটাজুটসমন্বিত ভস্মমাখা—মেজকুমার হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ এক সন্ন্যাসী বসিয়াছিল, যে ব্যক্তিকে কুমার বলিয়া চালান অত্যন্ত কঠিন, এবং কিরূপ কঠিন ভূমিকায় অভিনয় করিতে হইবে সেই সম্পর্কে যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ,—সেই সন্ন্যাসীকে কুমার বলিয়া চালাইবার জন্য অকস্মাৎ অথবা দিন তিনেকের মধ্যে একটি ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। আমি তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করি। সুতরাং বিচার করিতে হইবে, বিবাদীপক্ষ কেন বলিতেছেন না যে, ভ্রম হইতে পারে, এমন আকৃতিগত সাদৃশ্য বাদী ও মেজকুমারের আছে বলিয়াই বাদীর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য উত্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। তারপর বাদীর কথা যদি অসত্য না হয়, তবে আত্মপ্রতারণা প্রভৃতি যেসকল যুক্তি দেখাইবার আছে, বিবেচনাক্রমে তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী আমার নিকট এমন আন্তরিকতার ও দৃঢ়তার সহিত সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, তাহাতেই বুঝা যায়, আত্মপ্রতারণার যুক্তি টিকিতে পারে না।

রায় সাহেবের উক্তি

আত্মপ্রতারণা করিবার সম্ভাবনা রায় সাহেব যোগেন্দ্র ব্যানাজ্জীর পক্ষে যত কম, অন্য কাহারও পক্ষে তত কম নহে। তাঁহাকে দেখিবা-মাত্রই খাঁটি বস্তুতান্ত্রিক লোক বলিয়াই মনে হয়। তিনি এই মামলায় যে তদ্বির করিয়াছেন (পরে এই সম্পর্কে আলোচনা করিব) তাহাতেও বুঝা যায়, **তাঁহাকে দেখিলে যাহা মনে হয়, বাস্তবিক পক্ষে তিনি তাহাই।** নতুবা তাঁহাকে তদ্বিরকারক নিযুক্ত করিলে এষ্টেটের ক্ষতি হইতে পারে বিবেচনায়, তাঁহাকে তদ্বিরকারক নিযুক্ত করা হইত না। এই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি ও মোহিনীবাবু যখন একত্র বসিয়া মিঃ নীডহ্যানের চিঠি মুসাবিদা করেন, তখন তিনি তাঁহাদের মুসাবিদার বিবরণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন কিনা? তিনি বলেন, আমি এই অংশটী বিশ্বাস করিয়াছিলাম, মোহিনীবাবু ইহা লিখিয়া দিলেন এবং আমিও লিখিবার সময় উপস্থিত ছিলাম। তখন যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদের সকলের মনেই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি মেজকুমার ছাড়া আর কেহ নহেন। তিনি বলেন, যাহারা উপস্থিত ছিল বলিতে, বাড়ীর লোকও ধরা হইয়াছে, এবং বাড়ীর লোক বলিতে তিনি বুদ্ধ,

জবব্ ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে বুঝেন। তিনি বলেন, বাড়ীর লোক প্রভৃতি **সকলেই সাধুকে মেজকুমার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে**। ঐ মর্ম্মে তিনি শুনিয়াছিলেন। তিনি মেজকুমারকে অন্যান্যের মতই চিনিতেন। সাধু প্রথমবার যখন জয়দেবপুর গিয়াছিলেন, তখনও তিনি সাধুকে দেখিয়াছিলেন; তিনি সাধুর চেহারাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার চক্ষুর রং ছিল কটা। সাধুই মেজকুমার বলিয়া যে জ্যোতির্ম্ময়ীর মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সেই কথা তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, তিনি নিজেও নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, সাধুই মেজকুমার, যদিও তিনি তোতাপাখীর ন্যায় পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, বাদী ও মেজকুমারের মধ্যে কোনই সাদৃশ্য নাই। যদি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বাদীকে মেজ-কুমার বলিয়া সত্যসত্যই বিশ্বাস করিয়া থাকেন, অথবা যদি তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে যে, বাদী ও মেজকুমারের কথাবার্ত্তা এবং মানসিক বৃত্তি পৃথক হইলেও উভয়ের মধ্যে আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা হইলে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ভুল করিয়া থাকিলেও, তিনি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, বাদীই মেজকুমার। দেখা যায় যে, রিপোর্টে এমন কথা বলা হয় নাই যে, সাধুকে মেজকুমারের মত দেখা যায় না, অথবা তিনি দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথা বলিতেছিলেন। সাধু যখন প্রথমবার জয়দেবপুরে যান, তখন রায়সাহেব ও মোহিনীবাবু উভয়েই তাঁহাকে কথা বলিতে শুনিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইহা রিপোর্টে বলা হয় নাই যে, বাদীকে মেজকুমারের ন্যায় দেখা যায় না, অথবা বিবাদী পক্ষের অধিকাংশ সাক্ষীই যেরূপ বলিয়াছে, বাদীকে দেখিয়াই বলা যায় তিনি মেজকুমার নহেন। রিপোর্টে শুধু বলা হইয়াছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত আবশ্যক।

জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য বা শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ আবশ্যক, এমন কথা রিপোর্টে বলা হয় নাই। মোহিনীবাবুকেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, রিপোর্টে বর্ণিত বিষয় তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন কি না। তিনি মেজকুমারকে দেখেন নাই; কিন্তু যখন রিপোর্ট রচনা করা হয়, তখন তিনি ও রায় সাহেব একত্র ছিলেন। তিনি বলেন, ৪ঠা মে রাত্রিতে তিনি মিঃ নীডহ্যামের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং পরদিন রিপোর্টে যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহা তিনি মিঃ নীডহ্যামের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, মিঃ নীডহ্যাম তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও উহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি পরে বলেন, তিনি উহা বিশ্বাস করেন নাই। তারপর তিনি বলেন, বিশ্বাস করার

বা অবিশ্বাস করার কোনও সময় ছিল না। ব্যাপার জরুরী ও সাংঘাতিক হইয়া পড়িয়াছিল। এই কথা বলিবার সময় তিনি সাময়িক কালের জন্য ভুলিয়া গেলেন যে, রিপোর্টে যাহাই লেখা থাকুক, সাক্ষ্যদানের সময় তিনি ব্যাপারটীকে অকিঞ্চিৎকর, প্রমাণ করিতে চাহিয়া ছিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি বলেন, তিনি রিপোর্টের এক কথাও বিশ্বাস করেন নাই, উহার সমস্তই নিছক বাজে, কিন্তু তিনি মিঃ নীডহামকে এমন কথা বলিলেন না, বরং এই বাজে কথাই সাজাইয়া গুছাইয়া তিনি এক রিপোর্ট রচনা করিলেন, এবং কালেক্টরের নিকট উপহাসচ্ছলে তাহা প্রেরণের জন্য তাহাতে মিঃ নীডহামের স্বাক্ষর লইলেন। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, রিপোর্টে সাধুর প্রথমবার জয়দেবপুর গমনের কথা প্রসঙ্গে সেই কুখ্যাতি ও কাল্পনিক চা'য়ের মজলিসের কোনও উল্লেখ করা হয় নাই। বাদী যে সেই চায়ের মজলিসে বলিয়াছিলেন, তিনি একজন পাঞ্জাবী, তাহারও কোনও উল্লেখ করা হয়ই নাই।

উল্লিখিত ঘটনা যিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, আলোচ্য রিপোর্ট তাঁহারই লেখা। উহাকে প্রাথমিক এজাহার বলিয়াই যদি ধরিয়া লওয়া যায়,—অবশ্য মোহিনীবাবু ঐরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াই উক্ত রিপোর্টের প্রামাণ্য নষ্ট করিয়াছেন,—তাহা হইলেও উক্ত ঘটনা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার রিপোর্ট এমন একজন লোককে দেওয়া উচিত ছিল, যিনি উহার মধ্যে কোনও অসত্য থাকিলে তাহা বুঝিতে পারিতেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সত্যতা নির্ণয়ে প্রয়াস পাইতেন এবং সকল অবস্থার তদন্ত করিয়া নিজে সন্তুষ্ট হইয়া জেলার কালেক্টরের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য যথার্থ রিপোর্ট লিখিতে বসিতেন।

বাদীর আত্ম পরিচয় দান

বাদী পক্ষের জবাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলা হইয়াছে যে,—ভগিনিগণ কুমার বলিয়া সাব্যস্ত করিবার জন্য একজন পাঞ্জাবী সন্ন্যাসীকে খাড়া করিয়াছিলেন, ও দুরভিসন্ধিপূর্ণ কুলোকগণ চক্রান্ত করিয়া সেই সন্ন্যাসীকে কুমার বলিতেছিল এবং কলিকাতার কয়েকজন তাঁহাকে কুমার বলিয়া দাঁড় করাইয়াছিল,—বড় রাণীর জেরার সময় বিবাদীপক্ষ সে সম্বন্ধে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিবাদী পক্ষের পূর্ব্বোক্ত যুক্তিই খণ্ডন হইয়াছে। তারপর বিবাদীপক্ষের আর এক যুক্তি এই যে,—সন্ন্যাসী একজন চিকিৎসক। এ যুক্তিও খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়। স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব দূর করিবার জন্যই যে তাঁহাকে চিকিৎসকরূপে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া

যাওয়া যাইতেছিল তাহা নহে, সকল ক্ষেত্রেই সন্ন্যাসী বলিয়াছেন, তাঁহার সেরূপ কোনও ক্ষমতা নাই। কিন্তু যে জন্য তাঁহাকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তাহার কারণ সেই একই, যে কারণে বাকল্যাণ্ড বাঁধে থাকা কালে মিঃ মায়ার সন্ন্যাসীকে অতি অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসীকে মধ্যম কুমারের ন্যায় দেখাইতেছিল। দেখিতে মধ্যম কুমারের মত বলিয়াই তাঁহাকে কাশিমপুর যাইতে হইয়াছিল। মধ্যম কুমারের মত চেহারার জন্যই তাঁহাকে জয়দেবপুরে লওয়ার ব্যবস্থা হয়।

সন্ন্যাসী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে যান, তারপর অন্যত্র গমন করেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ঢাকায় গিয়াছিলেন,—চিকিৎসকের অনুসন্ধানে নহে। সন্ন্যাসীকে শৈবালিনীর বাড়ীতে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে। তারপর যখন সন্ন্যাসী পুনরায় আগমন করেন, তখন দলে দলে লোক আসিতে থাকে। শত শত লোক আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যায়। কিন্তু **৪ঠা মে যখন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পুত্র-কন্যারা সন্ন্যাসীকে "মামা" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল (বিবাদী পক্ষের ৭৬নং সাক্ষী) এবং যখন (যেমন যোগেন্দ্রবাবু সরলভাবে বিশ্বাস করিয়াছিলেন) ভগিনিগণ ভ্রাতা বিশ্বাসে তাঁহাকে মধ্যমকুমার বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন, তখনই সন্ন্যাসীর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িল।**

বিস্তৃত কারণ প্রকাশ

মাত্র একটি ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তাহা এই, রায় সাহেব কুমারকে চিনিতেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়াই সন্ন্যাসীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিলেন,—কুমারের ভগ্নী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীও অন্যান্য ভগিনিগণের সন্তান-সন্ততিদিগের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল; কিন্তু একমাত্র এই ব্যাপারের উপরই নির্ভর করা চলে না। এই প্রকারের দৃঢ় বিশ্বাস ভিন্ন কোনও কোনও ঘটনা আদৌ ঘটিতে পারে না। ৪ঠা মে যখন কুমারের পরিচয় প্রকাশ হইল, সে সময় নিশ্চয়ই জয়দেবপুরের সকল লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বিবাদিগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত একজনকেও সাক্ষিরূপে আদালতে উপস্থিত করেন নাই। কেন না, ঐদিনকার ঘটনা ভগ্নী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এবং অন্যান্য সাক্ষিগণ যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং বিবাদীপক্ষের বর্ণিত তাৎকালিক প্রাথমিক জবানবন্দীর দ্বারা যে প্রকারে

সমর্থিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। এখন, ঐঘটনার পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপের বিষয়ই অতঃপর বিবেচনার বিষয়।

বিবাদীপক্ষের সাক্ষিগণ এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, ঐ দিন হইতে বাদী পরিবারে স্থান পায়, জ্যোতির্ম্ময়ীর কন্যা পূর্ব্বে যে ঘরে থাকিতেন, ঐ দিন হইতে সেই ঘর বাদীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। তিনি পূর্ব্বে কোথায় ঘুমাইতেন, বাদী তাহা বলেন নাই। সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে আমার ধারণা—বাদী ঐ দিনের পূর্ব্বেও ঐ নির্দ্দিষ্ট ঘরেই শুইতেন, অতঃপর কালবিলম্ব না করিয়া বাদীকে পরিবারের আপনার জন করিয়া লওয়া হইল। বাড়ীতে যুবতী স্ত্রীলোক ছিলেন; তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র অন্দরমহল ছিল না। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী নিজেও যুবতী—তাঁহার বয়স চল্লিশেরও কম; পর্দ্দানশীন মহিলা। তিনি চিকের অন্তরালে থাকিয়া সকল ঘটনা দেখিতেছিলেন। এইসময় সহসা বাদী সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন,—তিনি এই ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। তাঁহার অন্তর উদ্বেলিত হয়; তিনি পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বাহিরে আসেন। বাহিরে আসিবার সময় সমাগত জনগণ সরিয়া তাঁহার জন্য পথ করিয়া দেয়। তাহার ন্যায় পর্দ্দানশীন মহিলা যে অল্প আবেগে লোকলোচনের সমক্ষে উপস্থিত হন নাই, তাহা নিঃসন্দেহ।

তারপর ঐ পরিবারের জীবন-যাপন-পদ্ধতি বিবেচ্য বিষয়। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বিধবা ছিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ অত্যধিক গোঁড়া। প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে, তিনি কলের জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেন না। বিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী; সেই কারণে কলের জল তাঁহারা গ্রহণ করেন না। এই প্রকৃতির মহিলাগণ অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত ব্যক্তিকে গৃহে স্থান দিবার কথা ভাবিতেও রোমাঞ্চিত হন। বিশেষতঃ তখন সন্ন্যাসী যুবাপুরুষ, এবং বিবাদীপক্ষের বর্ণনা অনুসারে বাদী একজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি; তাহার পিতৃপরিচয় এবং তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সকলেই অপরিজ্ঞাত। এমন একজন লোককে—যে লোক একজন পাঞ্জাবী, যিনি রাজ পরিবারের চালচলন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং যাহার চেহারা ও আকৃতি সম্পূর্ণরূপ স্বতন্ত্র, এই সকল সত্ত্বেও,—কুমার বলিয়া পরিচয় দেওয়া মাত্র গৃহে আপনার জন বলিয়া স্থান দেওয়া হইবে এবং পরিবারের লোক বলিয়া গণ্য করিয়া লওয়া হইবে, ইহা বড়ই কৌতূহলের বিষয়! জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী আশা করিতেন যে, এই লোক ভাওয়াল এষ্টেটের সহিত লড়িয়া নিজ অংশ উদ্ধার করিবে, এষ্টেট শেষ কপর্দ্দক ব্যয় করিয়াও মামলায় লড়িবে,—জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর এ দূরদৃষ্টি থাকিবে না, ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয়। অপিচ যদি বাদীকে হাসিয়া উড়াইয়া না দেওয়া

হয় এবং জয়দেবপুর হইতে তাহার অস্তিত্ব যদি একেবারে লোপ করিয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে বাদী আদালত পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেও, সাফল্য লাভ করিবেন কি না, এবং তাহার ফলই যে কি হইবে, তাহা যে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বুঝিতে পারিবেন না, ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয়। উন্মাদগ্রস্ত না হইলে কেহ চিন্তায়ও এ বিষয় আনিবেন না; উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন এরূপ চেষ্টায় কেহ যোগ ও দিবেন না, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাহা করিয়াছিলেন। ৭ই জুন সন্ন্যাসী জয়দেবপুর পরিত্যাগ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি সন্ন্যাসীকে পরিত্যাগ করেন নাই। সেদিন হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী নির্ব্বাসিতার ন্যায় বাস করেন।

ভগ্নীদিগের দ্বারা সনাক্ত-করনের কথা

নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া বিতর্ক করা বৃথা। আমার ধারণা, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল—বাদী তাহারভ্রাতা। এক্ষণে দেখা আবশ্যক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সেই বিশ্বাস বাদীকে সত্য সত্য ভ্রাতা বলিয়া চিনিবার ফলে জন্মিয়াছিল কি না। মিঃ চ্যাটার্জ্জি বলেন, ঃ—ভগ্নিগণ বাদীকে ভাই বলিয়া সত্যসত্যই চিনিতে পারিয়া ছিলেন বলিয়াই, বাদীকে এতদূর পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছেন। পুনরুক্তি ক্ষেত্রে সেইরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু ভগ্নিগণের দৃঢ় বিশ্বাসই চূড়ান্ত প্রমাণ নহে, যদিও তাহা সম্পূর্ণ অসাদৃশ্যের যুক্তিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। ভগ্নীদের দ্বারা এ সনাক্ত নিঃসন্দেহে বাদীকে অনেকটা অগ্রসর করায় বটে; কিন্তু মৃত্যুঘটার সামান্য একটি মাত্র প্রমাণ, স্বতন্ত্র প্রকারের মানসিক ভাবের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এবং বাদীর অবাঙ্গালীত্ব বিষয়ক একটি মাত্র যুক্তি বাদীকে মামলার পটভূমি হইতে একেবারে বিদূরিত করিবে।

রিপোর্টের কথা

গত ৪ঠা মে বাদীর পরিচয় ঘোষিত হইবার পর যে ঘটনা ঘটে, তাহা আমার মতে সত্য, এবং ভগ্নীদের দৃঢ় বিশ্বাস উদয় হওয়া সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সিদ্ধান্ত হইল, তদ্দ্বারা তাহাও সমর্থিত হয়। ৫ই তারিখে মিঃ নিডহ্যামের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট প্রেরিত হয়। ঐ রিপোর্টের এক একটী নকল প্রত্যেক রাণীর নিকট পাঠান হয়। মোহিনীবাবু এসকল বিষয় স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্ট নিশ্চয়ই ৬ই মে কলিকাতায় পৌছিয়াছিল। কারণ পোষ্ট অফিসের শিলমোহরে দেখা যায় (৩৯৮নং একজিবিট) জয়দেবপুর পোষ্ট অফিসে ঐ রিপোর্ট ৫ই তারিখে পোষ্ট করা হইয়াছিল। তাহা হইলে

কলিকাতায় উহা ৬ই মে বিলি হইয়াছিল। সে দিন শুক্রবার। ৭ই তারিখে কলিকাতায় "ইংলিসম্যান" পত্রিকায় (৪০০ একজিবিট)। 'এসোসিয়েটেড প্রেসের' প্রেরিত 'ঢাকা সেন্সেশন' শীর্ষক এক সংবাদ প্রকাশিত হয়। মিঃ নিউহ্যামের পত্র বা টেলিগ্রাম পাইয়া সত্যবাবু কি করিলেন ? তিনি তাঁহার ভগ্নীকে তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। ভগ্নী তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। তিনি সে সম্বন্ধে মৃদুভাষায় আলোচনা করিলেন কুমারের চেহারার সহিত বাদীর চেহারা স্বতন্ত্র না দেখাইলেও সত্যবাবু কি জয়দেবপুরে যাইয়া সে লোকের সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—সত্যবাবুকে তিনি চিনেন কিনা, অথবা দুই চারিটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আগন্তুককে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ? সত্যবাবু তাহা করেন নাই। তিনি রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ লেথ্‌ব্রিজের নিকট গমন করেন ও মধ্যম কুমারের মৃত্যু সংক্রান্ত যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ নিরাপত্তায় রাখিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিয়া ইনসিওরেন্সের টাকা উঠাইবার যে, এফিডেভিট করা হইয়াছিল, সেই এফিডেভিটের একটি নকল মিঃ লেথব্রিজকে অর্পণ করেন। সত্যবাবুর সাক্ষ্য প্রকাশ, তিনি মিঃ লেথব্রিজকে এই বলিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, ইনসিওরেন্সের মূল কাগজ এবং অন্যান্য মূল দলিল যেন অবিলম্বে সংগ্রহ করা হয়। মিঃ লেথব্রিজ স্বীকৃত হন। তিনি ঐ সকল দলিলের নকল ঢাকায় কালেক্টরের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ সকল দলিলের মধ্যে ১৯০৯ সালের ৭ই জুলাই তারিখে কুমারের মৃত্যু সম্বন্ধে কর্ণেল ক্যালভার্ট যে এভিডেভিট করিয়াছিলেন তাহার নকল ছিল। বাদীর দাবীর বিষয় অবগত হইবার এক সপ্তাহের মধ্যে এই সকল যোগাড় করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যবস্থা আরও অল্প সময়ের মধ্যে হইয়াছিল বলিয়াও অনুমান করা যায়। সত্যবাবু বলেন,—পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করা ছাড়াও তিনি অনারেবল মিঃ লীজের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার পরামর্শ অনুসারে বাদী ভাওয়ালের মধ্যমকুমার বলিয়া যাহা "ইংলিশম্যানে" লেখা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিয়া পাঠান। সত্যবাবুর স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ, ১৯০৯ সালের ৯ই "ইংলিশম্যান" সেই পত্র প্রকাশিত হয়। ৮ই মে, রবিবার ছিল। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে, সত্য বাবু ৯ই মের পূর্ব্বে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; সম্ভবতঃ ৬ই ও ৭ই মে উক্ত কর্ম্মচারীদিগের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।

ঢাকার তাৎকালিক কালেক্টর মিঃ লিণ্ডসে স্বতন্ত্র এক রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। ৫ই এবং ১৫ই মের মধ্যে রায় বাহাদুর শশাঙ্ককুমার ঘোষ

সেই রিপোর্ট সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় সত্যবাবুর সহিত রায় বাহাদুর শশাঙ্ক ঘোষের সাক্ষাত হয়। কলিকাতা হইতে ইহারা দুইজন মিঃ লীজের নিকট রিপোর্ট পেশ করিবার উদ্দেশ্যে দার্জ্জিলিং রওনা হন।

কুমারের মৃত্যু ও সৎকার

মেজ কুমারের মৃত্যু এবং সৎকার সম্পর্কে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, কে, রায় কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। ১৭-৫-২১ তারিখে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। সেই প্রথম সাক্ষী কি না জানা যায় নাই। উপরে সত্যবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা "ইংলিশম্যানে" প্রকাশিত হইয়াছে এবং ১৭-৫-২১ তারিখে দার্জ্জিলিংএ উত্তরের বিবৃতি গৃহীত হইয়াছে। আর একটা আবশ্যকীয় বিবরণ পাওয়ার কথা সত্যবাবু বলিয়াছেন যে, ১৫ই মে দার্জ্জিলিং ত্যাগের পূর্ব্বে তিনি কয়েকবার মিঃ লেথব্রিজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। একবার তিনি তাঁহাকে এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের প্রেরিত একটা টেলিগ্রাফ দেখাইয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, 'তিনি এবং আশু ডাক্তার মেজকুমারকে বিষ খাওয়াইয়াছেন' বলিয়া জয়দেবপুরে বলাবলি করা হইতেছে এবং এই সম্পর্কে তাঁহাদের বিরুদ্ধে পরিষ্কার অভিযোগ আনা হইয়াছে। ৪ঠা মে যে ঘটনা হইয়াছে, উহা উড়াইয়া দেওয়ার বিষয় নহে। কি কারণে সত্যবাবু দার্জ্জিলিং যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাকে মৃত্যু সম্পর্কিত সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল—মৃত্যু সম্পর্কিত মূল এফিডেভিটের জন্য রেভেনিউ বোর্ড ইনসিওরেন্স কোম্পানীর নিকট লিখিয়াছিলেন।

এই সকল কাজ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করা হইয়াছে; কিন্তু ইতিমধ্যে জয়দেবপুরে কি ঘটিয়াছে? রায় সাহেব বলেন যে, ৬ই তারিখ কোর্ট অব ওয়ার্ডস বাদীর বিপক্ষে দাঁড়ান। উহা কোন পন্থা অবলম্বন করিল তাহা, ৫ই তারিখও জানা যায় নাই। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্ম্মচারীদের অনেকেই মেজ কুমারকে জানিতেন। এই তারিখ যাহা ঘটিয়াছে, মিঃ নীডহামের রিপোর্টেও তাহা উল্লেখ আছে। উহার কোন কোন অংশ স্বীকৃত হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে যে, উক্ত দিবস এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার, রায় সাহেব, আশু ডাক্তার এবং অন্যান্য কয়েকজন লোক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে গিয়া বাদীকে দেখিয়াছেন। সেখানে কি

ঘটিয়াছে তৎসম্বন্ধে মোহিনীবাবু একটা রিপোর্ট তৈরী করিয়া ৬ই তারিখ মিঃ নাডহামের নিকট দাখিল করেন, রিপোর্টটা এইরূপ :—

মোহিনীবাবুর রিপোর্ট

"আপনার মৌখিক নির্দ্দেশানুযায়ী সাধুর সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য গতকল্য বিকালে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে বাঁড়ুয্যে, স্পেশাল অফিসার, ফরেষ্ট অফিসার, হেড ক্লার্ক এবং এষ্টেটের আরো কয়েকজন কর্ম্মচারী ছিল। শুনিলাম উক্ত সাধু নিজকে পরলোকগত মেজকুমার বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। আমরা তাঁহার সম্পর্কে তাঁহার নিকট হইতে পরিচয় আদায় করিতে খুব চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তিনি তাঁহার অতীত জীবন সম্পর্কে কিছু বলিতে অস্বীকার করেন। সাধু এই রিপোর্টের সহিত উল্লিখিত ব্যক্তিদের সম্মুখে পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, তাঁহার নাম শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং তাহার পিতার নাম স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়। কিন্তু তিনি মেজকুমারের জীবনের কোন ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। কোনও প্রশ্ন সম্পর্কে উত্তর না দেওয়ার কারণ পরিষ্কার। এখন সাধু তাঁহার আত্মপরিচয় দিবেন, অন্যথা মিথ্যা পরিচয় দেওয়ার অভিযোগে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইবে। সাধুকে যদি এই ভাবে মেজকুমার বলিয়া প্রচার করিতে দেওয়া হয়, তবে এষ্টেটের কাজে ব্যাঘাত ঘটিবে। ইতিমধ্যেই সাধু প্রজাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহারা তাঁহাকে মেজকুমার বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে। এই অবস্থায় কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত তৎসম্পর্কে আপনার উপদেশও প্রার্থনা করি।

এই প্রকার জানা গিয়াছে যে, সময় হইলে সাধু উদ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার আত্মপরিচয় দিবেন বলিয়া বলিতেছেন।"

স্বাঃ—এম, এম, চক্রবর্ত্তী
৬-৫-২১

উপস্থিত ব্যক্তিদের নাম :—

বাবু মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী (বিবাদী পক্ষের ১১৭ নং সাক্ষী), জে, এন, বাঁড়ুয্যে (বিবাদী পক্ষের ৩১০নং সাক্ষী), ফণিভূষণ ব্যানার্জ্জি (বিবাদী পক্ষের ৯২নং সাক্ষী), গৌরাঙ্গহরি কাব্যতীর্থ-সাব রেজিষ্ট্রার, (বাদী পক্ষের সাক্ষী), জয়দেবপুর থানার দারোগা মৌলবী নুরুলহক্, রামচন্দ্র বাগ্চি (হাজির করা হয় নাই), আশুতোষ দাস, বিবাদী পক্ষে ৩০৬৫নং সাক্ষী। অশ্বিনীকুমার

দত্ত, (হাজির করা হয় নাই) জলদচন্দ্র মুখুজ্জ্যে (মৃত)। সীতানাথ বাড়ুয্যে। (বাদী পক্ষের ৯৭৭নং সাক্ষী) ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র মুখুয্যে, (বাদী পক্ষের ৯৩৮নং সাক্ষী), সীতানাথ মুখুয্যে বাদী পক্ষের ৯৭৩নং সাক্ষী), যোগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত (হাজির করা হয় নাই), নস্থ প্রধানিয়া (হাজির করা হয় নাই), অছিম মুন্সি (হাজির করা হয় নাই) উমেদ আলি ভূঞা (বাদীপক্ষের ২৬নং সাক্ষী)।

যাঁহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে, আমি তাঁহাদের নামের সঙ্গে নম্বর দিয়াছি। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উহা ৬ই মের রিপোর্ট। উক্ত রিপোর্টে (একজিবিট নং ২ (২০৩) ৬।৫।২৯ তারিখকে ৫।৫।২৯ তারিখের মত দেখায়। মোহিনীবাবু বলিয়াছেন যে, ৫ নহে ৬। রায় সাহেবের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, ৬ই তারিখ কোর্ট অব ওয়ার্ডস সাধুর বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং বিবাদীপক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, উক্ত দিবস জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং রায় সাহেব গিয়াছিলেন; এই সম্পর্কে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং রায় সাহেবকে সাক্ষ্য দিতে না আনিয়া, বিবাদীপক্ষ অন্য একজন সাক্ষীকে আনিয়াছে। আমি তাঁহার সম্পর্কে আলোচনা করিব, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রিপোর্টে কতকগুলি বিষয় বলা হইয়াছে, যেমন 'সাধু মেজকুমার বলিয়া প্রচার করিতেছেন।' পারিবারিক ঘটনা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দেন নাই; তাঁহাকে অভিযুক্ত করিবার জন্য বলা হইয়াছে। ৫ই তারিখের রিপোর্টে যে চা পার্টির কথা উল্লেখ হইয়াছে, উহাতে ঐ লোক পাঞ্জাবী বা হিন্দীভাষী তৎসম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয় নাই, এবং পারিবারিক ঘটনার বিষয়ও উল্লেখ করা হয় নাই, এবং পরিবারস্থ লোকজন তাঁহাকে স্বীকার করে নাই বলিয়া বলা হইয়াছে।

বাদীর সহিত ৫ই মের সাক্ষাৎকারের ঘটনা ৬ই মের রিপোর্টে বর্ণিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে কোর্ট অব ওয়ার্ডস বাদীর বিরুদ্ধে গিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি, একটা মামলা দায়ের করার জন্যই পূর্ব্ব হইতে তাহারা ঐপ্রকার রিপোর্ট তৈরী করিয়াছে এবং সেখানে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা যথাযথভাবে উল্লেখ না করিয়া বাদ দিয়াছে। এই সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাই, কারণ বাদীর সহিত ৫ই মে যে সাক্ষাৎ করা হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহার সম্পর্কিত প্রশ্ন সম্পর্কে অনেক কথা বাহির হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইহার পর আর কখনো বিবাদীপক্ষ তাঁহার নিকট যান নাই বা এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেন নাই। এই মামলার সময় ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, বাদীকে কুমারের জীবনের

ঘটনাগুলি শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করিব। ৫ই তারিখের সাক্ষাৎকার সম্পর্কিত ঘটনা সম্পর্কে বহু সাক্ষী উপস্থিত করা হইয়াছে। যাঁহারা কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, তাঁহারাত উপস্থিত ছিলেনই।

ডাক্তার আশুর প্রশ্ন

বাবু গৌরাঙ্গ কাব্যতীর্থ তখন জয়দেবপুরে সাব্‌-রেজিষ্টার ছিলেন, এবং এই সাক্ষাৎকারের সময়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় কুমারকে চিনিতেন না, এবং কুমারের সাদৃশ্য প্রমাণে তিনি সাক্ষীও নহেন। তাঁহার পিতা একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতের পণ্ডিতদের পক্ষে ইহা সর্ব্বোচ্চ সরকারী উপাধি। তাঁহার বাড়ীতে যে টোল ছিল তাহা পরিদর্শন করিতে লর্ড রোনাল্ডসে এবং স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলিও গিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গবাবুকে সরকারই (কাব্যতীর্থ) উপাধি দেন,এবং তিনি এখনও চাকুরীতে আছেন। তিনি বলেন যে, ঐদিন বাদীকে দেখিতে তিনি গিয়া দেখেন যে, বাদী একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন এবং তিনি শুনিলেন যে, তখন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন। অতঃপর সাক্ষী বলেন যে, রায় সাহেব, মোহিনীবাবু, ডিসপেন্সারীর ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার এবং আরও অনেকে বাদীকে দেখিতে আসিলেন। সাধু কে? সে কাহার ভাই প্রভৃতি অনেকে প্রশ্ন করিবার পর আশু ডাক্তার বলিলেন, "আমি একটি প্রশ্ন করিব। যদি সে ইহার উত্তর করিতে পারে, তবে আমি তাহাকে কুমার বলিয়া স্বীকার করিব।" সাক্ষী সাধুর পাশে এবং আশু ডাক্তার তাহার পাশে বসিয়াছিলেন। ইহার পর আশু ডাক্তার হিন্দী বাঙ্গালায় মিশাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "দার্জ্জিলিংয়ের বাড়ীর কার্ণিসে একটি পাখী ছিল, কে উহাকে গুলী করিয়া মারে এবং তুমি তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলে কেন?" তিনি যখন প্রশ্ন করিলেন, তখন একজন বলিল, "সাধু উত্তর দেওয়ার আগে আশু ডাক্তার গৌরাঙ্গ বাবুর নিকট লোকটিরনাম বলুক।" আশু ডাক্তার ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া তাঁহার নিকট 'বীরেন্দ্র বাড়ুয্যের' নাম বলিলেন, সাধু উত্তর করিলেন, 'হরিসিংহ'। আশু ডাক্তার বলিলেন, "হরিসিংহ আদৌ দার্জ্জিলিং যায় নাই" সাক্ষী বলেন যে, যখন নামের মিল হইল না, তখন বীরেন্দ্র বাঁড়ুয্যেকে ডাকা হয়। তিনি আসিয়া বলেন যে, হরি সিংহই পাখীটিকে গুলি করিয়া মারিয়াছিল। বীরেন্দ্রবাবু বন্দুকের গুলী ছাড়িতে জানেন না।

জেরায় সাক্ষী বলেন যে, সাধুকে প্রশ্নটি বুঝাইয়া বলা হইয়াছিল কি না তাহা তাহার স্মরণ নাই। তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইহা আধা হিন্দী আধা বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। বিবাদীপক্ষ বলেন যে, ঘটনাটি সত্য নহে। অতঃপর সাক্ষী বলেন, "আমি আপনাকে বলিতেছি যে, সেদিন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্ম্মচারীরা বাদীকে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি সেগুলির উত্তর দিতে পারেন নাই। যে কোন প্রশ্ন করা হইলেই তিনি উত্তর দেন যে; 'তাহার মনে নাই।' আপনার নাম কি প্রভৃতি এই জাতীয় প্রশ্নই করা হইয়াছিল, তবে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্ম্মচারীরাই সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন কি, ফণীবাবুই করিয়াছিলেন, সে কথা সাক্ষীর ঠিক মনে হয় না।"

কি কি প্রশ্ন করা হইয়াছিল রিপোর্টে তাহার উল্লেখ নাই এবং জেরায়ও তাহা বলা হয় নাই।

পুলিশ সাব্ ইন্স্পেক্টার আবদুল হামিদের সাক্ষ্য

সেই সময় জয়দেবপুর থানার আবদুল হামিদ নামে একজন দারোগা ছিলেন। তিনি এখনও চাকুরী করিতেছেন। তখন সেই থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ছিলেন মৌলভী নুরুল হক। ৫ই মে তারিখের সাক্ষাৎকারের সময় এই দুইজন দারোগাই উপস্থিত ছিলেন। যদিও আবদুল হামিদের নাম রিপোর্টে উল্লেখ নাই, সে যে উপস্থিত ছিল, সে কথা কেহ অস্বীকার করে নাই এবং ১৯২১ সালের ৫ই মে অপরাহ্ণ ৪টার সময় থানার জেনারেল ডায়েরীতে লেখা আছে, যে সন্ন্যাসী নিজেকে রাজকুমার বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। তাহাকে দেখিবার জন্য আবদুল হামিদ, এবং থানার ভারপ্রাপ্ত দরোগা যাইতেছেন, এই দারোগা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন, এবং তিনিও বহু সাক্ষীর মত মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি সরকারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে যাইতেছেন।

মানহানি মামলা

পূর্ব্বের একটি মামলার সাক্ষ্য প্রমাণ হইতেই তিনি যাহা কিছু বলেন, সেই মামলাটি হইল একটি মানহানির মামলা। ১৯২১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর আশু ডাক্তার একজন পুস্তিকা লেখকের বিরুদ্ধে এই মামলা আনিয়াছিলেন। আশু ডাক্তারের সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে ইহা দেখা যায় যে, সরকারী উকীল রায় বাহাদুর শশাঙ্ককুমার ঘোষ এই মামলায় ফরিয়াদী পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, এবং ছোটরাণীর তরফ হইতে একখানি চিঠিতে এসিষ্ট্যাণ্ট

ম্যানেজারকে তাঁহার কাজের জন্য এবং এই মামলার সাফল্যের জন্য প্রশংসা করা হইয়াছে, ইহা তিনি জানেন না দেখিয়া ঐ কথার প্রতিবাদ করা ভিন্ন, এই মামলায় তাঁহার আর বিশেষ কিছু করিবার ছিল না। এই মামলায় আসামীকে বাদী নিশ্চয়ই সমর্থন করিয়াছিলেন। আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, 'দার্জ্জিলিংয়ে কুমারকে আশু ডাক্তার বিষ খাওয়াইয়াছিলেন' বলিয়া উক্ত পুস্তিকায় লেখা হইয়াছে। সাক্ষ্য প্রমাণে একটি ক্ষেত্রে এমন কি আশু ডাক্তারও ভুলিয়া যান। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, পি, ঘোষের এজলাসে এই মামলার একবার বিচার হয়। ইহার পর আবার আর একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, এম, ঘোষের এজলাসে এই মামলার বিচার হয়। ঢাকাতেই এই বিচার হয়।

এই মামলায় ফরিয়াদী পক্ষে দারোগা আবদুল হামিদ সাক্ষ্য দেয়। জেরায় সে বলে—

"একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে যাই এবং সেখানে গিয়া দেখি যে, সন্ন্যাসী দ্বিতীয় কুমার কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য তথায় এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার মোহিনীবাবু, রায় সাহেব জে, এন, বাঁড়ুয্যে, আশু ডাক্তার, গৌরাঙ্গবাবু (সাব রেজিষ্ট্রার) এবং আরও অনেকে উপস্থিত আছেন। সন্ন্যাসীকে বহু প্রশ্ন করা হয়। আশু ডাক্তার প্রশ্ন করেন, আপনি যদি কুমার হন, তবে দার্জ্জিলিংয়ে কে গুলি করিয়া একটি পাখী মারিয়াছিল, তাহার নাম নিশ্চয়ই বলিতে পারিবেন, ইহা সত্য যে, কুমার উত্তর দেওয়ার আগে, সাব রেজিষ্ট্রারের নিকট ঐ লোকটির নাম বলিবার জন্য আশু ডাক্তারকে কোন কোন ব্যক্তি বলেন। তদনুসারে আশু ডাক্তার সাব্ রেজেষ্ট্রারের নিকট ঐ লোকটির নাম বলেন, সন্ন্যাসী ইহার পর আশু ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং খুব সম্ভব বলেন যে, হরিসিংহ নামে এক ব্যক্তি সেই পাখীটি মারিয়াছিল। গৌরাঙ্গবাবু তখন বলেন যে, আশুডাক্তার বীরেন্দ্র বাঁড়ুয্যের নাম বলিয়াছিলেন। পরে আমি গৌরাঙ্গ বাবুর নিকট শুনিয়াছি যে, এ সম্পর্কে পরে খোঁজ করা হইয়াছিল, এবং সন্ন্যাসীর উত্তরই ঠিক হইয়াছিল। বীরেন্দ্র বাঁড়ুযোকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। **তিনি স্বীকার করেন যে, সাধুর কথাই ঠিক।**

ইহা মূল প্রমাণ নহে। তিনি বলিয়াছেন যে, তাহার এখন যাহা স্মরণ আছে তাহা এই যে, রাজবাড়ীর আঙ্গিনায় কোন মাঠে—জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ী। রাজবাড়ীর ভিতরে বলিয়াছেন—কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্ম্মচারী-বৃন্দ এবং অন্যান্য ভদ্রলোক সমবেত হন, এবং সন্ন্যাসীকে তাহাদের মধ্যে একজন

প্রশ্ন করেন, কে প্রশ্ন করেন সাক্ষীর তাহা স্মরণ নাই, কিন্তু তিনি বলেন, ‘সন্ন্যাসী যদি কুমার হন, তাহা হইলে দার্জ্জিলিংএ কে পাখী শিকার করিয়াছিল তাহা তাঁহার বলিতে পারা উচিত।’ তিনি ইহাও বলেন যে, এখন তিনি বিস্তৃত-কাহিনী ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মানহানির মামলায় তিনি ইহা বলিয়াছিলেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা তাহারই কথা, এবং তাহা সত্য—যদিও এখন তিনি তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। বাজবাড়ীর মাঠে যে ঐ ঘটনা হয়, তাহা তাঁহার স্মরণ আছে। তিনি ইহাও বলেন যে, সমস্ত যায়গাটাকেই রাজবাড়ী বলা হয়, এবং যদি তিনি বলিয়া থাকেন যে, ঐ ঘটনা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে ঘটিয়াছিল তাহা সত্যই হইবে।

ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, ঐ উপলক্ষে পাখী শিকারের কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, সাক্ষী ইহা শুনিয়াছিল; কিন্তু আশুবাবু—যিনি দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন এবং যিনি ঐ ঘটনার দিন বেলা ১১টার পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন যে, লোকটী (সাধু) একজন জাল ব্যক্তি (একজিবিট ৩৯৮)—তিনি এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহা তিনি (সাক্ষী) বলিতে চাহেন না। এই দিনের ঘটনা এবং পাখী শিকারের প্রশ্ন সম্পর্কে আর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছে। তাহার নাম উমেদালী ভুঞা এবং তাহার বাড়ী ভাড়ালিয়া। এই ব্যক্তির নাম রিপোর্টে উল্লেখ আছে (বাদীপক্ষের ২৬নং সাক্ষী)। সে সাক্ষ্যদানকালে এই বিষয়ে নির্দ্দিষ্টভাবে কিছু বলে নাই। কিন্তু জেরায় মিঃ চৌধুরী, আশুডাক্তার যে পাখী শিকারের প্রশ্ন করেন তাহা বাহির করেন।

বাদীকে এইদিনের কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে এই ভাবে প্রশ্ন করা হয়,—

(১) বাদীকে হিন্দীতে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি নাম এবং পিতার নাম বলেন।

(২) বাদীকে তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি তাহা বলিতে পারেন না; তাহাকে আরও প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইলে তিনি (জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী) এবং তাঁহার পরিবারের লোক বলেন, সাধু এখন আর কোন প্রশ্নের উত্তর দিবেন না,—উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সব কথা বলিবেন।

(৩) পরদিন পুলিশ সাহেব এবং রায় সাহেব ও কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারী আসিয়া বাদীকে কয়েকটী প্রশ্ন করেন; কিন্তু তিনি তাহার উত্তর দিতে পারেন নাই।

তাঁহাদিগকে বলা হয় যে, সরকার কর্ত্তৃক আহূত কোন সভা ডাকা না হইলে, তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত নহেন।

রায় সাহেবের বাদীকে প্রশ্ন করিবার কথা ছিল, কিন্তু যখন আপনারা জানিতে পারিলেন যে, মোহিনীবাবুও উপস্থিত থাকিবেন, তখন আপনারা বাদীর সহিত তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দেন না।

৬ই তারিখে যে সব বিষয় বলা হইয়াছে তাহা প্রমাণিত হয় নাই; কিন্তু রায় সাহেব ঐ তারিখের কথা সাবধানতার সহিত বাদ দিয়াছেন। অতঃপর তিনি ৫ই মে তারিখের কথাই বলিয়া আসিতেছেন, এবং তিনি ৮ই তথায় যান—মোহিনীবাবু ঐ তারিখ দিয়াছেন।

ডাক্তার আশু কি বলিয়াছেন ?

তারপর আশু ডাক্তার সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসেন। তিনি এই সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই, "আমি বাদীকে একবার রেলওয়ে ষ্টেশনে, আর একবার ১লা বৈশাখ কোন 'চা পার্টিতে' এবং 'আরও বহুবার' দেখিয়াছি। তিনি বাদীকে পাখী শিকার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেন নাই। তিনি জেরায় স্বীকার করিয়াছেন যে, ৫ই তারিখ বাদীর সহিত সাক্ষাতের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নাম রিপোর্টে আছে।

যে মানহানি মামলার কথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সেই মামলায় তিনি দুইবার সাক্ষ্য দিয়াছেন;—একবার মিঃ এস, পি; ঘোষের এজলাসে আর একবার মিঃ বি, এম, ঘোষের এজলাসে। উভয় আদালতেই তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি বাদীকে মাত্র দুইবার দেখিয়াছেন, একবার জয়দেবপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে (বাদীর আত্মপরিচয় প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে) এবং একবার জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার ও যোগেন ব্যানার্জ্জিও উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষী বলিয়াছেন যে, ঐ সময় সন্ন্যাসী বলেন নাই যে, তিনি মেজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ। দার্জ্জিলিংএ পাখী কে শিকার করিয়াছে, এই প্রশ্নও তিনি তাহাকে করেন নাই। সাব রেজিষ্টার গৌরাঙ্গবাবুর কাণে কাণে তিনি তাহার নাম বলিয়াছেন কি না, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই। (একজিবিট ৩৫৯ (২) ও একজিবিট ৩৩৫ (১২)) ঐ দিনের কথা সম্পর্কেই তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি একবার মাত্র জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রশ্ন করিবার কথা এবং এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার ও অবশিষ্ট লোকের উপস্থিতির কথা অস্বীকার করিয়াছেন।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, তিনি ৫ই তারিখের ঘটনা সম্পর্কে দুই রকমের বিবৃতি দিয়াছেন, এবং তাহা এড়াইবার জন্যই দুইবারের বেশী গিয়াছিলেন। এই সকল কথা বলেন, যে তারিখে এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার ও গৌরাঙ্গ বাবু উপস্থিত ছিলেন তাঁহাকে সেই তারিখের সহিতই যুক্ত রাখা হইয়াছে। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, তিনি বাদীকে মাত্র দুইবার দেখিয়াছেন—(একবার রেলওয়ে ষ্টেশনে) ইহা বলিয়াছেন কেন, তখন তিনি বলেন যে, 'দেখা' অর্থে তিনি দুইবার বাদীর সঙ্গে 'কথা' বলিয়াছেন, ইহা বলিতে চাহিয়াছেন ; এবং যখন দেখা গেল যে, 'দেখার' অর্থ 'কথা' করা হইলে, ৫ই মে (সেদিন এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার ও গৌরাঙ্গবাবু উপস্থিত ছিলেন) তিনি বাদীর সহিত কথা বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়, তখন তিনি বলেন যে, 'দেখা'র অর্থ 'কথা' বলা ইহা তিনি বলিতে চাহেন নাই।

মেজকুমারের মৃত্যু সম্পকে এই সাক্ষী যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, সাক্ষীর জবানবন্দী তাহার গুরুত্ব কতটা লাঘব হইয়াছে ইহা তাহার একটা সামান্য দৃষ্টান্ত মাত্র। তিনি চা-পার্টির কথা উল্লেখ করেন নাই। পক্ষান্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি বাদীকে—১লা বৈশাখ যেদিন বাদী জয়দেবপুর হইতে চলিয়া যান—রেলওয়ে ষ্টেশন দেখিয়াছেন।

মোহিনীবাবু, রায় সাহেব ও ফণীবাবু কি বলেন

৫ই তারিখে কি ঘটিয়াছিল তৎসম্পর্কে মোহিনীবাবু, রায়সাহেব এবং ফণীবাবু সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বাদীকে তাঁহার নাম ও পিতার নাম জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল এবং তিনি তাহা ঠিকমত উত্তর দেন ; কিন্তু রাজার মৃত্যু কবে হইয়াছিল এবং রাণীর (মাতার) কোথায় মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারেন নাই। এই সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বাদী ফোঁপাইতে আরম্ভ করেন। এই ফোঁপাইবার কথা রিপোর্টে উল্লেখ নাই। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকেও এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় নাই। এই তিনজন সাক্ষী, আশুবাবু পাখী শিকার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করিয়াছেন, বলিয়া অস্বীকার করেন, এবং প্রত্যেকেই ১লা বৈশাখের চা-পার্টির কথা স্বীকার করেন। বাদীর প্রথম জয়দেবপুর আগমন উপলক্ষে কি হইয়াছিল ফণীবাবু তাহার একটি বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ঐ সময় জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী কাঁদেন নাই, এবং তিনি ও সত্যভামা দেবী সন্ন্যাসীকে

প্রণাম করেন। রায় সাহেব বলিয়াছেন যে, এই কাহিনী তিনি ফণীবাবুর নিকট হইতে শুনিয়াছেন। অবশ্য কখন তিনি ইহা শুনিয়াছিলেন তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে চা-পার্টিতে বাদী পাঞ্জাবী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া বলা হইয়াছে। সেই চা-পার্টির কাহিনীর ন্যায় উপরোক্ত সমস্ত কাহিনীই মিথ্যা। আমি সাব্যস্ত করিতেছি যে, এই তারিখেই বাদীকে পাখী শিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইয়াছিল,—যাহা গৌরাঙ্গ বাবু ও আবদুল হাকিম বলিয়াছেন, এবং বাদী তাহার উত্তর দিয়াছিলেন—সে উত্তর সত্যই অথবা মিথ্যাই হউক, বীরেন্দ্রকে এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হইয়াছিল বলিয়া সে অস্বীকার করে। হরিসিংএর নাম নিশ্চয়ই উল্লেখ করা হইয়াছিল। হরি সিং নিশ্চয়ই দার্জ্জিলিং গিয়াছিল, যাহা আশুবাবু পূর্ব্বে অস্বীকার করিলেও এখন স্বীকার করেন।

ইহার পর আসে মোহিনীবাবুর ৮ই মে তারিখের বিবরণ। তিনি ৬ই এবং ৭ই যান নাই। কারণ বলা হইয়াছে যে, ৬ই তারিখ পুলিশ সাহেব আসিয়াছিলেন।

এই তারিখে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা এই যে, যোগেন্দ্রবাবু তাহার সঙ্গে ছিলেন, এবং তিনি সাধুর সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ভিতরে যান, ও বাহিরে আসিয়া বলেন যে, তাহাদের মধ্যে বাজে আলাপ হইয়াছে,—কাজের কথা কিছু হয় নাই। যোগেন্দ্রবাবু এই কথা সমর্থন করেন এবং বলেন যে, মোহিনী ঘোষ নামক এক ব্যক্তি যে একটা খাতায় লোকের স্বাক্ষর লইতেছিল, সে আসিয়া বলে যে, কুমার তাহাকে দেখিতে চাহেন, তিনি ভিতরে যান এবং সাগরের শয়ন কক্ষে যাইয়া সাধুকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, বুদ্ধুর সঙ্গে দেখিতে পান এবং তিনি (যোগেন্‌বাবু) জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি এতদিন কেন আসেন নাই, দার্জ্জিলিং হইতে তিনি, কোথায় গেলেন, তাহা কেন লিখিলেন না এবং সাধু যে সব মন্দির দেখিয়াছেন সেইসব মন্দিরের কথা বলেন। অপর কথা সম্পর্কে বলেন, 'পিছু বলবেন', তিনি আরও বলেন যে, সাধুরা চিঠিপত্র লেখেন না।

এই দুইজন সাক্ষী আরো বলেন যে, ৯ই তারিখেও তাঁহারা একবার তথায় যান। ঐদিন তাঁহারা দেখিতে পান যে, একজন মুসলমান বক্তৃতা দিতেছে, এবং সুধন্য নামক এক ব্যক্তি রাণী, আশুবাবু, সত্যবাবু এবং যোগেন্‌বাবুকে গালাগালি করিয়া গান গাহিতেছে। তাহারা বক্তৃতা ও গানের মাঝখানে চলিয়া আসেন। ফণীবাবুও এই তারিখের কথা বলিয়াছেন। এই সঙ্গে তিনি

তিনি বলেন যে, তিনি পরিবারের লোক দিগকে তাহাদের অসঙ্গত কার্য্যের জন্য অনুযোগ দেন। তিনি এই কথাও বলেন যে, তাহাদের রাণীদের নিকট এই সম্পর্কে লেখা উচিত। ৮ই তারিখের কাহিনী সমর্থনের জন্য বিবাদী পক্ষ্য ৬ই তারিখের রিপোর্টের ন্যায় মোহিনী বাবুর লিখিত একটী রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। ঐ রিপোর্ট বিলম্বে কেন দাখিল করা হইল, বিবাদী পক্ষ তাহার কোন কৈফিয়ৎ দেন নাই। আমি ঐ রিপোর্ট গ্রহণ করিতে অস্বীকার করি, কারণ জালিয়াতির অভিযোগ আনা হইয়াছিল এবং সত্য সত্যই এই মামলায় জালিয়াতি হইয়াছে। ঐ দুই দিনের ব্যাপার সম্পর্কে বাদীকে আবশ্যক কোন প্রশ্ন করা হয় নাই। যদি একমাত্র ঐ দুইদিনের ঘটনার উপরই পরিবার সম্পর্কে বাদীর অজ্ঞতা নির্ভর করে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, উহা কৌঁসুলীর অথবা তাহার মক্কেলের পূর্ব্বে খেয়াল হয় নাই।

আমি সাব্যস্ত করিতেছি যে, ৬ই মে তারিখের রিপোর্টে প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। ৬ই মে তারিখে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের যে মনোভাব ছিল, সেই মনোভাবের সহিত যাহাতে খাপ খায়, সেইভাবেই ঐ রিপোর্ট লেখা হয়; এবং পরে ঐ সম্পর্কে যেসব আদেশ দেওয়া হয়, তাহাতে এই বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আমার মনে হয় যে, ৬ই মে তারিখেই ইহা লইয়া বিতর্ক হয়। আমি স্বীকার করি, অন্ততঃ ১৯১১ সালের ৬ই মে এই বিতর্ক উঠিয়াছিল, উহার পর নহে। এই মামলাটি যেরূপ তাহাতে এই বিতর্ক ৪ঠা তারিখেও অর্থাৎ যেদিন বাদী আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, সেই দিনও আরম্ভ হইতে পারে; কারণ যে সকল লোক মারা গিয়াছে এবং যাহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে আনা সম্ভব নহে, তাহাদের উক্তি প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু তাহাদের আচরণ প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে। কি ঘটিতেছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য আমি যদি দুই একটি ঘটনা বর্ণনা করিও, তবুও এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। কিন্তু এই সম্পর্কে একটী কথা বলা আবশ্যক। মিঃ চৌধুরী বলিয়াছেন, ৬ই তারিখে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কোয়ারী উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার স্থলে শ্রীযুত কিরণ ঘোষ নামক আর একজন সাক্ষী আমদানী করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঘোষ ঢাকায় কো-অপারেটিভ সোসাইটিসমূহের ইন্সপেক্টর ছিলেন, এখন তিনি গবর্ণমেণ্ট প্রেস ডিপোর ম্যানেজার। তিনি বলেন, তিনি কালীগঞ্জে ছিলেন, এবং কালেক্টর মিঃ লিণ্ডসেও তথায় উপস্থিত ছিলেন। বেলা ৯টার সময় মিঃ লিণ্ডসের নিকট একজন লোক একখানা শিলকরা চিঠি দেয়। মিঃ লিণ্ডসে মিঃ চন্দ নামক একজন ডিপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে

জয়দেবপুরে গিয়া সাধু সম্পর্কে তদন্ত করিতে বলেন। তদনুযায়ী সাক্ষী ও মিঃ টমাস রঞ্জন (তমসারঞ্জন) তাঁহার সহিত জয়দেবপুরে যান—যদিও তাঁহাদের জয়দেবপুর যাবার কোনও কথা ছিল না। তাঁহারা জয়দেবপুরে গিয়া সাধুকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সাধু উত্তর দিতে পারিলেন না। বাদীকে এই সাক্ষাৎকারের কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই; জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকেও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই; কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে যাহা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ইহা তাহার বিকাশ বিশেষ। লণ্ডনে মিঃ লিণ্ডসেকেও এ বিষয় কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। এই সময় জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীও কোনও কোনও কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া, বিবাদীপক্ষ বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে সত্য নহে, তাহা মোহিনীবাবুর সাক্ষ্য হইতেই প্রমাণিত হয়। মোহিনীবাবু বলিয়াছেন, উক্ত পত্র বেলা ৯টার সময় জয়দেবপুরে মুসাবিদা করা হইতেছিল। অথচ কালীগঞ্জে মিঃ লিণ্ডসের নিকট ঐ পত্র প্রেরণ করা হইলে, তিনি একজন ডি, এস, পিকে তদন্ত করিতে প্রেরণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, এই ডি, এস, পি ভাওয়াল রাজপরিবার সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না। ডি, এস, পি, প্রভৃতি যে জয়দেবপুর গিয়াছিলেন বলিয়া বলা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে মিঃ গুপ্ত বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন, সুতরাং পত্র কখন মুসাবিদা করা হইতেছিল, সেই সম্পর্কে তিনি ভ্রান্ত ধারণা করিবেন, তাহা নহে।

এদিকে ৪ঠা মে হইতে ৭ই জুন পর্য্যন্ত অর্থাৎ বাদী ঢাকা যাত্রা করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যহ শত শত লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। তাহাদের অধিকাংশই ভাওয়াল এষ্টেটের প্রজা; ঢাকা এবং অন্যান্য স্থান হইতেও বহু লোক গিয়াছিল। যাহারা বাদীকে দেখিতে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতেই বাদী পক্ষ ও বিবাদী পক্ষ তাহাদের অধিকাংশ সাক্ষী মান্য করিয়াছেন। তাহাদের অধিকাংশই বাদীকে ৪ঠা মে ও ১৫ই মে তারিখের মধ্যে দেখিয়াছে।

জয়দেবপুরে বিরাট সভা

১৫ই মে তারিখে জয়দেবপুরে বড় সভার অধিবেশন হইয়াছিল। গোবিন্দ বাবুর প্রস্তাবক্রমে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, গোবিন্দবাবুর পুত্রেরা এবং সাধুর অন্যান্য সমর্থকগণ নোটিশ প্রচার করিয়া ও সংবাদ প্রেরণ করিয়া এই সভার আয়োজন করেন। সভা কবিরার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সাধু সমবেত জনতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখা দিবেন যেন তাঁহারা তাঁহাকে মেজকুমার বলিয়া গ্রহণ করেন; (বাদী পক্ষের ২৮৮ নং সাক্ষী) একটু পরেই আমি এই সভা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি। যাহা হউক, প্রত্যহ যে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত

পর্য্যন্ত বহু লোক যে সাধুকে দেখিতে যাইত, তাহা বিবাদী পক্ষ অস্বীকার করেন নাই, এবং তাহা থানার জেনারেল ডায়েরীতেও লেখা আছে। ডায়েরীর এক স্থানে দেখা যায়—১০।৫।২১—বেলা ৩টা। গত ২৪ ঘণ্টা বৃষ্টি হয় নাই। জয়দেবপুর রাজবাড়ীতে যে সাধু মেজকুমার বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি এখনও তথায় আছেন। দূর-দূরান্তর হইতে বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছে। জনসাধারণের অধিকাংশই তাঁহাকে মেজকুমার বলিয়া বিশ্বাস করে। এই এলাকায় কোনও দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। চাউলের দর টাকায় ছয় সের।

১১।৫।২১ আকাশ পরিষ্কার। এই এলাকায় কোন দুর্ঘটনা বা সংক্রামক রোগ হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যায় নাই। জয়দেবপুরে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। নানাস্থান হইতে বহু লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য যাতায়াত করিতেছে। তাহার মধ্যে ১৫ আনা লোকই এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, তিনি দ্বিতীয়কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী। সাধারণের স্বাস্থ্য ভাল নয়। আউশ ধানের অবস্থা মন্দ নয়। মোটা চাউল টাকায় ৬ সের করিয়া বিক্রী হইতেছে। একজিবিট ২৩১ (২)। ১৩।৫।২১ বৈকাল ২-২০ মিঃ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আগামী রবিবার প্রজাসাধারণের একটি বড় সভা হইবে। সভার উদ্দেশ্য, যে সন্ন্যাসী নিজেকে কুমার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাকে কুমাররূপে গ্রহণ করা। মনে হয় বহু জনসমাগম হইবে। একজিবিট ২৩১ (৩)।

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ১৪ই ও ১৫ই কি হইয়াছে। তিনি বুদ্ধু বাবুর গৃহের বারান্দায়, অথবা চটানে আমগাছের নীচে একটি আরাম কেদারায় বসিয়া থাকিতেন এবং যাহাতে জনতা তাঁহাকে ভালভাবে দেখিতে পারে তজ্জন্য তাঁহার চেয়ার মাঝে মাঝে একটা চৌকীর উপর বসাইয়া দেওয়া হইত। একজন সাক্ষী (৮২নং বাদী পক্ষের সাক্ষী) বলিয়াছে যে, লোকে যে তাঁহাকে দেখিতে আসিত, তাহার কারণ, মরা মানুষ জীবন পাইয়াছে একথা না দেখিয়া বিশ্বাস করা যায় না। আর একজন সাক্ষী বলিয়াছে, সকলের মুখেই এই কথা 'কুমার আসিয়াছেন' অন্যান্য অনেক সাক্ষীর মত একজন সাক্ষী বর্ণনা করিয়াছে—

"আমি তাঁহাকে সন্ন্যাসী বেশে চটানে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলাম, সেখানে ৫০০।৬০০ লোক ছিল। সেখানে কেবল একজন লোকেরই সন্ন্যাসীর বেশ ছিল, তিনিই কুমার। আমি তাঁহার শরীরের বর্ণ ও দেহের গঠন লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম"। একজন সাক্ষী (বাদীর সাক্ষী ২৪)

বলিয়াছেন যে, বাদী আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বাদী যখন আমাকে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেন, তখন ইনিই সেই লোক ইহা বুঝিতে পারিয়া আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছিল। বাদীপক্ষের ৫৫নং সাক্ষী বলিয়াছেন—"তাঁহার সহিত আমাদের কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই আমরা প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়াছিলাম, তিনিও কাঁদিয়াছিলেন। তাঁহার গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়াছিল।" মিঃ নীডহ্যাম তাঁহার রিপোর্টে যে দৃশ্য ও যে উচ্ছ্বাসের প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমি তাহাই সুস্পষ্ট করিবার জন্য উপরের কথাগুলি উদ্ধৃত করিলাম।

দিনের পর দিন এইরূপ চলিতেছিল। এইরূপ চিহ্নাদি প্রদর্শন, একস্থানে বসিয়া থাকিয়া লোকদিগকে দর্শন দেওয়া, এই কান্না, সাধারণ লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলা,—এই ব্যাপারগুলি যে কুমার জনসাধারণ হইতে দূরে থাকিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে অসাধারণ আচরণ কি না তাহা নির্ণয় করিতে, এবং বাদীর সমস্ত আচরণের কথা বিবেচনা করিতে হইবে। তিনি শান্তভাবে মিঃ নীডহ্যামের নিকট যাইয়া এষ্টেটের দখল দাবী করিলেন না কেন? মিঃ চৌধুরী আমাকে এই প্রশ্নটার কথা বিবেচনা করিতে বলিয়াছেন, কুমার যদি সুশিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি আভিজাত্যগর্ব্বী ব্যক্তি হইতেন, (যাহা প্রমাণ করিবার জন্য মিঃ ঘোষালকে (কমিশনে) প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং কার্য্যতঃ বাদীকেও ঐ ভাবে জেরা করা হইয়াছিল) তাহা হইলে এই বিবরণের অনেকাংশই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইত এবং এই আচরণের অনেকটা অসাধারণ—এমন কি অবিশ্বাসী বলিয়া মনে হইত। বাদী অবশ্য ২৫ দিন পরে কালেক্টর মিঃ লিণ্ডসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। আমি আড়াই বৎসর ধরিয়া এই মামলা শুনিয়াছি। অধিকাংশ লোক তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানে, আমি সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে তাহা অপেক্ষা সম্ভবতঃ বেশী জানি। আমি তাঁহার সম্বন্ধে একটি ধারণা পাইয়াছি এবং আমি প্রথমে বলিব তিনি কি ধরণের লোক ছিলেন, এবং তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এই আচরণের কথা বিচার করিব। কিন্তু ধরা যাক্ যে, কুমারের একটি আঙ্গুলের ছাপ যদি পাওয়া যাইত এবং তাহা বাদীর আঙ্গুলের ছাপের সহিত মিলিয়া যাইত, তাহা হইলে আচরণের কোন কথাই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিত না। এখন কেবল কুমার কিরূপ ছিলেন, তাহা বিবেচনা করিলেই হইবে না। ১২ বৎসরের ভীষণ অভিজ্ঞতার পর (ঐ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া তাহাকে যাইতে হইয়াছে ইহা ধরিয়া লইয়া) তিনি কিরূপ হইবেন তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে।

১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত এবং তাহার পরে ৭ই জুন তিনি জয়দেবপুর পরিত্যাগ

করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাকে দেখিতেছিল। ১৫ই তারিখ সভা হয়, ঐ তারিখে সত্যবাবু ও রায় বাহাদুর দার্জ্জিলিংএ মৃত্যু সম্পর্কে প্রমাণ গ্রহণ করিতেছিলেন। ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাদীর সমর্থনে প্রচারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। বিবাদী পক্ষ বলিয়াছেন যে, সংবাদপত্রের লেখা ছাড়াও পুস্তক পুস্তিকা প্রভৃতির সাহায্যে জ্যৈষ্ঠমাসে অর্থাৎ ১৫ই মের পরে প্রচার চালানো হইয়াছিল। ১৫ই পর্য্যন্ত কি ঘটিতেছিল উহা সহজেই বুঝা যায়, মিঃ নীডহ্যামের রিপোর্ট হইতেও তাহা বুঝা যায়। ৩০শে এপ্রিল বাদী দ্বিতীয় বার জয়দেবপুর যাওয়ার সময় হইতে ইহা আরম্ভ হইয়াছিল। ৩০শে এপ্রিল বাদী দ্বিতীয় বার জয়দেবপুর যাওয়ার সময় হইতে ইহা আরম্ভ করা হইয়াছিল। ১৫ই মে'র পরে গদ্যে ও পদ্যে লিখিত বই বাহির হইয়াছিল। আমার নিকট যে সমস্ত বই দাখিল করা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ঐ সকল বইয়ের মধ্যে বেশীর ভাগ বিবাদীদের চেয়ে বাদীকে সমর্থন করিয়া লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত স্থানে অর্থাৎ ঐ সভার কথা আলোচনার পরে এই প্রচার কার্য্যের কথা আরও একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

রাজবাড়ীর সম্মুখস্থ যে চটানের বর্ণনা আমি পূর্ব্বে দিয়াছি, সেইখানে এই সভা হয়। সভায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। বরিষাবর একজন বড় তালুকদার শ্রীযুক্ত আদিনাথ চক্রবর্ত্তী 'নামে মাত্র' সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। আমি 'নামেমাত্র' বলিলাম এইজন্য যে, উহা কুমারকে দেখিবার জন্য বিপুল জনসমাগম মাত্র ছিল। সমস্ত স্থান হইতেই লোক আসিয়া বুদ্ধ বাবুর বাড়ী হইতে রাজবাড়ী পর্য্যন্ত জনসমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছিল। **ইহার জন্য স্পেশাল-ট্রেণ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সকাল বেলা হইতেই লোক আসিয়া জড় হইতেছিল। পুলিশ রেজিষ্ট্রার অনুসারে প্রায় ১০ হাজার লোক আসিয়াছিল।** এই অনুমান অতিরঞ্জিত নহে বলিয়াই মনে হয়। জেরায় বিবাদী পক্ষ ইহাই বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, রাজবাড়ী রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জনতার বিপুলতার একটা আঁচ দিবার জন্য বলা হয়, 'চিড়ার সের এক টাকা হইয়াছিল!' বিবাদী পক্ষের একজন সাক্ষী কমিশন জবানবন্দীতে এই সভা ও ইহার বিশালতার কথা স্বীকার করিয়াছেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, বহু সাক্ষী, যাহারা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, এবং বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, বাদী ও বুদ্ধ বাবু হাতীতে চড়িয়া আসিয়া চটানের চারিদিকে ঘুরিতেছিলেন। সমবেত লোকেরা তাঁহাকে কুমার বলিয়া ডাকিয়া অভিনন্দিত করিতেছিল।

বাদীপক্ষের অন্যতম সাক্ষী মিঃ হরেন্দ্র ঘোষ তখন ঢাকার যে অঞ্চলে জয়দেবপুর পড়ে, সেই অঞ্চলের মহকুমা হাকিম ছিলেন। তিনি কার্য্যোপলক্ষে ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভা উপলক্ষে নহে। একটা মামলা সম্পর্কে তিনি হলপ করিয়া বলিয়াছেন যে, বাদী প্রায় ৪টার সময় সভায় আসিয়াছিলেন। অন্যান্য সাক্ষীরাও ঐরূপ বলিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া 'কুমারের জয়' বলিয়া ধ্বনি হইয়াছিল। ভোটের কোন প্রশ্ন থাকিলে কোন সভা বিধানঅনুযায়ীগঠিত হয় নাই বলিয়া, যেমন সভার উপর আক্রমণ চালানো হয়, তেমনভাবে বিবাদী পক্ষ ঐ সভার উপব আক্রমণ কেন চালায়াছিলেন, তাহা আমার পক্ষে বুঝা কঠিন হইয়াছিল। তাহাদেব শুনানীর প্রায় শেষে, বিবাদীপক্ষের অসংখ্য সাক্ষী একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে ঐ সভার কথা উল্লেখ করার পর ৪০৭ নং সাক্ষী যখন সাক্ষ্য দিতেছিলেন তখন তাঁহারা এই কাহিনী উপস্থিত করেন যে, বাদী ঐ সভায় আসেন নাই, এবং উহা ৩৷৷০টা এবং ৪টার সময় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই সাক্ষী এষ্টেটের একজন ভৃত্য। তাহার সাক্ষ্য দ্বারা বহু সাক্ষী, তন্মধ্যে বিবাদীপক্ষেব জগদীশ ও বহু ভদ্রলোকও আছেন। বলিয়াছেন যে, বাদী সভায় আসিয়াছিলেন এবং জনতার জয়ধ্বনি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, তাহা বাতিল হইয়া যাইতে পাবে না। ৪০৭নং সাক্ষীব পূর্ব্বে বিবাদীপক্ষের সকলেই, তাঁহারা সভা দেখেন নাই, তাঁহাদের অসুখ ছিল, তাঁহারা কোন কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র ছিলেন, অথবা কেবল শেষ দিকটা দেখিয়াছিলেন ইত্যাদি বলিয়া সভার কথা এড়াইতেছিলেন (বিবাদীপক্ষের ১৯, ৪০, ৪৮, ৮৪, ১০০, ১০৮, ২২০, ৩৫৬, ৩৭৫, ৩৭৯নং সাক্ষী)। একজন বেলা ১২টার সময় চটানের মধ্য দিয়া যাইয়াও কোন লোকই দেখিতে পান নাই। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে বুঝা যায় যে, তখন উহা জনপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

জনতার জয়ধ্বনি পরিচয় নির্ণয়েব কোন প্রমাণ নহে। কিন্তু জয়ধ্বনির অভাব থাকিলে উহা পরিচয় নির্ণয়ের প্রতিকূল প্রমাণ হইত। কিন্তু এই কাহিনী একেবারেই অমূলক বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেয় যে, কলিকাতা বা ঢাকার কয়েকজন লোকমাত্র বাদীকে দাঁড় করাইয়াছিলেন। সভায় পূর্ব্বে এবং পরে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতেই ঐ কথা বাতিল করিয়া দেয়। ইহা বলাও নিরর্থক যে, বাদী একজন সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারার লোক। কয়েকজন লোক ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে দাঁড় করাইয়াছেন, এবং প্রজারা তাঁহাকে মোটেই চিনিতে পারে নাই। পরে দেখা যাইবে যে, তাঁহারা তাঁহাকে নজর ও খাজানাস্বরূপ প্রচুর টাকা দিয়াছে। নায়েবদের উপর যে আদেশ জারী করা হইয়াছিল, (এক-

জিবিট ৩৫৩ (১)) তাহাতে হয়ত তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, কোন প্রজা বা অন্য কেহ তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে না। বিবাদী পক্ষ আদালতের কাছে এই প্রার্থনা জানাইতেছিলেন যে, বাদী পক্ষেরা সাক্ষ্য উপস্থিত করা বন্ধ করিয়া, সাক্ষীর স্রোত বন্ধ করা হউক, তাহাতে আমি মোটেই আশ্চর্য্য হই নাই। সঙ্কীর্ণ ষড়যন্ত্রের কাহিনী ভিত্তিহীন বলিয়া পরিগণিত হইতে বসিয়াছিল। যে সকল সাক্ষী বাদীকে ভিন্ন লোক বলিয়া দেখিয়া একই ব্যক্তি বলিতেছিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে কি বলা যাইবে তাহাও ক্রমেই কঠিনতর সমস্যা হইয়া উঠিতেছিল।

আনন্দচন্দ্র রায়

এই সভার দিনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, ঢাকার প্রসিদ্ধ উকীলবাবু আনন্দচন্দ্র রায়—যিনি ঘনিষ্ঠভাবে রাজ পরিবারকে জানিতেন এবং যাঁহাকে কুমারেরা কাকা বলিয়া ডাকিতেন; তিনি আসিয়াছিলেন এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল বাদীর সহিত নির্জ্জনকক্ষে ছিলেন। তিনি যখন বাহির হইয়া আসেন, তখন সকল ভদ্রলোক ঐ বাড়ী আসিয়া জড় হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে কিছু বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যে, সন্ন্যাসীই কুমার। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই মত বিরোধের আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া উহাকে প্রমাণ বলিয়া ধরা হয় নাই—যদিও এই মামলা তারিখের বয়সাধিক্যের জন্য শ্রীযুক্ত আনন্দ রায়ের সাক্ষ্য দিবার ক্ষমতা ছিলনা। কিন্তু ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, তিনি বাদীর একজন খুব বড় সমর্থক ছিলেন। মিঃ লিণ্ডসেও তাঁহার একখানা চিঠিতে এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। (এক্জিবিট ৪৩৫) বিবাদীরাও বাদীর গুরুর আগমন সম্পর্কে একটি ব্যাপারের আলোচনা-প্রসঙ্গে এই ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত আনন্দরায় কি করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ বিবরণ নিম্নলিখিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। (বাদী পক্ষের ৯৯৭, ৯৮৫, ৮৫২, ৮০৬, ৯০৯, ৯৫৯, ৯৬১, ৯৬৭, ৬৩নং সাক্ষী) এই সম্পর্কে ইহাদের সাক্ষ্য আমি মানিয়া লইয়াছি। ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও ঢাকার একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক মিঃ সতীশচন্দ্র দের সাক্ষ্যের কথা আমি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিব।

রাজ-জামাতা ব্রজলাল

এই দিনের সহিত আরও একটি ব্যাপারের যোগ আছে। তাহা এইরূপ, —রাজার কনিষ্ঠা কন্যার স্বামী ব্রজলালবাবু ঐ দিন বাদীকে দেখিতে আসিয়া-

ছিলেন। পূর্ব্বে সংবাদ দিলেও (যদিও এ ব্যাপারে সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না), তিনি বা তাঁহার স্ত্রী পূর্ব্বে দেখিতে আসেন নাই, তাঁহার স্ত্রী সভার দিন তিনেক পরে বাদীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। (পরবর্ত্তী বিবরণ দেখে মনে হয় যেন তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বকই যান নাই।) অথচ কোন পক্ষে তাঁহাদের সাক্ষ্যও গৃহীত হয় নাই। পরে উল্লিখিত তাঁহাদের আচরণ;-হইতেই তাঁহারা কেন যান নাই, বা কেন সাক্ষ্য দিতে পারেন নাই, তাহা বুঝা যাইবে।

সাধুর প্রতি ব্যবস্থা

১৫ই তারিখে—বাঙ্গালা তারিখ ১লা জ্যৈষ্ঠ সভা হইয়াছিল। বাদীকে অভিযুক্ত করা যায় কি না, তৎসম্পর্কে ১২ই তারিখ ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিলের অভিমত চাওয়া হইয়াছিল। এই অভিমতের মধ্যে ১৩।৫।২১ তারিখ দেওয়া আছে। (একজিবিট ৩০৭) উহাতে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, প্রতারণা দ্বারা সম্পত্তি প্রদানের প্ররোচনা না দেওয়া পর্য্যন্ত কোন অপরাধ হইবে না; এবং যে পর্য্যন্ত এইরূপ অনুমান করিবার কারণ থাকিবে যে, প্রজারাই নিজেদের সন্দেহবশে ঐরূপ প্ররোচনা দিতেছে। ততদিন অভিযোগ আনা সঙ্গত হইবে না। এই অভিমত দেওয়ার পরে বহু ব্যাপার ঘটিয়াছে, কিন্তু তাঁহার জয়দেবপুর গমন নিষিদ্ধ করা ব্যতীত, তাঁহাকে কোনরূপে অভিযুক্ত করা হয় নাই। ১০ই মে মিঃ লিণ্ডসে বাদীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট রচনা করেন। সরকারী উকীল রায় বাহাদুর, কলিকাতা যাইয়া সত্যবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার সহ তাঁহারা উভয়ে মৃত্যু-সম্পর্কে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। ১৫ই তারিখ তাঁহারা দার্জ্জিলিংয়ে ছিলেন। ১৬ই তারিখ বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ কুমারের পিতামহী রাণী সত্যভামার নিকট তাঁহার (রাণী সত্যভামার) ১৯১৭ সালের অনুসন্ধান সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তিনি যাহাতে সাধুর সৌন্দর্য্যে ভুল করিয়া না বসেন, তজ্জন্য সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ তিনি পরিবারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া, তিনি যাহা বলিবেন, অধিকাংশেই তাহাই বিশ্বাস করিবে। (একজিবিট ২৬৬)। পরিচয় নির্ণয়ে এই চিঠি কোন প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইতে পারে না। এরূপ কোন প্রমাণও নাই যে, মহারাজা ও সরকারী উকিলের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যদিও তখন তাঁহারা দুইজনেই দার্জ্জিলিংএ ছিলেন। ইহারও কোন প্রমাণ নাই যে, সাধু সম্পর্কে রাণী সত্যভামার মনোভাব প্রকাশের ফলেই তিনি

তাঁহাকে ঐভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। বাদী, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকও যথেষ্ট আসিতেছিল। ৫ই তারিখের পরে এষ্টেটের কোন সাধারণ কর্ম্মচারী সাধুর নিকট গিয়াছিল, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। কারণ সাধুর প্রতি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের মনোভাব কি, তাহা ৬ই তারিখেই সুস্পষ্ট-রূপে বুঝা গিয়াছিল বলিয়া রায় সাহে বলিয়াছেন, (বিবাদীপক্ষের ৩৯১নং সাক্ষীর সাক্ষ্য দেখুন।)

তাঁহাদের সকলেই ১৫ই মে তারিখের সভায় যান নাই। একজন কর্ম্মচারীর পিতা সভায় যাইবার জন্য টঙ্গী হইতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার পুত্রের বাসায় যান এবং তারপর আর বাহিরে আসেন নাই। (বিবাদীপক্ষের ২৮৩নং সাক্ষীর সাক্ষ্য) একজন কর্ম্মচারী হয়ত সভা দেখিতে গিয়াছিলেন এবং ইহা তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়া দাঁড়ায়। (একজিবিট ২০৮) ২৮শে মে তারিখে কালেক্টরের হুকুম আসে। হুকুমে বলা হয় যে, রেভেনিউ বোর্ড এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিবেন; যতদিন পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত না হয় যে, এই সাধুই মেজকুমার, ততদিন কোনও কর্ম্ম দ্বারা এই বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করিতে পারিবে না যে, সাধুই মেজকুমার (একজিবিট ২০৬)।

ভাওয়াল তালুকদার ও প্রজাসমিতি

এদিকে সাধু জয়দেবপুরেই থাকিয়া গেলেন। এবং "কুমারকে আইন সম্মত উপায়ে তাঁহার স্বাধিকার ও পদমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার" উদ্দেশ্যে টাকা তুলিবার জন্য "ভাওয়াল তালুকদার ও প্রজা-সমিতি" নামে এক সমিতি গঠিত হয়। ভাওয়ালের বিশিষ্ট তালুকদার হারবাইদের বাবু দিগিন্দ্র নারায়ণ ঘোষ ইহার প্রেসিডেণ্ট হন, এবং বাদীর অন্যতম প্রধান সমর্থক হইয়া দাঁড়ান। ১৯০৯ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে মেজকুমার এই ভদ্র লোকের জন্য একখানা দলিল সম্পাদন করেন, দার্জ্জিলিং যাত্রার পূর্ব্বে উহাই কুমারের শেষ দলিল। (একজিবিট ৯)। সমিতির কর্ম্মমণ্ডলী ছিল; ৪ঠা জুন সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। সমিতি চাঁদা সংগ্রহের জন্য লোক নিযুক্ত করে ও বহু টাকা সংগ্রহ করে; ১৯২২ সালের নবেম্বর মাসে (বাঙ্গালা কার্ত্তিক ১৩২৯) জয়দেবপুরে সমিতির শেষ সভা হয়, এবং তৎপর সমিতি ঢাকায় আফিস খোলে। তারপর "বাদী খাজানা আদায় আরম্ভ করিলে" সমিতির কাজ বন্ধ হইয়া যায়। বিবাদীপক্ষ স্বীকার করেন না যে, বাদী কখনও

খাজানা আদায় করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের কোনও প্রতিবাদ হয় নাই; দিগিন্দ্র বাবু ও জগদীশবাবুর সাক্ষ্য হইতেও বুঝা যায়, ঐ সকল কথা সত্য। জগদীশ ভাওয়াল তালুকদার ও প্রজাসমিতির সদস্য ছিলেন, কিন্তু বিবাদী পক্ষে কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

সভার তিন চারিদিন পর কুমারদের কনিষ্ঠা ভগিনী তড়িন্ময়ী দেবী, ঢাকা হইতে জয়দেবপুরে যান, তিনি ঢাকায় তাঁহার স্বামী উকিল ব্রজলাল বাবুর সঙ্গে বাস করিতেছিলেন, **তড়িন্ময়ী দেবী বাদীকে দেখিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে থাকেন। কনিষ্ঠা ভগিনী যেমন করে, তদ্রূপ তিনি বাদীর উরুদেশে মাথা রাখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি এতদিন কিরূপে বাড়ী ছাড়িয়া ছিলেন?"** (জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সাক্ষ্য ও মোক্ষদার কমিশন সাক্ষ্য) তাঁহার পরবর্ত্তী আচরণে এবং তাঁহার একটি কাজে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যদিও তিনি সাক্ষ্য দেন নাই, তথাপি তাঁহার তৎকালীন আচরণ সম্পর্কে যে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা সত্য।

তড়িন্ময়ী কি করিলেন

তিনি যে কারণে সাক্ষ্য দেন নাই, তাহা সুস্পষ্ট। তিনি যে কাজটি করিয়াছেন বলিয়া বাদীপক্ষ বলিয়াছেন, তাহা বিবাদীপক্ষ অস্বীকার করেন নাই, বরং মিঃ লিণ্ডসে তাহা স্বীকারই করিয়াছেন। তাঁহার সেই কাজটি এই যে, তিনি যে পাঁচ দিন জয়দেবপুরে ছিলেন, উহার কোনও একদিন অর্থাৎ ২৩শে মে তারিখের পূর্ব্বে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে তিনিও একযোগে কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে, বাদীর পরিচয় সম্পর্কে তদন্ত করা হউক। মিঃ লিণ্ডসে স্বীকার করিয়াছেন যে, ঐরূপ দরখাস্ত করা হইয়াছিল। সত্যবাবুও ঐরূপ দরখাস্তের কথা শুনিয়াছিলেন। সেই দরখাস্ত তলব করা হয়। এবং কালেক্টর তাহা দাখিল করেন।

মিঃ লিণ্ডসের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, সাধুর সম্পর্কে সমস্ত কাগজ-পত্র একটা ফাইলে রাখা এবং সেই ফাইল ওয়ার্ডস ডেপুটী কালেক্টরের চার্জ্জে রাখা হয়। মিঃ আর সি দত্তও (বিবাদী পক্ষের ৪৩৫নং সাক্ষী) ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই দরখাস্ত আদৌ আমলে আনা হয় নাই। কুমারের মৃত্যু হইয়াছিল, ইহা প্রমাণের জন্য যদিও বহুলোকের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছিল, তথাপি কুমারের ভগিনিগণ বা বাদী কিংবা ঢাকা ও

জয়দেবপুরে কাহাকেও বাদীর পরিচয় সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করা হয় নাই। কোর্ট অব ওয়ার্ডস বা সত্যেন্ বাবু যে তদন্ত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য কোর্ট অব ওয়ার্ডসকে দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহারা বাদীকে আদালতে যাইতে বলিতে পারিতেন, পরে অবশ্যই তাঁহারা বাদীকে কোর্ট যাইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে তাহা না বলিয়া তাঁহাকে মিথ্যা আশা দিয়াছিলেন; তাঁহারা যে বাদীকে মিথ্যা আশা দিতেছিলেন, তাহা যথা সময়ে আমি দেখাইব; প্রকাশ্যতঃ কালেক্টর, কিন্তু বস্তুতঃ সত্যেনবাবু ও সরকারী উকিল যে তদন্ত করাইতেছিলেন। সত্য নির্ণয় যে তাহার উদ্দেশ্য ছিল তাহা নহে। ঐ তদন্তের উদ্দেশ্য ছিল, ব্রীফ সংগ্রহ। সরকারী উকিল যে মেজরাণীর পক্ষ হইতে কাজ করিতেছিলেন, তাহা এই তদন্তের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি দেখাইব। বিবাদীপক্ষও তাহা অস্বীকার করেন নাই।

দরখাস্তের ফলে

ঐ দরখাস্ত সম্পর্কে কোনও আদেশ আসিল না, বরং তৎপরিবর্ত্তে অর্ডার আসিল যে, বাদী মেজকুমার কি না, তাহা রেভিনিউ বোর্ড স্থির করিবেন, এবং এই সম্পর্কে বোর্ড স্থির সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে, কোনও কর্ম্মচারীই এই বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করিতে পারিবেন না যে, বাদী মেজকুমার (একজিবিট ২০৬), ২৮শে মে তারিখে এই অর্ডার আসে। মিঃ লিণ্ডসে ১০ই তারিখের পূর্ব্বেই তাঁহার সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি দার্জ্জিলিংএর বৃষ্টিপাতের রিপোর্ট দেখিলেন। রিপোর্টে দেখিলেন যে, ১৯০৯ সালের ৮ই মে দার্জ্জিলিংএ বৃষ্টি হয় নাই। তাই স্থির করিলেন যে, শ্মশানে বৃষ্টি হইবার কথা কাল্পনিক কাহিনী মাত্র; সুতরাং সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বাদী একজন প্রতারক। তিনি বলিতেছেন যে, শুধু বৃষ্টিপাতের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, কর্ণেল ক্যালভার্ট মেজকুমারের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া যে এফিডেভিট করিয়াছিলেন, তিনি তাহাও দেখা আবশ্যক মনে করেন নাই। অবশ্যই তিনি সেই এফিডেভিটও দেখিয়াছিলেন। সত্যবাবু বলিয়াছেন যে, তিনি রেভিনিউ বোর্ডে মিঃ লেথব্রিজের নিকট যখন উহার কপি দেন, তখনই কলিকাতা হইতে উহা পাঠাইয়াছিলেন। বারিপাতের রিপোর্ট এবং সত্যবাবুর উক্তি হইতে তাঁহার স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বাদী একজন প্রতারক এবং সেই বিশ্বাস বশতঃই তিনি ১০ই মে তারিখের রিপোর্ট দিয়াছিলেন এবং

সেই বিশ্বাস বলেই তিনি মিঃ লীজের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য রায়বাহাদুরের দার্জ্জিলিং যাত্রার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন।

কলিকাতায় সত্যবাবুর সঙ্গে তাঁহার (রায় বাহাদুরের) দেখা হয়, এবং মৃত্যুর প্রমাণ সংগ্রহের জন্য একজন ব্যারিষ্টার লইয়া তাঁহারা দার্জ্জিলিং যাত্রা করেন। এইবার দার্জ্জিলিং গিয়া ঐ সম্পর্কে যাহারা কিছু জানে, তাহাদের বিবৃতি গ্রহণ করার কল্পনা নিশ্চয়ই সত্যবাবু ও সরকারী উকিলের মাথায় খেলিয়াছিল, এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমেই ঐরূপ বিবৃতি লওয়া হইয়াছিল,—নতুবা সেই ব্যারিষ্টার তাঁহার নিকট আত্মীয় হওয়া স্বত্বেও একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ সকল বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিতেন না। কিন্তু মিঃ লিণ্ডসে ঐ সকল বিবৃতি গ্রহণ করিয়া ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিলের উপরোক্ত অভিমত সহ এবং "১৯২১ সালের ২৫শে মে তারিখে দার্জ্জিলিংএ ঢাকার সরকারী উকীল কর্ত্তৃক লিখিত মন্তব্য"সহ ঐগুলি, রেভিনিউ বোর্ডে প্রেরণ করেন। (একজিবিট ৪৩৬)। বৃষ্টিপাতের রিপোর্ট এবং কর্ণেল ক্যালভার্টের এফিডেভিট হইতে তাঁহার পূর্ব্বেই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বাদী প্রতারক। তারপর ২৫শে মে তারিখে সেই বিষয়ে তিনি একেবারে নিঃসন্দেহ হইয়া পড়িলেন। সাক্ষ্যদানের সময়ও তিনি দৃঢ়ভাবে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং বৃষ্টিপাতের রিপোর্ট দেখিবার পর হইতে তিনি এই মত এমন দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিতেছেন যে, তেমন দৃঢ় ভাষা আমি খুজিয়া পাই না।

কালেক্টরের নিকট বাদীর উপস্থিতি

যখন তাঁহার ঐরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল এবং যখন তিনি সন্ন্যাসীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত সংগ্রহের জন্য পাঞ্জাবে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তখন বাদী তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ৩১শে মে তারিখে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী কোর্ট অব ওয়ার্ডের একজন কর্ম্মচারীর সহিত পাঞ্জাব যাত্রা করেন; মিঃ লিণ্ডসে কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন বাদী একজন পাঞ্জাবী; কিন্তু তিনি কাহার নিকট এই কথা শুনিয়াছিলেন তাহা কেহই বলিতে পারে না। ২৭শে মে তারিখে বাদী জয়দেবপুর পরিত্যাগ করেন; ব্রজলাল বাবু যে কুমারকে লইয়া ঢাকা আসিতে অনুরোধ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন, ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, তদনুসারে তিনি ঢাকা আসিয়াছিলেন। ২৯শে তারিখে দুইজন উকিল ও একজন স্থানীয় জমিদারের সহিত তিনি মিঃ লিণ্ডসের নিকট উপস্থিত হন। মিঃ লিণ্ডসে এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন (একজিবিট ৩৫৮):—

"বেলা ১১টার সময় সাধু আসেন, তাঁহার সঙ্গে বাবু শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাবু প্যারীলাল দাস এবং মনে হয় কাশিমপুরের ম্যানেজারও ছিলেন। তিনি বলেন, প্রজাদের উপকার হইতে পারে, এমন ভাবে যাহাতে তাঁহার জমিদারীর বন্দোবস্ত হয়, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা। আমি তাঁহাকে বলি যে, তিনি মেজকুমার নহেন, ইহা ধরিয়া লইয়াই, বোর্ড অব রেভিনিউ কাজ করিবেন; কারণ কুমার মারা গিয়াছেন বলিয়াই বোর্ড অব রেভিনিউ অনেক বৎসর যাবৎ ধরিয়া আসিতেছেন। আমি তাঁহকে আরও বলি, তিনি আদালেতে মামলা করিয়া তাহার পরিচয় সপ্রমাণ করিতে পারেন; নতুবা তিনি যদি আমার নিকট প্রমাণ উত্থাপন করিতে চাহেন, তবে আমি তাহা লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। তিনি দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার সঙ্গের উকীলদ্বয় বলেন, আগামীকল্য তাঁহারা তদস্তের জন্য দরখাস্ত করিবেন। তাঁহারা আরও বলেন, রেভিনিউ বোর্ড যাহাতে খরচ দেন, সেই ব্যবস্থা করা হউক, আমি উত্তর করি, তাঁহারা ঐ মর্ম্মে দরখাস্ত করিলে আমি ঐ সম্পর্কে যাহা হয় অর্ডার করাইব।

"আমার প্রশ্নের উত্তরে সাধু বলেন, দার্জ্জিলিংএ তিনি দুই হইতে চারি দিন নিউমোনিয়ায় ভুগিবার পর তাঁহার সংজ্ঞা বিলোপ হয়। দার্জ্জিলিংএর যে বাড়ীতে ছিলেন, সেই বাড়ীর নাম তাঁহার স্মরণ নাই, বলিয়া তিনি বলেন। তিনি আরও বলেন, যখন জয়দেবপুর হইতে দার্জ্জিলিং যান, তখন তাঁহার কোন অসুখ ছিল না, শুধু ডান পায়ের জানুর উপর একটী ফোঁড়া হইয়াছিল এবং দার্জ্জিলিং যাত্রার পূর্ব্ববর্ত্তী দশ দিনের মধ্যে ঐ ফোঁড়া হইয়াছিল। ঐ ফোঁড়া হইবার একটী বিশেষ কারণও ছিল। উহার পূর্ব্বে তিনি কখন কলিকাতা গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে তাঁহার জ্ঞানসঞ্চার হয়, তখন একজন সাধু উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সাধু পরে তাঁহার গুরু হইয়াছিলেন। সাধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তিন চারি দিন অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। সাধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে এমনভাবে মাটিতে পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল; যেন তাঁহাকে ফেলিয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাঁহাকে পাওয়ার পূর্ব্বে বৃষ্টি হইতেছিল; সুতরাং তাঁহার শরীর বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে দিনের বেলা পাওয়া গিয়াছিল কি রাত্রিতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা সাধু তাঁহাকে বলেন নাই।"

(স্বাঃ) জে, এইচ, লিণ্ডসে,

২৯-৫-২১

"এষ্টেটের কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বেই যথারীতি খাজানা আদায় করিবেন,—সাধু এই প্রস্তাবে সম্মত হন। উকিলেরা বলিলেন যে, যদি মৃত মেজকুমারের নাম বাদ দিয়া শুধু বিভাবতীর নামে রসিদ দেওয়া হয়, তবে প্রজাদের খাজানা দিতে কেন আপত্তি হইবে ?"

(স্বাঃ) জে, এইচ, এল
২৯ ৫-২১"

যে কাগজে মিঃ লিণ্ডসের উক্ত বিবরণ লেখা হইয়াছিল' উহার কিনারায় তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন।

সাধুকে দেখিয়া মনে হইল, তিনি হিন্দুস্থানী, রং চমৎকার ; শরীরে উপদংশের কোনও চিহ্ন নাই, তাঁহার চুলের বর্ণ সোনালী—'আতিকুল্লার' ন্যায়. লাল নহে।

(স্বাঃ) জে এইচ এল
২৯-৫-২১"

বাদী অন্যান্য সকলের সহিত যে সকল উক্তি করিয়াছেন বলিয়া বলা হইয়াছে, উহার সহিত আমি মিঃ লিণ্ডসের উক্ত লিখিত বিবরণ আলোচনা করিব। কিন্তু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মিঃ লিণ্ডসের সহিত বাদীর সাক্ষাতের কথা মিঃ লিণ্ডসের প্রায় কিছুই মনে নাই ; তাঁহার শুধু এইটুকু মনে আছে যে, তাহাদের মধ্যে হিন্দীতে বাক্যালাপ হইয়াছিল। বাদী বলিয়াছিলেন, তাহার গুরুর নাম ধরমদাস নাগা—তাঁহার বাহুতে উল্কী ছিল এবং সাধুর চুলের বর্ণ সোনালী কটা ছিল ও গায়ের রং ফর্সা ছিল, এবং যখন সাধুর সঙ্গে তাঁহার কথা হয় তখন উকীল দুইজন উপস্থিত ছিলেন না। মিঃ লিণ্ডসে বাদীর কথা যতদূর বুঝিয়া ছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার কতদূর স্মরণ ছিল. তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, কারণ মিঃ লিণ্ডসে বলিয়াছেন, কথাবার্ত্তা যখন চলিতেছিল তখন তিনি তাঁহার ঐ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, কি তাহার পর লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই ; তবে ঐ দিনেই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, দুইটী বিষয় সুস্পষ্ট বুঝা যায়, বাদী পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলেন নাই, এবং বিবাদী পক্ষের সাক্ষী অতুল বাবু যে বলিয়াছেন,—যাহা বিবাদী পক্ষ বলেন—বাদী তদ্রূপ হিন্দী ভাষায়ও কথা বলেন নাই। তিনি অনাহূতভাবে কোনও বিষয়ে কাহারও নিকট হইতে কোনও ইঙ্গিত না পাইয়া, একাকী একেবারে সিংহের গহ্বরে গিয়া প্রবেশ করিলেন এবং

কালেক্টরের সঙ্গে বুদ্ধিমানের মতই কথা বলিলেন। অথচ বলা হইয়াছে যে, তিনি হাতের পুতুল মাত্র—চতুর লোকেরা পিছনে থাকিয়া তাঁহাকে চালনা করিতেছে।

বাদী ঐ সময় কালেক্টরের সাথে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তাহা আমি এই মামলার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় মনে করি।

২৯শে মে তারিখে বাদী কালেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু ঐ তারিখের পূর্ব্বেই দার্জ্জিলিং-এর বৃষ্টিপাতের রিপোর্ট, কর্ণেল ক্যালভার্টের এফিডেভিট, বিবৃতিগুলির উপর নির্ভর করিয়া তিনি স্থির করিয়া বলিয়াছিলেন, যে, বাদী একজন প্রতারক এবং স্থির বিশ্বাস বলে তিনি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের সম্মতিক্রমে বাঙ্গালায় এই নোটিশ প্রচার করেন :—

মিঃ লিণ্ডসের নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া যাইতেছে যে, বার বৎসরপূর্ব্বে দার্জ্জিলিংয়ে ভাওয়ালের মেজকুমারের শব দাহ করা হইয়াছিল, কোর্ট অব ওয়ার্ডস তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ পাইয়াছেন। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে, যে সাধু নিজেকে মেজকুমার বলিতেছেন, তিনি একজন প্রতারক। যাঁহারা তাঁহাকে খাজানা দিবে, তাহারা নিজ দায়ীত্বেই দিবে।

রেভিনিউ বোর্ডের অনুমত্যনুসারে
জে, এইচ্ লিণ্ডসে
ঢাকার কালেক্টর
৩।৬।২১

এই নোটিশকে ৩রা জুনের 'প্রতারক ঘোষণার নোটিশ' বলা হইয়াছে। সুতরাং এই রায়ে উহাকে ঐরূপেই অভিহিত করা হইবে। ৭ই জুন বাদী জয়দেবপুর পরিত্যাগ করেন। বাদী যে ৭ই জুন জয়দেবপুর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা বিবাদীপক্ষ অস্বীকার করেন নাই। রাণী সত্যভামার এক পত্র হইতেও (একজিবিট ৫৪) ঐ তারিখটি প্রমাণিত হয়। তাঁহার পত্রখানা এই :—

"তোমার ঢাকায় পৌছানর সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত আছি। তোমার, জ্যোতির্ম্ময়ীর ও সাগরের মঙ্গল সংবাদ দানে নিশ্চিন্ত করিবে এবং প্রত্যহ তোমার মঙ্গল সংবাদ লিখিয়া জানাইবে। তুমি আমার হারাণো মাণিক। তোমার কাছ ছাড়া হইয়া আমি পাগলিনীর মত আছি। তুমি কবে বাড়ী আসিবে, তাহা জানাইও।"

সত্যভামা দেবী নিরক্ষর ছিলেন। তিনি শুধু নাম স্বাক্ষর করিতে পারিতেন। এই চিঠির স্বাক্ষর যে সত্যভামা দেবীর স্বাক্ষর, তাহা বিবাদী পক্ষ অস্বীকার করেন নাই। সত্যভামা দেবী মারা গেলেও তাঁহার এই চিঠি প্রমাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না, কিন্তু তাঁহার আচরণ প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে। তাহার আচরণ কিরূপ ছিল তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইবে। সত্যভামা দেবী ১৯২২ সালে মারা যান, বিবাদী পক্ষ বলিতেছেন, সত্যভামা অন্ধ, অন্ততঃ প্রায় অন্ধ ছিলেন, তাঁহারা এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছেন। (শৈবলিনী দেবীর কমিশন সাক্ষ্য) তিনি অন্ধ ছিলেন কি না, অথবা পৌত্রকে চিনিবার মত দৃষ্টীশক্তি তাঁহার ছিল কি না—অবশ্যই বাদী মেজকুমার হইলে —তাহা আমি পরে আলোচনা করিব। কিন্তু বিবাদীপক্ষ যাহা বলিতেছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, সত্যভামা দেবী ভুল করিয়াছিলেন।

উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৯২১ সালের ৭ই জুন বাদী ঢাকা আসিবার পর, ১৯৩১ সালের পূর্ব্বে তাঁহাকে জয়দেবপুর যাইতে দেওয়া হয় নাই। ১৯৩১ সালে কয়েকজনের কমিশন সাক্ষ্য দেওয়াইবার জন্য তাঁহাকে জয়দেবপুর যাইতে দেওয়া হইয়াছিল, এবং ঐজন্য যে কয়দিন তথায় থাকিবার প্রয়োজন ছিল, তাহার বেশী তাঁহাকে তথায় থাকিতে দেওয়া হয় নাই (একজিবিট ৩২৬) তিনি আরমানী গীর্জ্জার পার্শ্ববর্ত্তী ৪নং আরমানীটোলার বাড়ীতে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পরিবারের লোক-স্বরূপ থাকেন। জয়দেবপুরের ন্যায় এখানেও বহুলোক তাঁহাকে দেখিতে যাইত এবং এই সকল লোকের মধ্য হইতে বহু লোককে উভয় পক্ষই সাক্ষী মানিয়াছেন। তিনি বাহিরের ঘরে বসিতেন এবং যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিত, তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতেন,—যদিও তিনি বাঙ্গালায় কথা বলিতেন কি হিন্দীতে কথা বলিতেন, সেই বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। বাদী পক্ষ বলিতেছেন যে, ৩০া মে তারিখে আত্মপরিচয় দানের পর হইতে তিনি বাঙ্গালায়ই কথা বলিতেন; কিন্তু তিনি হিন্দীটান বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। এখনও তাঁহার কথার হিন্দী টান আছে। বিবাদিগণের বর্ণনায় প্রকাশ, ১৯২১ সালের এই সময়ে বাদী মোটেই বাংলা বলিতে বা বুঝিতে পারিতেন না।

(বিপক্ষ হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে এ-সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাহা দ্রষ্টব্য)। মামলার বিচারকালে, ১৯২৪ সালে, বাদীর সে প্রকারের কোনও অনভিজ্ঞতার বিষয় দৃষ্টিগোচর না হইলেও বিবাদিগণ মিঃ ঘোষালকে (কমিশনে ইহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়) বলিতে ছাড়েন নাই যে, বাদী ১৯২৪

সালেও বাংলা বলিতে পারিতেন না। বাদীর বাক্যালাপ এবং বাংলা কথা-বার্ত্তা বলা সম্পর্কিত বিতর্কের আলোচনা অতঃপর যথাস্থানে করিবার প্রয়াস পাইব।

বাদীর পক্ষে পুস্তকাদি প্রচার ও গান রচনা

প্রায় এই সময়েই (প্রকৃত সময় নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়) অথবা মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে, বাদীর বিষয় সম্পর্কে—আদালতে দাখিল পুস্তিকাদি হইতে সিদ্ধান্ত করা যায়, প্রধানতঃ বাদীকে সমর্থন করিয়া পদ্যে ও গদ্যে পুস্তিকাদি প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। (বাদীর ৩৩, ৯, ২২০, ৩২৬, ৯১নং সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য) ফিরিওয়ালাগণ সর্ব্বত্র সেই পুস্তিকা বিক্রয় করিত। একজন সাক্ষী (বাদীর ৩০নং সাক্ষী) গান রচনা করিত এবং গ্রামে গ্রামে সে গান গাহিয়া বেড়াইত। আর একজন সাক্ষী (বাদীর ৩৫নং সাক্ষী) তাহার কবিগাণের মধ্যে উক্ত গান সন্নিবিষ্ট করিয়া (৩০নং একজিবিট) জনতার সমক্ষে—কবিগানে সাধারণতঃ যে প্রকার জনতা আকৃষ্ট হয়—সেই কবিগান গাইত। এ সম্বন্ধে গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়া চাঁদাও সংগ্রহ করা হইত (বিবাদীর ৬৩৩ ও ২২১নং সাক্ষী) এবং সংবাদপত্রেও এতৎ সম্পর্কে আন্দোলন চলিয়াছিল। (বাদীর ৯১নং সাক্ষী এবং মিঃ চাকলাদারের কমিশন সাক্ষী দ্রষ্টব্য)।

যাঁহারা সাধুর বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারাও সাধুর বিরুদ্ধে কবিতা ও পুস্তিকাদি প্রচার করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তাঁহাদের প্রচারিত "ভাওয়ালের ভূতের কাণ্ড" নামক পুস্তিকার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিতর্ক বিতণ্ডা দুইটী বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যেই চলিয়া থাকে। কিন্তু এক পক্ষের গাহিয়া বেড়াইবার উপযোগী কোনও গান ছিল না; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষের গান গীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। আর আর সকল বিষয়ে সম্পর্কহীন ও অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বাদীর সাদৃশ্য বিষয়ক প্রশ্ন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও মুখ্য প্রমাণের সত্যাসত্য নির্ণয় উপলক্ষে এই আন্দোলনের বিষয় স্মরণ করিবার আবশ্যক হইবে।

বিবাদী পক্ষের কৌসুলী যদিও বাদীর স্বীকারোক্তি বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য ঐ সকল পুস্তিকাদি হইতে বিষয় বিশেষ বাছিয়া লইয়া বাদীর বিরুদ্ধে বলাইবার উদ্দেশ্যে সাক্ষী দিগকে তৎসংক্রান্ত প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বড়ই অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। (বাদীর ৩৭৭, ২২৮, ৬৮০, ৭৭, ১৯৩, ২৬২, ৩২৬, ৩৫৮, ৩৮৭, ৯৫৮, ৬৩৯, ৬৮০ ও ৯২১নং সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য)।

কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যকলাপ

৩রা জুন বাদীকে প্রতারক বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ৭ই জুন বাদী জয়দেবপুর হইতে চলিয়া যান। ১০ই তারিখে বাদী প্রতারক বলিয়া নোটিশ জারি হইবার পর মীর্জ্জাপুরে এক দাঙ্গা হয়। ঐ দাঙ্গা সম্পর্কে তত্রত্য পুলিশ ঝুন্নুরআলি নামে এক ব্যক্তিকে গুলী করিয়া মারে (বিবাদী পক্ষের ৩নং সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য)।

ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্ম্মচারীদিগকে, ১৩ই জুন, এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় যে, তাহাদের কেহ প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে যদি সন্ন্যাসীর বিষয় সমর্থন করেন, তাহা হইলে বিনা কৈফিয়তে তাহাকে সরাসরিভাবে ডিস্‌মিস্ করা হইবে (২০৭নং একজিবিট)। রসিদে বাদীর স্বাক্ষর না থাকিলে প্রজাগণ খাজানা দিতে অস্বীকার করে, (৩৪৩নং একজিবিট)। এই উপলক্ষে সার্টিফিকেট দ্বারা প্রজাগণের নিকট হইতে খাজানা আদায়ের ব্যবস্থা হয়। একটী অর্ডারে স্পষ্টই সে কথা লেখা ছিল; অবশিষ্ট কয়েকটি অর্ডারে স্পষ্ট করিয়াই সার্টিফিকেট দ্বারা, খাজানা আদায় করা হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত। (একজিবিট নং ২২১, ২:৮, ৩৪০; ১৯২১ সালের জুলাই মাসের ব্যাপার এতদ্বারাই স্পষ্ট হইবে)। সম্পত্তি দখল রাখা এবং বাদীকে কুমার সাব্যস্ত করিতে বাধ্য করা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছিল। কিন্তু এ পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডের কর্ম্মপন্থা অপ্রাসঙ্গিক এবং অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কেন না কোর্ট অব ওয়ার্ডের আচরণে কোনও গূঢ় অভিসন্ধিব্যঞ্জক বিষয় বিশেষ প্রকাশ পাইলে বিবাদী পক্ষের সাক্ষীর সত্যতার মূল্য নষ্ট হইতে পারে; এই আশঙ্কায় তাঁহারা পূর্ব্বাপর যে ভাবে চলিয়াছেন, তাহা সমর্থন যোগ্য নহে।

বিবাদী পক্ষের সাক্ষী জনৈক নায়েবের কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি। নায়েব বলিয়াছেন, সে যদি বাদীকে মধ্যমকুমার বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার চাকুরী যাইবে বলিয়া নোটিশ হয়। (বিবাদী পক্ষের ৩০৯নং সাক্ষী)। নায়েব দিগের উপর এই প্রকারের কড়া আদেশ জারী হইয়াছিল যে,—তাঁহারা যেন এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হন। জমীদারীর কোনও কর্ম্মচারী বা কোন প্রজা বাদী পক্ষে সাক্ষী না দিতে পারে, তাঁহারা যেন তৎপ্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন। এই উপলক্ষে একজন নায়েবের কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছিল। তাহাকে লেখা হইয়াছিল,—তাহারই এলাকাধীন স্থানের জনৈক প্রজা বাদীর পক্ষে

সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে, দেখিয়া মনে হয়, তিনি সাধুকে সমর্থন করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাকে ডিস্‌মিস্ করা হইবে না কেন, অবিলম্বে তিনি যেন তাহার কারণ প্রদর্শন করেন। (৩৫৩ এবং ৩৫৩-১ একজিবিট দ্রষ্টব্য)। তুমি তোমার নিজের মনোমত সর্ত্তে চাকর রাখিতে পার; কিন্তু যখন তাহারা আদালতের আশ্রয়ে আসে, তখন আদালত তোমার সে সর্ত্ত পরীক্ষা করিতে বাধ্য।

বাদীর ঢাকার কার্য্যকলাপ

১৯২১ সালের ৭ই জুন হইতে ১৯৩১ সালের আষাঢ় কি শ্রাবণ (১৯০৪ সালের জুলাই, আগষ্ট) মাসের ১লা পর্য্যন্ত বাদী ঢাকায় অবস্থান করেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, সাগরবাবু (বাদীর ৯৭৭নং সাক্ষী) ও মনোমোহন রায় (বাদীর ১০৩৭নং সাক্ষী প্রভৃতির সাক্ষ্য হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। এই সক্ষ্যে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই বা প্রতিবাদ হয় নাই। ঐ দিন বাদী কলিকাতায় রওনা হন।

কলিকাতা যাইয়া বাদী কি করিলেন, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বাদীর ঢাকায় অবস্থানকালের কায্য কলাপ সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করিতেছি। কারণ প্রমাণের সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ঢাকায় আসিয়া বাদী, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এবং তাঁহার পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, বাদী সকলের সহিতই সাক্ষাৎ করিতেন। বিবাদী পক্ষের বহু সাক্ষী ঢাকায় বাদীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কে, সি, চন্দ্র, আই-সি এস একজন। ভাওয়ালের রাজপরিবারের বিষয় যাঁহারা সম্যক অবগত ছিলেন। (অন্য সকল বিষয়ও যাঁহারা সম্যক অবগত ছিলেন) এই সময় বাদী ঢাকার সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছিলেন। উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ধানকোড়ার জমীদার হেম বাবু এবং ঢাকার প্রসিদ্ধ ধনী জমীদার আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাদী ঢাকায় সভাসমিতিতে যোগ দিতেছিলেন)। ঢাকার আর একজন প্রসিদ্ধ ধনী মিঃ শঙ্খনিধির বাড়ীতে ঐরূপ এক পার্টি হয়। বাদী সে পার্টিতে যোগ দেন। ঢাকায় ফণী বাবুর শ্বশুর মিঃ পাকড়শীর গৃহে ফণীবাবুর পুত্রের উপনয়নে বাদী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ফণীবাবু যদিও তাহা অস্বীকার করেন, কিন্তু সাক্ষিগণ (তাঁহাদের মধ্যে একজন উকীলও ছিলেন এবং তিনি বাদীর ৯৫১নং সাক্ষী) তাহা স্বীকার করিয়াছেন। মিঃ পাকড়াশীর বাড়ীর উপনয়ন উপলক্ষে বাদীর উপস্থিতির কথা কেহ প্রতিবাদ করেন নাই।

১৯০৯ সালের পূর্ব্বে মধ্যমকুমার যেভাবে ঢাকার রাস্তায় টমটম হাঁকাইতেন, বাদীও এসময় ঠিক সেইভাবে ঢাকার রাস্তায় টমটমে চড়িয়া বেড়াইতেছিলেন। বাদী নিজেই টমটম হাঁকাইতেন। (বাদীর ৩২৬, ৬৬৬, ৭৩৯, ৪৫০, ৪৭২, ৬০২, ৭৮৯, ৮৩৩, ৯১৫, ৯১৪, ৯০২, ৭৯২, ৮০৬, ৯৫১, ৯৭৭, ১০০২, ৯৭০, ৯৭৬, ৯২৮, ১০০৯, ১০১৯, ১০১৫, ১০১৬, ১৯নং সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য) ঢাকার রাস্তায় যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিই কেহই তাহা অস্বীকার করেন নাই। মিঃ মায়ারও এই সময় বাদীকে টমটমে চড়িয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিলেন।

একদিন বিবাদী পক্ষের সাক্ষী সর্ব্বমোহন চক্রবর্ত্তী (কমিশনে ইহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়), আর্ম্মাণীটোলার বাড়ীতে বাদীর নিকট আসেন। তিনি যখন ঐ বাড়ীতে উপস্থিত, ঠিক সেই সময়ে বাদী টমটমে চড়িয়া বেড়াইতে যান। সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, বাদীর টমটম হাঁকাইবার অদ্ভুত কৌশল ছিল। বাদীর জয়দেবপুর থাকা কালে সকলেই দেখিয়াছিলেন; কেহই তাহা অস্বীকার করেন নাই। আমি যখন বাদীর সনাক্ত করিবার জন্য শরীরের চিহ্ন এবং বাদীর চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করিব, সেই প্রসঙ্গে পুনরায় এতদ্বিষয়ের অবতারণা হইবে।

বাদীর গুরু বাবা ধর্ম্মদাস নাগার কথা

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাদী ৭ই জুন ঢাকায় আসিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার লম্বা চুল এবং গোঁফদাড়ি ছিল। গোড়াতেই তাঁহার গুরু বাবা ধর্ম্মদাস নাগার নাম করিয়াছিলেন। গোড়াতেই তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার গুরুই তাহার হাতে উল্কি পরাইয়া দিয়াছিলেন। বাদীর সাক্ষ্যে প্রকাশ,—সেই ধর্ম্মদাস নাগা, সন্ন্যাসী চতুষ্টয়ের একজন, যিনি দার্জ্জিলিংএর শ্মশান হইতে বাদীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালে বাদী, মিঃ লিণ্ডসেকে, তাহার হাতের উল্কি দ্বারা লিখিত নাম দেখান।

ভাওয়ালের এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজারের এক নোটীশে প্রকাশ,—"ভাওয়াল-সন্ন্যাসীর দল গোড়াগুড়িই বলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার গুরু ধরমদাস আবির্ভূত হইবেন।" (২১২নং একজিবিট) ঢাকায় পৌঁছিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বাদীর গুরুকে দেখিবার জন্য উৎসুক হন; এবং তাহাকে ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করেন। প্রথমে তিনি জব্বু ও জিতেনকে পাঠান, তাঁহারা গুরুকে দেখিতে পায় না, তারপর জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জামাতা সাগর (বাদীর ৯৭৭নং সাক্ষী), অতুল রায় এবং হাবীর নামক জনৈক সাধু,

গুরুকে আনিতে যান। তাঁহারা গুরুকে পাইয়া ১৯২১ সালের ভাদ্র মাসের একদিন ঢাকায় লইয়া আসেন। মিঃ লিণ্ডসের এক পত্রে ঠিকভাবে তাহার তারিখ জানা যায়। সে তারিখ ১৯২১ সালের ২৬শে আগষ্ট। বিবাদী পক্ষ ঐ তারিখের কথা বলেন এবং আমিও তাহা মানিয়া লইলাম। ৩০শে আগষ্ট গুরু চলিয়া যান। বাদীর জনৈক সাক্ষীকে (বাদীর ১০৪০নং সাক্ষী) জেরা করিবার সময় বিবাদী পক্ষই ঐ তারিখের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

বাদীর গুরু ধর্ম্মদাস নাগা যে ঢাকায় আসিয়াছিলেন, এই মামলায় তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা হইয়াছে। বাদী বলেন,—পুলিশের ভয়ে তাঁহার গুরুকে ঢাকা ছাড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু বিবাদী পক্ষ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, বাদীর গুরু পুলিশের ভয়ে চলিয়া যান নাই। তিনি পাঞ্জাবের এক অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে এক বিবৃতি দিয়াছিলেন যে, বাদী (ধর্ম্মদাসকে ফটো দেখাইয়া) তাঁহার চেলা সুন্দর দাস সাধু হইবার পূর্ব্বে, সুন্দরদাস লাহোর জেলার আউজলা গ্রামের এক রাখাল বালক ছিল। তখন তাহার নাম ছিল—মাল সিং। কিছু পরে এই প্রসঙ্গের পুনরবতারণার আবশ্যক হইবে।

ম্যানেজার সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রিপোর্ট

ভাদ্র মাসের শেষের দিকে বাদী তাঁহার দাড়ি ফেলিয়া দেন, তখনও তাঁহার মাথায় জটা থাকে। তিনি তখন সাধারণ ধুতি পরা আরম্ভ করিয়াছেন। ঢাকা আসিবার পর ইহাই তাঁহার প্রথম ধুতি পরা। প্রথম আত্মপরিচয়ের দিন হইতেই বাদী লেংটি ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে, ১৯২১ সালের ১লা জুলাই এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রিপোর্ট পান। ইন্সপেক্টার মমতাজউদ্দিন সমভিব্যাহারে সুরেন্দ্র বাবু পাঞ্জাবে গিয়াছিলেন। ৩১শে মার্চ্চ তাঁহারা উভয়ে পাঞ্জাবে যান। সুরেন্দ্র বাবু রিপোর্ট দিয়াছিলেন,—এই বাদীর নাম সুন্দর দাস। তিনি রামদাসের চেলা। (৩২৭২ একজিবিট)। ২রা জুলাই ম্যানেজার মধ্যম রাণী বিভাবতী দেবীকে তারযোগে এই সংবাদ জানান যে, 'বাদীর গোড়ার খবর সমস্ত পাওয়া গিয়াছে।'

বিবাদী পক্ষীয়দিগের অপচেষ্টা

এ সকলই ১৯২১ সালের ঘটনা। সমস্ত বৎসর ধরিয়া এমন কি পরবর্ত্তী বৎসরেরও কতক সময় পর্য্যন্ত, বাদীর অজ্ঞাতসারে দার্জ্জিলিংএ তাহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য, সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণের জোর আয়োজন

চলিয়াছে। (৪২৮ হইতে ৪৩১, ৪৩৫ হইতে ৪৪৭, ২৩৪২, ২৩৪০ প্রভৃতি একজিবিট দ্রষ্টব্য)। তখন বাদীর জন্য জমীদারীর মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছিল। কিন্তু সে চাঁদা সংগ্রহের বিরুদ্ধেও বিবাদীগণ যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চাঁদা সংগ্রহ বন্ধ হইয়া যখন বাদীর পক্ষে খাজানা আদায় আরম্ভ হইল, তখন দেখা গেল—প্রায় এক লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা এতদ্বিষয় সমর্থিত। বিবাদীগণ বলেন, এই চাঁদার টাকা হইতে বাদী, মানহানির মামলায় ১০,৯৯১৲ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

"ফকির বেশে প্রাণের রাজার" মানহানি

"ফকির বেশে প্রাণের রাজা" নামক পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন বলিয়া, উক্ত পুস্তিকার মুদ্রাকর সতীশ রায় এবং গ্রন্থকার পূর্ণচন্দ্র ঘোষের নামে, ডাঃ আশুতোষ দাস গুপ্ত এই মানহানির মামলা করিয়াছিলেন।

আশু ডাক্তারের অভিযোগক্রমে ৯।৯।২১ তারিখে এই মানহানির মামলা দায়ের হয়। আশু ডাক্তারের অভিযোগ, ঐ পুস্তিকায় বলা হইয়াছিল—"আশু ডাক্তার দার্জ্জিলিংএ বাদীকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছেন বলিয়া, উক্ত পুস্তিকায় আশু ডাক্তারের নামে অযথা অপবাদ দেওয়া হইয়াছিল।" রায় বাহাদুর এস, এন্, ঘোষ ফরিয়াদীর পক্ষে এই মামলা চালান। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হইতেছে যে, ভাওয়াল জমিদারীর পক্ষ হইতে, এষ্টেটের খরচায় মানহানির মামলা চালান হইয়াছিল এবং বাদী আসামী পক্ষে মামলা চালাইয়াছিলেন।

আশু ডাক্তারের বিবরণ

হাইকোর্টের সিদ্ধান্তে আসামীগণ দণ্ডিত হয়। তৃতীয় রাণী এই উপলক্ষে বলিয়াছিলেন,—একমাত্র মোহিনীবাবুর তদ্বিরের গুণেই মামলায় এইবার জয়লাভ হইয়াছে (২৩৭নং একজিবিট)। এই মামলায়ই (দুইবার এই মামলার বিচার হয়) এবং আর একটী মামলায় (১৯২১ সালে এই মামলা দায়ের হয়, এবং ১৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে মামলার শুনানী হয়) আশু বাবু এবং বীরেন্দ্র বাবু,—যাঁহারা দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন,—বাদীর মৃত্যু সংক্রান্ত সকল অবস্থার বিষয় এবং বাদীর পীড়া সংক্রান্ত সকল ঘটনা বিবৃত করিয়াছিলেন। বাদীর পীড়া ও মৃত্যু সম্বন্ধে ইহাই হইল আদি বিবরণ। এস্থলে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ঐ দুই মামলার শুনানীর পূর্ব্বে মিঃ লিণ্ডসে বড় রাণীর নিকট পত্র লিখিয়া মধ্যম কুমারের পীড়া ও মৃত্যু সংক্রান্ত যাবতীয় টেলিগ্রাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন (৫৫নং একজিবিট)। আশু ডাক্তার তখন নিজে

ডাক্তারী ব্যবসা করিতেন। তারপর ৩-১১-২১ তারিখের ডিস্পেন্সারী কমিটির এক রিজলিউশন অনুসারে ১৭-১-২২ তারিখে আশু ডাক্তার জয়দেবপুর ডিস্পেন্সারীর কার্যভার প্রাপ্ত হন।

মুকুন্দ গুণ নিহত

১৯২১ সালে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। দার্জ্জিলিংএ কুমারের সঙ্গী এবং সেক্রেটারী, মুকুন্দ গুণ ২৪-৯-২১ইং তারিখে ঢাকার রাজপথের উপর দিনদুপুরে নিহত হয়। মৃত্যুর প্রাক্কালে সে যে জবানবন্দী দেয়, তাহাতে সে বলে যে, "তাহার কোন শত্রু ছিল না; তবে সে ভাওয়াল মামলার বাদীর বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে লিখিয়াছিল" (বিবাদী পক্ষের ৪০৫নং সাক্ষী)।

বৃদ্ধা রাণী সত্যভামা দেবীর পত্র

তারপর ১৯২২ সাল আসিল। বাদী ঢাকায় বাস করিতেছিলেন। ১৪ই জুলাই তারিখে কুমারের পিতামহী সত্যভামা দেবী ঢাকায় আসিলেন। সাক্ষ্য হইতে তাঁহার আগমনের তারিখ ঠিক পাওয়া যায়। ঢাকায় আসিবার পর সত্যভামা দেবী দ্বিতীয় রাণীর নিকট যে পত্র (৫৮নং একজিবিট) লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই তারিখের কথাই পাওয়া যায়। তারিখের উল্লেখ বিহীন এই পত্রখানি ২৫-৭-২২ইং তারিখে কলিকাতার ১৯নং ল্যান্সডাউন রোডে মধ্যম রাণীর নিকট পৌছে, কিন্তু ইহা মধ্যমরাণী প্রত্যাখ্যান করেন। এই পত্র বাঙ্গালায় লিখিত ছিল এবং তাহার বক্তব্য বিষয় এই। (৫৮নং ও ৫৮ (এ) নং একজিবিট) :—

"অশেষ ভাগ্যবতী শ্রীমতী বিভাবতী দেবী!

"আমার পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র রমেন্দ্রনারায়ণ জীবিত আছে। সন্ন্যাসীকে অর্থাৎ যে লোকটি প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকায় আসিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া ভাওয়ালের অনেক প্রজা এবং ঢাকার বহুসংখ্যক ভদ্রলোক দ্বিতীয়কুমার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমিও তাঁহাকে বিশেষ সতর্কতা-সহকারে দেখিয়াছি। প্রথমে আমি তাঁহাকে জয়দেবপুরে দেখি। গত কয়েক দিন যাবৎ আমি প্রত্যহই ঢাকার বাসায় তাঁহাকে দেখিতেছি। সন্ন্যাসী সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই যে, এই লোকটিই আমার দ্বিতীয় পৌত্র রমেন্দ্রনারায়ণ আমি বৃদ্ধা হইয়াছি বটে; তথাপি আমি মনে করি যে, আমার দৃষ্টিশক্তি ভালই আছে। তুমি জান যে, দ্বিতীয়কুমারের তথাকথিত মৃত্যুর পর

কুশপুত্তলিকা দাহের কথা হইয়াছিল, এবং কেন হইয়াছিল তাহাও তোমার জানা আছে।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এখানে আসিয়া একবার তাহাকে দেখা তোমার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তাহা হইলেই তোমার মনে কোন সন্দেহ থাকিবে না। তাহার ঢাকায় আগমনের পর তোমরা কেহই স্বচক্ষে দেখ নাই। হয়ত তোমরা লোকমুখে নানা কথা শুনিয়াছ, এবং সংবাদপত্রে নানারূপ বর্ণনা পড়িয়াছ।

"আমি তাই স্নেহভাবে তোমাকে আহ্বান করি যে, তুমি আসিয়া দেখ; তাহা হইলেই সত্য কথাটি ঘোষণা করা যাইবে। অতএব আমার ঐকান্তিক অনুরোধ, তুমি একবার আসিয়া, স্বচক্ষে একবার দেখ, অতঃপর ন্যায় ও ধর্ম্ম অনুসারে যাহা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তাহাই করিয়া আমার বিখ্যাত স্বামীর পরিবারের মানসম্ভ্রম রক্ষা কর।" (স্বাঃ) শ্রীসত্যভামা দেবী।

অবিনাশচন্দ্র মুখুয্যেই শ্রীযুক্তা সত্যভামা দেবীর কাজকর্ম্ম দেখিতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন,—সত্যভামা দেবীর উপদেশ অনুসারে তিনি এই পত্রখানা লিখিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা সত্যভামা দেবী কিভাবে স্বয়ং তাঁহার শীলমোহর বাহির করিয়া আনিয়া স্বহস্তে পত্রের উপর শীলমোহর দিয়াছিলেন, তাহাও এই সাক্ষী বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে তিনি তাঁহার নিজের সত্যিকার মতামত বর্ণনা করিয়াছিলেন কি না, তাহার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তবে এই বর্ণনা অগ্রাহ্য করিয়া দেওয়ার কোন কারণও পাইতেছি না। কেবলমাত্র তাঁহার উক্তিকেই প্রমাণ বলিয়া ধরা যায় না। তাঁহার কার্য্যাবলীর যেটুকু প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা হইতেই সত্যভামা দেবীর প্রকৃত মতামত নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তবে কথা এই যে, যদিও দ্বিতীয় রাণী জানিতেন যে, এই পত্র সত্যভামা দেবীর নিকট হইতে আসিয়াছে; তথাপি তিনি ইহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা পত্রের উল্লিখিত বিষয় স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল, এমন কথা কেহই বলেন না। তবে দ্বিতীয় রাণীর চালচলন ও ভাবগতিকের কথা সমালোচনা করিবার সময় এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে।

কালেক্টার মিঃ ড্রামণ্ডের নিকট পত্র

ঢাকায় আসিবার পর সত্যভামা দেবী এই পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং আরও দুইটি কাজ করিয়াছিলেন। ১৯২২ সালের ২০শে জুলাই তারিখে তিনি

ঢাকার সিভিল সার্জ্জন কর্ণেল ম্যাক কেলাভ আই এম-এস দ্বারা তাঁহার চক্ষু পরীক্ষা করাইয়া তাঁহার দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে একখানি সার্টিফিকেট লইয়াছিলেন (৭৪নং এক্জিবিট)। তখন বলা হইতেছিল এবং দ্বিতীয় রাণীও স্বীকার করিয়াছেন যে, সত্যভামা দেবীর দৃষ্টিশক্তি খারাপ হইয়া গিয়াছিল; তাঁহার স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তিও অক্ষুণ্ণ ছিল না। অতএব তিনি যাহা বলিতেছিলেন, তাহার সম্পর্কে সন্দেহ করিবার অবকাশ ছিল। ফণীবাবুর সাক্ষ্যেও এইরূপ ইঙ্গিত আছে যে, সত্যভামা দেবীর দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল না।

সত্যভামা দেবী আর একটী কাজ, যাহা এই সময়ে করিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে এই যে, তিনি ২৯-৭-২২ ইংরাজী তারিখে মিঃ ড্রামণ্ডের নিকট এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। এই পত্র আদালতে পেশ করার তাগিদ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পেশ করা হয় নাই। ২৭৪নং এক্জিবিট হইতেছে এই পত্রেরই একখণ্ড নকল। আমি সেই পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"মহাশয়, ২৫শে মে তারিখে লিখিত আপনার পত্রখানি যথাসময়ে আমি পাইয়াছি। বিগত ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে আমার পত্রে লিখিত অনুরোধ রক্ষায় আপনি সরকারী কারণে অসমর্থ হইয়াছেন বটে, তথাপি আপনি আমার মনোভাবের প্রতি যে সম্মান দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ হইয়াছি।

"আপনার প্রস্তাব অনুসারে আমি ক্লেশ স্বীকার করিয়াও ঢাকায় আসিয়াছি, এবং সাধুর সঙ্গে দেখা করিয়াছি"। অতঃপর এই পত্রে সত্যভামা দেবী বলেন,—প্রত্যহ তিনি সাধুর সহিত দেখা করিতেছেন, কেন তিনি ইহাকে মধ্যম কুমার মনে করেন, তাহার কারণ প্রদর্শন করেন, দার্জ্জিলিংএ কুমারের মৃত্যু সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্যের অবতারণা করেন, একতরফা তদন্ত দ্বারা সত্য প্রমাণিত হইতে পারে না; এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন। সত্যভামা দেবী আরও বলেন যে, রাণী বিভাবতী দেবী, তাঁহার ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে বাস করিতেছেন, বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করা তাঁহার স্বার্থের পক্ষে সুবিধাজনক নহে; বাদীর বিরুদ্ধে যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণ আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া নিরপেক্ষ অথচ বিশিষ্ট আইনজীবী দ্বারা পরীক্ষা করাইবার ব্যয়ভার বহনে তিনি রাজী আছেন; তাঁহার দৃষ্টিশক্তির কোন বিঘ্ন ঘটে নাই, ড্রামণ্ড আসিয়া যদি তাঁহাকে দেখেন, তবে ভাল হয়, ইত্যাদি।

মিঃ লিণ্ডসে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভগ্নীদের প্রেরিত আবেদনগুলি সম্পর্কে কোন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই; ঠিক সেইরূপ ভাবেই সত্যভামা দেবীর এই পত্রের উপরও কোন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই।

বৃদ্ধা রাণী সত্যভামা দেবীর মৃত্যু

১৫-১২-২২ ইং তারিখে বাদীর বাড়ীতেই সত্যভামা দেবীর অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। জুলাই মাসে ঢাকায় আসিবার পর তিনি এই বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছিলেন। আমি পরে তাঁহার আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করিব। তবে ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, সত্যভামা দেবী অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই পূজা-আর্চ্চাও প্রার্থনায় নিরত থাকিতেন। তাঁহার নীতিজ্ঞান অতি কঠোর ছিল ; কলের জল বিধবাদের পক্ষে অপবিত্র বলিয়া তিনি কলের জল স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতেন না। (কমিশনে গৃহীত ছোট রাণী ও শৈবলিনীর সাক্ষ্য) প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে অথবা তাহার কাছাকাছি সময়ে সত্যভামা দেবীর মৃত্যু হয়। রাজা কালীনারায়ণের বিধবা পত্নী সত্যভামা দেবী, কিসের প্রেরণায় ঢাকায় আসিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত একটা ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

রাত্রি ১১টার সময় সত্যভামা দেবীর মৃত্যু হয়। যাহারা তাঁহার শবাধার বহন করিয়াছিলেন, বাদী তাহাদের মধ্যে একজন। বাদীই মুখাগ্নি প্রভৃতি শেষ সৎকার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঢাকার উপকণ্ঠে অবস্থিত কালীগাঁও নামক স্থানে সেই রাত্রিতেই তাঁহার শব দাহ করা হয় ; কিন্তু প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাঁহার চিতায় আগুন জ্বলিতে ছিল। কনিষ্ঠা ভগিনী তড়িন্ময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী, অন্যান্য আত্মীয়বর্গ (যেমন সত্যভামা দেবীর ভ্রাতা রাধিকা) প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন (বাদী পক্ষের ৮০৬, ৯৩৭, ৬৪৫, ৯৩৮, ৯৭৭নং সাক্ষীর জবানবন্দী দ্রষ্টব্য। শ্মশানে সত্যভামা দেবীর শবদাহের একটি ফটো আছে (৪নং একজিবিট)। সকলেই এই ফটোর কথা স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বিবাদী পক্ষ দার্জ্জিলিংএর ঘটনা সংক্রান্ত একটি বিষয়ে প্রয়োজন হওয়ায় ইহার উপর যথেষ্ট জোর দিয়াছিলেন। কথা উঠিয়াছিল যে, ব্রাহ্মণের মৃতদেহ কোন অব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না। শাস্ত্র কিম্বা লোকাচার —কিছুতেই ইহা সমর্থন করা যায় না। (বাদীপক্ষের ১০১২নং সাক্ষীর জবানবন্দী দ্রষ্টব্য)। বিবাদী পক্ষের বর্ণিত নীতি অনুসারে অজ্ঞাতকুলশীল অথবা জনৈক পাঞ্জাবী কর্ত্তৃক রাণী সত্যভামা দেবীর এই যে মুখাগ্নি, তাহা একটি ভীষণ অনাচার ! তবে কেহ যে এই বিষয়ে কোন প্রতিবাদ করিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

ঢাকা বাঙ্গালাবাজারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

সত্যভামা দেবীর মৃত্যুর পর ১১শ দিবসে বাদী যথারীতি শাস্ত্রমতে তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। এই উপলক্ষে একটা বড় রকমের ব্যাপার হইয়াছিল; ঢাকার বাঙ্গালাবাজারে একটা বড় বাড়ীর উঠানে ইহা সম্পন্ন হইয়াছিল। সাক্ষ্যে বহু সংখ্যক সাক্ষী বলিয়াছেন যে, শ্রাদ্ধের সময় প্রায় ৩০০০ লোক উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে ভাওয়ালের প্রজা, উকীল, এমন কি বাবু আনন্দ রায়ের ন্যায় সামাজিক মর্য্যাদাশালী বিশিষ্ট ব্যক্তি, ধানকুড়ার জমিদার হেমবাবু, মুরাপাড়ার জমিদার দীনেশবাবু, বহু আত্মীয় স্বজন, বহু ব্রাহ্মণ, ভাওয়াল রাজপরিবারের পুরোহিত, গুরুদেব, পণ্ডিত প্রভৃতি উপস্থিতি ছিলেন। তড়িন্ময়ী দেবী এবং শৈবলিনী দেবীও তথায় নিশ্চয়ই উপস্থিত ছিলেন। বাদী পক্ষের ২, ৩, ৪, ৫, ৩৫, ৬৪নং সাক্ষী, তড়িন্ময়ীব কথা বলিয়াছেন। এবং বাদী পক্ষের ৮৫২, ৬৬০ নং সাক্ষী, শৈবলিনী দেবীর কথা বলিয়াছেন। বাদী নদীতে যাইয়া পূরক-পিণ্ড দান করেন। বাদী পক্ষের ৫৪নং সাক্ষীর জবানবন্দী) এই অনুষ্ঠানের ফটো তোলা হয় (৫, ৬, ৭, ৮নং একজিবিট) এই ব্যাপারের কোন কথাই, বিবাদীপক্ষ কোনও সাক্ষী দ্বারা খণ্ডন করিতে পারেন নাই। অতএব সত্যভামা দেবীর শ্রাদ্ধ যে ঠিক যেরূপ হওয়া উচিত ছিল, এস্থলে সেইরূপই হইয়াছিল। কিন্তু বিবাদী পক্ষের বর্ণিত নীতি অনুসারে এই শ্রাদ্ধ আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার; বিবাদী পক্ষ বলেন যে, প্রত্যেক আত্মীয় এবং প্রত্যেক ভদ্রলোক—যাঁহারা কুমারকে জানিতেন, তাঁহারাই এই ব্যাপারকে অতি অদ্ভুত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। একটা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া, কিম্বা মুখাগ্নি সম্পাদন করিয়াই কেহ কুমার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। ইহা বলাই অনাবশ্যক। কিন্তু যদি কয়েকজন লোকের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের প্রশ্ন বিবেচনা করিতে হয় এবং বাদীর সহিত কুমারের গড়মিলের কথা তোলা হয়, তাহা হইলে এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও মুখাগ্নির বিষয় লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না।

১৯২৩ সালে আর একটা প্রয়োজনীয় ঘটনা ঘটে। কোর্ট অব ওয়াডস এবং রেভেনিউ বোর্ডের তদানীন্তন বিশিষ্ট সদস্য মিঃ কে, সি, দে, আই-সি এস্ এই সময়ে ঢাকা পরিদর্শন করেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তখন তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন। উত্তরে মিঃ দে তাঁহাকে এক বাঙ্গালা পত্র (২০০নং একজিবিট) লেখেন। আমি এই পত্রের ইংরাজী অনুবাদ দিলাম।

ঢাকা, ৭-৮-২৩ ইং

কে, সি দে, রেভেনিউ বোর্ডের সদস্য সমীপে—

"২৬শে শ্রাবণ তারিখে লিখিত আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি আমার বাসায় আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছেন। আপনি একটী অতি পদস্থ ভদ্র পরিবারের মহিলা। অতএব আপনি আসিয়া সার্কিট হাউসে আমার সঙ্গে দেখা করিবেন. ইহা আমি সঙ্গত মনে করি না। আপনি আগামী বৃহস্পতিবার দিবস আপনার জামাতাকে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন। সকালে ৮টা সময় তিনি আমার নিকট আসিয়া আপনার সমস্ত বক্তব্য আমাকে জানাইতে পারেন। তিনি যাহা বলেন, তাহা শুনিয়া আমি প্রয়োজনীয় আদেশ দিব।

(স্বাঃ) শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

মিঃ দে'র বক্তব্য সম্বন্ধে মন্তব্য

আমার মতে এই পত্রখানি একটি সর্ব্বজনীন দলিল। সে যাহাই হউক না কেন, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জামাতা মিঃ চন্দ্রশেখর বাঁড়ুয্যের সহিত সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। মিঃ কে, সি, দে তাঁহার সাক্ষ্যে, এই পত্র এবং এক জামাতার সহিত সাক্ষাৎকারের কথা স্বীকার করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরবাবু আদালতে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, মিঃ দে তাঁহাকে সনাক্ত করিতে পারেন নাই। তবে এইটুকু বলিয়াছেন যে, জ্যোতির্ম্ময়ীর জামাতা হিসাবে এই ব্যক্তিই হয় ত আসিয়াছিলেন। প্রায় ৪৫ মিনিট কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ইহা স্বীকৃত যে, এই সাক্ষাৎকারের সময় মিঃ দে প্রস্তাব করেন যে, স্বয়ং বাদী যেন একটা আবেদন করেন; কারণ ভগিনী, পিতামহী অথবা প্রজাদের আবেদনের উপর নির্ভর করিয়া কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না। চন্দ্রশেখরবাবু বলেন,—বাদীই প্রকৃতপক্ষে ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার কি না, এই সম্পর্কে তিনি প্রকাশ্য তদন্তের দাবী করিয়াছিলেন; উত্তরে মিঃ কে, সি, দে বলিয়াছিলেন, রাম একথা বলিতেছে, শ্যাম সেই

কথা বলিতেছে, শুধু এই কারণেই তিনি কোন তদন্ত করিতে পারেন না; তবে বাদী স্বয়ং যদি কোন আবেদন করেন, তাহার একটা কিছু করা যাইতে পারে। মিঃ দে স্মরণ করিয়া বলেন যে, জামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তিনি একটা প্রস্তাব দিয়াছিলেন। অতএব এ পর্য্যন্ত সমস্তই অতি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। মিঃ দে আর একটি সাক্ষাৎকারের কথা বলেন। তাঁহার মতে ১৯২৬ সালে এই সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই সেই সাক্ষাৎকার, যাহার সময়ে বাদী উপস্থিত ছিলেন বলিয়া তিনি স্বীকার করেন। তথাকথিত কোনও সাক্ষাৎকারের সময়ে বাদীর স্বীকারোক্তি সম্পর্কে আমি যখন আলোচনা করিব, তখন আমি এই প্রসঙ্গের বিষয় নিষ্পত্তি করিব। মিঃ দে তাঁহার জবানবন্দীতে ১৯২৬ সালের যে সাক্ষাৎকারের কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে ১৯২৩ সালের সাক্ষাৎকারই বটে। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এই ব্যাপারে তাঁহার সঙ্গে একটা ছলনা করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত প্রেরণ

১৯২৩ সালের এই সাক্ষাৎকারের পর, চন্দ্রশেখর বাবু আইনজ্ঞগণের পরামর্শ গ্রহণ করেন। মামলা রুজু করা হইবে, না একটা আবেদন পেশ করা হইবে, এই বিষয় কিছুটা আলোচনা চলে। আবেদন পেশ করার কথাই স্থিরীকৃত হয়। ৮।১২।২৬ ইং তারিখে রেভিনিউ বোর্ডের নিকট এক আবেদন করা হয় এবং তাহাতে বলা হয় যে, বাদীই ভাওয়ালের কুমার কি না, এ সম্বন্ধে তদন্ত করান হউক।

ইতিমধ্যে বাদী কলিকাতায় গমন করেন। ১৩৩১ বাঙ্গালার আষাঢ় অথবা শ্রাবণ মাসে তিনি ঢাকা হইতে যাত্রা করেন। ১৩৩১ বাঙ্গালার কথা কয়েকজন সাক্ষীর মুখেই শোনা গিয়াছে। কিন্তু প্রথম রাণী সরযূবালা দেবী মাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাদী যে ১৯২৪ সালে কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই। নথিপত্রে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে, জুলাই অথবা আগষ্ট মাসের একদিন বাদী কলিকাতায় গিয়াছিলেন। ইহার সহিত অপর কোন তথ্যের বিরোধ নাই। ১৯২৪ সালে অথবা ১৯২৫ সালে যাহারা বাদীকে কলিকাতায় দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েকজনকে বিবাদীপক্ষ সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। ১নং বিবাদী ভাওয়ালের দ্বিতীয় রাণী ১৯২৪ সালের শীতকালে বাদীকে কলিকাতায় দেখেন, এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার মিঃ গুপ্ত সেখানেই বাদীকে ১৯২৪ সালের আগষ্ট মাসের কাছাকাছি সময়ে দেখিতে পান।

কুমারের কলিকাতা বাস

কলিকাতায় বাদী হরিশ মুখার্জ্জি রোডস্থিত বসু পার্ক নামে একটি বাড়ীতে বাস করিতেন। এবং তাঁহার সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও তাঁহার পুত্রবধূ বাস করিতেন। বাদী ইহাদের সঙ্গে এবং কুমারদের আর এক ভাগিনেয় জব্বু, দিগিন্দ্র ঘোষ (বাদী পক্ষের ২১২নং সাক্ষী) ও অপর তিন ব্যক্তির সঙ্গে কলিকাতায় যান। এই শেষের তিন ব্যক্তির মধ্যে দুর্গানাথ চক্রবর্ত্তী একজন। বাদী পক্ষের সাক্ষী মনোমোহন রায়, ও আমি যাহার সাক্ষ্য হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, এক বাড়ীতে ছিলেন। দুর্গানাথ ও মনোমোহন বাদীর কর্ম্মচারী।

বাদী এই বাড়ীতে প্রায় ৫ বৎসর বাস করেন। যেদিন তিনি কলিকাতায় পৌছেন, সেইদিনই তিনি ৮নং মধুগুপ্ত লেনে প্রথম রাণী সরযুবালা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাদী বলিয়াছেন যে, তাহাদের পরস্পর দেখা হইলে তিনি (প্রথম রাণী) তাহাকে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারেন। প্রথম রাণীও সেইভাবেই সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইহা আষাঢ় কি শ্রাবণ মাসে হইবে।

১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে একবার এবং ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে একবার, বাদী অল্প কয়েকদিনের জন্য ঢাকা যান। ইহা ভিন্ন ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাস (১৩৯৬ সালের আশ্বিন) পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতায়ই বাস করেন। ঐ তারিখের পর হইতে বাদী ঢাকায় জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পরিবারের সঙ্গেই বাস করিতেছিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও বৃদ্ধ ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় ৪ বৎসর পর্য্যন্ত কলিকাতায় বসু পার্কে বাদীর সঙ্গে বাস করিয়াছেন। ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী কোন বিবাহ উপলক্ষে ঢাকায় আসেন এবং আর ফিরিয়া যান নাই।

কলিকাতা অবস্থানকালে বাদী লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, বড় বড় অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, জমিদার সমিতির সভ্য হন, এবং ইষ্ট বেঙ্গল ফ্লোটিলা সার্ভিস লিঃ কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর হন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী মিঃ হলধর রায় (বাদীপক্ষের ২৪৮নং সাক্ষী) ঐ কোম্পানী পরিচালনা করেন। এই সময় তিনি হাইকোর্টের উকীল রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রায়বাহাদুর ঐ সময় হাইকোর্টের জজ ছিলেন। তিনি গোবিন্দ রায়ের সঙ্গে (বাদী পক্ষের ১৫৮নং সাক্ষী) সাক্ষাৎ করেন। গোবিন্দ রায়

তখনও এষ্টেটের উকীল নহেন। তিনি রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য অনারেবল মিঃ কে, সি, দে আই সি এস' এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হেতমপুরের রাজা তাঁহাকে, মিঃ কে, সি দের সাহিত পরিচয় করাইয়া দেন। পূর্ব্বোক্ত রায়বাহাদুর চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে পরিচয়পত্র লইয়া বাদী রেভেনিউ বোর্ডের অস্থায়ী সদস্য মিঃ জে, এন, গুপ্ত, আই সি এস-এব সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ব্যারিষ্টার মিঃ নাগ (বাদী পক্ষের ৪৫৯নং সাক্ষী), ইঞ্জিনিয়ার মিঃ গুপ্ত (বাদী পক্ষের ৪৬১নং সাক্ষী) সি, সি, গাঙ্গুলীর (এটর্নী) সহিতও সাক্ষাৎ করেন। তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া লর্ড কেভের, রাজা জানকীনাথ রায়ের এবং বড়লাটের গার্ডেন পার্টিতে যোগদান করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত সাক্ষীদের উক্তি হইতে এই সব প্রমাণাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে। এইসব পার্টিতে যোগদান করায় বাদী কুমার, ইহা প্রমাণিত হয় না বটে, কিন্তু বাদী যে আত্মগোপন করিতেছিলেন না, তাহা বুঝা যায়।

বোর্ড অব রেভেনিউর নিকট তদন্তের প্রার্থনা করিয়া এক প্রতারক বলিয়া যে নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল, সেই নোটিশ প্রত্যাহারের প্রার্থনা করিয়া বাদী যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন, ১৯২৭ সালের ৮ই এপ্রিল বোর্ড এই বলিয়া ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন যে, সাক্ষীদিগকে হাজির হইতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা বোর্ডের থাকিলেও এবং তাহাদিগকে হলপ লইবার অধিকার থাকিলেও এই তদন্তের ফলে কাহারও কোন লাভ হইবে না। এই তদন্তের ফলে বাদীকে যদি প্রতারক বলিয়া সাব্যস্ত করা হ'ত, তাহা সময়ের অপব্যবহার হইত। দেখা গেল বাদীই কুমার এবং বোর্ড তাঁহাকে সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে পারিল না। বাদী ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইতিমধ্যে ব্রজবাবুর পুত্র অর্থাৎ কুমারদের কনিষ্ঠা ভগ্নীর পুত্র,—তৃতীয় রাণী যাহাতে দত্তক গ্রহণ করিতে না পারেন, তজ্জন্য এক মামলা দায়ের করেন। এই ব্যাপারে তড়িন্ময়ী দেবীর হাত কতটা ছিল তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু তাহার যেসব আচরণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সকলেই এই মামলা দায়েরের পূর্ব্বের ব্যাপার! কোন পক্ষই তাঁহাকে অথবা তাঁহার স্বামীকে ডাকেন নাই। অতঃপর মামলা ডিসমিস করা হয়।

প্রজাদের নিকট হইতে খাজানা আদায়

এষ্টেটের একতৃতীয়াংশের খাজানা প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিতে চেষ্টা করেন। বাদীপক্ষ বলিয়াছেন যে, তিনি একটা পয়সাও আদায় করেন নাই, কিন্তু তাহারা একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, খাজানা আদায়ের চেষ্টা হইয়াছিল। বাদী পক্ষ খাজনা আদায়ের কাগজপত্র দাখিল

করিয়াছেন এবং তাহাতে দেখা যায় যে প্রজাগণ খাজানা দিয়াছে। অনেক প্রজা সাক্ষ্য দিয়াছে যে তাহারা খাজনা দিয়াছে। এই সময় খাজনা আদায় বন্ধ রাখা সম্পর্কে যে সব আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে, (একজিবিট ২১৭, ২১৪, ২৭৬, ২৬০ ইত্যাদি)। প্রজাদের উপর অত্যাচার করা হইতেছে, এইরূপ অভিযোগ করিয়া বড়রাণী ও গবর্ণমেণ্টের নিকট তার ও চিঠি পাঠান হয়। ম্যানেজার বিগনল বড় রাণীকে (দ্বিতীয় বিবাদিনী) এই বলিয়া চিঠি লিখেন যে, অনেক প্রজা খাজনা দিতে অস্বীকার করিতেছে, ইহা সত্য কথা। তিনি (বড রাণী) যেন প্রজাদিগকে সাধু আমাদের প্রিয় রমেন্দ্রনারায়ণ রায় (একজিবিট নং ৩৬৩) এইরূপ বলিতে উৎসাহ না দেন। বাদীকে খাজনা আদায় করিতে এবং জয়দেবপুর যাইতে নিষেধ করিয়া তাঁহার উপর উপর কাঃ বিঃ ১৪৪ ধারা (শান্তিভঙ্গ) অনুযায়ী আদেশ জারী করা হয় (একজিবিট ২৭৬নং)। পরে বাদী জয়দেবপুর যাইবেন না এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে একটী আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

বাদী ঢাকায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ ষ্ট্রীটস্থিত বাড়ীতে ক্রমাগত তিনবৎসর পুণ্যাহ করেন। সাক্ষীদের উক্তি এবং ফটোদ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। ১৯৩০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হয়—

প্রঃ—রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য মহাশয় কি জানেন যে, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলায় ভাওয়াল এষ্টেটের বহু প্রজা এমন এক ব্যক্তিকে খাজনা দিতেছেন, যিনি নিজেকে ভাওয়ালের মধ্যমকুমার বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, এবং সমগ্র ভাওয়াল এষ্টেটের এক তৃতীয়াংশের মালিক বলিয়া দাবী করিতেছেন ?

অনারেবল স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র—হাঁ (একজিবিট ২৬৩)

মামলার সূত্রপাত

১৯৩০ সালের ২৪শে এপ্রিল মামলা দায়ের করা হয়।

১৯৩৩ সালের ২৭শে নবেম্বর শুনানী আরম্ভ হয়। ১০ ই ডিসেম্বর বাদীর সাক্ষ্য আরম্ভ হয়। তিন দিনের কিছু বেশী তাহার জবানবন্দী গৃহীত হয়। ১৫ই তারিখে তাঁহার জেরা আরম্ভ হয় এবং ২০শে পর্য্যন্ত জেরা চলিতে থাকে। অতঃপর পুনরায় বাদীকে কয়েকটী প্রশ্ন করা হইলে তাঁহাকে পুনরায় জেরা করা হয়। কারণ বাদীর পরিচয় সম্পর্কে আর

একটী চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল। মোট কথা, চারিদিনের কিছু বেশী সময় তাহাকে জেরা করা হয়। বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী তাঁহার জেরা শেষ করিবার পর একটী অস্বাভাবিক রকমের বিবৃতি দেন। তিনি বলেন যে, যদি কোন বিষয়ে তিনি নির্দ্দিষ্টভাবে জেরা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সেই বিষয় স্বীকার করিয়া লইতেছেন, এইরূপ ভুল যেন বুঝা না হয়।

বাদীকে কিভাবে জেরা করা হইয়াছিল

বাদীকে জেরা করিবার সময় ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, (ক) বাদী বাঙ্গালী নহেন (খ) তিনি ফুটবল, টেনিস, ক্রিকেট, পলো এবং বিলিয়ার্ড খেলা জানেন না; বন্দুক অথবা শিকার সম্পর্কে কিছু জানেন না, ঘোড়া সম্পর্কে কিছু জানেন না, ইংরেজী আসবাবপত্রের নাম জানেন না, ফটোগ্রাফ তোলা সম্পর্কে, কি ঘোড়দৌড় সম্পর্কে কিছু জানেন না। বাদীকে মোটেই শিক্ষিত বলা চলে না, ইহাও দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু পরে প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, বাদী একেবারে নিরক্ষর। তিনি শুধু ইংরেজী ও বাঙ্গালায় নাম স্বাক্ষর করিতে পারিতেন—এমন কি, ইংরেজীতে নাম স্বাক্ষর করিতে যে সব বর্ণজ্ঞান থাকা দরকার, তাহাও তাঁহার ছিল না; তিনি আদালতে নাম লিখিবার সময় 'এন' অক্ষরটীই বাদ দিয়াছেন। এখন আমাদিগের দেখা দরকার যে, শিকার, ঘোড়া, আসবাবপত্র সম্পর্কেই তাঁহার জ্ঞান ছিল না, তিনি তাঁহার ইংরেজী নাম জানিতেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 'বুলস্ আই' শব্দটী না জানিয়াও তিনি ভাল শিকারী ছিলেন কি না, 'স্নফ্‌ল' কথাটী না জানিয়াও ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন কিনা। জেরার এই অংশ, ফণীবাবু সাক্ষীর কাঠগড়ায় উপস্থিত হইবার পর কিরূপ হাস্যোদ্দীপক হইয়া দাঁড়ায়, নিম্নে তাহা দেখা যাইবে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বাদী ক্রিকেট, বিলিয়ার্ড, ফুটবল, টেনিস এবং পলোখেলা ও তাহাদের ইংরাজী নাম জানেন না। 'মন সনাক্ত করুন', শীর্ষক, বিষয়ের জেরার বিশ্লেষণ কালে আমি ইহার উল্লেখ করিতেছি। ১৯৩৩ সালে মিঃ ঘোষালের নিকট কুমারের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, বাদীপক্ষের সাক্ষীদিগকে জেরায় সময়েও কুমারকে সেইরূপে একজন 'সুশিক্ষিত, মার্জ্জিত-রুচিসম্পন্ন বাঙ্গালী যুবক', 'একজন পাকা খেলোয়াড়', 'রাজার ছেলে', 'সাহেবী পোষাক পরিতে', 'সাহেবী খানা খাইতে', 'ইংরেজী বলিতে' এবং 'সাহেবী ধরণে বাস করিতে অভ্যস্ত'—এইরূপ একজন লোক বলিয়া চিত্রিত করা

হইয়াছে। কুমার একজন শিক্ষিত লোক ছিলেন, এই সুর জেরার সময় হইতেই বাদীর অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কিছু নরম হইয়াছিল কিনা, তাহা আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিতেছি না।

কিন্তু পরে বিবাদীপক্ষ ইহা প্রমাণ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন যে, কুমারের অতি সামান্য অক্ষরজ্ঞান ছিল এবং সামান্য ইংরেজী বলিবার ক্ষমতা ছিল। অবশেষে বিবাদী পক্ষের সাক্ষী মিঃ আর, সি, সেন আসিয়া বলেন যে, কুমারের ইংরেজী জ্ঞান মোটেই ছিল না—যাহা অনেক পূর্ব্বেই বুঝা গিয়াছিল। কুমারের তথাকথিত সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে যাহা সামান্য লেখা-পড়া জানা লোকেরও থাকে—জেরা করা ভিন্ন তাঁহাকে তাঁহারা স্মৃতি সম্পর্কে নামে মাত্র জেরা করা হয়। এই সম্পর্কে বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলী এই কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে, বাদীকে শিখাইবার যথেষ্ট সময় পাওয়া গিয়াছিল, এবং তিনি ঐ ফাঁদে পড়িবেন না; সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃত পক্ষে সামান্য কয়েকটি প্রশ্ন ভিন্ন যাহা বাদী নির্ভুলভাবে উত্তর দিয়াছেন। কুমারের স্মৃতি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হয় নাই। এবং উহার অধিকাংশ প্রশ্নই কুমারের স্মৃতি মাত্র স্পর্শ করিয়া গিয়াছে দেখিয়া মনে হয়, যেন উপর হইতে 'ইঙ্গিত হইয়াছে এবং বাদীর উত্তরে চালাকি ধরা পড়িলে সোজাসুজি পলায়ন করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

জেরার আলোচনার সময় এই মন্তব্য কেন করা হইল, তাহার কারণ দেখাইব। ধরিয়া লওয়া যায় যে, কুমার বাদীর মতই অজ্ঞ, কিন্তু তাহা হইলেও বাদীকে কুমার বলা যাইবে না, যদি তাঁহাদের মধ্যে শারীরিক সাদৃশ্য বর্ত্তমান না থাকে। বাদীর সহিত কুমারের সাদৃশ্য আছে কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে শারীরিক সাদৃশ্যই প্রধান বিচার্য্য বিষয় হইবে। একজন মৃতব্যক্তি অথবা পাগলকে কেহ সনাক্ত করিতে পারে। কিন্তু যেখানে এই সনাক্ত করণ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে এবং যে সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী প্রমাণ রহিয়াছে, সেখানে ব্যক্তি বিশেষের মত মনকেও লক্ষ্য করিতে হইবে। যেখানে (যেমন বর্ত্তমান মামলায়) শিখাইয়া রাখা হইয়াছে, এই অজুহাতে ইচ্ছা করিয়া মনের কোন সন্ধানই করা হয় নাই এবং যে স্মৃতির ভাণ্ডার কোন কৌশল দ্বারাই কাল্পনিক প্রতিপন্ন করা সম্ভব হইত না, সেই ক্ষেত্রেব শারীরিক সাদৃশ্যই প্রধান বিচার্য্য বিষয়; সুতরাং আমি এখন জেরা এং বাদী মামলার পূর্ব্বে যে সব সাক্ষীদের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছেন, সেই সাক্ষ্য আলোচনা করিব; কিন্তু আমাকে শরীর সম্পর্কেই প্রথম আরম্ভ করিতে হইবে।

বাদীর শরীর পরীক্ষার সময় আমি কোর্টে বাদীকে দেখিয়াছি এবং পরে বিচারের সময়েও বাদীকে বহুবার দেখিয়াছি। অনেক সময় আমাকে তাঁহার খুব নিকটে যাইতে হইয়াছে। অনেক সময় তাঁহার শরীরের চিহ্ন সমূহ দেখিবার জন্য তাঁহার শরীর স্পর্শও করিতে হইয়াছে। **ফটোতে যেরূপ আছে, বাদীকে সেইরূপই দেখা গিয়াছে।**

কলিকাতার বিখ্যাত ফটোগ্রাফার মিঃ উইণ্টারটন (বাদীপক্ষের ৭৮৮নং সাক্ষী) ঐ ফটো ১৯৩৪ সালের ২৮শে এপ্রিল তুলিয়াছেন। বাদী একজন মোটা, বলিষ্ঠ লোক এবং তিনি যে বয়স বলিয়াছেন, সেইরূপ বয়সের বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার চুল, যে সব চুল সাদা হইয়াছে তাহা ভিন্ন, গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ এবং একটু লালচে। তাঁহার গোঁফ পাতলা পিঙ্গলবর্ণ; তাঁহার দেহের উচ্চতা (আমার সমক্ষে ডাক্তার তাঁহার পরিমাপ করিয়াছেন) ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি পায়ে জুতা ছিল না, তাঁহার হাত ছোট বলিয়া মনে হয। তাঁহার জুতার মাপ ৬ নম্বর। তাঁহার রং ফর্সা এবং লালচে। নাক চওড়া, তাঁহার গোঁফ আছে, এই সব চিহ্ন সম্পর্কে কোন বিতর্ক নাই।

কোন বিতর্ক নাই বাই বলিতেছি এইজন্য যে, যদিও চৌধুরী এক এক সময় বলিয়াছেন যে, বাদীর চুল কালো, কিন্তু যত্ন না নেওয়ায় এবং তেল না দেওয়ায় পিঙ্গল বর্ণ হইয়াছে, কিন্তু যখন বাদীর সাক্ষিগণ আসিয়া বলিতে লাগিলেন যে, তাহাদের ক্ষেত্রে ঐরূপ হয় না, তখন তিনি (মিঃ চৌধুরী) জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে 'গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ' সম্পর্কে প্রশ্ন করেন এবং পরে বিবাদী পক্ষের সাক্ষি-গণও বলিতে আরম্ভ করেন যে, মেজকুমারের সহিত বাদীর একমাত্র পিঙ্গলা চুল ভিন্ন অরে কোন সাদৃশ্য নাই। আমি বাদীর চুল কোঁকড়ান দেখিয়াছি। উভয় পক্ষের উকীলদের সম্মুখেই আমি তাহা দেখি এবং তাহা লিপিবদ্ধ করি। তাঁহার ফটোতে কোঁকড়ান চুল বেশ ভালভাবে দেখা যায়।

আমি এখনই সূক্ষ্ম বিচারের ভিতরে প্রবেশ করিব না,—তবে যে সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে, তাহার কথা এখনই আলোচনা করিব এবং ফটোর সাহায্যে এবং যে সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তি সাক্ষ্য দান করিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া সাদৃশ্য বা বৈষম্য সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিব। একদিকে মধ্যমকুমারের কতক-গুলি ফটো রহিয়াছে, অপরদিকে বাদী নিজে বর্ত্তমান এবং তাঁহার কতকগুলি ফটোও রহিয়াছে। কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে—যেমন গায়ের রঙ, চুলের রঙ এবং চোখের রঙ, যাহা ফটোতে ধরা যায় না, সে সম্পর্কে আদালতকে একমাত্র মৌখিক সাক্ষ্যের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। বিবাদী পক্ষ বলিতেছেন,

কুমারের চক্ষু নীল ছিল, সুতরাং এ সম্পর্কে সামান্য মতভেদ থাকিলেও বাদীর মামলা টিকিতে পারে না। এখন এইরূপ প্রশ্নের সমাধান শুধু ফটো দেখিয়া হইতে পারে না। ফটো দেখিয়া এবং বাদীকে দেখিয়া বাদী ইহা বলা সবস্তপর হইত যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে, তবে এই সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতাম না, ঐ কারণেই উহা বাদ দিতাম।

এক্ষণে এই বিষয়ে খ্যাতনামা চিত্রকর মিঃ জে, পি, গাঙ্গুলী—পদ মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিলে যাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য লোক বলা যায়—এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, **মেজকুমারের ফটো এবং বাদীর ফটো একই ব্যক্তির**। ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসের ভূতপূর্ব্ব সদস্য ও গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের প্রিন্সিপাল মিঃ পার্সি ব্রাউন (যে আর্টস্কুলে মিঃ জে, পি, গাঙ্গুলী ভাইস-প্রিন্সিপাল এবং পরে অস্থায়ীভাবে প্রিন্সিপালের কাজ করেন) একজন চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর। তিনিও তেমনই বিশ্বাসযোগ্য। ঐ দুইটি ফটোগ্রাফ পরীক্ষা করিয়া তিনি আবার এই মত প্রকাশ করেন যে, উভয় ফটোর ব্যক্তি একজন নহে, বস্তুতঃ তিনি বলেন, ঐ দুই ফটোতে তিনি কোনই সাদৃশ্য দেখিতেছেন না। মিঃ উইটারটন এবং মিঃ মসলহোয়াইট উভয়েই অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফার; কিন্তু এ বিষয়ে একজন যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অপরের মত হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। বিবাদী পক্ষে মিঃ চৌধুরী এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন, মিঃ উইনটারটনও স্বীকার করিয়াছেন এবং যাঁহারা কুমারকে চিনিতেন না, তাহাদের কেহ অস্বীকার করেন না যে, এই সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ফটো দুইটি (৪৯ এবং ৪৮ চিহ্নিত) প্রথম দেখিলে কাহারও নিকট উহা একই ব্যক্তির ফটো বলিয়া বোধ হইবে না। মিঃ উইনটারটন এবং মিঃ গাঙ্গুলীর মতে, বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে উহা একই ব্যক্তির বিভিন্ন বয়সের ছবি বলিয়া মনে হইবে। মিঃ চৌধুরী বলেন, একই ব্যক্তির বিভিন্ন বয়সে তোলা বিভিন্ন ফটোতে তাঁহাকে দৃষ্টিমাত্র চিনিতে পারা উচিত, কিন্তু কাহারও ফটো যদি অনেকদিন পর তোলা হয়, তবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে যেমন বদলাইবে (অবশ্য যাহারা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বিশেষ বদলায় না, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র), তাহার বিভিন্ন সময়ের ফটোও সেই কারণে তাহার সঙ্গে চেনাপরিচয় না থাকিলে, দৃষ্টিমাত্র ঠিক করা যায় না। এরূপ দেখা যায়, পরিচয় না হইবার পূর্ব্বে তরুণ বয়সে গৃহীত বন্ধুর ফটোতে অনেকে নিজ বন্ধুকে চিনিয়া উঠিতে পারেন না। তবে যিনি তাঁহার বন্ধুকে বরাবর চিনেন, তাঁহার পক্ষে তাঁহার বন্ধুর সহিত পরিচয় হইবার পূর্ব্বে অল্পবয়সে গৃহীত ফটোতেও বন্ধুকে চিনিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি

চিরকাল অন্য একজনকে দেখিয়া আসিয়াছে, সে অপর ব্যক্তির শিশুকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যে কোন সময়ের গৃহীত ফটো হইতেই তাহাকে চিনিতে পারিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ মেজকুমারের যে আটখানা ফটো দাখিল করা হইয়াছে, তাহার কথাই ধরা যাক। ১নং একজিবিটে তিনি একটি ক্ষুদ্র বালক। ৪০ একজিবিটে তাঁহাকে ১৪ বৎসরের একটী বালকরূপে দেখা যায়। বাদী পক্ষের ৬৩নং সাক্ষী মুখুটি, যিনি ঐ ফটোতে কুমারের সহিত রহিয়াছেন, তিনিও একথা বলেন। ক (১৫নং) একজিবিট একটি আধুনিককালের ফটো এবং ১১নং একজিবিট আরও পরবর্ত্তী কালের। বাদীর উক্তি অনুসারে উহা দার্জ্জিলিং যাওয়ার পূর্ব্বে গৃহীত। এক্ষণে এই ফটোগুলির কোন দুইটিই যাঁহারা কুমারকে দেখেন নাই, তাঁহাদের নিকট একই ব্যক্তির ফটো বলিয়া বোধ হইবে না; যাঁহারা কুমারকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কিন্তু কুমারকে চিনিতে অসুবিধা হয় নাই। রাণী (১নং বিবাদিনী) (একজিবিট নং ৪০এ) তাঁহার স্বামীকে চিনিতে পারেন নাই। তাহার কারণ তিনি তাঁহাকে ১৪ বৎসর বয়সে দেখেন নাই। বীরেন্দ্র (বিবাদীপক্ষের ২৯০নং সাক্ষী) যাহার সঙ্গে কুমারের পরে পরিচয় ঘটিয়াছিল, তিনিও তাঁহাকে ঐ ফটোতে চিনিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, না বলিয়া দিলে ঐ ফটো যে মেজকুমারেরই ফটো, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতেন না। আপনারা যদি ১১নং একজিবিট মধ্যস্থিত মেজকুমারের ফটো, (ক) ১৫নং একজিবিটে ফ্রক ও কোট পরিহিত মেজকুমারের ফটো এবং বাদীর শ্মশ্রুবিহীন যে কোন ফটো দেখেন, তাহা হইলে কুমারকে পূর্ব্বে না দেখিয়া থাকিলে আপনারা সকলেই উহা বিভিন্ন ব্যক্তির ফটো বলিয়া মনে করিবেন। আর আপনাদিগকে যদি বলা হয় যে, এই ফটোগুলির মধ্যে যে কোন দুইখানিতে একই ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস আপনারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া পরে যে ধারণাই করুন না কেন—প্রথমেই আপনারা ফ্রক ও কোট পরিহিত ফটো এবং বাদীর ফটো—এই দুইখানার দুইটি ফটো বলিয়া বাছিয়া লইবেন। যাহা সহজেই ধরা যায় বলিয়া আমার নিকট বোধ হয়, তাহা নিয়াই আমি এতক্ষণ আলোচনা করিলাম। ইহার কারণ এই যে, মিঃ চৌধুরী এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন এবং এমন কি মিঃ পার্সি ব্রাউন এবং মিঃ মসলহোয়াইট মূলতঃ ইহা স্বীকার করিয়া নিলেও এই সহজ সত্যটি অস্বীকার করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন—এতদ্ব্যতীত ইহাও বলা প্রয়োজন যে, শুধু ফটো দেখিয়াই আমরা এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিতে পারি না।

যে কথা এই মাত্র বর্ণিত হইল যে, যাঁহারা কুমারকে চিনিতেন, তাঁহারা তাঁহাদের পরিচয়কালে কুমারকে বিভিন্ন সময়ের গৃহীত ফটোতে কুমারকে অবশ্যই চিনিতে পারিবেন, কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তিগণ তাহা কখনও পারিবেন না,—ইহা হইতে এই সত্যে উপনীত হওয়া যায় যে, কোনও ব্যক্তি বাস্তবিকপক্ষে সেই ব্যক্তি কিনা, তাহা এইরূপে চিনিবার উপরেই নির্ভর করে। ব্যক্তি বিশেষকে ঠিক করিবার পরবর্ত্তী প্রকৃষ্ট উপায় হইল, চেনা না থাকিলে সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে নির্ণয় করা; যেমন জলমগ্ন ব্যক্তিকে তাহার পকেটে প্রাপ্ত কোন চিঠি হইতে অথবা কোনও চোরকে তাহার টিপসই হইতে ঠিক করা হইয়া থাকে। যাহারা কুমারকে চিনিতেন, তাহারা কুমারের ফটোতে একই ব্যক্তিকে দেখিয়া থাকেন; কারণ অপরিচিতগণ না বুঝিতে পারিলেও এই সকল পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট বিভিন্ন ফটোর মধ্যে এইরূপ একটা ঘনিষ্ঠতার ভাব বিদ্যমান থাকে যে, যদি পূর্ব্বদৃষ্ট ছবির ছায়া মন হইতে মুছিয়া না যায়, তাহা হইলে তাহারা তাহাকে চিনিতে সমর্থ হয়। কেহ যদি কোনও ব্যক্তিকে একবার নয়, মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার চেহারা সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা হইয়া থাকে। বার্দ্ধক্য, রোগ বা কোনও দুর্ঘটনার ফলে ঐ ব্যক্তির কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিলেও তাহাকে চিনিতে পারা যায়। সুতরাং যে সকল সাক্ষী এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহারা বিশ্লেষণ বা বর্ণনা করিতে পারে নাই—এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া মিঃ চৌধুরী তাহাদের চিনিবার কথা উড়াইয়া দিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সফল হয় নাই। কিন্তু শিশুরাও চিনিতে পারে। কাহারও কণ্ঠস্বর কিরূপ, তাহা বর্ণনা করিতে না পারিলেও তাহা চিনিতে পারা যায়। পৃথক পৃথক ভাবে দেখিলে অন্যের সহিত যে সমস্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে না, তাহাই সমষ্টিগত ভাবে এরূপ ফল উৎপাদন করে যাহাতে তাহার স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠে। ইহা লক্ষ্য করা যায় বা ইহার ছবি আঁকা যায়,—কিন্তু ইহার বর্ণনা সম্ভব নহে। কোনও কিছুর বর্ণনা অবলম্বন অঙ্কিত করিয়া তাহার হুবহু প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা যায় না। কোনও লোকের চেহারায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে তাহার পার্থক্য সনাক্ত করার শক্তি কাহারও মুখমণ্ডলের সমগ্র রূপ কেহ প্রথমে আংশিকভাবে খণ্ড খণ্ড আকারে দেখে না। মিঃ চৌধুরী সাক্ষীদের প্রশ্ন করিয়াছেন,—"রাজা ও রূপ বাবুর চেহারায় কি পার্থক্য তাহা বলিতে পারেন? (বাদী পক্ষের সাক্ষী নং ৫৩৮) দিগিন্দ্রবাবু ও পুবাইলের জমিদারের মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে? (বাদী পক্ষের ৬০৮নং

সাক্ষী) আপনার জমিদারের চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন ? (৭৫২ নং সাক্ষী) রাজা ও বড়কুমারের চেহারায় কি পার্থক্য ছিল ? (বাদী পক্ষের সাক্ষী নং ৫১৪) বিল্লু ও টেব্বুর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করিতে পারেন ? (বাদী পক্ষের ১৩৭নং সাক্ষী) মধ্যমকুমার ও বুদ্ধুর নাকের কি পার্থক্য ছিল ? (বাদী পক্ষের ৩৬০নং সাক্ষী) আপনাদের গ্রামের বিহারী সাহার চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন ? (বাদীপক্ষের ১৭৯নং সাক্ষী) নরেন্দ্র চৌধুরী ও তাহার পিতার চেহারার পার্থক্য কি ? (বাদীপক্ষের ৩৯৯নং সাক্ষী) মিসেস মায়ারের ভগ্নীপতির চেহারা বর্ণনা করিতে পারেন ? (কুমারের ভাগিনেয় বাদীপক্ষের ৪৩৮নং সাক্ষী)"

মিঃ চৌধুরী এইরূপ প্রশ্ন দ্বারা একের সহিত অন্যের চেহারার সাদৃশ্য বিশ্লেষণ কবিবার অক্ষমতা অথবা কুমারকে চিনিতে পারিবার কথা মিথ্যা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। একজন সাক্ষী আদালতের প্রশ্নের জবাবে বলিয়াছিল যে, তাহার দুই ছেলের চেহারার মধ্যে কি পার্থক্য আছে তাহাও বুঝাইয়া বলা তাহার সাধ্যাতীত ; সে মাত্র ইহাই বলিতে পারে যে, তাহার এক পুত্র মোটা ও কাল ধরণের এবং অপর পুত্রের গায়ের রং ফর্সা। (বাদী পক্ষের ৪৯৮ নং সাক্ষী) ; জনৈক চাষীকে (বাদীকে পক্ষের ৪২৫ নং সাক্ষী) যখন প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাঁহাকে চিনিবার পূর্ব্বে তুমি তাঁহার কি লক্ষ্য করিয়াছিলে ?—সে জবাব দেয়,—বাদীর মুখমণ্ডল। অপর সাক্ষীকে (বাদী পক্ষের ৩২৫নং সাক্ষীকে) জিজ্ঞাসা করা হয়,—বাদীকে চিনিবার পূর্ব্বে তুমি তাঁহার মুখমণ্ডলের প্রথম কি দেখিয়াছিলে ?—শ্মশ্রু ও দীর্ঘ কেশ।

প্রশ্ন—তুমি দীর্ঘকেশ ও শ্মশ্রু দেখিয়া বাদীকে চিনিয়াছিলে ?

উঃ—হাঁ, (কিছুক্ষণ থামিয়া) এবং তাহার মুখ দেখিয়া।

এই সকল কৃষক প্রজা সাক্ষী—যাহারা কুমারকে চিনিত পারিয়াছিল বলিয়া আদালতে জবানবন্দী দেয়, তাহাদের প্রায় সকলেই কুমারকে চোখে দেখিয়া চিনিয়াছিল। এই সকল সাক্ষীর উক্তির বিস্তৃত সমালোচনা করিব না। বাদীপক্ষে ৪৭৩ জন প্রজা ও অপর জমিদারের অধীন কতিপয় কৃষককে সাক্ষী হাজির করা হয়। বিবাদী পক্ষে ২১৯ জন প্রজা সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয়। উভয় পক্ষের এই শ্রেণীর সাক্ষীরা বাদীকে জয়দেবপুরে দেখিয়াছিল। 'বাদী ঐ সময় জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন' বলিয়াছে।

বাদী পক্ষের সাক্ষীরা বলিয়াছে, তাহারা দৃষ্টিমাত্র মধ্যমকুমারকে চিনিতে পারে নাই। খানিকক্ষণ তাহাকে দেখিবার পর চিনিয়াছিল।

বিবাদীপক্ষের সাক্ষীরা বলিয়াছে, তাহারা বাদীকে প্রথম হইতেই ভিন্ন লোক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। বাদী পক্ষের বহু সাক্ষী বলিয়াছে, তাহারা বাদীকে খাজানা বা নজর দিয়াছে। এই দুই দলের সাক্ষীদের উক্তি সম্বন্ধে কোনও কিছু সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে এই সম্পর্কে দুইখানি চিঠির কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ১৯৩৩ সালের ৩১শে মে বর্ত্তমান মামলা দায়ের হইবার প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে, রায় সাহেব যোগেন্দ্র ব্যানার্জ্জী জনৈক নায়েবকে বাঙ্গালায় যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—

"রাজ তরফে সাক্ষ্য দিবার জন্য আপনি যাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন, তাহাদের জবানবন্দী লইয়া আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। কি রকম জবানবন্দী দিতে হইবে, তাহার নমুনা এই সঙ্গে পাঠাইলাম, দেখিবেন, সাক্ষীদের সকলেই যেন একই কথা একইভাবে আবৃত্তি না করে। অপরপক্ষ যাহাদের সাক্ষী মানিয়াছে, তাহাদেরও তলব করিয়া ঐরূপ জবানবন্দী লিখাইয়া লইবেন।"

জবানবন্দীর নমুনা নিম্নলিখিতরূপ (একজিবিট ৩০৯ (১) :—

"আমার বয়স......আমি······রাজ সরকারে খাজানা দেই। মধ্যম কুমারের জীবিতকালে আমি বহুবার রাজবাড়ীতে দরবারে গিয়াছি। সকল কুমারকেই আমি চিনিতাম ; তাঁহারাও সকলে আমাকে চিনিতেন। পরলোকগত মধ্যমকুমার বিচার করিতেন, তাঁহার নিকট বহুবার আমি খাজানা দিয়াছি এবং তাঁহাকে খুব ভাল করিয়া চিনিতাম, এই সন্ন্যাসী হিন্দিতে কথা বলেন ; স্বর্গত মধ্যমকুমার আমাদের সহিত বাঙ্গালায় কথা কহিতেন।

মধ্যমকুমারের কণ্ঠস্বর ও চেহারার সহিত সন্ন্যাসীর কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। মধ্যমকুমারের (সন্ন্যাসীর) আগমনকাল পর্য্যন্ত আমি কোনও দিনও গুজব শুনি নাই যে, তাঁহার শবদাহ হয় নাই, বা তিনি প্রকৃত পক্ষে মারা যান নাই। এই সন্ন্যাসী যে মধ্যমকুমার ইহা আমি বিশ্বাস করি না।

রায় সাহেব যোগেন্দ্র ব্যানার্জ্জী এই মামলায় বিবাদী পক্ষের প্রধান তদ্বিরকারক ছিলেন। তিনি এই চিঠির কথা (৩০৯নং একজিবিট) স্বীকার করিয়াছেন।

অপর চিঠিখানি (৩৫৩ (১) নং একজিবিট) ভাওয়াল এষ্টেটের জনৈক ইনস্পেক্টারের সার্কুলার। উহা 'লিথো' করা ছিল এবং উহাতে বিভিন্ন

নায়েবের নাম পূরণ করিবার ব্যবস্থা ছিল। এই সার্কুলারে লিখিত ছিল :—যাহাতে রাজ এষ্টেটেব কোনও প্রজা বা অপর কেহ বাদী পক্ষে সাক্ষী না দেয়। পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। অপর পক্ষ যাহাদিগকে সাক্ষী মানিয়াছে, তাহাব তালিকা পূর্ব্বেই আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছে; উপরোক্ত একজিবিটখানি যে নায়েবের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তাঁহা হইতে জনৈক সাক্ষী সম্পর্কে তাঁহাকে লেখা হইয়াছে,—"সুস্পষ্ট বুঝা গিয়াছে ঐ সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে সন্ন্যাসীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। সুতরাং নায়েবকে কেন চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইবে না, তাহার কারণ দেখাইতে হইবে। নায়েবকে আরও লেখা হইয়াছিল :—আপনি যখন ঐ সাক্ষীকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই,—তখন আপনার ঐ সাক্ষী সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে রায় সাহেবকে জানাইয়া তাহাকে রায় সাহেবের নিকট হাজির করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল।"

এই চিঠি দুইখানি যথাক্রমে ২০-১১-৩৩ ও ২০-১২-৩৩ তারিখযুক্ত ছিল। ২৭-১১-৩৩ তারিখে মামলা আরম্ভ হয়।

ইহা হইতে স্বতঃই উপলব্ধি হয় যে, বিবাদী পক্ষের প্রজা সাক্ষী গঠনে উপরোক্ত পত্রগুলি কার্য্যকরী হইয়াছে, ঐ সকল সাক্ষী ইহাও স্বীকার করিয়াছে যে, নায়েব পেয়াদা সঙ্গে দিয়া তাহাদিগকে দলে দলে সাক্ষ্য দিতে প্রেরণ করিয়াছে। যে সকল প্রজা বাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহারা উপরোক্ত আদেশ এবং সাধুর পক্ষে সাক্ষ্য দিলে উৎখাতের মামলা আনয়ন করা হইবে বলিয়া যে সকল ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়া সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিল।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই সমস্ত প্রজা সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক, অপর পক্ষ যেমন দরিদ্র বলিয়াছেন তাহা নহে। সাধারণভাবে ইহাই আমি বলিতেছি যে, তাহাবা যে বিশ্লেষণ করিতে বা বর্ণনা করিতে পারে নাই তাহার জন্য তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। সেই যুক্তি আমি খণ্ডন করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে জেরা করিবার সময় তাহারা কুমারকে মোটেই দেখে নাই, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য যে চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ সাক্ষীদের অন্য একটী দলকেও, যদিও তাহারা এই দল অপেক্ষা অধিক সুযোগ পায় নাই, স্বীকার করিতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় কুমারকে সকলেই দেখিতে পাইত। কুমার সব সময় ঘরেই বন্ধ হইয়া থাকিতেন না। তিনি বাহিরে যে কোন যায়গায় যাইতেন এবং যে কোন জায়গাতেই তাঁহাকে দেখা

যাইত। সকালে তিনি প্রায়ই অশ্বশালায় যাইতেন, তিনি পিলখানায়ও যাইতেন। হস্তীপৃষ্ঠে, অশ্বপৃষ্ঠে, গাড়ীতে তিনি বাহির হইতেন। রথে রাজবাড়ীর সম্মুখের ময়দানে, হাটে, রেলওয়ে ষ্টেশনে তিনি যাইতেন; শিকার করিতে তিনি জঙ্গলেও যাইতেন। বিবাদী পক্ষের সাক্ষীগণ ইহার অধিকাংশই স্বীকার করিয়াছেন এবং অন্যান্য কেহও ইহা অস্বীকরে করেন নাই। প্রবেশদ্বারের সম্মুখে পাহারা নিযুক্ত করিয়া, চিড়িয়াখানায় প্রবেশের নির্দ্দিষ্ট সময় ঠিক করিয়া অথবা নাটমন্দির বা অন্য প্রজা বা দর্শকের সম্মুখে বাহির হওয়া লজ্জার বিষয়, বলিয়া গানের সময় নাটমন্দিরের কোন ঘরের মধ্যে কুমারের বসিবার বন্দোবস্ত হইত। দ্বিতীয় কুমারকে লোকচক্ষুর আড়াল রাখিতে বিবাদীগণ সক্ষম ছিলেন না। এইরূপ কিছুই ছিল না; বরং কুমারের পক্ষে ইহা শিষ্টাচারেরই বিষয় ছিল। প্রজারা অবশ্যই কুমারের নিকট হইতে দূরেই থাকিত। কিন্তু ম্যানেজারগণকে স্মরণে রাখা, ভূমিকম্পে রাজবাড়ীর ক্ষতির কথা, পিলখানা বর্ত্তমান স্থানে সরাইবার ঠিক সময় বলা, তাহাদের বয়সের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অন্যান্য তারিখগুলি ঠিক ঠিক বলা, প্রভৃতি না বলিতে পরিলেও কিম্বা দ্বিতীয় কুমারের সহিত তাহাদের কোন কাজ কারবার না থাকিলেও, তাহারা নিশ্চয়ই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তাঁহাদের মালিককে দেখিয়াছিল।

ম্যাপ লক্ষ করিলে দেখা যায় যে, এই সমস্ত প্রজার অধিকাংশেরই বাড়ী জয়দেবপুর হইতে তিন মাইল দূরের মধ্যে বিভিন্ন গ্রামে এই জয়দেবপুরেই তাহাদের রেলওয়ে ষ্টেশন, তাহাদের বাজার এবং ইহাই তাহাদের মালিকের বাড়ী। বিবাদীগণ নিজেরাই সে সমস্ত প্রজা সাক্ষী হাজির করিয়াছেন, তাহাদিগের কথার দিক হইতে বিচার করিলেও আমার নিকট ইহা আশ্চর্য্য বোধ হয়, প্রজারা যে কুমারকে দেখে নাই, এই মতবাদ কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল।

প্রজাদের দৃষ্টিতে মধ্যম কুমার •

আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, এই সকল প্রজারা কুমারদিগকে দেখিয়াছিল এবং দ্বিতীয় কুমারকে প্রায় সকলেই দেখিয়াছিল। আমি এই সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ যে, তাহারা বাদীকে কুমার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। তবে প্রাচীন রাজপরিবারের প্রতি ভক্তি থাকায় এবং চেহারার সাদৃশ্যের দরুণ ভুল করিবার সম্ভাবনা থাকায় অন্য কোনভাবে কুমারের সাদৃশ্য প্রমাণিত না হইলে এই মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া কেবল প্রজাদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া

অসম্ভব। কিন্তু আমি এই সঙ্গে বলিব যে, বিবাদী পক্ষে যে সকল সাক্ষীকে রায় সাহেবের মার্কামারা সাক্ষ্যের প্রতিধ্বনি করিবার জন্য আনা হইয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে জেরায় যাহা আদায় হইয়াছে তদ্ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। তাহারা যাহা বলিয়াছে—তাহার নমুনা-স্বরূপ বলা যাইতে পারে—বাদী ভিন্ন ব্যক্তি, তাহার মুখের চেহারা একেবারে ভিন্ন রকমের। তাহাদের প্রধান যুক্তিই ছিল বাদীর মুখাবয়ব সম্পূর্ণ পৃথক, এত পৃথক যে, দেখা মাত্রই ধরা যায়, কিন্তু বিবাদী পক্ষের ৩৩৬নং সাক্ষীকে বাদীর চেহারার সাদৃশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়:—

প্রশ্ন—দেখিয়াই তুমি চিনিয়াছিলে যে, বাদী দ্বিতীয় কুমার নহে?

উত্তর—দেখামাত্রই, একথা কেহ বলিতে পারে না। কাজেই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলাম।

ইহার পর সে বলে যে, উকীলের নিকট একথা সে বলিয়াছিল যে, কুমারের চেহারার সহিত বাদীর চেহারার যে কোন সাদৃশ্য নাই তাহা দেখামাত্রই বুঝা যায়। এই কথা উল্টাইয়া আবার সে বলে যে, দেখামাত্রই নহে, ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া শেষে সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, বাদী কুমার নহে।

প্র:—তাহাকে দেখামাত্র তোমার কি মনে হইল?

উ:—একই ব্যক্তি।

আদালতে সাক্ষীর কথায় ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে, সে সমস্যায় পড়িয়াছিল। সাদৃশ্য সম্বন্ধে ইতর বিশেষ যাহাই থাকুক, এই কি সেই একই লোক?

যাহাই হউক না কেন, এই মামলায় বৈসাদৃশ্য প্রমাণের জন্য বিবাদী পক্ষ যেমন জোর দিয়াছেন এমন আর কিছুতেই দেওয়া হয় নাই। **রায় সাহেবের মার্কামারা সাক্ষ্যে** কেবল এই কথাই বলা হইয়াছে। মামলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে একমাত্র মিঃ আর, এন, শেঠ ব্যতীত বিবাদীপক্ষের যে সকল সাক্ষীর কমিশনে সাক্ষ্য নেওয়া হইয়াছে, উহাদের প্রত্যেকের মুখে এই একই কথা। মামলার সময় বাদীপক্ষের ২নং এবং ৯নং সাক্ষীকে এবং এমন কি বাদীপক্ষের ৬৬০নং সাক্ষী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে পর্য্যন্ত বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, বাদীও কুমারের চেহারার মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই। বাদীপক্ষের ৯নং সাক্ষী জিতেন্দ্রকেও এই প্রশ্নই করা হয়। ইহার পর আবার বাদীকে ছাড়িয়া দিয়া প্রশ্ন করা হইতে থাকে যে, দ্বিতীয় কুমার, ছোট কুমার এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পুত্র বুদ্ধুর মধ্যে চেহারার সাদৃশ্য আছে কিনা? শত শত সাক্ষীকে এই প্রশ্ন

করা হয়। ৮-১-৩৪ তারিখে বাদী একখানি দরখাস্ত করিয়া বলেন যে, মামলাটি এখনও পর্য্যন্ত বিবাদী পক্ষ হইতে শুধু বৈসাদৃশ্যের উপর রাখিবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা হয় যে, মামলা এখনও লিখিত জবানবন্দীতে আছে। এই সম্বন্ধে সেখানে বলিবার কিছু নাই; এই ভাবে বাদীর সাদৃশ্য স্বীকার করিয়া ৯৬৭ জন সাক্ষী জবানবন্দী দিলে বাদী পক্ষের সাক্ষ্য দেওয়া যখন শেষ হয়, তখন মিঃ চৌধুরী তাঁহার মামলার কয়েকটি বিষয়ে বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু চেহারার সাধারণ যে সাদৃশ্য থাকার দরুণ একই ব্যক্তি বলিয়া ভুল হইবার সম্ভাবনা আছে, তৎসম্পর্কে আমি প্রশ্ন না করা পর্য্যন্ত, মিঃ চৌধুরী কোন উচ্চবাচাই করেন নাই। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "বাদী ও দ্বিতীয় কুমারের চেহারা যে একেবারেই পৃথক এমন নহে, তবে যাঁহারা এই দুইজনকে একব্যক্তি বলিয়াছেন তাঁহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন" আমি তাঁহার এই কথাগুলি টুকিয়া লই। ইহার পরে তিনি বলেন, যাহারা তাহাতে কোনও উপলক্ষে মাত্র দেখিয়াছে তাহাদের পক্ষে এই ভুল করা সম্ভব। দ্বিতীয় রাণী এতদূর যাইবেন না" কিন্তু ইহার পর দেখা যায়, আবার সেই চেহারার বৈসাদৃশ্য এবং মুখের ভিন্ন রকম গড়নকেই কেন্দ্র করিয়া সাক্ষ্যগ্রহণ চলিতে থাকে। বাদীপক্ষের ৬৬০নং সাক্ষীর জবানবন্দী পর্য্যন্ত এইরূপে মামলা চলিতে থাকে। সম্পূর্ণ পার্থক্য এবং সাদৃশ্য এই দুইটিরমধ্যে কোন একটি বিষয়ের সিদ্ধান্তে আদালতকে উপস্থিত হইতে হইবে, ইহা আমি স্বীকার করি না; এবং প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণের কথা বিবেচনা করিয়া আমি ইহাও ধরিয়া লইতে পারি না যে, সাক্ষীরা মিথ্যা কথা বলিয়াছে, বা বাদী একই ব্যক্তির সাদৃশ্য ঘোষণা সম্পর্কে সকল অবিসংবাদিত সত্য কথা রহিয়াছে। মিঃ নীডহামের রিপোর্টের সারমর্ম্ম ভগ্নীর সরল বিশ্বাস, পিতামহীর মুখাগ্নি এবং শ্রাদ্ধ, যে সকল ভদ্রলোক সে অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন, নজর ও খাজনা পাওয়া এবং কুমারকে যে সকল সম্ভ্রান্ত লোক জানিতেন তাঁহাদের মতামত, বাদীর সাদৃশ্য সম্পর্কে ৯৬৭ জন সাক্ষীর প্রতিশ্রুতি, মিঃ জে, এন, গুপ্তের সাক্ষ্য যে, উভয়ের চেহারায় সাদৃশ্য আছে, মিঃ র‍্যাঙ্কিনের সাক্ষ্য, যে, কেহ যদি দ্বিতীয়কুমারের সহিত বাদীর চেহারার সাদৃশ্য আছে বলিয়া থাকে তবে, সে সত্য কথাই বলিয়াছে, বিবাদী পক্ষের ৫২নং সাক্ষী মি কে, সি, দে'র সাক্ষ্য যে, কেহ যদি সাদৃশ্যের কথা অস্বীকার করে তবে সে ভুল করিয়াছে। বিবাদী পক্ষের ২৮০ নং সাক্ষী দ্বিতীয় রাণীর নিকট সম্পর্কীয়া ভগ্নী সুকুমারীর জেরায় সাদৃশ্যের কথা অস্বীকার করিয়াছেন, এই সকল বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করিব। বিবাদী পক্ষের

৩৩৬নং সাক্ষী সেই বৃদ্ধ কৃষক "প্রথমে দেখিয়া মনে হয় যে, একই ব্যক্তি" এই কথা বলায় আমি যে সমস্যায় পড়িয়াছিলাম, তাহাও আমি আলোচনা করিব। কেবল চেহারার সাদৃশ্য সম্পর্কে সাক্ষীদের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া যদি সাদৃশ্য সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিতে হইত, তবে সাক্ষাদের বিশ্বস্ততা, পদমর্য্যাদা প্রভৃতি অনেক বিষয়েরই বিবেচনা করিবার ছিল। কিন্তু সুখের বিষয় কেবল সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া বাদীর সাদৃশ্য সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়োজন নাই, কারণ বাদীর অঙ্গে নানারূপ চিহ্ন এবং বাদী ও কুমারের ফটো রহিয়াছে।

বাদ-বিসম্বাদের এই সীমা নির্দ্দেশ করিয়া আমি উভয় পক্ষের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিব। বাদী পক্ষে মোট ১০৬৯ জনের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ২৭ জনের সাক্ষ্য কমিশনে গৃহীত হয়। বাদী পক্ষের সাক্ষীদের মধ্যে এমন ৯২ জন আছেন, যাঁহাদের সাক্ষ্য সনাক্তকরণের জন্য গৃহীত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে দার্জ্জিলিংয়ের দুই ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেই নানান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লোক। দশজন সাক্ষী কিছুই প্রমাণ করিতে পারে নাই। কাজেই বলা যায় যে, ৯৬৭জন সাক্ষী বলিয়াছে, বাদী ও দ্বিতীয় কুমার একই লোক। এই ৯৬৭ জন সাক্ষীর মধ্যে ৪৭৩ জন সাধারণ কৃষক। তাহাদের কথা আগেই বলা হইয়াছে। বাকী সাক্ষীদিগকে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়।

বাদীর আত্মীয়—১৮, প্রাচীন কর্ম্মচারী—৬৬, চাকরবাকর—৩৩, বাদীর নিজের চাকর—১০, জয়দেবপুরে এবং অন্যান্য স্থানে নিযুক্ত রেলওয়ের কর্ম্মচারী —১৯, ব্যবসায়ী, বাদ্যকর এবং অনুরূপ জীবিকার্জ্জনকারী—৪১, জয়দেবপুরের শিক্ষক, ছাত্র, পুরোহিত, প্রাক্তন ছাত্র প্রভৃতি সাধারণ ভদ্রলোক ৩৩, অবস্থাপন্ন তালুকদার—২১, অন্তরঙ্গ বন্ধু—২, ব্যারিষ্টার, উকিল, এডভোকেট, ডাক্তার প্রভৃতি শ্রেণীর ধনী, অথবা প্রতিপত্তিশালী লোক—৫৮ জন, ইহাদের মোট সংখ্যা ৩০১ জন। বাকী সাক্ষীদের ভাওয়াল রাজপরিবারের কোন লেনদেন ছিল না। ইহাদের অধিকাংশই ঢাকাবাসী, এবং ইহারা বলিয়াছে যে, কুমারকে তাহারা চিনিত। সাক্ষীদের মধ্যে ২০ জন বাদীর স্ব-গ্রামবাসী।

সাক্ষীদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। আমি কয়েকজনের সাক্ষ্য মাত্র বিশ্লেষণ করিব। ইহাদিগকে আমি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিব— (১) যে ধরণের লোক হউক না কেন, যাহারা সত্য সত্যই কুমারকে চিনিত এবং তাহাকে দেখিয়া ভুল করিবার যাহাদের সম্ভাবনা নাই; (২) যাঁহাদের

বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না, এমন যে সকল লোক কুমারকে চিনিতেন এবং তাঁহাদের নিকট মাত্র এই প্রশ্নই করা হইয়াছে যে, কুমারের কথা তাঁহাদের কতদূর মনে আছে।

যাহাদের সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা কম প্রশ্ন উঠিবে আমি তাহাদের সাক্ষ্যই বিশ্লেষণ করিব।

যাঁহারা মেজো কুমারকে সত্য সত্যই চিনিতেন

(১) বাদী পক্ষের ৬৬০নং সাক্ষী কুমারদের ভগ্নী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

পূর্ব্বে না হইলেও ১৯২১ সালের ৪ঠা মে আত্মপরিচয়ের দিন হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বাদীকে তাঁহার ভাই বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিবার যে যথেষ্ট কারণ আছে তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং আমি ইহা বিশ্বাস করি। তিনি আন্তরিকভাবে এ বিশ্বাস করিয়াছিলেন— রায় সাহেবও মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি আন্তরিকভাবেই এ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। এবং উহাই মিঃ নীডহ্যামের রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছিল মিঃ নীডহ্যামের রিপোর্ট বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারই রিপোর্ট, তিনি কুমারকে অন্যান্যের মতই জানিতেন, তিনি সাধুকেও দেখিয়াছিলেন, যে, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, তাঁহার ছেলেমেয়েরা এবং তাঁহার ভগিনীর ছেলেমেয়েরা সাধুকে কুমার বলিয়া সরল মনে বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

এদিকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বিরুদ্ধে বিবাদীপক্ষ বলিয়াছেন যে, তিনি, তাঁহার ভগিনী ও তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা সকলেই কুমারদের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজবাড়ীতে আরামে বাস করিতেছিলেন, পরে তাঁহাদিগকে রাজবাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং ছোট রাণী পোষ্য গ্রহণ করিলে তাঁহাদের সমস্ত আশা-ভরসা নির্ম্মূল হইয়া যায়। তাঁহারা যে তাঁহাদের ভ্রাতাদের পরিবারের লোক হিসাবে বাস করিতে ছিলেন, তাহা সত্য। ছোট রাণী দত্তক গ্রহণ করিলে তাঁহাদের পুত্রদের এষ্টেট পাইবার আশা যে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল, তাহাও সত্য; কিন্তু তাঁহাদিগকে রাজবাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এই কথা জ্ঞানকৃত মিথ্যা। ছোট কুমারের মৃত্যুর পূর্ব্বেই ইন্দুময়ী দেবীর বাড়ী নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছিল, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ী নির্ম্মিত হইতে ছিল, এবং ছোট কুমারের যেদিন মৃত্যু হয়, সেইদিন হইতেই তাঁহারা আর জয়দেবপুরের বা নলগোলা রাজবাড়ীতে প্রবেশ করেন নাই। আমি এ স্থলে যাহা বলিলাম, কেহই এমন কি, স্বয়ং রায় সাহেবও তাহার প্রতিবাদ করেন নাই। মিঃ চৌধুরী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে শুধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন

যে, তাঁহাকে নলগোলা রাজবাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে বলা হইয়াছিল কিনা ? কেহই তাহাকে দেখিতে যায় নাই, বরং বিবাদী পক্ষ এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছেন যে, ছোট রাণী কুমারদের ভগিনীদ্বয়কে ঐ বাড়ীতে থাকিতে অনুরোধ করিলেও তাঁহারা অশোভন ব্যস্ততার সহিত ঐ বাড়ী পরিত্যাগ করেন।

ভগিনীরা যে ছোট কুমারের মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই ভ্রাতাগণ হইতে পৃথক হইবার কথা ভাবিতেছিলেন তাহা সুস্পষ্ট। কেহই অস্বীকার করিতেছে না যে, তাঁহারা যে বাড়ীতে বাস করিতেছেন। ছোট কুমারের মৃত্যুর পূর্ব্বে উহা তৈয়ার হয় নাই বা উহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় নাই। তবে এ কথা সত্য যে, একটি ভ্রাতা দাঁড় করাইতে পারিলে তাঁহাদের খুবই সুবিধা হইত; এবং ১৯১৯ সালে ছোট রাণী দত্তক গ্রহণ করিলে তাহাদের পুত্রদের এষ্টেটের উত্তরাধিকারী হইবার সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইয়া যায়,—যদিও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর এখন কোনও পুত্র নাই। তাঁহার একমাত্র পুত্র বুদ্ধ এই মামলার শুনানী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই মারা যায়। একটি ভাই দাঁড় করাইতে পারিলে তাঁহার সুবিধাই হইত, কিন্তু তিনি দরিদ্র ছিলেন না,—অবশ্যই রাজার সঙ্গে তাঁহার তুলনা চলে না। তাঁহা মাসিক দুইশত টাকা আয় ছিল এবং উইল অনুসারেও তিনি আরও কিছু সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। ঐ টাকা লইয়া যে মামলা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা ১৯১১ সালের পরে হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রের জুড়ী গাড়ী ছিল, তিনি খুব ধনী ছিলেন না বটে, কিন্তু অভাবগ্রস্তও ছিলেন না। একটি ভ্রাতা দাঁড় করাইতে পারিলে তাঁহার সুবিধাই হইত, কিন্তু পাগল না হইলে তিনি যে কোন লোককে ভাই দাঁড় করাইতেন না; পাগল না হইলে তিনি ভাবিতে পারিতেন না যে, ভ্রাতার বিধবা পত্নীর বিরোধিত, ভাওয়াল এষ্টেটের বিপুল ঐশ্বর্য্য ও যোগাড়-যন্ত্র, কৃতকার্য্যতায় সুদূর সম্ভাবনা সত্ত্বেও তিনি একটী পাঞ্জাবীকে ভাই বলিয়া চালাইয়া দিতে পারিবেন,—সত্যভামা দেবী একটী পাঞ্জাবীকে কুমার বলিয়া গ্রহণ করিবেন কিনা, তাহা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জানা ছিল না। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী নিষ্ঠাবতী আত্মমর্য্যদাজ্ঞান-সম্পন্না বিধবা মহিলা; তিনি একটী পাঞ্জাবীকে ভাই বলিয়া প্রচার করিলেও, ভাওয়াল পরগণার অধিবাসীরা এবং বাহিরের সুরুচিসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত লোকেরা যে পাগল হইয়া তাঁহার জঘন্য চক্রান্ত সমর্থন করিয়া বলিবে, এই পাঞ্জাবীই মেজ কুমার, তাহাও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর আশা করিবার কারণ ছিল না; এমন অবস্থায় তিনি আর্থিক দুর্দ্দিনে পাড়লেও এবং গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলেও যে ঐরূপ চক্রান্ত করিয়া একটী

পাঞ্জাবী সন্ন্যাসীকে ভাই বলিয়া প্রচার করিয়া তাহাকে এমন সময় কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন যে সময় একটিমাত্র প্রশ্নেই সমস্ত চক্রান্ত ধরা পড়িয়া যাইবার সম্ভবনা ছিল—তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে। ইহা কল্পনাতীত। এই মহিলা যাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাই তিনি বলিয়াছেন। সুতরাং এখন দেখিতে হইবে, তাঁহার ধারণা কতদূর সত্য। তাঁহার বিরুদ্ধে এই একটী যুক্তি দেখান হইয়াছে যে, তিনি এখন যদিও বলিতেছেন যে, মেজকুমার মারা যান নাই বলিয়া একটী জনরব রটিয়াছিল, কিন্তু বাদী আসিবার পর তিনি কোর্টে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তাঁহার ভ্রাতারা মারা গিয়াছেন। কিন্তু যদি স্মরণ রাখি যে, ঐ জনরবে বিশ্বাসদ্বারা শুধু আশাই প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাঁহার সেই উক্তি ও এই কোর্টে তাঁহার উক্তি পরস্পর বিরোধী নহে; কারণ কোর্টে গিয়া সাক্ষ্যদানপ্রসঙ্গে আইন অনুসারে যাহা বক্তব্য তাহাই তিনি বলিয়াছিলেন,—তাহার যাহা আশা, তাহাই সত্য,এমন কথা তিনি আদালতে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলিতে পারেন না।

বড়রাণী সরযূবালা দেবী

এই মহিলাটি কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তিনি হলফ করিয়া বলিয়াছেন, **বাদী তাঁহার দেবর, মেজকুমার**। ১৯১০ সালে এই মহিলার স্বামী বড়কুমার মারা যান, তারপর তিনি কলিকাতা চলিয়া যান। আর ফিরিয়া আসেন নাই। ১৯২৫ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতায় মধু গুপ্ত লেনে বাস করিতেন; তৎপর ১১২নং রিপণ ষ্ট্রীটে উঠিয়া যান। ৮নং মধুগুপ্ত লেন হইতে তিনি কোর্ট অব ওয়ার্ডের রিভিনিউ বোর্ডে অনেক পত্র লিখিয়াছেন। ৮নং মধুগুপ্ত লেন তাঁহার পিতার বাড়ী, তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত শৈলেন্দ্র মতিলালও তথায় থাকিতেন। ১৯২১ সালের ৪ঠা মে তারিখে আশু ডাক্তার শৈলেন্দ্র মতিলালের নিকট একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন।

এই মহিলার পিতা একজন উকিল ছিলেন। রাববাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষের পর এবং মিঃ মায়ারের পূর্ব্বে তিনি একবার ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজারও ছিলেন। সাক্ষ্যে দেখা যায় মতিলাল পরিবার কলিকাতায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবার। বড়রাণী ১৯১০ সাল হইতে কলিকাতায় বাস করিতেছেন; সুতরাং বলিতে গেলে ভাওয়ালে তিনি একরূপ অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছেন। মেজ রাণীর ন্যায় তিনিও এষ্টেট হইতে মাসোহারা পান। এই মামলায় তাঁহার স্বার্থ বিপন্ন হয় নাই এবং কোর্টের পরিচালনাভার যাঁহাদের উপর তাঁহারা যে

ব্যক্তিকে প্রতারক বলিয়া মনে করেন সেই ব্যক্তিকে যদি তিনি মেজকুমার বলিয়া সমর্থন করিয়া তাঁহাদের বিরাগ ভাজন না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থ আদৌ বিপন্ন হইত না।

বড়রাণী জেরায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার ভ্রাতা ঢাকা আসিয়াছিলেন। ফিরিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বাদীকে দেখিয়াছেন, এবং **বাদীই মেজকুমার**। এইরূপ কথা তিনি অন্যান্য অনেকের নিকটও শুনিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'আমি ঐ কথা শুনিয়াছিলাম এই পর্য্যন্ত।" অর্থাৎ তিনি ঐ কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ বিষয়ে তাঁহারা কোনও আগ্রহ ছিল না। তারপর ১৯২৪ সালের আষাঢ় কি শ্রাবণ মাসে একদিন সন্ধ্যার পর তিনি আহ্নিক করিতেছিলেন, এমন সময় তিনি শুনিতে পান তাঁহার বাড়ীতে "সন্ন্যাসী কুমার আসিয়াছেন, এবং পাড়ার কয়েকজন লোকও তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে উপরে উঠাইয়া আনান এবং তাঁহাকে দেখিয়া **মেজকুমার বলিয়া চিনিতে পারেন ও মেজকুমার বলিয়া গ্রহণ করেন**। তাহার পর হইতে বাদী যত দিন কলিকাতায় ছিলেন, ততদিন মাসে দুই তিন বার করিয়া বড রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে-গিয়াছিলেন। বাদী ১৯২৪ সালের আগষ্ট হইতে ১৯২৯ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত কলিকাতায় ছিলেন। বাদী বলিয়াছেন, তিনি যেদিন কলিকাতায় পৌছেন সেই দিন মধুগুপ্ত লেনের বাড়ীতে বড় রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বড় রাণী বলিতেছেন, বাদীকে যেদিন তিনি কুমার বলিয়া চিনিতে পারেন সেই দিন হইতে তিনি তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিতেন, এবং বৌদিরা দেবরদের সঙ্গে যেরূপ আলাপ করে তিনিও তদ্রূপ তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতেন।

তাৎকালিক এডভোকেট জেনারেল স্যার এন্, এন্, সরকার বড় রাণীকে জেরা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাক্ষ্য আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। জেরায় একটি বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে, ছোট রাণীর জন্য অনেক ব্যয় হইতেছে মনে করিয়া তিনি কোর্ট অব ওয়ার্ডস ও রেভেনিউ বোর্ডে ঐ সকল ব্যয়ের বিরুদ্ধে অনেক পত্র লিখিয়াছেন; কারণ বড়রাণী ও মেজরাণী কলিকাতায় থাকিতেন, কিন্তু ছোট রাণী ঢাকায় থাকিতেন, সুতরাং মেরামতি খরচা ও মোটর গাড়ীর ব্যয় প্রভৃতির সুবিধা ছোট রাণীই উপভোগ করিতেন; ছোটরাণী ঢাকায় থাকিতেন বলিয়া তিনিই ঐ গাড়ী ব্যবহার করিতেন। আর একটী বিষয় এই যে, তিনি ছোটরাণীর দত্তক গ্রহণ বৈধ হইয়াছে বলিয়া

কখনও স্বীকার করেন নাই, এবং বরাবর তিনি ঐ দত্তক পুত্রকে ‘তথাকথিত দত্তক পুত্র’ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। একখানা পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, “শ্রীযুক্তা আনন্দকুমারী দেবী যে দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমি কখনও বৈধ বলিয়া স্বীকার করি নাই।” সুতারং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। যে, এষ্টেটের যে সকল এজমালী ব্যয় হইত তাহার উপর তিনি কড়া নজর রাখিতে এবং যে সকল ব্যয়ে ছোটরাণী উপকৃতা হইবেন বলিয়া মনে করিতেন ঐ সকল বিষয়ে তিনি আপত্তি করিতেন। বাদীর আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মেজরাণীও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া এরূপ আপত্তি করিতেন। ছোটরাণীর পোষ্য রদের জন্য ব্রজলাল বাবু যে মামলা আনিয়াছিলেন, সেই মামলায় সাক্ষ্যদানপ্রসঙ্গে মেজরাণীও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এককথায় বলিতে গেলে ছোটরাণী সম্পর্কে বড়রাণীর মনোভাব একরূপ ছিল এবং উভয়েই দত্তক গ্রহণে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; তাহা নহে, তাঁহাকে উপযুক্তভাবে সংবাদ দেওয়া হয় নাই বলিয়া কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বড়রাণী বলিতেছেন যে, ছোটবাণী যে বালকটিকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাব মায়েব গোত্র ও ভাওয়াল বাজপরিবারের অজ্ঞাত বলিয়া তিনি দত্তকগ্রহণ অবৈধ মনে কবেন, কিন্তু ছোটরাণী বলিয়াছেন, শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখায়াই যে, বড়রাণী তাঁহার দত্তক গ্রহণে আপত্তি করেন তাহা নহে, বড়রাণী তাঁহাকে বড়রাণীর ভ্রাতুষ্পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে অসম্মত হওয়ায় বড়রাণী তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, বাদীর আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছোটরাণীর প্রতি বড়রাণী ও মেজরাণীর মনোভাব একরূপ ছিল, কিন্তু তাহার পর স্বার্থসমন্বয়বশতঃ মেজরাণী ও ছোটরাণী ক্রমেই একদিকে যাইতে থাকেন; সাধু সম্পর্কে বড়রাণীর মনোভাব ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত মেজরাণীর বিরুদ্ধে ছিল না। বড়রাণী বলিয়াছেন, ১৯২৪ সালে সাধুকে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে মেজকুমার বলিয়া চিনিতে পারেন। বাদী আত্মপরিচয় দিবার কিছুদিন পর ১৯২১ সালের মে মাসে মেজরাণী ও ছোটরাণী মোহিনীবাবুকে কাজে রাখিবার জন্য পাগলপ্রায় হইয়া রেভিনিউ বোর্ডে তার করিতেছিলেন, কারণ তাঁহাকে বদলী করিবার কথা হইয়াছিল (একজিবিট ২৩৮ ও ২৩৯)। ১৯২১ সালে ২৭শে অক্টোবর তারিখে কালেক্টর মিঃ লিণ্ডসে বড়রাণীর নিকট একটি চিঠি লিখিলে, বড়রাণী তাঁহার নিকট দার্জ্জিলিংএ মেজকুমারের পীড়া

ও মৃত্যু সম্পর্কে এক তার প্রেরণ করেন। জেরায় বড়রাণীকে এমন কথা বলা হয় নাই যে, তিনি এই সাধু সম্পর্কে ১৯২৪ সালের পূর্ব্বেই মেজরাণীর বিরুদ্ধে গিয়াছিলেন। বরং বলা হইয়াছে যে, এই সম্পর্কে তিনি ১৩৩৫ সনে (ইং ১৯২৮) মেজরাণীর বিরুদ্ধে গিয়াছিলেন; কারণ এই মর্ম্মে বহু চিঠিপত্র দাখিল করা হইয়াছে যে, ১৯২৪ সালের পরও অর্থাৎ যে বৎসর তিনি বাদীকে মেজকুমার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন বলিয়া বলিতেছেন, সেই বৎসরের পরও তিনি মেজকুমারকে মৃত সাব্যস্ত করিয়া সরকারী চিঠিপত্রে প্রস্তাব করিয়াছেন, আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, অথবা আইন ব্যবসায়ীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। ছোটরাণীর দত্তক গ্রহণ সম্পর্কে মেজরাণীর মনোভাবের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা এত অল্প জানা গিয়াছিল যে, ব্রজলাল বাবু (দত্তক-গ্রহণের মামলায় তাঁহার স্ত্রী তড়িন্ময়ী দেবী বাদী ছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাদী ছিলেন ব্রজলাল বাবু) তাঁহাকে সাক্ষী মানিলে তিনি সাক্ষ্য দিতে আসিয়া জবানবন্দীতেই দত্তকগ্রহণ সমর্থন করেন। ইহা ১৯২৯ সালের ২রা মে তারিখের কথা। তারপর ছোটরাণী যাহা বলিতে চাহিতেছিলেন, তিনি জেরায় তাহার সমস্ত স্বীকার করেন (একজিবিট ৪০২)। বড়রাণী সেই মামলায় ২৬-৭-২৯ তারিখে সাক্ষ্য দেন ছোটরাণী যে দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সেই কথা অস্বীকার করেন নাই; কিন্তু তিনি বলেন হিন্দু আইন অনুসারে ঐ দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ। সেই সময়ে বলা হয় যে, তাঁহার পিতা ছোটরাণীকে নিজের এক পৌত্রকে দত্তক গ্রহণ করিতে বলিয়া ছিলেন, কিন্তু ছোটরাণী তাহাতে অসম্মত হন, কিন্তু বড়রাণী এই কথা অস্বীকার করেন। ছোটরাণী দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দত্তক গ্রহণ সমর্থন করিয়াছিলেন)। অবশ্যই বড় রাণীর উদ্দেশ্য এবং ছোটরাণীর দত্তক গ্রহণ সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব সম্বন্ধে সত্যবাবু নিজে কিছু জানিতেন না; কিন্তু যেহেতু বড়রাণী ১৯২৪ সালে বাদীকে মেজকুমার করিয়াছেন। নথিপত্রে আমি দেখিতেছি যে, স্যার এন, এন, সরকার বড়রাণীকে শুধু ঐ মর্ম্মে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বড়রাণী ঐ কথা অস্বীকারও করিয়াছেন—কিন্তু কবে কখন কি ভাবে বড়রাণীর পিতা ছোটরাণীকে তাঁহার নিজের পৌত্রকে দত্তক গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই।

মেজরাণী ছোটরাণীর দত্তক গ্রহণ সমর্থন করিবামাত্র, বড়রাণী মেজরাণীর বিরুদ্ধে যান, এই কথাও বিচারসহ নহে। ১৯২৯ সালের বহু পূর্ব্বে তিনি মুখে বলিয়াছিলেন, এবং লিখিত ভাবেও স্বীকার করিয়া ছিলেন যে, তিনি বাদীকে মেজকুমার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। ১৯২৪ সালের জুলাই বা আগষ্ট

মাসে বাদীকে দেখিয়াই যে তিনি তাঁহাকে মেজকুমার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ আছে। সত্যবাবুও তাহা জানিতেন, সুতরাং তিনি বলিয়াছিলেন যে, মেজরাণী সাক্ষ্য দিবার পূর্ব্বেই জানাজানি হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি ছোটরাণীর দত্তক গ্রহণ সমর্থন করিবেন, সুতরাং এই সুযোগে হয়ত বড়রাণী সাধুকে মেজকুমার বলিয়া গ্রহণ করিয়া "এক ঢিলে দুই পাখী মারিবেন।" উহাতে ছোট রাণীকেও মারা হইল এবং মেজরাণীকেও মারা হইল। (ছোটরাণী দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মেজরাণী দত্তক গ্রহণ সমর্থন করিয়াছিলেন)। অবশ্যই বড়রাণীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব সম্বন্ধে সত্যবাবু নিজে কিছু জানিতেন না।

রাণীত্রয়ের মনোভাব

বড়রাণী ১৯২৪ সালে বাদীকে মেজকুমার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইহেতু সত্যবাবু বলিয়াছেন যে, দশবৎসর যাবৎ মেজরাণীর সঙ্গে বড়রাণীর মনোমালিন্য চলিতেছে। এই কথা সত্য নহে; কিন্তু পোষ্যদের মামলায় ছোটরাণীর পোষ্যগ্রহণে তাঁহার বিরোধিতার উপর একটি অভিসন্ধি আরোপের চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইল, তখন ইহা ছাড়া বড়রাণীকে অপদস্থ করার অন্য কোন উপায় ছিল না। সেই মামলায় বড়রাণীর জেরার সময় বলা হয় নাই যে, মেজরাণীর সঙ্গে তাঁহারও মনোমালিন্য আছে। মেজরাণীও তাঁহার পূর্ব্বের সাক্ষ্যে তাহা বলেন নাই। তিনি অস্বীকার করেন নাই যে, তিনি কমিশনে সাক্ষ্য দিবার একমাস পূর্ব্বেও তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁহার হাত নাই বলিয়া, তিনি যদি তাঁহাকে দুর্ভাগিনী মনে না করিতেন, তবে ঐরূপ ব্যাপার বিস্ময়কর মনে হইত। আসল কথা যে, এই দুই রাণীর মধ্যে অসদ্ভাব ছিল না, যদিও বড়রাণী ১৯২৪ সালে বাদীকে মেজকুমার বলিয়া গ্রহণ করিবার পর হইতেই, বড়রাণী ও মেজরাণীর মধ্যে মতদ্বৈধ হইয়াছিল। এই মতদ্বৈধ, "কারণ" নহে—উহা 'ফল'। আমার মনে হয় না যে, ছোট রাণীর সম্পর্কে বা তাঁহার দত্তক গ্রহণ সম্পর্কে বড়রাণীর মনোভাব যাহাই হউক না কেন, তিনি মেজরাণীকে এইরূপ প্রচণ্ড আঘাত করিবার জন্য বাদীকে দেখা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। আগাগোড়া ইহা প্রমাণের জন্যই বড়রাণীকে জেরা করা হইয়াছে যে, তিনি ১৯২৪ সালে বাদীকে দেখেন নাই। দেখিলেও চিনিতে পারেন নাই, এবং ছোটরাণীর সহিত তাঁহার মনান্তর ছিল বলিয়াই—ছোটরাণীর দত্তকগ্রহণ তিনি সমর্থন

করেন নাই বলিয়াই, তিনি ১৩৩৫ সনে মেজরাণীর বিরুদ্ধে যান। আরও বলা হইয়াছে, ছোটরাণী বড়রাণীর ভ্রাতুষ্পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই তিনি ছোটরাণীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, ও তাঁহার দত্তক গ্রহণ সমর্থন করেন নাই। এখন ১৯২৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে কালেক্টর মিঃ জে. ড্রামণ্ড বড়রাণীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা দেখুন :—

প্রিয় মহাশয়া,

নর্থব্রুক হলের জন্য প্রতিকৃতি দিতে ও অর্থসাহায্য করিতে সম্মত হইয়া আপনি যে পত্র লিখিয়াছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান অবস্থায় গবর্ণরকে প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিতে অনুরোধ করা সম্ভব নহে। যদি আমরা তাহা করিতে যাই, তবে মনে হইবে যে, সাধু সম্পর্কে আপনার যে মত, তিনি তাহা সমর্থন করেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কলিকাতায় কোনও ভদ্রলোক সাধুর পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে জনসাধারণের দৃষ্টিপথে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, কতিপয় ভদ্রলোক সাধুর পক্ষ হইতে যে কথা উত্থাপন করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা আদৌ সমর্থন করেন না। কোনও কোনও ভদ্রলোকে সাধুর পক্ষ হইতে দাবী উত্থাপন করিতেছেন বটে, কিন্তু সাধুকে এই বিষয়ে নির্লিপ্ত বলিয়াই মনে হয়। আশা করি, আপনি ভাল আছেন। ইতি—(স্বাঃ)

তি, জে, জি, ড্রামণ্ড

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিবাদীপক্ষ যে বলিতেছেন বড়রাণী ১৯২৪ সালে বাদীকে দেখেন নাই, ১৩৩৫ সন (ইং ১৯২৮) পর্য্যন্ত তিনি সরকারী ভাবে বা অন্যভাবে যত চিঠিপত্র লিখিয়াছেন তাহার সমস্তপত্রেই মেজ কুমারকে মৃত সাব্যস্ত করিয়াছেন। বিবাদী পক্ষের সেই কথা প্রমাণিত হয় নাই। তিনি যে বলিয়াছেন, বাদীকে মেজকুমার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন বলিয়া সরকার কর্ম্মচারীদের নিকট তিনি বলিয়াছেন তাহা সত্যকথা এবং মিঃ ড্রামণ্ড ও ১৯২৫ সালে এই সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব জানিতেন। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, ১৯২৪ সালে তিনি বাদীকে মেজকুমার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্যই সরকারী কাগজপত্রে যখন কুমার জীবিত কি মৃত সেই প্রশ্ন উঠে নাই, তখন তিনি কুমারকে মৃত বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন; কারণ অনাবশ্যক ভাবে এই প্রশ্ন তুলিলে

এষ্টেটের খরচ সম্পর্কে তিনি যে সকল আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বার্থ বিপন্ন হইতে পারিত, ঠিক এইরূপেই, যে সকল উকীল ও প্রজা এই মামলায় সাক্ষ্যদানপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা বাদীকে মেজ কুমার বলিয়া চিনিয়াছেন, তাঁহারাও খাজনার মামলা এবং অন্যান্য মামলা ধরিয়া লইয়াছে যে, মেজকুমার মারা গিয়াছেন এবং মেজরাণীই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। কুমার জীবিত কি মৃত এই প্রশ্ন ঐ সকল নামমাত্র অনাবশ্য বলিয়া তাঁহারা ঐ প্রশ্ন ঐ সকল মামলায় উত্থাপন করেন নাই।

বড়রাণীর মনোভাব

এই মহিলা বলিয়াছেন যে, তিনি যে বাদীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন তাহা মিঃ কে, সি, দে, মিঃ জে, এন, গুপ্ত, মিঃ সাক্সি প্রভৃতি সরকারী কর্ম্মচারীদেব নিকট জানাইয়াছিলেন। মিঃ গুপ্ত কমিশনে বিবাদী পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহাকে এই বিষয়ে কোন জেরা করা হয় নাই। মিঃ কে, সি, দে বলিয়াছেন যে, ১৯২৫ কি ১৯২৬ সালে কলিকাতায় এই মহিলা যে বাদীকে চিনিতে পাবিয়াছিলেন তাহা মিঃ দে'কে জানাইয়াছিলেন। মিঃ দে বলিয়াছেন,—"এই মহিলা নিজ মুখে আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি বাদীকে চিনিতে পারিয়াছেন।" ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি মিঃ ড্রামণ্ডের কাছে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯২৪ সালের জুলাই মাসের পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিবাদী পক্ষ কর্তৃক প্রমাণিত পূর্ব্বের কতকগুলি চিঠিপত্র হইতে জানা যায়। ১৯২৪ সালের ৮ই আগষ্ট কৃপাময়ী দেবীর উইল অনুযায়ী প্রাপ্ত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য কুমারের ভগ্নী ও ভাগীনেয়দের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা উঠিলে তিনি তাহাতে আপত্তি করেন। এই মামলায় সাধুকে দাঁড় করান হইতে পারে বলিয়া তিনি জানান। এজমালী সম্পত্তির আয় হইতে মামলার খরচা চালাইতে হইবে বলিয়া স্থির হইলেও তিনি আপত্তি করেন। ১৯২৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর বিহারী সাহা নামে একব্যক্তি সাধুকে চিনিতে পারিয়াছে জানিয়া, তখন তাহাকে স্থান ত্যাগ করার নোটীশ দেওয়া হয়। তখনও তিনি মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাকে সমর্থন করেন। ঐ বৎসর ২৭শে সেপ্টেম্বর ফণীবাবুর এষ্টেটের ভার যাহাতে কোর্ট অব ওয়ার্ডস হাতে না লয় তজ্জন্যও তিনি পীড়াপীড়ি করেন; কারণ তাহাতে সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত সাধুর পক্ষে ক্ষতিকারক হইবে। ১৯২৫

সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তিনি ম্যানেজারকে লিখিয়াছিলে যে, সাধুর বিরুদ্ধে মামলা চালাইবার জন্য যে ব্যয় পড়িবে তাহা যেন তাঁহার অংশ হইতে দেওয়া না হয়।

১৯২৫ সালের জানুয়ারী মিঃ ড্রামণ্ডের লিখিত চিঠিতে তাঁহার কার্য্যবিধির কথা জানা যায়। ঐ বৎসর ২০শে জুন এই মহিলা মধ্যম কুমারের মৃত্যুর কথা (যেরূপ রাষ্ট্র হইয়াছিল) বলেন ২৫শে আগষ্ট তারিখে মধ্যম কুমার নিখোঁজ হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা দেন। ১৯২৮ সালের ২৩শে জুলাই তারিখে তিনি বলেন যে, মেজকুমারেব মৃত্যু হইয়াছে, এই কথা তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। এই সম্পর্কে তিনি মধ্যমকুমারেব আবেদন-পত্রের কথা উল্লেখ করেন। তাহাতে মধ্যমকুমারকে যাঁহারা চিনিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ছিল এবং তাঁহার নামও ছিল। বিবাদীপক্ষ হইতে এই সমস্ত চিঠি সম্পর্কেই তাঁহাকে জেরা করা হইয়াছে ; ইহা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাদীকে মধ্যমকুমার বলিয়া যে তিনি চিনিতে পারিয়াছেন তাহা ১৯২৪ সালে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনি তাহা সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে জানাইয়াছেন ; পরে পোষ্য-গ্রহণের যে মামলা রুজু হইয়াছিল তাহার উদ্দেশ্যও প্রকাশ পায়। নানা লোক আশেপাশে নানা অভিসন্ধি লইয়া ঘুরিতেছিল, এবং তাহাতেই সমস্ত ব্যাপারটা গোলমেলে হইয়া গিয়াছে। আমার মনে হয়, ১৯২৪ সালের জুলাই বা আগষ্ট মাসে এই রাণী বাদীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, বাদী যে মেজকুমার তাহার এই ধারণা কুমারের ভগ্নীদের মতই স্বতঃপ্রণোদিত। একজন জালিয়াতের জন্য কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বিরুদ্ধে যাওয়ার বিশেষ কোন হেতু পাওয়া যায় না। তিনি নিজেই ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন ; নতুবা তাঁহাকে জেরার সময় এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইত না যে তাঁহার ভ্রাতা ও বাদীর মধ্যে কোন চুক্তি ছিল কি-না। কিন্তু এই কথা বাদীকে জিজ্ঞাসা করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয় নাই। লিখিত বিবৃতিতে তৃতীয় ও প্রথম বাদিনী বড়রাণী কর্ত্তৃক কুমারকে চিনিতে পারার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, বড়রাণী যে বাদীকে মেজকুমার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন,—"তাহাতে নিশ্চয়ই পরোক্ষভাবে কোন উদ্দেশ্য আছে, কিংবা বাদী ও তাহার সমর্থকদের অনুরোধে বা চাপে কিম্বা ভ্রমবশতঃ করা হইয়াছে" শেষোক্ত এই 'ভ্রমাত্মক' শব্দটী যিনি বিজ্ঞ কৌঁসুলীকে শুনানীর সময় নানা অসংলগ্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন তিনি ঠিকমত ধরিতে পারেন নাই। দৃঢ়বিশ্বাসের উপরও যে কাহারও মতামত গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহা তিনি মনে করিতে পারেন

নাই। কারণ একদল দুরভিসন্ধি-পরায়ণ লোকের কূট-চক্রান্ত এবং সেই উদ্দেশ্যে অসন্তুষ্ট প্রজাবৃন্দ ও ভগ্নমনোরথ আত্মীয়বর্গের সাহায্য গ্রহণ—এই সমস্তই এই মামলা সম্পর্কে চোখে পড়িয়াছে। এই দুই শ্রেণীর কাহাকেও এখন পাওয়া যাইবে না বটে; কিন্তু তাহাদের বিষয় সাক্ষ্য প্রমাণে স্পষ্ট-রূপেই আছে।

কমিশনে পূর্ণসুন্দরী দেবীর সাক্ষ্য

ইনি মেজরাণীর মামাত বোন, শ্রীযুক্ত প্রতাপ নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। মেজরাণীর অপর দুই মাতুল সূর্য্যনারায়ণ ও রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। এই মুখোপাধ্যায়গণ উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমীদার বংশের। মেজরাণীও ইহাদের ভাগিনেয়ী হিসাবে এই পরিবারের মেয়ে বলিয়া দাবী করেন। সাক্ষীর পিতা প্রতাপনারায়ণ মেজরাণীর বিবাহের বন্দোবস্ত করেন এবং কনে লইয়া জয়দেবপুরে আসেন। মেজরাণীর মাতা প্রথমে, পুত্র কন্যা সহ প্রতাপ-নারায়ণের বাড়ীতে ছিলেন, পরে রামনারায়ণের (অপর এক ভ্রাতা) বাড়ীতে যান (?)

সাক্ষী পূর্ণ সুন্দরীর স্বামী একজন উকীল। তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে কলিকাতায় থাকেন। মেজরাণীর বিবাহের সময় তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর ছিল, সুতরাং তাঁহার বয়স মেজকুমারের সমান হইবে। তাঁহার বিবাহ পূর্ব্বেই হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহ হইলেও তিনি পিতৃগহে বাস করিতেন। বিবাদী-পক্ষ নিজেদের সুবিধামত প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী ঘরজামাই ছিলেন। এই মহিলা তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন, সাক্ষ্যদানের প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৯১৩ সালের শেষের দিকে একদিন তাঁহার স্বামী আসিয়া বলেন—'এক ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁহাকে দেখে যাও'। তিনি বলিয়াছেন "আমরা তখন ঈশ্বর গাঙ্গুলি লেনে ছিলাম। দরজার ফাঁক দিয়া চাহিয়াই আমি স্তম্ভিত হইলাম, কারণ সেই লোকটী, যাহাকে বেশ চিনিতাম, তাহাকে দেখিতে পাইলাম। যৌবনে তাহাকে যেরূপ দেখিয়াছি তাহার চেয়ে কিছু হৃষ্টপুষ্ট ও রংটা একটু লালচে দেখাইতে ছিল মনে হয়। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। সে-ই কুমার, ঠিক কুমার রমেন্দ্র বলিয়াই তাহাকে চিনিলাম। তারপর তাহার কাছে গেলাম এবং সে আমাকে নমস্কার করিল, আমাকে চিনিতে পারিল ও 'দিদি' বলিয়া সম্বোধন করিল।"

এই মহিলা কুমারকে চিনিতেন না, এইরূপ কোন কথা উঠে নাই। তাঁহার কথায় পরিচয়ের অর্থ প্রকাশ পায় না, ইহাও বলা হয় নাই। আগে মেজকুমার উত্তর পাড়ায় পাঁচ ছয়বার গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে মেজকুমারের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, একথাও সত্য। জেরার সময় প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন। ইহার কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, তাঁহার স্বামী অর্থবান লোক নহেন এবং প্রথম পুত্র কৃষ্ণকুমারের অন্নপ্রাশনের সময়, এই ভদ্রলোককে প্রতাপনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে অপমান করা হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, ঐ সময় মেজরাণীর পিতা তাঁহার স্বামীকে দারোয়ান দ্বারা বাহির করিয়া দিয়াছিলেন কি না? মোটের উপর এই কথাই প্রমাণের চেষ্টা হইয়াছে যে, তিনি প্রতাপনারায়ণের পরিবারের পরিত্যক্তা কন্যা; সুতরাং এই জাতীয় মামলায় পিসতুতু বোনের বিরুদ্ধে তাঁহার দ্বারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ান সম্ভবপর! তাঁহার স্বামী কিছু জমিদারী আছে এবং তজ্জন্য একজন নায়েবও নিযুক্ত আছেন,—এইকথা জানা যায়। প্রতাপনারায়ণ বাবুর বিধবা স্ত্রী ঢাকায় আসিয়া বাদীপক্ষে আমার এজলাসে সাক্ষ্য দিয়াছেন। এই যুক্তিতেও তাঁহার সাক্ষ্য ঠিক নহে; এইরূপ প্রমাণের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু উহা একেবারে কল্পনাপ্রসূত। আমার ধারণা এই মহিলা বাদীকে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে মেজকুমার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন কিংবা চিনিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

মেজোরাণীর মামী সরোজিনী দেবীর সাক্ষ্য

ইনি মেজরাণীর মাতুল প্রতাপনারায়ণের বিধবা স্ত্রী। মেজরাণীর বিবাহের সময় ইনি প্রতাপনারায়ণবাবুর সহিত জয়দেবপুরে আসিয়াছিলেন, ১৮৯৯ সালে প্রতাপবাবুর সহিত ইহার বিবাহ হয়, সন্তান-কন্যা পূর্ণসুন্দরীর তৎপূর্ব্বেই বিবাহ হইয়াছিল। সরোজিনী দেবী স্বামী-গৃহে আসিয়া মেজরাণীর মাতা ফুলকুমারীকে পুত্র কন্যা সহ তথায়ই দেখিতে পান। মেজরাণীর মাতা তথায় আরও দুই বৎসর (সরোজিনী দেবীর বিবাহের পরে) ছিলেন। অতঃপর ফুলকুমারী তাঁহার আর এক ভ্রাতা রামনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে যান। ফুলকুমারী দেবী, সত্যবাবু ও অন্যান্য ছেলেমেয়েদের লইয়া রামনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে ছিলেন। মেজরাণীর তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

এই মহিলা বিবাহের সময় জয়দেবপুরে আসিয়াছিলেন। এসময় তিনি মেজকুমারকে তথায় এবং উত্তরপাড়ায় দেখিয়াছেন। মেজকুমারকে উত্তরপাড়ায়

বাড়ীতে তাঁহাদের অনেক সময় নিমন্ত্রণ করা হইত। তিনি মেজকুমারকে কোনদিন দেখেন নাই, এইরূপ কথা উঠে নাই। তিনি বাদীকে মেজকুমার বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন। দার্জ্জিলিং গমনের দুই কি আড়াই বৎসর পূর্ব্বে মেজকুমার উত্তরপাড়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, মেজকুমারের দার্জ্জিলিংয়ে মৃত্যু হইয়াছে, এই কথা তিনি শুনিয়াছিলেন এবং পরে যে মেজকুমার ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাহাও তিনি শুনিয়াছিলেন। তিনি ও মেজরাণী পরস্পরের গৃহে যাওয়া-আসা করিতেন, উৎসব-অনুষ্ঠানেও তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হইত; কিন্তু মেজরাণী মনে ব্যথা পাইবেন, এই আশঙ্কায় তিনি এক ব্যক্তির মেজকুমার বলিয়া আত্মপরিচয় দেওয়ার কথা জানা সত্ত্বেও তাহা তাঁহার (মেজরাণীর) নিকট উত্থাপন করিতেন না। অবশ্য ঐ লোকটীকে দেখিবার জন্য তাঁহার খুব ইচ্ছা হইত এবং নিজের ছেলেদের নিকটও তিনি তাহা বলিতেন; কিন্তু সেই লোকটী প্রতারক, এই কথাই তাঁহাকে বলা হইত।

মামলার শুনানী সময় বাদী উত্তর-পাড়া গিয়াছিলেন। কে আসিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য তাঁহার পুত্র তাঁহাকে বলিতেছিলেন। তিনি পর্দ্দার আড়াল হইতে তাহাকে দেখিয়াছিলেন। তিনি মিনিট খানেকের মত দেখিয়াই তাহাকে চিনিতে পারেন এবং কোঠার দিকে চলিয়া আসেন ও তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে থাকেন। অতঃপর বাদীকে অন্দরে লইয়া গিয়া জলখাওযার দেওয়া হয়। এই দেশে জামাইকে এই প্রকার জলখাবার দেওয়ার প্রথা আছে। বাদী ঐ স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুরোধ করিয়া বলেন—মামীমা, আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন। আপনাকে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে হইবে। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, প্রয়োজন হইলে ডাকিও, আমি সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বলিতে পারিব না।

এই মহিলা উত্তরপাড়া হইতে আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার পুত্রদের সম্মতি ব্যতীত সাক্ষ্য দিতে পারিতেন না। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার পুত্রদের বার্ষিক জমীদারীর আয় ৫৩০০০৲ টাকা। উঁহারা পশ্চিম বঙ্গের একটী বিশিষ্ট পরিবারভুক্ত, ১নং বিবাদিনীও তাহা বলিয়াছেন। জেরার সময় এই মহিলাকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করাও হইয়াছিল। ইহা বলা হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার স্বামীর একজিকিউটর তিনকড়ি বাবুর সহিত মামলা করিয়াছিলেন, এবং উক্ত মামলায় তিনি ন্যায়পক্ষে ছিলেন না। তিনি

জয়াদবপুরে খুব কম সময় ছিলেন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য মেজরাণী বিবাহের তারিখও মিথ্যা বলিয়াছেন ; অবশ্য পরে কাগজপত্রের দ্বারা উহা ঠিক করা হইয়াছিল। এই মহিলা চলিয়া গেলে পর বিবাদীপক্ষ নানা টালবাহানা করিতে থাকে। অতঃপর সত্যবাবু অসিয়া জোরের সহিত বলেন, উক্ত মহিলার সহিত তাঁহার ভাল ভাব ছিল না। ভাল ভাব না থাকার কারণ খুজিয়া বাহির করা গেল না। তিনি উত্তরপাড়া হইতে ঢাকা আসিয়া ভাগিনেয়ীর বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য দিলেন, ইহা হইতেই ভাগিনেয়ীর সহিত তাঁহার শত্রুতা আছে, উহা প্রমাণ করিবার জন্য মিঃ চৌধুরী চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার সওয়ালের সময়ও এতসম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। একজন মহিলা তাঁহার ভাগিনেয়ীর জন্য অনেক কিছু করিতে পারেন ; কিন্তু যখন দেখেন, সে তাহার স্বামীকে অস্বীকার করিতেছে, তখন তাঁহার পথ আলাদা। এই প্রকার ব্যাপার পুরুষেরা সমর্থন করিতে পারে কিন্তু স্ত্রীলোকেরা কখনও সমর্থন করিতে পারে না। আমি মনে করি, এই মহিলা যখন বাদীকে ভাওয়ালের মেজকুমার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন, তখন তিনি সত্য কথাই বলিয়াছেন।

আত্মীয় স্বজনদের সাক্ষ্য

নিম্নোক্ত আত্মীয়গণ যখন বাদীকে ভাওয়ালের মেজকুমার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন বাদীই মেজকুমার, ইহাই মনে হয়—কুমারদের মামীমা সোনামণি দেবী (কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছেন), কুমারদের অপর মামীমা সুধাংশুবালা দেবী (কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছেন), মাতুল কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্য (বাদী পক্ষের ৩৩নং সাক্ষী), সত্যভামা দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ রাজার মামাত ভাই রাধিকা গোস্বামী, (বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষী), রাজার মামাত ভাই মুকুন্দমোহন গোস্বামী (বাদী পক্ষের ৩৫ নং সাক্ষী), রাজার মামাত ভাই লালমোহন গোস্বামী (বাদী পক্ষের ৮৫২ নং সাক্ষী), কৃপাময়ী দেবীর সতীন-পুত্র সুরেশ মুখুজ্যে (বাদী পক্ষের ৫নং সাক্ষী) সুরেশ মুখুজ্যের জ্ঞাতিভাই বসন্তকুমার মুখুজ্যে (বাদী পক্ষের ৭১নং সাক্ষী), ইন্দুময়ীর পুত্র কুমারদের ভাগিনেয় যতীন্দ্র ওরফে বিল্লু (বাদী পক্ষের ৯৩৮ নং সাক্ষী), জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জামাতা চন্দ্রশেখর (বাদী পক্ষের ৯৫৯ নং), সাগরবাবু (বাদীপক্ষের ৯৭৭নং সাক্ষী), প্রসন্নকুমার মুখুজ্যের স্ত্রী অশীতিবর্ষ বয়স্কা বিধবা কুলদাসুন্দরী এবং পাবনা স্কুলের জমিদার বিল্লুর শ্বশুর অখিল পাকড়াশী।

ফণীবাবুর মাসীমা কমলকামিনী দেবী বিবাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। শিবমোহিনী (কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছেন), কৃপাময়ী (বাদী পক্ষের ৯৬২ নং সাক্ষী), আশুতোষ গাঙ্গুলী (বাদী পক্ষের ৪৬৪নং সাক্ষী) প্রভৃতি দূর-সম্পর্কিত আত্মীয়গণকে আমি ধরি না, তবে অনন্তকুমারীর (কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছেন) কথা আলাদা। তিনি আত্মীয় অপেক্ষাও বেশী ; তাঁহার স্বামী কুমারদের ও তাঁহাদের পিতার আমলের কর্ম্মচারী এবং জ্ঞাতি। রাজ-বাড়ীতেই অনন্তকুমারীর বিবাহ হইয়াছিল। যখন তাঁহার বিবাহ হয় সে সময় মেজ কুমারের বয়স মাত্র ছয়মাস ছিল। তিনি তাঁহাকে আজীবন চিনিতেন।

বিবাদীপক্ষীয় আত্মীয়-সাক্ষী

ফণীবাবু, তাঁহার ভগ্নী শৈবলিনী এবং এষ্টেটের কর্ম্মচারী, শৈবলিনীর জামাতা ব্যতীত অন্য কোন আত্মীয়ই বিবাদী পক্ষে সাক্ষ্য দেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ১নং বিবাদিনীর উত্তরপাড়াস্থ অনেক আত্মীয়ও তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া বাদীকে প্রতারক প্রমাণ করিতে আসেন নাই। শুধু জ্ঞাতি ভগ্নী সুকুমারী দেবী সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় বাস করেন, তাঁহার অস্বীকৃতি এবং ভাবগতিক সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইবে। রামনারায়ণের বিধবা মা এখনও জীবিত আছেন, এবং উত্তরপাড়া পরিবারে এমন বহু লোক আছেন, যাঁহারা কুমারকে চিনিতেন। কোন পক্ষই তড়িন্ময়ীকে সাক্ষী মানে নাই। তিনি কেন সাক্ষ্য দিতে পারেন নাই, এবং বিবাদী পক্ষও এই প্রসঙ্গের উপর জোর দেন নাই, তৎসম্পর্কে ইতিমধ্যে বলা হইয়াছে। তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করিব, তবে বর্ত্তমানে তাঁহার সম্পর্কে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মিঃ লিণ্ডসের পত্র এবং সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, তিনি তাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন (এক-জিবিট নং ৪৩৫ দ্রষ্টব্য)। তিনি সত্যভামা দেবীর মুখাগ্নির সময় উপস্থিত ছিলেন ; শ্রাদ্ধের সময়ও ছিলেন ; ১৯২১ সালের মে মাসে তদন্তের জন্য যে আবেদন করা হইয়াছিল, তাহাতেও তিনি ছিলেন।

সাক্ষী বিষয়ে অন্যান্য কথা

উপরে যে সকল আত্মীয়দের নাম করা হইয়াছে, তাঁহারা মেজকুমারকে যে চিনিতেন তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নই নাই। কুমারদের মামী সোনামণি এবং সুধাংশুবালা, বাদীর কলিকাতা অবস্থানকালে তাহাকে দেখিয়াছেন। বাদী

ঢাকা আসিলে পর ১৯২১ সালের জুন মাসে অখিলবাবু তাঁহাকে চিনিতে পারেন। অবশিষ্ট আত্মীয়গণ ১৯২১ সালের মে মাসে বাদীর জয়দেবপুর অবস্থানকালে বাদীকে চিনিতে পারেন। তাঁহারা সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, বাদীও তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন। প্রথমাবস্থায় যে সকল বড় বড় সভা হইয়াছে, ঐ গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা অসম্ভব। বহুলোক বলিয়াছে যে, বাদী তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। ইহার একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি। বাদীর আলোচ্য বিষয়গুলি জানিবার বিষয়। বিবাদীপক্ষের একজন সাক্ষী জেরার সময় স্বীকার করিয়াছেন যে, বাদী যাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদিগকে স্বীকার করিয়াছেন এবং যাহাদিগকে চিনিতে পারেন নাই, তাহাদিগকে চিনেন নাই বলিয়া বলিয়াছেন। বিবাদী পক্ষ হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, বুদ্ধু বাদীর নিকটে ছিল, সেই পুরাতন ঘটনাগুলি বলাইতেছিল; বাদী হিন্দী বলিতেছিলেন, বুদ্ধু উহার তর্জ্জমা করিতেছিল। বাদী হিন্দী বলিতেছিলেন, কি না, ইহাই বুদ্ধুর সাক্ষ্য হইতে জানিবার বিষয়। এই সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করিব।

আত্মীয়বর্গের মধ্যে সত্যভামার ভাগীনেয়গণ। বলিতে গেলে সারাজীবনই জয়দেবপুরে কাটাইয়াছে, এবং কৃপাময়ীর সপত্নী-পুত্র সুরেশও তাহাই করিয়াছে। তাহার আত্মীয় ভ্রাতা বসন্ত জয়দেবপুরে থাকিয়াই শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং পরে জয়দেবপুরেই চাকুরী করিয়াছে। এই দুইজনের মধ্যে সুরেশের দিকে বেশী লক্ষ্য রাখিতে হয়। এক পক্ষে সুরেশ এবং অন্যপক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ী, তাঁহার ভগ্নী ও ভগ্নী পুত্রগণ—এই দুই পক্ষে কৃপাময়ীর সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে প্রিভিকাউন্সিল পর্য্যন্ত মামলা চলিতেছিল, এবং এই অবস্থায় সুরেশ মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে সাহায্য করিবে, ইহা কতকটা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়।

জয়দেবপুরের অনন্তকুমারী, মোক্ষদা ও কুলদা—এই তিনজন বৃদ্ধা মহিলার দিকেও একটু বিশেষলক্ষ্য করিতে হইবে, এই তিনজন ছোট বেলায় বিবাহের পর হইতে সমস্ত জীবনই জয়দেবপুরে কাটাইয়াছেন। তাঁহারা রাণীর বন্ধু ছিলেন, এবং কুমারগণ ও কুমারদের পত্নিগণ তাঁহাদিগকে গুরুজনের ন্যায় মান্য করিতেন। মেজরাণী এবং ছোটরাণী ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা মেজকুমারকে তাঁহার জন্মকাল বা প্রায় ঐ সময় হইতেই দেখিয়া আসিয়াছেন। কুমার একজনের স্তন্যও পান করিয়াছেন। যদি ইহাদিগের

বিপক্ষে কিছু থাকিত, তাহা হইতে জেরার সময় ইহাদিগকে হেয় করিবার জন্য তাহাই জিজ্ঞাসা করা হইত; কিন্তু তাহা না করিয়া জেরার সময় ইহাদিগের একজনকে তাঁহার কন্যার বৈধব্যের পরও সন্তান হইয়াছিল কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। যদিও এই সন্তান হইবার কথা একটী লজ্জাকর মিথ্যা, তথাপি কন্যা সম্পর্কে ইহা সত্য হইলেও মাতার কোন অপবাদ হয় না, বা সেজন্য মাতা হেয় প্রতিপন্ন হন না।

অন্য একজন আত্মীয়, যাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে, তিনি হইতেছেন অপরপক্ষের সাক্ষী ফণীবাবুর মাসীমা কমলকামিনী দেবী। ইনি পূর্ব্ববর্ণিত স্বর্ণময়ীর কন্যাদ্বয়ের একজন। পরিবারের এই শাখা ১৮৯৩ সাল হইতে রাজবাড়ীতেই বাস করিতেছে। স্বর্ণময়ীর সম্পত্তি এখন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে আছে, এবং দেনাদারের পাওনা মিটাইয়া এই সম্পত্তি হইতে যে আয় হয়, তাহার মধ্যে ২০০৲ শত টাকা কমলকামিনী দেবী পান, অন্য সমস্ত আয়ই ফণীবাবু এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ পান। এই সম্পত্তির একটি খুব বড় অংশ কুমারের পিতামহ 'মিরাস্' করিয়া দিয়াছিলেন। ভাওয়াল এষ্টেট এখনই অথবা কমলকামিনীর মৃত্যুর পর আদৌ ফিরাইয়া লইতে পারিবেন কিনা, সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে (পরে দেখান হইয়াছে); অতএব স্বর্ণময়ীর ষ্টেটের ম্যানেজার মামলা করিবার কোন কারণ উপস্থিত হইলে, তাহা নিবারণের জন্য একজন তৃতীয় ব্যক্তিমাত্র। বস্তুতঃ একবার মোকদ্দমাও হইয়াছিল। এবং সর্ত্তাধীনভাবে উহা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। ইহাতে আইনতঃ ফণীবাবুকে কমলকামিনীর মৃত্যুর পর কোর্ট অব ওয়ার্ডসের দয়ার উপরই নির্ভর করিতে হইবে (পরে বলা হইয়াছে)। বর্ত্তমানেও ফণীবাবুর বিপদ উড়াইয়া দিবার মত নহে। ইহার প্রমাণ আছে। অতএব যদিও কমলকামিনী নির্ভাবনায় বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারেন, তথাপি ফণীবাবুর সে অবস্থা নহে। কারণ সাধুর বিপক্ষে কার্য্য করিবার জন্য তিনি আর্থিক সাহায্য পাইয়াছেন (ইহার কথা তাঁহার সাক্ষ্যের বিশ্লেষণে বলা হইবে)। এখন কমলকামিনী, কুমারগণের জন্মকালে রাজপরিবারেই ছিলেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি মেজ-কুমারকে স্তন্যদান করিয়া বড় করিয়াছেন এবং তাঁহাকে সমস্ত জীবনেই চিনিতেন। এই মহিলা হলপ করিয়া বলিয়াছেন যে, বাদীই মেজকুমার। তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবার মত কিছুই আমি দেখি না।

কুমারকে কে চিনিত ?

অতঃপর কয়েকজন সাক্ষীর সমালোচনা করিব—যাঁহারা নিশ্চয়ই কুমারকে চিনিতেন এবং রাজপরিবারের সহিত তাঁহাদের কোনও সম্পর্ক না থাকিলে যাঁহাদের নিশ্চয়ই কোন ভুল করিবার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য সেরূপ সকল সাক্ষীর সম্বন্ধে সকল কথা বলা সম্ভব হইবে না; কিন্তু তাহাতে কেহ যেন না বুঝেন যে, আমি যাঁহাদের বিষয় উল্লেখ করিলাম না, তাঁহারা কুমারকে চিনিতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পুরাতন রাজকর্মচারিগণ, কুমারের নিজের পরিচারকবৃন্দ, রাজসরকারের ভৃত্যগণ, গ্রামবাসিগণ, এষ্টেটের তালুকদারগণ,—যাহারা বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন, এবং রাজসংসারে বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সরবরাহকারী ব্যবসায়িগণের উল্লেখ করা যায়। ইহারা সকলে নিশ্চয়ই কুমারকে চিনিতেন।

প্রজাদিগের অধিকাংশ, অধিকাংশ নহে—আমার বিশ্বাস, প্রায় সকলেই দেখিবামাত্রই কুমারকে চিনিতেন। তাঁহাদের কেহই কুমারকে ভুলিতে পারেন নাই। মিং চৌধুরী এডলফ্ বেকের মামলার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন,—পরিচয় ও সনাক্ত করা সম্বন্ধে সাক্ষীদিগের পক্ষে কি প্রকার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বর্ত্তমান। সম্পূর্ণ অমিল ক্ষেত্রে আমিও তাহা অস্বীকার করি না। তবে আমার এজলাসে যাঁহারা সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এমন সাক্ষী নহেন, কুমারের সহিত যাঁহাদের 'কালেভদ্রে' দেখা হইত। প্রতিবেশী যেভাবে প্রতিবেশীকে চিনে, প্রতিবেশীর যেমন প্রতিবেশীর সহিত সর্ব্বদা দেখা হয়, ঐ সকল সাক্ষী কুমারকে সেই ভাবে চিনিতেন এবং সেই প্রকারে কুমারকে তাঁহারা দেখিতেন। এক বিশিষ্ট পরিবারের অতি পরিচিত সুদর্শন আকৃতি বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীকে তাহারা কখন পল্লীর বাড়ীতে, কখনও সহরের বাড়ীতে, অশ্বপৃষ্ঠে, টমটমে এবং হস্তিপৃষ্ঠে জয়দেবপুরে এবং ঢাকা সহরের রাস্তায় ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছে এবং দেখিয়াই কুমার বলিয়া চিনিয়াছে। সুতরাং তাহাদের সাক্ষ্যে ভ্রম-প্রমাদের আশঙ্কা স্থান পাওয়া সম্ভব না। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকে সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করা এবং ঐ সকল সাক্ষীর মধ্যে এমন কেহ আছে কি না, যাহারা কুমারকে দেখে নাই—তাহা বাছিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন।

আমার রায় যুক্তিযুক্ত গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয়। সেই দৃষ্টিতেই নিম্নে কতকগুলি সাক্ষীর বিষয় উল্লেখ করিতেছি, যাহাদের সম্বন্ধে একথা বলা

আদৌ সঙ্গত হইবে না যে, তাহাদের কেহ কুমারকে চিনিত না, অথবা কুমারের কথা তাহারা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল।

সনাক্তকারী সাক্ষীদিগের পরিচয় বিশ্লেষণ

বাদী পক্ষের ৬২নং সাক্ষী রেবতীমোহন ঘোষ। ঢাকার একজন প্রবীণ উকিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি রাজপরিবারের সকলকে জানেন। তিনি নলগোলার রাজবাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। সেখানে তাঁহার ভগ্নীপতি সপরিবারে থাকিতেন। সাক্ষীর উক্ত ভগ্নীপতি রাজ এষ্টেটের মোক্তার ছিলেন। ইনি ১৮৯৯ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত এই জয়দেবপুর স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯০৫ সালে ইনি ঢাকায় ওকালতী আরম্ভ করেন। তখনও ইনি রাজ বাড়ীতেই থাকিতেন। রাজবাড়ীর ঠিক বিপরীত দিকে ১৯০৯ সালে তাঁহার নিজের বাড়ী নির্ম্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাক্ষী রাজ-সংসারেই ছিলেন। ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত সাক্ষী ভাওয়াল এষ্টেটের উকীল থাকেন। কুমারদিগের সহিত সাক্ষী ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন; সাক্ষী তাঁহাদিগকে বিশেষভাবেই চিনিতেন। দার্জ্জিলিং রওনা হইবার দশ দিন পূর্ব্বেও সাক্ষী মধ্যম কুমারকে দেখিয়াছেন। জয়দেবপুর স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময় সাক্ষী মধ্যম কুমারকে ইংরেজী শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা কালে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। কোনও সাক্ষীই সম্ভবতঃ বলিতে পারিবেন না যে, এই সাক্ষী কুমারদিগকে জানিতেন না এবং রাজপরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ও সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। এই সাক্ষীর বিরুদ্ধে একমাত্র বলিবার বিষয় এই যে, একটী মামলার কোনও নির্দ্দিষ্ট বাড়ার স্বত্ব হস্তান্তরিত-করণ বিষয়ক প্রশ্ন বিচারকালে মুন্সীগঞ্জের জনৈক মুন্সেফ তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন, এই সাক্ষী ঐ মামলায় বিবাদী ছিলেন।

বাদীর ৬১নং সাক্ষী পরেশনাথ বিশ্বাস (বয়স ৭৭ বৎসর) ভাওয়ালের একজন সম্ভ্রান্ত তালুকদার। ইনি বখতিয়ারপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। রাজার সহিত সাক্ষীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। রাজার মৃত্যুর পর ইনি বিষয়কার্য্যে রাণীকে পরামর্শ দিতেন। রাণীর মৃত্যুর পরও রাজপরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, তখনও রাজবাড়ীতে তিনি যাতায়াত করিতেন, তাঁহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই।

বাদীর ৬৩নং সাক্ষী, রাজকুমার মুখোটী (বয়স ৬৩ বৎসর) ময়মনসিংহের একজন মোক্তার। ১১নং একজিবিটে প্রদর্শিত ফটোতে কুমারের সহিত ইঁহাকে দেখা যায়, সাক্ষীর শ্বশুর রাজবাড়ীর পুরোহিত ছিলেন। সাক্ষীর

খুড়া-শ্বশুর একজন ডাক্তার। রাজার সহিত তাঁহার কিরূপ সৌহার্দ্দ্য ছিল, রাজার লিখিত পত্রাদি হইতে তাহা সপ্রমাণ হইবে (একজিবিট ৪৬নং সিরিজ এবং ৪৭নং সিরিজ)। বাদীর কর্ম্মচারী দুর্গানাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্রের সহিত এই সাক্ষীর শ্যালকের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল।

বাদীর ১১২নং সাক্ষী মিঃ ভি, জে, ষ্টিফেন। ইহার বয়স ৪৯ বৎসর, এক্ষণে ইনি এক কারবারের ম্যানেজার। ইহার বেতন মাসিক ৫২৫ টাকা। তদ্ভিন্ন ইনি বৎসরে ৫ হাজার হইতে ১০ হাজার টাকা কমিশন পান। স্থানীয় আর্ম্মেনিয়ান চার্চ্চের ইনিই এখন প্রেসিডেণ্ট। ব্যবসায় মন্দা হইবার পূর্ব্বে ইনি বড় একজন কারবারী ছিলেন। 'ল্যাজারাস' নামে তাঁহার কারবার চলিত। তাহার বাড়ী নলগোলার রাজবাড়ী সংলগ্ন। রাজবাড়ীতে তাঁহার যাতায়াত ছিল। এমন কি, বাড়ী হইতেও কথাবার্ত্তা চলিত, সাক্ষী পূর্ব্বে যেমন ধনী ছিলেন, এখন তিনি তত ধনী নহেন—ইহা ছাড়া এই সাক্ষীর বিরুদ্ধে অন্য কিছু বলিবার নাই।

বাদীর ১৫৫নং সাক্ষী মণীন্দ্রমোহন বসু (বয়স ৪৭ বৎসর) বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক, ইনি এম-এ পাশ। ১৯০৮ সালের জুলাই হইতে ১৯১০ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ইনি জয়দেবপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। স্মরণ থাকিতে পারে, জয়দেবপুর স্কুলটী রাজবাড়ীর প্রায় সংলগ্ন। মধ্যমকুমার যখন জয়দেবপুর থাকিতেন, তখন কুমারের সহিত সাক্ষীর প্রায় প্রত্যহই দেখা হইত। এই সাক্ষীর বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই।

বাদীর ৪২৬নং সাক্ষী নবেন্দু বসাক, ঢাকার একজন বিখ্যাত জমিদার। তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর। তাঁহার ১২ হাজার হইতে ১৩ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী আছে। তাঁহার এবং তাহার ভ্রাতার প্রায় ২ লক্ষ টাকার তেজারতী কারবার আছে। ঢাকায় তাঁহাদের ৮।৯ খানা বাড়ী। তিনি ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌সের একজন উদ্যোক্তা। ঐ মিলে তাঁহাদের ৫০ হাজার টাকার অংশ আছে। ঢাকায় থাকাকালে কুমারের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু পাওয়া যায় নাই।

বাদীর ১৬৭নং সাক্ষী হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী। ময়মনসিংহের একজন জমিদার; বয়স ৫২ বৎসর, ইঁহাদের বংশ প্রসিদ্ধ। প্রিভিকাউন্সিলে যে চন্দ্রাবলী মামলার বিচার হয়, সেই মামলা সম্পর্কে এই জমীদার বংশ সুপরিচিত। ইনি রাজাকে এবং রাজপরিবারকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন। রাজপরিবারের মহিলারা পর্য্যন্ত তাঁহার সম্মুখে বাহির হইতেন। এই সাক্ষীর বিরুদ্ধে কিছু পাওয়া যায় নাই।

বাদীর ২৬২নং সাক্ষী যোগেশচন্দ্র রায় বি-এ, ১৯০৬ সাল হইতে ১৯১১ সালের মে মাস পর্য্যন্ত জয়দেবপুর রাণী বিলাসমণি হাইস্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। এই সাক্ষীর বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই।

বাদীর ৩২৩নং সাক্ষী চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত (বয়স ৫৪ বৎসর), ব্যারাকপুর গবর্ণমেণ্ট পার্ক স্কুলের হেড মাষ্টার। ১৯০৩ সাল হইতে দশ বৎসরকাল ইনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি ঢাকায় কোনও এক কলেজের লেকচারার ও পরীক্ষক হন। ইনি কুমারদিগকে চিনিতেন। একদিন ইনি মধ্যমকুমারকে টমটমে উঠিবার সময় সাহায্য করেন। আর একদিন ইনি হাতীর শুঁড়ের উপর দিয়া মধ্যমকুমারকে হাতীর পিঠে উঠিতে দেখিয়াছিলেন। কুমাব যে হাতীর শুঁড়ের উপর দিয়া হাতীতে উঠিতেন, বিবাদী পক্ষের সাক্ষী জনৈক মাহুতও তাহা স্বীকার করিয়াছে। বিবাদী পক্ষের ২৬৬নং সাক্ষীও বলিয়াছেন, কুমার ঐভাবেই হাতীতে চড়িতেন। বিবাদীগণ এই সম্বন্ধে নানা প্রকারের বিতণ্ডা তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজের সাক্ষীর সাক্ষ্যই সে বিতণ্ডাব অবসান করিয়াছেন।

বাদীর ৫নং সাক্ষী হেমেন্দ্রলাল দাস, এক বিশাল জমিদারীর উত্তরাধিকারী। তিনি ঢাকার অধিবাসী, তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর। ইনি মাতামহালয়ে প্রতি-পালিত হন। ইনি মাতামহের সম্পত্তির মালিক। রাজ-পরিবারে ইঁহাদের যাতায়াত ছিল। ইনি শৈশবকাল হইতে কুমারদিগকে চিনিতেন।

মধ্যম কুমারের সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ইনি বলেন,—যদি ইনি বাদীকে মধ্যমকুমার বলিয়া চিনিতে না পারিতেন, তাহা হইলে বৃদ্ধ বয়সে ইনি এ সকল কথা স্বীকাব করিতেন না যে, তাঁহারা উভয়ে এক সঙ্গে বেশ্যালয়ে গমন করিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধে এই মাত্র বলিবার আছে যে, তিনি যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার কোনও বিষয় সম্পত্তি নাই তবে তিনি কিছু সম্পত্তি পাইবার আশায় আছেন।

বাদীপক্ষের ৪৫৮নং সাক্ষী ভূপেন্দ্রমোহন ঘোষ, ঢাকার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের পুত্র। ইঁহার বয়স ৪৪ বৎসর; উক্ত রায়বাহাদুর ভাওয়াল রাজ এষ্টেটের উকীল ছিলেন। রায়বাহাদুরের পরিবার এবং রাজপরিবারের মধ্যে অত্যন্ত সৌহার্দ্দ্যও ছিল, উক্ত সাক্ষী সাক্ষ্যদানকালে বলিয়াছেন যে, মেজকুমার তাঁহাকে রমণায় ঘোড়দৌড় শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভাই জ্ঞানেন্দ্র মেজকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

বাদীপক্ষের ৪৫৯নং সাক্ষী মিঃ এন. কে, নাগ বার য়্যাট-ল, কলিকাতার

হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। ১৯২১ সালে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয় তৎপর আর তিনি ব্যবসা করেন নাই, তিনি রিসিভার, তজ্জন্য এবং অন্যান্য কার্য্যোপলক্ষে অবশ্য তিনি প্রত্যহ হাইকোর্টে যান। তিনি বারদীর সুপ্রসিদ্ধ নাগ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয় আছে, তাঁহার আরও দুই ভাই আছে, তাঁহারা বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। ১৯০৩ সালে ঢাকাতে তাঁহার সহিত মেজকুমারের পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা জ্ঞানবাবুর সহিত মেজকুমারের বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার যোগে মেজকুমারের সহিত তাঁহার খুব ভাব হয়। ১৯০৩ সাল হইতে ১৯০৪ সালের জানুয়ারীর মধ্যে তিনি প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন। তৎপর ১৯০৫ সালের মাঝামাঝি সময় হইতে যে সময় তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কিত খবর বাহির হয়, সেই সময় পর্য্যন্ত খুব দেখাশুনা হইত। একদিন গভীর রাত্রে মেজকুমার তাঁহার বাড়ীতে আসেন এবং সাক্ষীর পিতার নিকট হইতে ঋণ লইয়া দেওয়ার জন্য তাহাকে বলেন, তিনি ঠিকা গাড়ীতে আসিয়াছিলেন। গাড়ীতে আরো লোক ছিল। মদ্যপান করিয়াছিলেন। সঙ্গীয় স্ত্রীলোক'দর জন্যই তিনি টাকা চাহিয়াছিলেন। সাক্ষী জেরায় স্বীকার করিয়াছেন যে, ঐ রাত্রির আগমনটা একটা অস্বাভাবিক। তিনি কুমারের চরিত্র অবগত ছিলেন,তাহাও স্বীকার করেন। সাক্ষীকে দেখিতে খুব বিমর্ষ বলিয়া মনে হয়, যে লোককে তিনি প্রতারক বলিয়া মনে করিবেন, তাহার জন্য তিনি কখনই তাঁহার নিজের জীবনের একটা গোপনীয় অধ্যায় সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবেন বলিয়া আমি মনে করি না।

সাক্ষাতের বিবরণ

বাদীর সহিত তাঁহার প্রথম দিনের সাক্ষাৎটা একটা চমকপ্রদ ঘটনা। রাজা শ্রীনাথ রায়কে উপাধি দান উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা করিবার উদ্দেশ্যে একটা কমিটি গঠিত হয়। ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল মিঃ এস, আর, দাস উহার সেক্রেটারী এবং সাক্ষী উহার এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সাক্ষী এই উৎসব সম্পর্কিত সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। নিমন্ত্রিত লোকদের তালিকার মধ্যে বাদীর নাম দেখিয়া তিনি আপত্তি করেন, এবং বলেন যে উক্ত লোককে প্রতারক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তাঁহাকে এই সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়, অতঃপর তিনি বলেন, আচ্ছা! তিনি কুমার কি না তাহা দেখিবার জন্য আমি যাইতেছি, যদি তিনি কুমার হন তবে নিশ্চয়ই আমাকে চিনিবেন। ইহা ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসের ঘটনা। ঐ সময় বাদী কলিকাতায় ছিলেন। সাক্ষী বাদীর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া হরিশ

মুখার্জ্জি রোডে বাদীর বাড়ীতে যান। "যখন আমি বাড়ীতে ঢুকি তখন দেখি যে, নীচের তলায় একটা ঘরে দুইজন ভদ্র লোক অপর একটি লোকের সহিত কথা বলিতেছেন। আমি উক্ত দুই ভদ্রলোকের মুখ দেখিলাম, কিন্তু অপর ব্যক্তির মুখ দেখা গেল না। যখন আমি ঘরে ঢুকিলাম, তখন উক্ত দুই ভদ্রলোকের মধ্যে একজন, আমি কি চাহি তাহা জানিতে চাহিলেন। এই সময় তৃতীয় ব্যক্তি আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলেন, 'আরে নাগা!'—এই কথা বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিলেন এবং চেয়ারে নিয়া বসাইলেন ও বলিলেন "সাহেব হৈচ্ছ বিলাত গেছিলি?' চেয়ারে বসিবার পূর্ব্বেই সাক্ষী বাদীকে চিনিলেন। তৎপর সাক্ষী জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি যে নাগা তুমি কি করিয়া জান? তিনি বলিলেন, তুই বল্। তুই নাগা না?' আমি বলিলাম, 'আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তৎপরে তিনি আমার পিতা ও খুড়ার, ঈশ্বর ঘোষ, জ্ঞান, শিববাবুর পুত্র সুরেন্দ্র বসু প্রভৃতির নাম বলিলেন, তৎপর আমি বলিলাম, 'তুমি ইহাদের নাম জানিতে পার। আমি যে আসিব এই খবরও কেহ তোমাকে বলিতে পারে।' তৎপর তিনি বলিলেন "তুমি এবং তোমার বাবা ব্যতীত অন্য কেহ জানেন না এই প্রকার একটা ঘটনা বলি। অতঃপর তিনি দুপুর রাতের সেই অভিযোগের কথা বলেন।'

বাদী এই ঘটনা বলিলে পর আমি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলাম এবং তাহাকে জীবিত দেখিয়া কত যে আনন্দিত হইয়াছি তাহা বলিলাম।

অতঃপর সাক্ষী ফিরিয়া আসিয়া 'বাদীই যে কুমার তাহা মিঃ এস, আর, দাসকে বলিলেন।' বাদী গলষ্টন পার্কের পার্টিতে ছিলেন। সেখানে যে ফটো গৃহীত হইয়াছে উহাতে তিনি ছিলেন (একজিবিট করা হইয়াছে) ফটো গৃহীত হওয়ার অনেক পরে মিঃ কে, সি, দে, আই, সি, এস. আসিয়াছিলেন। সাক্ষী তাঁহাকে তথায় দেখিয়াছিলেন। এই ভদ্রলোকের উক্তির মধ্যে মিথ্যা কিছুই নাই।

মিঃ চৌধুরী বলিয়াছেন যে, ১৯২৫ সালে বাদী বাঙ্গালা বলিতে পারিত না, এই কথা সত্য নহে, কারণ বিবাদীপক্ষের সাক্ষী মিঃ কে, সি, চন্দ্র আই, সি, এস বলিয়াছেন যে, ১৯২৪ সালে ঢাকা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাইবার কালে বাদীর সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি তখন বাঙ্গালাতে কথা বলিয়াছিলেন। ইহা কি ধরণের বাঙ্গালা ছিল, ইহা কি বাঙ্গালীর বাঙ্গালা, না হিন্দুস্থানীর বাঙ্গালা, বা অতুলবাবুর ১৯২৮ সালের দুর্ব্বোধ্য হিন্দী অথবা

একজন বাঙ্গালী যিনি ১২ বৎসর যাবৎ হিন্দী ব্যতীত অন্য ভাষায় কথা বলেন নাই, সেই রকম বাঙ্গালীর বাঙ্গালা, তাহাই আলোচ্য বিষয়। এই সম্পর্কে বহু সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে, অতঃপর এই সম্পর্কে আলোচনা করা যাইবে। এই সাক্ষী যৌবনে কুমার এবং তাঁহার স্ত্রীলোকদের সহিত মিলিয়াছেন, উহাতে তাহাকে দোষ দেওয়া চলে না।

বাদী পক্ষের ৬৬৬নং সাক্ষী রমেশচন্দ্র চৌধুরী, জমিদার, বয়স ৫০ বৎসর, ঢাকার একজন ভূতপূর্ব্ব গভর্ণমেণ্ট উকীলের পুত্র। এই গভর্ণমেণ্ট উকীল ও রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ পরম বন্ধু ছিলেন। এই গভর্ণমেণ্ট উকীলের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে রাজা উপস্থিত ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর এই সাক্ষী কুমারদের নিকট বিশেষ অন্তরঙ্গ হইয়াছিলেন। ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই।

বাদীপক্ষের ৬৩১নং সাক্ষী সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর। ইনি রাজাকে ও কুমারদিগকে জানিতেন। চাকুরীর কর্ত্তব্যে তাঁহাকে জয়দেবপুরে যাইতে হইয়াছে। ইহার সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলিবার নাই; কেবল তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে। এই ভ্রাতুস্পুত্রের নাম নগেন্দ্র, সে হইতেছে ডাঃ সূর্য্যকুমারের পুত্র। ছোট কুমারের ব্যক্তিগত একজন কেরাণীর সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুতা ছিল।

বাদীপক্ষের ৭৯২নং সাক্ষী রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, বয়স ৫৫ বৎসর। ঢাকার বিখ্যাত ব্যক্তি, রমানাথ দে'র পরিবারের লোক। কয়েকটি জেলায় তাঁহাদের যে জমিদারী আছে, তাহার খাজানার আয় বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা। ইনি আয়ের এক পঞ্চমাংশের মালিক। ইহার এবং ইহার ভ্রাতাদের ঢাকায় বাড়ী ও ভূসম্পত্তি আছে, ময়দার কল আছে, ঢাকা, পাটনা এবং অন্যান্য স্থানে মহাজনী কারবার আছে। তিনি ঢাকার একজন উচ্চপদস্থ লোক; জমিদার, মহাজন এবং ব্যাঙ্কার। তিনি দ্বিতীয় কুমারকে ভালরূপে চিনিতেন। দ্বিতীয় কুমার ও তাঁহার গণিকাদের সহিত তিনি নৌ-বিহারে গিয়াছিলেন; একথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই ভদ্রলোকটী যদি বাদীকে কুমার বলিয়া বিশ্বাস না করিতেন, তাহা হইলে কখনই তিনি আদালতে আসিতেন না, এবং যৌবনকালে তিনি কি করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতেন না।

তিনি ঢাকার একটি প্রাচীন বংশের লোক। ঐ সব জিলায় তাঁহার জমিদারী আছে, এবং জমিদারীর আয় প্রায় ১৭ হাজার টাকা হইবে। ঢাকায় তাঁহার অনেক বাড়ী আছে এবং সম্পত্তির কিয়দংশ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে। ঢাকা তাঁতিবাজারের যে বিখ্যাত মিছিল বাহির হয় তাহার সমস্ত

ব্যয় সাক্ষীর দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে নির্ব্বাহ হয়। কুমারদের তিনি ভালরূপে চিনিতেন, মিছিল বাহির হইবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় কুমার তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া মিছিল কি ভাবে সাজান হইতেছে তাহা দেখিতেন এবং হাতী হইতে নামিয়া হুকা দিয়া তামাক খাইতেন।

বাদী পক্ষের ৮৯০নং সাক্ষী আবুল কাসেম (৫১)—একজন ইষ্টক ব্যবসায়ী। তাঁহার নিজের বসতবাড়ী ভিন্ন ঢাকায়ও বাড়ী আছে। তালুকদারী আছে, এবং একটি বাজার আছে, জয়দেবপুরে তাঁহার পিতার আবগারী কারবার (মদের দোকান) দেখিতে তিনি প্রায়ই জয়দেবপুর যাইতেন এবং কুমারদের ভালরূপে চিনিতেন।

বাদী পক্ষের ৯০৩নং সাক্ষী রায় সাহেব আনন্দচন্দ্র গাঙ্গুলী—একজন অবসরপ্রাপ্ত এসিষ্টাণ্ট সার্জেন। তিনি কুমারের রক্ষিতা এলোকেশীর বাড়ীতে প্রথম কুমারকে দেখেন। স্থানীয় জেলের তদানীন্তন ডাক্তার হিসাবে, জরাক্রান্ত এলোকেশীর চিকিৎসার জন্য তাহাকে ডাকা হইয়াছিল। কুমার পীড়িতা এলোকেশীর নিকট বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছিলেন। কুমারের সঙ্গে তথায় ডাক্তারের সাক্ষাৎ হয়। ইহা ভিন্ন নলগোলায়ও কুমারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। এই সমস্ত ঘটনা ১৯০৩ হইতে ১৯০৪ সালের মধ্যে ঘটে। ইহাতে সাক্ষী যে বিশ্বাসযোগ্য এমন কিছুই নাই। ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই সাক্ষী কুমারকে খুব বেশী দেখেন নাই।

বাদীপক্ষের ৯০৯নং সাক্ষী যোগেশচন্দ্র রায়, ময়মনসিংহ ঈশ্বরগঞ্জের একজন উকীল।

এই সাক্ষী বলিতেছেন যে, তিনি ১৯০১ হইতে ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত জয়দেবপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি স্কুলের বোর্ডিংয়ে বাস করিতেন। আমি এই স্কুলের ছাত্রদিগকে এই মামলায় অতিশয় প্রয়োজনীয় সাক্ষী বলিয়া মনে করি। যাহারা স্কুলের হোষ্টেলে বাস করিত, তাহারা দ্বিতীয় কুমারকে প্রত্যহ আস্তাবলে ও পিলখানায় যাইতে দেখিত। ঐ সময় তাহারা কুমারের নিকট যাইয়া চাঁদা প্রভৃতি চাহিত। তাহারা কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে কাজ করিত। নিমন্ত্রণ উপলক্ষে পরিবেশন করিত,—যেমন এই সাক্ষী রাণী বিলাসমণির শ্রাদ্ধ উপলক্ষে করিয়াছেন। এই সাক্ষীর নিকট হইতে আমরা (পলটন ঘটনার কথা জানিতে পারি) দ্বিতীয় কুমারে অক্ষর জ্ঞানের সহিত সেই ঘটনার সম্পর্ক রহিয়াছে। ঐ ঘটনা একটী প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

বাদীপক্ষের ৯২১নং সাক্ষী হিরণ্ময় বিশ্বাস (৫৩), ২৪ বৎসর যাবত

ঢাকায় ওকালতি করিতেছেন তাহার জমিদারীর অংশ আছে এবং তাহার অংশের আয় ১০ হাজার টাকা ইহবে। ঢাকা, বগুড়া ও ময়মনসিংহে জমিদারী আছে, ওয়াইজ এষ্টেটে ভাওয়ালের সহিত তাহার অংশ আছে। ভাওয়ালেরও তাহাদের অধীনে জোত আছে।

ঢাকায় তিনি শিক্ষালাভ করেন, তাহার পরিবার বিপন্ন হইলে রাজা তাহাকে অর্থ সাহায্য করেন। সাক্ষী ও তাহার ভাই রাজবাড়ী যাইতেন। রাণী ও কুমারদের মা তাহাদের সম্মুখে বাহির হইতেন। বড়কুমারের বয়স তখন ১১ বৎসর হইবে। বড়কুমারের বিবাহে সাক্ষী উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর সাক্ষী কুমারদিগকে জয়দেবপুর ও নলগোলার বাড়ীতে দেখিয়াছেন। মিঃ জ্ঞানশঙ্কর সেন যখন ম্যানেজার ছিলেন, তখনও সাক্ষী কুমারদিগকে জয়দেবপুর দেখিয়াছেন। দার্জ্জিলিং যাইবার ২।৩ মাস পূর্ব্বে মেজকুমারকে দেখিয়াছেন। সাক্ষী শেষবার মেজকুমারকে নলগোলায় দেখেন। ভাওয়াল এষ্টেটের সহিত তাহার মামলা আছে, ইহা তিনি অস্বীকার করেন।

বাদী পক্ষের ৯০৮নং সাক্ষী কালীমোহন সেন। একজন অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বয়স ৬৪ বৎসর। গত ১৯০৭ সালে জয়দেবপুরে কুমারদের সহিত ইহার সাক্ষাৎ হয়। একদিন একরাত্রি তিনি তাঁহাদের আতিথি হইয়াছিলেন। ১৯০৭ সালে ঢাকার নলগোলায় এবং কলিকাতায় আরও নানা ব্যাপারে কুমারদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, ১৯০৭ সালে জানুয়ারী মাসে কুমারগণ কলিকাতায় ছিলেন। মাতার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহারা কলিকাতায় বাস করেন। ১৯০৮ সালেও এই সাক্ষীর সহিত কুমারদের সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষীর বিপক্ষে এইমাত্র বলিবার আছে যে, ইনি সম্প্রতি বিষয় সম্পত্তিতে বীতস্পৃহ হইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছেন। মিঃ চৌধুরীর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলিয়াছিলেন যে, তিনি অলৌকিক বিষয়ে বিশ্বাস করেন। সাক্ষীর বিশ্বাস বাইবেলে কোনও মিথ্যা উক্তি নাই। অন্যান্য সাক্ষী কেহ অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস করে কিনা, অন্যান্য সাক্ষীদ্বারা তাহা স্বীকার করাইয়া লইবার জন্যও মিঃ চৌধুরী চেষ্টা করিয়াছিলেন (৪৩৫নং সাক্ষী দ্রষ্টব্য)। অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাসবান সাক্ষী বেশ ভাল সাক্ষী, তাহার সাধুর বেশে এবং সত্য বাক্যে বিশ্বাস আছে। কিন্তু সকলের জীবন একই ছাঁচে ঢালা নয়। এই সাক্ষীর বিরুদ্ধে একমাত্র বলিবার বিষয় এই যে, তিনি অন্যান্য সাক্ষীর ন্যায় কুমারদিগকে ঘনঘন দেখেন নাই। কিন্তু কোনও লোককে চিনিতে হইলেই যে তাহাকে ঘন ঘন দেখিবার আবশ্যক হইবে, তাহা নয়। অন্যান্য সাক্ষীর তুলনায় এই সাক্ষী কুমারদিগকে কম দেখিয়াছেন। সম্পূর্ণ অমিল সম্পর্কে ইহার সাক্ষ্য হয়তো বিশ্বাসযোগ্য

হইবে, কিন্তু বাদীর সহিত কুমারের সাদৃশ্য বিষয়ে ইহার সাক্ষ্য বিশ্বাস বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেকেরই দ্বিধা আসিবে।

সাক্ষী গোবিন্দচন্দ্র রায় হাইকোর্টের একজন এডভোকেট। ইহার বয়স ৬৬ বৎসর, কমিশনে ইহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। ১৮৯৫ সাল হইতে ইনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। ইনি হাইকোর্টের ভাওয়াল এষ্টেটের পক্ষে পূর্ব্বনিযুক্ত উকিল। আমি সংবাদ পাইয়াছিলাম, 'কুমার ফিরিয়া আসিয়াছেন,' এই মন্তব্য করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইনি ঐ কার্য্যে ছিলেন। কলিকাতায় কুমারেরা বহুবার আসিয়াছিলেন। প্রত্যেকবারই সাক্ষী তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন, রাণী যখন শেষবার কলিকাতায় পীড়িতা হইয়াছিলেন, এই সাক্ষী তখন উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ নরেন্দ্র মুখার্জ্জি, হুগলী জেলায় চুঁচুড়ায় ইহার বাস। কমিশনে ইহার সাক্ষ্য গৃহীত হয়। ইনি অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জেন। ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত ইনি ঢাকায় ছিলেন। তখন ইনি ঢাকা মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক। কুমারদিগকে তিনি ভালভাবেই চিনিতেন। তাঁহাদের ভগ্নীদিগকেও ইনি চিনিতেন।

কোন্ সাক্ষীকে বিশ্বাস করা যায়

সাক্ষীদিগের মধ্যে এই কয়জন কুমারদিগকে নিশ্চয়ই ভালভাবে চিনিতেন। কালীমোহন বাবু এবং রায় সাহেব আনন্দ গাঙ্গুলী ভিন্ন অন্য কেহ যে কুমারদিগকে ভুলিয়া যাইবেন, তাহা সম্ভব নহে।

আরও অনেক সাক্ষী আছেন, যাঁহারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ যাঁহারা কুমারকে ভালভাবে চিনিতেন, এবং কোন প্রকারেই যাঁহাদের কুমারকে ভুলিবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা ধনী না হইলেও সকলেই ভদ্রলোক। তাঁহারা সাধারণ শ্রেণীর হইলেও ধনদৌলত ছাড়াও তাঁহাদের ভালভাবে জীবনযাপনের উপায় আছে এবং তাঁহারা ভদ্রভাবে অনাড়ম্বর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ঐ সকল সাক্ষীকে ইতর শ্রেণীর লোক বলা যায় না; পরন্তু তাঁহারা ব্যবসাদার, দোকানদার, জোতদার, চিকিৎসক, শিক্ষক, পুরোহিত, জমিদারের গোমস্তা, কবিরাজ প্রভৃতি। ধনী না হইলেও তাঁহাদের ভদ্রভাবে জীবনযাপনের উপযুক্ত অর্থ আছে।

ঐ সকল সাক্ষীর মধ্যে আমি প্রথমে কুমারের দশজন চাকরের নাম করিব যথা—প্রতাপ (বাদীপক্ষের ৪৮নং সাক্ষী); মধ্যমকুমারের প্রহরী নন্দকিশোর তেওয়ারী (৪৯নং সাক্ষী); প্রতাপ নামক আর একজন খানসামা (৫২নং সাক্ষী); বুদ্ধু, (৬৫নং সাক্ষী); ঝুনিয়া বামুয়া (৬৯নং সাক্ষী); নারায়ণচাঁদ মণ্ডল

(২৯৪নং সাক্ষী); এই সাক্ষী কুমারের অঙ্গমর্দ্দন দ্বারা কুমারের পীড়ার সময় পরিচর্য্যা করিত; দেনগড়ি মণ্ডল (৬৮০নং সাক্ষী) আলো দিত; ভগবান কৈবর্ত্ত পাখাওয়ালা (৫৮নং সাক্ষী)। শেষোক্ত সাক্ষীর নিকট হইতে যে বিবৃতি গ্রহণ করা হইয়াছিল, তদ্দ্বারাই ইহার সাক্ষ্য মিথ্যা সপ্রমাণের প্রয়াস হইয়াছিল। উক্ত বিবৃতির গোড়ার কথা কাহারও অপরিজ্ঞাত নহে। ইহা রায় সাহেবের সেই 'মার্কামারা সাক্ষ্য'—যাহার জন্য রায় সাহেব নায়েবদের উপর কড়া হুকুম জারি করিয়াছিলেন এবং রায় সাহেব যাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিয়াছিলেন (বিবাদী পক্ষের ৪০৯নং সাক্ষী)।

মণিপুরী জকি চন্দ্রানন সিংহের নাম (বাদী পক্ষের ১৬২নং সাক্ষী) এই তালিকার অন্তর্ভূক্ত করা যায়। জয়দেবপুরে পোলো খেলার প্রসঙ্গ যখন উত্থাপন করিব, সেই সময় এই ব্যক্তির সাক্ষ্য বিশেষ প্রয়োজনে আসিবে।

কি প্রকারে কুমারের উপদংশ ব্যারাম আরম্ভ হয়, কুমারের নিজের চাকরদের মধ্যে কেবল প্রতাপ ও প্রভাত সে বিবরণ প্রদান করিয়াছে। কুমারের উপদংশ ব্যারাম সম্বন্ধে ইহাদের সাক্ষ্যই একমাত্র সাক্ষ্য। রাজবাড়ীর ডিস্পেন্সারীর কম্পাউণ্ডার উপেন্দ্র (বাদী পক্ষের ৭৪নং সাক্ষী) এ বিষয়ে কতক কতক সংবাদ দিয়াছে; কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ। কুমারের শরীরের দাগ-চিহ্ন সম্বন্ধে যখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তখন এ সকল সাক্ষ্যের বিশেষ প্রয়োজন হইবে।

রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের সাক্ষ্য

জয়দেবপুর রেল ষ্টেশনের অথবা জয়দেবপুর ও ঢাকার মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনসমূহের কর্ম্মচারিগণ কুমারদিগকে বহুবার যাতায়াত করিতে দেখিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ ঢাকার লোক না হইলেও, তাঁহারা সচ্চরিত্র ও সদ্ভাবাপন্ন বিশ্বাস-যোগ্য সাক্ষী তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় (বাদী পক্ষের ৪৫, ৫৪. ৭৭, ২৩৭, ৩০৬, ৪৩৮, ৪৮৪, ৫৬৫, ৬০২, ৬২০, ৬৪৫, ৬৫২, ৭৩০, ৭৫৬, ৭৬৬, ৮২৫, ৮৫৪, ৯০৬, ও ৯৮২ নং সাক্ষী), মধ্যমকুমার অশ্বপৃষ্ঠে অথবা টমটমে বেড়াইতে বাহির হইয়া রেলষ্টেশনে যাইতেন। রেলষ্টেশনই তাঁহার বেড়াইবার প্রিয়স্থান ছিল। তিনি রেলষ্টেশনের আফিস গৃহে যাইয়া বাবুদের সহিত গল্প করিতেন, কেরাণীদের হুকা লইয়া তামাক খাইতেন এবং রেলের কর্ম্মচারীদিগকে নিতান্ত বিরক্ত করিতেন।

বাদীর পরিচয় সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে 'বাদী অনেকটা মধ্যম কুমারের

মত'—ইহা বলা ছাড়া, বাদীর পরিচয় ও সনাক্ত করণ সম্বন্ধে রেলের এই সকল কর্ম্মচারীর কোনও নিশ্চয়তামূলক উক্তি করিবার যোগ্যতা আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কিন্তু তাহা হইলেও, ঐ সকল সাক্ষীর মধ্যে এমন লোকও থাকা সম্ভব, যাঁহারা খুব সম্ভব কুমারকে ভুলিয়া যাইবেন না, অথবা তাঁহার সম্বন্ধে ভুল করিবেন না।

ঐ শ্রেণীর সাক্ষীর মধ্যে আশুতোষ ব্যানার্জ্জির নাম করা যাইতে পারে। সাক্ষী ১৯০১ সালের প্রথম হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত জয়দেবপুর ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার ছিলেন। আর একজনের নাম অতুল ঘোষ ১০০৬ সাল হইতে ১৯০৭ সালের অক্টোবর পযান্ত এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন। পরে তিনি গার্ড হন, এবং ঐ লাইনেই চলাচল করেন। লর্ড কিচেনার যখন জয়দেবপুর আসেন এবং মধ্যমকুমার যখন দার্জ্জিলিং যান, তখন আশুবাবু ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন। সে সময় কুমার তাঁহাকে বাংলায় বলিয়াছিলেন, "মাষ্টার গাড়ী কোথায়"? আশুবাবুর সে কথা বেশ স্মরণ আছে। এই ভদ্রলোকের লম্বা গোঁফদাড়ি ছিল।

সাক্ষী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে বাদীকে দেখিতে যান। সে ১৯২১ সালের ঘটনা। বুদ্ধু বাদীকে মামা বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল—"মামা, আপনি ইহাকে চেনেন?" বাদী সাক্ষীর দিকে তাকাইলেন এবং একটু ভাবিয়া বলিলেন,—'ইঁনি আশু বাবু।" পরে বাদী জিজ্ঞাসা করেন,—'আপনার গোঁফদাড়ি কোথায় গেল?'

সাবেক কর্ম্মচারীদের সাক্ষ্য

সাবেক কর্ম্মচারীদের মধ্যে নিম্নের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে:—

বাদীপক্ষের ১০নং সাক্ষী বিপিন বয়স ৬৪ বৎসর, ১৩০৮ হইতে ১৩২২ সাল পর্য্যন্ত সদরে চীফ ম্যানেজারের অফিসে কেরাণী ছিলেন। বাদী পক্ষের ২নং সাক্ষী সুরেন্দ্র অধিকারী ১৩০৪ হইতে ১৩১৮ সাল পর্য্যন্ত সার্ভেয়ার ছিলেন। বাদীর ৬৬নং সাক্ষী রমেশচন্দ্র ঘোষ ১৩০১ হইতে ১৩২০ সাল পর্য্যন্ত নায়েব ছিলেন। বাদীর সাক্ষী হরনাথ ধরগুপ্ত ১২৮৯ হইতে ১৩০৬ সাল পর্য্যন্ত সদরে কেরাণী ছিলেন, বাদীর ৩৮৭নং সাক্ষী অরুণকান্ত নাগ ১৩০১ হইতে ১৩০৯ সাল পর্য্যন্ত নায়েব ছিলেন। বাদীর ৬৬৪নং সাক্ষী পূর্ণচন্দ্র দত্ত ১৩০৯ হইতে ১৩২০ সাল পর্য্যন্ত ভাওয়াল এষ্টেটের কর্ম্মচারী ছিলেন। বাদী পক্ষের ৯০৭নং সাক্ষী রসিকচন্দ্র রায় মহাশয়, ১৩০৯ সালে সহকারী দেওয়ান এবং

প্রাচীন দেওয়ান ঈশ্বর মিত্র অবসর গ্রহণ করিবার পর ১৩১৪ সালে দেওয়ান হইয়াছিলেন। দুর্গাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ১২৮৬ সাল হইতে ১৩২৭ সাল পর্য্যন্ত মোক্তার ছিলেন। এষ্টেটের এই সাবেক কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে বলিবার একটী কথা আছে যে, তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছিল এবং তাঁহার নামে একটি হিসাব গরমিলের মামলা হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে ১২৲ ডিক্রী হইয়াছিল।

সাধারণ চাকর-বাকরের মধ্যে ধরা যায়—বাদীপক্ষের ২২নং ও ২৩নং সাক্ষী দুইজন ঘাস কাটবার লোক, বাদীর ৯নং ও ১৪নং সাক্ষী রাজপরিবারের ক্ষৌরকার, বাদীর ২৮নং সাক্ষী একজন রাখাল, বাদীর ৪০নং সাক্ষী রাজার খানসামা, বাদীর ৬০নং সাক্ষী শিকার খেদাইবার লোক, বাদীর ১৬৮নং সাক্ষী একজন অনুচর, বাদীর ২৮৩, ১৮০ এবং ১৮৯নং সাক্ষী ফরাস পাতিবার লোক, বাদীর ২১০ এবং ২৯২নং সাক্ষী রাজপরিবারের ধোপা, বাদীর ২৩০ ২৩১, ৪৪১, ৪৬৭, ৪৬৮ ৫৪২, ৬৪২ এবং ৭১৯নং সাক্ষী পিওন, বাদীর ২৭৫নং সাক্ষী একজন মালী, বাদীর ৩৫৭নং সাক্ষী পাঙ্খাওয়ালা, বাদীর ৫৯, ৫৮১ এবং ৬৩৬নং সাক্ষী মাহুত, বাদীর ৮২৯নং সাক্ষী একজন ভারী, (ভারবাহক)। বাদীর ৮৮৮নং সাক্ষী জলের কলের লোক, পেশাদারদের মধ্যে বাদীপক্ষের ২৫নং সাক্ষী একজন কুম্ভকার, বাদীর ৪৭, ৬৭৮, ৭০৬ এবং ৭০৭নং সাক্ষী বাদ্যকর, বাদীর ৬৪৪ এবং ৭১৭নং সাক্ষী ঝালাইকর, বাদীর ৩৭৫ এবং ৭১২নং সাক্ষী যাত্রাওয়ালা, বাদীর ৬৬৫ এবং ৭০নং সাক্ষী স্বর্ণকার, বাদীর ৬৮৩নং সাক্ষী মিস্ত্রী, বাদীর ২১নং সাক্ষী গোয়ালা, বাদীর ৯১৩নং সাক্ষী চিত্রকর, বাদীর ৩২০নং সাক্ষী নাটকের সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহকারী, বাদীর ৪৩৪, ৪৪৪ এবং ৮৬৫নং সাক্ষী সঙ্গীতজ্ঞ। মফঃস্বলের একটী প্রাচীন জমীদার পরিবারের সহিত এইরূপ যতপ্রকার লোকের যোগাযোগ থাকা সম্ভব, সাক্ষীদের মধ্যে সেরূপ লোক অসংখ্য।

শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র ঘোষের সাক্ষ্য

ভাওয়াল এষ্টেটের অধীনে এমন তালুকদার আছে, যাহাদিগকে ছোটখাট জমিদারও বলা চলে। সেই সকল তালুকদারের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, আমি তাঁহারই কথা উল্লেখ করিব। তিনি হইলেন হরবাইদের বাবু দিগিন্দ্র-নারায়ণ ঘোষ। তিনি পূবাইল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। তাঁহার তালুকের আয় বার্ষিক প্রায় দশ হাজার টাকা। প্রথমাবধি তিনি বাদীর একজন দৃঢ় সমর্থক এবং তাঁহাকে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসাবে ধরা যায় না। অন্যান্য যে সকল নিরপেক্ষ সাক্ষী আছেন, তাঁহাদের কথা বিবেচনা করিয়া আমার মনে হয় যে, এই সাক্ষী তাঁহার বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই বাদীর পক্ষ সমর্থন করিয়া-

দারজিলিং যাইবার পূর্ব্বে শিকারীবেশে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ

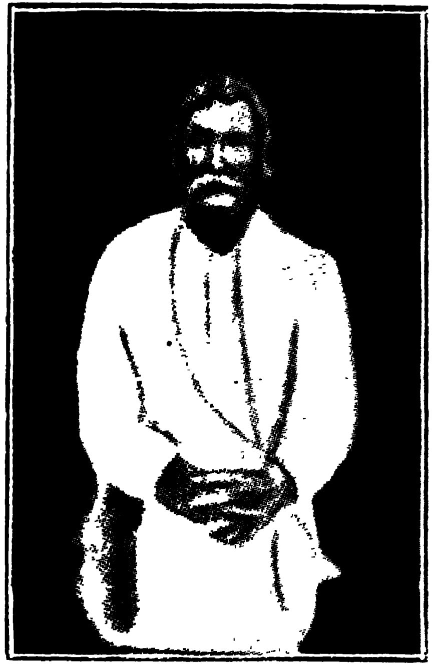

ভাওয়ালের স্বভাব কবি স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস

Aparajita Press

ছেন। ইহার পশ্চাতে অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। স্মরণ থাকিতে পারে যে, তিনি প্রজা এবং তালুকদার সমিতির সভাপতি ছিলেন, এবং বাদীকে সমর্থন করিবার জন্য ৩২ হাজার হইতে ৩৫ হাজারের মধ্যে টাকা ধার করেন। এক-পক্ষের সাক্ষী হইলেও তাঁহার সাক্ষ্যে একটি আশ্চর্য্য রকমের সংযম দেখা যায়। ১৮৯৯ সালে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বিবাহোপলক্ষে তিনি প্রথম জয়দেবপুরে যান। ইহার পর তিনি কার্য্যোপলক্ষে রাজার আমলে, মিঃ মেয়ারের আমলে এবং মিঃ সেনের আমলে অন্ততঃ বার বার জয়দেবপুরে যান, এবং ১৯০৯ সালের ১২ই এপ্রিল দ্বিতীয় কুমার দার্জ্জিলিং যাইবার পাঁচদিন পূর্ব্বে যে অনুষ্ঠান হয়, তদুপলক্ষে তিনি শেষ বার জয়দেবপুরে যান (একজিবিট নং ৭)। ঘটনা পরম্পরায় দেখা যায়, তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন না, এবং এই মামলায় বাদীকে কুমার বলিয়া তাঁহার ধরিয়া লওয়ায় কিছু আসে যায় না। তালুকদারগণ রেলওয়ে ষ্টেশন বা জয়দেবপুর যেমন চিনিতেন, কুমারদিগকেও ঠিক তেমনই চিনিতেন, বলিয়া ধরিয়া লইলেই যথেষ্ট।

ঢাকাবাসী সাক্ষী

ঢাকা হইতে বহু দোকানদার, ব্যবসায়ী, সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান ভদ্রলোক এবং কতিপয় পদস্থ ব্যক্তিও সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছেন। কুমারেরা প্রায়ই ঢাকা আসিয়া নলগোলার বাড়ীতে থাকিতেন, জয়দেবপুর হইতে ঢাকা আসিতে একঘণ্টা সময় লাগে। নলগোলার বাড়ীর নাম "নীরনিবাস" এবং উহা নদীতীরে অবস্থিত। দ্বিতীয় কুমার তাঁহার টমটমে চড়িয়া:বাহির হইতেন অথবা দলে যাইয়া মিশিতেন। তিনি বেশ্যালয়ে যাইতেন (৯২০ ও ৯৯৬নং সাক্ষী), স্ত্রীলোক লইয়া নৌ-বিহার করিতেন, কখনও বা লঞ্চ 'মতিয়াতে' চড়িয়া যাইতেন, বাড়ীর পশ্চাতে নদীতে স্নান করিতেন, আমোদ প্রমোদে যোগদান করিতেন, তবে অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে বাড়ীর বিপরীত দিকে অবস্থিত আস্তাবলে দেখা যাইত। বাড়ীতে, রাস্তায়, আস্তাবলে, বাড়ীর পোস্তা হইতে নদীতে লাফাইয়া পড়িতে, ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিলে তাঁহার সুসজ্জিত হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া যাওয়া আসা করিতে, বাদী পক্ষের ৪৩৫নং সাক্ষী যেমন বলিয়াছে যে, 'মিছিলে তিনিও ছিলেন একটি দেখিবার বস্তু',—এই সকল যাহারা দেখিয়াছে, তাহাদের সকলের নাম করিবার প্রয়োজন নাই। তাহাদের সাক্ষ্যের বিশেষ আলোচনাও দরকার নাই। বাদীকে সনাক্তকরণের পক্ষে তাহারা সকলেই যে যোগ্যব্যক্তি একথা ধরিয়া লইলে বিপদ। লণ্ডনে একজন অজ্ঞাত অখ্যাতনামা লোককে একদিন দেখিবার পর, ঠিক তাহার মত

অবয়ববিশিষ্ট আর এক ব্যক্তিকে দেখিয়া ভুল করা সম্ভব; কিন্তু তাহার সহিত কুমারের তুলনা করা বৃথা।

নির্ভরযোগ্য সাক্ষী

দ্বিতীয়তঃ যে সকল সাক্ষীর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোনও প্রশ্নের অবকাশ নাই,—কেবল দ্বিতীয়কুমারের কথা তাঁহাদের কতদূর স্মরণে, ইহাই কেবল জিজ্ঞাস্য। তাঁহাদের কথা ধরা যাউক :—

প্রথমেই আমি কলিকাতার সম্মানী ব্যক্তি এবং বাদীপক্ষের সাক্ষী শ্রীযুত সুবোধকৃষ্ণ বসুর নাম উল্লেখ করিব। সুবোধবাবুর জন্মস্থান কলিকাতা এবং তিনি কলিকাতায়ই লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত। তিনি কলিকাতার রাজা বিনয় কৃষ্ণের ভাগিনেয়। তিনি দ্বিতীয় কুমারকে ১৯০৫ ও ১৯০৬ সালে এবং পুনরায় ১৯০৮ সালে দেখেন এইখানে দেখা যায়—১৯০৬ সালে কুমার যখন ধর্ম্মতলার বাড়ীতে বাস করিতেন, তখন সাক্ষী কুমারকে দেখিয়াছিলেন এবং তিনি ১৯০৭ সালে কলিকাতা যান নাই।

ইহার পর বাদীর ৬০০নং সাক্ষী ময়মনসিংহ জেলার সেনবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন এবং বাদীর ৪৬১নং সাক্ষী কলিকাতার ইঞ্জিনিয়ার পি, সি, গুপ্তের কথা উল্লেখ করা যায়।

তিনি কুমারের একজন বন্ধু ছিলেন বলিলেও ক্ষতি হয় না। কুমারের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন; কিন্তু দ্বিতীয় কুমার যখন দার্জ্জিলিং যান তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর ছিল। তিনি কুমারের সহিত ঘোড়ায় চড়িতেন, রাজবাড়ী যাইতেন এবং মাঝে মাঝে ঢাকার বাড়ীতেও যাইতেন। ইহার পর কুমারেরা তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন; কিন্তু ১৯২৪ সালের অর্থাৎ ১৯০৯ সাল হইতে ১৭ বৎসর পর তিনি বাদীকে দেখেন।

বাদীর ৫৮নং সাক্ষী প্রিয়নাথ সাহা বণিক। ঢাকার একজন ধনী ব্যবসায়ী। তাঁহার ঢাকায় কয়েকখানি বাড়ী আছে এবং তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তবে তিনি কুমারকে রাস্তায় কিংবা অন্য কোথাও বাহিরে দেখিয়াছেন।

বাদীর ৮৯নং সাক্ষী মিঃ জি, সি, সেন ১৯০৫ সালে ইনি কুমারের জীবনবীমা করিবার সময় এজেণ্ট ছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি বাদীকে দেখিয়া ঠিক করেন যে, এই ব্যক্তিই কুমার। কিন্তু তথাপি তাহাকে পরীক্ষা

মূলক প্রশ্ন করিতে হইয়াছিল; কাজেই আমি ধরিয়া লইতে পারি না যে, তিনি ঠিক চিনিতে পারিয়াছিলেন।

বাদীর ১৮৯নং সাক্ষী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর। তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর। তিনি কুমারকে সাধারণতঃ রাস্তাঘাটেই দেখিয়াছেন। নলগোলার বাড়ীতে মাত্র দুইবার কুমারকে দেখিয়াছিলেন। ইহারই মধ্যে তিনি কোনও একবার দ্বিতীয় কুমারকে একটি ঘরে তাঁহার ইয়ারগণ ও ৩৪টি গণিকাকে এক সঙ্গে দেখিয়াছেন। যে সকল লোক মেজকুমারকে রাস্তায় দেখিয়াছেন, আমি তাঁহাদের মধ্যে সাক্ষ্য সম্পর্কে বিবেচনা করিব না।

বাদী পক্ষের ৮৯৪নং সাক্ষী মাখনলাল দে (৫০) মার্চেন্ট, ঢাকা ও কলিকাতায় ব্যবসা করেন, কলিকাতার ও ঢাকায় বাড়ী আছে।

বাদী পক্ষের ৯৮৪ নং সাক্ষী রমণীমোহন বসাক, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের একটি শাখার এজেণ্ট ছিলেন। এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

বাদী পক্ষের ১০০১নং সাক্ষী উপেন্দ্রচন্দ্র চাটুর্য্যে বি, এল, মুন্সীগঞ্জের উকিল

বাদী পক্ষের ১০১২ নং সাক্ষী সন্ন্যাসীচরণ রায় ঢাকার বিখ্যাত উকিল।

বাদী পক্ষের ১০২৪নং সাক্ষী রমণীমোহন গোস্বামী।

এই সাক্ষীদের মধ্যে সন্ন্যাসীবাবু মেজকুমারকে দেখিয়াছেন মাত্র, এই জন্য তাঁহার সাক্ষ্য কোন কাজে আসিবে না। উল্লিখিত সাক্ষীদের মধ্যে বাবু আশুতোষ বাঁড়ুয্যে (বাদী পক্ষের ৯৫১নং সাক্ষী) এই সহরের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তিনি ঢাকার জমিদার, তিনি মুবাপাড়ার বিখ্যাত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জমিদারীর আয় দেড় লক্ষ টাকার মত, ঢাকাতে বাড়ী আছে। জমিদারী ব্যতীত অন্য যে সম্পত্তি আছে, উহার জন্য চারি হাজার টাকা আয়কর দিতে হয়। এই পরিবারের সহিত ভাওয়াল পরিবারের অত্যন্ত প্রীতির ভাব ছিল। সাক্ষ্যদানকালে সাক্ষীর বয়স ৪৪ বৎসর ছিল অর্থাৎ মেজকুমারের দার্জ্জিলিং যাওয়ার কালে তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর ছিল। তিনি তিন কুমারকে 'পার্টিতে', মিছিলে এবং গাড়ীতে দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রত্যেক কুমারের চেহারা মনে আছে মিঃ র‍্যাঙ্কিনের বিদায়োপলক্ষে ২৭-৭-৫০ তারিখে ঢাকার নর্থব্রুক হলে যে পার্টি দেওয়া হইয়াছিল, তিনি মেজকুমারকে সেখানে দেখিয়াছেন। বিবাদী পক্ষের ৩১০ নং সাক্ষী রায় সাহেব উক্ত পার্টির কথা স্বীকার করিয়াছেন।

১৯০৯ সালে স্যার ল্যান্সলট হেয়ারের সম্মানার্থে ঢাকায় যে 'গার্ডেন পার্টি' হইয়াছিল, সাক্ষী সেখানেও মেজকুমারকে দেখিয়াছিলেন মেজকুমারের সহিত কখনও কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। বাদীর আত্মপরিচয় দানের চারি মাস পর অর্থাৎ ১৩২০ বাঙ্গালা ভাদ্র (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর) মাসে তাঁহার বাড়ীতে তিনি বাদীকে দেখিয়াছেন। সাক্ষী বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, এবং বাদীকে তাঁহার মা ঠাকুরমার নিকট লইয়া যান। অতঃপর কয়েকবারই বাদী তাঁহার বাড়ী আসিয়াছিলেন। সাক্ষীকে বাদী কোথায় দেখিয়াছেন, ১৯৩৪ সালে সাক্ষী বাদীকে উহা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন যে, মিঃ র‍্যাঙ্কিনের বিদায়োপলক্ষে যে পার্টি দেওয়া হইয়াছিল তথায় তিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন। মিঃ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'মিঃ র‍্যাঙ্কিনের পার্টির কথা বলিয়াছেন বলিয়াই, আপনি বিশ্বাস করিয়াছেন যে, বাদীই মেজকুমার ?'

উত্তরে—হাঁ,—বিশ্বাস করিয়াছি।

এই উক্তি শুনিয়া মনে হয় যে, তিনি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। এই সাক্ষ্য হইতে নানা কথা আসে। মনে হয় একটা লোককে মেজকুমার বলিয়া চালাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে। আমি এই মামলার সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য শুনিয়াছি। এই সাক্ষীদের মধ্যে সকল শ্রেণীর লোক ছিল। উহাদের বয়স চল্লিশের কম ছিল না, এবং পঞ্চাশের অধিকই ছিল। উহাদের মধ্যে বহু গাম্ভিয্যপূর্ণ ব্যক্তি এবং বয়স্ক লোক ছিল। ইহারা যে গাঁজাখুরী কথা বলিতে পারেন, তাহা কেহ বিশ্বাস করিবেন না। ইহাদের কথা শুনিলে এই মনে হয় যে, কেহ বুড়ী-গঙ্গার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন না। আর সাক্ষীরা এখানে একটা নদী ছিল ইহাই বলিতেছেন।

আমি এই সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করি নাই, শুধু তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি কারণ ইহাদের সাক্ষ্যের ভিতর কিছু মিথ্যা আছে বলিয়া মনে হয় না, শুধু বাদী আত্মপরিচয় সম্পকিত ঘটনা নহে, পারিবারিক ঘটনা সম্পর্কেও কোন কিছু মিথ্যা বলে নাই, আমার বিশ্বাস। বিবাদীপক্ষ বাদীও মেজকুমারের সাদৃশ্য সম্পর্কেও অনেক প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। সাক্ষীর সাক্ষ্য দেখিবার নহে। কোর্টকে দেখিতে হইবে (ক) উভয় পক্ষ কি প্রকার প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, সাক্ষীদের অবস্থা, মর্য্যাদা, শিক্ষা, লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা, কুমারের কথা তাহাদের কতদূর মনে পড়ে।

মিথ্যা বলিবার কোন কারণ আছে কি না, কুমারের শিক্ষা, পোষাক কোনও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কাহারো মিথ্যা বলিবার কারণ আছে কি না ?

(খ) এমন কোন অখণ্ডনীয় প্রমাণ আছে কিনা, যাহার উপর নির্ভর করিয়া বাদীই মেজকুমার কি না তাহা হয় স্বীকৃত হইবে অথবা অস্বীকৃত হইবে, এই মামলায় বহু প্রমাণ আছে।

ক'তে বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কিত সাক্ষ্য সম্পর্কে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সকল সাক্ষীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাহাদের নাম উল্লেখ করা হয় নাই, তাহাদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। তাহারা নিশ্চয়ই কুমারকে চিনিতেন এবং তাঁহার সম্পর্কে ভুল করিবেন না। আমি উক্ত তালিকা সম্পর্কে উল্লেখ করিতেছি, কুমারের শিক্ষা এবং অন্য ভাবমূলক বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অন্য সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। এই সম্পর্কে আমি পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব। এই সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে আমি এখন কিছু বলিতেছি। অন্য বিষয় সম্পর্কেও আমি এখন কিছু বলিতেছি। অন্য বিষয় সম্পর্কেও বিবাদী পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করা যায় না। এখন আমি ঐ সকল সাক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করিব।

বিবাদী পক্ষের সাক্ষ্য

বিবাদী পক্ষে ৪৭৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কমিশনে ৪৪ জনের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। তাহারা বাদীই উজলার 'মাল সিং' বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং যাহারা সনাক্ত করণ সম্পর্কে কিছুই বলেন নাই, তাহাদিগকে বাদ দিলেও যাহারা এই বাদী 'মেজ-কুমার' নহে বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন, এই প্রকার সাক্ষীর সংখ্যা ৩৭৪ জন। ঐ সব সাক্ষীর মধ্যে ৫৬ জন ভদ্রলোক এষ্টেটের অধীনে চাকুরী করেন না। অবশ্য জয়দেবপুর রাজস্কুলে চাকুরী করেন। এমন কয়েকজন ঐসব সাক্ষীদের মধ্যে রহিয়াছেন। অবশিষ্ট সাক্ষী প্রজা অথবা এষ্টেটের চাকরবাকর অথবা কৃষক। মিঃ চৌধুরী প্রজাদের একখানি তালিকা আমাকে দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, প্রজাদের সংখ্যা ২১৯ জন কিন্তু ঐ তালিকায় অনেক নাম বাদ আছে। তিনি চাকরদের যে তালিকা দিয়াছেন। তাহাতে চাকরের সংখ্যা ২১ জন দেখা যায়। ইহার মধ্যে ১০ জন এষ্টেটের অধীনে কাজ করে, এবং একজন ভিন্ন অবশিষ্ট সকলেই আর সকল কাজ করে এবং কয়েকজন ভিন্ন অবশিষ্ট

সকলেই এষ্টেটের প্রজা। তিনি ভদ্রলোকের যে তালিকা দিয়াছেন। তাহাতে ভদ্রলোকের সংখ্যা মোট ৮৩ জন। কিন্তু এই তালিকাও অসম্পূর্ণ। এই ৮৩ জন ভদ্রলোকের মধ্যে ৪২ জন নায়েব অথবা অন্যান্য কর্ম্মচারী—যাঁহারা এখনও এষ্টেটেই কাজ করিতেছেন।

প্রজা সাক্ষীদের সম্পর্কে ইহা সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, রায় সাহেব নমুনাস্বরূপ যে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন ঐসব সাক্ষী তাহারই ফল। পিয়নের হেপাজতে নায়েব তাহাদিগকে কোর্টে পাঠান, ইহা প্রত্যেক সাক্ষীই স্বীকার করিয়াছে। এই সব সাক্ষী এবং বাদী যে সব প্রজা সাক্ষী হাজির করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত সাক্ষিগণ এমন একজন লোকের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে যাহার দখলে এষ্টেট ছিল না। আর একটি পার্থক্য এই যে, বাদীপক্ষের প্রজা সাক্ষিগণ বিবাদীপক্ষের প্রজা সাক্ষীদের তুলনায় অধিক বিত্তশালী। ইহার মধ্যে পিরুজলিয়া একজন প্রজার সাক্ষ্য একমাত্র ব্যতিক্রম। কিন্তু এই সাক্ষীরও হাট ইজারা আছে। এই সব সাক্ষীদের উক্তি হইতে কিছুই সিদ্ধান্ত করা করা যাইত না, যদি তাহাদের জেরায় কিছু না প্রকাশ হইয়া পড়িত।

নায়েব ও এষ্টেটের অন্যান্য কর্ম্মচারীদের সম্পর্কেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য। আদেশ ছিল একজিবিট ৩৫৩ (১) কেহ যেন তাহাদের অঞ্চল হইতে বাদীপক্ষে সাক্ষ্য না দেয়। তাঁহারা তাহাদিগকে কোন স্বাধীনতা দেন নাই। কোন নায়েবের এলাকা হইতে একজন লোক বাদীপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ায়, ঐ নায়েবকে কেন ডিসমিস করা হইবে না, তাঁহাকে তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য নোটীশ দেওয়া হয়। একজন নায়েব জেরায় স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি যদি বলিতেন যে বাদী কুমার, তাহা হইলে তাহার চাকুরী যাইত। বিবাদী পক্ষে ৩২৯ নং সাক্ষী পূর্ব্ববর্ত্তী ম্যানেজার মিঃ মোহিনীমোহন চ্যাটার্জ্জিও অনেকটা ঐরূপ অভিমতই পোষণ করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যদি কোন কর্ম্মচারী শুধু বলে যে, বাদী মেজকুমার তাহা হইলে তাহাই প্রচারকার্য্য হইবে, কারণ অপরে তাহা অনুসরণ করিবে। তাহারা সরল বিশ্বাসে যাহা মনে করে, প্রকাশ্যভাবে তাহাদের তাহা বলা সঙ্গত নহে। যদি তাহারা তাহা করে, তাহা হইলে এষ্টেটের উপর কর্ত্তব্য পালন করা হইবে না। যাঁহার অধীনে সে কাজ করে তাঁহার মতের সহিত যদি কোন সাক্ষীর মতের মিল না হয়, তাহা হইলে সে তাহা প্রকাশ করিবে না। এইজন্যই বোধ হয় এবং আরও একটু অগ্রসর হইয়া—বাদীর উপর ১৪৪ ধারা জারী সম্পর্কিত মামলায় তিনি বলিয়াছেন যে,

বাদীর সহিত তাহার আলাপ হইয়াছে—যদিও বর্ত্তমান মামলায় তিনি বলিয়াছেন যে, বাদীর সহিত তাঁহার কোন আলাপ হয় নাই।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কেহ নিজের সর্ত্তাধীনে ভৃত্য নিযুক্ত করিতে পারে, কিন্তু সর্ত্তাধীনে আদালতে সাক্ষী পাঠান যায় না।

আর একটি সাধারণ মন্তব্যের বিষয় এই যে, যে ঢাকায় বাদী একজন সুপরিচিত লোক ছিলেন, সেই ঢাকা সহর হইতে বিবাদীপক্ষে মাত্র একজন লোক ভিন্ন আর কাহাকেও সাক্ষ্য মান্য করা হয় নাই।

সেই একটি মাত্র লোকও (বিবাদীপক্ষের ৭৯নং সাক্ষী মাধব) প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়। সে বলিতে আরম্ভ করে যে, সে ঢাকা সহরের সোণাকুঠীতে বাস করে। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, তাহার বাড়ী আদৌ ছিল না—১৯১৫ সালে তাহার ভগ্নীপতির নিকট বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ ভগ্নীপতি তাহার বেনামদার ছিল। সে পুনরায় বলে যে, ক্রেতা নিজের টাকারই ঐ বাড়ী খরিদ করে। এই দুই উক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে যাইয়া বলে যে, সে নিকটবর্ত্তী আর একটী বাড়ীর কথা বলিতেছে, এবং সেই বাড়ী এখনও তাহার দখলে আছে। কিন্তু ঐ বাড়ী বেনামদারের নিকট বিক্রয় করিয়াছে; এবং ১৪ বৎসর যাবৎ তাহা বেনামদারের দখলে আছে। সাক্ষী ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেছে। সে কোনদিন উকীলের কেরাণী ছিল। ইহা সে অস্বীকার করে; এবং পরে ডাইরী দৃষ্টে সে তাহা স্বীকার করে। ডায়েরী লেখা আছে যে, '১৯২৯ সালের ১২ই নবেম্বর পর্য্যন্ত।' তথাপি এই লোকটী—যে কুমার সম্পর্কে কিছুই জানিত না—কুমারের চেহারা সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রমাণ করিতে আসে। এই সাক্ষী বর্ত্তমানে বেকার এবং সে কিভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহা কেহ জানে না। সে স্বীকার করিয়াছে যে, বিবাদী পক্ষের কোন এজেণ্ট তাহাকে পানের দোকান হইতে সজোরে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে।

এষ্টেটের কর্ম্মচারী ভিন্ন নিম্নলিখিত আরও ৫৫জন সাক্ষী বাদীর চেহারার সাদৃশ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন। তন্মধ্যে ৪০ জন কোর্টে আসিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন, এবং ১৫ জন কমিশনে সাক্ষ্য দেন।

(১) লেঃ কর্ণেল পুলি, (২) মিঃ র‍্যাঙ্কিন আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত), —বিবাদীপক্ষের ২নং সাক্ষী, (৩) মিঃ কে, সি, দে আই সি এস (বিবাদীপক্ষের সাক্ষী। (৪) মিঃ জে, এন, গুপ্ত আই সি এস (অবসর প্রাপ্ত), ইহার কমিশনে সাক্ষ্য লওয়া হয়।

(৫) ভাওয়ালের পূর্ব্ববর্ত্তী ম্যানেজার মিঃ মেয়ার (কমিশন)

(৬) মিসেস মেয়ার (ঐ)

(৭) কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্রলোক মিঃ শরদিন্দু মুখার্জ্জি (বিবাদী পক্ষের ১২০নং সাক্ষী)

(৮) লেঃ হোসেন—ময়মনসিংহের জমিদার (বিবাদী পক্ষের ৬নং সাক্ষী) এই লেঃ হোসেনের উক্তি অনুসারে দেখা যায় যে, এখন তাঁহার সামান্য সম্পত্তিই আছে, অত্যন্ত ঋণ-জর্জ্জরিত। তাঁহার বিরুদ্ধে মোট ১,৬৩০০০ ডিক্রী আছে, তাহা কত টাকার জানা যায় নাই। তাহার জমিদারী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সাক্ষী কোন্ বৎসর এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন, তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। অবশেষে বহু চেষ্টার পর ১৯০৪ সালে ঐ পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন বলিয়া বলেন। ইহাতে ১৯০৫ সালে তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতেন ইহা বুঝা যায়। পরে ঢাকা কলেজে পড়িতে আসেন; কিন্তু কোন বৎসর ঢাকায় পড়িতে আসেন, তাহা বলেন না। অবশেষে বলেন যে, ১৯০৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত এক বৎসর ঢাকা কলেজে ছিলেন। ১৯০৮ সালের মে অথবা জুন মাসে কলেজে যোগদান করেন। ১৯০৬ অথবা ১৯০৭ সালে তিনি কুমারের সহিত শিকারে গিয়াছিলেন। (যখন তিনি আদৌ ঢাকায় ছিলেন না।)। এই উক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য কলেজে ভর্ত্তি হইবার তারিখ নির্দ্ধারিতভাবে বলিতে চাহেন না। সাক্ষী বলিতেছেন যে, তিনি ১৯০৪, ১৯০৫ এবং ১৯০৬ ও ১৯০৭ এবং ১৯০৮ সালে কুমারের সঙ্গে খানা খাইয়াছেন। সাক্ষী জানেন না যে, কুমারদের কলিকাতা গমন সম্পর্কে আদালতে গঠিত বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। কুমারদের সাহেবখানা সম্পর্কে আলোচনা কালে আমি দেখাইব যে এই সাক্ষীর কুমারের সহিত খানা খাইবার কাহিনী 'শূন্যে' মিলাইয়া গিয়াছে।

---

(৯) বিবাদী পক্ষের ১৪নং সাক্ষী কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী রাণী বিলাসমণি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক। এই শিক্ষকটি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফেল করেন। বাদীকে জেরায় যে সব প্রশ্ন করা হইয়াছিল, এই সাক্ষীও প্রায় সেই সব কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার সাক্ষ্য নিম্নে বিচার করা হইবে।

(১০) বিবাদী পক্ষের ৩নং সাক্ষী যোগেন্দ্র সেন (৬৪) এষ্টেটের একজন পুরাতন কর্ম্মচারী এবং সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বিচারের সময় তাঁহার জামানতী, টাকা উঠাইয়া নেন। তিনি জামালপুরের তাঁহার এক

আত্মীয়ের সঙ্গে জয়দেবপুরেই বাস করেন। ঐ আত্মীয়টী জয়দেবপুর এষ্টেটের রেকর্ড-কিপার। একজন দোকানদার তাহার বিরুদ্ধে মামলা করিয়া ডিক্রী পায়, এবং তাহাকে তাহার বাড়ীঘর নিয়া রেহাই পায়।

(১১) বিবাদী পক্ষের ২২নং সাক্ষী রমণীমোহন মজুমদার (৪১) পূর্ব্বে নায়েব ছিলেন; কিন্তু তাহাকে ডিস্‌মিস্ করা হয়। ইহার পরবর্ত্তী মালিকও তাহাকে ডিসমিস করেন এবং তৃতীয়বার তাহাকে সসপেণ্ড করা হয়। তিনি মাসিক ১৫৲ বেতন পাইতেন এবং খাওয়া পাইতেন। তাঁহার বাড়ীঘর রেহাণাবদ্ধ। তাহার অবস্থা খারাপ—তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

(১২) বিবাদী পক্ষের ২৩নং সাক্ষী আবদুল ওয়াজিদ। নিজকে তালুকদার বলিয়া বলেন; বাৎসরিক খাজনা ১০৮৲, তাহার কারাদণ্ড হইয়াছিল কিনা তাহা ভুলিয়া যান, কিন্তু চাপিয়া ধরা হইলে তিনি স্বীকার করেন যে, টাকা জাল কবিবার অপরাধে তাহার ৭ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল। এই সাক্ষী ফণী বাবুর (বিবাদী পক্ষের ৯২নং সাক্ষী) প্রজা।

(১৩) বিবাদী পক্ষের ৩২নং সাক্ষী শরৎ চক্রবর্ত্তী (৭৫) একজন নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ। হাটে জিনিষ বিক্রয় করে। এই সাক্ষী ১০৲ ঋণ পরিশোধের জন্য ৪ বৎসরের কিস্তি লয়।

(১৪) বিবাদী পক্ষের ৪২নং সাক্ষী শ্রীনাথ রায় (৪১) ১৯০৬—১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত জয়দেবপুর স্কুলে ছিল। সে একজন বেকার। তাহার ৮ খাদা জমি আছে, ও আশু ডাক্তারের জন্য বর্গার শস্য সংগ্রহ করে।

(১৫) বিবাদী পক্ষেয় ৭৭নং সাক্ষী বসন্ত বল (৫০) ১৩১৩ সন হইতে ১৩২১ সন পর্য্যন্ত এষ্টেটের কেরাণী ছিল। অতঃপর অন্য এক জায়গায় মাসিক ১৮৲ বেতনে কাজ করিত। সে বলে যে, সে ঐ কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু প্রথমে অস্বীকার করিয়া পরে স্বীকার করে যে, তাহার মনিবের নিকট সে টাকা ধারিত, এবং সে জন্য তাহাকে সে হ্যাণ্ডনোট দেয়। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তছরূপ করিবার জন্যই তাহাকে ডিসমিস করা হয়। এই ব্যক্তি বর্ত্তমানে বেকার; জীবিকার কোন উপায় নাই। এবং জমি হইতে ৪০ মণ ধান পায় ইহাই তাহার একমাত্র আয়,—অবশ্য যদি ইহা সত্য হয়।

(১৬) বিবাদী পক্ষের ৭৮নং সাক্ষী মনোমোহন ব্যানার্জ্জি (৬৫) বাড়ী ফরিদপুর। জামাতার উপর নির্ভর করিয়া ঢাকায় আছে। কিন্তু বলে তাহার টাকার অভাব হইলে সে টাকা দেয়। সে আরও বলে যে, গ্রামে যে বাড়ী আছে তাহাতে তাহার অংশ আছে। ঐ বাড়ী তাহার ভাই ও

ভ্রাতুষ্পুত্র তৈরী করে, কিন্তু সে তাহার জন্য কিছু খরচ দেয়। আমার বিশ্বাস যে, যে সব সাক্ষীদের কথা আমি আলোচনা করিতেছি তাহারা সকলেই হয় কুমারকে জানিতেন না হয় দেখিয়াছিলেন। কিন্তু এই সাক্ষীটি কুমারকে দেখে নাই, অথবা কুমারের সম্বন্ধে কিছু জানেনও না। সুতরাং আমার সন্দেহ হয় যে, সাক্ষী আদৌ কালীগঞ্জে কাজ করিয়াছে কি-না। সাক্ষী বলিয়াছে যে, কুমারের মৃত্যু সংবাদ যখন জয়দেবপুর পৌছে তখন সে তথায় উপস্থিত ছিল। কিন্তু সে ইহাকে অকাল মৃত্যু বলিতে পারিতেছে না—কারণ তখন কুমারের বয়স ৫০ কি ৫৫ বৎসর হইবে।

(১৭) বিবাদীপক্ষের ৮৭নং সাক্ষী সৌভাগ্যচাঁদ শেঠ (৪৫)। তিনি মণিকার লাভচাঁদ মতিচাঁদের পুত্র। তিনি মেজকুমারকে শেষবার কলিকাতায় যখন দেখেন, তখন তাহার (সাক্ষীর) বয়স ১৮ বৎসর। তাহার আপন খুড়া মতিচাঁদের (অপর অংশীদার) এই সাক্ষীর মতই কুমারকে দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। ভাইপো'কে সাক্ষী মান্য করিবার কারণ ঘটিয়া থাকিলেও, খুড়োকে ডাকার কারণ ঘটে নাই; আর ভাইপো'কে ডাকার কারণ ঘটিয়াছিল। আলীপুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট সত্যবাবুর এজলাসে এই সাক্ষী একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন। ১৯৩৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল তিনি ঢাকায় সাক্ষ্য দিতে আসেন এবং তাহার মামলা দায়ের থাকাবস্থায় ফিরিয়া আসেন। ফৌজদারী মামলায় ১৯৩৫ সালের ২৩শে এপ্রিল আসামীর প্রতি দণ্ডাদেশ হইবার পর তিনি প্রকৃতপক্ষে ভাওয়াল মামলায় সাক্ষ্য দেন।' পরে ঐ মামলার ফল উল্টাইয়া যায়। ইহাতে শুধু দেখিবার বিষয় এই যে, মামলা দায়ের থাকাবস্থায় এই লোকটিকে সাক্ষ্য মান্য করা হয়, সুতরাং সাক্ষীর মনের অবস্থা কি হইতে পারে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সাক্ষী ফণিভুষণ ব্যানার্জ্জি

(১৮) বিবাদী পক্ষের ৯২নং সাক্ষী ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ৪৮ বৎসর। ইনি রাজা কালীনারায়ণ রায়ের বৈমাত্রেয় ভগ্নী স্বর্ণময়ীর পৌত্র। ইহা সম্ভবতঃ স্মরণ আছে যে, এই মহিলা তাহার স্বামীর সহিত ১৩০০ কি ১৩০৩ সাল পর্য্যন্ত রাজবাড়ীর এক অংশে বাস করিতেন। তারপর জয়দেবপুরে নদীর ধারে তাঁহার জন্য এক বাড়ী প্রস্তুত হইলে, স্বর্ণময়ী দেবী সেই বাড়ীতে যান। স্বর্ণময়ী দেবীর বাড়ী 'নয়াবাড়ী' নামে অভিহিত। এই মহিলার দুই কন্যা—কমলকামিনী ও মোক্ষদা। কমলকামিনী বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

ফণীবাবু এবং তাঁহার ভগ্নি শৈবলিনী বিবাদী পক্ষে সাক্ষ্য দেন। তাঁহারা মোক্ষদার পুত্রকন্যা। মোক্ষদা এখন পরলোকে।

স্বর্ণময়ীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকাংশ মীরাস পত্তনী, উহার খাজানার পরিমাণ দশ হাজার টাকা। ফণীবাবু সাক্ষ্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, যে পাট্টামূলে উক্ত মৌরাসের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই দলিলের একটা সর্ত্ত এই যে. মেয়ের ছেলে ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে না। ফণীবাবু এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্ণময়ীর সম্পত্তি ভোগদখল করিতেছিলেন, সেইজন্য স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পর মীরাস অসিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ১৯০৭ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডস এক মামলা রুজু করেন। স্বর্ণময়ীর কন্যা কমলকামিনী তখনও জীবিত বলিয়া পুনরায় মামলা দায়ের করা সম্বন্ধে কোর্টের অনুমতিসহ কোর্ট অব ওয়ার্ডস এই মামলা উঠাইয়া লন। উক্ত সম্পত্তির একজিকিউটার ফণীবাবুর শ্বশুর অখিল পাকড়াশী মহাশয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে উক্ত মামলা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। ইহা ১৯২৪ সালের ঘটনা। মামলা উঠাইয়া লওয়ার সময় কোর্ট অব ওয়ার্ডস ফণীবাবুকে কতকগুলি সুবিধা দিয়াছিলেন,—বাকী খাজানার সুদ বাবদ বহু টাকা ফণীবাবুর নিকট পাওনা হয়, সে সুদ মাপ করা হয়। সম্ভবতঃ সাধুর বিরুদ্ধে তাঁহার কার্য্যকলাপের পুরস্কার এই ভাবে দেওয়া হইয়াছিল। ফণীবাবু সে মামলার কথা স্বীকার করিয়াছেন; সুদ বাবদ ৬০০০৲ টাকা মাপ করা হইয়াছিল, তাহাও ফণীবাবু অস্বীকার করেন নাই। তবে তাহা যে সাধুর বিরোধী কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বীকার করিতে চাহেন না। ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজার মিঃ নীডহামের লিখিত এক পত্র বিবাদী পক্ষ আদালতে দাখিল করিয়াছেন (একজিবিট Z২০৪)। সেই পত্রের মধ্যে সুদের টাকা মাপের সর্ত্তাদির বিষয় উল্লিখিত আছে। যে কারণে ফণীবাবুকে সুদের টাকা মাপ দিয়া বাকী খাজানার আদায়ের কিস্তিবন্দী করা হইয়াছিল, সেই কারণ উক্ত পত্রে এই ভাব বিবৃত আছে.—এষ্টেটের বর্ত্তমান সঙ্কট অবস্থায় ফণীবাবু যেরূপ বিশ্বাসের কাজ করিয়াছেন এবং এষ্টেটের প্রতি তিনি যে প্রকার আনুগত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত সুবিধা দেওয়া গেল।

সাধুর উপস্থিতি ভিন্ন, এষ্টেটের সঙ্কট অবস্থায় আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না. কিন্তু এ কথা সত্য যে, সম্পত্তি ভাওয়াল এষ্টেটে পুনগ্রহণ করিলে ফণীবাবু

কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইবেন, ফণীবাবু তাহা জানিতেন। ১৯২৪ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ মামলা উঠাইয়া লইবার পরও বড়রাণী সম্পত্তি গ্রহণের জন্য কিরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছিলেন, z২৭১নং একজিবিট হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। ফণীবাবুর স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ, এই অবস্থায়ই ফণীবাবু উক্ত সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে দিবার জন্য আবেদন নিবেদন করিতে-ছিলেন। যাহা হউক, বড়রাণীর আপত্তি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও (z ২৭২ একজিবিট) পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সঙ্ঘর্ষের আশঙ্কায় কোর্ট অব ওয়ার্ডস ফণীবাবুর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করেন। তখন মীমাংসের কথা আর উল্লেখ হইল না। ফণীবাবু কোর্ট অব ওয়ার্ডসকে অপরিবর্ত্তনীয় ক্ষমতা প্রদান করিলেন। তদবধি কোর্ট অব ওয়াডসের ম্যানেজার ঐ সম্পত্তি দখল করিয়া আছেন।

অতএব ফণীবাবু কোনক্রমেই কোর্ট অব ওয়াডসের বিরুদ্ধে যাইতে পারেন না; কিংবা দুই রাণীকেও সহসা রাগাইতে পারেন না। কারণ, সে ক্ষেত্রে ঐ দুই রাণীও অবিলম্বে মামলা দায়ের করিবার জন্য জিদ করিতে পারেন। এই সাক্ষীকে বিশ্বাস করিবার যেটুকু ছিল, তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কারণ, কুমারের অক্ষরজ্ঞান এবং সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় সপ্রমাণ করিবার জন্য ইনি যে ব্যাপার করিয়াছিলেন, তাহার কতক পরিচয় পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে। নিম্নে সে সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিব।

বিবাদী পক্ষের আরও সাক্ষী

(১৯) বিবাদী পক্ষের ৯৩নং সাক্ষী গিরিশ বিশ্বাস। ইনি জয়দেবপুরে এষ্টেট পরিচালিত জকি প্রাইমারী স্কুলের পণ্ডিত। এষ্টেটের কর্ম্মচারীর এবং তাঁহার মর্য্যাদায় কোনও পার্থক্য নাই।

(২০) বিবাদী পক্ষের ৯০নং সাক্ষী অন্নতোষ দাস গুপ্ত এম.এ. (বয়স ৪০ বৎসর) ইনি কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক এবং ডাঃ আশুতোষ দাসগুপ্তের ভ্রাতা।

(২১) বিবাদী পক্ষের ১০০নং সাক্ষী রমেশ সরকার (বয়স ৪৫ বৎসর)। ইহার পিতা বর্ত্তমান পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইবার মত সামর্থ্য এই সাক্ষীর নাই। . এই সাক্ষীর পিতা গরীব। এই সাক্ষী বিবাদী পক্ষের ১০৮নং সাক্ষীর আত্মীয়।

(২২) বিবাদী পক্ষের ১০৮নং সাক্ষী উমেশচন্দ্র দে সরকার (বয়স ৪৮ বৎসর)। ইনি রাজার পরিচালিত পূর্ব্বোক্ত প্রাইমারী স্কুলের অন্যতম পণ্ডিত।

ইহার মাসিক বেতন ২০৲ টাকা। চিকিৎসাভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমি ইহার নাম করিয়াছি। ইহার সম্বন্ধে কোনও হৈ চৈ হয় নাই।

(২৩) বিবাদী পক্ষের ১২২নং সাক্ষী রমানাথ বিশ্বাস। ইহার বয়স ৫৫ বৎসর। ইনি পূর্ব্বোক্ত প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক, বিবাদী পক্ষের ৯০নং সাক্ষী গিরিশ বিশ্বাসের ভ্রাতা।

(২৪) বিবাদী পক্ষের ১২৪নং সাক্ষী সতীশ মিত্র। ইহার বয়স ৫৪ বৎসর। ১৩১৯ সালে ইনি ভাওয়ালে আসিয়া বাস করেন। সাক্ষী বলেন এষ্টেট হইতে জমী বন্দোবস্ত লওয়ার জন্য তিনি রাজবাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। ১৩১৯ সালে, অর্থাৎ মধ্যমকুমারের কাল্পনিক মৃত্যুর তিন বৎসর পরে তিনি কিছু জমী বন্দোবস্ত পান। সাক্ষীর নিজের কোনও বাড়ী ঘর নাই। প্রকৃত-পক্ষে, জমী বন্দোবস্তের বিষয় ছাড়া, ইনি মধ্যমকুমারের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। তথাপি ইান মধ্যমকুমারের নাক, ঠোঁট প্রভৃতি খুটিনাটি বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(২৫) বিবাদী পক্ষের ১২৯নং সাক্ষী যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী। ইহার বয়স ৬০ বৎসর। ইনি 'তৃণ হেন' লোক। ইহার অবস্থা বিশেষ কিছু নয়, ছয় মাসের খোরাকী চলিবার উপযুক্ত জমী আছে। ইনি বলেন, ইহার শিষ্য-সেবক আছে। ইহার পুত্র ৮০৲ টাকা বেতন পান। তা'ছাড়া তেজারতিও আছে। সে প্রায় তিন হাজার টাকা।

(২৬) বিবাদী পক্ষের ১৫৮নং সাক্ষী চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী। বয়স ৫২ বৎসর। ১৯০৩ সালের জুন হইতে ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ইনি ভাওয়াল এষ্টেটে আমিনের কাজ করেন। মামলা নিস্পত্তির পূর্ব্বেই তাঁহার অস্থাবর ক্রোক হইয়াছিল। ইহাতে মনে হয়, তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না। এই সাক্ষী বলেন, ইহার বাড়ী আছে, বাৎসরিক ২৫০৲ টাকা মুনাফার তালুক আছে। ইনি অপর সাক্ষী বাঁইরার সর্ব্বমোহন চক্রবর্ত্তীর আত্মীয়।

(২৭) বিবাদী পক্ষের ১৮৩নং সাক্ষী সুরেশচন্দ্র ঘোষ। বয়স ৪৯ বৎসর ইনি বলেন,—ইনি একজন তালুকদার। সেই তালুক হইতে বৎসরে তাঁহার ৪০০৲ টাকা আয় হয়। আমি ইহা বিশ্বাস করি না। একজন 'সাদকে' (পিয়ন) ইহাকে ঢাকায় লইয়া আসে। ইহার সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, সকলেই দায়াবদ্ধ।

(২৭) বিবাদী পক্ষের ২৮০ নং সাক্ষী সুকুমারী দেবী। বয়স ৪২ বৎসর ইনি ১নং প্রতিবাদিনীর আত্মীয়া। ১৩০০ সালে ইহার জন্ম হয়, এবং ১৩১৩

সালে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের দুই বৎসর পরে ইনি শ্বশুরবাড়ী স্বামীর ঘর করিতে যান। এই সময় তিনি শেষবার মধ্যম কুমারকে দেখেন।

(২৯) বিবাদীর ২৮১ নং সাক্ষী প্রমথ চক্রবর্ত্তী, বয়স ৪৮ বৎসর। ইনি সাত টাকা বেতনের ব্রাঞ্চপোষ্টমাষ্টার। ইনি বলেন, ইহার বার্ষিক ৪৫০৲ টাকা আয়ের এক তালুক এবং কিছু জমি আছে। পূর্ব্ববর্ণিত সর্ব্বমোহন চক্রবর্ত্তী (কমিশনে জবানবন্দী হয়) এই সাক্ষীর ভগ্নিপতি।

(৩০) বিবাদী পক্ষের ২৮৩ নং সাক্ষী, কালীমোহন চক্রবর্ত্তী। ইহার এক পুত্র ভাওয়াল এষ্টেটে চাকুরী করে। সাক্ষী নিজকে রাজপরিবারের 'আশ্রিত' বলিয়া পরিচয় দেন। মধ্যমকুমারের শ্রাদ্ধের সময় কি হইয়াছিল, এই সাক্ষী তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য উপস্থিত হন। সাক্ষী বলেন,— এ, বি, রেলে তিনি টাঙ্গী হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে রেলভাড়া পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল। যদিও সে সময় এ, বি, রেলের অস্তিত্বই ছিল না। তাহার অনেক পরে রেলপথ হয়। (টঙ্গী-ভৈরব রেল)

(৩১) বিবাদী পক্ষের ২৯২ নং সাক্ষী খাঁ সাহেব এ, এম, এ, হামিদ। বয়স ৪৫ বৎসর। মধ্যমকুমারকে এই সাক্ষী অনেক উপলক্ষে দেখিয়াছিলেন। সাক্ষী বলেন,—কুমারদের চেহারা আমার বেশ মনে আছে। বাদীকে সাক্ষী মধ্যমকুমার বলিয়া মনে করেন না। তবে একথা স্বীকার করেন যে, বাদীকে মধ্যমকুমার বলিয়া ভুল করা সম্ভব।

(৩২) বিবাদী পক্ষের ৩১০ সাক্ষী রায় সাহেব যোগেন্দ্র ব্যানার্জ্জি। ১৯০৪ সাল হইতে ইনি রাজ এষ্টেটে চাকুরি করিতেছেন। ইনি সেক্রেটারী নামে পরিচিত। ১৯৩৩ সালে ইনি বরখাস্ত হন। কিন্তু তখনও তিনি এষ্টেটের পক্ষে এই মামলার প্রধান তদ্বিরকারক। পুনর্নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য ইনি এক দরখাস্ত করিয়াছেন; কিন্তু পুনরায় বহাল হইতে পারিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন না। (পুত্র-পাপে)।

(৩৩) বিবাদী পক্ষের ৩৪৮ নং সাক্ষী রায় সাহেব উমেশ ধর। প্রায় ২০ বৎসর ইনি কালীগঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ইনি এখনও ইউনিয়ন কোর্টের সভাপতি এবং কালীগঞ্জ রাজেন্দ্রনারায়ণ স্কুলের সভ্য। এষ্টেট হইতে বিদ্যালয়ের সাহায্য দেওয়া হয়। ইহার এক ভ্রাতা কালীগঞ্জ স্কুলে নিযুক্ত, আর এক ভ্রাতা কালীগঞ্জ রাজ ডিস্পেন্সারীতে চাকুরী করেন, ঐ ডিস্পেন্সারীতে এই সাক্ষীর ভাগিনেয় ডাক্তার। যখন কমিশনে

ইহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, তখন ইহার এক ভ্রাতা নায়েব ছিলেন। ইহারা পাঁচ ভ্রাতা। ইহাদের বাৎসরিক ২৫০০৲ টাকা আয়ের তালুক আছে।

সাধুকে প্রতারক বলিয়া ঘোষণার জন্য ১৯২১ সালে ফণীবাবু কর্ত্তৃক যে সভা আহূত হয়, ইনি সেই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। ঐ সভার বিবরণী হইতে দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছিল যে, সাধুকে প্রতারক সাব্যস্ত করার পশ্চাতে জনমত আছে (২২৪নং একজিবিট)। সাক্ষীদের অন্য কেহ এই সভার কথা বলে নাই।

(৩৪) বিবাদী পক্ষের ৩৬৫ নং সাক্ষী ডাঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত। ইনিও মেজকুমারের সহিত দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। (৩৫) বিবাদী পক্ষের ৪৬নং সাক্ষী অবনীকান্ত মুখুয্যে বয়স বাড়াইয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তাঁহার বয়স তড়িন্ময়ী দেবীর মত। তড়িন্ময়ী ১৩০০ সন অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহা হইলে ১৯০৯ সালে তাহার বয়স ১৫ বৎসরের মত ছিল। তাহার তালুক আছে বলিয়া বলিয়াছেন ; কিন্তু ঠিক মত বিবরণ দিতে পারেন নাই। ইনি বেকার জীবন যাপন করেন।

(৩৬) সৈয়দ আলি হোসেন, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার।

(৩৭) জয়কালী কাহিলী, উকিল, এষ্টেটের একজন কর্ম্মচারীর জামাতা।

(৩৮) মেজরাণী। (বিভাবতী দেবী)

(৪০) গৌর মজুমদার, কলিকাতাবাসী, মর্য্যাদা সম্পন্ন লোক নহে! সে বলিয়াছে যে, ১৯০৫ সাল, ১৯০৬, ১৯০৮ সালে কলিকাতা ও ১৯০৬ সালে জয়দেবপুরে সে কুমারদিগকে দেখিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কমিশনে ১৩জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। এই ১৩জন এবং মিঃ ও মিসেস মেয়ার, মিঃ জে এন গুপ্ত কমিশনে সাক্ষ্য দান কালে সনাক্তকরণ সম্পর্কে বলিয়াছেন।

এই ৫৩ জন সাক্ষীর মধ্যে আমি নিম্নোক্ত কয়েকজন সাক্ষীর সম্পর্কে বিশেষভাবে বলিতে চাই, অন্য সাক্ষীদের অস্বীকৃতির দ্বারা বিশেষ কিছু আসে যায় না। কমিশনে যাহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের সম্পর্কেও এই কথা বলা যাইতে পারে। আমি তাহাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। কুমারের শিক্ষা এবং বাদীর কথাবার্ত্তার সম্পর্কিত সাক্ষ্য সম্পর্কে এখন বিশদভাবে আলোচনা করিব না। আমি এখন এষ্টেটের কর্ম্মচারী এবং সাধারণ প্রজাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করিব। যে সকল সাক্ষী বাদীকে স্বীকার করেন নাই, তাহাদের সাক্ষ্য কোর্টের কত কাজে আসিতে পারে, তাহা দেখিতে হইবে, এবং যে সকল সাক্ষী কুমারকে দেখিয়াও

বাদীকে কুমার অস্বীকার করিয়া যে সাক্ষ্য দিয়াছে, উহা যে কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহাও দেখিতে হইবে।

সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মধ্যে যতপ্রকার ভ্রান্তি এবং স্মৃতিশক্তির ছলনাই থাকুক আমি এই সকল সাক্ষীর সততা সম্পর্কে কোন সন্দেহ করি না। এই সকল সাক্ষ্যে বাদীকে চিনিতে অক্ষমতা দেখাইলেও কুমার এবং বাদীর সম্পর্কে তাঁহাদের সাক্ষ্যে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

(১) বিবাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী কর্ণেল পুলি মামলার প্রথমেই সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি বিলাত যাইতেছেন বলিয়া বাদীর জবানবন্দী দেওয়ার পূর্ব্বে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি ১৯১৯ সালে ভারতীয় সৈন্যবিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০৪ সালে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা জানেন না। তিনি বলেন যে, তিনি ১৯০৮ সালে স্যার ল্যান্সলট হেয়ার সাহেবের এডিকং নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ১৯১২ সালে এই প্রদেশ উঠিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পদে ছিলেন। তিনি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের সহিত ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫ এপ্রিল ঢাকায় ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি ১৯০৯ সালে গবর্ণমেণ্ট হাউসে সামাজিক অনুষ্ঠানে কুমারদিগকে দেখিয়াছেন। পরে আবার লর্ড কিচেনার যখন শিকারে আসিয়াছিলেন, তখনও দেখিয়াছেন। লর্ড কিচেনার শিকার করিবার জন্য জয়দেবপুর যাইতেছিলেন। সেই উপলক্ষে শিকারসম্পর্কিত ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি ৫।৬ বার মেজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন ডেনিং ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সাক্ষী তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। মেজকুমার তাঁহার সহিত ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন, অন্যান্য কুমারগণও ইংরাজী বলিয়াছেন। তাঁহারা যে কায়দায় কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন, তাহাতে আমি মনে করিয়াছি যে, কোন ইংরেজ শিক্ষক তাঁহাদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিয়াছেন; অথবা কোনও ইংরেজী স্কুলে ইংরেজী শিখিয়াছেন। বাদী মেজকুমার নহে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন।

তাঁহার এই বর্ণনার মধ্যে সময় লইয়া গরমিল আছে। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি লেঃ পিয়ার্সের স্থানে এডিকং নিযুক্ত হইয়াছেন। আসাম গেজেটে (১৯০৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর) দেখা যায় যে, ১৯০৯ সলের ১লা ফেব্রুয়ারী বা তৎপরবর্ত্তী কোনও তারিখ হইতে লেঃ পিয়ার্সের ছুটি মঞ্জুর করা হইয়াছে। উক্ত গেজেটে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের ভ্রমণ-তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, উহাতে দেখা যায় যে, ১৯০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী ক্যাপ্টেন পুলি ঢাকায় আসিয়াছেন। এই বিজ্ঞাপিত কাগজ দেখান হইলে পর সাক্ষী স্বীকার করেন যে,

তনি উক্ত তারিখেই আসিয়াছিলেন—উহার পূর্ব্বে আসেন নাই। এই তারিখের পূর্ব্বে যে কুমারদের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল বা মেলামেশা ছিল বলিয়া তিনি বলিয়াছেন, এই বিজ্ঞপ্তি স্বীকার করিয়া লইলে, তাঁহার উক্তি টিকিতে পারে না।

লর্ড কিচেনার ১৪ই ফেব্রুয়ারী নারায়ণগঞ্জ হইতে স্পেশ্যাল ট্রেণযোগে জয়দেবপুর আসিয়াছেন, ঢাকা হইতে আসেন নাই। কুমারগণ ১০ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, (৬৮নং একজিবিট ;)

শিকার সম্বন্ধে আলোচনা

কুমারেরা যেদিন আসিয়া ঢাকা পৌছিলেন (১২ কি ১৩ ফেব্রুয়ারী) সেইদিন তাহাদের সহিত প্রস্তাবিত শিকার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কর্ণেল পুলির সাক্ষাৎ হওয়ার খুবই সম্ভাবনা দেখা যায়। তাঁহার জবানবন্দীতে কিন্তু এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করাও হয় নাই যে, কুমারদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বড়কুমারের সহিতই তাঁহার দেখা হয়। ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের মাঝামাঝি সময়ে—মলমূত্র ত্যাগের জন্য তিনি সভাগৃহের বাহিরে আসেন, এবং কোথায় মলমূত্র ত্যাগ করিতে হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে বড়কুমার এই প্রথমে যোগদান করিলেন বলিয়া, ১৯০৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারীর কার্য্যবিবরণীতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। ১৯০৯ সালের মার্চ্চ মাসের ইষ্টবেঙ্গল গেজেট হইতে ইহা দেখান হইলে পরে, কর্ণেল পুলি স্বীকার করেন যে, প্রথম অধিবেশনের তারিখ তিনি ভুল করিয়া আগে লিখেন। শিকার সম্বন্ধে আলোচনা আর হয় না।

১৯ বৎসর বয়স্ক এই যুবক কর্ম্মচারী ১২ই ফেব্রুয়ারী কেন ঢাকা আসিলেন? ২২শে ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে তিনি কোনও কুমারকেই দেখিলেন না, ঐ তারিখে বড়কুমার ব্যতীত আর কাহারও সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না, লর্ড-কিচেনার জয়দেবপুর হইতে চলিয়া যাইবার পর এক সপ্তাহ কিম্বা তাহারও অধিককাল ঢাকায় থাকিয়া, কুমারদিগকে জানা না থাকা সত্ত্বেও তাহাদের সহিত শিকারসম্বন্ধে আলোচনার সময়ও, লর্ড কিচেনারের আগমন ও অবস্থান সম্পর্কে পরামর্শ করার কি কারণ থাকিতে পারে—তাহা সুস্পষ্ট।

* ২০৬ পৃষ্ঠায় সাক্ষ্যে দেখাযায়, মেজোরাণীর মা মেয়ে বিবাহের পরই পুত্রকন্যা সকলকে লইয়া মামাবাড়ী ও পরে জয়দেবপুরে আশ্রয় লন। অথচ সত্যবাবু সাক্ষ্যে বলেন, 'মা, তাঁহাকে চল্লিশহাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন।' টাকা ছিল কোথায়? প্রঃ—

তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, তাঁহার সময় কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং তিনি তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, কুমারদের একজন ইংরেজ শিক্ষক ছিলেন এবং তাহাদের কথা বলার ভঙ্গীটাও ইংরেজের মতই ছিল। ইহার পর তিনি বলেন যে, কুমারদের ইংরাজী বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের একজন ইংরেজ শিক্ষক ছিল, অথবা কোন ইংরেজী বিদ্যালয়ে তাহারা শিক্ষালাভ করিয়াছে। সাক্ষী জবানবন্দীর দিন এই কথা বলেন; কিন্তু পরদিনই আবার তিনি বলেন যে, প্রথম কুমার অপর দুই কুমারের তুলনায় ভাল ইংরাজী বলিতেন। তাঁহার ইংরেজীও অশুদ্ধ এবং উচ্চারণে ভুল ছিল; তবে বুঝিতে কষ্ট হইত না। ইহার পূর্ব্বদিন তিনি আদালতে অন্যরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

তৎসম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি হতভম্ব হইয়া যান। অবশেষে মিঃ চৌধুরী তাহার একটি উত্তর বলিয়া দিলে সাক্ষী তদনুসারে বলেন যে, ভারতের কোনও ইংরেজী বিদ্যালয়ের কথাই তিনি বলিয়াছেন। ইংরেজীর শিক্ষক বলিতে তিনি কোন ভারতীয় শিক্ষককে (যিনি ইংরেজী পড়ান) বুঝিয়াছিলেন কি না, এই প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, তাহা তিনি মনে করেন নাই। তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, কুমারদের একজন ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন, এবং তাহা হইতেই তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, কুমারেরা নিশ্চয়ই কোন ইংরেজ শিক্ষকের নিকট ইংরেজী শিখিয়া থাকিবে। তাহাদের বলার ভঙ্গী দেখিয়াও তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। কুমারেরা যে ধরণের ইংরেজী বলিতেন সেই ধরণের ইংরাজী বলিয়া শুনান, কিন্তু সেইগুলি কুমারদের কথার অবিকল নকল নহে। তাহাদের কথার বিপরীত। লর্ড কিচেনারের শিকার, উহা ঘটিবার পূর্ব্বে কুমারের সহিত আলোচনা অথবা ইংরেজী কায়দায় কুমারদের বচনভঙ্গী সম্বন্ধে এই ভদ্রলোক আদালতে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি না। একজন উচ্চ শিক্ষিত এবং মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন অভিজাতের বর্ণনা দিতে যাহা প্রয়োজন, সেই সব কথাই তাঁহাকে বলা হইয়াছিল। তিনি একজন সরল বিশ্বাসী সাধারণ ইংরেজ সৈনিক মাত্র। এই সকল অপচেষ্টা তিনি ধরিতে পারেন নাই। ইহা স্পষ্ট-ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ২২শে ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে তিনি কোনও কুমারকেই দেখেন নাই। ঐ তারিখে কেবল বড় কুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, ২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই এপ্রিলের মধ্যে দ্বিতীয় কুমারের সহিত দার্জ্জিলিং যাইবার কালে তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনার কথা বাদ দেওয়া না হইলেও, তৃতীয় কুমারকে দেখিয়া যে

তিনি দ্বিতীয় কুমার বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তৃতীয় কুমারের মৃত্যু হয় ১৯১৩ সালে। সাক্ষী তৃতীয় কুমারকে নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন; তাহা না হইলে কখনো তিনি এমনভাবে বলিতেন না যে, **বাদীর চেহারা দ্বিতীয় কুমারের মতই মোটা।** উভয় পক্ষই স্বীকার করেন যে, দ্বিতীয় কুমারের দেহ সুগঠিত ছিল। ছোট কুমারের মত তিনি মোটা ছিলেন না। মিঃ চৌধুরীও তাঁহার মামলা আরম্ভ করিবার সময় বাদীর এই মোটা চেহারার বৈসাদৃশ্য প্রমাণের পক্ষে একটি প্রধান যুক্তি বলিয়া উল্লেখ করেন।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, এই সাক্ষী দ্বিতীয় কুমারকে ১৯০৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী দেখিয়াছিলেন, তবে এখানে বলা প্রয়োজন যে, তিনি ১৯৩৪ সালে বাদীকে আদালতে দেখিলেন, এবং সাক্ষ্য দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি সাদৃশ্য প্রমাণ সম্বন্ধে কিছু বলিবার যোগ্য ব্যক্তি নহেন। অন্যান্য কথার সহিত তাঁহাকে এ কথাও বলা হইয়াছিল যে, বাদী একজন প্রতারক, তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, আদালতে আসিবার সময় তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে বাদীর সনাক্তকরণ সম্বন্ধে তিনি যে সাক্ষ্য দিবেন তাহা বাদীর বিরুদ্ধে যাইবে।

শ্রীযুক্ত জে, এন, গুপ্তের সাক্ষ্য

(২) ইহার পর বিবাদী পক্ষের অন্যতম সাক্ষী অবসরপ্রাপ্ত আই, সি, এস, আফসার শ্রীযুক্ত জে, এন, গুপ্তের কথা ধরা যাউক। এ ব্যক্তির সাক্ষ্য কমিশনে গৃহীত হইয়াছিল।

১৯০৮ সালে জরুরী কাজে এই সাক্ষী ঢাকা আসেন। ঢাকায় দিন পনর অবস্থানের পর শিকারের জন্য, মিঃ আলতাপ আলী তাঁহাকে জয়দেবপুরে লইয়া ন। তিন কুমারের সহিত হাতীতে চড়িয়া তিনি শিকার করিতে যান। ইহা তাঁহার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছিল। কুমারদের সহিত তখনই তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশেন। ইহার ২৬ বৎসর পরে তিনি বাদীকে ১৯২৫ সালে দেখেন। বিচারপতি দ্বারকা চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন। বাদীর সহিত কতকক্ষণ আলাপ হয়। তখন দেখা যায়, বাদী বাঙ্গালা বলিতে পারেন না, অথবা হিন্দী সুরে কথা বলেন। তিনি দুই-এক মিনিটেই বুঝিতে পারেন যে, বাদী একজন প্রতারক। ব্যাপারটা সরকারী ভাবে হয় নাই, কাজেই তিনি তাঁহার এই মতামত সমর্থনের জন্য তখন কোন প্রমাণপত্র রাখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এই হইল এই ব্যক্তির সাক্ষ্য। বাদীর কথাবার্ত্তা সম্পর্কে এই ব্যক্তির সাক্ষ্যের কথা বিবেচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু

সনাক্তকরণের পক্ষে ইহার সাক্ষ্য কোনই কাজে আসে না। সাক্ষী স্বীকার করেন যে, দ্বিতীয় কুমারের সহিত বাদীর চেহারার অনেকটা সাদৃশ্য আছে বটে, তবে বাদীকে অনেকটা রুক্ষ দেখায়। বিবাদীপক্ষে এই একজন মাত্র সাক্ষী বাদীর চেহারার সাদৃশ্যের কথা স্বীকার করেন। ১৯০৮ সালে শিকারের সময় ২৪ বৎসরের যুবক দ্বিতীয় কুমারকে যেমন দেখাইত, বাদীকে সেই তুলনায় রুক্ষ দেখায়। ইহা সম্ভব যে, রেভিনিউ বোর্ডের একজন সদস্য হিসাবে সাক্ষী ১৯২৫ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কুমারের মৃত্যু প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগৃহীত হইয়া বোর্ডে প্রেরিত হইয়াছে, উহা দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু **এই মৃত্যু প্রমাণের চেষ্টার পশ্চাতে যে কুচক্র বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা হয়ত তিনি নাও জানিতে পারেন।**

মিঃ কে, সি, দে'র সাক্ষ্য

(৩) মিঃ কে, সি, দে; অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস্। ইনি রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য ছিলেন। এই রেভিনিউ বোর্ডই কোর্ট অব ওয়ার্ডস। ১৯২৩ সাল হইতে ২১-১২-২৮ ইং তারিখ পর্য্যন্ত তিনি এই কাজ করিয়াছেন। তবে মধ্যে মধ্যে অল্প সময় বাদ গিয়াছে।

১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯১১ সালের মার্চ্চ অথবা এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালার কো-অপারেটিভ সোসাইটি সমূহের রেজিষ্ট্রারস্বরূপে ঢাকায় ছিলেন। এই সময় তাঁহার প্রধান কার্য্যালয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় অথবা শিলং সহরে থাকিত। নবেম্বর মাসের মধ্যভাগ হইতে এপ্রিলের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ঢাকা সহরে সরকারী কার্য্যালয় থাকিত; কর্ণেল পুলি আমাদিগকে এইরূপই বলিয়াছেন।

মিঃ কে, সি, দে ১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশনে একবার কুমারকে দেখেন। ঐ সময় পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্যার বম্‌ফিল্ড ফুলারকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। তারপর এই মাসেই কিম্বা পরবর্ত্তী মাসে গবর্ণমেণ্ট হাউসে এক উদ্যান-সম্মিলনীতে তিনি আর একবার কুমারকে দেখেন। তিনি বলেন, যে, এই উভয় বারেই তিনি ভাওয়ালের তিন কুমারকে দেখিয়াছেন, এবং উভয় বারেই তিনি ইংরাজী ভাষায় তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিয়াছেন। শেষবারে কুমারগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন; গার্ডেন পার্টিতে সাধারণতঃ এইরূপই করা হইয়া থাকে। অতঃপর মিঃ কে, সি, দে বলেন, এতদ্ভিন্ন আরও নানা স্থানে সামাজিক ও সরকারী অনুষ্ঠানে কুমারদের

সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে ; তবে তিনি স্মরণ করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানের কথা বলিতে পারেন না।

তিনি বলেন,—বহুবারই সাধুর সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছে। প্রথমবারে ১৯২৪ সালে কলিকাতায় দেখা হয় এই সময় হেতমপুরের রাজা স্বয়ং এই সাধুকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করেন। অতঃপর কলিকাতার অনুষ্ঠানে এবং কলিকাতার রাজপথে সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। সর্ব্বশেষে ১৯২৬ সালে কিম্বা ১৯২৭ সালেও দেখা হইয়াছে ; এই সময়ে বাদী নাকি কতকগুলি বিষয়ে স্বীকারোক্তি করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। মিঃ কে, সি, দে'-ই প্রস্তাব করেন যে, বাদী যদি কোন প্রকার তদন্ত অথবা অপর কিছু চাহেন, তাহা হইলে তাহার পক্ষে একটা দরখাস্ত করাই উচিত ; এই দরখাস্ত ৮-১২-২৬ ইং তারিখে উপস্থিত করা হয়। সাক্ষী তাহা শ্রবণ করেন, এবং ১৪-২-২৭ ইং তারিখে তিনি ইহা অগ্রাহ্য করেন। এই সময় সাক্ষী কারণ দেখান যে, এরূপ তদন্ত করিবার ক্ষমতা রেভিনিউ বোর্ডের নাই, এবং তাহা করিলেও যে ফল হইবে, সেই ফলাফল মানিয়া চলিতে কেহ বাধ্য হইবে না।

কুমারের মৃত্যু হইয়াছে এবং বাদী একজন পাঞ্জাবী—ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সংগৃহীত সাক্ষ্যাদির দিক হইতে মিঃ কে, সি দে'র বক্তব্য অনেকটা সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। তিনি যে সব দরখাস্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং কমিশনার যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং আদালতে প্রদত্ত মিঃ কে সি, দে'র সাক্ষ্য লক্ষ্য করিয়া ইহাই প্রতীয়মান হয়।

"রুপিয়া লেকে কিয়া করেঙ্গে"

বাদীর স্বীকারোক্তিতে বর্ণিত বলিয়া কথিত ১৯২৬ সালের সাক্ষাৎকারের কথা আমি এস্থলে উল্লেখ করিব। কারণ বাদীর সাদৃশ্য সম্পর্কে মিঃ দে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহার মূল্য নির্দ্ধারণে ইহার প্রয়োজন আছে। তবে এই সাক্ষাৎকারের কথা আমাকে অতি সংক্ষেপেই উল্লেখ করিতে হইবে। সাক্ষী বলেন, ১৯২৬ সাল কিম্বা ১৯২৭ সালের আগের মাসে বাদী ঢাকায় তাহার সহিত দেখা করেন। তিনি বলেন যে, একজন উকিলকে সঙ্গে করিয়া বাদী তাহার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি আরও, বলেন, খুব সম্ভব জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর নিকট হইতে প্রাপ্ত একখানি পত্রের উত্তরেই বাদীর সহিত এই সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করা হইয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর নিকট লিখিত সাক্ষীর পত্র (একজিবিট নং ২০০) আমি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি।

পত্র সাক্ষীকে দেখান হয়। ইহাতে ৭-৮-২৩ ইং তারিখ আছে। এই পত্র দেখিয়া সাক্ষী বলেন যে, এই সাক্ষাৎকারের কথাই আমি মনে করিতেছি। এই পত্রে কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে বলা হইয়াছিল, সার্কিট হাউসে তাঁহার নিজের আসিয়া কোন কাজ নাই, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার জামাতাকে পাঠাইলেও চলে। চন্দ্রশেখর বাবুই হইতেছেন জামাতা। তিনি বহু পূর্ব্বেই সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছেন, তিনিই মিঃ দে'র সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, এবং এই সাক্ষাৎকারের সময়ই মিঃ দে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, অন্যদ্বারা না করাইয়া স্বয়ং বাদীর দ্বারা একটা দরখাস্ত দিলেই তদন্ত হইতে পারে। মিঃ দে এই সমস্ত কথাই স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই সাক্ষাৎকারের সময়ে বাদীও আসিয়াছিলেন। মিঃ দে আবার বলিয়াছেন, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জামাতা ও একজন উকীল আসিয়াছিলেন; তারপর আর একবার তিনি বলিয়াছেন, ১৯২৬ সালে বাদী একজন উকীলকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তখন বাদী বলিয়াছিলেন, "হাম ফকির আদমী; রুপিয়া লেকে কিয়া করেঙ্গা?" উত্তরে মিঃ দে প্রস্তাব করেন যে, বাদী যাহাই চাহেন না কেন, তাহার জন্য একটা আবেদন করা দরকার। বাদী প্রকৃতপক্ষে কি চাহেন বলিয়াছিলেন, তাহা সাক্ষী স্মরণ করিতে পারেন নাই। তথাপি মিঃ দে কেন আবেদন করার উপদেশ দিয়াছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ দে বলেন যে, দরখাস্ত দেওয়ার কথা শুনিলে হয়ত বাদী হটিয়াও যাইতে পারেন, এই বিশ্বাসেই তিনি দরখাস্ত দেওয়ার কথা বলিয়াছিলেন। সাক্ষী বলেন যে, ১৯২৬ সালের এই সাক্ষাৎকারের সময় বাদীর লম্বা লম্বা চুল ছিল এবং তিনি গেরুয়া আলখেল্লা পরিহিত ছিলেন। ইহা অতি পরিষ্কার যে, ১৯২৬ সালের এই সাক্ষাৎকারের কথা সত্য নহে সাক্ষী এস্থলে ১৯২৩ সালের সাক্ষাৎকারের সহিত ১৯২৬ সালের কথা আনিয়া গোলমাল বাধাইয়াছেন। ১৯২৩ সালে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জামাতা পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়া ঢাকার সার্কিট হাউসে সাক্ষীর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। সাক্ষী বলেন যে, ১৯২১ সালের সর্ব্বপ্রথম তিনি কলিকাতার সাধুকে দেখেন। তারপর ১৯২৩ সালের সাক্ষাৎকারের মধ্যে এই সাধুকে টানিয়া আনিয়া গোলমাল সৃষ্টি করেন। যখন তাঁহাকে ১৯২৬ সালের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, তখন তিনি ঢাকায় বাদীর সহিত একটা সাক্ষাৎকারের বর্ণনা করিয়া কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে মিঃ দে এমন সব কথা বলিয়াছেন, যাহা কেহই বুঝিতে পারে না। শেষ-পর্য্যন্ত সাক্ষী ধরিয়া বসেন যে, ১৯২৬ সালেই সাক্ষাৎকার হইয়াছিল এবং

সেই সাক্ষাৎকারের সময়েই বাদী বলিয়াছিলেন যে, তিনি একজন ফকির। ১৯২৬ সালে বাদী কলিকাতায় ছিলেন, এই তথ্যের সহিত সাক্ষীর উক্তির অসামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে না।

মিঃ দে নিজেই বলিয়াছেন যে, ১৯২৪ সালে সর্ব্বপ্রথম বাদীর সহিত কলিকাতায় তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ১৯২১ সাল হইতে বাদী ঠিক বাবুর মত পোষাক পরিতে সুরু করিয়াছেন, ১৯২৫ সালে বাদী তাঁহার চুল খাটো করিয়া ছাঁটিয়াছেন এবং ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করাইবার জন্য বাদী মিঃ লিণ্ডসে মিঃ জে, এন, গুপ্ত ও সাক্ষীর (মিঃ দে) সহিত দেখা করিতেছিলেন। নানা প্রকার উপদেশ ও পরামর্শের পর এই চন্দ্রশেখর বাবুর নিকট প্রদত্ত সাক্ষীর উপদেশের (১৯২৩ সালের আগষ্ট) পর সাক্ষীর নিকট যখন বাদীর এক দরখাস্ত পেশ করা হয়, তখন তিনি একদিন বহু সময় ধরিয়া দরখাস্ত শ্রবণ করেন এবং স্থির করেন যে, তদন্ত দ্বারা কোন ফল হইবে না। মিঃ দে বলেন, ১৯২৪ সালে সর্ব্বপ্রথম বাদীকে কলিকাতায় দেখিবার পর তাঁহার ধারণা জন্মে যে, এই লোকটি প্রতারক, এবং তারপর ১৯২৬ সালের সাক্ষাৎকারে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। তথাপি তিনি উপদেশ দেন যে, একটা দরখাস্ত করা বাদীর উচিত। পাছে বাদী হটিয়া যান, এই আশঙ্কায়ই সাক্ষী এরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন; অর্থাৎ কোন প্রকারে একটা স্বাক্ষর আদায় করিয়া বাদীকে একটা মামলার মধ্যে জড়াইয়া ফেলাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বাদীকে প্রতারক বলিয়া মনে করেন, এবং একমাত্র এই কারণেই তিনি বাদীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিতে পারেন, ইহাতে সাক্ষীকে বাধা দেওয়ার কিছুই নাই। তবে আমি মনে করি, মিঃ দে তাঁহার নিজের প্রতিই ন্যায়বিচার করিতেছিলেন না। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৯২৩ সালেই তিনি আবেদন পেশ করার প্রস্তাব দিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তিনি নিজে বাদীকে দেখেন নাই। কারণ তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, ১৯২৪ সালে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় বাদীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তারপর ১৯২৬ সালে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয় এবং দ্বিতীয় দফা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। তথা বিচারের দ্বারা ইহা অসম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হয়।

১৯২৩ সালের সহিত সাধুকে জড়িত করিয়া এবং পরে আবার ১৯২৬ সালে ঢাকায় সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহার পরিধানে গেরুয়া ছিল, মাথায় জটা ছিল—সন্ন্যাসীর এই সমস্ত উপকরণের কথা বলিয়া তিনি সমস্ত গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কারণ ইহা সর্ব্ববাদী সম্মতভাবে-

স্বীকৃত যে, ১৯২৪ সালে কলিকাতা রওনা হইবার পূর্ব্বে বাদী বাঙ্গালী বাবুর মত পোষাক পরিয়া বেড়াইতেন এবং মিঃ চন্দ্রের সহিত বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন—তিনি যে ভাবেই সেই বাঙ্গালা বলিয়া থাকুন না কেন বাদীকে দেখার পর এবং বাদীর সম্পর্কে গোপনে যে সব সংবাদ সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া তাঁহারা মনে যে ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নিম্নরূপ। সাক্ষী জবানবন্দীতে বলিয়াছে,—"আমার অভিমত এই যে বাদী দ্বিতীয়কুমার নহেন।"

প্রশ্ন :—কেন,—না? (জবানবন্দীতে)

উ :—কারণ দ্বিতীয়কুমারের মৃত্যু হইয়াছে।

প্র :—ভাওয়ালের দ্বিতীয়কুমার এবং বাদীর চেহারার মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে কি?

উঃ —উভয়ের রংই ফর্সা, উভয়ের চক্ষু নীলবর্ণ ; কিন্তু সেই সন্ন্যাসীর ঠিক গাট্টা-গোট্টা চেহারা, মার্জ্জিত আচরণ নহে, চাষার ছেলের মত মনে হয়,—রাজার ছেলের মত নহে।

জেরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—

প্র :—আপনার কি ইহাই ধারণা যে, যাঁহারা বাদীর চেহারার সহিত দ্বিতীয়কুমারের চেহারার সাদৃশ্য আছে বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অসাধু।

উ :— নিশ্চয়ই নহে। আমার ভুল হইতে পারে। মিঃ ঘোষালেরও ভুল হইতে পারে।

মিঃ দে' যখন বাদীর তদন্ত সম্পর্কিত দরখাস্তের কথা শুনিতেছিলেন ইহা তাঁহার সেই সময়কার মানসিক অবস্থা। এই সাদৃশ্যের প্রশ্ন সম্পর্কে মিঃ দে'র সাক্ষ্য কোর্টের কোন কাজেই লাগিবে না। যদিও আমাকে অন্যান্য বিষয়ের জন্য (যথা কুমারের বর্ণজ্ঞান) তাঁহার সাক্ষ্য আলোচনা করিতে হইবে। এই সাক্ষ্য আলোচনায় এই সাক্ষী বাদী গাট্টাগোট্টা এবং রাজার ছেলের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে জাঠা কৃষকের মত দেখায় ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বাদী সম্পর্কে পাঞ্জাব হইতে যে রিপোর্ট পাঠান হইয়াছে তাহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারে। পাঞ্জাব রিপোর্ট কি, তাহা নিম্নে দেখা যাইবে।

মিঃ মেয়ার

মিঃ মেয়ার ১৯০২ সালের নবেম্বর হইতে ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। রাণী বিলাসমণি তাঁহাকে

নিযুক্ত করেন। মালিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং কালেক্টারের নিকট রিপোট করার জন্য (যে রিপোর্টের অংশ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে) তাঁহাকে ডিসমিস করা হয়। ১৯০৪ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্ত্তৃক দখল নেওয়ার পূর্ণ কাহিনী, এই উপলক্ষে মিঃ মেয়ার কি ভাবে রাণীর পতনের কথা বলেন, এবং রাণীকে দশ মিনিটের মধ্যে বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়, তাহা আমি উল্লেখ করিয়াছি। এতদিন পরে মিঃ মেয়ারের মনের সেই তিক্ততা আর নাই, ইহাই মনে করা সঙ্গত ছিল; কিন্তু তাঁহার সাক্ষ্যে তিক্ততার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। আরও দুঃখের কথা এই যে, এই ব্যাপার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কোন কথাই তিনি স্বীকার করেন নাই—যদিও মিঃ র‍্যাঙ্কিন যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে পরিষ্কার দেখা যায় যে, রাণীর সহিত এই ঝগড়ায় প্রথম কুমার, মিঃ মেয়ার একদিকে এবং অপর দুই কুমার ও রাণী আর একদিকে ছিলেন। অনেক চেষ্টার পর মিঃ মেয়ারকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, দ্বিতীয়কুমার, ছোট কুমার ও রাণী তাঁহার চরিত্রের উপর বহু কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন এবং ইহাও দেখা যাইতেছে যে, এই ঘটনার পর মিঃ মেয়ারের নাম ঐ পরিবারে অভিশাপের বস্তু ছিল। সত্যবাবু তাঁহার রোজ নামচায় (একজিবিট ৩৯৯) উল্লেখ করিয়াছেন যে, নীডহাম (যিনি ম্যানেজার হইয়া আসিতেছেন) মিঃ মেয়ারের আত্মীয়। ইহাতে পরিবারের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সুতরাং ১৯০৪ সালে রাণী ও দ্বিতীয়কুমার মিঃ মেয়ারের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার দরুণ তাহার (দ্বিতীয় কুমারের) প্রতি কোমল ভাব পোষণ করা সম্ভব ছিল না। সে যাহা হউক, মিঃ মেয়ারের কুমারের প্রতি কিরূপ ভাব ছিল, তাহা বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ যখন তিনি বলিয়াছেন যে, সাধু নিজেকে দ্বিতীয় কুমার বলিয়া প্রচার করিতেছে, শুনিয়া তিনি ব্যাকুল্যাণ্ড বাধে যান, এবং সাধুকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। সাধু যে একজন প্রতারক, সে সম্বন্ধে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। মিঃ মেয়ার যখন এই সব কথা বলেন, তখন তিনি সত্য কথা বলেন না। কারণ ইহার প্রায় ১৯ মাস পরে ১৯২২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকার কোন সবজজের আদালতে তিনি এইরূপ সাক্ষ্য দেন (একজিবিট ২৯০)—

"আমি ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমারকে চিনিতাম।

প্রশ্নঃ—যে সাধু এখানে আসিয়াছেন এবং যাহাকে লোকে দ্বিতীয় কুমার বলিয়া বলিতেছে, তাঁহাকে কি আপনি দেখিয়াছেন?

উঃ—হাঁ, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। আমি সাধুকে রাস্তায় দেখিয়াছি। আমি যতদূর তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাহাতে ঐ সাধু দ্বিতীয় কুমার কিনা, তৎসম্পর্কে নিশ্চিতরূপে কিছু বলিতে পারিনা। কিন্তু আমার ধারণা, সাধু দ্বিতীয়কুমার নহেন। কিন্তু আমি এই সরকারী উকীলকে এবং কোর্টের জজকে যে ভাবে দেখিতেছি, সেইভাবে ৫ মিনিটের জন্য যদি তাঁহাকে দেখিতে পারি এবং তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিব। সাধু ঢাকায় আসার পর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই।"

আমার কোন সন্দেহ নাই যে, মিঃ মেয়ার দ্বিতীয় কুমারকে চিনিতেন। তিনি জজকে যেভাবে দেখিতেছিলেন, সেইভাবে যদি সাধুকে দেখিতেন এবং ৫ মিনিটকাল আলাপ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বাদী মেজকুমার কিনা তাহা তিনি বলিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা কখনও করেন নাই। সুতরাং বাদীকে সনাক্ত করা সম্পর্কে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের মত নহে এবং তাহা কোন কাজেই লাগিবে না।

উহা জবানবন্দীর নকল বলিয়া, তিনি তাহা নিজের জবানবন্দী বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

উপরোক্ত জবানবন্দীর পর বাদীর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের আর একবার সুযোগ ঘটিয়াছিল এই কথা তিনি বলেন এবং তাহা অস্পষ্টভাবে বলেন—
—যদিও বাদী ১৯২১ ও ১৯২২ সালে ঢাকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

(৫) মিসেস মায়ার (কমিশনে সাক্ষ্য দেন) মিঃ মায়ার যখন জয়দেবপুরে ছিলেন, তখন এই সাক্ষী নিশ্চয়ই মধ্যম কুমারকে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ মায়ার জয়দেবপুরে থাকা কালেই সাক্ষী ইংলণ্ডে চলিয়া যান; ইহার পর আর কখনও তিনি জয়দেবপুরে যান নাই। ১৯০৪ সালে মিসেস মায়ার জয়দেবপুর পরিত্যাগ করেন।

এই সাক্ষী বলেন,—সাধু মধ্যম কুমার নহেন। সাক্ষী ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধের উপর সাধুকে দেখিয়াছিলেন। মধ্যম কুমারকে দেখিবার মনোভাব লইয়া সাক্ষী সাধুকে দেখিতে যান নাই, সাধুকে সাধু হিসাবে দেখিবার জন্যই সেখানে তাঁহার যাওয়া, বাঁধের উপর সাধুকে এই সাক্ষী বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে এত নিকটে কোনও সাধুকে পান নাই। মিঃ মায়ারের পক্ষে হয় তো অন্য কারণ থাকিতেও পারে।

বাঁধের উপর থাকিবার কালে কিম্বা তাহার পরেও সাধুকে কোন ব্যক্তিই

মধ্যম কুমার বলিয়া চিনিতে পারে নাই। সাধুর গায়ের ভস্ম না ধোওয়া পর্য্যন্ত বাদী যে মধ্যম কুমার, এ বিষয় কেহ গভীরভাবে ভাবিবার অবসর পান নাই। ভস্ম ধোওয়ার পর কেহ আর সে বিষয় সন্দেহের চক্ষে দেখেন না, অথবা সে সম্বন্ধে কাহারও মনে দ্বিধা ভাব আসে না। কুমারের বিষয় যতটা স্মরণ রাখা এই মহিলার পক্ষে সম্ভব বলিয়া আশা করা যায়, তাহাতে মনে হয়, উক্ত মহিলা প্রকৃতপক্ষে যদি দ্বিতীয় কুমার সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট না যাইয়া থাকেন, তাহাহইলে ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসীকে মধ্যম কুমার বলিয়া সন্দেহ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আরও মধ্যম কুমার বলিয়া ধরিয়া লইয়াও যদি এই বাঁধে অথবা রাস্তায় সন্ন্যাসীকে দেখিয়া থাকেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কারণ সে ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় কেউ সন্ন্যাসীকে কুমার বলিয়া চিনিতে পারিত না। এই মহিলাকে এমন অনেক কথা বলা হইয়াছে এবং সেগুলি যেন তিনি তাঁহার পূর্ব্বের স্মৃতি হইতেই বলিতেছেন, যাহা ভবিষ্যৎ কোনও মামলার বিষয়বস্তুর উপযোগী হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি; যথা—এই মহিলা বলিয়াছেন যে, জয়দেবপুর থাকাকালে তিনি সেখানে মিঃ হোয়ার্টনকে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু মিঃ হোয়ার্টন ১৯০২ সালের জুলাই মাসের শেষে জয়দেবপুর ত্যাগ করেন (৪নং একজিবিট) অবশ্য মিঃ হোয়ার্টনের পদত্যাগ-পত্র আদালতে দাখিল করা হয় নাই। এই মহিলা সাক্ষী আরও বলেন যে, বাদী বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন। কিন্তু বাদীপক্ষের জেরার দায় এড়াইবার জন্য মধ্যম কুমার সম্বন্ধে বিবাদীগণ প্রমাণ করিতে চান যে, কুমারেরা বেশ ভাল ইংরেজী জানিতেন, এবং বাদী ইংরেজীর সামান্য উচ্চারণও জানিতেন না। এ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইবে।

(৬) বিবাদী পক্ষের ২৮০নং সাক্ষী আলতাদেবী ইহাকে সুকুমারী বলিয়াও ডাকা হইত।

এই সাক্ষী বাদিনী বিভাবতী দেবীর (মধ্যম রাণী) মাতুল রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। ইহার পিত্রালয়ে পরে মধ্যম রাণীর মাতা এবং তাঁহার সন্তানগণ থাকিতেন। ১৩১৩ সালে সালে সুকুমারী দেবীর বিবাহ হয়; কিন্তু সাক্ষী বলেন, তিনি বিবাহের পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত শ্বশুরালয়ে যান নাই। ১৩০০ সালের কার্ত্তিক মাসে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার ৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি মধ্যমকুমারকে প্রথম দেখেন। তাঁহার এ উক্তি ঠিক বলিয়া মনে হয়। সাক্ষীর বয়ক্রম ১৫ বৎসর হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, এই সাক্ষী মধ্যম কুমারকে অন্ততঃ

বারোবার দেখিয়াছেন। বাদীর বোস পার্কে থাকা কালে সাক্ষী সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে দেখেন, সেই বাড়ী সাক্ষীদের বাড়ীর সংলগ্ন। সাক্ষী তাঁহার শুইবার ঘরের জানালায়, দাঁড়াইয়া বাদীকে দেখিতেন। (ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না; কারণ, যেমন প্রকৃত লোকের সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল একই প্রকারের হয়।) কিন্তু যখন সাক্ষী আমার আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসেন, বাদী তাঁহার সম্মুখে দাড়ান; সাক্ষী অনেকক্ষণ ধরিয়া বেশ ভাল করিয়া বাদীকে দেখেন। জবানবন্দীর সময় সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ—

প্রঃ। উনি কি মধ্যম কুমার?

উঃ। আমি মুখের চেহারায় কোনই মিল দেখিতে পাইতেছি না।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সময় পর্য্যন্ত সাক্ষী একদৃষ্টে বাদীর দিকে চাহিয়াছিলেন। সাক্ষী নিশ্চয়ই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য অপেক্ষা করেন নাই; তার জন্যই তিনি প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে বলিতে পারেন নাই যে, তিনি কেন "এই লোক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি।" যে দিক দিয়াই দেখা হউক, ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হয়, যে, সাক্ষী জেরায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ সময়ে সেই কথাই ভাবিতেছিলেন।

প্রঃ। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, বাদী মধ্যম কুমার হইতেও পারেন, না-ও হইতে পারেন?

সাক্ষী নিরুত্তর

প্রঃ। বাদী যে মধ্যম কুমার একথাও আপনি বলিতে পারেন না; আবার বাদী যে মধ্যম কুমার নহেন, তাহাও আপনি বলেন না।

সাক্ষী পুনরায় নিরুত্তর

প্রঃ। কি প্রকারে নাক এত প্রশস্ত হইল; মুখশ্রী হয় তো, সকলেরই পরিবর্ত্তিত হয়; কিন্তু নাকের কোন পরিবর্ত্তন আসে কি?

এই সময় বিবাদী পক্ষের উকীল কিঞ্চিৎ বাধা দিয়া বলেন,—"সাক্ষী সে কথা বলিয়াছেন।" নাক এবং চক্ষুর পরিবর্ত্তন হয় না। সাক্ষী শুনিতে পান সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরেই কথাগুলি বলা হইয়াছিল, তার পর আমার প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তিনি ঐ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। নাক এবং চোখের পরিবর্ত্তন হয় কি? সাক্ষীর বক্তব্য সমর্থন করিবার পক্ষে ইহা এক সাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয়। নাক কি করিয়া এত প্রশস্ত হয়? এই প্রশ্নে একদিকে যেমন মনে সন্দেহ আনে, অন্যদিকে তেমন একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য পড়ে, যদ্দ্বারা বিবেকে কোনও খটকা লাগিয়াছে কি না, তাহা সহজে

ধরা যায়। যখন হইতে সাক্ষী কুমারকে চিনিতেন বলিয়া বলেন, ঠিক তাহারও পূর্ব্ব হইতে যদি কুমারকে তিনি চিনিয়া থাকেন, আমি তাহার ঐ উত্তরকে সন্দেহ বলিয়া ধরিব না; কিন্তু তাহা যখন নহে, তখন কুমারকে সনাক্ত করণ সম্পর্কে এই সাক্ষীর সাক্ষ্যের কোনও মূল্য নাই।

বিরুদ্ধ সাক্ষী

এই শ্রেণীর কতকগুলি সাক্ষীর নাম করিব। ইহারা নিশ্চয়ই কুমারকে চিনিতেন। কিন্তু যদিও ইঁহারা বাদীকে কুমার বলিয়াই স্বীকার করেন নাই, তথাপি ইহাদের সাক্ষ্যের দ্বারা যাহারা বাদীকে স্পষ্টতঃ কুমার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের সাক্ষ্যের গুরুত্ব হ্রাস হইবে না।

(৭) শ্যামদাস ব্যানার্জ্জি (বয়স ৪৮ বৎসর) কমিশনে ইহার সাক্ষ্য গৃহীত হয়। সত্যবাবুর মাতার আত্মীয়ের পুত্র। সাক্ষী উত্তর পাড়ায় বাস করেন। দ্বিতীয় কুমারের পীড়ার সময় এবং কাল্পনিক মৃত্যুকালে এই সাক্ষী দার্জ্জিলিং ছিলেন। সনাক্ত করণ সম্পর্কে ইহার সাক্ষ্যে গুরুত্ব আছে। তহবিল তছরুপের অভিযোগে এই সাক্ষী সরকারী চাকুরী হইতে ডিসমিস হন। সাক্ষী নিজের অনেক আয়ের কথা বলেন; কিন্তু ইনি কোনও আয়কর দেন নাই।

(৮) জগদীশ চৌধুরী, প্রেসিডেন্সী স্মল জজ কোর্টের উকিল। জয়দেবপুরের নিকটবর্ত্তী ধীরাশ্রম গ্রামে ইঁহাদের বাস। ইনি জয়দেবপুর স্কুলে পড়িতেন, স্কুলের বোর্ডিংয়ে থাকিতেন। ইহাকে স্কুলের বেতন দিতে হইত না। বোর্ডিংয়ে থাকার ব্যয় লাগিত না। মধ্যম কুমার ইহার বোর্ডিংয়ের খরচা দিতেন; পড়িবার পুস্তকাদিও কিনিয়া দিতেন। মধ্যম কুমার যখন দার্জ্জিলিং যান, তখন সাক্ষীর বয়স ১৩ বৎসর।

১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই সাক্ষী সাধুকে সমর্থন করিয়াছেন। সাক্ষী সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি সাধুর একজন গোঁড়া সমর্থক। সাধুর পক্ষে যে সমিতি চাঁদা তুলিতেছিলেন, এই সাক্ষী সেই সমিতির সভ্য ছিলেন। সাক্ষী বলেন, তিনি বিরক্ত হইয়া ঐ দল ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাক্ষ্যে বুঝা যায়, তিনি একজন তদ্বিরকারক। সাক্ষীর পূর্ব্ব জবানবন্দী এবং কার্য্যকলাপ, তাঁহার বর্ত্তমান মতবাদের বিরোধী।

(৯) দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস, (বয়স ৭৮) ইহার সাক্ষ্য কমিশনে গৃহীত হইয়াছে। ইনি পূবাইল জমিদারীর পেশকার বা ম্যানেজার ছিলেন; এবং ১৭৲ টাকা বেতনে অবসর গ্রহণ করেন। দুর্গাবাবু বাদীকে দেখিবার জন্য

তাঁহার বাড়ীতে যান। এতদ্ব্যতীত আর একবারও তিনি দৈবক্রমে সেখানে যান, তারপর আবার কীর্ত্তন গাহিতে তিনি সেখানে যান। বাদীর তখন দাড়ি ও লম্বা চুল ছিল, ইহা ১৯২১ সাল হইবে এবং ভাদ্র মাসের পূর্ব্বেই হইবে। সাক্ষী বলেন, বাদীকে তিনি যখন প্রথম ঢাকায় দেখেন, তখন সত্যভামা দেবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, অথচ দেখা যায় ১৯২২ সালের পূর্ব্বে সত্যভামা দেবী ঢাকায় আসেন নাই।

(১০) শিবচন্দ্র মিত্র বিশ্বাস (কমিশনে সাক্ষ্য গৃহীত), বয়স ৬০। ইনি ব্রাহ্মণগাঁওর একজন ছোট তালুকদার। তাহার মুদী দোকান ছিল কিনা, সে কথা তাঁহার স্মরণ নাই। আগে একটি মামলায় স্বীকার করেন যে, একটি ফৌজদারী মামলায় তাঁহার জারমানা হইয়াছিল; কিন্তু এই মামলার সময় তিনি বলেন যে, সেই কথা তাঁহার ঠিক মনে নাই।

(১১) সর্ব্বমোহন চক্রবর্ত্তী সাং বাঁহিরা। ভাওয়াল এষ্টেটে ৪০ বৎসর মোক্তার ছিলেন। তাঁহার বয়স ৮০। ইনি একজন তালুকদার। তালুকের আয় এক হাজার হইতে ১২ শত টাকার মধ্যে। বাদী কুমার, এই কথা স্বীকার করিয়া সরকারের নিকট কোনও এক দরখাস্তে তিনি স্বাক্ষর দিয়াছিলেন কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, সে কথা তাঁহার স্মরণ নাই। জয়দেবপুরে যখন তিনি গিয়াছিলেন, তখন সাধুর জটা ছিল না; তাঁহার দাড়ি দেখিয়াছিলাম।

(১৩) রামনাথ রায় বয়স, ৮৩ বৎসর (কমিশনে সাক্ষ্য গৃহীত)।

ইনি একজন বড় তালুকদার। তালুকের আয় প্রায় ৭ হাজার টাকা। ভাওয়াল এষ্টেটের নিকট ঋণের জন্য সাক্ষ্য দেওয়ার দুই মাস পূর্ব্বে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। ভাওয়াল এষ্টেট তাঁহার একটি জোতের অংশ দখলের জন্য চেষ্টা করিতেছিল এবং ইহা লইয়া এখনও বিবাদ রহিয়াছে। তিনি বলেন, কুমারদিগকে তিনি নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন, তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে কিংবা রাজ পরিবার সম্পর্কে খুব কম খবরই তিনি রাখিতেন। দ্বিতীয় কুমারকে সর্ব্বশেষে কবে দেখিয়া ছিলেন। তিনি তাহা ঠিক বলিতে পারেন না; তবে দ্বিতীয় কুমারকে শেষবার দেখেন, তখন কুমার অসুস্থ ছিলেন। কুমার তখন বাঘ শিকার কি এমনই একটা কিছু করিতেছিলেন। তিনি উপদংশ কিংবা অন্য কোন কঠিন রোগের কথা বলেন না।

(১৩) ডেভিড মালুক (কমিশনে সাক্ষ্য গৃহীত)

১৯০৬ হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত ভাওয়াল এষ্টেটের একজন কর্ম্মচারী

ছিলেন। তাঁহার সাক্ষ্য প্রমাণে প্রকাশ পাইয়াছে যে, তিনি এখন বিশেষ দুরবস্থায় আছেন।

(১৪) শৈলবালা দেবী (কমিশনে সাক্ষ্য গৃহীত) ফণীবাবুর ভগ্নী) তাঁহার সাক্ষ্য সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাইবে।

(১৫) ডাঃ যতীন্দ্রমোহন সেন, ফণীবাবুর একজন বন্ধু। চট্টগ্রামের এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন। আশু ডাক্তারের দূর সম্পর্কীয় কুটুম্ব।

(১৬) এণ্টনি ময়েল। বয়স ৬৪ বৎসর। বেকার, দ্বিতীয় কুমারের সহিত দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কুমারের মৃত্যুর (তথাকথিত) পর পর্য্যন্ত তিনি ভাওয়াল এষ্টেটে চাকুরী করিতেন। ভাওয়ালবাসী এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ গোয়া বাসী। তাঁহার সাক্ষ্য পরে আলোচিত হইবে।

(১৭) হুগলী জেলার বালী নিবাসী রাজেন্দ্র শেঠ। অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট-ও বালী মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। পদস্থ ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। এই সাক্ষী সত্যবাবুর একজন বন্ধু, এবং দ্বিতীয় কুমার যখন দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দার্জ্জিলিংয়ের ঘটনা সম্পর্কে একজন প্রধান সাক্ষী। সনাক্ত করণে তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে বলা যায় যে, রেভেনিউ বোর্ডের কাছে আবেদনে এই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি বাদীকে চিনিতে পারিয়াছেন, এবং বাদী তাহার আবেদনে এই ব্যক্তিকে একজন বন্ধু বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। সাক্ষী বলিয়াছেন যে, দার্জ্জিলিংয়ের 'ষ্টেপ এসাইডে' দ্বিতীয় কুমার যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে তিনবার দেখিয়াছিলেন, এবং ৯ই মে প্রাতঃকালে কুমারের শবদাহ করিতে তিনি গিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় কুমারের শারীরিক বৈচিত্র্য ও তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সাক্ষী যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে; তাঁহার কথানুসারে দেখা যায় যে, বাদী যখন কলিকাতা ছিলেন, তখন সাক্ষী তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। সনাক্তকরণ সম্পর্কে বিবাদী পক্ষ হইতে তাঁহার কোন সাক্ষ্য গৃহীত হয় নাই, কিন্তু জেরায় তাহা করা হইয়াছে। ইহার কারণ, বিবাদীপক্ষ এই ব্যাপারে সাক্ষীকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। আমি এখানে বলিতে পারি যে, তিনি সনাক্তকরণ সম্পর্কেও বলিয়াছেন। তিনি অনুসন্ধিৎসু হইয়া শ্রীযুক্ত দ্বারিক চক্রবর্ত্তীর এক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বাদীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণিত বিবরণ এইরূপ,—

"ঘরে ঢুকিয়াই কুমারের মত লালচুল ও 'কটা চোখ' বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া যাই। আমি তখন প্রশ্ন করিলাম

'এই কি কুমার ?' একজন উত্তর করিল,—'না, সে ভাগিনেয়।' ইহার পর যাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম তিনি আসিলেন। আসিয়া আমাকে প্রশ্ন করিলেন, 'কৈ, কেমন চিন্তে পারেন ?'

আমি বলিলাম, 'না, কেমন করিয়া চিনিব ?'

ইহার পর বাদী বলিলেন, 'আপনার সন্দেহ নিরসনের জন্য আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।'

আমি তখন প্রশ্ন করিলাম, 'দার্জ্জিলিংয়ে সত্যেন্ কি ধরণের টুপী ব্যবহার করিত ?'

তিনি উত্তর করিলেন, 'একটু অপেক্ষা করুন।' এই বলিয়া তিনি উপরের তলায় গেলেন এবং খবরের কাগজে মোড়া একটি টুপী লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। টুপীটি দামী এবং তাহাতে সোনার জরির কাজ ছিল। আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম ; কারণ সত্যেন সাহেবী পোষাক পরিয়া এবং এই ধরণের একটি গুর্খা টুপী মাথায় দিয়া বাহির হইত। বাদী ইহার পর বলিলেন, 'আমাদের পরিবারের এই টুপী পরা হইত এবং সত্যেন, এই টুপী পরিত।'

আমি আর একটি প্রশ্ন করি,—'ষ্টেপ এসাইডে আপনি সাধারণতঃ কি ধরণের পোষাক পরিতেন ?' তিনি উত্তর করিলেন, 'কোমরে জড়ান একখানি সিল্কের ধুতি এবং শয়নকালীন পরিচ্ছদের মত উপরে একটি রঙ্গিন জামা।' তাঁহার উত্তর খাটি। দার্জ্জিলিংয়ের বাড়ীতে আমি দ্বিতীয় কুমারের সেই পোষাক দেখিয়াছিলাম, তাহা ঠিক এইরূপই ছিল। ইহার পর বাদী আবার বলিলেন, 'আমি কাপড় লুঙ্গীর মত করিয়া পরিতাম।"

সাক্ষী বলিয়াছেন যে, বাদীর সহিত এই সাক্ষাতের বহু পরে তিনি সত্যবাবুকে এই সব কথা বলেন। তাহাকে সত্যবাবু বলিয়াছিলেন, 'হাঁ', তিনি সেই ভাবেই কাপড় পরিতেন ; কিন্তু সে কথা কে না জানিত সকল কথা তিনি হাসিয়াই উড়াইয়া দেন।' বাদী এবং দ্বিতীয় কুমারের চেহারার মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে কি না জিজ্ঞাসা করা হইলে সাক্ষী বলেন যে, ভাগিনেয়কে দেখিয়া অবশ্য কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল ; কিন্তু বাদীকে দেখিয়া তাঁহার সে রকম, মনে হয় নাই।

উপরোক্ত বিবরণ ব্যতীতও সাক্ষী বলিয়াছেন যে, তাঁহার সহিত দার্জ্জিলিং-এ যখন মেজকুমারের দেখা হইয়াছিল, তখন তিনি তাঁহার পরিধানে রঙ্গিন লুঙ্গি এবং গায়ে রঙ্গিন জামা দেখিয়াছিলেন। মেজকুমারকে এই পোষাকে

দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন, এবং গরম কাপড় ব্যবহার করিবার জন্য পরামর্শ দেন।

এই আলোচনার বিষয় কি সত্য অথবা কাল্পনিক, তাহা আমি এখন আলোচনা করিতে চাই না, তবে এই সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে দুইটা তথ্য জানা যায়। দার্জ্জিলিংএ কুমার রঙ্গিন লুঙ্গি পরিয়াছিলেন কি না, প্রত্যেকেই জানেন এবং সত্যবাবুও স্বীকার করিয়াছেন যে, সত্যবাবু সাহেবী পোষাক পরিতেন এবং কুমার সোনার কাজকরা টুপী ব্যবহার করিতেন। কোন লোক যদি রাজকুমার বা পদমর্য্যাদা সম্পন্ন লোক না হন; তবে এই প্রকার টুপী ব্যবহার করেন না, কারণ উহা সাধারণ লোকে ব্যবহার করিলে হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। নিম্নে দেখান হইবে যে কুমারের সমবয়সী এই যুবক, সাহেবী পোষাকে দার্জ্জিলিংয়ে ঘুরাফেরা করিতেন। তাঁহার মাথায় সোনার কাজকরা টুপী ছিল, এবং তিনি ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বলিতেন। এই পোষাক ও টুপী ছিল বলিয়াই দার্জ্জিলিংয়ের সাক্ষীরা বলিয়াছে যে তাহারা কুমারকে রাস্তায় ও হোটেলে, সুন্দর ইংরেজীতে কথা বলিতে দেখিয়াছে। নিম্নে দেখান হইবে যে মেজকুমার ভাল বা খারাপ কোন প্রকার ইংরেজীই বলিতে পারিতেন না। বাদীর সহিত যে কথাবার্ত্তা বলা হইয়াছে উহার ভাষা বলিবার ভঙ্গী সম্পর্কেও অনেক মূল্যবান তথ্য এই সাক্ষ্য হইতে পাওয়া যায়। উহার মধ্যে হিন্দীর কোন কথাই নাই এবং উহার কোন কোন অংশ অদ্ভুত বাঙ্গালা ছিল, যেমন,—কি, কেমন, চিন্তি পারেন? সাক্ষিগণ বলিয়াছেন যে, বাদী কলিকাতাতে বাঙ্গালা বলিতে পারেন নাই। হিন্দী বলিয়াই উহার সহিত একটু একটু বাঙ্গালা মিশান ছিল। বাদী ১৯২৫ সালে মিঃ ঘোষালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন মিঃ ঘোষালের সাক্ষ্য কমিশনে গৃহীত হইয়াছে। তিনি কলিকাতার একজন বিশিষ্ট লোক। তিনি বলিয়াছেন যে তখন বাদীর সহিত তাঁহার বাঙ্গলাতেই কথাবার্ত্তা হইয়াছে। এই ঘটনাটা অত্যন্ত বড, সেইজন্যই যথাস্থানে উহা আলোচিত হইবে।

মিঃ আর, এন, শেঠ বাদীকে দেখিবার পনর বৎসর পূর্ব্বে মেজকুমারকে দেখিয়াছেন, সনাক্তকরণ সম্পর্কে তাঁহার সাক্ষ্য প্রয়োজনীয়।

(১৮) ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, পি, ঘোষ (বর্ত্তমানে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট) রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের পুত্র। রাজা বাহাদুর রাজা কালীনারায়ণ রায়ের আমল হইতে ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভাওয়াল এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ঢাকাতে রায় বাহাদুরের বাড়ী ছিল। কিন্তু

সাধারণতঃ তিনি জয়দেবপুরেই থাকিতেন। কুমারদের জন্মের সময় তিনি তথায় ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে নিজের পুত্রদের মতই মনে করিতেন। মিঃ ঘোষ ও তাঁহার ভাইদের মত তাঁহাদিগকে জানিতেন বলিয়া আমি মনে করি। এই ভদ্রলোক বলিয়াছেন যে, বাদীর ঢাকা আগমনের পর তিনি তাঁহাকে আনন্দবাবুর বাড়ীতে দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহার ভাই ঢাকার প্রাবিক প্রসিকিউটর রায় সত্য প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর ও ঢাকার উকিল মিঃ খগেন্দ্রকুমার মিত্রের সহিত তথায় গিয়াছিলেন। তাঁহারা বাদীর আগমনের অপেক্ষায় একটা বেঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন। একদল লোকের সহিত বাদী সন্ধ্যার পরে আসিলেন এবং সাক্ষীর নিকটেই বসিলেন, তাঁহাদিগকে চিনেন কি না তিনি জিজ্ঞাসা করিলে বাদী বলেন 'মালুম নেহি' (চিনি না)। এখন সাক্ষী বলিলেন যে, মেজকুমারের সহিত চেহারার সাদৃশ্য নাই। বাবু আনন্দ চন্দ্র রায়ের অন্যতম পুত্র ধীরেন বাবু তথায় ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে তাহার বড় ভাই আরও প্রশ্ন করিয়াছেন, কিন্তু কি প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা বলেন নাই। তবে তিনি বাদী যে প্রতারক এই ধারণা লইয়া আসিয়াছেন।

১৯০১ সালে রাণী বিলাসমণি সাক্ষীর পিতাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন, তিনি নিকাশ দাবীর মোকদ্দমা করিয়াছিলেন এবং রাজা তাঁহার জন্য যে পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, উহা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ৫০ হাজার টাকা ডিগ্রী হইয়াছিল। অবশ্য পুত্রদেব অনুরোধে রাণী উহা মাফ্ করিয়া দেন ১৯০৫ সালের একখানি পত্রে (একজিবিট নং ২) উহা স্বীকৃত হইয়াছে। এই পরিবারই ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী হইতে মেজকুমারের টাকা তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ঘোষ পরিবার জীবিত কুমারদ্বয়কে সমর্থন করিতেন না, সত্যবাবুর নিজের ডায়েরী এবং মিঃ নীডহামের পত্র হইতে তাহা, বুঝা যায়। সেই সময় হইতে এই বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে মিঃ ঘোষ ডেপুটীম্যাজিষ্টেট নিযুক্ত হন। তিনি ১৯০৭ হইতে ১৯১৬ এবং ১৯২০ হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত ঢাকাতে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২৩ সাল হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত তাহার উপর কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিভাগের ভার ছিল তখন সাধু সম্পর্কিত গোপনীয় কাগজপত্র দেখা সম্ভব হইয়াছিল। ১৯২২ সালে তাহার কোর্টে উল্লিখিত মানহানির মামলা হইয়াছিল। তখন সাধুর সনাক্তকরণ সম্পর্কিত প্রশ্ন এবং অসুখ ও মৃত্যু সম্পর্কিত ঘটনাও উত্থাপিত হইয়াছিল, এই সাক্ষী ঢাকার অধিবাসী। এবং সাধু সম্পর্কিত সমুদয় ঘটনার সহিত জড়িত আছেন; অথচ তিনি বলিয়াছেন যে সাধু যে ব্যাকল্যাণ্ড বাধে আছেন, কিম্বা জ্যোতির্ম্ময়ী

দেবীর বাড়ীতে আছেন, তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার বাড়ীও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীর অতি সন্নিকটে। (সাধুর আত্মপরিচয় দানের পূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধে দেখিয়াছেন) তিনি বলিয়াছেন যে, অল্প কয়েকজন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাদীকে স্বীকার করিয়াছেন, অথচ একজিবিট নং ৫৯ এবং ১৯২১ সালে মিঃ লিণ্ডসের চিঠির (একজিবিট নং ৪৩৫) খবর তিনি রাখেন, পরিশেষে মেজকুমারের সহিত বাদীর চেহারার সাদৃশ্য নাই বলিয়াও তিনি বলিয়াছেন।

বাদীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর যে কথা মনে হইয়াছিল, তাহার সহিত এই সমস্তই সঙ্গতিপূর্ণ হইতে পারে। বিশেষ করিয়া যদি আমরা মনে রাখি যে, তিনি তাহাকে চিনিতেই পারেন নাই, অথবা তিনি হিন্দী ভাষায় কথা বলিয়াছিলেন, তাহা হইলে এই অভিমত সামঞ্জস্যহীন মনে হয় না; কিন্তু সাক্ষী বলেন যে, সম্ভবতঃ এক শীত ঋতুতে বাদীর সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল, 'প্রতারক' নোটীশজারী হইবার পর এই সাক্ষাৎকার হইয়াছিল এবং বাদী কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি জানেন না। অতএব বাদী যদি ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধ হইতে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে সাক্ষী স্বীকার করিতেছেন না যে, ইনিই দ্বিতীয় কুমার এই অস্পষ্টতার জন্যই আমি মনে করিলাম যে, রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ঘোষকে (ইনি মিঃ ঘোষের ন্যায়ই কুমারকে উত্তমরূপে জানিতেন) আহ্বান করা আবশ্যক; তাহা সম্ভবপর না হইলে অন্ততঃপক্ষে খগেন বাবুকে আনিয়া হাজির করিতে হইবে। বাদী যখন ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধের উপর ছিলেন, তখনও তাঁহাকে দ্বিতীয় কুমার বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছিল না, এই যে বর্ণনা তাহার বিরুদ্ধ কথাই প্রমাণিত হইত, যদি এই সাক্ষীর বক্তব্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত। এই সমস্ত সত্বেও এই ভদ্রলোকের সাক্ষ্যকে একজন স্বাধীনচেতা এবং কুমারের চেহারার সাদৃশ্য সম্পর্কে কথা বলিতে সমর্থ ব্যক্তির সাক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। অপর পক্ষের বিশিষ্ট সাক্ষিগণের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথাই ইনি বলিয়াছেন।

মিঃ র‍্যাঙ্কিনের সাক্ষ্য

মিঃ র‍্যাঙ্কিন, অবসরপ্রাপ্ত আই, সি, এস, (বিবাদী পক্ষের ২নং সাক্ষী) এই মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য মিঃ র‍্যাঙ্কিন ইংলণ্ড হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। গভীর দুঃখের সহিত আমি শুনিলাম যে, সাক্ষ্য দানের অল্প সময় পরেই তিনি কোন পুরাতন রোগে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন।

১৮৯৯ সালে ফেব্রুয়ারী অথবা মার্চ্চ মাস হইতে ১৯০৫ সালের কোনও

একটি তারিখ পর্যন্ত তিনি ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ছিলেন। ২৭-৭-০৫ ইং তারিখে ঢাকার নর্থব্রুক হলে তাঁহাকে এক প্রীতিভোজ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় কুমার তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৫ সালের শেষভাগ হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত মিঃ র‍্যাঙ্কিন রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী ছিলেন। এই সময় তিনি গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্মকালে শিলং সহরে এবং শীতকালে ঢাকায় গমনাগমন করিতেন। এই সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা হয় নাই ; তবে সমস্ত কথা তাঁহার স্মরণ আছে কি না, এই প্রশ্ন তোলা হইয়াছে মিঃ র‍্যাঙ্কিন বলেন, ঢাকার কালেক্টর থাকা কালে তিনি রাজাকে দেখিয়াছিলেন, রাজার জীবিত কালে কুমারগণকেও দেখিয়াছেন, রাজার মৃত্যুর পর কুমারগণের সহিত তাঁহার ঘনঘন দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঢাকায় এবং জয়দেবপুরে দেখা হইয়াছে। কুমারগণ আসিয়া সরকারীভাবে তাঁহার বাংলোয় দেখা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ঘোড়দৌড়ের সময় এবং নানা অনুষ্ঠানও দেখা হইয়াছে। জয়দেবপুরে গেলে মিঃ র‍্যাঙ্কিন "গেষ্ট হাউসে" থাকিতেন, শিকারে বাহির হইতেন, অথবা অশ্বারোহণে বেড়াইতেন। দ্বিতীয় কুমার এই সময় তাঁহার সঙ্গে যাইতেন। ঢাকার কালেক্টর পদ হইতে অন্যত্র বদলী হইবার পর কতকটা পার্থক্য নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল; কারণ রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী হিসাবে রাজপরিবারের সহিত অথবা তাঁহাদের সম্পত্তির সহিত মিঃ র‍্যাঙ্কিনের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না ; এই সময়ে তিনি কেবল শীতকালেই ঢাকায় আসিতেন, তখন আবার কুমারগণ সাধারণতঃ কলিকাতা চলিয়া যাইতেন। ম্যানেজার মিঃ মেয়ার ছিলেন তাঁহার পরম বন্ধু। তিনি ১৯০৪ সালে ঢাকা পরিত্যাগ করেন। প্রথমবারে কোর্ট অব-ওয়ার্ড যতদিন ভাওয়াল সম্পত্তির পরিচালক ছিলেন, ততদিন রাজপরিবার কলিকাতায়ই ছিলেন। তারপর যাঁহারা একে একে ভাওয়ালের ম্যানেজার হইলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ভারতবাসী ছিলেন ; ইহাদের সহিত মিঃ র‍্যাঙ্কিন ভাল করিয়া মিশিতে পারিতেন না। মিঃ মেয়ারের নিকটে আসিয়া তিনি পরম আনন্দে বাস করিতেন। এই বড় দালানকেই মিঃ র‍্যাঙ্কিন "গেষ্ট হাউস" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মিঃ র‍্যাঙ্কিন এবং আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, সমস্ত ইউরোপীয়ানই এই প্রকাণ্ড বাড়ীটাকে "গেষ্ট হাউস" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাড়ীটির এই নাম ছিল না, ইহার নাম ছিল 'বড় দালান'। প্রায় সকল সাক্ষীই স্পষ্টভাবে (দুই একজন বাদে) ইহাকে বড় দালান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই এবং কোন প্রতিবাদও হয় নাই যে, মিঃ

র‍্যাঙ্কিন কুমারদিগকে জানিতেন, তাঁহাদের বাড়ীঘরের কথা জানিতেন। কালেক্টররূপে সমস্ত বিষয় জানিবার সুযোগ তাঁহার ছিল, বিশেষ করিয়া এই মিঃ র‍্যাঙ্কিনই পুলিশের সহিত যাইয়া তখন কোর্ট অব ওয়ার্ডস'এর পক্ষ হইতে ভাওয়াল সম্পত্তির উপর দখল লইয়াছিলেন। সেই ঘটনার বর্ণনা আমি সম্পূর্ণরূপেই করিয়াছি। বাদী পক্ষ বলেন, অকস্মাৎ রাজ বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া মিঃ র‍্যাঙ্কিন তাঁহাদের মাতাকে হুকুম দেন যে, ১০ মিনিট সময়ের মধ্যে সরিয়া যাইতে হইবে; ইহাতে কুমারগণ ক্ষুন্ন হন। তাঁহাদের মনে হয় যে, তাঁহাদের মাতার অপমান করা হইয়াছে, অতএব এই ঘটনার পর হইতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কুমার পারিতে, মিঃ র‍্যাঙ্কিনকে এড়াইয়া চলিতেন, তবে বিশেষ করিয়া এই কারণেই যে তাঁহারা মিঃ র‍্যাঙ্কিনকে চিনিতেন এবং মিঃ র‍্যাঙ্কিনও তাঁহাদিগকে চিনিতেন, ইহা অতিশয় পরিস্ফুট। মিঃ র‍্যাঙ্কিন গত ১৯০৭ সালেই সর্ব্বশেষ দ্বিতীয়কুমারকে দেখিয়া থাকিবেন। কারণ ১৯০৯ সালের শীতকালে কুমারগণ ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ঢাকায় ছিলেন না। তবে তিনি যে ১৯০৯ সালেও কুমারকে দেখিয়া থাকিবেন, তাহাও একেবারে অসম্ভব নহে। ঐ বৎসর ডিসেম্বরে প্রথমভাগে তিনি চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে অথবা তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পরে দেখা হইয়া থাকিতে পারে। প্রায় ২৬ বৎসর পরে—এই সময়ের মধ্যে তাঁহার অবসর গ্রহণের পরবর্ত্তী ইংলণ্ড বাসের সময়ও আছে—মিঃ র‍্যাঙ্কিন আদালতে হাজির হইয়া বাদীকে দেখিতে পান। বিলাত বাসের অর্থ এই যে, ভারতের সহিত তাঁহার সংস্পর্শ বিনষ্ট হইয়াছে, এবং তাঁহার স্মৃতিও বিমলিন হইয়াছে। দ্বিতীয় কুমার বয়সে মিঃ র‍্যাঙ্কিন হইতে ১৪ বৎসরের ছোট, অতএব তিনি ঘনিষ্টভাবে কুমারের সহিত মিশিতেন না; সামাজিক প্রথা ও নিয়ম অনুসারে ইহা সত্য তবে আনুষ্ঠানিকভাবে মিঃ র‍্যাঙ্কিন ঢাকায় কুমারদের বাড়ীতে যাইতেন। বাদী বলেন, সাধারণতঃ মিঃ র‍্যাঙ্কিন বড় কুমারের কাছেই যাইতেন এবং তিনি যে একটা বিশিষ্ট ব্যক্তি, এমনই ভাব দেখাইতেন। মিঃ র‍্যাঙ্কিন বলেন, ইংরাজী ভাষা শিক্ষায় তিনি কুমারকে সাহায্য করিতেই যাইতেন। জয়দেবপুরে গেলে এতটা বাহ্যিক শিষ্টাচার প্রয়োজন ছিল না, ইহাই হয়ত অনেকে মনে করিতেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মিঃ র‍্যাঙ্কিন সর্ব্বদাই সাহেবী পোষাক পরিহিত কুমারের সহিত দেখা করিতেন, ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, মেলামেশার মধ্যেও যথেষ্ট ব্যবধান ছিল।

২৬ বৎসর পরে আদালতে দণ্ডায়মান বাদীকে দেখাইয়া যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, ইনিই দ্বিতীয় কুমার কি না, তখন মিঃ র‍্যাঙ্কিন ধীরভাবে বলেন,—

"আমার সেরূপ মনে হয় না। ইহার চেহারা দ্বিতীয় কুমারের অনুরূপ বলিয়া আমার দৃষ্টিতে মনে হইতেছে না।"

জেরার সময় মিঃ র‍্যাঙ্কিনকে বলা হয় যে, বহু সংখ্যক লোক আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছে যে, কুমার ও বাদীর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। অতঃপর তাহাকে প্রশ্ন করা হয়, "বাদীকে দেখিবার পর কি আপনি বলেন, এই সমস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্যই মিথ্যা?"

উঃ—"আমি মনে করি না যে, যাঁহারা বাদীর সহিত কুমারের সাদৃশ্য আছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন।"

পুনরায় "যদি কোন লোক বলে যে, তাঁহাকে (বাদীকে) দেখিতে দ্বিতীয় কুমারের মত মনে হইতে পারে, তাহা হইলে হয়ত সে সত্যকথাই বলিয়া থাকিবে।"

যেরূপ আশা করা গিয়াছিল, মিঃ র‍্যাঙ্কিন উভয়ের সাদৃশ্য সম্পর্কে সেরূপ কোন নিশ্চিত অভিমত দিতে পারেন নাই,—যদিও সাক্ষ্য দিবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় কুমারের কয়েকখানি ফটো তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল, কুমারের ১৪ বৎসর বয়সের একখানা ছবি তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল,—ছবিখানি চিনিতে পারেন। নাই। মিঃ র‍্যাঙ্কিন কুমারের পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে কুমারকে দেখিয়াছেন। সুতরাং আদালতে ঐ ছবি তাঁহার চেনা ছিল।

বিবাদীপক্ষের ১২০নং সাক্ষী শরদিন্দু মুখার্জ্জি (৪৭) কলিকাতার একজন সম্মানিত ভদ্রলোক। ১৯০১ সালে তিনি যখন তিন চারি দিনের জন্য জয়দেবপুর গিয়াছিলেন, তখন তিনি দ্বিতীয় কুমারকে দেখিয়াছিলেন। সাক্ষী বলেন কলিকাতার বাড়ীতে দেখার পূর্ব্বে সাক্ষী আর তাঁহাকে দেখেন নাই, সাক্ষী ১৯২৫ সালে বাদীকে কলিকাতায় দেখেন। বাদী হিন্দিমিশ্রিত বাঙ্গালা বলায় তিনি তাঁহাকে হিন্দুস্থানী বলিয়া মনে করেন। বাদী হিন্দুস্থানী কিনা এই প্রসঙ্গে আলোচনা কালে আমি সাক্ষীর শেষোক্ত মন্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করিব। বাদীকে সনাক্ত করা সম্পর্কে তাঁহার সাক্ষ্য বৃথা।

অতুলপ্রসাদ রায় চৌধুরী (৪৩) একজন কমিশন সাক্ষী। বাদীর সহিত কাশিমপুর ও জয়দেবপুর গমনের প্রসঙ্গ সম্পর্কে ইহার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মামলার শেষে তাঁহার প্রমাণ গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে এই সাক্ষী এলাকা ছাড়িয়া চলিয়া যান; এবং তাঁহার একজন গোমস্তাকে পাঠাইয়া জানান যে, তিনি অসুস্থ। তিনি নিজে বাদীকে কাশিমপুর

অথবা জয়দেবপুর লইয়া যান নাই বলিয়াছেন যে, বাদী অদ্ভুত রকমের কঠিন হিন্দী বলিতেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বাদী জয়দেবপুরে তাঁহার নাম সুন্দরদাস বলিয়া বলিয়াছেন; যদিও ২৭শে জুলাইর পাঞ্জাব রিপোর্টে প্রথম ঐ নামের উল্লেখ দেখা যায়। নিম্নে তাঁহার সাক্ষ্যের আরও অনেক বিষয় উল্লেখ করা হইবে, যাহাতে তাঁহাকে একেবারেই বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া মনে হইবে।

দুই রাণীও সত্যবাবু ভিন্ন ইহাই সমস্ত সাক্ষী। অবশ্য নায়েব এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী (যাহাদের উপর আদেশ ছিল যে, কেহ যেন বাদীপক্ষে সাক্ষ্য না দেয়) এবং প্রজা সাক্ষীদিগকে (নায়েবমহাশয়গণ যাহাদিগকে রায়-সাহেবের 'নমুনা সাক্ষ্য' পুনরাবৃত্তি করিবার জন্য সঙ্গে লোক দিয়া পাঠাইয়াছিলেন) ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। ফণীবাবু, তাঁহার ভগ্নী এবং ভগ্নীর জামাতা (যিনি এষ্টেটে চাকুরী করেন) ভিন্ন আর কোন আত্মীয় বিবাদী পক্ষে সাক্ষ্য দেন নাই। মেজরাণীর নিজের লোকের মধ্যে একমাত্র তাঁহার এক আত্মীয়া, যিনি তাঁহার ১৬ বৎসর বয়সে মেজকুমারকে শেষবার দেখেন, এবং যাঁহার অস্বীকৃতি প্রায় স্বীকারোক্তির কাছাকাছি আসিয়াছিল এবং এক ব্যক্তি, যিনি তহবিল তছরুপের অপরাধে সরকারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন,—এই দুইজন সাক্ষী ভিন্ন উত্তর-পাড়া হইতে আর কেহ সাক্ষ্য দেন নাই। সূর্য্যবাবু ও রামবাবুর বিধবা পত্নীদ্বয় (মেজরাণীর মামীমা) এখনও জীবিত। একমাত্র মিঃ এস, পি, ঘোষ ভিন্ন এমন একজনও নিরপেক্ষ পদস্থ লোক নাই, যিনি কুমারকে চিনিতেন, ও তখনও কুমারের কথা স্মরণ ছিল এবং তাঁহার সম্পর্কে কোন ভুল হইত না। অপরপক্ষে কুমারের ভগ্নীর সাক্ষ্য, তাঁহার বিশ্বাসের সততা শুধু তাঁহার উক্তির নির্ভর করে নাই। ৪ঠা ও ৫ই মে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, যাহার ইঙ্গিত নীডহ্যামের রিপোর্টে রহিয়াছে এবং সাক্ষ্য প্রমাণে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে,—সেই পরিস্থিতির উপরও নির্ভর করে। এতদ্ভিন্ন বহু লোকের আচরণ, নিরপেক্ষ বহু স্ত্রীপুরুষের হলপযুক্ত জবানবন্দী—এমন কি রাণীর নিজের একজন আত্মীয় ও মামীমার সাক্ষ্যও যাঁহাদের সততা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নাই, এবং যাঁহাদের কুমারকে ভুল করিবার সম্ভাবনা—ইহা সমর্থন করে। প্রত্যেকেই কুমারের ভগ্নী নহেন। অবশ্য বিবাদী পক্ষের সাক্ষিগণ বাদীর চেহারার সহিত কুমারের চেহারার সাদৃশ্য নাই, একথা বলিয়াছেন। রাণী ও তাঁহার ভাই সাদৃশ্যের কথা

অস্বীকার করিয়াছেন; এই রাণীর অস্বীকারের বিষয় এবং কুমারের তথাকথিত মৃত্যু সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে হইবে। সাক্ষিগণ কিরূপ বিশ্বাসযোগ্য, তাহারা কিরূপ পদস্থ, তাহার উপর ইহার মীমাংসা কিছুই নির্ভর করে না। শরীর ও মন সম্পর্কে বাদী ও বিবাদী পক্ষ যে সব বৈষম্য ও সামঞ্জস্যের কথা বলিয়াছেন, পরীক্ষায় যদি তাহা টিকে, বাদীর শরীরের চিহ্নাদি দ্বারা—যাহা একত্রিতভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে সম্ভব হয় না, যদি তাহা সমর্থিত হয়, মৃত্যুর কাহিনী যদি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে রাণী ও তাঁহার ভাইয়ের অস্বীকারে বাদীর কোন ক্ষতি হইবে না। ভাইয়ের সম্পর্কে রাণীর নিজস্ব কোন মত নাই।

ব্যবহার দ্বারা মন্তব্য প্রকাশ

সত্যভামা দেবী :—বাদী যখন প্রথমবার জয়দেবপুর গমন করেন, তখন এবং দ্বিতীয় বারের সময় ৭ই জুন পর্য্যন্ত সত্যভামা দেবী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন, একথা অস্বীকার করা হয় নাই। ৪ঠা মে আত্মপরিচয় প্রকাশের দিন তিনি উপস্থিত ছিলেন, ইহা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সাক্ষ্য।

তিনি বলিয়াছেন যে, ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে চক্কোরে তাঁহার নিজের বাড়ী দখলের পর সত্যভামা দেবী কাশী হইতে ফিরিয়া (তিনি কৃপাময়ী দেবীর সহিত কাশী গিয়াছিলেন) সাধারণতঃ তাঁহার বাড়ীতেই থাকিতেন। রায় সাহেব যিনি রাজ বাড়ীতে সপরিবারে বাস করিতেছিলেন, তিনি ইহা অস্বীকার করেন নাই যে, ১৯২১ সালে তিনি তাঁহার বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। এই ১৯২১ সালে একটী প্রয়োজনীয় বৎসর ফণীবাবু ও বাদীর প্রথম ও দ্বিতীয় বার জয়দেবপুর আগমনকালে তাঁহাকে ঐ বাড়ীতে দেখিয়াছেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, ভাগিনেয়গণ এবং অপরাপর সাক্ষিগণ বলিয়াছেন যে, এই বৃদ্ধা মহিলা বাদীকে তাহার নাতি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে জয়দেবপুর রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি বাদ দিয়া আমি তাহার আচরণের কথা বলিব। তিনি বাদীকে 'কোকা' বলিয়া ডাকিতেন (বাদী ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সঙ্গে একই ঘরে শয়ন করিতেন)। বাদী ঢাকা রওনা হইবার পরদিন তিনি তাহার নিকট চিঠি লিখেন (একজিবিট নং ৫৪)। ১৯২২ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় রাণীর নিকট চিঠি লিখেন, মিসেস ড্রামণ্ডকে তাহার নিকট পাঠাইবার জন্য তিনি

মিঃ ড্রামণ্ডকে চিঠি লিখেন, তদন্তের দরখাস্তে এক সঙ্গে স্বাক্ষর করেন, এবং তাহার মৃত্যু হইলে কুমারকে মুখাগ্নি করিতে বলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন বাদীর সঙ্গে (ঠাকুরমারা যেরূপ করেন সেইভাবে) তিনি রাজ-রাণী অভিনয় করেন। যদি এই সব কাহিনী সত্য না হইবে তাহা হইলে বিবাদী পক্ষ তিনি অন্ধ বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়াইতেন না। সত্যভামা দেবী অন্ধ বলিয়া বিবাদী পক্ষ যে ঐ সময় প্রচার করিতেছিলেন, তাহার অপর প্রমাণ এই যে, ঢাকার সিভিল সার্জ্জন লেঃ, কেঃ, ম্যাকলীভ (বর্ত্তমানে মৃত) দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করাইয়া তাহাকে ১৯২২ সালের ২০শে জুলাই একদিন সার্টিফিকেট লইতে হইয়াছে। এই সার্টিফিকেট অনুসারে দেখা যায় যে, তাহার বয়সের স্ত্রীলোকের পক্ষে দৃষ্টিশক্তি ভালই আছে। তিনি 'টেষ্টডট' পড়িতে পারিয়াছিলেন, লোকের চেহারা চিনিতে পারিতেন। সত্যভামার দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে যে সব যুক্তিতর্ক হইয়াছে তাহা এইজন্য ছেলেমী বলিয়া মনে হয় যে, ঠাকুরমাদের নাতিদিগকে চিনিতে হইলে যেন প্রখর দৃষ্টির দরকার হয়। বিবাদীপক্ষ এই যুক্তিও দেখাইয়াছেন যে, সত্যভামা দেবী দ্বিতীয় কুমারের মৃত্যু হইয়াছে, এই বিশ্বাসে ১৯১৩ সালে একটী উইল করিয়াছিলেন, তিনি সেই উইল পরিবর্ত্তন করেন নাই। কিন্তু তিনি যে উইল পরিবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন এবং অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ মারা যান, সেই সম্পর্কে প্রমাণ রহিয়াছে (বাদীপক্ষের ৪নং ও ৮৫২নং সাক্ষী) বলা হইয়াছে যে, তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর প্রভাবাধীনে ছিলেন। বিদেশে মৃত্যু হইবার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তিনি যে বাদীর জন্য জয়দেবপুর, তাঁহার স্বামীগৃহ ছাড়িয়া ঢাকায় একটী ছোট বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন এই সম্পর্কে কোন তর্ক নাই। তিনি যদি বাদীকে কুমার বলিয়া বিশ্বাস না করিবেন, তাহা হইলে কি তাঁহার ন্যায় একজন নিষ্ঠাবতী স্ত্রীলোক জাত নষ্ট হইবার বিপদ বরণ করিয়া লইতেন? জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর প্রভাব সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তৎসম্পর্কে আমার ধারণা এই যে, তিনি কোন চক্রান্তকারিণী স্ত্রীলোক নহেন। তিনি বাদীকে তাঁহার ভাই বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। সিভিল সার্জ্জনের সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য সাক্ষীদের উক্তি হইতে কিছুতেই আমার মনে হয় না যে সত্যভামা দেবীর বার্দ্ধক্য-জনিত জড়তা আসিয়াছিল; তাঁহার ঐ অবস্থা থাকিলে তিনি কিছুতেই মিসেস ড্রামণ্ডকে আসিতে বলিতেন না। তাঁহার পদমর্য্যাদা বিবেচনা করিয়া ভগ্নী তড়িন্ময়ী দেবীর অনুরোধের জন্য অস্বাভাবিক কিছুই নাই।

মামলার প্রথমাবস্থায় বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, তড়িন্ময়ী দেবী বাদীকে চিনিতে পারেন নাই এবং তাঁহাকে কুমার বলিয়াও

গ্রহণ করেন নাই, এবং তাঁহার স্বামী ব্রজবাবু বাদীকে একজন প্রতারক বলিয়া নোটিশ জারী করিয়াছেন। কোন পক্ষই তাঁহাকে ডাকেন নাই এবং কৌঁসুলী তাঁহার সওয়ালে তড়িন্ময়ী অথবা তাঁহার স্বামীর কথা উল্লেখ করেন নাই। কোর্টের বাহিরে ইঁহাদের উক্তির কোন মূল্য নাই কিন্তু এই ভগ্নী বাদীকে অস্বীকার করিয়াছেন ইহা একটি অদ্ভুত কথা। কারণ ৪নং বিবাদিনী তাঁহার বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, ভগ্নিগণ তাহাকে (বাদীকে) কুমার বলিয়া দাঁড করাইয়াছেন। ৩৭১ নং একজিবিটে এই মহিলাটী সাধুর জন্য ভগ্নীদিগকে দোষ দিয়াছেন ; মিঃ চৌধুরী ইহাও লক্ষ্য করেন নাই যে, নথীতে শুধু এই চিঠি ও এই বর্ণনাই নাই। মিঃ লিণ্ডসের ১৯২১ সালের ৯ই আগষ্ট তারিখের একখানা চিঠিও রহিয়াছে ঐ চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন— ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পরলোকগত দ্বিতীয় কুমারের ভগ্নিগণ এবং বাবু আনন্দ চন্দ্র রায় সাধুর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন (একজিবিট ৪৩৫নং। বাদী কর্ত্তৃক সত্যভামা দেবীর শবদাহের সময় তড়িন্ময়ী দেবী গিয়াছিলেন। বাদীকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সত্যভামা দেবীর শ্রাদ্ধে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন আমি ইহা বিশ্বাস করি—তদন্তের দরখাস্তে তিনি স্বাক্ষর করেন এই সম্পর্কেও কোন তর্ক নাই। ১৯২১ সালের মে মাসে তিনি জয়দেবপুর যাইয়া বাদীকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। বাদী যখন ঢাকায় ছিলেন তখন তিনি তথায় যাইতেন এবং তাহার পাতের ভুক্তাবশিষ্ট খাইতেন। তিনি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। তিনি ভাই ফোঁটা ও ভাই ছাতুতে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর উক্তির উপরই, শুধু ইহা নির্ভর করে না। তড়িন্ময়ী দেবীকে ঢাকায় সারদা গাঙ্গুলীর বাড়ীতে কোন বিবাহ উপলক্ষে বাদীর সহিত একা বদ্ধ ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। (বাদী পক্ষের ১০০৪—১০০৫—৯১৩নং সাক্ষী)।

সত্যভামা দেবীর মৃত্যুর পর তৃতীয় বিবাদী (দত্তক পুত্র) প্রপৌত্র হিসাবে তাহার ত্রিরাত্র শ্রাদ্ধ করেন। ঐ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনজন ভদ্রলোককে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাঁহারা তড়িন্ময়ী দেবীকে বাড়ীর ছাদে বাদীর পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। তাহারা শ্রাদ্ধ দেখিতেছিলেন (বাদীপক্ষের ১০০৪, ১০০৮, উভয়েই এই আদালতের উকীল)। এই মহিলাটী বাদীকে অস্বীকার করিবেন, এইরূপ মনে করা বৃথা। তিনি এই মামলায় সাক্ষ্য দিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার স্বামী ১৯২৫ সালে দত্তক নাকচ করিয়া দিবার জন্য এক মামলা আনিয়াছিলেন। তিনি কেন এই মামলা আনেন, তাহার কারণ সম্পর্কে গবেষণা করার কোন প্রয়োজন নাই, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে,

এই তড়িন্ময়ী দেবীর স্বামীকে সাক্ষীরূপে হাজির না করিবার উপর আমি কোন গুরুত্ব আরোপ করিতেছি না। কারণ দেখা যাইতেছে যে, **১৯১৩ সালের ২৭শে মে তিনি যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বাদীকে কুমার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।**

হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী (মৃত) :—ধানকোরার জমিদার। তাঁহার সম্পর্কিত ভ্রাতা দীনেশ বাবুর মা ও সত্যভামা দেবী সম্পর্কে ভগ্নী ছিলেন। হেমবাবু বাদীকে জ্ঞাতি বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন, অন্দর মহলে লইয়া যাইতেন, কোন অনুষ্ঠান হইলেই আমন্ত্রণ করিতেন এবং তিনি (বাদী) তাঁহাকে খুড়া বলিয়া ডাকিতেন হেমবাবু তাহাকে মেজকুমার বলিয়া ডাকিতেন। এই সমস্তই ১৯২১ সালে বাদী যখন ঢাকায় ছিলেন তখনকার কথা। (বাদী পক্ষের ২২০ ও ৪৭৩নং সাক্ষী)।

যাহারা মারা গিয়াছে, তাহাদের আচরণের ছোটখাট দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই ; এড্ুইন ফ্রেজার বাদীকে জয়দেবপুরে দেখিয়া যে কাঁদিয়াছিলেন এবং কুমারদেব শিক্ষক অনুকূল বোস (বাদী পক্ষের ৩১নং সাক্ষী) বাদীকে আরমানিটোলায় দেখিয়া যে আচরণ দেখাইয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করাও প্রায় নিস্প্রয়োজন।

এখন আমি দুইটি আকৃতির তুলনা করিয়া দেখিব, উভয়ই এক কি না— একটি আকৃতি জীবন্ত লোকের এবং অপরটি স্মৃতির রাজ্যের; অর্থাৎ বাদীর আকৃতির সহিত মেজকুমারের আকৃতির তুলনা করিব।

চেহারার তুলনা

(ক) ফটোগ্রাফ, (খ) জুতা প্রস্তুতকারক, দর্জ্জি প্রভৃতির লিখিত বিবরণ, (গ) অর্ডারী জুতা, জামা, (ঘ) বিতর্ক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে সকল কাগজপত্রে কুমারের আকৃতি বর্ণনা করা হইয়াছিল,—(এইক্ষেত্রে উহা হইতেছে বীমা কোম্পানীর ডাক্তারের রিপোর্ট (ঙ) বিতর্ক আরম্ভের পর কিন্তু উহা চরমে উঠিবার পূর্ব্বে, যে সকল কাগজপত্রে কুমারের আকৃতি বর্ণনা করা হইয়াছে, (চ) যাঁহারা কুমারকে চিনিত তাহাদের মৌখিক সাক্ষ্য—এই সকল বিষয় হইতে বুঝা যায়, কুমারের আকৃতি কিরূপ ছিল।

সত্যবাবু বলিয়াছেন, কোর্ট অব ওয়ার্ডস দুই তিন বৎসর ধরিয়া ইউরোপীয়ান দর্জ্জি এবং জুতা ও জিন প্রস্তুত কারক প্রভৃতির নিকট বিস্তৃত তদন্ত করিয়াছেন ; সত্যবাবুও ঐ সকল তদন্তে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং বিবাদী

পক্ষের কৌসুলী মিঃ চৌধুরী তদন্তের কাগজপত্র নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন; কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঐ সকল তদন্তে যাহা পাওয়া গিয়াছে, বিবাদী পক্ষ তাহার কোন বিষয় প্রমাণ করেন নাই। মিঃ চৌধুরী শুধু কুমারের পায়ের মাপ সম্পর্কে মিঃ এস, কে, ঘোষালকে প্রশ্ন করিয়াছেন। সওয়ালের সময় মিঃ চৌধুরী বলিয়াছেন যে, বাদীর পা দেখিয়া মনে হইয়াছিল তাঁহার জুতা বড়, তাই বাদীকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করিয়া ঘোষালকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তারপর আর একটি উল্লেখ-যোগ্য বিষয় এই যে, বীমার কাগজপত্রে মেজকুমারের চেহারায় যে সকল বর্ণনা আছে, বাদীই তাহার উপর নির্ভর করিয়াছেন—বিবাদীপক্ষ উহার উপর নির্ভর করেন নাই। বাদী ১৯২১ সালের ৪ঠা মে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন মিঃ নীডহ্যামের রিপোর্টে সত্যবাবু ঐ সংবাদ পান, কিন্তু তিনি ৬ই মের পূর্ব্বে ঐ সংবাদ পাইতে পারেন না। ঐ সংবাদ পাইয়াই সত্যবাবু মিঃ লেথব্রিজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, মেজকুমারের মৃত্যুর প্রমাণগুলি যেন সযত্নে রাখা হয়, তিনি মিঃ লেথব্রিজকে বীমার এভিডেভিট দিলেন এবং কুমারের মৃত্যুর প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ১৫ই মে তারিখের পূর্ব্বেই একজন ব্যারিষ্টার লইয়া দার্জ্জিলিং চলিয়া গেলেন। মিঃ লেথব্রিজ ১০ই মে তারিখে বীমা কোম্পানীর নিকট মূল কাগজপত্রের জন্য লিখেন, বীমা কোম্পানী মিঃ লেথব্রিজকে জানান যে, ঐ সকল কাগজপত্র স্কটল্যাণ্ড হইতে পাঠান হয় ও ও উহা ১৪-৭-২১ তারিখে রেভিনিউ বোর্ডে দেওয়া হয়। রেভিনিউ বোর্ড ঐ সকল কাগজপত্র ও মেডিকেল রিপোর্ট ১৫।৭।২১ তারিখে ফেরত পাঠাইয়া বলেন, উহা কোনও পক্ষের নিকট থাকিতে পারিবে না; উহা বীমা কোম্পানীর নিকট থাকিবে এবং প্রয়োজন মত উহা বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে আনান হইবে মামলা চলিবার সময় বিবাদী পক্ষ বীমা কোম্পানীর নিকট এই ছয়খানা কাগজ তলব করেন:—মৃত্যুর দুইখানি সার্টিফিকেট, সৎকারের দুইখানি সার্টিফিকেট এবং ঐ পরিচয়ের দুইখানি সার্টিফিকেট, তাঁহারা ডাক্তারী রিপোর্ট তলব করেন নাই। বাদীপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, এমন সময় ১৯৩৪ সালে বাদীপক্ষ ডাক্তারী রিপোর্ট তলব করেন এবং ১৯৩৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর উহা এডিনবরা হইতে আসে। বীমার কাগজ পত্রের মধ্যে যাহাতে কুমারের চেহারার বর্ণনাও আছে তাহা বাদীপক্ষ দাখিল করেন। কুমারের শব দাহ করা হইয়াছিল এই মর্ম্মে বিবাদী পক্ষ যে এভিডেভিট দাখিল করিয়াছেন, বাদী পক্ষ বলেন, তাহাতে বরং প্রমাণ হয় যে, যে দেহ দাহ করা হইয়াছিল, তাহা কুমারের দেহ নহে

কুমারের আকৃতি সম্পর্কে বাদীপক্ষ রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষেরও একখানা এভিডেভিট দাখিল করিয়াছেন ; মিঃ চৌধুরী প্রথমে বলিয়াছেন, তিনি ঐ এভিডেভিট মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন, কিন্তু পরে তাহারা ঐ সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেন নাই।

কুমার যে সকল পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, বাদীপক্ষ তাহার উপরও নির্ভর করিয়াছেন। বাদীপক্ষ যে পুরাতন জুতা ও পোষাক আদালতে দাখিল করিয়াছেন তাহা যে কুমারের—সেই সম্পর্কে কোনও বিতর্ক নাই। পরে আমি এই সম্পর্কে আলোচনা করিব। দর্জ্জি, জুতাপ্রস্তুতকারক প্রভৃতিদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছিল, বিবাদী পক্ষ তাহার প্রায় কোনওটির যে প্রমাণ করিতে চাহেন নাই তাহাও সত্য। ঐ সকল তথ্যের মধ্যে শুধু একটি বিষয়, অর্থাৎ কুমারের পায়ে ৬ নম্বর জুতা লাগিত—শুধু এই বিষয়টি তাঁহারা প্রমাণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু দেখা গেল বাদীর পায়েও ৬ নম্বরের জুতাই লাগে। বিবাদী পক্ষের কৌস্থলী বলিয়াছেন, বাদীর পা দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইয়াছিল, বাদীর পা বড়। তাই তাঁহারা ঐ সম্পর্কে বাদীকে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই, মিঃ ঘোষালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বিধবা স্ত্রীলোকেরা স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ তাহাদের স্বামীর জুতা, কোট ইত্যাদি যাহা রক্ষা করে, বিবাদী পক্ষ তাহার কিছুই আদালতে দাখিল করেন নাই। রাজবাড়ীর এক প্রকোষ্ঠে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের জিনিষপত্র এখনও রাখা হইয়াছে। কুমারদের স্ত্রীরা তাহা দেখিয়াছেন, সুতরাং মনুষ্যসুলভ মমত্ববোধে না হউক অন্ততঃ তাহা দেখিয়াও তাঁহারা তাঁহাদের স্বামীদের জিনিষপত্র ঐরূপে রক্ষা করিতে পারিতেন।

ইনসিওরেন্সের কাগজপত্রের কথা আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া আমি এখন ফটোগ্রাফ ও মৌখিক সাক্ষ্য আলোচনা করিব। ফটোগ্রাফের বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমি চেহারা সম্পর্কে উভয় পক্ষের বক্তব্য বিষয়গুলি বর্ণনা করিব ; তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, ফটোগ্রাফে কোন কোন বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এই বর্ণনা দিয়াছেন :—

তাঁহার নিজের সম্পর্কে বর্ণ—গৌর, চক্ষু—কটা, বিশেষ বিবরণ বলিতে পারেন না, চুল—কটা, ফিকে বাদামী। মেজকুমারের বর্ণ—গৌর, লালচে ও হলদে আভা আছে ; বর্ণ ফর্সা, গোলাপী আভা আছে ; চক্ষু—কটা, ফিকে, নীল, চুল—কটা, ফিকে, বাদামী।

বুদ্ধ,—বর্ণ,—মেজকুমারের মতই ফর্সা, তবে তাহার ন্যায় লালচে আভা নাই ; চক্ষু—কটা, নীল, চুল—কটা, মেজকুমারের নাক ছোটকুমার অপেক্ষা কালো। এক কথায় বলিতে গেলে, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর মতে মেজকুমারের শরীরের বর্ণ, চক্ষু ও চুল বাদীর ন্যায়। তাঁহার মতে মেজকুমার ও বাদী একই ব্যক্তি, সুতরাং তিনি শুধু যে সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন তাহা নয়, তিনি বাদীকে মেজকুমার বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী আরও বলেন, এখন বাদী একটু ময়লা হইয়াছেন, কিন্তু ১৯২১ সালে তাঁহার রং আরও ফর্সা ছিল, তিনি বলেন, নাকও ঠিক মেজকুমারের নাকের ন্যায়, যদিও কেহ কেহ বলে বাদীর নাক মেজকুমারের নাকের চেয়ে চ্যাপ্টা। তাহার মতে বাদীর নাক চ্যাপ্টা নয় ; তবে বাদী এখন মোটা হইয়াছেন, তাই নাকও মোটা হইয়াছে।

আকৃতি বিচারে তাঁহার সাক্ষ্য মূল্যহীন, কারণ তিনি বাদীকে কুমার বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে অন্য দুই জনের চেহারার তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা কাজে আসিবে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন, তাঁহার, মেজকুমারের ও ছোটকুমারের গায়ের রং একরূপ—উহা সাহেবী, অর্থাৎ ইংরাজদের গায়ের রং যেরূপ, তাঁহাদের গায়ের রংও সেইরূপ। তাহাদের চুল বাদামী রংও সেইরূপ। তাঁহাদের চুল বাদামী রংএর এবং চক্ষু কটা—বাঙ্গালীদের মত কালো নয়।

চক্ষু ও চুল বিশ্লেষণ

মামলার বিচারকালে এক সময়ে মিঃ চৌধুরী 'কটা' শব্দের অর্থ লইয়া তর্ক তুলিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার নিজের পক্ষের সাক্ষীই বাদীর চক্ষু এবং মধ্যমকুমারের চক্ষু একই রকমের 'কটা' বলিয়া বর্ণনা করে এবং তারপর যখন ইনসিওরেন্স ডাক্তারের রিপোর্টে দেখা যায় যে, মধ্যমকুমারের চক্ষু সেখানে 'ধূসর' বলিয়া লেখা আছে, তখনই বাদী পক্ষ কর্ত্তৃক কুমারের চক্ষুকে নীলবর্ণ বলিয়া সপ্রমাণ করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং বিবাদী পক্ষের মামলা সেখানেই শেষ হইয়া যায়। এ বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নাই।

বিবাদী পক্ষের সাক্ষী মিঃ এস, পি, ঘোষ (কমিশনে গৃহীত সাক্ষী), ১৯০- সালে সাক্ষ্যদানকালে মধ্যমকুমারের, তাঁহার ভগ্নীর জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর, ছোট কুমারের এবং বুদ্ধর চক্ষু 'কটা' রকমের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। চুলের এবং চক্ষুর সমালোচনাকালে আমি পুনরায় এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। সেই সমালোচনা হইতে বেশ বুঝা যাইবে,—চক্ষুর সম্বন্ধে বলিতে হইলে 'কটা' শব্দ

এবং 'করঞ্জা' শব্দ, একমাত্র কালো রং ব্যতীত, আর সকল রংএর সম্বন্ধেই বলা যায়। 'কটা' বা 'পিঙ্গলা' শব্দের 'নীলাভ' বা কোনও নির্দিষ্ট রং অর্থ নিষ্পন্ন করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে, পরে তাহা পরিত্যক্ত হইলেও, সে প্রকার প্রচেষ্টার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

চেহারা ও গায়ের রং

ইহা কোনও প্রকারেই স্বীকৃত বিষয় বলিয়া ধরা যায় না যে, মধ্যমকুমারের, ছোট কুমারের, বুদ্ধুর এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর চেহারা একই রকমের ছিল অর্থাৎ শরীরের রং অত্যন্ত ফরসা, বাদামী রঙের অথবা বাদামী আভার রং বিশিষ্ট চুল এবং কটা চক্ষু। এদেশে ঐ ধরণের অথবা অন্য প্রকারের ফর্সা রং সহজেই মানুষের নজরে পড়িলেও, বিবাদী পক্ষের সাক্ষী রমানাথ রায় (কমিশন সাক্ষী) মধ্যমকুমারের এবং বুদ্ধুর গায়ের রংএর মধ্যে কোনই সাদৃশ্য দেখিতে পান নাই। তিনি এ বিষয় একেবারেই অস্বীকার করিয়াছেন। বাদীর একজন সাক্ষী তিনজনের চেহারার সাদৃশ্যের বিষয় উল্লেখ করিলে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বর্ণান্ধ অর্থাৎ বর্ণবিচারে অক্ষম কি না? এই সাক্ষীর পর শত শত সাক্ষী তিনজনের গায়ের রং সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন। বিবাদী পক্ষের সাক্ষিগণও যখন রং একরূপ বলিয়া স্বীকার করেন এবং কেহই যখন তৎসম্বন্ধে অন্যমত প্রকাশ করেন না, তখন আর বর্ণ এক নহে বলিয়া কোনও প্রশ্ন উঠিতে পারে না; তখন তাহা স্বীকৃত বিষয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

বিবাদী পক্ষের সাক্ষী শরৎ বলিয়াছে,—বুদ্ধ, ছোটকুমার এবং মধ্যম কুমার —তিনজনের গায়ের রং একই ছিল। কিন্তু তিনজনের মধ্যে মধ্যমকুমার একটু বেশী ফর্সা ছিলেন। তিন জনের চুলের রংও একই রংও একই রকমের 'লালচে' ছিল। বাদীর চুলও 'লালচে' রংএর।

লেফট্‌নাণ্ট্‌ হোসেন বলেন,—বুদ্ধ দেখিতে অনেকটা মধ্যমকুমারের মতই ছিলেন। মধ্যমকুমারের বুদ্ধুর এবং ছোটকুমারের গায়ের রং, চক্ষু এবং চুল যে প্রকারের ছিল, বাঙ্গালীদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না, বাদী পক্ষের সাক্ষিগণ যে বলিয়াছেন, বাঙ্গালীর মধ্যে তেমন চেহারা দেখা যায় না,—লেফট্‌নাণ্ট্‌ হোসেনের সাক্ষ্যে ঐ উক্তি সমর্থিত হয় সাক্ষীরা হয় তো দেশবিদেশে ভ্রমণ করে নাই; কিন্তু লেফ্‌টনাণ্ট হোসেন তাহা করিয়াছেন, আর সাক্ষীরা বাঙ্গালীদের কথাই কহিতেছেন।

বিবাদী পক্ষের ৩৬নং সাক্ষী কলিমদ্দী বলে,—"আমি বুদ্ধুবাবুকে দেখিয়াছি ছোটকুমারের চেহারাও আমার মনে আছে। তাঁহাদের এবং মধ্যম কুমারের

চেহারা প্রায় একই রকমের ছিল। আমি আর কাহারও তেমন চেহারা দেখি নাই।

বিবাদী পক্ষের সাক্ষী এস, পি, ঘোষ কমিশনে সাক্ষ্য দান কালে বলেন,— "মধ্যমকুমার, ছোটকুমার, বুদ্ধ এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—সকলেরই চক্ষু, চুল এবং গায়ের রং একই রকমের ছিল।

বস্তুতঃ তাঁহাদের চেহারা এমনই অস্বাভাবিক ছিল যে, বিবাদী পক্ষের একজন সাক্ষী (৮২নং সাক্ষী) সত্যই বলিয়াছিলেন যে, মধ্যমকুমারকে সাহেব-সুবো'র মত দেখাইত, এদেশের লোকের মত দেখাইত না। আমার মনে হয় সাক্ষী সত্যই বলিয়াছিলেন।

বিবাদী পক্ষের সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং মামলার অবস্থা ও ঘটনা পরম্পরা হইতে বেশ বুঝা যায়, মধ্যমকুমারের সহিত বাদীর সাদৃশ্য আছে। বিবাদীপক্ষের সাক্ষের উপর নির্ভর করিয়াই আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, উভয়ের মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য আছে "প্রথম দৃষ্টিতে বাদীকে সেই ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়" (বিবাদী পক্ষের ৩৩৬নং সাক্ষী), আর একজন সাক্ষী (বিবাদী পক্ষের ২০১নং সাক্ষী) বলিয়াছেন,—"বাদী যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, তবে আমি তাঁহাকে মধ্যমকুমার বলিয়া বিশ্বাস করিব।" আর একজন সাক্ষী (বিবাদী পক্ষের ৩৮৬নং সাক্ষী) বলেন—'খুব নিকটে যাইয়া ১৫।২০ মিনিটকাল বাদীকে দেখিবার পর আমার মনে হইল,—জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এবং অপর সকলে ভুল করিয়াছেন।" সুকুমারী দেবী (বিবাদীপক্ষের ২৮০নং সাক্ষী) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি করিয়া নাক এমন চওড়া হইল ?"

এক্ষেত্রে এই ধরণের উক্তি আর বাহুল্যভাবে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সাক্ষীদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রকারের উক্তিতে এমন এক বিষয়ের আভাষ দেওয়া হইয়াছিল যে, সেরূপ আভাস পাওয়া না গেলে ঐ সকল উক্তি উদ্ধৃত করিবার কোনই প্রয়োজন হইত না।

বাদী ও মেজকুমারের পার্থক্যের সমালোচনা

বাদীর এবং মধ্যম কুমারের মধ্যে বিবাদীগণ যে পার্থক্যের কথা কহিয়াছেন প্রথমে অতুলবাবুর জবানবন্দী কালে তাহার উল্লেখ হইয়াছিল। অন্য লোকে যে ভাবে কুমারকে জানিত, অতুলবাবুও ঠিক সেই ভাবেই কুমারকে চিনিতেন। অতুলবাবু মধ্যমকুমারের এবং বাদীর মধ্যে যে সকল পার্থক্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, নিম্নের তপশীলে তাহা বিবৃত হইল :—

মধ্যম কুমারের নাক—পাতলা এবং চোখা; কিন্তু বাদীর নাক চ্যাপ্টা, মোটা।

মধ্যমকুমারের চুল বাদামী রঙের, কিন্তু বাদীর চুল কালো।

মধ্যম কুমারের চক্ষু বড, টানা, ঈষৎ নীলাভ—সাহেবদের মত, কিন্তু বাদীর চক্ষু ছোট, গোল এবং ফ্যাকাসে।

মধ্যমকুমারের গায়ের রং লাল্‌চে—সাহেবদের গায়ের রঙ্গের মত; কিন্তু বাদীর গায়ের রং সাদা।

মধ্যমকুমারের ঠোঁট পাতলা; কিন্তু বাদীর ঠোঁট মোটা ও ভারী।

মধ্যমকুমারের গোঁফ মোটা, বাদামী রং, এবং কাঁন্তিবৰ্দ্ধক আটার মত সামগ্রীর দ্বারা একস্থানে আটা থাকিত; কিন্তু বাদীব গোঁফ পাতলা।

মধ্যমকুমার হেলিয়া ঢুলিয়া চলিতেন, কিন্তু বাদীর গমনভঙ্গী সাধারণ মানুষের ন্যায়। বাদী মধ্যমকুমারের অপেক্ষা বেশী লম্বা।

মধ্যমকুমারের বুকে চুল ছিল না; কিন্তু বাদীর বুক চুলে ভরা।

মধ্যমকুমারের কপাল সমতল ছিল, কিন্তু বাদীর কপাল উঁচু।

মধ্যমকুমারের চোখের ভ্রূ দুইটী মোটা—দেখিতে যেন তুলিতে আঁকা। কিন্তু বাদীর ভ্রূ পাতলা এবং চুল শূন্য।

১৯৩৩ সালের ৮ই মার্চ্চ উক্ত বর্ণনা দেওয়া হয়। এক মিঃ এস, পি, ঘোষ ছাড়া বাদীকে সনাক্ত করিবার মত আর কোনও সাক্ষীর সাক্ষ্য ইহার পূর্ব্বে গ্রহণ করা হয় নাই। অতুলবাবুর অপেক্ষা অথবা অতুলবাবুর মতই সনাক্ত করণ বিষয়ে মিঃ ঘোষের যোগ্যতা থাকিলেও বিবাদীগণ তাঁহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কোনও বিষয় প্রমাণ করিবার প্রয়াস পান নাই।

কমিশনে আর আর যে সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাঁহারা মধ্যম কুমারের চেহারার কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের মুখে শৈবলিনী দেবী জেরার মুখের পার্থক্য সম্বন্ধে বলেন সামান্য কিছু বলিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশিত পার্থক্যের বিষয় এই—দ্বিতীয় কুমারের চক্ষু নীলাভ, বুদ্ধুর চক্ষুও নীলাভ, বাদীর চক্ষুর রং সাদা, দ্বিতীয় কুমারের গায়ের রং পীত, বুদ্ধুর রং খব ফরসা, বাদীর রং রক্তাভ। দ্বিতীয় কুমারের চুল কটা, সুন্দর, পাট করা এবং মসৃণ, বুদ্ধুর চুল কটা, বাদীর চুল অপেক্ষাকৃত কম লাল, মোটা, খাড়াখাড়া এবং রুক্ষ।

লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল পুলী তাঁহার সাক্ষ্যে বড় কুমারের বর্ণনায় বলিয়াছেন—

বড়কুমারের মুখাবয়ব ছিল উল্লেখযোগ্য। একদিকে মোচড়ান, সাক্ষীর মনে হয়, ডান দিকেই মোচড়ান ছিল। চক্ষু দুইটি ছিল অদ্ভুত, একটু টেরা,

দুই চক্ষের দৃষ্টি একদিকে ছিল না, দেখিতে লম্বা ছিল। ৫ ফুট ৯ কি ১০ ইঞ্চি ছিল তাহার দেহের উচ্চতা।

দ্বিতীয় কুমার সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন :—

দ্বিতীয় কুমার ততটা লম্বা ছিল না; তবে চেহারার বৈশিষ্ট্য ছিল এবং দেখিতে ছিল স্বতন্ত্র রকমের। বাঙ্গালীদের মধ্যে ওরূপ ফরসা রং সচরাচর দেখা যায় না। সামান্য রক্তাভ ছিল, কি না সন্দেহ, চক্ষু নীলাভ ডিম্বাকৃতি, মুখ এবং চোখা নাক ছিল চেহারা খুবই সুন্দর ছিল।

তৃতীয় কুমার সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন :—দ্বিতীয় কুমারের মতই তৃতীয় কুমারের গায়ের রংও অত্যন্ত ফর্সা ছিল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত খাট এবং বলিষ্ঠ ছিল। বাদীকে উক্ত সাক্ষী আদালতে দেখিয়া বলিয়াছেন, তাহার চুলের রং গাঢ় বাদামী, গায়ের রং সম্পূর্ণ পৃথক, চক্ষুর রংও সম্পূর্ণ পৃথক, নাকের গঠন স্বতন্ত্র, চক্ষু কটা, কি রকম একটা সবুজ আভা আছে তিনি বলেন যে, বাদী এবং কুমার দেখিতে প্রায় একই রকম মোটা এবং তাহাদের উভয়ের দেহের উচ্চতা প্রায় এক। এতদ্ব্যতীত উভয়ের চেহারার মধ্যে তিনি আর কোন সামঞ্জস্য দেখিতে পান না।

দ্বিতীয় কুমারের কথা লেফটেন্যান্ট কর্ণেল পুলীর কিছু মনে নাই, আমি এই কথা ধরিয়া লইয়া তাহার সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করিতেছি না। তিনি যে, চেহারার পার্থক্য সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা অনুধাবন যোগ্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাঁহাকে এমন সব কথা বলা হইয়াছে, সত্যই যাহা তাঁহার স্মরণে নাই। কাজেই সন্দেহ হয়, দ্বিতীয় কুমারের সম্বন্ধে লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল পুলীর সত্যই সকল কথা স্মরণ আছে কি না। মিঃ চৌধুরী তাঁহার পক্ষে মামলা আরম্ভ করিবার সময় চেহারার পার্থক্য প্রমাণে এই মোটা চেহারার উপর বিশেষ জোর দেন।

ইহার পর জ্যোতির্ময়ী দেবীকে বাদী ও দ্বিতীয় কুমারের চেহারার পার্থক্য সম্বন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়। বিবাদী পক্ষ তাহাকে বলেন যে, বাদীর চুল গাঢ় বাদামী বর্ণের, দ্বিতীয় কুমারের চুলের রং ইহা অপেক্ষা হালকা বাদামী রংয়ের ছিল। বাদীর নাক মোটা, দ্বিতীয় কুমারের নাক চোখা উভয়ের নাসারন্ধ্র পৃথক কুমারের চক্ষু নীলাভ ছিল। উভয়ের চক্ষুর গড়ন ভিন্ন দ্বিতীয় কুমারের চক্ষু আরও বড় ছিল উভয়ের কান পৃথক ধরণের, দ্বিতীয় কুমারের গোঁফ বেশ ঘন ছিল এবং অগ্রভাগ বাঁকানো ছিল। কুমারের চক্ষুর পাতার লোম ধূসর বর্ণের ছিল এবং তাহার মুখের রং ছিল ফরসা, তবে রোদে পোড়া বলিয়া সামান্য রক্তাভ।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী অস্বীকার করেন যে, কুমারের চোখ নীলাভ ছিল, যে যে স্থানে কুমারের চেহারার সহিত বাদীর চেহারার পার্থক্য দেখান হইয়াছে, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সেই সকল পার্থক্যের কথাও অস্বীকার করেন। গায়ের রং সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, বাদীর গায়ের রংয়ের মতই কুমারের গায়ের রং ছিল। বাদীও রোদে পোড়া হইয়াছিলেন কি না, তিনি জানেন না, এবং দ্বিতীয় কুমার সব সময় না হইলেও কখনও কখনও গোঁফের অগ্রভাগ বাঁকাইয়া রাখিত। বাদী কখনও রোদেপোড়া হইয়াছিলেন কি না এই প্রশ্ন করিবার কারণ বুঝা মুস্কিল। কুমারের মুখের মত বাদীর মুখের রংও ফর্সা এবং রক্তাভ বোধ হয় এই রংয়ের মিল দেখিয়া বিবাদী পক্ষ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, রোদেপোড়া হওয়ায় কুমারের মুখের রং রক্তাভ হইয়াছিল; কিন্তু বাদীর মুখের রং স্বাভাবিকই রক্তাভ।

এই মামলায় প্রারম্ভে মিঃ চৌধুরী বলিয়াছেন:—বাদীকে বাঙ্গালীদের মধ্যে বেশ ফর্সা বলা যায়। দ্বিতীয় কুমারের রং রক্তাভ, গায়ের রং পীতাভ, মুখ রোদেপোড়—কাজেই রক্তাভ দুইজনের চক্ষুই কালো নহে; তবে কুমারের চক্ষু কটা। দুইয়ের চুলই বাদামী, তবে, আভা পৃথক।

মিঃ চৌধুরী বলেন, আমাদের হইল এই যে, কুমারের চেহারা আরও সুন্দর ছিল। বেশ চোখা চেহারা, চোখা নাক, বড় বড় চোখ। কুমারকে দেখিয়াই মনে হইত যে তিনি একজন ভদ্রলোক। বাদীকে দেখিয়া মনে হয় যে, সে একজন স্থূলকায় পালোয়ান। তাহাকে দেখিয়া একজন ভদ্রলোক বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয় না।"

মেজরাণীর সাক্ষ্য

মেজরাণী দ্বিতীয় কুমারের চেহারা সম্পর্কে বলিয়াছেন:—

দ্বিতীয় কুমারের গায়ের রং ছিল ফর্সা, ঈষৎ পীতাভ। কেহ রক্তাভ বলিলে ভুল বলা হইবে। তাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল,—আপনার স্বামীর মুখের রং কেমন ছিল, আপনি বলিতে পারেন?

তিনি উত্তর করেন,—রোদেপোড়া।

আদালতকে লক্ষ্য করিয়া তখন বলা হয়,—রক্তাভ অর্থাৎ রোদে পুড়িলে যেমন হয়। নাক—টিকল—অর্থাৎ সরু এবং সুগঠিত।

চক্ষু—বড়, ভাসা (কোটরগত নয়) টানা, নীলাভ। চুল—রক্তাভ। গোঁফ—লালচে, অর্থাৎ বাদামী। চোখের ভ্রূ—লালচে অর্থাৎ বাদামী লম্বা সরু, অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে তুলিতে আঁকা। কপাল—দস্তুরমত (উঁচু নয়)। ঠোঁট—পাতলা। কাণ—দস্তুরমত (বড় নয়)

বক্ষ—মাঝখানে সামান্য কয়েক গাছি লাল লোম ভিন্ন আর লোম নাই ;

চেহারার পার্থক্য সম্বন্ধে যাহা ফটোতে ধরা যাইবে না, আমি সেই, সম্বন্ধে—এখন সিদ্ধান্ত করিব। ফটোগ্রাফিতে রং ধরা যায় না।

বয়স—অদ্যাবধি মেজকুমার জীবিত থাকিলে ১৯৩৬ সালের ২৮শে জুলাই তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর হইত ; বাদীকেও ঐ বয়সে মনে হয়। উচ্চতা—বাদার উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। কোর্টে আমার সামনে জুতা বাদে বাদীর উচ্চতা সম্পর্কিত মাপ লওয়া হইয়াছিল।

১৯০৫ সালের ২রা এপ্রিল মেজকুমারের জীবন বীমার জন্য ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ডাক্তার আর্নল্ড ক্যাডে যে মাপ লইয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, (এক জিবিট নং ২৩০)। উক্ত দিবস মেজকুমার ২০ বৎসর ৮ মাস ৫ দিন ছিল। ১৮৮৪ সালের ২৮শে জুলাই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখন বিচার্য্য বিষয় এই যে অদ্যকার তারিখে তিনি ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি হইতে পারেন কি না ?

বিবাদী পক্ষ ইচ্ছা করিয়া ডাক্তার আর্নল্ড ক্যাডের মাপ নেওয়া সম্পর্কিত রিপোর্ট উপস্থিত করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন যে, ১৯০৫ সালের কুমার এবং অদ্যকার বাদীর উচ্চতার মধ্যে পার্থক্য আছে, বাদী নিজেও মামলার প্রথমেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

মেজকুমার কত বৎসর পর্য্যন্ত বাড়িয়াছেন—এই প্রশ্ন মিঃ চৌধুরী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া বাদীপক্ষের ৯নং সাক্ষী যতীন্দ্রকে (বিল্লু) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই প্রশ্ন একজন চাষী সাক্ষীকেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। কত বৎসর পর্য্যন্ত তিনি বাড়িয়াছেন ? জবাবগুলি তাঁহার অনুকূলে যায় নাই !

কোন বয়স পর্য্যন্ত লোকে বাড়িতে পারে—এই সম্পর্কে বাদীপক্ষে দুইজন বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। বিবাদী পক্ষের বিশেষজ্ঞগণের সাক্ষ্যও গৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহারা কেহই এই প্রশ্ন সম্পর্কে কিছুই বলেন নাই। তাহা হইলে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, সাধারণ প্রশ্ন গুলি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের কোন মতদ্বৈধ হয় নাই। কুমারের তথাকথিত মৃত্যু সম্পর্কিত ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময় লেঃ কর্ণেল মার্কগিল ক্রাইষ্ট এম-এ, এম-ডি, (এডিনবরা) ডি এস সি (এডিনবরা), এম আর সি-পি (লণ্ডন), আই-এম এস (অবসর প্রাপ্ত) এর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে উল্লেখ করিব। কবে তিনি ৮ বৎসর কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শরীরতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মানুষের আকৃতি শরীরতত্ত্বের

একটা জ্ঞাতব্য বিষয়। এই দেশে একজন লোক ২৫ বৎসব পর্য্যন্ত এবং ২০।২১ বৎসর বয়সে ৫ ফুট লম্বা হয় ও ২৫ বৎসর বয়সে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা হইতে পারে। উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি হইতে সোয়া ছয় ইঞ্চি পয্যন্ত বাড়িতে পারে। শরীরের কয়েকটা হাড় পূর্ণ হইলেই বাড়িবার সীমা স্থির হইয়া যায়। উরুতে অস্থির তিনটি কেন্দ্র আছে, ঐগুলি হাড়ে পরিণত হওয়া পয্যন্ত প্রসারিত হইতে থাকে, উহা প্রসারিত হইলেই বাড়্তি বন্ধ হইয়া যায়। ইহা বলা হইয়াছে যে, ইংলণ্ডে ২০ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর পয্যন্ত এক চতুর্থাংশ ইঞ্চি উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন রকম বাড়ে। উচ্চতা সম্পর্কে ব্যাডলফ মার্টিনের একখানি বই আছে।

ডাঃ ব্রাডলে বি-এ, এম-ডি, বি-এইচ-এম (ক্যানাডা)—ইনি পি, এণ্ড ও এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্টীম-নেভিগেশন কোম্পানীর চীফ মেডিক্যাল অফিসার ও রয়েল সোসাইটি অব-ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ফেলো। তিনি এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ১২ হইতে ২৯ বৎসর বয়স পয্যন্ত উচ্চতা খুব বাড়ে এবং ২২ অথবা ২৩ বৎসর বয়সে উহা বন্ধ হইয়া যায়। তবে ইহার ব্যতিক্রমও আছে ইংলণ্ড। আয়র্লণ্ড, স্কটল্যাণ্ডের লোক অন্যস্থানে যাইলে তাহারা ২০।২৫ বৎসর বয়স পয্যন্ত বাড়ে তিনি বলিয়াছেন যে, ১২ হইতে ২১ পর্য্যন্ত খুব বাড়ে, তবে নৃ-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে লোক ৩০ বৎসর পয্যন্ত বাড়ে। সাক্ষী মনে করেন যে সচরাচর ৩০ বৎসর বয়স পয্যন্ত লোক বাড়ে না, ২৪ বৎসর বয়স পয্যন্ত লম্বা হাড় বাড়ে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে কুমার শিকার করিত, ঘোড়া দৌড়াইত, গাড়ী চালাইত, তাহার শ্রেণীর লোক ২১ হইতে ২৫ বৎসর বয়স পয্যন্ত বাড়তে পারে। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার ছেলের ২০ বৎসর বয়সের সময় পুত্র অপেক্ষা তিনি লম্বা ছিলেন। বর্ত্তমান সময় তাঁহার পুত্রের বয়স ২৫ বৎসর। বর্ত্তমানে তাঁহার পুত্র তাঁহার অপেক্ষা আধ ইঞ্চি বেশী লম্বা, তাহার ওজনও তাঁহার অপেক্ষা বেশী। তাঁহার সাক্ষ্য দেওয়ার তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পুত্রের ওজন লইয়াছিলেন। সাক্ষী ইনসিওরেন্স ডাক্তার হিসাবে বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তিনি ম্যানুফেকচার্স লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর চেকারীর কাজ করিয়াছেন। ওজন সম্পর্কেও তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। কারণ ইনসিওরেন্স ডাক্তারদের রেকর্ড তাহাকে দেখিতে হইয়াছে। তাহাকে পুনরায় বীমা করা সম্পর্কিত কাগজপত্র এবং পুরাণ আবেদনের সহিত নূতন আবেদন মিলাইয়া দেখিতে হইয়াছিল।

শরীরের উচ্চতা বিষয়ক প্রশ্ন

দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন,—ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ডাক্তারেরা যে প্রকার মাপ লন, তাহা বিজ্ঞানসম্মত অর্থাৎ সঠিক, হওয়া উচিত। কিন্তু তিনি দেখিয়াছেন যে, সে সকল মাপ সব সময় ঠিক হয় না। কেননা অনেক ডাক্তার আছেন, যাঁহাদের মাপ গ্রহণাদির সুযোগ সুবিধা নাই। সে ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে সেই আদিম প্রথারই আশ্রয় লইতে হয়; যেমন দেওয়ালের নিকট দাঁড় করাইয়া, মাথার উপরকার দেওয়ালে দাগ দেওয়া, দেওয়াল সকল ক্ষেত্রে ঠিক সমান্তরাল নাও হইতে পারে এই প্রকারে মাপ গ্রহণের কথা, বিবাদী পক্ষের কৌশুলী আর দাস নামক জনৈক ইনসিওরেন্স এজেণ্টের মুখ দিয়া বলাইয়া লইয়াছিলেন (বাদীর ৯৭৫নং সাক্ষী) অন্য যে সকল ক্ষেত্রে উচ্চতার বাড়্তি লক্ষিত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন (২৬৭, ২৫০, ২৭০ হইতে ২৭২নং একজিবিট); আমি সে সকল দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিতেছি না।

এই বিষয় সম্পর্কে আমি দুইজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিতেছি তাঁহাদের উক্তি বহুদর্শিতামূলক; সে সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। মিঃ চৌধুরী আমাকে লায়নের মেডিকেল জুরিস প্রুডেন্স গ্রন্থের (১৯২১, সপ্তম সংস্করণ) ৪৬ পৃষ্ঠায় উচ্চতা ও ওজন সম্পর্কিত এক তালিকা দেখান। তাহাতে উচ্চতা, ওজন এবং বয়স প্রভৃতির আনুপাতিক পরিমাণ এবং গড়া হিসাবে তাঁহাদের ক্রমের একটা ধারা ইংরেজী প্রথা মতে দেওয়া আছে। যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা চলিয়াছে, তদালোচনা সম্পর্কে এই তালিকার কোনও প্রয়োজন নাই কারণ, উক্ত গ্রন্থের নবম সংস্করণে (১৯৩৫, ৯ম সংস্করণ) পূর্ব্বোক্ত তালিকা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রকারে ইহা খুবই সম্ভব এবং সত্য বলিয়া মনে হয় যে, কুমারের বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার দেহের উচ্চতা ক্রমশঃ বাড়িতে ছিল। কেন না, বাদীর উচ্চতা যদি ঠিকই ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি হইত, তাহা হইলে উক্ত ঘটনাকে বাদীর বিরুদ্ধ বলিয়া সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস দেখা যাইত, কিন্তু এ প্রকারের সম্ভাবনা ছাড়াও এই প্রসঙ্গে আরও দুইটী বিবেচনার বিষয় আছে তাহার একটা এই,—কয়েকজন ছাড়া, বিবাদীপক্ষের কোনও সাক্ষীই এ কথা বলেন নাই যে, ১৯২১ সালে তাঁহারা যখন বাদীকে দেখিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের চোখে বাদীকে একটু লম্বা দেখাইতেছিল। অতুলবাবু (কমিশনে সাক্ষ্য দেন) বলেন,—সম্ভবতঃ বাদী অপেক্ষাকৃত লম্বা; তিনি

সে সম্পর্কে এক লম্বা তালিকা দিয়াছেন। ফণীবাবুও বলিয়াছেন,—বাদী অপেক্ষাকৃত লম্বা, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করা যায় না।

এখন দেখা যাউক, অন্যান্য সাক্ষী বাদীর উচ্চতা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। বিবাদী পক্ষের ১৪০নং সাক্ষী বলিয়াছেন,—"বাদী সামান্য একটু লম্বা। কিন্তু আমি বলিতেছি না যে, কেবল এই একই বিষয়ে বাদীর সহিত কুমারের স্বাতন্ত্র্য।" বিবাদী পক্ষের ১৫নং সাক্ষী বলেন,—"আমার অনুমান হয়, বাদী যেন সামান্য একটু লম্বা। কিন্তু পার্থক্য এমন বেশী কিছু নয় যে, দুইজনকে এক বলিয়া বুঝা যায় না।" বিবাদী পক্ষের ৬১নং সাক্ষী একজন মাহুত। সে কুমারের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিত। উক্ত মাহুত সাক্ষী বিশেষভাবে বলে,—"কেবল উচ্চতায় সামান্য তারতম্য দেখিয়া কাহারও বলিবার সাধ্য নেই যে, বাদী মধ্যম কুমার নয়।" ডাক্তার আশুতোষ এবং রায় সাহেব যোগেন্ বাবু এই বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলেন নাই। সত্যেন্দ্রবাবু (যিনি ১৯৩৫ সালে আদালতে বাদীকে দেখিয়াছিলেন) বলেন,—"আমি বাদীকে অপেক্ষাকৃত লম্বা বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম কিন্তু আকৃতির পার্থক্যই বড কথা নয়।" সত্যবাবু এতদ্বারা বুঝাইতে চান যে, পার্থক্য যে ছিল, সে কথাও নিশ্চয় বলা যায় না।

কর্ণেল পুলী মনে করেন যে, বাদীর এবং কুমারের দেহের উচ্চতা একই প্রকারের, তিনি উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কোনও নির্দ্দেশ দেন না। ১৯০৯ সালে কুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। যদি আদৌ কুমারকে তিনি দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮ই এপ্রিলের মধ্যে কুমারের সহিত তাঁহার দেখা হওয়া সম্ভব। মিঃ র‍্যাঙ্কিনের ধারণা, বাদীর এবং কুমারের দেহের উচ্চতা প্রায় একই প্রকারের। এ সম্বন্ধে বিবাদী পক্ষের জনৈক সাক্ষীর উক্তি বিশেষ কৌতুহলপ্রদ। সেই সাক্ষী বলে,—বাদী সামান্য একটু লম্বা; কি করিয়া বাদী বেশী লম্বা হইবে? বিবাদী পক্ষের আর এক সাক্ষী বলে,—বাদী তিন চারি ইঞ্চি বেশী লম্বা। বাদা এত লম্বা যে, দেখিলেই বুঝা যায়, বাদী সে লোক নয়। এই দুই সাক্ষীর উক্তি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। অতুলবাবুও —'হয় তো', 'সম্ভবত' বাদ দিয়া আর বেশী কিছু বলিতে পারেন নাই।
১৯০৫ সালের ২রা এপ্রিল তারিখের বয়সের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিশেষজ্ঞগণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ ঐ সময় পর্য্যন্তও কুমারের দেহের 'বড়' হওয়া বন্ধ হয় নাই। মিঃ র‍্যাঙ্কিনের সাক্ষ্য, এবং কুমারকে যাঁহারা ভালভাবে জানিতেন—এই বিষয়ে প্রশ্নে তাঁহাদের নিরুত্তর এবং আলোচ্য

বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

পোষাক প্রস্তুতকারক দর্জ্জির কথা

ইংরেজ দর্জ্জির দোকানে কুমারের দেহের মাপের জন্য বহু অনুসন্ধান হইয়াছিল। সত্যবাবু এই প্রকার অনুসন্ধানের বিষয় স্বীকার করিয়া বলেন, —সেই অনুসন্ধানের ফলাফল বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলীর নিকট হাজির করা হইয়াছিল। তাহা হইলে কৌঁসুলী নিশ্চয়ই ঐ সকল মাপের মধ্য হইতে পায়ের জুতার ৬ ইঞ্চি মাপ পান। কিন্তু আমি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যে ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা এই,—ঐরূপ সন্ধান অবশ্যই হইয়াছিল; তাহার ফলও যাহা হইয়াছিল, মিঃ চৌধুরীর কথায়ই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সত্যবাবু তাহা অস্বীকার করিয়া কিছু বলেন নাই, দর্জ্জিরা যখন জামা কাপড়ের অর্ডার লয়, তখন তাহারা সম্পূর্ণ উচ্চতার কথা লিখিয়া থাকে। কিন্তু তাহা এখন পাওয়া যাইতেছে না।

দর্জ্জির একখানি বিল বিবাদী পক্ষ দাখিল করিয়াছিলেন। তাহাতে ১৯০৬ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখ ছিল। (একজিবিট ২১১) ঐ বিল কলিকাতার মেসার্স ফেপস্ কোম্পানীর বিল। উহা একখানি যৌথ বিল বলা যাইতে পারে। বিলখানি বড় কুমারের নামীয় হইলেও ঐ বিল যে কেবল বড় কুমারের জিনিষের মূল্য বাবদই হইয়াছিল, তাহা নহে; পরন্তু ঐ বিল, অন্যান্য কুমারের এবং সম্ভবতঃ রাজপরিবারের অন্য কাহারও জন্য অডারী জিনিষের মূল্য বাবদ হইয়াছিল। কিন্তু বিল হইতে সে সকল কথা স্পষ্ট বুঝা যায় না। যাহা হউন, ঘটনা পরম্পরা বিবেচনা করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মেসার্স ফেলপস এবং মেসার্স হারমান মধ্যম কুমারের জন্য কিছু কাপড় চোপড় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মধ্যম রাণী মধ্যম কুমারের কতকগুলি কাপড় বৃদ্ধকে দিয়াছিলেন, তাহা অবিসম্বাদিত আদালতে ঐ সকল কাপড় চোপড়ের কতকগুলি উপস্থিত করা হইয়াছিল।

মেজ রাণী ঐ সকল বিষয় অস্বীকার করেন নাই। আদালতে যে সকল কাপড় চোপড় দাখিল করা হইয়াছিল, তাহা যে মধ্যম কুমারের নয়, রাণী অথবা অন্য কোনও সাক্ষী তাহা বলেন নাই। আমি সকল কাপড় চোপড় দেখিয়াছি। সেগুলিতে পুরাতন রেশম দ্বারা প্রস্তুতকারী দর্জ্জির নাম প্রত্যেক কাপড়ে বোনা আছে। ঐ সকল কাপড়-চোপড়ের মধ্যে শিকারকালে পরিবার জন্য একটি ভেলভেটের জামা, আর একটি শিকারের কোট এবং জাকজমকপূর্ণ

একটি 'দরবার-পোষাক' ছিল। ঐ পোষাকের জরোয়া কাজ আজি পর্য্যন্ত চাকচিক্যপূর্ণ রহিয়াছে। (২৮নং, ২৬নং, ২১নং একজিবিট)

একজিবিট নং ২১—একটি দরবার কোট একজিবিট নং ২২—দুইটি ট্রাউজার। পীতবর্ণের দুইটি শিকার কোটের ন্যায় উহাতেও সূচীকার্য্য ছিল। প্রত্যেকটির উপরই 'হান্মান এণ্ড কোং' এবং 'রমেন্দ্রনারায়ণ রায়' নাম লেখা—ছিল। জামার উপরে তারিখ ছিল—২৭।১।১৯০৯ (একজিবিট নং ২৭—তৃতীয় শিকার ফটো) ।

উহাতেও হাম্যান এণ্ড কোম্পানীর এবং কুমারের নাম। উহার তারিখ ২০-১-১৯০৯। সালে লর্ড কিচেনারের আগমন উপলক্ষ করিয়াই ঐ পোষাক প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তবে আমি সে সম্বন্ধে কোনও জল্পনা কল্পনা করিব না, অথবা জামার উপরকার কোম্পানীর নামও আমি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিব না, তবে কাপড়গুলি যে মধ্যমকুমারের পুরাতন কাপড়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য যেগুলির নাম করা হয় নাই, তাহাও যে মধ্যম কুমারের সে বিষয়েও কেহ অন্যমত প্রকাশ করেন নাই।

কিন্তু মিঃ চৌধুরী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে ঐ কাপড়চোপড় সম্বন্ধে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, বাদীর গায়ে ঐগুলি ঠিকভাবে লাগাইবার জন্য কাটছাঁট ও অদলবদল করিয়া ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছিল কিনা? আমি নিজে ঐ সকল কাপড়চোপড় বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছি। কিন্তু আমি ইহাতে কাট ছাঁটের বা অদলবদলের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। বিবাদীপক্ষের আইনজীবী, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে সন্দেহের প্রশ্ন করিলেও, আমার মনে কাট ছাঁটের বা কোনরকম অদল বদলের সন্দেহ উদয় হয় নাই অথবা সেরূপ কিছু আমার চখে পড়ে নাই। কাপড়গুলি যে মধ্যম কুমারের, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ আসিতে পারে না।

পোষাক কার

কলিকাতা থাকাকালে বাদী দরবারের পোষাক পরিয়া তাহার এক ফটো তুলিয়াছিলেন। (একজিবিট ৩ সেই ফটো)। বাদী মধ্যম কুমারের শিকারের কোট পরিয়াও ফটো গ্রহণ করিয়াছিলেন (২৪নং একজিবিটে) সেই ফটো প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দৃঢ়তা সহকারে বলিয়াছেন যে, ইহা মধ্যম কুমারেরই সেই দরবারের পোষাক এবং শিকারের পোষাক। বিবাদী পক্ষের সওয়াল জবাবে ইহা প্রদর্শনের আদৌ চেষ্টা হয় নাই যে, প্রদর্শিত পোষাক পরিচ্ছদ সে পোষাক নয়। বাদীর গায়ে ঠিকভাবে লাগাইবার জন্য তাহা

কাটিয়া ছাটিয়া অদলবদল করা হইয়াছিল, বিবাদীপক্ষের এ অনুমানও পরে প্রত্যাহৃত হইয়াছিল। ফটোতে যে কোটের এবং পোষাকের ছবি দেখিয়াছি, তদ্দ্বারা আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে ১৮নং একজিবিটের দরবার পোষাকের সহিত ট্রাউজারের যে ছবি দেখা যায়, তাহাতে দেখিতে পাই, পায়ের গোড়ালীর নিকটস্থ ট্রাউজারেব অংশ কতকটা গুটাইয়া আছে। মিঃ চৌধুরী বলিয়াছেন, উহা ঠিক মানায় নাই। উহা 'মিস্‌ফিট' হইয়াছে। অতএব ইহা সুপষ্ট যে, বাদী কুমার হইতে দীর্ঘাকৃতি নহে; বরং তাহার 'পা-জামা'ব প্রতি লক্ষ্য কবিলে আপনি তাহাকে একটু খাটোই বলিতে পারেন।

এইরূপ পোষাকের বেলায় পাজামা একটু বেশী লম্বাই করা হয় এবং তাহা একেবারে জুতার তলা পর্য্যন্ত পৌঁছে। পাজামাব মধ্যে আটিয়া রাখাব উপায় স্বরূপ বন্ধনী আছে; তবে যখন ফটো লওয়া হইয়াছিল তখন পাজামা এই সমস্ত বন্ধনী দ্বাবা আটা ছিল না। আমি মনে করি যে দ্বিতীয় কুমার বাঁচিয়া থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই এখন বাদীর সমান দীর্ঘদেহ হইতে পাবিতেন। বাদীর দেহের এই দীর্ঘতা দ্বারা কুমারের সহিত তাহার সাদৃশ্য বিনষ্ট হয় না। বিবাদী পক্ষ কুমারের দেহের দীর্ঘতা সম্পর্কে যে সকল পরিমাপ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাব সহিত বাদীর শারীরিক উচ্চতাব কোন বিরোধ নাই, ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে।

বাদী ও মেজকুমারের তুলনার কথা

এই মুখবন্ধে বিবাদী পক্ষের সুবিজ্ঞ কৌঁসুলী উল্লেখ করেন যে, ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমারকে বেশ ভদ্রলোকের মত দেখাইত; আর এই বাদীকে যেন "এক বিশালকায় পালোয়ানের" মত দেখায়। সংক্ষেপে বাদীকে বেশ মোটা বলিতে পারা যায়। উভয়ের মধ্যে বৈষম্য প্রদর্শন করিতে গিয়া বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলী ইহাও বলিতে পারেন যে, কুমারের বয়স ছিল ২৫ বৎসর: আর এই লোকটির বয়স ৫২ বৎসর।

বাদীর শরীরের বর্ণ সম্পর্কে বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। বাদী দেখিতে অতিশয় ফরসা। এই ফরসা রং বায়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটু খানি রক্তিম আভা রহিয়া গিয়াছে। বাদী ও কুমারের মধ্যে আকৃতিগত বৈষম্য দেখাইতে গিয়া বিবাদী পক্ষের সাক্ষিগণ কেবলই এই রক্তিমাভার উপর জোর দিতে ছিলেন। এই রক্তিমাভা এবং তাহার রং যে ইতিমধ্যে অনেকটা ময়লা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেই কথা উঠিয়াছে যে, দ্বিতীয় কুমারের শরীবের রং ছিল পীতাভ; কিন্তু এই বাদীর রং কেবল যে লাল তাহা নহে, কিঞ্চিৎ ময়লা।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন যে, বাদীর রং ইতিমধ্যে অধিকতর ময়লা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ১৯২১ সালে তিনি যখন জয়দেবপুরে আসেন, তখন তিনি স্বাভাবিক অপেক্ষাও অধিকতর ফর্সা ছিলেন। এই সাক্ষ্য উত্থপিত হইবার পূর্ব্বে কেহ বলেন নাই যে, বর্ত্তমান মামলার বাদী; কুমার অপেক্ষা অনেক কম ফর্সা। পক্ষান্তরে এমন কথাও বলা হইয়াছিল যে, বাদীর রং কুমারের রং হইতেও ফর্সা। একখানি পুস্তিকায় এরূপ কথাই বলা হইয়াছিল (বাদী পক্ষের ৩৪নং সাক্ষী) কুমারের শরীরের বর্ণ সম্পর্কে শত শত সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছেন; কিন্তু এমন কথা কেহ বলেন নাই যে, বাদীর রং কুমারের রং হইতে ময়লা। বাদী পক্ষের ৪৩৮নং সাক্ষী বলেন যে, তিনি ১৯২১ সালের মে মাসে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে বাদীকে দেখিয়াছিলেন। দেখিয়াই তিনি বাদীকে দ্বিতীয় কুমার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। জেরার সময় এই সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয়:—

প্রশ্ন—খুব ফর্সা রংয়ের একটি লোক বসিয়া আছে, তাহাই আপনি দেখিয়া ছিলেন? উত্তর—হাঁ, সকলেই তাহার দিকে উৎসাহ সহকারে চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহা হইতে আমি বুঝিলাম যে, তাহারা কুমারকে দেখিতে আসিয়াছেন।

প্রঃ—ইহা হইতে এবং কুমারের ন্যায় ফর্সা একটি লোক, এই ধারণা হইতে আপনি নিঃসন্দেহ হইলেন যে, এই লোকটিই দ্বিতীয় কুমার? উঃ—হাঁ, তাহার আকৃতি হইতে।

মেজো কুমারের শরীরের রং কিরূপ ছিল

বাদী ও কুমারের মধ্যে প্রভেদ সম্পর্কে প্রথমতঃ যে কথা উঠে, তাহা এই যে, দ্বিতীয় কুমার ছিলেন রক্তাভ শ্বেতবর্ণ কিন্তু বাদীর রং হইতেছে কেবল "শ্বেতবর্ণ"। কমিশনে অতুলবাবু যে জবানবন্দী দিয়াছেন তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রভেদের কথাই তিনি বলিয়াছেন এই কথাগুলির মধ্যে উপরোক্ত কথাটিও আছে। শৈবলিনী দেবীই সর্ব্বপ্রথম পীতবর্ণের কথা উত্থাপন করেন। তাহার মতে দ্বিতীয় কুমার ছিলেন পীতবর্ণ অথবা পীতাভ; কিন্তু বাদী হইতেছেন লাল; এমন কি অতিরিক্ত লালবর্ণ।

সুবিজ্ঞ কৌঁশুলী কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে সাহস করিয়া কুমারের শরীরের রং সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই; তবে এইরূপ ভাবে কথাটা তুলিয়াছিলেন—দ্বিতীয় কুমারের মুখের রং ফর্সা হইলেও কতকটা লাল ছিল; রোদে পোড়ার জন্যই এইরূপ হইয়াছিল। "রোদেপোড়া" এই

কথাটি কৌন্সুলীর নিজের কথা আসলে ইহাই প্রমাণিত হইতে চলিযাছিল যে, দ্বিতীয় কুমার ছিলেন পীতাভ, রাণী ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন ; কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল পুলি দেখিয়া ছিলেন, দ্বিতীয় কুমারের শরীরের বর্ণ এমনই ফর্সা যে, ইংরাজের নিকটেও তাহা ফর্সা বলিয়া মনে হইত। অতএব মুখমণ্ডলে যে রক্তিমাভা, তাহা ছিলই ; তবে রোদে পোড়ার দরুণই তাহা হইয়াছিল।

রোদে পোড়ার কথা পরে আলোচনা করিব। তবে আপাততঃ যাহা বিচার করিতে হইবে, তাহা এই যে, দ্বিতীয় কুমারের শরীরের রং ছিল ফর্সা এবং পীতাভ : তিনি রোদে পোড়া ছিলেন বলিয়া তাহার মুখমণ্ডলে ছিল একটা জ্যোতিঃ বয়োবৃদ্ধির ফলে শরীরের রং অপেক্ষাকৃত ময়লা হইয়া যায়, এই অনুভূতি হইতেই বিবাদী পক্ষ পরে বলিয়াছেন, বাদীর রং যেন কুমারের রং হইতে কালো বলিয়া মনে হয়। বাদী পক্ষের ৪৩৮নং সাক্ষীর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, এই বাদী কুমারের ন্যায় ফর্সা কিনা। এতদ্বারাই রংএর প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বিবাদী পক্ষ মামলার শুনানীর সময় ভাবিয়া চিন্তিয়া রংএর প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বাদীপক্ষের এক আবেদনের উত্তরে ৯।৮।৩৬ ইং তারিখে বিবাদী পক্ষ এক আবেদন (ফাইলের ৩২০৪ নং কাগজ) করেন এবং তাহাতেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বিবাদী পক্ষের বক্তব্য—১নং বিবাদী দ্বিতীয় রাণীর সাক্ষ্যে বর্ণিত বিষয় হইল এই যে, কুমার ছিলেন অতি ফর্সা, সর্ব্বাঙ্গে তাহার একটা পীতাভা ছিল এবং মুখমণ্ডলে একটুখানি রোদে পোড়ার চিহ্ন ছিল। তারপর বিবাদী পক্ষ বলিয়া আসিয়াছেন যে, বাদী মোটের উপর কুমার হইতে কম ফর্সা, উভয়ের বর্ণের মধ্যে একটা প্রভেদ আছে ; তবে একদিন পরে হয়ত অনেকেই সেই প্রভেদটা ধরিতে পারিবে না ; আর ধরিতে পারিলেও সেই প্রভেদ কতটুকু তাহা নির্ণয় করিতে পারিবে না।

দুধে-আলতা রং

দ্বিতীয় কুমারের সম্পর্কে একটা বিষয়ে সকলেই একমত যে, তাহার শরীরের রং ছিল অতি আশ্চর্য্য রকমের। একজন মহিলা কুমারের এই রংকে 'দুধে আলতা রং" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল পুলি বলিয়াছেন, গোলাপী রং। বারবারই এই রংয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। শুনানীর প্রথম হইতেই এই বর্ণকে ভিত্তি করিয়া বাদী ও কুমারের পার্থক্য দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। উভয়েই ফর্সা ; তবে এই

ফর্সার মধ্যেও একটু রকমারি আছে। এই বাদী শ্বেতবর্ণ; কিন্তু কুমার ছিলেন লাল; কুমারের বর্ণের মধ্যে একটা পীতাভা ছিল; কিন্তু এই বাদীর তাহা নাই।

১৯২১ সালে এবং তৎপরে বাদীর শরীরের রং কিরূপ ছিল, তৎ-সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা বিবাদীপক্ষের সাক্ষীগণের নিম্ন-লিখিত উক্তিগুলি পাই:—

"অতি সুন্দর পরিষ্কার চামড়া"—মিঃ লিণ্ডসে।

"স্বাস্থ্যের পরিচায়ক শ্বেতবর্ণ"—মিঃ গুপ্ত (বিবাদী পক্ষের ২৫নং সাক্ষী)

"অতি সুন্দর ফর্সা লোক"—কমিশনে গৃহীত মিঃ দেবব্রত মুখুয্যের সাক্ষ্য।

প্রশ্ন:—বাদীর রং কি কুমারের রং হইতে ভিন্ন রকমের? উত্তর:—না, সম্পূর্ণ পৃথক রকমের নহে। বাদীও ফর্সা, তবে একটা রক্তিমাভা আছে।

প্রশ্ন:—যদি কেহ বলে যে, দ্বিতীয় কুমারের মুখ লালচে রকমের ছিল, তাহা কি সত্য হইবে? উত্তর:—কতকটা লাল্‌চে ছিল। দ্বিতীয় কুমারের মুখ ফর্সা ও লাল্‌চে ছিল। লালচে এই কথায় আমার সম্মতি আছে। রোদে পোড়া ছিল বলিয়া আমি বলিয়াছি যে কিছু লাল্‌চে। বাদীর মুখের রংটাও লালচে বটে; তবে সাহেবের মুখে যেরূপ লালচে দেখা যায় ইহা হইতেছে সেইরূপ লালচে; ইহাকে রোদে পোড়া বলিয়া মনে হয় না।

বিবাদীপক্ষের ১৪নং সাক্ষী শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীও এইরূপ বলেন। ইনি জয়পুরে থাকিয়া কোন স্কুলের শিক্ষকতা করিতেন এবং চাকুরী সম্পূর্ণরূপে ভাওয়াল এষ্টেটের দয়ার উপরই নির্ভর করিত। এই সাক্ষী কুমারের অক্ষর বিষয়ক জ্ঞান প্রমাণের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার কথা নিম্নে আলোচনা করিতে হইবে।

যামিনী প্রসন্ন গাঙ্গুলীর সাক্ষ্য

শ্রীযুক্ত যামিনী গাঙ্গুলী পরম খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী; তাঁহার মর্য্যাদাও খুব উচ্চ। এই সাক্ষীর গুণাগুণ ও ব্যক্তিগত মর্য্যাদার কথা নিম্নে উল্লেখ করিব। ইনি লেডী হার্ডিঞ্জ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের তৈলচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তিনি নিজেও খুব ফর্সা লোক। অতএব বর্ণ সম্পর্কে তাঁহার কোন ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি বলেন,—ইহা বলা যাইতে পারে যে, কোনও জিনিষের রং বিচার করিবার উত্তমরূপ ক্ষমতা আমার আছে। আমি মনে করি যে, বাদী বর্ত্তমানে আমার নিজের অপেক্ষাও সামান্য একটু খানি বেশী ফর্সা। উষ্ণ মণ্ডলের একজন ইউরোপীয়ানের গায়ের যেরূপ

রং হয়, বাদীর রং ঠিক সেইরূপ। এতদ্বারা আমি উষ্ণমণ্ডলে যাহার জন্ম, সেইরূপ ইউরোপীয়ানের কথাই বলিতেছি। ইংলণ্ড হইতে সদ্য সমাগত ব্যক্তির রং বাদীর রং হইতেও ফর্সা। একথা আমি নিশ্চয়ই বলিব যে, এক সময়ে বাদীর গায়ের রং অতিশয় ফর্সা ছিল।" সাক্ষী বলিতেছেন যে, বর্ত্তমানে বাদীর রং ফর্সা।—ইহাকে রোদেপোড়া কটা রকমের বলা যায়। প্রথম বয়সে বাদীর গায়ের রং খুবই উজ্জ্বল ছিল। আমি এবিষয়ে সাক্ষীর সহিত একমত। আদালতে বাদীকে লক্ষ্য করিয়া আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহাতে বলিতে পারি যে,—সাদা এবং ক'টা বাঙ্গালী সমাজে যাহাকে শ্যামবর্ণ বলা হয়, সেইরূপ হল্‌দে রকমের নহে। এই অভিমত প্রকাশ করিলেই পূর্ব্বে বাদীর রং কিপ্রকারের ছিল, তাহার কথা কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন। বয়ঃক্রম বৃদ্ধির ফলে রং কতকটা ময়লা হইতে পারে এবং বর্ত্তমানে জামার নীচে তাহার হাতখানির রং কিরূপ আছে, এই সমস্ত কথা বিবেচনা করা দরকার। কাহারও রং সর্ব্বদা একই প্রকার থাকে না। বয়সের সঙ্গে, স্বাস্থ্যের উন্নতি অবনতির সঙ্গে, মানসিক উদ্বেগের ফলে প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় শরীরের রং পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। যে ভাবে—যেরূপ আলোতে কাহাকেও দেখা যায়, তাহারও রংএর পরিবর্ত্তন হইতে পারে। জলবায়ু পরিবর্ত্তনের সঙ্গেও খাদ্য ও পানীয়ের প্রকার ভেদে শরীরের রং বদলাইতে পারে। যখনই কোন রংএর কথা ভাবা যায়, অথবা কোন রং বর্ণনা করা যায়, তখনই সমস্ত পরিবর্ত্তনের কথা সাধারণভাবে বলিতে হয় এবং মুহূর্ত্তে ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্ত্তন আপনা হইতেই আসে, তাহার কথা স্মরণ রাখিয়া ও কাছাকাছি কোন একটা জিনিষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তদনুসারে রংএর নাম দিতে হয়। যেমন—ইহা গোলাপের মত অথবা দুধ ও গোলাপের মত বলিতে হয়। ইংরাজীতে Ton creamy, olive, ivory, marble, pink peach । like, copper brown ইত্যাদি বহু কথাই আছে; কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় তেমন সম্পদ নাই। বাঙ্গলা ভাষায়ই অধিকাংশ সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছেন রংএর বর্ণনা দিতে গিয়া তাঁহারা যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছেন এবং সাহেবী রং—অর্থাৎ ইউরোপীয়ানদের রং বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। খাঁ সাহেব এ. এম, এ হামিদই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলেন,—দ্বিতীয় কুমার দেখিতে অতি সুন্দর ও ফর্সা চেহারার লোক ছিলেন। কুমারের রং ছিল অতি অদ্ভুত রকমের ফর্সা। এই রং ব্যতীত অন্যান্য আর সকল বিষয়েই আমি এই বাদী ও দ্বিতীয় কুমারের মধ্যে অতি সামান্য পার্থক্য দেখিতেছি। বাদী ও বুদ্ধুর মধ্যে এই রংএর সাদৃশ্য আছে; আর কোন

বিষয়েই সাদৃশ্য নাই। মাত্র সেদিন তিনি বাদীকে দেখিয়াছেন, বুদ্ধুকেও দেখিয়াছেন। একই সময়ে এবং একই স্থানে দেখা হইয়াছে। এই ব্যক্তি আরও বলেন যে বাদী ও দ্বিতীয় কুমার অন্যান্য দিক দিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিক একথা বলিলে ভুল বলা হইবে।

কাহার রং কেমন

এক্ষণে প্রশ্ন বুদ্ধুর গায়ের রং কিরূপ ছিল? জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন, ছোটকুমার, মেজকুমার এবং তাঁহার নিজের মতই ইহা সাহেবী রং ছিল। তবে এইটুকু পার্থক্য ছিল যে, বুদ্ধুর রং দ্বিতীয় কুমারের মত এতটা লাল্‌চে ছিল না। তবে ছোটকুমার অত্যন্ত ফর্সা ছিলেন এবং কতকটা রক্তিমাভাও ছিল। শৈবলিনী বলেন যে, ছোটকুমার "অত্যন্ত ফর্সা" ছিলেন। মিঃ র‍্যাঙ্কিন বলেন যে, "ছোটকুমারের রং ছিল দ্বিতীয় কুমারের তুলনায় কিঞ্চিৎ ময়লা"; কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল পুলি (তিনি কুমারকে ভাল করিয়াই জানিতেন); কেননা তিনি কুমারের সঙ্গে সকল সময়েই পলো খেলিয়াছেন এবং কুমারের নিকট একটা ঘোড়া বিক্রয় করিয়াছেন"। বলেন—"ছোটকুমার দ্বিতায় কুমারের সমান ফর্সা ছিলেন। বিবাদী পক্ষের ৮৭নং সাক্ষী সৌভাগ্যচাঁদ বলেন যে, ছোটকুমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফর্সা ছিলেন।

বাদীর গায়ের বর্ণের কথা

বাদী পক্ষের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, বাদী এবং মেজকুমারের গায়ের রং একই। খান সাহেব আবদুল হামিদও বলিয়াছেন যে মেজকুমারের গায়ের রং পীতাভ। বাদী পক্ষের সাক্ষীগণ ইহা মোটেই স্বীকার করেন নাই, তাহারা লালচে বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, শৈবলিনী বলিয়াছেন যে, মেজকুমারের গায়ের রং পীতাভ এবং মুখ লাল নহে, কর্ণেল পুলি মেজো-কুমার খুব সুন্দর পুরুষ বলিয়াছেন, কিন্তু গায়ের রং গোলাপী বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিজের গায়ের রং মলিন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মেজকুমারের গায়ের রং বাদীর গায়ের মত হল্‌দে ও লালে মিশান। কয়েকদিন এই সাক্ষীকে আমি দেখিয়াছি, তাহার রং প্রায় সাদা ইউরোপীয়দেরই মত। তবে উহাকে মলিন দেখা যাইতেছিল।

মেজরাণীর গায়ের রং হলদে তবে উহা বাদীর রং হইতে আলাদা। যে সকল সাক্ষী মেজ কুমারের রং সাহেবী বলিয়াছেন, মিঃ চৌধুরী তাহাদিগকে জেরা করিয়াছেন এবং কোন বাঙ্গালীর রং সাহেবী হইতে পারে না। উহা

প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাহেবী রংকে উজ্জ্বল পীতাভ হইতে আলাদা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

বিবাদীপক্ষের একজন সাক্ষী বলিয়াছেন যে, মেজকুমারের গায়ের রং গৌরবর্ণ ছিল না, সাদা ধব্‌ধবে ছিল। এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্যই তাঁহার রংকে সাহেবী বলা হইয়াছিল।

মেজকুমারের রং সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটা বর্ণনা দেওয়া হইতেছে। সাহেবী (বাদীপক্ষের ২১০, ৩৩৬, ৪২৬ এবং ৬৬০ নং সাক্ষী) সাহেবের মত সুন্দর (বাদী পক্ষের ৪৫৮ নং সাক্ষী এবং বিবাদী পক্ষে ৫৭, ৬৩, ৭২, ৭৪, ৮৩, ২৭, ৩০, ৩৯, ৫৪, ৩৭ এবং অন্যান্য সাক্ষী। ইংরেজ সাহেবের মত সুন্দর। বিবাদী পক্ষের ৪২৭ ও ৪০নং সাক্ষী) সাহেবের মত সুন্দর ও লাল (বিবাদী পক্ষের ৩০, ৪২৭, একজন উকিল, বাদী পক্ষের ৪২৭নং সাক্ষী আবদুল মন্নান এবং অন্য কয়েকজন সাক্ষী)।

'তিনি কুমারদের মধ্যে মেজকুমারের রং লাল ও পাকা'—শিবচন্দ্র মিত্র (বিবাদী পক্ষে কমিশন সাক্ষ্য দিয়াছেন) 'লাল সাদায় মিশান'—(বিবাদী পক্ষের সাক্ষী অতুলপ্রসাদ কমিশনে বলিয়াছেন) 'সাদার উপর লাল্‌চে' (বাদী পক্ষের ৪৯নং সাক্ষী মিঃ এন, কে, নাগ বার-য়্যাট-ল)।

'সুন্দর বাঙ্গালী অপেক্ষাও সুন্দর। প্রায় ইউরোপীয়ের মত' (বিবাদী পক্ষের সাক্ষী কর্ণেল লোসেন)।

'যুবরাজ সুন্দর, তবে গোলাপী মনে হয়'—কর্ণেল পুলি উভয় পক্ষের সাক্ষীরাই হলদে রংকে উড়াইয়াছে সাক্ষীদের মধ্যে, ছোটরাণী, ফণীবাবু, রায় সাহেব (বিবাদীপক্ষের ৩১০নং সাক্ষী) সত্যবাবু, (৩৮৭নং সাক্ষী) বীরেন্দ্র (বিবাদীপক্ষের ২৯০নং সাক্ষী) কালী বিবাদী পক্ষের ১৪নং সাক্ষী কামিনী চক্রোর্ত্তি (বিবাদীপক্ষের ৩৬৪নং সাক্ষী এবং অবনী (বিবাদীপক্ষের ৩২৪নং সাক্ষী) স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সাক্ষী। প্রধান তদ্বিরকারক রায় সাহেব, সত্যবাবু, ফণী এবং দুই রাণী ব্যতীত অন্য সকলেই এষ্টেটের কর্ম্মচারী। পুলী বলিয়াছেন গোলাপী এবং শৈবলিনী বলিয়াছেন হল্‌দে, উহার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। বিবাদীপক্ষে ৩৬৪নং সাক্ষী বৃদ্ধ কামিনী খাজাঞ্চি বলিয়াছেন যে কেহ রৌদ্রপোড়ার নামও শুনে নাই। বিবাদীপক্ষের ৩০৯নং সাক্ষী সর্ব্বমোহন চক্রোর্ত্তি বলিয়াছে যে কেহ যদি রৌদ্রপোড়া বলিয়া থাকে, তবে মিথ্যা বলিয়াছে মেজকুমারের রং সাদা ও লালচে এবং বাদীর রংও সাদা ও লালচে বলিয়া আমি সাব্যস্থ করিতেছি।

১৯২১ সনে আত্মপরিচয়ের পরে প্রথম গৃহীত ফটো।

দারজিলিং যাইবার পূর্বে গৃহীত ফটো।

বাদীর চুল, গোঁফ ও ভুরু

আমি দেখিয়াছি যে; বাদীর চুল লাল আভাযুক্ত কাল। অর্থাৎ সচরাচর বাঙ্গালীদের চুল যে প্রকার কাল থাকে, সে প্রকার নহে। যখন ৬৬০নং সাক্ষী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সাক্ষ্য দিতেছিলেন, তখন মিঃ চৌধুরী বলিয়াছিলেন যে, কুমারের চুল পিঙ্গল অর্থাৎ উজ্জ্বল, আর বাদীর চুল কাল এবং কুমারের চুল পিঙ্গল, অতুলবাবু সাক্ষ্যদান কালে এই পার্থক্য দেখাইয়াছেন। এই সাক্ষীর উক্তির সহিত লাহোরের সাক্ষীদের সামঞ্জস্য রাখা হইয়াছে।

তাহারা কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছে এবং ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে যে বাদী উঙ্গলার একজন শিখ কৃষক। তাহার নাম মাল সিং, মালসিংহের চুল কাল, বাদীর আত্ম পরিচয় দানের পর ১৯২১ সালের ২৯শে মে মিঃ লিণ্ডসের সহিত দেখা হইয়াছিল। তিনি এখন বাদীর চুল সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন, 'সুন্দর সোণালী ও পিঙ্গল।' কর্ণেল পুলির গোলাপীর সহিত শৈবলিনী হলদেকে খাপ খাওয়াইবার যে প্রকার চেষ্টা করিয়াছিল, এখানেও নিশ্চয়ই এই দুইটী রংকে খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা হয়, এখানে উহাকে রৌদ্রপোড়া বলা হয় নাই, তবে অযত্নের দরুণ এই প্রকার হইয়াছে বলা হইয়াছে। যুবক মাল সিং সন্ন্যাস গ্রহণ করে এবং তাহার চুল জটা হইয়া যায়। চুলে তেল পড়ে নাই, অথবা ধূলা বালি পড়িয়াছে বলিয়াই পিঙ্গল হইয়া গিয়াছে বার বৎসর চুলে তেল না দেওয়ার বাদীর চুলের স্বাভাবিক রং নষ্ট হইয়াছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। বাদী পক্ষের ৩৬৫, ১৫৫, ৩৭৭, ৪৫৫, ৯৩৮ এবং ৬৬নং সাক্ষিগণকেও অযত্নের দরুণ কাল চুল পিঙ্গল হইয়া গিয়াছে কি-না জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। মিঃ যামিনী গাঙ্গুলী বলিয়াছেন যে, চুলে তেল না পড়িলে বা অযত্ন করিলে ইহার রং নষ্ট হইয়া যায়, এবং ময়লায় পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠে।

বাদী এই উক্তিতে বিচলিত হন, এবং ৯৬১, ১০১০ ও ৪৩৫নং সাক্ষীকে আহ্বান করেন। তাঁহারা কখনো চুলে তেল দেন নাই, অথচ কালই আছে। ইহাই প্রমাণ করার চেষ্টা হয় যে, চুলে তেল না পড়িলে উহা লাল হয় না, উহা শুক্ল হয়, বিবাদী পক্ষে কয়েকজন সাক্ষী পরে উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহারা ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাদী উজলার মালসিং এবং মালসিংহের চুল সোণালী বর্ণ ছিল। কিন্তু পরিশেষে ইহাই সাব্যস্ত হয় যে বাদীর চুল মেজকুমারের মতই।

চুলের রং

সাধারণতঃ বাঙ্গালীর চুল, কাল। একজন শ্বেতাঙ্গ সাক্ষী বলিয়াছেন যে, কখনো কখনো চুল লালচে বা লাল অর্থাৎ কটা হয়। বাদী তাঁহার চুলকে 'কটা' বলিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর চুল এখন পিঙ্গল বর্ণ। তিনিও উহাকে 'কটা' বলিয়াছেন। এই অঞ্চলে পিঙ্গল শব্দটা প্রচলিত; কিন্তু ভাওয়ালের সাক্ষী ও সুকুমারী দেবী 'কটা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা যে রংকে লালচে বলিয়াছেন, চুল সম্পর্কে সেখানে কটা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, উহার অর্থ ই ঠিক হইয়াছে, তবে চক্ষু সম্পর্কে যখন শব্দ ব্যবহার করা হয়, তখন উহার অর্থ কাল ব্যতীত অন্য কিছু বুঝায়।

বাদী পক্ষের সাক্ষিগণ মেজকুমারের চুলকে পিঙ্গল বলিয়া বলিয়াছেন।

বাদিগণ পিঙ্গল কথাটি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মামলার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি না। মিঃ চৌধুরী বাদী পক্ষের ৩১৪নং সাক্ষীকে এই শব্দটি সৃষ্টি করিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বাদী পক্ষের ৮২নং সাক্ষীকে কতদিন ধরিয়া এই শব্দটি জানিতেন বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করেন। মেজকুমারের দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বে এই শব্দটা জানিতেন কি না বাদী পক্ষের ৩১৪নং সাক্ষিকেও উহা জিজ্ঞাসা করা হয়। সাক্ষীগণ মেজকুমারের চুলের রংটা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শব্দের অভাবে তাঁহারা উহা পরিষ্কার করিতে পারিতেছিলেন না। বাদী পক্ষের ৩৫৫নং সাক্ষী বলিয়াছেন যে, চুলের রং উজ্জ্বল লাল। বাদী পক্ষের ১৩৩নং সাক্ষী বলিয়াছেন, গাঢ় কাল। বাদী পক্ষের ৩১৪নং সাক্ষী বলিয়াছেন, উহা কৃষ্ণাভ লাল। বাদীপক্ষের ২৬৩নং সাক্ষী বলিয়াছেন উহা লালচে বাদীপক্ষের ১০১ নং সাক্ষী বলিয়াছেন উহা নূতন পয়সার রংও নহে. বাদীপক্ষের ২১০ সাক্ষী বলিয়াছেন উহা তাম্রাভ। বাদীপক্ষের ১৩৫ নং সাক্ষী বলিয়াছেন পুরাতন তামার রং, উহা পূজার তাম্রপাত্রের রং বলিয়া বাদীপক্ষে ৩৫৫ নং সাক্ষী বলিয়াছেন বাদীপক্ষের ৮৯নং সাক্ষী বলিয়াছেন উহা তামাটে। বাদীপক্ষের ১২নং সাক্ষী বলিয়াছেন যে উহা সাক্ষীর কাটগড়ার রেলিং-এর রংএর মত।

সংক্ষেপে মিঃ চৌধুরী বলিতে চাহিয়াছেন উহা তামাটে। বিবাদীপক্ষ এই প্রকার বর্ণনাই দিয়াছেন। বিবাদী পক্ষের ১৯, ২৭, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪৩, ৪৫, ৫৮, ৭০, ৭৬, ১৪০, ১৫৯, ২৯০, ৩১০, ৩২৫, ৩৯৭, ৩৪৮ নং সাক্ষীগণ উহাকে পিঙ্গল বা লাল বা লালচে বলিয়াছেন, বিবাদী পক্ষের ৩নং সাক্ষী

যোগেশ (ভূতপূর্ব্ব নায়েব) উহাকে তামাটে বলিয়াছেন, ছোটরাণী উহাকে তাম্রবর্ণ বলিয়াছেন। লেঃ কর্ণেল পুলিস উহাকে লাল বলিতে চাহিয়াছেন। বাদী এবং মেজকুমারের চুল সম্পর্কে পাথক্য দেখান হইয়াছিল, বিবাদী পক্ষের ৩১৪নং সাক্ষী বৃদ্ধ নায়েব কামিনী তাহা দূর করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বাদীও মেজকুমারের চুলের মধ্যে কোনই পাথক্য নাই। বিবাদী পক্ষের ৩৭১নং সাক্ষী পুরাতন খাজাঞ্চী, বিবাদী পক্ষের ৩৩৮নং সাক্ষী পুরান কর্ম্মচারী অবনী এবং বিবাদী পক্ষের ১৪৫নং সাক্ষী বৃদ্ধ চাষা আলিমুদ্দিন বাদীর চুল ও মেজকুমারের চুলে কোনও পার্থক্য নাই বলিয়াছে। রায় সাহেব যোগেন্দ্র, ফণীবাবু সাক্ষ্যে গণ্ডগোল করিবেন বলিয়া আমি মনে করি না। কয়েকজন চাষা ও অন্যান্য সাক্ষীকেও ভাল করিয়াই শিখাইয়া আনা হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে কালী (বিবাদীপক্ষের ১৪নং সাক্ষী) বলিয়াছে বাদী ও মেজকুমারের চুলের মধ্যে আমি কোন পার্থক্যই দেখি না।

এখন আমি চুল সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি বলিয়া উভয়েরই একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আলোচনা করিতে চাই দুইজনেরই চুল কোঁকড়া, বিবাদী পক্ষ বলিয়াছেন যে, মেজকুমারের চুল কোঁকড়া, কিন্তু বাদীর চুল সোজা শৈবালিনী দেবী বলিয়াছেন যে, মেজকুমারের চুল চিকণ এবং পরিপাটি; সাধুর চুল ভারী রুক্ষ এবং খাড়া থাকে। বিবাদী পক্ষের মিঃ পার্সী ব্রাউন দুইখানি ফটোর তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বাদীর চুল খাড়া থাকে এবং কুমারের চুল তরঙ্গায়িত থাকে। আমি কোর্ট উভয় ব্যবহারাজীবদের সম্মুখে বাদীর চুল দেখাইলাম, তাহার চুল সামনে এবং পেছনে তরঙ্গায়িত। আমি উহা ২৪ ও ২৫ তারিখে রেকর্ড করিয়াছি।

গোঁফের রং কিরূপ ছিল

বিবাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী কর্ণেল পুলি বলিয়াছেন, কুমারের গোফের রং তাহার চুল অপেক্ষা অনেক উজ্জ্বল। মিঃ গাঙ্গুলি কখনো মেজকুমারকে দেখেন নাই। তিনি বাদীর গোঁফ সম্পর্কে বলিয়াছেন উহা বাদামী, চুল অপেক্ষা উজ্জল। এই সম্পর্কে কেহই আপত্তি করেন নাই। আমি মনে করি, উভয়েরই গোঁফ বাদামী এবং উহা চুল হইতে অনেক উজ্জল।

ভ্রূর রং

উভয়েরই ভ্রূ বাদামী রংএর আভাযুক্ত ভ্রূযুগলের গঠন ও আকৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিবার থাকিলেও ভ্রূ-যুগলের বর্ণ সম্বন্ধে কোনও সওয়াল করা

হয় নাই। সর্ব্বমোহন (কমিশনে সাক্ষ্য দেন) ভ্রূর রংকেই পার্থক্যের এক প্রধান লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—কুমারের ভ্রূযুগল দেখিতে অতি সুন্দব ছিল। মেজরাণী স্বয়ং বলিয়াছেন যে, উহা লাল রংএর আভা যুক্ত ছিল। বিবাদী পক্ষের কয়েকজন সাক্ষীও (যেমন ১৮২নং সাক্ষী) ঐ কথাই বলিয়াছিলেন।

চক্ষুর পাতার লোমের রং

উভয়ের এই বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। চক্ষুর পাতার লোম সম্বন্ধে যে কোনও পার্থক্য আছে, এ বিষয় কেহ উল্লেখও করেন নাই বাদীর একজন সাক্ষীকে মধ্যমকুমারের চক্ষুর লোম সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। ঐ সাক্ষী উত্তর দিয়াছিলেন যে,—উহা দেখিতে সুন্দর ঐ যে যাহাই বুঝা যাউক না কেন, চোক্ষের লোম সম্পর্কিত প্রশ্নের কেহ আলোচনা করেন নাই।

চক্ষের কিরূপ রং

এই প্রসঙ্গ হইতে যে সকল বিশেষত্বের সন্ধান পাওয়া যাইবে, তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মিঃ গাঙ্গুলী বলেন,—বাদীর চক্ষু বাদামী বংএর, তাঁহার মতে হালকা বাদামী বলিলেই ঠিক হয়। তিনি বলিয়াছেন, ঐ ধরণের চক্ষু আঁকিবার সময় তিনি কপিল রং ব্যবহার করিবেন। তাঁহার মতে মাথার চুল এই রংএর ছিল; তবে গাঢ় রং হাল্কা করিবার জন্য তিনি তাহার সহিত অন্য রং মিশাইয়া লইবেন। বিবাদী পক্ষের ৩১০ নং সাক্ষী রায় সাহেবের মতে চোখের রং বাদামী আভাযুক্ত। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে তাঁহার জয়দেবপুর যাওয়ার সময় হইতে আগাগোড়া তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। বাদীর চুল যে বাদামী রংএর, সে বিষয়ে কোনও বাদপ্রতিবাদ নাই। মধ্যম কুমারের চক্ষুর রং সম্বন্ধে বিবাদী পক্ষের বক্তব্য এই যে, অথবা তাঁহারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে,—মধ্যম কুমারের চোখের রং নীলাভাযুক্ত ছিল। চোখের এই বর্ণনা ইন্‌সিওরেন্স ডাক্তারের রিপোর্ট না পৌছান পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, কিন্তু ঐ রিপোর্ট আসিয়া পৌছিলে যখন দেখা গেল—উহাতে মধ্যম কুমারের চোখের রং ধূসর বর্ণ বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে, তখন বলা আরম্ভ হইল যে, কুমারের চোখের রং ধূসর বর্ণেরই ছিল, তবে সে রং নীল রংএরই সমান। সাধারণ লোকে উহাকে নীলের আভাযুক্ত বলিয়াই সাব্যস্ত করিবে।

ইনসিওরেন্স ডাক্তারের রিপোর্ট পৌছিবার অনেক পূর্ব্বে কর্ণেল পুলি

সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—'নীল রং ধুইয়া ফেলিলে যেমন একটা নীলের ফিকে আভা রহিয়া যায়, মধ্যম কুমারের চোখের রং সেইরূপ ছিল।' কর্ণেল পুলি বলিয়াছেন এবং সাক্ষ্যপ্রমাণেও দেখা গিয়াছে যে, কর্ণেল পুলি একজন চিত্রশিল্পী বটেন; কিন্তু উহাই তাঁহার উপজীবিকা নহে। বালক, বৃদ্ধ হইলে দেখিতে কিরূপ হয়, তাহা তিনি হুবহু আঁকিয়া দিবার ক্ষমতা রাখেন—মিঃ পুলির এ দাবী প্রলাপের মত মনে হইলেও

ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, রং এর খুটিনাটি সম্বন্ধে তাঁহার বেশ নজর আছে। ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে তিনি প্রখরদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি কুমারের চক্ষু ধূসর বর্ণ বলেন এবং ভঙ্গী প্রভৃতি ব্যাপারে কর্ণেল পুলি ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়াছিলেন। লড কিচেনারের শিকারের সময়ের বন্দোবস্ত সম্পর্কেও তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তিতে নিঃসন্দেহে ইহা সপ্রমাণ হইতেছে যে, ঐ সকল ব্যাপার সম্পর্কে আদৌ তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না, অপিচ ছোট কুমারের চক্ষের রং নীলাভাযুক্ত বলিতে তিনি উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া ইহা অবশ্যই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, মধ্যম কুমারের চক্ষু ফিকে নীল রঙের ছিল বলিয়া তিনি যে উক্তি করিয়াছেন, তাঁহার সেই উক্তি এবং রাজ কুমারদের উচ্চারণ-ভঙ্গী লর্ড কিচেনারের শিকার ব্যবস্থার ন্যায় অপরের উপদেশ অনুসারে করা হইয়াছিল কিনা;—অথবা ছোট কুমারের সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতি যেটুকু ছিল, তাঁহার সেই স্মৃতি হইতেই ঐ সকল বিষয় বলিয়াছিলেন কিনা তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কর্ণেল পুলি বলিয়াছেন,—বাদা এবং মধ্যম কুমার একই রকমের মোটা। কর্ণেল পুলি উভয়কে একই রকম স্থুলকাল বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও, ইহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছে যে, মধ্যম কুমারের দেহ পেশীবহুল ও সুগঠিত ছিল। ছোট কুমার কিছু মোটা ছিলেন (ফটো দ্রষ্টব্য XC VIII, EX IV, EXa 17) বড় কুমারের সঙ্গে ভুল হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই, কেননা, তাঁহার শরীরের রং কালো ছিল, তাঁহার গোঁফ দাড়ি ছিল না। তাঁহার মুখশ্রী একটু মোচড়ান গোছের ছিল।

কুমারের চক্ষু নীলবর্ণ কিনা

এক্ষণে এই শ্রেণীর সাক্ষ্য প্রমাণের সমালোচনা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখা যাউক। কমিশনে অতুলবাবুর সাক্ষ্য গ্রহণের সময় হইতেই, প্রথম মধ্যম কুমারের চক্ষু নীলবর্ণ ছিল বলিয়া একটা কাহিনীর সৃষ্টি হয়। পার্থক্যের

যে তালিকা অতুলবাবুর সাক্ষ্যে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে চক্ষু সম্বন্ধে এই বলেন যে, উহা সাহেবদের চোখের মত ঈষৎ নীলাভাযুক্ত।

এই মামলার শুনানী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, আর আর যাঁহারা কমিশনে জবানবন্দী দিয়াছিলেন, চক্ষুর বর্ণনা সম্বন্ধে তাঁহাদের জবানবন্দী হইতে পাওয়া যায় :—

(১) নীল বর্ণের ঈষৎ আভা—শৈবলিনী

(২) নীলের আভাযুক্ত—যতীন্দ্র (কমিশনে)

(৩) ভাষা চক্ষু—মিঃ মায়ার "

(৪) করঞ্জা—রমানাথ "

(৫) কটা—রঞ্জন শেঠ— "

(৬) চোখের মণির চারিদিকের রঞ্জিত মণ্ডল, সাহেবদের চোখের মত —সর্ব্বমোহন (কমিশন)।

(৭) মধ্যম কুমারের, ছোট কুমারের, বুদ্ধুর এবং জ্যোতির চোখ কটা রকমের ছিল—মিঃ এস, পি, ঘোষ।

(৮) বিড়াল চক্ষু—মোরেল ও জগদীশ (কমিশনে)।

এখন দেখা যাইতেছে,—জোতির্ম্ময়ী দেবীর চক্ষু কটা, ছোট কুমারে চক্ষু নীলাভ, এবং বুদ্ধুর চক্ষু সামান্য ঘোর নীলবর্ণের আভাযুক্ত। এই বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নাই। আমি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর চক্ষু দেখিয়াছি তাঁহার জবানবন্দীর সময় তাঁহার চোখের রং যেমন দেখিয়াছি তাহাই লিখিয়া রাখিয়াছি। আমি তাহার কোনও নামকরণ করি নাই। মিঃ উণ্টারটন রংকে কটা রং বলেন যে, যে ঐ রং যে চোখের রংএর সহিত খাপ খায়:তাহা স্বীকৃত। কৃত্রিম চক্ষুতে যে রং থাকে এই রং প্রায়ই সেই ধরণের (C X V নং একজিবিট দ্রষ্টব্য) প্রথম উহা X294 একজিবিট রূপে চিহ্নিত হইয়াছিল)।

কুমারের বিড়াল চক্ষু

দেখা যায়, শ্রীযুক্ত এস, পি, ঘোষ এই সকল চক্ষুকেই কটা বলিতেছেন। এবং বিবাদীপক্ষের সাক্ষী (কমিশনে গৃহীত) উকীল জগদীশ বাবু দ্বিতীয় কুমার এবং বুদ্ধুর চোখকে বিড়ালের চোখ বলিতেছেন। কিন্তু ইহাতেও বিবাদীপক্ষ কিছুতেই এই কথা বুঝাইতে নিরস্ত হন নাই যে, বিড়াল চোখ বা কটা চোখ বলিতে চোখে একটা নীল আভা বুঝায় বা এই দুইটী কথায় বাঙ্গালীদের মনে একটী রংয়ের কথা জাগে। কিন্তু সহজ কথা হইল এই যে,

বিড়াল চোখ কিম্বা কটা চোখ বলিলে সাধারণ বাঙ্গালীদের কালো চোখ বুঝায় না। বাঙ্গালীদের অধিকাংশের চোখই কালো।

উভয়পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণের এই কথা প্রকাশ পাইয়াছে শ্রীযুক্ত এস, পি, ঘোষ একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং তিনি একজন ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনিও বলিয়াছেন, কটা এবং নীলাভ একই শ্রেণীভুক্ত। উকিল জগদীশ বাবুও এই কথাই বলিয়াছেন এবং বিবাদীপক্ষের আরও বহু সংখ্যক সাক্ষী এই একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কটা বলিতে যদি একটি নির্দ্দিষ্ট রংকেই বুঝাইত, তবে এই প্রশ্ন লইয়া এত মাথা ঘামাইতে হইত না। বিবাদী পক্ষের অনেক সাক্ষীই এই কথা বলিয়াছেন যে, বাদী এবং দ্বিতীয় কুমারের চোখের রং এক রকম অর্থাৎ কটা। তাহার অর্থই হইল কালো নহে। কাজেই কেহ যদি বলেন যে, দ্বিতীয় কুমারের চক্ষু কটা ছিল তবে তিনি কোন বিশেষ রংয়ের কথা মনে করিয়া বলেন নাই। তিনি এই কথাই মনে করিয়া বলিয়া থাকিবেন যে, সাধারণ কালো চোখের মত নহে। এই বিষয়ে বিবাদীপক্ষের যে সকল সাক্ষীকে জেরা করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের কথা নিম্নে দেওয়া গেল :—

বিবাদী পক্ষের ৩, ২১ এবং ১৪০ নং—সাক্ষী বলিয়াছেন, যাহা কালো নয়,—তাহাই কটা। বিবাদী পক্ষের ২১নং সাক্ষী বলেন, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এবং দ্বিতীয় কুমারের চোখ কটা। ৩২, ৫৮, ৩৭১, ৫৯ এবং ১২২নং সাক্ষী বলেন,—বাদী এবং দ্বিতীয় কুমার উভয়েরই চোখ কটা।

১২২ নং সাক্ষী রমানাথ বলে,—বাদী এবং কুমারের চোখ ও চুল কটা ; এতদ্ব্যতীত উভয়ের মধ্যে চেহারার কোন সাদৃশ্য নাই। ৫৯নং সাক্ষী জব্বর খাঁ বলে,—চোখের রং একই রকম, কেবল চাষীরাই যে কালো চোখ না হইলে কটা বলে এমন নয়, প্রত্যেকেই ইহা বলিয়া থাকে।

কেহ কেহ, বিশেষ করিয়া মুসলমানগণ কটার পরিবর্ত্তে করঞ্জা শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে এবং এই কারণেই ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ৩২৩, ৩৮, ৬৪, ৬৯, ৩৩৭,৩ ৫৪নং সাক্ষী এবং রমানাথ (কমিশনে গৃহীত) করঞ্জ শব্দ ব্যবহার করিয়াছে।

বিড়াল চোখও এই একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে চোখ কালো নহে, তাহাকেই বিড়াল চোখ বলা হয়। ইহাতে বিশেষ কোন রং নির্দ্দিষ্ট হয় না, কেবল ইহাই বুঝা যায় যে, চোখ কালো নহে। বিবাদী পক্ষের সাক্ষী (কমিশনে গৃহীত) জগদীশ বাবু বলেন, জ্যোতি, মেজকুমার এবং বুদ্ধুর বিড়াল চোখ ছিল। ৫৭নং সাক্ষী দুর্গাদাস পাল বলেন যে. যে চোখ

সাধারণ কালো চোখের মত নহে, তাহাকেই বিড়াল চোখ বলা হয়, আবার কটাও বলা হয়। তিনি আরও বলেন যে, আশুতোষ ডাক্তার কোথাও বলিয়াছিলেন যে দ্বিতীয় কুমারের বিড়াল চোখ ছিল এবং তিনি বিড়াল চোখ বলিতে বাদামী রং বলিয়া ভুল করিয়াছেন। পাঞ্জাবেও দেখা যায় যে, রং অনুসারে চক্ষুকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। একটি হইল মামুলী অর্থাৎ সাধারণ কালো রংয়ের এবং অপরটী হইল 'বিল্লি" অর্থাৎ যাহা কালো নহে। পাঞ্জাবের একজন বিশিষ্ট শিখ ভদ্রলোক এবং বিবাদীপক্ষের ৩৫৫নং সাক্ষী লেফটেন্যাণ্ট রঘুবীরের নিকট এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মালসিংহের কাহিনী বলিবার সময় তাঁহার কথা স্থানান্তরে উল্লেখ করা হইবে।

কটা চক্ষু সচরাচর দৃষ্ট হয় না। সকল কটা চোখকে একই শ্রেণীভুক্ত করা হইলেও রং নিশ্চয়ই আছে এবং এই রংয়ের তারতম্য আছে ; কিন্তু এদেশে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা কিংবা পাঞ্জাবে কেহই রং লইয়া বড় একটা মাথা ঘামায় না; অতএব কটা চোখের রং ফ্যাকাসে নীল, জলের মত নীল না ফিকে নীল ধূসর; নীলাভ ধূসর না ইস্পাতের ন্যায় ধূসর, বাদামী, না বেগুনী, কমলা না সব্জে কটা হইবে, কেহই কিছু বলেন না। অবশ্য এদেশে এই জাতীয় কয়েকটি রংয়ের আভা পরিলক্ষিত হয়। তবে সাধারণতঃ কটা বলিতে বদ্‌রঙের কথাই এদেশে বুঝা যায়। কাজেই এদেশে কটা চুলের মত কটা চোখও লোকে পছন্দ করে না। বিবাদী পক্ষের ২৮০নং সাক্ষী সুকুমারী দেবী নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও প্রকারান্তরে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তাঁহাকে যদি কোন পাত্রী পছন্দ করিতে বলা হয়, তবে অন্যান্য দিক হইতে পাত্রী সুশ্রী হইলে, কটা চক্ষুতে তাঁহার কোন আপত্তি হইবে না।

কটা চোখের রং বড় কেহ একটা লক্ষ্য করিয়া দেখে না। সাধারণ সকলে চুল কিংবা চোখ কটা বলিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। একমাত্র নিকট আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠভাবে যাহারা মিশে, তাহাদের নিকটই কটা চোখের রং ধরা পড়ে। শ্রীযুত এস, পি, ঘোষ দ্বিতীয় কুমারকে শৈশব হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত জানিতেন। তাহার পরেও তিনি কুমারকে দেখিয়াছেন এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকেও তিনি বিশেষ ভালভাবেই জানিতেন। এখন এইরূপ সমস্ত চোখকে যিনি কটা শ্রেণীতে ফেলিতে অভ্যস্ত এবং যিনি কখনও ঐ শব্দটীর অনুবাদ করিয়াছেন, তিনি 'গ্রে' (ধূসর) কথাটী ব্যবহার করিবেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাদী বলিয়াছেন যে, তাহার চোখ কটা। আমি ঐ শব্দটীই লিখিয়া লই, কিন্তু ব্র্যাকেটে তাহার প্রতিশব্দ 'গ্রে' লিখি। অবশ্য, ইহা ভুল, কিন্তু আমার মনে

হয় যে, 'গ্রে' কথাটীর পরিবর্ত্তে 'কটা' শব্দটীই সাধারণতঃ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বিবাদী পক্ষের ৩নং সাক্ষী যোগেন্দ্র 'কটা' শব্দটী 'গ্রে' বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। ব্যারিষ্টার মিঃ আর, সি, সেন ৩ বৎসর বিলাতে ছিলেন, এবং তিনি ইহা আরও ভাল জানিবেন, ইহাই আশা করা যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, অমুক ব্যক্তি তাঁহার বন্ধু এবং তাঁহার সহিত ক্লাবে পার্টিতে খানা খাইবার সময় তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। সাক্ষ্য দেওয়ার দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে তিনি জানেন। তাঁহার কটা চোখ ছিল। তিনি আর এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাহারও 'গ্রে' অথবা কটা চোখ ছিল। তাহার চোখের রং কিরূপ ছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি তাহা বলিতে পারেন না। তিনি 'কটা'কে 'গ্রে' (ধূসর) বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন।

সুতরাং আমি কুমারের নিকট আত্মীয় অথবা যাহারা তাহাকে চিনিতেন, তাঁহাদের সাক্ষ্য ভিন্ন দ্বিতীয় কুমারের চোখের রং সম্পর্কে উভয় পক্ষের অপর কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য আলোচনা করিব না। দ্বিতীয় কুমারের চোখ কটা ছিল, তাহা তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিতেন কিন্তু এমন কি বিবাদী পক্ষের ৩৭১নং সাক্ষী পুরাতন খাজাঞ্চী আর অধিক কিছু জানিতেন না। আমি এই সম্পর্কে শ্বেতাঙ্গ সাক্ষীদের উক্তির আলোচনা করিব। কারণ তাঁহারা চোখের রং লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে ইংরাজী ভাষায় চোখের বিভিন্ন রংএর উল্লেখ থাকিত না। আমার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে-সব সাক্ষী বলিয়াছেন যে, বাদী ও কুমারের চোখের রং একই রকমের, তাহারা যদি সত্য কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই পর্য্যন্ত প্রমাণ আমরা পাই যে, বাদীকে দেখিয়া অন্ততঃ চোখের রং সম্পর্কে কোন পার্থক্য তাহাদিগকে চমকিত করিতে পারে নাই। এইরূপ সাক্ষী বিবাদীপক্ষেও ছিল। এখানে তাহাদের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। এইরূপ সাক্ষী অনেক আছে। বাদীপক্ষে যে-সব সাক্ষী কুমারের চোখ 'কটা' অথবা 'কটাভ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমি (১) জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী (বাদীপক্ষের ৬৬০নং সাক্ষী), (২) বিল্লু বাবু (ভগ্নীর ছেলে), (৩) সাগর বাবু (জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জামাতা) (৪) সরোজিনী দেবী, (৫) উকীল রেবতী বাবু, (৬) মণীন্দ্র বাবু (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার), (৭) ব্যারিষ্টার মিঃ এন, কে, নাগ (৮) উকীল মিঃ হিরণ্ময় বিশ্বাস। এই সকল বাদীপক্ষের সাক্ষী দের পূরা তালিকা আমি দিতে পারি। কর্ণেল পুলি, দ্বিতীয় রাণী, তৃতীয় রাণী, সৌভাগ্যচাঁদ (সত্যবাবুর এজলাসে এই ব্যক্তির ফৌজদারী মামলা ছিল), সত্যবাবু, পুরাতন খানসামা বিপিন (বর্ত্তমানে এষ্টেটের দপ্তরী), মামলার

তদ্বিরকারক রায়সাহেব যোগেন্দ্র, লেঃ হোসেন, দ্বিতীয় রাণীর মাসীমা সুকুমারী দেবী, ফণীবাবুর ভগ্নী শৈবলিনী দেবী, ফণীবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু জিতেন্দ্র, কমিশন সাক্ষী অতুলবাবু, ফণীবাবু, ষ্টেটের কর্ম্মচারী বীরেন্দ্র। বিবাদী পক্ষের এই সব সাক্ষীদের মধ্যে জিতেন্দ্র খুব সম্ভব চোখের রংএর বৈষম্য লক্ষ্য করেন নাই; কিন্তু এমন একটি দলিল এবং এমন সব ঘটনা রহিয়াছে, যাহাদ্বারা দুই পক্ষের পরস্পরবিরোধী প্রমাণের নিষ্পত্তি হইবে। ঐ সম্পর্কে আলোচনায় পূর্ব্বে আমি শ্বেতাঙ্গ সাক্ষী ও মিঃ কে, সি, দে'র সাক্ষের আলোচনা করিব। এই সম্পর্কে মিঃ কে, সি, দে'র সাক্ষে বিবাদীপক্ষের মোটেই সমর্থন করে না।

মিঃ কে, সি, দে বলিয়াছেন যে, সাক্ষ্য দিতে আসিবার ২৬ বৎসর পূর্ব্বে তিনি তিন কুমারকেই রেলওয়ে ষ্টেশনে, গার্ডেন পার্টি ইত্যাদিতে দেখিয়াছেন। জবানবন্দীতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বাদী ও কুমারের মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে কি না। তদুত্তরে তিনি বলেন যে, উভয়ের রং ফর্সা। উভয়ের চোখ নীলবর্ণ অথবা অন্ততঃ ফিকে নীল হইবে। জেরার উত্তরে তিনি বলেন, সহস্র সহস্র লোকের নীল চোখ আছে। এই উক্তি বরং বাদীর অনুকূলেই যায়। চোখের রং'এর কথা তাঁহার স্মরণ না থাকিলেও তিনি রংয়র বৈষম্য দেখিয়া বিস্মিত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, অনেকেরই নীল চোখ আছে। যদিও এই দেশে নীল চোখ অতি বিরল।

মিঃ মেয়ার বলেন,—দ্বিতীয় কুমারের চোখের রং ছিল পাতলা রকমের; তবে তিনি কোন রং সুস্পষ্ট বলেন নাই। মিঃ র‍্যাঙ্কিন বলেন যে, ইহার মধ্যে অত্যন্ত পাতলা বাদামী রং ছিল। লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল পুলি নিজে বিশ্বাস করিয়া এত সব জিনিষ গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহার বর্ণিত "এই ফিকে নীল রং" প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজী ভাষায় যাহা, তাহা হইতে পারে না। লর্ড কিচনাবের শিকারপর্ব্ব তাঁহার জ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হয় নাই। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার জ্ঞাতসারে এবং স্মরণকালের মধ্যে হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। অন্যেরা তাহাকে এরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে। তিনি তৃতীয় কুমারকে জানিতেন; তৃতীয় কুমার তাঁহার সহিত পলো খেলিতেন; তাঁহার চোখগুলি ছিল নীলাভ। এই সমস্ত কথা হইতে মনে হয় যে, তিনি দ্বিতীয় কুমার ও তৃতীয় কুমারের মধ্যে ভুল করিতেছেন। দ্বিতীয় কুমারের দেহও মাংসল ছিল। ছোট কুমার ছিলেন মোটা (তাহার ফটোগুলি দ্রষ্টব্য)।

মিঃ র‍্যাঙ্কিন সাক্ষ্য দিতে আসিবার পূর্ব্বে প্রায় ২৭ বৎসর কাল দ্বিতীয় কুমারকে দেখেন নাই। তিনি জবানবন্দীতে বলেন, দ্বিতীয় কুমারের চোখের রং ছিল পাতলা রকমের। তিনি প্রকৃত রংটা কি, তাহা বলেন নাই। আমি তাঁহাকে একটা প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তদুত্তরে সাক্ষী বলেন যে, পাতলা রংএর—এই কথা দ্বারা তিনি নীল অথবা ধূসর বুঝাইতে চাহেন। জবানবন্দীর সময় বিবাদীপক্ষ তাঁহার নিকট হইতে এই কথাটি আদায় করিয়াছেন যে, সাক্ষীর নিজের চোখগুলিকে ধূসর কিম্বা নীল বলা যাইতে পারে। তিনি স্বীকার করেন যে, ধূসর ও নীল চক্ষু সম্বন্ধে তাঁহাকে একটা প্রশ্ন করা হইয়াছে। বীমা করিবার সময় ডাঃ যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহার কতকটা প্রস্তাব এই সাক্ষ্যের উপর দেখিতে পাওয়া যায়।

বীমার ডাক্তারের রিপোর্ট

রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ কোন এফিডেভিটে বলিয়াছেন কিনা (প্রকৃত পক্ষে তিনি এরূপ বলিয়াছেন) যে, দ্বিতীয় কুমারের চক্ষুগুলি বাদামী আভাযুক্ত ছিল? সাক্ষীকে এইরূপ প্রশ্ন করা হইলে বিবাদী পক্ষের কৌসুলী মিঃ চৌধুরী বাধা দেন, এবং বলেন যে, এইরূপভাবে প্রশ্ন করিলে সাক্ষীর প্রতি সুবিচার করা হইবে না; কারণ এই বিষয়ে আরও কয়েকটি উক্তি রহিয়াছে। এস্থলে সাক্ষী কোন প্রকারেই বিচারক ছিলেন না; অতএব তাঁহার সম্মুখে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করা যাইত না। বাদী পক্ষ হইতে কৌসুলী মিঃ চাট্যো যাহা বলাইতে চাহিতেছিলেন, তাহা হইতেছে এই যে, এই "ধূসর অথবা নীল রং"—মুলতঃ যাহা সন্দেহ জনক স্মৃতির কথা মাত্র—তাহা প্রকৃতপক্ষে সাক্ষীর স্মরণ আছে কি না। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে যে, এই সাক্ষী তৃতীয় কুমারের চক্ষের রং কিরূপ ছিল, তাহা স্মরণ করিতে পারেন না। অথচ তিনি এই ছোট কুমারের সঙ্গে প্রায় সমানভাবেই—এমন কি দ্বিতীয় কুমারেব সঙ্গে অপেক্ষা অনেক বেশী সময় মিশিবার অবসর পাইয়াছেন! কারণ তৃতীয় কুমার ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, জবানবন্দীর সময় মিঃ র‍্যাঙ্কিনের স্মৃতিবেখা, পাতলা রকমের, এর বেশী আর কিছুই স্মরণে আনিতে পারে নাই। আমি এস্থলে সাক্ষীর একটি উক্তি স্মরণ করিতেছি। এই উক্তিতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ বলে যে, বাদীকে অনেকটা দ্বিতীয় কুমারেরই মত দেখায়, তাহা হইলে সে সত্য কথা বলিতেছে বলিয়াই মনে হয়।

কটা রং বলিতে কি বুঝায়

দার্জ্জিলিংএর এক হোটেলরক্ষক মিঃ প্লিভা বলিয়াছেন যে, ২৬ বৎসর পরেও তাহার মনে হইতেছে যে, দ্বিতীয় কুমারের চক্ষু ছিল নীল, ধূসর নহে। আমি এই সাক্ষীর কথা আলোচনা করিব না। আর একজন সাক্ষী—বিবাদী পক্ষেব ৫৭নং সাক্ষী দুর্গা বলিয়াছেন যে, বৈকালে ৫টার পর অন্ততঃ পাঁচবার তিনি 'মলে' দ্বিতীয় কুমারকে দেখিয়াছেন এবং মুখমণ্ডলে রক্তিমাভা লক্ষ্য করিয়াছেন। ইনি বিবাদী পক্ষের বক্তব্য অনুসারে মৃত্যুর ছয়ঘণ্টার পূর্ব্ববর্ত্তী রং কিরূপ ছিল, তাহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। আমি বলিতে পারি যে, যে সকল সাক্ষী বলিয়াছেন. কটা চোখ অথবা বিড়াল চোখের অর্থ হইতেছে নীল অথবা নীলাভ চোখ, তাহারা পক্ষদ্বয়ের বক্তব্যের উপর নজর রাখিয়া মিথ্যা অথবা সম্পূর্ণ বেপরোয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন। উভয় পক্ষের বহুসাক্ষীই বলিয়াছেন যে, বাদীর চক্ষু কটা। তাঁহারা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, কটা বলিতে এমন একটা রং বুঝায়, যাহা কৃষ্ণবর্ণ অথবা অন্ধকারের বর্ণ হইতে পৃথক। কটা রং সম্পর্কে সুকুমারী দেবী একটা চমৎকার পার্থক্যের ন্যায় নীল—অথবা ফিকে নীল বর্ণ বলিয়াই তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে এই সমস্ত কথা শিখাইয়া দেউক না কেন, সেই লোকটির দৃষ্টি মেডিক্যাল রিপোর্টের উপর ছিল। আর একটি সাক্ষীর উক্তি হইতে একথাটা অতিশয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেই সাক্ষী বলেন যে, কটা বলিতে সাধারণতঃ নীলাভ ধূসর বুঝায়। তাঁহার পদমর্য্যাদার কথা বিবেচনা করিয়া আমি ইহা মনে করিতে পারি যে, তাঁহাকেও শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তবে একথা সুস্পষ্ট মনে হয় যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিচারের বিষয়টি কি, তাহা তিনি শুনিয়া আসিয়াছিলেন (বিবাদী পক্ষের ৫৩নং সাক্ষী)।

রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ

এই যে বিতর্ক ইহার প্রকৃত মীমাংসা হয় একটি এফিডেভিটের দ্বারা। ভাওয়াল এষ্টেটের বৃদ্ধ ম্যানেজার রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর এই এফিডেভিট দিয়াছিলেন। রাজার বিবাহের পূর্ব্ব হইতে তিনি ভাওয়ালের ম্যানেজার ছিলেন। কুমারদের জন্ম হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যেককে দেখিয়াছেন। ইহার পরেও ঢাকায় তাঁহার সহিত কুমারদের দেখা হইয়াছে। কারণ পিতার পুরাতন বন্ধু হিসাবে কুমারগণ ঢাকায় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। কুমারের বীমার টাকা আদায় করিবার জন্য সত্যবাবু যেসব উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহারই প্রসঙ্গে বলা

যায় ১৯১০ সালের ৬ই মার্চ্চ রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর এই এফিডেভিট দিয়াছিলেন। সত্যবাবু স্বীকার করিয়াছেন, বীমার টাকা আদায়ের জন্য যেসব এফিডেভিটের প্রয়োজন হইয়াছিল, রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষের এফিডেভিট তাহারই মধ্যে একটি। এই এফিডেভিটের ভুল বলিয়া মনে করা হয় না। কুমারের জীবনবীমা এবং তাহার টাকা আদায় সংক্রান্ত দলিল-গুলির মধ্যে এই এফিডেভিট অন্যতম। ১।১২।৩০ ইং তারিখে মামলা আরম্ভ হইবার প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে বিবাদীপক্ষ, বীমা কোম্পানীর নিকট যে ছয়খানি এফিডেভিট চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, বর্ত্তমান এফিডেভিটখানি তাহাদের অন্যতম।

বিবাদী পক্ষের সুবিজ্ঞ কৌঁসুলী প্রথমতঃ ইহা নথিভুক্ত করিতে অসম্মত হ'ন (১২ ৩ ৩৪ ইং তারিখের ৬০ নং অর্ডার দেখুন) কিন্তু পরে তিনি ইহাতে রাজী হন! অতঃপর রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের এই এফিডেভিট-খানিকে বাদী পক্ষের সাক্ষ্য হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়।

এই এফিডেভিট হইতে গৃহীত একটি অংশ নিম্নে দেওয়া হইল :—

"আমি রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি-আই-ই, এতদ্বারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, গত ২৫ কিম্বা ২৬ বৎসর যাবৎ আমি ব্যক্তিগত ভাবে কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায়ের সহিত পরিচিত আছি। তাঁহার জন্মের সময় হইতে আমি তাঁহাকে জানি। প্রায় ২৬ বৎসর বয়সে ১৯০৯ সালেন ৮ই মে তারিখে দার্জ্জিলিংএ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার চেহারা ছিল এইরূপ :—

"তাঁহার গাত্র চর্ম্মের রং ফর্সা ; চক্ষু ও চুলের রং অনেকটা বাদামী, সুগঠিত দেহ ; শরীরের উচ্চতা ও আকৃতি সাধারণ রকমের।"

বিবাদী পক্ষের সাক্ষীরা বলিয়াছেন যে, এই ভদ্রলোক ছিলেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, অর্থাৎ বিদ্যাবুদ্ধিতে তিনি অন্যান্য সকলের উপর বিরাজ করিতেন। এই রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষের কোনও এক পত্রে যখন দেখা গেল যে, তিনি ভাওয়ালের প্রথম কুমারকে বলিতেছেন, তাঁহার কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতার মুখ হইতে যেন মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি ইংরাজী কথা বাহির হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন, তখন কুমারদের ইংরাজীজ্ঞান সংক্রান্ত কাহিনী বিপন্ন হইবার উপক্রম হইল। এই সময় আদালতকে বুঝাইবার চেষ্টা হইল যে, দ্বিতীয় কুমার যেটুকু ইংরাজী জানিতেন, তাহা রায় বাহাদুর কালী প্রসন্ন ঘোষের দৃষ্টিতে কিছুই ছিল না। আমি পরে এই বিষয়ের কথা বলিব। তবে ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রতিজ্ঞা করিয়া এফিডেভিট দেওয়ার সময় রায় বাহাদুর নিশ্চয়ই অতি সতর্ক ভাবে কথাগুলি বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং তিনি সত্যই যে সব কথা লিপিবদ্ধ

করিয়াছিলেন তাহা আর কেহ অধিকতর যোগ্যতার সহিত বলিতে পারেন না। 'ধূসর' এই কথাটী ডাক্তারের রিপোর্টে কি করিয়া আসিল? বিবাদী পক্ষ গত ১৯২১ সালে ইহা জানিয়াও (৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০নং একজিবিট) চক্ষুর বর্ণনায় কেন 'ধূসর' না বলিয়া নীল বলিলেন? এমন কেহ ছিল কি, যে ব্যক্তি কটা রংকে গ্রে (ধূসর) বলিয়া অনুবাদ করিয়াছিল? বিবাদী পক্ষ কি ধূসর কথাটির অর্থ না জানিয়াই মনে করিয়াছিলেন যে, ইহার মানে কটা, এবং বাদীর বেলায় তাহা খাটিতে পারে? একথা সত্য যে, বিবাদী পক্ষ ইচ্ছা করিয়াই ইহা তলব করেন নাই। তাঁহারা হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে, ইহা নির্ব্বিঘ্নে এডিনবরার কার্য্যালয়ে চাপা পড়িয়াই থাকিবে। এই দলিলে লিপিবদ্ধ একটা চিহ্ন সম্পর্কে তাহাদের ভয় ছিল; কিন্তু এক দলিলখানি শেষ পর্য্যন্ত আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইবার আশঙ্কা ছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত এই আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হইল। বিবাদী পক্ষের বর্ণনা অনুসারে বাদীকে প্রতারক বলিয়া ধরিয়া লইলেও তিনি শুনানীর শেষ পর্য্যন্ত এই দলিলখানি তলব দিয়া আদালতে আনিয়া হাজির করিতে পারিতেন এবং যে কোন অবস্থাই হউক না কেন, বিবাদী পক্ষ 'ধূসর' এই কথাটির সুযোগ লইতে পারিতেন। এই দলিলখানি স্কট্‌ল্যাণ্ডে ছিল এবং মাননীয় বোর্ড ছাড়া আর কেহই ইহা দেখেন নাই। ১৯২১ সালের মে মাসে তলব দিয়া এই দলিলখানি আনয়ন করিয়া ১৯২১ সালের জুলাই মাসে তাহা দেখিয়া মাননীয় বোর্ড স্কটল্যাণ্ডে ইহা ফেরত দেন। বাদীর বক্তব্য শেষ হইবার প্রাক্কালে ৬-১২-৩৪ ইং তারিখের তলব অনুসারে এই দলিলখানি ইংলণ্ড হইতে আবার ভারতে পাঠান হয়। বীমা কোম্পানীর পত্রানুসারে বিমান ডাকেই এই দলিলখানি ভারতে আসিয়া ১৫-১২-৩৪ ইং তারিখে আদালতে পৌঁছিয়াছিল। (ডি ফাইলের পেপার নম্বর ২৪৩২ ১৪৪৮ দেখুন) ইহার দীর্ঘ সময় পূর্ব্বে ৫-২-৩৪ ইং তারিখে বীমা কোম্পানীর এজেণ্ট মিঃ জি, সি, সেনের সাক্ষ্য বাদী পক্ষ হইতে গ্রহণ করা হয়। ইহারই চেষ্টায় কুমারের জীবন বীমার ব্যবস্থা হইয়াছিল মেডিক্যাল রিপোর্টে এই বলিয়া তাঁহার নাম আছে যে, তিনিই কুমারকে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। বিবাদী পক্ষ তাঁহাকে জেরা করেন এবং জেরার সময়ে দেখাইতে চাহেন যে, ইনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছেন, আসলে তিনি বীমার এজেণ্ট ছিলেন না, অপরএক ব্যক্তি মিঃ তর ছিলেন কুমারের জীবন বীমার এজেণ্ট, এবং মিঃ জি, সি, সেন তাঁহার খাতায় একটা মিথ্যা কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন। বিবাদী পক্ষ নিশ্চয় মনে করিয়াছিলেন যে, মেডিক্যাল রিপোর্টখানি স্কটল্যাণ্ডেই চাপা থাকিবে, কিন্তু যখন এই রিপোর্ট আসিয়া পড়িল তখন বিবাদী পক্ষ স্বীকার করিলেন,

যে, প্রকৃতপক্ষে মিঃ জি, সি, সেনই কুমারের জীবন বীমার এজেণ্ট ছিলেন। বাদী পক্ষ উক্ত মেডিক্যাল রিপোর্টের মর্ম্ম অবগত হইবার পূর্ব্বেই এই সাক্ষী (মিঃ জি, সি, সেন) ঘটনা সম্পর্কে এইরূপ বর্ণনা দিয়াছিলেন আমি তাহার বর্ণনাটা একটু সংক্ষেপে করিলাম ; তবে কোন কিছুই বাদ দিলাম না।

ইন্সিওরেন্স ডাক্তারের নিকট

বেলা অপরাহ্ন ২টা ও ৩টার মধ্যে সাক্ষী কুমারকে ডাঃ কেডির নিকট লইয়া যান এবং জয়দেবপুরের 'মহারাজ কুমার' বলিয়া ডাঃ কেডির সহিত পরিচয় করিয়া দেন। ডাক্তার কেডি কুমারকে এই প্রকারে হাত চিৎ করিয়া কপালে স্পর্শ করিয়া সেলাম করেন। কুমার মাথা নাড়িয়া সেলাম গ্রহণ করেন। (মাথা কিঞ্চিৎ নীচু করিয়া)। ডাঃ কেডি কুমারের ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করেন। কুমারের ওজন লন, জোরে নিঃশ্বাস লইবার পর বুকের ছাতির মাপ গ্রহণ করেন ; আবার নিঃশ্বাস ত্যাগের পর আর একবার বুকের ছাতির মাপ লন। তারপর মূত্রের নমুনা লইয়া তাহা পরীক্ষা করেন এবং উচ্চতার মাপ লন। অবশেষে ডাক্তার তাঁহার আসনে উপবেশন করিয়া, ডাক্তারের রিপোর্টের ঐ নির্দ্দিষ্ট ফরমে অংশ লিখিতে আরম্ভ করেন। তারপর, কুমারের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস সংগ্রহের জন্য ডাক্তার কুমারকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন।

ডাক্তার ইংরেজীতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঐ প্রশ্ন বাঙ্গালায় তরজমা হইলে পর কুমারকে তাহার উত্তর দিতে বলা হয়। কুমার বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর করেন ; এবং আমি তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ডাক্তারকে বলিয়া দেই। রিপোর্ট লেখা হইবার পর মধ্যমকুমারকে ঐ রিপোর্টে প্রশ্নোত্তরের তলায় স্বাক্ষর করিতে বলা হয়। মধ্যম কুমারের গায়ের রঙ্গের মত রং, চক্ষু এবং চুল বিশিষ্ট অপর কাহাকেও ডাক্তারের নিকট লইয়া যাওয়া হইয়াছিল কিনা, সাক্ষীর তাহা স্মরণ নাই—

চক্ষুর রং বিশ্লেষণ

রিপোর্টের নির্দ্দিষ্ট স্থানে মধ্যমকুমার স্বাক্ষর করিলে পর, ডাক্তার আমাকে কুমারকে সনাক্ত করিবার উপযুক্ত কতকগুলি চিহ্ন নির্দ্দেশ দিতে বলেন। তদুত্তরে আমি বলি—'রং সাদা, চক্ষু ধূসর বর্ণ, চুল বাদামী রং'এর—সনাক্ত করিবার পক্ষে এই সকল লক্ষণ যথেষ্ট ; কারণ বাঙ্গালীর মধ্যে সচরাচর এরূপ দেখা যায় না।

এই অংশ সম্বন্ধে সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই। 'ধূসর' শব্দটী যে সাক্ষীর নিজের ব্যবহৃত ভাষা, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 'কটা' শব্দের অনুবাদও সাক্ষীর নিজের কৃত সামান্য একটী বিষয়ের উল্লেখ করিলেই এবিষয় সমথিত হইবে। মেডিকেল রিপোর্টে যাহা লেখা আছে, তাহা এই—

"চুল বাদামী, সুন্দর গোঁফ। ধূসরবর্ণ চক্ষু"

একটী পূর্ণচ্ছেদের পর 'ধূসরবর্ণ চক্ষু' শব্দ দুইটী লেখা। এই দুইটী কথার আগেকার কথাগুলি যেরূপ ফিকে হইয়াছে, 'ধূসরবর্ণ চক্ষু, কথা তাহাব অপেক্ষা বেশী ফিকে। এরূপভাবে লেখা যে, দেখিলেই মনে হয় যেন পূর্ব্বে কথাগুলি লিখিবার কিছু পরে, ঐ শব্দ দুইটী লেখা হইয়াছিল। কথা দুইটী মৌলিক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্বের কথাগুলি যেরূপ একটানা, লেখা শেষের দুইটী কথা সেভাবে লেখা নহে।

ধূসর শব্দটী মিঃ সেনের কল্পিত ডাঃ কেডির নহে,—সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই যে দিক দিয়াই দেখা যাউক, আমি রায় বাহাদুরের এভিডেভিটকেই বেশী বলবৎ বলিয়া গ্রহণ করিব, কারণ নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার ঐ এভিডেভিট প্রধান সোপান বলিয়া মনে হয়। সেই এভিডেভিটে 'বাদামীর আভাযুক্ত' শব্দ পাওয়া যায়। যিনি কুমারকে জন্মকাল হইতে দেখিয়াছেন, বিশাল জমিদারী যাঁহার রক্ষণাধীন ছিল, যিনি অগাধ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত, তিনি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক যে দলিল নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাতেই লেখা আছে.—'চুল এবং চোখ বাদামী রংএর আভাযুক্ত' আমার বিশ্বাস রায় বাহাদুর চক্ষুর রং 'বাদামীর আভাযুক্ত' বলিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই সত্য যাঁহারা সত্যসত্য রং চিনিতেন অসাবধানতার সময়ে সত্য কথা গোপন করা তাঁহাদেব পক্ষে বিশেষ কঠিন হইয়াছিল। ডাক্তার আশুবাবুকে মধ্যম কুমারের চক্ষুর বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন,—

"চক্ষু দুইটীর রং পিঙ্গলা অর্থাৎ নীল রংএর আভাযুক্ত পিঙ্গলা বলিতে নীল রংএর আভা বুঝায়। পিঙ্গলা বলিতে বাদামী বুঝা যায়; তাহা লাল অর্থাৎ রক্ত বর্ণের আভাযুক্ত বিড়ালচক্ষু না তাহাও নহে। কিন্তু বাদামী রংএর।"

এষ্টেটের নায়েব প্রবল রায় একজন মহা চালাক এবং পাক্কা লোক। তিনি ভারী ধুরন্ধর ও হিসাবী। এই মামলায় তিনি যে বিষয় প্রমাণ করিতে আসিয়াছিলেন, সেই বিষয় হইতে তাঁহাকে একটুও হটান যায় নাই। তিনি বলিয়াছেন—"মধ্যম কুমারের চক্ষু দুইটি কটা রংএর ছিল।"

"প্রঃ—কিরূপ ধরণের কটা ?"

"উঃ—তাহা আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিব না। বিড়ালের চক্ষুর মতও নয়, কারণ, তাহারও ইতরবিশেষ হয়। কোনও প্রকারের বিড়াল চক্ষুর সঙ্গেই কুমারের চক্ষুর তুলনা করা যায় না। মধ্যম কুমারের চোখ কালোও ছিল না, সাদাও ছিল না। অন্য কোনও জিনিষের সঙ্গে তুলনা করিলে হয় তো কিছু সাদা রংএর মত দেখাইতে পারে। কিন্তু তাহাকে 'একটু সাদা' বলা যায় না। তুলনার হিসাবে অন্য কোনও সামগ্রীর উল্লেখ না কবিলে, অথবা অন্য কিছুর সঙ্গে না দেখাইলে, একটু সাদা বলিলে কিছুই বুঝা যায় না। মধ্যম কুমারের চোখ লাল্‌চে রংএর ছিল না। কেহ কেহ হয়তো পিঙ্গলা বলিলেও বলিতে পারেন, কিন্তু লাল্‌চে নহে।"

সাক্ষীকে পুনরায় প্রশ্ন করা হইলে সাক্ষী বলেন,—

প্রঃ—আপনি বলিয়াছেন মধ্যম কুমারেব চোখের রং লাল্‌চে নয়—পিঙ্গলা। সেটা কি রং ?

উঃ—ঈষৎ নীলাভ।

আদালতকে লক্ষ্য করিয়া—নীলাভ বলিলেই পিঙ্গলা বুঝায়।

ইহা একটী প্রহসন মাত্র। শ্রীপুরের মামলায় এই সাক্ষী বলিয়াছিলেন,— "চোখের তারার চারিদিকে যে গোলাকার অংশ আছে, মধ্যমকুমারের চোখের সেই অংশ কালোও নহে, বিড়ালের চোখের মতও নহে; তবে একটু সাদার আভাযুক্ত। বিড়ালের চোখের ঐ অংশের নীল রংএর তুলনায় তাহা সাদা—সাক্ষী তাহাই মনে করেন। বাদী পক্ষের সাক্ষিগণের যাহারা মধ্যম কুমারের চক্ষুর রং পিঙ্গলা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাদের কেহ কেহ 'সাদার আভাযুক্ত' কথাও বলিয়াছেন; তাহাদের একজন সাক্ষী মধ্যম কুমারের চক্ষুকে 'নারিকেল চক্ষু' বলিয়াছেন (বাদী পক্ষের ২৫০ নং সাক্ষী) তাহাতে, নারিকেলের রংএর মত—এই কথাই তাঁহার বক্তব্য বলিয়া মনে হয়।

রায় সাহেব বলিয়াছেন,—তিনি ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে বাদীর চক্ষুর বর্ণ লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি তখন বাদীর চোখে বাদামী রং দেখিয়াছিলেন, তারপর এই সন্ন্যাসী পুনরায় জয়দেবপুরে যান এবং আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন। ভগ্নী তাঁহাকে কুমার বলিয়া গ্রহণ করেন। সাক্ষী তাঁহাকে (বিবাদীর ভগ্নীকে) সচ্চরিত্রা বলিয়া জানিতেন।

আমার মত এই যে, বাদীর চোখের রংএর ন্যায় মধ্যম কুমারের চোখের

রংও ফিকে বাদামী। বাদী ও কুমারকে স্বতন্ত্র প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক মধ্যম কুমারের 'নীলবর্ণ চক্ষু' এইরূপ মিথ্যা বৈশিষ্ট্যের কল্পনা করা হইয়াছিল।

ফটোতে চেহারার পরিচয়

আমি রং সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিয়াছি। বিশেষজ্ঞগণ ফটো পরীক্ষা করিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ফটোসহ তুলনা করিয়া চেহারার যে পরিচয় পাওয়া যায়, এক্ষণে আমি তাহারই আলোচনা করিব।

মধ্যম কুমারের আটখানি ফটোগ্রাফ আছে। তাছাড়া আরও আট-খানি ফটো আছে। তাহার কতকগুলি ফটোর নকলও ফটো হইতে বাড়াইয়া প্রস্তুত করা হয়।

গ্রুপ ফটো ব্যতীত বাদীরও ১৬খানি ফটো আছে। সহজে বুঝিবার জন্য সেই ফটোগুলিকে নিম্ন প্রকারে বিভিন্ন ভাগে সাজান ও নামকরণ করা যাইতে পারে, যথা—

মধ্যম কুমারের ফটোগ্রাফ

১ ইনসেট ফটো—একজিবিট (২)

নকল ফটো

৯৭—এক্স (৪৫)—বড় আকারের

৬২—এক্স (৪৯)—বক্ষ পর্য্যন্ত (বাষ্ট—বড় আকারের)

৯—(ফ্রিজ ক্যাপ, ঢাকা—এই কথাগুলি কার্ড বোর্ডের নীচে ছাপান আছে)।

এক্স (২৭৮)

৬৩—বক্ষ পর্য্যন্ত (বাষ্ট)

৪৪—এ, সি, গাঙ্গুলীর গৃহীত

৯৩—পি /১০ লাহোর কমিশনারের লওয়া।

৬১—১০-৬-৩৪ তারিখে মিঃ উইণ্টার্টন কর্ত্তৃক গৃহীত (বাদীর ৭৮০নং সাক্ষী)।

৮৩—এক্স (৪৭)

২। ছোট পাজামা পরিহিত, ব্যাঘ্রসহ গৃহীত ফটো·········একজিবিট ১ (১০)।

১৯০৯ সালে এই ফটো গৃহীত হয়। উপরে তাহা দেখা গিয়াছে।

ফটোগ্রাফের নকল

একজিবিট—এ (২) ও এক্স (৩২)

৩। ধুতি পরা এবং ব্যাঘ্রসহ গৃহীত ফটো—একজিবিট (৫০)

নকল—

৮৯ (বাষ্ট—বক্ষ পর্য্যন্ত)—মুদ্রিত, লাহোরের পি /৬নং।

৪। পাঞ্জাবীসার্ট গায়ে বাষ্ট ফটো—একজিবিট (৯০) পি /৭নং। লাহোরে সংগৃহীত।

৫। থ্রিকোয়ার্টার ফ্রক্ কোট পরিহিত (একজিবিট নং ১৮)।

৬। থ্রি কোয়ার্টার ফ্রক্ কোট পরিহিত (একজিবিট নং ১৫)।

৭। মুখুটির সহিত ফটো—দণ্ডায়মান।

৮। বিবাহের পূর্ব্বের ফটো।

ফটোগুলির মধ্যে ২নং ফটো মেজকুমারের দার্জ্জিলিং যাইবার সময়ের অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছে। ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে শিকারের পর ধুতিপরিহিত অবস্থায় বাঘ সহ এই ফটো গৃহীত হইয়াছে। ১৯০২ সালের বিবাহের পূর্ব্বে যে ফটো গৃহীত হইয়াছে, উহাকে বিবাহকালীন ফটো বলিয়া ধরা যাইতে পারে, ইহা অনেক আগেকার ফটো। মেজকুমারের ১৪ বৎসর বয়সে মুখুটির সহিত যে ফটো গৃহীত হইয়াছে, উহাই অতি আগেকার ফটো, বাণী এই ফটোখানি চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু মিঃ র‍্যাঙ্কিন ও শরদিন্দু মুখুয্যে উহাকে চিনিতে পারিলেন।

নানা বেশে বাদীর ফটো

এই ফটোর কোনটা কোন সময়ে গৃহীত হইয়াছে, তাহা ঠিক বলা যায় না. তবে ক্রমে ক্রমে পোষাকের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। লুঙ্গি ছাড়িয়া বাঙ্গালীর মত ধুতি ধরিয়াছেন, মেজকুমারের পোষাক পরিহিত ফটো সম্পর্কে জানা যায় যে, ১৯২৪ সালে বাদী ঢাকা ছাড়িয়া কলিকাতা যাইলে তখন তথায় উক্ত ফটো গৃহীত হয়।

১। কৌপীন পরিহিত বাদী—একজিবিট নং এ (১৯)—এক্স (২৮৩)।

উহার কপি :—

এ (৫২)—একস (৩১৫)—'বি' কমিশনার গাঙ্গুলী।

২। গোটিলা ফটো—একজিবিট (১২) একস (৩৭)।

উহার কপি :—

এ (৩৫)—একজিবিট 'সি' কমিশনার ডি

—লাহোর। ২

৩। লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় দণ্ডায়মান—এ (৩৬)—এস, বি, ডি, ৯৪।

উহার কপি—এ (৪১)।

৪। লুঙ্গি পরিহিত, উপবিষ্ট—এ (২৪)

ডি/১ লাহোর, কমিশনার।

উহার কপি :—এ (৩৯),=এস, বি, ডি, ১৮ এ (৫১)—এল, এইচ, এল (১)।

৫। ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর উপবিষ্ট—

একজিবিট এ (৩৭)=এস, বি, ডি, (১৫)।

৬। কৃশাঙ্গ—একজিবিট নং ৫৭

৭। শাল পরিহিত একজিবিট নং এ (৩৫)।

৮। ডবল ব্রেষ্ট কোট—একজিবিট (৮৩) পি /২ লাহোর।

৯। শিকার কোট—একজিবিট (২৪)।

১০। খোলা গায়—একজিবিট (৪৩)।

কপি (৮৪)—সি, (১) লাহোর।

১১। মুখের পার্শ্ব দৃশ্য—(৪৯)—এক্স (২৮৮)।

১২। জটা ছাড়া ধুতি পরিহিত অবস্থায় দণ্ডায়মান বাদী—(৮৮) পি /৫ লাহোর।

(১৩) জটা ব্যতীত ধুতি পরিহিত অবস্থায় উপবিষ্ট বাদী—একজিবিট ৩। কপি একজিবিট ৪৬—সি' গাঙ্গুলী একজিবিট ৪৫—বি' গাঙ্গুলী (বাষ্ট), একজিবিট ৬৫—এক্স (৪৮) ব্যাষ্টের বড় আকার

একজিবিট সি ১২—এক্স (৪৪) একজিবিট ৮৬ এক্স (৪৬))

(১৪) সেফটিফিন দ্বারা আবদ্ধ উত্তরীয় সহ—একজিবিট ৬০

২৮-৪-৩৪ তারিখে মিঃ উইনণ্টারটন দ্বারা গৃহীত কপি

৪৭—ডি গাঙ্গুলী

৪৮—ই গাঙ্গুলী

৬৬—(এনলার্জ্জ করা হইয়াছে। গোঁফসহ)

৬২—(এনলার্জ্জ করা হইয়াছে। চুলসহ)

(১৫)—প্রাচীন দরবারী পোষাকে—৪। সম্ভবতঃ কপি ১৯।

(১৬) গ্রুপ হইতে আলাদা করা হইয়াছে—৮২। সময় অনুযায়ী শেষটা আগে যাইবে (১৭) উহাই সকলের শেষে গৃহীত।

বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য এবং ফটোগুলি তুলনা করিলে কয়েকটা বিবরণ পাওয়া যায়। মিঃ চৌধুরী বাদীপক্ষের ৫৪৪নং সাক্ষী মিঃ গাঙ্গুলীকে নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কয়েকটা জিনিষের উপর ফটোতে অবিকল ছবি উঠা নির্ভর করে—যেমন যন্ত্রটা ঠিক থাকা চাই, আবহাওয়া অনুকূল থাকা চাই। দূরত্বমাপ ঠিক হওয়া চাই, রাসায়নিক দ্রব্যের মাপ ঠিক থাকা চাই। মিঃ চৌধুরী নিজেই বলিয়াছেন যে, সকল প্রকার অবস্থা অনুকূল হইলে ফটোতে ঠিক চেহারাই উঠে।

বিবাদীপক্ষের ৮নং সাক্ষী মিঃ পার্সি ব্রাউন বলিয়াছেন, আমি যখন চোখ দিয়া পাশাপাশি দুইটী ফটোকে দেখি তখন উহাতে পার্থক্য দেখিনা, যখন আমি উহা বিশেষভাবে দেখি, তখন উহার মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে তাহা আমার চোখে পড়ে। ইহা দক্ষ ফটোগ্রাফোরের চক্ষুতে ধরা পড়ে। সাধারণ লোকের চোখেও পার্থক্য ধরা পড়ে, তবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধরিতে পারে না।

মোটামুটি কথা এই যে, চোখে যাহা দেখা যায়, ফটোতে উহাই উঠে। ফটোতে কলাইশুঁটির আকারে আকৃতি উঠিলেই উহা চিনা যায়।

আমি সকল ফটোগুলি দেখিয়াছি, উহাতে একটার আকৃতির সহিত অন্যটার আকৃতির পার্থক্য নাই বলিয়া মনে হয়। গ্রুপ ফটোগুলির মধ্যে এক একটি লোকের মুখকে কলাইশুঁটি হইতে বড় দেখায় না, ঐগুলি চেনা যায়; কিন্তু যে গুলির মাথা নীচু হইয়া থাকে ঐগুলির উপর আলো না পড়িলে চিনা শক্ত হয়।

ফটোতে সন্ন্যাসীর মুখের চেহারা

মুখ যদি নীচু করা যায় তবে চিবুক আসিয়া কণ্ঠে ঠেকে; সঙ্গে সঙ্গে কান উপরের দিকে উঠে। নাসিকার যে স্থানটিকে সেতু বলা হয় উহার বিপরীত দিকে কাণের গোড়া দেখা যায়, অথবা চোখের সহিত এক লাইনে ত অন্ততঃ দেখা যাইবেই, যদিও কানের সর্ব্বোপরি ভাগ থাকে ঠিক ভ্রূর সহিত একলাইনে এবং কানের সর্ব্বনিম্নভাগ অর্থাৎ কানের লতি থাকে নাসারন্ধ্রের। বরাবর মুখ নীচু অবস্থায় চোখ ও ভ্রূর মধ্যে দূরত্ব কমিয়া যায়, নাকের অগ্রভাগ মুখের কাছে চলিয়া আসে এবং মাথার চুল অধিকাংশই দেখা যায়। মুখ যদি উচু করা যায়, তবে ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা হয়। মাথা ডানদিকে হেলাইলে

বামদিকের কোণটি অপরটির তুলনায় অধিক উর্দ্ধে উঠিবে। সংক্ষেপে বলা যায়, ছবি দেখিয়া মুখের গড়ন বিচারের ইহাই ফলাফল।

এই মামলায় এই বিষয়টি লইয়া যে প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কুমারের ইনসেট ফটোতে দেখা যায় যে, বামচক্ষুর বাহির দিকের কোণা কিঞ্চিৎ উর্দ্ধদিকে, অথচ বাদীর ঠিক সেই চক্ষুর সেই কোণ সোজা বা সামান্য নীচু দিকে হেলান। বিবাদী পক্ষ ইহাকেও একটি পার্থক্য বলিয়া ধরেন, এবং মিঃ চৌধুরী বাদীপক্ষের ৫৪৪নং সাক্ষী মিঃ গাঙ্গুলীকে বলেন যে, কুমারের চোখ টেরা ছিল। ফটো গ্রহণের সময় কুমার কি অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য মিঃ চৌধুরী ইন্‌সেট্‌ ফটো হইতে বর্দ্ধিতাকারে প্রস্তুত একটি আবক্ষমূর্ত্তি সাক্ষীর নিকট উপস্থিত করেন। মিঃ গাঙ্গুলী স্বীকার করেন যে, বাম চক্ষুর বাহির কোণ উর্দ্ধদিকে আছে এবং মিঃ পার্শি ব্রাউন ইহাকে একটি পার্থক্য ধরিয়া লইয়া বলেন যে, কুমারের চোখ টেরা ছিল। পূর্ণাঙ্গের ইনসেট ফটোতে দেখা যায় যে, কুমার তাঁহার ডানদিকে একটি টেবিলে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন; কাজেই তাঁহার বামচক্ষুর বাহির কোণ উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। মিঃ চৌধুরী কেবল বামচক্ষুর উর্দ্ধগমনের কথাই বলিয়াছেন, ডান চোখের কথা কিছু উল্লেখ করেন নাই, কাজেই এই ফলাফলের কথা ধরা পড়িয়াছে এবং উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মিঃ পার্শি ব্রাউন একথা স্বীকার করিয়াছেন যে (১৫এ) নং ফটোতে এই বৈশিষ্ট্য নাই। বিবাদী পক্ষের ৫৬নং সাক্ষী মিঃ মুসলী হোয়াইট মিঃ পার্শি ব্রাউনের পরে সাক্ষ্য দিলেও এই পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেন নাই।

বাদীপক্ষ হইতে মিঃ চাটার্জ্জী 'সখের শিল্পী' কর্ণেল পুলীর সাক্ষ্য হইতে এই কথা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, কুমারের ইনসেট ফটো এবং বাদীর উপবিষ্ট অবস্থায় গৃহীত ফটো—উভয় ফটোতেই দেখা যায়, কাণ চোখের লেভেলের নীচে; কাজেই ইহা একটি সাদৃশ্যের চিহ্ন; কারণ সচরাচর ইহা দৃষ্ট হয় না। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল পুলী বলিয়াছেন, উহা বিরল নহে, মুখ রাখিবার ভঙ্গীতেই উহা হইয়াছে, ইহা কোন বৈশিষ্ট্য নহে, ইহা সাদৃশ্য প্রমাণের কোন চিহ্ন নহে।

(৫) মাংসপেশী, অথবা সিল্কের কাপড় অথবা জটা, অথবা চুলের কুঞ্চন— এইভাবই আলোছায়ায় প্রতিফলিত হয়, ইহাদ্বারা ঘনত্বই বুঝা যায়। মিঃ পার্শি ব্রাউন (একজি ৪৯) ও (একজি ৪৮) নং ফটো পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, বাদীর চুল সোজা এবং কুমারের চুল ঢেউ খেলান। কার্য্যতঃ আমি দেখি যে বাদীর চুল ঢেউ খেলান।

(৬) সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, একই ব্যক্তির জীবনে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত ফটো দেখিয়া যাহারা সেই ব্যক্তিকে চিনে, শুধু তাহারাই দিশা করিতে পারে; কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে একবার কেন বহুবার দেখিয়াও হয়ত সেই ফটোগুলি একই ব্যক্তির বলিয়া চিনিয়া লওয়া কঠিন। আমি পূর্ব্বেও এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কুমারের চৌদ্দ বৎসব বয়সে গৃহীত ফটো (একজিবিট্ ঃ—১১) দেখিয়া মিঃ র‍্যাঙ্কিণ এবং শরদিন্দুবাবুর পক্ষে চেনা সম্ভব, কারণ তাঁহারা তখন কুমারকে দেখিয়াছিলেন। ইনসেট ফটোতে কুমারকে যেমন দেখায়,—সে অবস্থায় তিনি যদি আদালতে আসিয়া হাজির হইতেন, এবং খুটিনাটিভাবে বিচার না করিয়া যদি একবার মাত্র দেখিয়া বা কয়েকবারও দেখিয়া কেহ তাঁহাকে কুমার বলিয়া অস্বীকার করিত, তবে কুমাব নিশ্চয়ই পরাজিত হইয়া যাইত। একজিঃ এ ১৫নং ফটোতে তাঁহার গোঁফের অবস্থা দেখিয়া ইনসেট ফটো হইতে বিশেষ পৃথক বলিয়া মনে হয় না; এই প্রকার তাঁহার অনেক পরবর্ত্তী ফটো—যাহা "টাইগার ফটো" বলিয়া অভিহিত এ (১০), তাহা দেখাইয়া কুমারের জিতিবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না। কার্য্যতঃ দেখা যায়; একজিঃ এ (১০), নং ফটোতেই কুমারের অপেক্ষাকৃত সুবিধা হইত। কুমারকে যাঁহারা ভালভাবে চিনিতেন, তাঁহারা সকল ফটো দেখিযাই কুমারকে চিনিতে পারিতেন; তাঁহাদের স্মৃতিতে কুমারের যে ছবি অঙ্কিত থাকিবে তাহা হইতেই কুমারের চেহারার প্রতিটী বৈশিষ্ট্য তাহাদের চোখে ধরা পড়িবে। অবশ্য কুমারের স্মৃতি যদি তাহাদের মন হইতে মুছিয়া গিয়া না থাকে উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বীরেন্দ্র বাড়ুজ্যে একজিঃ ১২নং ফটোতে কুমারের দণ্ডায়মান চেহারা দেখিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাকে কুমার বলিয়া স্বপ্নেও তিনি ধরিয়া লইতে পারেন না। বাদীর প্রথমাবস্থার ফটোর যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

ফটো বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য

আমি এখন বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্যের কথা বলিব। বাদী পক্ষের মিঃ গাঙ্গুলী এবং মিঃ উইনটারসন এবং বিবাদী পক্ষে মিঃ পার্শি ব্রাউন ও মিঃ মুশিল হোয়াইট সাক্ষ্য দিয়াছেন।

মিঃ গাঙ্গুলীর বয়স ৫৯ বৎসর। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মূর্ত্তি আঁকিয়াও অর্থোপার্জ্জন করেন। তিনি যে সকল ব্যক্তির প্রতিকৃতি আঁকিয়াছেন, তাহাতেই তাহার পদমর্য্যাদা সূচিত হয়। তিনি লেডী হাডিঞ্জ, দেশীয় নৃপতিগণ, স্যার হার্ব্বাট বাটলার,

স্যার উইলিয়ম মরিস এবং এইরূপ আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির ছবি আঁকিয়াছেন। তিনি এক একখানি প্রতিকৃতি আঁকিবার জন্য ২৫০০৲ এবং পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি আঁকিবার জন্য ৭ হাজার টাকা করিয়া পারিশ্রমিক নিয়া থাকেন। তাঁহার জমিদারীর আয়ও বার্ষিক ৪০ হাজার হইতে ৬০ হাজার টাকার মধ্যে হইবে। তিনি যে স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মিঃ পার্শি ব্রাউন সেই স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন; এবং মিঃ গাঙ্গুলীও দুই বৎসরের জন্য ঐ স্কুলের স্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছিলেন। সাক্ষী ফটোগ্রাফার নহেন, কিন্তু তাঁহারই কথায় বলা যায় যে, তিনি ফটোগ্রাফী লইয়াও নাড়াচাড়া করেন।

তিনি বলেন যে, ১৯৩৪ সালের ৩০শে মে তাঁহার সাক্ষ্য গৃহীত হয়। মনোহন রায় নামে বাদীর একজন লোক তাঁহার হাতে আনিয়া দুইখানি ফটো দেয়। এবং উহার সাদৃশ্য সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করে। ইহার পর বাদী আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন এবং বলেন যে, আদালতে তাঁহার সাদৃশ্য প্রমাণের চেষ্টা চলিয়াছে। সাক্ষী দুইখানি ফটো তুলনা করিয়া দেখিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং বাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হন। তাঁহাকে কোনরূপ ফী দেওয়া হয় নাই, কেবল যাতায়াতের খরচ দেওয়া হয়। সাক্ষী বলেন যে, বাদীর অবস্থা স্বচ্ছল নয়।

মিঃ গাঙ্গুলীর মতামতের যাহাই মূল্য থাকুক না কেন, তাঁহার সততা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তিনি যখন আসিয়া সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়াছিলেন তখন বাস্তবিকই আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম এবং এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজস্ব মত এবং তিনি এমন ভাব কখনও দেখান নাই যে, তাঁহার মতামতই মানিয়া লইতে হইবে; যদিও মিঃ চৌধুরী তাঁহার উপর এই দোষারোপ করিয়াছেন।

সাক্ষী তুলনা করিয়াছেন:—মিঃ উল্টারটন ১৯৩৪ সালে বাদীর যে দুইখানা ফটো তোলেন, তাহার ডি এবং ই ফটো।

ধুতি পরিহিত, উপবিষ্ট অবস্থায় তোলা ফটো হইতে 'এনলার্জ' করা বাদীর আবক্ষ ফটো। যে এটো তোলা হয় তাহা ৩নং একজিবিট।

৩নং একজিবিট হইতে তোলা একখানি ফটো।

এক কথায় তিনি বাদীর বর্ত্তমান ফটো, অনুমান ১৯২৫ সালে কলিকাতায় যে ফটো তোলা হয় তাহা, এবং কুমারের ২৪ বৎসর বয়সের (অথবা কিছু কম হইবে) ইনসেট করা ফটো তুলনা করিয়াছেন; ১৯২৫ সালে বাদীরও এই বয়স ছিল বলিয়া তিনি বলিয়াছেন।

মিঃ গাঙ্গুলী স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, এই তিনখানি ফটো একই ব্যক্তির। কিন্তু বিভিন্ন বয়সের। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি এই মত গঠন করিয়াছেন তাহা নহে; তিনি ৪৫ মিনিটকাল সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া মত প্রকাশ করিতেছেন।

মিঃ উইণ্টারটন একজন ব্যবসাদার ফটোগ্রাফার, এবং তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর। তিনি পূর্ব্বে কলিকাতা বোর্ণ এণ্ড সেফার্ড নামক ফার্ম্মের ম্যানেজার ছিলেন। বর্ত্তমানে মুসিল হোয়াইট ঐ ফার্ম্মের ম্যানেজার এবং তিনি অপর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। মিঃ উণ্টারটন বার্লিন, ড্রসডেন, মিউনিক, প্যারিস এবং লণ্ডনে আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার হিসাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি দ্বিতীয় কুমারের ইনসেট করা দুইখানি ফটো এবং বাদী সর্ব্বশেষে তোলা ফটো তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই যে, ঐসব ফটো একই ব্যক্তির কিন্তু বিভিন্ন বয়সের।

তিনি বলিয়াছেন—কপালের গঠন, ভ্রূ, চোখের পাতা, নাক, নাকের ছিদ্র, মুখ, চিবুক, কানের লতা একই রকমের; বয়স বেশী হওয়ায় চুল অনেক পাতলা হইয়াছে। কিন্তু উহা এখনও সেইরূপ কোঁকড়ান ও জটা পাকান রহিয়াছে।

এই উভয় বিশেষজ্ঞই দুইটী মুখাবয়বের মধ্যে একই প্রকারের তিনটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহা এই—(ক) কানের বিশেষ গঠন (খ) উপরের ওষ্ঠ দক্ষিণ দিকে ঈষৎ বাঁকা। (গ) উভয়েরই চোখের নিম্নদিকের পাতার মাংসপিণ্ড একই স্থানে রহিয়াছে। মিঃ উইণ্টারটন আর একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন

(ঘ) বাঁ হাতের মধ্যম অঙ্গুলী এবং তর্জ্জনী উভয় ফটোতেই দৈর্ঘ্যে প্রায় এক রকম।

অপর পক্ষের বিশেষজ্ঞগণ উভয়ের কর্ণ এক রকম নহে বলিয়াছেন, উপরের ওষ্ঠ একটু বাঁকা, ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। চোখের নিম্নদিকের পাতার মাংসখণ্ড অস্বীকার করিয়াছেন এবং দুইটী অঙ্গুলী দীর্ঘে প্রায় একই রকমের—এই সম্পর্কে তাহারা কিছুই বলেন নাই। এই সব বিশেষজ্ঞদের উপযুক্ততা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া, বাদী ও কুমারের চেহারার পার্থক্য সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহার আলোচনা করিব।

মিঃ পার্শি ব্রাউন একজন অবসর প্রাপ্ত আই সি এস। লণ্ডন, সাউথ কেনসিংটন রয়েল কলেজ অব আর্টস এ আর্টিষ্ট হিসাবে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি ভাস্কর্য্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজে

১৮ বৎসর প্রিন্সিপাল ছিলেন। ভারতীয় কলা বিষয়ে তিনি অনেক বই লিখিয়াছেন, চারু-শিল্প প্রদর্শনীর তিনি জজ ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য কোন সাধারণ স্থানে তাহার তৈরী কোন মূর্ত্তি নাই।

মিঃ মস্‌লি হোয়াইট কলিকাতায় মেসাস বোর্ণ এণ্ড সেফার্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং পার্টনার—লণ্ডনে ফটোগ্রাফি শিখিয়াছেন। তিনি একজন ব্যবসাদার ফটোগ্রাফার।

মিঃ পার্শি ব্রাউন দ্বিতীয় কুমারের ইনসেট ফটো (মিঃ গাঙ্গুলীর 'এ' ফটো) এবং এনলার্জ্জ করা আবক্ষফটো, বাদীর ১৯২৫ সালের তোলা ফটো এবং সর্ব্বশেষে বাদীর যে ফটো তোলা হয় তাহা তুলনা করিয়াছেন অর্থাৎ মিঃ গাঙ্গুলী যে তিনখানা ফটো তুলনা করিয়াছেন। তিনিও তাহাই তুলনা করিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় কুমারের ইনসেট করা যে ফটো আবক্ষ এনলার্জ্জ করা হইয়াছে এবং ১৯২৫ সালে বাদীর যে ফটো আবক্ষ এনলার্জ্জ করা তৎসম্পর্কে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই দুইখানি ফটোর উপরেই মিঃ গাঙ্গুলীকে জেরা করা হইয়াছে। সুতরাং এই দুইজন বিশেষজ্ঞের একই মাল মসলা ছিল,—একথা বলা যাইতে পারে।

মিঃ পার্শি ব্রাউন ও মিঃ মসলি হোয়াইট বাদী ও কুমারের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যে পার্থক্য দেখাইতেছেন তাহার তালিকা দিয়াছেন যে, কুমারের ইন্‌সেট ফটোতে একজন মার্জ্জিত রুচি সম্পন্ন লোকের চেহারা দেখা যায়। কিন্তু বাদীর ফটোতে তাহাকে অমার্জ্জিত রুচি সম্পন্ন লোকের চেহারা বলিয়া মনে হয়। তিনি বাদীর নিম্নের ওষ্ঠের দক্ষিণ দিকে একটু বাঁক দেখিয়াছেন। কিন্তু কুমারের তাহা নাই বলিয়াছেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বিশেষজ্ঞগণ বাদীর তিনখানা ফটো এবং কুমারের একখানা ফটোর উপর তাহাদের মতামত গঠন করিয়াছেন। কুমারের ফটোখানা ইনসেট করা ফটো। এই ফটোখানা তাহার শেষ ফটো এবং খুব ভাল ফটো। ইহা এত ভাল হইয়াছে যে, তাঁহার পূর্ব্বের ফ্রক কোট পরা দুইখানি ফটো দেখিয়া মনে হয় না যে দুইখানি একই ব্যক্তির ফটো।

উপসংহারে আমি বলিতে চাই যে, আমি ফটোগুলি দেখিয়াছি, তারপর বিশেষজ্ঞদের অভিমত বিবেচনা করিয়াছি। আমি বিশেষজ্ঞ মিঃ ব্রাউনের সহিত একমত হইয়া বলিতেছি যে,ফটো ম্যাপ নহে। সমস্ত ফটো একই স্কেলে হয় না। যে দুইখানা এনলার্জ্জ করা ফটো (একজিবিট ৪৯ এবং ৪৮) সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা ঠিক একই স্কেলে তোলা হয় নাই ; ৪৮নং একজিবিটে বাদী সোজা ক্যামেরার দিকে চাহিয়াছেন ; ইন্‌সেট ফটোতে মুখ

সেইভাবে নাই। মিঃ উইণ্টারটনের এই শক্তি সম্পর্কে কেহ আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। মিঃ পার্শি ব্রাউন বলিয়াছেন যে, ৪৮নং একজিবিটে কুমার অপারেটরের দিকে চাহিয়াছিলেন। চোখের দৃষ্টি দিয়া যাহা মনে হয় তদনুসারেই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। অবশ্য অভিজ্ঞ লোকের চোখে যাহা দেখা যায়—দেখাইয়া দিলে অনভিজ্ঞ লোকেও তাহা দেখিতে পারে।

ঠোঁটের বৈশিষ্ট্য কথা

পূর্ব্বোক্ত বিষয় ও অবস্থাসমূহ বিবেচনা করিয়া আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি ; যথা—

কুমারের এবং বাদীর ঠোঁট—এক্স (৫৯) নং একজিবিটে কুমারের ফটোর মধ্যে পার্শি ব্রাউন এ চিহ্ন দেখিয়াছেন ; কিন্তু বাদীরও কুমারের নীচের ঠোঁটে তিনি ইহা দেখিতে পান নাই এক্স (৪৯) নং একজিবিটে কুমারের ফটোতে পার্শি ব্রাউন ইহা যেরূপ দেখেন, এক্স (৪৮) নং একজিবিটে বাদীর ফটোগ্রাফে তিনি ইহা দেখিতে পান না। মিঃ গাঙ্গুলী দেখাইয়া দিবার পর মাজল হোয়াইট। বাদীর ফটোতে ইহা দেখিয়াছিলেন। যে কোনও সাধারণ লোককে দেখাইলে তাহা দেখিতে পাইবে। রায় সাহেব (বিবাদী পক্ষের ৩১০নং সাক্ষী), এ (১৫) নং একজিবিটে কুমারের ফটোতে নীচের ঠোঁটে ইহা দেখিতে পান না। তিনি তিনি বলেন,—ফটোগ্রাফের দোষে ঐরূপ হইয়াছে। বাদী ফটোতে ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। কুমারের ফটোতে ইহা বর্ত্তমান দেখিতে পাই। ফটোগ্রাফে ঐ চিহ্ন যে দৈবক্রমে আসিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। মিঃ ব্রাউন সমেত তিন জন বিশেষ 'ইনসে' ফটোতেই যে কেবল এই ছিহ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা নহে ; পরন্তু মিঃ উইণ্টারটন এ (১) নং একজিবিটের ফটোতেও ইহা পাইয়াছেন। ১৯২৫ সালে বাদীর যে ফটো গ্রহণ করা হয় (এক্স ৪৯) ঐ ফটোতে মুখের বাঁ দিকে কালো ছায়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে নীচের ঠোঁটের বা দিক অস্পষ্ট থাকায়, ঠোঁঠের ডান দিকের কোঁকড়ান ভাঁজ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ঠোঁটের উক্ত প্রকারের ভঙ্গী হইতে মিষ্টার চৌধুরী, মিষ্টার গাঙ্গুলীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, ঠোঁট যেন ঝুলিতেছে ; এমনভাবে ঝুলিতেছে যে, ছায়ার অন্তরালস্থিত বাঁ দিকের অংশ যেন একেবারেই নাই।' ইনসেট ফটোর ছবিতে মুখের বাঁ পাশে আলো পড়িয়াছে ; সে দিকটা আলোতে পূর্ণ ; কিন্তু ডান দিক কালো ছায়াতে আচ্ছন্ন। এই ফটো দেখিয়া সে সময়

বুঝাইবার চেষ্টা হয় যে, নীচের ঠোঁটের ডানদিকে কোন ভাঁজ (কোঁকড়ান) নাই। তোমাকে ঠোঁটের সবটাই দেখিতে দেওয়া হইয়াছে, কেবল যে দিকে আলো পড়িয়াছে, কেবল সেই দিকটাই দেখিতে বলা হয় নাই। যখন দেখা গেল, ইনসেট ফটোর চেহারারও কোঁকড়ান ভাঁজ আছে। (মিঃ ব্রাউন তাহা লক্ষ্য করেন), তখন এ (৪৫)নং একজিবিটে প্রদর্শিত ফটোর চেহারার সেই অংশ পরিষ্কার হইয়া যায়।

নীচের ঠোঁটের কেন্দ্রস্থিত গর্ত্ত চিহ্ন এবং উপরের ঠোঁটে কেন্দ্রস্থিত, গর্ত্ত ঠিক সোজাসুজি অবস্থিত নয়। নীচের ঠোঁটের গর্ত্ত চিহ্ন একটু ডানদিকে সরান, মুখ যে ভাবেই হেলাইয়া রাখা যাউক,সে হেলান থাক। উক্ত গর্ত্ত চিহ্নের আপেক্ষিক বা পরস্পরানুবন্ধী অবস্থান স্থানের পরিবর্ত্তন ঘটে না বিশেষত্বসূচক এই লক্ষণ বাদীর এবং কুমারের ঠোঁটে সমভাবে বর্ত্তমান, ছোটকুমারের সম্বন্ধে ততটা হইলেও (একজিবিট নং ৪) জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর (১০৮ নং একজিবিট ফটো) ঠোঁটের কোঁকড়ান ভাঁজ সম্বন্ধে অনেকের মধ্যে সন্দেহের ভাব দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

(২) ফটোতে (৪৮॥ একজিবিট, ১৯৩৩ সালে গৃহীত ফটো) বাদীর বাঁ হাতের তর্জ্জনী এবং মধ্যমা—এই দুইটি আঙ্গুল সমান দেখায়। আমি নিজে বাদীর ঐ দুইটী আঙ্গুল দেখিয়াছি। প্রায় সমান দেখাইলেও প্রকৃতপক্ষে আঙ্গুল দুইটী সমান নয়। অন্য হাতের ঐ আঙ্গুল যে প্রকার অসমান, বাঁ হাতের ঐ আঙ্গুল দুইটী তেমন অসমান নয়। কুমারের ইনসেট ফটোতেও ঐ দুইটী আঙ্গুল সমান দেখায়; কিন্তু তাহা সমানভাবে টানা দেখায় না। আমি রাজা কালীনারায়ণের হাতের আঙ্গুলেও ঐ বৈশিষ্ট্য দেখিয়াছি। (ফটো ৩৮)। ঐ আঙ্গুল সমানভাবে বাড়াইলে, ফটোতে প্রায় সমান দেখায় বটে; তবে ইহা খুবই সম্ভব যে, বাদীর ঐ দুইটী আঙ্গুলের মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়, ফটোর মধ্যে দেখিলে তাহা প্রায় সমানই দেখায়। সেইজন্যই ইনসেট ফটোতে ঐ দুইটী আঙ্গুল দেখিতে প্রায় সমানই দেখা গিয়াছে। অবশ্য আঙ্গুল বাড়াইবার তারতম্য অনুসারে ছোট বড় ডিগ্রী পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়। এই বিষয়টী একেবারে সন্দেহের অতীত নহে; এ সম্বন্ধে মিল বা পার্থক্য প্রদর্শন করাও একরূপ অসম্ভব। তবে, বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে বেশ বুঝা যায়, কুমারের ঐ দুইটী অঙ্গুলী অন্য হাতের অঙ্গুলী দুইটীর অপেক্ষা অল্প অসমান।

(৩) কান—বাদীর কান দুইটী মধ্যম কুমারের সহিত পার্থক্য বিধায়ক

না হইয়া বরং উহা যে সম্পূর্ণ মিল সপ্রমাণ করিতেছে—এ বিষয়ে আমি মিঃ গাঙ্গুলী এবং মিঃ উইণ্টারটনের সহিত একমত।

কান দুইটি বিশেষ বৈশিষ্টব্যঞ্জক। মিঃ গাঙ্গুলী বলেন, তাহার জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার মধ্যে তিনি সে প্রকারের কান কখনও দেখেন নাই। কান দুইটী অপেক্ষাকৃত বড়। কর্ণলতা মুখমণ্ডল স্পর্শ করে নাই অর্থাৎ কানের লতি মুখ-ঘেষা না—পরন্তু ঝুলান। অর্থাৎ গালের ও কানের লতির মধ্যে ফাঁক আছে। তাহা ছাড়া কানের সম্মুখ ভাগের বহিরাংশে যে বলয়াকৃতি চক্র আছে—যাহাকে কুণ্ডলী বলে,—তাহা বক্রভাবে কানের লতি পর্য্যন্ত কুণ্ডলাকৃতিতে না পৌঁছাইয়া, লতির সহিত সংযুক্ত হইবার সময় একটি কোণ গঠন করিয়াছে সে কোণ একটী চোথাল কোণ। কাণের লতি চিবুক স্পর্শ করে নাই। কানের লতি দুইটি ভারি দেখায়। আমি বাদীর কানের লতিও ভারি দেখিলাম। ১নং এবং ১ (২) নং একজিবিটের ফটোতে যে প্রকারের কানের লতি দেখিয়াছি, বাদীর কানের লতিও দেখিতে সেইরূপ। বাদীকে আমার খুব কাছে দাঁড় করাইয়া, বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষের আইন ব্যবসায়ী দিগের সাক্ষাতে আমি এই বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। (২৭.৪, ৩৬ তারিখের কাগজপত্র দ্রষ্টব্য)। কানের লতির উপরের অংশও ভারি; কুণ্ডলার মধ্যস্থল সংলগ্ন অংশের নিকট যাইয়া ইহা একটী কোণ গঠন করিয়াছে। কানের মধ্যভাগের এই কোণ অল্প বিস্তর প্রত্যেকেরই আছে। বিবাদী পক্ষের উকীল আমাকে তাহা দেখিবার জন্য অনুরোধ করেন। এ সম্বন্ধে কাহাকেও কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় নাই; এবং ফটোর প্রসঙ্গে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায় না। কাণের বহিরাংশের গঠন প্রণালীর অতি অল্প পরিমাণই ফটোর ঐ অংশের সহিত তুলনা করা যায়; কেননা, কুণ্ডলীর ধার ফটোতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় না, কিন্তু কাণের বহিরাংশ সকল ফটোতেই স্পষ্ট হয়।

ইহা স্বীকৃত যে, উভয়েরই কাণের লতি মুখমণ্ডল স্পর্শ করে নাই; পক্ষান্তরে লতি দুইটী ঝুলান এবং মুখ হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলা হইয়াছে যে, বাদীর কানের লতি বাড়ান এবং গণ্ডদেশ হইতে কিঞ্চিৎ সরান। এতদ্ভিন্ন, কুমারেরকানের সম্মুখের বহির্ভাগে কুণ্ডলী ছিল না।

১৯৩৪ সালে বাদীর যে ফটো লওয়া হয়, সেই ফটোতে এবং কুমারের ইনসেট ফটোর মধ্যে বাঁ দিকের কানে আলোর ভাগ বেশী পড়িয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত দুইটীই একই প্রকারের কুণ্ডলীর উপরে এবং নীচে কোণাকার এবং কুণ্ডলী আঁকাইয়া বাঁকাইয়া নীচের দিকে নামিয়াছে। আমি দুইজনের কানের

বহির্ভাগেরই কোণ দেখিতে পাইতেছি যে সূক্ষ্ম পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ এই যে, ক্যামেরার কাছে যেরূপ ভঙ্গীতে উপবেশন করা যাইবে, বসিবার সেই ভঙ্গীর ইতর বিশেষে ফটোর ছবিতেও ইতর বিশেষ ঘটিবে। অন্য ফটোগুলি দেখিলে এ বিষয় স্পষ্ট হইবে। ৪৮নং একজিবিটের ফটোর কথা বলিতেছি এ ফটোতে কারিগরী করা হয় নাই। যেমন তোলা হইয়াছিল, তেমনি আছে এই ফটোতে ডান কানের উপর আলো পড়িয়াছে। বাদীর কানের কুণ্ডলীর ধারে যে কোণ গঠিত হইয়াছে, এই ফটোতে তাহা আছে। কিন্তু ১৯২৫ সালে গৃহীত ফটোতে ঐ কোণ যেমন সুস্পষ্ট, এই ফটোতে সেরূপ নহে।

আর একটা ফটো গ্রহণ করুন—যে ফটোতে বাঁ দিকের কানের উপর বেশী আলো পড়িয়াছে (একজিবিট নং ৮২) ইহাতেও কোনও কারিগরী নাই। যেমন, তোলা হইয়াছে, তেমনই আছে। ঐ সঙ্গে আর একখানি ফটো লউন। (একজিবিট নং ৫৭) ঐ দুইটি ফটোতে বাঁ কান ঠিক একই রকমের। উভয়েই কুণ্ডলীর কোণাকার অংশের বহির্ভাগ সরু ও পাতলা সে রেখা কোথাও তীক্ষ্ণ নহে। কুমারের ইনসেট ফটোতে দক্ষিণ কর্ণ যদিও ছায়াতে অস্পষ্ট, তাহা হইলেও তাহা সেখানে আছে এবং বহিরাংশে তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। আর একটিতে ডান কানে যদিও ছায়াপাত হইয়াছে, তথাপি কানের লতিতে আলোক পড়িয়াছে। বয়োবৃদ্ধ এবং স্থূলকায় হইলেও আমি বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, গণ্ডদেশ হইতে কাণের নতি সরান। যেমন ডান কানে তেমনি বাম কানে। মিঃ উইণ্টারটন এবং মিঃ ব্রাউন উভয়েই তাহা স্বীকার করেন। কাণের বাহিরের ধারে উভয়েরই কোণে আছে। কানের পুলি কুমারের ফটোতে (একজিবিট এক্স ৪৫) তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেলেন। কুমারের এবং বাদীর সকল রকমের ফটোতে কাণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জীবিত বাদীর কান এবং বিশেষ করিয়া 'আনটাচড' দুইটি ফটোর চেহারার কান দেখিয়া (যাহা আমি উল্লেখ করিয়াছি), আমার স্থির ধারণা হইয়াছে যে, বাদীর এবং মধ্যম কুমারের কাণ একই প্রকারের এবং তাঁহাদের কাণ এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আমি এই অনন্য সাধারণ বিষয়টি বেশ লক্ষ্য করিয়াছি যে, সে সময় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের কানও একই প্রকারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল (একজিবিট ৫৪ এবং ৩৯) মিঃ উইণ্টারটন তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

৪। আলোক সম্বন্ধে দুইটী বিচার্য্য বিষয়। মিঃ গাঙ্গুলী এবং মিঃ উইণ্টারটন আলোক সম্বন্ধে দুইটী বিতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। তাহার একটী চোখের পাতার কেন্দ্রস্থলে এবং অপরটী কুমারের ফটোতে প্রায়

একই জায়গায় (এক্স ৪৯) মিঃ গাঙ্গুলী বলেন,—তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী হইয়াছিলেন। মিঃ গাঙ্গুলী বাদীকে দেখিতে চান। মিঃ গাঙ্গুলী যেদিন সাক্ষ্য দেন, সেইদিন তিনি বাদীকে দেখেন তিনিও বাদীর চোখের পাতায় ঐ প্রকারের চিহ্ন দেখিতে পান।

আমি সেখানে আর একটি চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ডান চোখের নীচের পাতার একদিকে একটি ছোট আঁচিল আছে; কাজেই ইহা একটি বৈচিত্র্য বলা যায়। চোখের তারার কাছাকাছি আমি দুইটি আলোক চিহ্ন দেখিয়াছিলাম, এই দুইটি আলোক চিহ্ন দ্বারা দুইটি মাংসবিন্দু প্রতিফলিত হইয়াছে কি না, তাহা আমার পক্ষে বলা কঠিন; তবে আমি এপর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এই আলোক চিহ্ন কুমার এবং বাদী উভয়ের ফটোতেই আছে এবং একই মাংসবিন্দু প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিবাদী পক্ষের কোনও বিশেষজ্ঞকেই এই আলোকচিহ্ন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। তাঁহাদিগকে কেবল জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, তাঁহারা মাংসের কোনও বিন্দু দেখিয়াছিল কি না এবং তাহার উত্তরে মিঃ মার্শেল হোয়াইট নিগেটিভে দাগ পড়ার কথা বলেন। অপর দুইটি আলোকচিহ্ন সম্বন্ধে তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। ফটোতে আলোক চিহ্ন দেখিয়া থাকিলে তাহার কারণ কি—সেকথা মিঃ মার্শেলকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

একমাত্র নাক ভিন্ন আর যে সকল পার্থক্যের কথা মিঃ পার্শী ব্রাউন এবং মিঃ মার্শেল হোয়াইট বলিয়াছেন তাহা সামান্য কয়েক কথায়ই শেষ করা যায়। নাক লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মতদ্বৈধ আছে। অন্যান্য বিষয়ে এই সাধারণ মন্তব্য করা যায় যে, ইনসেট ফটো এবং ১৯৩৫ সালের ফটোর (একজিবিট ৪৯ মধ্যে বিশেষ খুটিনাটি করিয়া পরীক্ষা করিবার পর যে সকল সামান্য পার্থক্য দেখা গিয়াছে, তাহা বিভিন্ন বয়সে গৃহীত ফটো বলিয়াই হইয়াছে।

চক্ষু সম্বন্ধে বিচার

কুমারের চক্ষু টেরা, চক্ষুর বাহিরের কোণ উর্দ্ধগামী। কিন্তু মিঃ ব্রাউন স্বীকার করিয়াছেন যে, এ (১৫)তে এরূপ দেখা যায় না। ইনসেট ফটোতেই এই টেরা চক্ষুর কথা বলা হয়। ইহার যাহা কৈফিয়ৎ তাহা বলা হইয়াছে। মিঃ মার্শেল হোয়াইট চক্ষু সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন; কিন্তু টেরা চক্ষুর কথা বলেন নাই।

ওষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্তি

মিঃ পার্শী ব্রাউন কুমারের ওষ্ঠ মোচড়ান দেখিয়াছেন ; কিন্তু বাদীর তাহা দেখেন নাই। আবার মিঃ মার্শেল হোয়াইট দেখিয়াছেন ঠিক ইহার বিপরীত।

উভয়ের নিম্নওষ্ঠের মধ্যে তিনি এই একমাত্র পার্থক্য দেখিতে পান যে, কুমারের নিম্নওষ্ঠের মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ পুরু। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মেজরাণী আসিয়া মিঃ ব্রাউনের সমক্ষেই সাক্ষ্য দিলেন যে, কুমারের ওষ্ঠ পাতলা ছিল এবং বহু সাক্ষী বলিয়াছে যে, বাদীর ওষ্ঠ অপেক্ষাকৃত পুরু ; কার্য্যতঃ উভয়ের ওষ্ঠ একই প্রকার।

চোখের ভ্রূ

মেজরাণী বলিলেন, ধনুকের মত ; আবার মিঃ পার্শী ব্রাউন বলিলেন সোজা টানা। তাহাকে সোজাসুজি এ (১৫) নং ফটো দেখান হইলে তিনি স্বীকার করেন যে, ফণীবাবু কুমারের যে ফটো আদালতে দাখিল করিয়াছেন তাহাতে কুমারের চোখের ভ্রূ ঠিক উঠিয়াছে।

চক্ষু সম্পর্কে যুক্তি

চক্ষু সম্বন্ধে মিঃ মার্শেল হোয়াইট বলেন যে, কুমারের ইনসেট ফটোতে চোখ দুইটি অপেক্ষাকৃত বড় ও উজ্জ্বল। এই ফটোতে কুমারের যেমন চোখ দেখা যায়, তেমন আর কোন ফটোতে দেখা যায় না ; এবং 'বাঘ' ফটোতে কুমারের চোখ সর্ব্বাপেক্ষা কদর্য্য দেখা যায়। উহাতে চোখ দুইটি ছোট এবং কোটরগত দেখা যায়। তাহার কারণ খুব সম্ভব ঐ ফটো খোলা যায়গায় গৃহীত হইয়াছিল এবং তাহাতেই চক্ষু দুইটি বিকৃত হইয়াছে। ফটোগ্রাফে চক্ষু এমন উঠে। আমি বলিয়াছি যে, ইনসেট ফটোতে যেমন চক্ষু দুইটি পরিষ্কার উঠিয়াছে, এমন আর কোনটিতে উঠে নাই। অন্যান্য ফটোতে চক্ষু বিভিন্ন রকম উঠিয়াছে।

বাদীর চোখের উপর পাতার স্থূলতা সম্বন্ধে মিঃ ব্রাউন স্বীকার করিয়াছেন যে, বয়সের দরুণ উহা হইতে পারে। চোখের উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে বলা যায় যে, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে আর চোখের উজ্জ্বলতা থাকে না। চোখের পাতার স্থূলতা এবং উহার নীচে যে কুঞ্চনরেখা দেখা দিয়াছে, তাহাতে কিছু পার্থক্য প্রমাণ হয় না। বয়স হইয়াছে, তা ছাড়া স্থূলকায়ও হইয়াছে, এই অবস্থায় চোখের যে অবস্থা হওয়া উচিত সে সকল কথা বিবেচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, চক্ষু সম্বন্ধে কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ—রায়ের পরে গৃহীত (১৯৩৬)

Aparajita Press

কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ—১৯৩০ সনে গৃহীত ফটো

মাথা, কপাল ও মাথারখুলি

মিঃ পার্শী ব্রাউনের অভিমত এই যে, কুমারের মাথার টাক ছিল, কোণ তোলা কপাল আরও প্রশস্ত, এবং মুখের নীচের দিকের তুলনায় মাথার খুলির দিক আরও চওড়া। এ (১৫) নং ফটোতে এই বর্ণনা সমর্থিত হয় না। ইহা দেখিয়া নিজের উক্তি সমর্থন করিবার জন্য মিঃ ব্রাউন কুমারের ফটোতে চুলের নীচে দুইটি স্থান দেখাইয়া বলেন যে, সাম্নের দিকের হাড় এবং চুলও কপালের মাপের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু এক্স ৪০নং ফটোর বেলায় তিনি আবার কপালের এই সংজ্ঞা বদলাইয়া সাধারণতঃ লোকে কপাল বলিতে যাহা বোঝে তাহাই স্বীকার করেন। মাথা, চিবুক এবং চোয়াল সম্বন্ধে যে পার্থক্যের কথা বলা হইয়াছে, আমি তাহা মানিয়া লইতে পারিনা। সকল ফটো দেখিয়া (কেবল একখানা দেখিয়া নয়), আমি স্বীকার করি না যে, আঙ্গুলের গড়ন পৃথক রকমের এ কথা বলা হয় নাই ; কিন্তু ইনসেট ফটো এবং ১৯২৫ সালে গৃহীত ফটোতে আঙ্গুল পৃথক ধরণের দেখা যায়, ফটোতে যে পার্থক্য উহা ঘটনাচক্রে হইয়া থাকে। কার্য্যতঃ একমাত্র হাত সম্বন্ধেই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। আমি খুব নিরীক্ষণ করিয়া ঐ গুলি দেখিয়াছি। হাত ছোট এবং একই রকম। কণ্ঠ এক রকম, উভয়ের কণ্ঠেই সুস্পষ্ট কণ্ঠমণি দেখা যায়, এবং বলা হইয়াছে যে, কুমারের গোঁফ পাকাইয়া রাখিতেন। ইনসেট ফটো ভিন্ন আর কিছুতে ইহা দেখা যায় না। অন্যান্য ফটোতে দেখা যায়, কুমারের গোঁফের মাথা নীচেরদিকে রহিয়াছে। বাদী ইচ্ছা করিলেই গোঁফ পাকাইয়া উপর মুখী করিতে পারিতেন।

কুমারের বক্ষদেশ

মেজরাণী সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, কুমারের বক্ষ লোমাবৃত ছিলনা। বাদী পক্ষের সাক্ষীরা বলিয়াছে যে, কুমারের বক্ষ বাদীর বক্ষের মতই লোমাবৃত ছিল, তবে তিনি তাহা কামাইয়া ফেলিতেন। কুমারের খালি গায়ে কোন ফটো নাই ; কাজেই শেষে এই কথা বলিবার কোন কারণ নাই। যে সকল সাক্ষী বলিয়াছেন যে, কুমারের বক্ষ লোমাবৃত ছিল, তাহাদের মধ্যে কুমারের ভগ্নী, প্রাচীন খানসামা, প্রভাত (বাদীর ৫২নং সাক্ষী) প্রাচীন দেওয়ান রসিক রায় (বাদীর ৯০৭নং সাক্ষী), বাড়ীতে যে ডিসপেন্সারী আছে উহার প্রাচীন কম্পাউণ্ডার (বাদীর ৬৯নং সাক্ষী), পাঙ্খাওয়ালা, কুমারের দেহরক্ষী

এবং আরও বহু লোক আছে। ভাওয়ালে বুকের লোম কামান একটা কিছু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

যোগেশ (বাদীর ৮৯২নং সাক্ষী) জয়দেবপুর স্কুলে ছিল। সে ফণীবাবুর বাড়ীতে প্রায় থাকিত। সে বলিয়াছে যে, রসিক রায়, ফণীবাবু এবং দ্বিতীয় কুমার, তাঁহাদের বুক কামাইতেন। ফণীবাবুর সম্বন্ধে সাক্ষী বলে যে, তিনি কুস্তি করিতেন বলিয়াই বুক কামাইতেন। ঐ অঞ্চলবাসী উকিল শান্তিবাবুও তাঁহার বুকের লোম কাটিয়া ফেলেন। বিল্লু এমন অনেক লোকের নাম বলিয়াছে যাহারা বুকের লোম কামাইত। সে বলিয়াছে যে ফণীবাবু তাঁহার হাতের লোমও চাঁচিয়া ফেলেন। ফণীবাবু স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্যায়াম করিবার জন্য তিনি বুকের লোম চাঁচিয়া ফেলিতেন। সাক্ষ্য প্রমাণে আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, এইরূপ অভ্যাস থাকা অস্বাভাবিক নয়। আমার বিবেচনায় কুমারের বক্ষ লোমাবৃত ছিল কি না তাহা স্বীকার করার কোন প্রয়োজন ছিল না, এবং মিথ্যা সাক্ষ্য যদি না দেওয়ান হইত তবে ইহা লইয়া এত বিশদ আলোচনা করারও দরকার হইত না। অবশেষে আমি বলি যে, কুমারের বক্ষ লোমাবৃত ছিল।

মুখমণ্ডল :— ইহা বলা হইয়াছে যে, মেজকুমারের মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, কিন্তু বাদীর মুখ গোলাকৃতি। ১৯২১ সাল হইতে বাদীর যে সকল ফটো গৃহীত হইয়াছে। ঐ গুলি দেখিলে মনে হয় যে, বাদী ক্রমে ক্রমে মোটা হইতেছেন, তাঁহার শরীর যতই ফুলিতেছিল, ততই মুখ লম্বা কম দেখাইতেছিল। যদি অনেক আগেকার ফটো (এক্জিবিট ৫৭নং) দেখা যায় এবং খোলা গায়ের ফটো (একজিবিট ৪০নং, অনেক পরে গৃহীত) হইতে দেখা যায়; তাহার মুখ লম্বা। আর মেজরাণী এবং মিঃ পার্শী ব্রাউন কথাগুলির মধ্যে যে পার্থক্য দেখিয়াছেন, এবং যে সকল সাক্ষী তাঁহাদের কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন. আমি তাহাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে আর আলোচনা করিতে চাই না, মেজরাণী ও মিঃ পার্শী ব্রাউনের সাক্ষ্যের মধ্যে অনেক স্থান পরস্পর বিরোধী হইয়াছে।

পদদ্বয়—কুমার ও বাদীর পায়ের কোন তুলনা চলে না, কারণ এমন কোন ফটো নাই, যে ফটোতে কুমার খালি পায়ে আছেন। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাদী ৬নং জুতা ব্যবহার করেন, বাদী যে জুতা পায় দিয়া কোর্টে উপস্থিত হইয়াছিলেন একজন চীনা জুতা প্রস্তুতকারক উহার মাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়াছে। এই লোকটির সাক্ষ্য সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে নাই। কুমারের জুতাও ৬ নম্বর ছিল বলিয়া বলা হইয়াছে। ডাঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত বলিয়াছেন যে, বাদীর জুতার ভিতরের দিকটা বাঁকা। বাদীর ফটো

দেখিলেও উহাই মনে হয় কিন্তু কুমারের পা যে বাকা ছিল না তৎসম্পর্কে কেহ কিছুই বলে নাই এবং এই সম্পর্কে বেশী কথাও তোলা হয় নাই। পায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

নাক—নাক সম্পর্কে তুমুল বাকবিতণ্ডা হইয়াছে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বাদী দুইখানি ফটো উপস্থিত করিয়াছিলেন, উহার একখানিতে তাঁহার নাক সরু বলিয়া দেখা গিয়াছে এবং আর একখানিতে মোটা বলিয়া দেখা গিয়াছে। আমি একজিবিট নং এ ১০ এবং ১২ সম্পর্কে উল্লেখ করিতেছি। যে ফটোখানিতে নাক মোটা উঠিয়াছে, উহা একখানি বিকৃতি ফটো, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এই ফটো সম্পর্কে বলিয়াছেন, উহাতে তাঁহাকে একটা গরিলার মত দেখা যায়। এই প্রকার তিনখানি ফটো আছে, ঐ গুলিকে গরিলা ফটো বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই ফটোগুলি যে বিকৃত উঠিয়াছে, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। অবশ্য এক সময় মিঃ চৌধুরী একখানি ফটো সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, উহাই বাদীর ঠিক ফটো (১২-৫-৩৪ তারিখে ৪৯৮নং অর্ডার)। মিঃ চৌধুরীর একথা ঠিক নহে, উহা যে বিকৃত হইয়াছে বিবাদী পক্ষের বিশেষজ্ঞও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

যদি কেহ নাকের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে চাহেন, তবে কুমারের শিকার ফটো ও এ (১২) নং ফটো দেখিতে হয়। বাদী এই ফটো দুইখানি তাহার আবেদনের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। একজন প্রতারক দুইটী আকৃতির মধ্যে অধিকতর সামঞ্জস্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

নাক সম্পর্কে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিয়াছেন যে, তাহার নিকট বাদীর নাক একরকমই মনে হয়, তবে কেহ কেহ বলিতেছে যে, বাদীর নাক মোটা হইতেছে, উহা হইতে পারে, কারণ তিনিও মোটা হইতেছেন। মোটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ যেমন বড় হয় না, সেরকম নাকও মোটা হয় কিনা, তাহা আমি জানি না। ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত যে সকল ফটো গৃহীত হইয়াছে ঐগুলিতে ক্রমেই বাদীর নাক মোটা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কুমারের দুইখানি ফটো (একজিবিট নং এল এবং এইচ ১০) ব্যতীত অন্য ফটোগুলিতেও কুমারের নাক মোটা বলিয়া দেখায়। ঐ সকল ফটোতে কুমারের নাককে বাদীর নাকের মত বা কোথায়ও কোথায়ও তাহা অপেক্ষাও মোটা দেখায়। কুমারের দুইখানি শিকার ফটো ব্যতীত অন্য ফটোর সহিত বাদীর ফটো পাশাপাশি দাঁড়া করাইলে কোন পার্থক্য বুঝা যায় না। নাক সম্পর্কে বিচার করিতে হইলে এক পক্ষে গৃহীত ফটো দেখিতে হয়। বাদীর ঐ প্রকার দুইখানি ফটো আছে; কিন্তু কুমারের ঐ

প্রকারের কোন ফটো নাই, নাকের মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়া আমি মনে করি, কিন্তু আদালত যদি বলে ঐ নাকটা ঠিক নহে, তাহা হইলে সনাক্তকরণ সম্পর্কিত সকল সাক্ষ্য নষ্ট হইয়া যায়। তবে বাদীর নাক সম্পর্কে একটু পার্থক্য হওয়ার কারণ আছে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীও বলিয়াছেন যে, কোন কোন লোক মনে করে যে নাকটা মোটা হইয়াছে। আদালতও যে এই পার্থক্য দেখেন, তাহার কারণ এই যে, দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বে কুমারের উপদংশ রোগ ছিল, ঐ রোগের ফলেই তখন নাক ঐরূপ হইয়াছে। এই উক্তি সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু তিনজন বিশিষ্ট চিকিৎসক বাদীকে পরীক্ষা করিয়াছেন, উহাদের মধ্যে দুইজন বিবাদী পক্ষে ও একজন বাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বাদীর নাকের ডান দিকের হাড় বাড়িয়াছে। কর্ণেল চাটুয্যে বলিয়াছেন যে, উপদংশের দরুণই এই প্রকার হইয়াছে। বিবাদী পক্ষের কর্ণেল ডানহ্যাম হোয়াইট ও মেজর টমাস এই যুক্তি সমর্থন করেন নাই, তবে তাঁহারা কোন অভিমতও প্রকাশ করেন নাই। এই তিন জন চিকিৎসকের সাক্ষ্য হইতে ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয় যে, বাদীর উপদংশ ছিল এবং কুমারের উপদংশ ছিল এবং এই কারণেই নাকের হাড় বাড়িয়াছে এবং নাকের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইনসিওরেন্স ডাক্তারের রিপোর্টে যে চিহ্ন ছিল, বিবাদীপক্ষ উক্ত রিপোর্ট উপস্থিত করিতে সাহস করেন নাই। বাদী পক্ষ স্কটল্যাণ্ড হইতে উহা আনাইতে পারিয়াছেন। অথচ বিবাদী পক্ষ তাহা অনান নাই। বাদীর গায়ে উপদংশের চিহ্ন এবং উপদংশ সম্পর্কে যখন আলোচনা করিব তখন নাকের পরিবর্ত্তন হওয়ার কারণ সম্পর্কেও আলোচনা করিব।

বাদীর শরীরের চিহ্ন

বাদীর শরীরে প্রকৃতপক্ষে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলি পাওয়া গিয়াছে—(১) পায়ের গোড়ালী খসখসে এবং তাহাতে দাগ আছে।

(২) মাথার খুলিতে ফোঁড়ার ত্রিকোণাকৃতি চিহ্ন।

(৩) বামপার্শ্বের উপরের পাটীর কসের দাঁত ভাঙ্গা।

(৪) বাদীর কথিতমত বাদীর অস্ত্রোপচারের চিহ্ন।

(৫) দক্ষিণ বাহুতে চিহ্ন। এই চিহ্নকে বাঘের নখের চিহ্ন বলা হইয়াছে।

(৬) শুষ্ক ফোড়ার চিহ্ন—ডাক্তারেরা এই চিহ্ন সম্পর্কে একমত। এই চিহ্নটীকে পৃষ্ঠদেশের ফোড়ার চিহ্ন বলিয়া অভিহিত করা যায়।

(৭) পায়ের বাহিরের দিকের গোড়ালীর উপরিভাগের অসমান ক্ষত চিহ্ন।

(৮) পুরুষাঙ্গের উপরস্থ ক্ষুদ্র তিল ছিল।

(৯) জিহ্বার নিম্নে থলের মত মাংস পিণ্ড।

বাদী সাক্ষ্য দিবার সময় উপরোক্ত চিহ্নসমূহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উপদংশ এবং বাহু ও পায়ে উপদংশ জনিত ক্ষতচিহ্নের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। কুমার সম্পর্কেও শেষোক্ত চিহ্ন স্বীকার করা হইয়াছে। বাদী বাগী অস্ত্রোপচারের চিহ্ন ও পুরুষাঙ্গের উপর তিল চিহ্ন ভিন্ন অন্যান্য সকল চিহ্ন আদালতে দেখাইয়াছেন। তিনজন ডাক্তারই ঐ সকল চিহ্ন দেখিয়াছেন। পৃষ্ঠদেশস্থ ফোড়ার চিহ্নও তাঁহারা দেখিয়াছেন, অবশ্য বাদী পৃষ্ঠদেশে বলিয়া নির্ভুল ভাবে এ চিহ্ন দেখাইতে পারেন নাই।

এই সব বাদী নিজে ডাক্তারদিগকে দেখাইয়াছেন—যদিও ডাক্তারদের লিখিত নোটে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট আদালতে উহা (২০) উপদংশজনিত চিহ্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরোক্ত দশটি চিহ্ন ভিন্ন ডাক্তারের নোটে আরও কয়েকটী চিহ্নের উল্লেখ আছে এবং বাদী তাহা দেখাইয়াছেন। ঐ গুলিকে উপদংশজনিত চিহ্ন বলা যায়। কুমারের শরীরে ঐ সময় কোন চিহ্ন ছিল না—যদিও ঘা ছিল। বাদীর বক্তব্য এই যে, ঐ ঘা শুকাইয়া বর্ত্তমানে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে।

আমি এই সব চিহ্নগুলিকে (১০) উপদংশজনিত চিহ্ন বলিয়া আলোচনা করিব। (১১) তিনটি টিকার চিহ্ন—যাহা ডাক্তারেরা দেখিয়াছেন।

(১২) উভয় কানের লতিকায় ফোঁড়ার চিহ্ন।

(১৩) বাদীর বাম বাহুতে উদ্দূতে 'ধর্ম্মদাসকা চেলা নাগা' এই কয়টি কথা উল্কিতে লেখা আছে। বাদী বলিয়াছেন যে, তিনি যখন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ছিলেন তখন ঐ উল্কি লেখা হয়। মিঃ লিণ্ডসে বলিয়াছেন যে, বাদী তাঁহাকে ঐ উল্কি দেখাইয়াছেন এবং উহা তাঁহার গুরুর নাম একথা বলিয়াছেন। ঐ শব্দগুলির অর্থ'—নাগা, ধর্ম্মদাসের চেলা' অথবা 'ধর্ম্মদাসের চেলা নাগা'। আমি পরে ইহার অর্থের আলোচনা করিব।

বাদী ঐ সব চিহ্নের কথা উল্লেখ করিলে এবং আমি যে সব চিহ্নের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা দেখাইলে, বাদী যখন ১৯২১ সালের ৪ঠা মে কি ঘটিয়াছিল (আত্মপরিচয় প্রকাশের দিন) তাহার বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে জেরাতে এই সব প্রশ্ন করা হয়—

"ইহা কি সত্য নহে যে, আপনার শরীরের চিহ্নসমূহ দেখিয়া এইরূপ ঘোষণা করা হয় যে, ঐসব চিহ্ন দ্বিতীয় কুমারের শরীরে ছিল?" বাদী আদালতে তাহার উপদংশজনিত যেসব চিহ্ন দেখাইয়াছেন তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়—

প্রঃ—আমি আপনাকে বলিতেছি যে, আপনি উপদংশ জনিত চিহ্ন বলিয়া যেসব চিহ্ন দেখাইয়াছেন তাহা আদৌ উপদংশজনিত চিহ্ন নহে ?"

বাদীর উপদংশ থাকা দূরের কথা, উপদংশ সম্পর্কে তাঁহার কোন জ্ঞানই নাই—এই সমস্ত বাদীকে জেরা করা হইয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যখন তাঁহার জবানবন্দীতে উপদংশজনিত চিহ্ন অথবা টিকার চিহ্ন অথবা জিহ্বার নীচের থলেরমত চিহ্ন ভিন্ন অন্যান্য সকল চিহ্নের কথা উল্লেখ করেন, তখনও তাঁহাকে একই রকমের জেরা করা হয়।

ইহা ১৯৩৪ সালের জুন মাসের কথা। বিবাদীপক্ষের বক্তব্য এই ছিল যে বাদীর শরীরের কোন চিহ্নই কুমারের শরীরে ছিল না। ৪ঠা মে অথবা তাহার কাছাকাছি কোন সময়ে ঐ সব চিহ্ন আবিষ্কার হয় এবং মিথ্যা করিয়া কুমারের শরীরে ঐসব চিহ্ন আরোপ করা হইয়াছে। এক কথায় ভগ্নী, বাদীর শরীরের ঐসব চিহ্ন দেখিয়াছেন এবং কুমারের শরীরের তাহা আরোপ করেন। 'কোন চিহ্ন সৃষ্টি করা হইয়াছে' বিবাদীপক্ষের তাহা মামলার বিষয় ছিল না আমি এখন চিহ্ন সম্পর্কে আলোচনা করিব।

বাম পায়ের বাহির দিকের গোড়ালীর উপরকার অসমান ক্ষত চিহ্ন—১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বাদী আদালতে এই চিহ্ন দেখান এবং বলেন যে, গাড়ীর চাকা পায়ের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ায় এই চিহ্ন হইয়াছে।

এই চিহ্ন মিথ্যা করিয়া দ্বিতীয় কুমারের শরীরে আরোপ করা হইয়াছে, বলিয়া বাদীকে জেরা করা হইয়াছে। এবং যে সব সাক্ষী এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে অথবা ১৯০৪ সালে ছোট কুমারের বিবাহের সময় দ্বিতীয় কুমারকে লাঠিতে ভর করিয়া খোঁড়াইয়া হাটিতে দেখা গিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহারা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, জেরাতে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে বাদী বলিয়াছেন যে, তৃতীয় কুমারের বিবাহের ৬৭ দিন পূর্ব্বে একখানি ফিটন গাড়ী তাঁহার বাঁ পায়ের উপর দিয়া চলিয়া যায় এবং বিবাহের দিন তিনি লাঠিতে ভর করিয়া ঘুরাফিরা করিতেছিলেন ; জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখেন নাই ; কিন্তু তিনি জখম দেখিয়া ছিলেন। ঐ ঘা রারিয়ার ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী ডাক্তার ও নিশি ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ করেন। ঐ ঘা শুকাইতে কতদিন লাগিয়াছিল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তবে কয়েকদিন লাগিয়াছিল, এইরূপ ইঙ্গিত তিনি করিয়াছেন। তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছেন ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেরা করা হইয়াছে। ইহা ইনস্যুরেন্স ডাক্তারের রিপোর্ট আসিবার পূর্ব্বের কথা।

ইহার পূর্ব্বে বাদী এইরূপ প্রার্থনা করিয়া এক দরখাস্ত করেন যে, বিবাদী

পক্ষের কৌঁসুলী ঐ দুর্ঘটনা সম্পর্কে জেরা করিবার সময় কুমারের তথায় ঐ চিহ্ন আদৌ ছিল কি না এইরূপ কোন কথা বলিতেছেন না। ঐ দরখাস্তের পর বিবাদিগণ এইরূপ এক দরখাস্ত করেন, 'বিবাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, মেজকুমারের কখনও এমন কোন গাড়ীর দুর্ঘটনা হয় নাই, যাহাতে তাঁহার পায়ের উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া যাইতে পারে এবং বাদী গোড়ালীতে যে চিহ্ন দেখাইয়াছে কুমারের এরূপ কোন চিহ্ন ছিল না ইহা আত্মরক্ষার চেষ্টা মাত্র।" এবং ইনস্যুরেন্স ডাক্তারের রিপোর্ট না আসা পর্য্যন্ত এইরূপ চলিতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত তারিখগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়: যথা—

৪।৫।২১—বাদী নিজ পরিচয় প্রকাশ করেন।

১০।৫।২১—সত্যবাবুর প্রস্তাবক্রমে বোর্ড অব রেভেনিউ ইনসিওরেন্সের কাগজপত্র তলব করেন। ৯ই মের পূর্ব্বে সত্যবাবু মিঃ লেথব্রিজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ঐ দিনই "ইংলিসম্যান" সংবাদপত্রে তাঁহার পত্র প্রকাশিত হয় (৮ই মে রবিবার ছিল), (একজিবিট নং ৪৫০)।

১৪।৭।২১—মূল মেডিকেল রিপোর্ট সমেত ইনসিওরেন্সের সমস্ত কাগজপত্র রেভেনিউ বোর্ডের নিকট পাঠান হয়। (একজিবিট ৪৫০)

১৫।৭।২১—এই তারিখে উক্ত কাগজপত্র পুনরায় ইনসিওরেন্স আপিসে ফেরত পাঠান হয়।

১।১২।৩০—ইনসিওরেন্সের কাগজপত্র হইতে বিবাদী পক্ষ মোট ছয়খানি এফিডেভিট তলব করেন,—মৃত্যু সংক্রান্ত দুইখানি এফিডেভিট, সৎকার (অন্ত্যেষ্টি) সংক্রান্ত দুইখানি এফিডেভিট এবং মৃত ব্যক্তিকে সনাক্তকরণ সংক্রান্ত দুইখানি এফিডেভিট (ডি ফাইলের ৬৪নং তাড়ার কাগজপত্র)

৮।১২।৩০—তারিখে ইনসিওরেন্স আপিসের কলিকাতার শাখা দুইখানি এফিডেভিট প্রদান করিয়া জানান যে, অবশিষ্ট এফিডেভিটগুলি তাঁহাদের স্কটল্যাণ্ডের হেড আপিসে আছে।

১০।১২।৩০—তারিখে বিবাদী পক্ষ অবশিষ্ট এফিডেভিটগুলি তলব করেন। (বাকি চারিখানি এফিডেভিট)।

১৯।১।৩১—তারিখে অবশিষ্ট চারিখানি এফিডেভিট আসিয়া পৌছে।

৬।১০।৩৪—তারিখে বাদী পূর্ব্বোক্ত দুইখানি সনাক্তকরণমূলক এফিডেভিট দাখিল করিবার পর, ইনসিওরেন্স ডাক্তারের মেডিকেল রিপোর্ট তলব করেন। (ডি সংখ্যক ফাইলের ২৪০০নং দলিল)

২৯।১১।৩৪—তারিখে বাদী প্রার্থনা করেন যে, মেডিকেল রিপোর্ট

স্কটল্যাণ্ড হইতে অথবা স্থানীয় ব্রাঞ্চ আপিস হইতে তলব করা হউক। (ডি সংখ্যক ফাইলের ২৩৪০ দলিল)

২৯।১১।৩৪—তারিখে কলিকাতাস্থ ব্রাঞ্চ আপিসের ম্যানেজার লেখেন যে, মেডিকেল রিপোর্ট তাঁহাদের এডিনবরার হেড আপিসে আছে।

১৫।১২।৩৩—তারিখে মূল প্রস্তাবপত্র (প্রপোজ্যাল ফরম) সমেত মেডিকেল রিপোর্ট আসিয়া পৌঁছে।

বাদীর পায়ের ক্ষত চিহ্ন

এই দলিলে ইনসিওরেন্স প্রার্থী কুমারের ব্যক্তিগত বিষয় ও শারীরিক নানা খুঁটি-নাটি বিষয়ে উল্লেখ আছে। ঐ সকল খুটিনাটি বিষয়ের মধ্যে ডাঃ আর্ণল্ড কেডির স্বাক্ষরযুক্ত একখানি মুদ্রিত ফরমের ৫নং ফরমে সনাক্ত করিবার অর্থাৎ চিনিবার উপযোগী চিহ্নসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটী কথা দৃষ্ট হয়—

"বাঁ পায়ের গোড়ালীর উপর দিকে কতকগুলি অসমান ক্ষত চিহ্ন আছে।"

বিবাদীপক্ষে, ডাঃ ডেন্‌হাম হোয়াইট সাক্ষ্যদানকালে বলেন,—যে ক্ষতচিহ্ন সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইতেছে, সেই ক্ষতচিহ্ন বর্ণনা করা হইতেছে, সেই ক্ষতচিহ্ন বর্ণনা করিবার সময় তিনি তাহাকে 'বাঁ পায়ের গোড়ালীর কিঞ্চিৎ উপরে অসমান ক্ষতচিহ্ন' বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি তাঁহার নোটে লিখিয়াছিলেন,—"বাঁ পায়ের গোড়ালীর কিছু উপরে অসমান ক্ষতচিহ্ন। ঐ ক্ষতচিহ্ন উপরের দিকে ১॥ সেন্টীমিটার চওড়া, নীচের দিকে উহা ৯ মিলিমিটার চওড়া উহা ২ সেন্টীমিটার উঁচু। গোড়ালীর সর্ব্বনিম্ন বিন্দু পর্য্যন্ত উহা ৬ সেণ্টমিটার। বিবাদী পক্ষের সুবিধার জন্য মেজর টমাস যে নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ ক্ষতচিহ্নের রূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের।"

মিঃ ডেনহাম হোয়াইট জবানবন্দীতে বলিয়াছেন,—আমাকে যদি ঐ ক্ষতচিহ্ন বর্ণনা করিতে বলা হয়, আমি আদালতে যেরূপ বলিতেছি ঐ প্রকারেই সে ক্ষতের বর্ণনা করিব। একখানি প্রয়োজনীয় ছবিতে ঐ সব চিহ্নের নির্দ্দেশ আছে। ঐ চিহ্নে সর্ব্বকার চিহ্ন এবং তাহাদের অবস্থান বেশ স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (একজিবিট এ ৪০ এবং এ ৪০ এ দ্রষ্টব্য)।

ইনসিওরেন্স ডাক্তারের রিপোর্টে উল্লিখিত বর্ণনা—বাঁ পায়ের গোড়ালীর কিছু উপরে অসমান ক্ষতচিহ্ন বাদীর দেহস্থিত ঐ ক্ষতচিহ্নের সহিত বেশ মিলিয়া যায়। বাদীর এবং কুমারের মিলের এই এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, উহা শুকনা ক্ষতের চিহ্ন, সাধারণ কোনও দাগ নহে। ডাঃ ডেনহাম তাঁহার নোটে সাধারণ দাগের এবং

ক্ষতচিহ্নের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। মেজর টমাসের মতে সে পার্থক্য অনেক সময় করিয়া স্থির করা হইয়াছিল। কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইটের ব্যাখ্যাক্রমে বুঝা যায়, ঐ ক্ষতের মাংস আঁশাল বটে ; কিন্তু তাহাতে চুল উঠিবার গ্রন্থি বা কোষ নাই। কেবল তাহাই নহে ; ঐ ক্ষতযুক্ত অংশ রসবাহক নাড়ী সমন্বিত নহে। তাই ঐ স্থানে রক্ত চলাচল হয় না বলিলেও চলে। ডাঃ ডেনহাম হোয়াইট বলেন,—সেই ক্ষতচিহ্ন অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার যদি সত্য ইনসিওরেন্সের ডাক্তার হইতেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষতচিহ্ন ছাড়া আরও সুস্পষ্ট কোনও চিহ্নের প্রতি লক্ষ্য করিতেন।

এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ক্ষতচিহ্ন ক্রমশঃ অস্পষ্ট হওয়ার দিকেই যায় এবং ইহাও সকলের স্বীকৃত যে, ১৯০৫ সালে কুমারের শরীরে একমাত্র ঐ ক্ষত চিহ্ন ছাড়া আর এমন কোনও বিশেষ চিহ্ন ছিল না, যাহা সহজে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। ১৯০৫ সালে মধ্যমকুমার উপদংশ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, এতদ্বিষয়ে কাহারও আলোচনার বিষয়ীভূত নহে ; সুতরাং দুষ্ট ক্ষতের জন্য অথবা উপদংশের জন্য ঐ ক্ষত হইয়াছিল,—ডাক্তারের নজর তাহা এড়াইয়া গেলেও কিছু আসিয়া যায় না। সুতরাং বাদীর পরিচয় অন্য কোনও ঘটনার দ্বারা মিথ্যা সপ্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত, ইহা নিঃসন্দেহ যে, ১৯০৫ সালের ২রা এপ্রিল, কুমার ইনসিওরেন্স ডাক্তারের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহার পায়ের গোড়ালীতে যে ক্ষত চিহ্ন দেখিতে পান, তাহা এই ক্ষতচিহ্ন, যাহা বাদীর শরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ডাক্তারের রিপোর্টে ভয় করিবার মত যথেষ্ট কারণ বিবাদীদিগের ছিল, তাহাদের সেই ভীতি অভিন্নতা প্রতিপন্ন করিবার অন্যতম প্রমাণ। ইনসিওরেন্স ডাক্তারের রিপোর্ট আসিয়া পৌছিলে কি ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহা দেখা যাউক— ডাক্তারের রিপোর্ট আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত সাক্ষীদিগের অনেকেই বলিয়াছেন যে,—ছোটকুমারের বিবাহের সময় মধ্যম কুমার লাঠি ধরিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া বেড়াইতেন (বাদীর ১৫, ৩৪, ২, ১৫, ৭১, ২১১, ৯৫৯, ৭৫৪, ৯০৬, ও ৯১৭ নং সাক্ষী দ্রষ্টব্য)।

বৃদ্ধ নাজীর গঙ্গাচরণ বলিয়াছেন যে, তিনি দুর্ঘটনার কথা শুনিয়াছেন। তিনি তখন বড়দালানে ছিলেন, তিনি তথা হইতে দৌড়িয়া গিয়াছিলেন, যাইয়া দেখেন যে, মেজকুমারের হাত হইতে রক্ত বাহির হইতেছে। সাক্ষী একখানি কাপড় ছিঁড়িয়া পট্টী বাঁধিয়া দেন। বাদীপক্ষে ৭৪ নং সাক্ষী বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার বলিয়াছেন যে, মেজকুমার ডিস্পেন্সারী হইতে ঔষধ লইয়াছেন, চাকরগণ তাঁহার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়াছে ; বাদীপক্ষের ৪৮নং সাক্ষী বৃদ্ধ

খানসামাও উহা দেখিয়াছে। এই সাক্ষ্যগুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন নাই বা একটা অতি সাধারণ ঘটনার মধ্যে বৈষম্য আছে, উহাও দেখিবার প্রয়োজন নাই। ইহা পরিষ্কার যে, মেজকুমারের গায়ে একটা অসমান দাগ না হইয়া থাকে, তবে এই দাগের প্রকৃত কারণ বলিতে ভগ্নীদের পক্ষে কোন বাধা থাকিতে পারে না। বিবাদীপক্ষের কোন সাক্ষী এমন কি ফণিবাবুও এই দাগ সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। এখন আর এই দাগের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। বিবাদীপক্ষ বলিয়াছেন, ছোটকুমারের বিবাহের সময় তিনি খোঁড়াইয়া হাঁটেন নাই। গাড়ীর চাকার দ্বারা তিনি কোন জখম পান নাই; চিকিৎসকগণ উপদংশের দরুণ এই প্রকার হইয়াছে বলিয়া মনে করেন না। বিবাদী পক্ষের একমাত্র মেজরাণী এই সম্পর্কে কিছু বলিয়াছেন। মেডিকেল রিপোর্ট আসিবার পর মেজরাণী একটা দাগ আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এই সম্পর্কে বলিয়াছেন :—

প্রঃ—তাঁহার শরীরে আপনি কোন দাগ লক্ষ্য করিয়াছেন ?

উঃ—তাঁহার বাম পায়ে একটি কাটার দাগ ব্যতীত অন্য কোন দাগ লক্ষ্য করি নাই।

প্রঃ—উহা কি রকম দাগ ?

উঃ—চামড়ার উপর একটা সাধারণ দাগ।

তিনি সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, মেজকুমারের বিবাহের সময়ই তিনি এই দাগ দেখিয়াছেন। ছোটকুমারের বিবাহের সময় তিনি (মেজকুমার খোঁড়াইয়া চলিয়াছেন কিনা জেরায় তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি এই উত্তর দিয়াছিলেন

'ছোট কুমারের বিবাহের সময় মেজকুমার খোঁড়াইয়া চলিয়াছেন কিনা তাহা আমার মনে নাই। তবে আমার যতদূর মনে পড়ে তখন যেন খোঁড়ান নাই।

প্রঃ—তিনি যে তখন খোঁড়াইয়া চলেন নাই, তাহা আপনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন কি ?

উঃ—আমি সঠিকভাবে বলিতে পারি না, কারণ আমার মনে নাই। এই সময় তাঁহাকে একখানি চিঠি দেখান হয়। এই চিঠিখানি তাঁহার বড় ভগ্নী মলিনা ১৪১০ সনের ৭ই ফাল্গুন (১৯০২-১৯০৪) তাঁহার নিকট লিখিয়াছিলেন ঐ চিঠিখানির মধ্যে নিম্নোক্ত ছত্রটিও লেখা ছিল; "রমেন্দ্রের পায়ের ঘা শুকাইয়াছে শুনিয়া আমরা সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছি"। ১৯০৪ সালের ২৪শে

জানুয়ারী ছোট কুমারের বিবাহ হইয়াছে (ছোটরাণীর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য) কোন চিকিৎসকই উহাকে অসমান দাগ বলিবেন না।

আমি বাদীর বাম পায়ের গোঁড়ালীর উপর একটা অসমান ক্ষত চিহ্নের দাগ দেখিতেছি। ইনসিওবেন্স ডাক্তারও এই দাগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

একজন চিকিৎসক বলিয়াছেন, বাদীর পায়ের গোঁড়ালির পেছনের দিকেও একটা দাগ আছে। বাদী এই দাগ সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। চিকিৎসকগণ এই দাগের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করেন না।

বাদীর চর্ম্ম কেমন

বাদীর উভয় পায়ের গোড়ালির উপর চামড়ার একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

বিবাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী লেঃ কর্ণেল পুলি একজন চিকিৎসক নহেন। তিনি কোর্টে বাদীর পায়েব চামড়া খস্‌খসে বলিয়া দেখিয়াছেন। লেঃ কর্ণেল ম্যাকগিলক্রাইষ্ট একজন অবসবপ্রাপ্ত আই, এম এস. তিনি সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ; তিনি বাদীর চামড়া সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, বাদীর চামড়া খসখসে এবং চিক্কণ—উহাকে মাছের চামড়া বলা যাইতে পারে, উহা বংশগত বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বিবাদী পক্ষের সাক্ষী কর্ণেল ডানহ্যাম হোয়াইটও উহা দেখিয়াছেন, তিনি এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, বাদীর পায়ের গোড়ালির উপর যে চামড়া আছে, উহা কতকটা অদ্ভুত ধরণের, উহা কি জিজ্ঞাসা কবা হইলে তিনি বলেন যে, উহা চামডাব উপর একপ্রকার দাগ। উহাব যে নামই দেওয়া হউক না, আমি মনে করি কর্ণেল ডানহ্যাম হোয়াইট অনুমানের উপরই উহা বলিয়াছেন। বাদী বলিয়াছেন যে, ছোট কুমার, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, কৃপাময়ী দেবী, বুদ্ধ, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর কন্যা মণি এবং তাঁহার এই প্রকার বৈশিষ্ট্য আছে। যাহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের পায়ে এইপ্রকার দাগ আছে। বাদী পক্ষ হইতে তাঁহাকে এই সম্পর্কে জেরা করা হয় নাই। সেই পক্ষের একজন সাক্ষীও স্বীকার করিয়াছে এবং অন্য সাক্ষিগণও উহা অস্বীকার করেন নাই। একজন সাক্ষী মামলার পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু পরে অস্বীকার করিয়াছেন। আমি এই দুইজন সম্পর্কে বলিব মামলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কমিশনে ফণীবাবুর ভগ্নীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে, তিনি উহা অস্বীকাব করিয়াছেন, কিন্তু বিচারের সময় ফণীবাবুও তাহা অস্বীকার করেন নাই।

দ্বিতীয় কুমারের খসখসে পা সম্পর্কে বহু সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছেন। বিশেষতঃ

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতার, কৃপাময়ী দেবীর, দ্বিতীয় কুমারের, ছোট কুমারের, তাঁহার নিজের, তাঁহার ছেলে বুদ্ধুর এবং তাঁহার কন্যা মণির এইরূপ খসখসে পা। আমি তাহার গোড়ালি ও পায়ের পাতার উপরের দিক দেখিয়াছি এবং উহা বেশ সুস্পষ্ট রূপে খসখসে। উহা মোটেই মসৃণ নহে। উহা রেতের মত খসখসে। বিবাদী পক্ষের কমিশন সাক্ষী উকীল জগদীশবাবু জেরায় স্বীকার করিয়াছেন যে, বুদ্ধু, দ্বিতীয় কুমার, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, ছোট কুমার ও বাদীর ঐ রূপ চামড়া। উহা 'হাতীর চামড়ার মত খসখসে।' ডাক্তার আশুতোষ দাসগুপ্ত ইহা স্বীকার করিয়াছেন। অপর দুইজন সাক্ষী উহা প্রায় স্বীকার করিয়াছেন। একমাত্র ফণীবাবুর ভগ্নী শৈবলিনী উহা অস্বীকার করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু একজন বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীর পক্ষে যতটা স্বীকার করা সম্ভব জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বেলায় এই সম্পর্কে তিনি ততটা স্বীকার করিয়াছেন। মিঃ চৌধুরী এই বিষয়ে তাঁহার জেরায় উল্লেখ করেন নাই। এই সম্পর্কে বাড়ীর চাকর অথবা আত্মীয়স্বজন অথবা যাঁহারা এই পরিবার ভাল রকম জানিতেন এইরূপ বহু লোকের সাক্ষ্য খণ্ডন করা হয় নাই। আমি দেখিতেছি যে, অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন মিঃ নরেন্দ্র মুখার্জ্জী ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দ্বিতীয় কুমার ও ছোট কুমারের মধ্যে উহা লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা পরিবারের একটা বৈশিষ্ট্য। আশুডাক্তার বলিয়াছেন যে, গোড়ালির সন্ধিস্থলে খসখসে চামড়া ভাওয়াল রাজপরিবারের একটা বৈশিষ্ট্য। কেবল বড় কুমার ও ইন্দুময়ীর বৈশিষ্ট্য নাই।

(গ) কাণ ফোঁড়া

বাদী এ বিষয় উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু মিঃ চৌধুরী সত্যভামা দেবীর ভাইপো কুমুদ গোস্বামীকে জেরা করিয়া ইহা বাহির করিয়াছেন। কুমুদবাবু রাজবাড়ীতেই প্রতিপালিত হন। তিনি বলেন যে, কুমারের কাণ ফোঁড়া ছিল জীবন বীমার এজেন্ট মিঃ সেনকেও এই প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু মিঃ সেনের তাহা স্মরণ নাই। ফোঁড়ার কথা সাক্ষিগণ অস্বীকার করিবে এই উদ্দেশ্যেই ঐ প্রশ্ন করা হইয়াছিল। কিন্তু উত্তর আসিল 'হাঁ' এবং কেহ তাহা অস্বীকার করিতেছে না। বাদীর কাণও ফোঁড়া দেখা যায়, ইহা খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া আমি মনে করি না। কিন্তু আমার মনে হয় না যে, উহা টীকার চিহ্নের ন্যায় একটা সাধারণ জিনিস।

(ঘ) উপদংশজনিত দাগ

উপদংশঘটিত চিহ্ন বলিয়া যেসব চিহ্নের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা উপদংশ-ঘটিত চিহ্ন ইহা স্বীকার করা হয় নাই, কিন্তু ঐরূপ চিহ্ন দেখা গিয়াছে এবং এবং ডাঃ ডেনহ্যাম তাঁহার নোটে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

পক্ষাপক্ষের সম্মতিক্রমে আদালত এক আদেশ দেন, যেন পক্ষাপক্ষ স্বীকার করেন যে, বিবাদীপক্ষের একজন ডাক্তার এবং বাদী পক্ষের একজন ডাক্তারদ্বারা বাদীকে পরীক্ষা করা হইবে ও তাঁহাদের দ্রষ্টব্য বিষয় এবং মতবাদের মধ্যে যদি মতভেদ হয়, তাহা হইতে বাদী তাঁহার একজন ডাক্তার ডাকিতে পারিবেন।

বিবাদীপক্ষে লেঃ কর্ণেল ডেনহ্যাম হোয়াইট আই, এম, এস, (অবসরপ্রাপ্ত) এবং মেজর টোমাস আই, এম, এস বাদীকে পরীক্ষা করেন এবং বাদীপক্ষে লেঃ কঃ কে, কে চাটার্জ্জি ছিলেন। এই তিনজন ডাক্তার বাদীকে একই সময় পরীক্ষা করেন। এই উপদংশ জনিত চিহ্ন সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ হয়।

কর্ণেল ডেনহ্যাম হোয়াইট এল, আর, সি, পি (?) এম আর সি এস, এম বি, বি, এস (লণ্ডন), একজন অবসরপ্রাপ্ত আই, এম, এস, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে তিনি তিনবৎসর প্রেসিডেণ্ট সার্জ্জেন ছিলেন। ১৯২২ সালে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সার্জ্জারীর অধ্যাপক ছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি বিভিন্ন জিলার সিভিল সার্জ্জেন ছিলেন।

মেজর টমাস্ আই, এম, এস, একজন সিভিল সার্জ্জন, তিনি এখনও চাকুরীতে আছেন। দুইজনই অভিজ্ঞ ডাক্তার। কিন্তু ইহারা কেহই উপদংশ রোগের বিশেষজ্ঞ নহেন। অবশ্য সাধারণ চিকিৎসাকালে তাঁহারা উপদংশের রোগী পরীক্ষা করিয়া থাকিবেন। মেজর টমাস ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে ম্যাঞ্চেষ্টারের কোন যৌন-রোগ-চিকিৎসার হাসপাতালে ৬ মাস কাল ছিলেন। লেঃ কঃ, কে, কে, চাটার্জ্জি এফ-আর-সি আই, লণ্ডনের রয়েল সোসাইটী অব মেডিসিনের ফেলো। বেঙ্গল ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির ফেলো, লণ্ডনের বাইও কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্য। ১৯০৭ সালে ডিগ্রী লাভ করেন। লণ্ডনের উলউইচ হাসপাতালে কর্ণেল ল্যামকিনের অধীনে তিনি কাজ করেন। যৌন-ব্যাধি চিকিৎসার জন্যই ঐ হাসপাতাল সার্জ্জারী, ট্রপিক্যাল সার্জ্জারী এবং উপদংশ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ। পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা সরকারী মেডিকেল স্কুলের সার্জ্জেন ছিলেন এবং পরে উহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। ঐ অবস্থায়ই তিনি

সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে তিনি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের সাজ্জারীর সিনিয়র অধ্যাপক। তিনি অপারেটিভ সাজ্জারী, ট্রপিক্যাল সার্জ্জারী, প্যাথলজী, সিফিলিস সম্পর্কে বই লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষে ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ফণ্ডের অধীনে তিনি উপদংশ রোগ সম্পর্কে গবেষণা করেন। ঐ ফণ্ডে ভারত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সাহায্য আছে। টক্‌সিন ভিন্ন স্যালভাসন হয় কি না তৎসম্পর্কে গবেষণা করেন। তিনি উপদংশ রোগ বিশেষজ্ঞ নহেন, একথা কেহ বলেন নাই।

ডাক্তারেরা কি ভাবে পরীক্ষা করেন

প্রত্যেক ডাক্তারই পরপর বাদীকে পরীক্ষা করেন। পরে কর্ণেল ডেনহ্যাম হোয়াইট চিহ্নসমূহের বিবরণ বলেন এবং অপর দুইজন ডাক্তার তাহা লিখিয়া লন। মেজর টোমাস ও কর্ণেল চাটার্জ্জির নোট আদালতে দাখিল করা হইয়াছে। তাঁহারা যাহা দেখিয়াছেন সেই সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় ভিন্ন তাঁহাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। উপদংশজনিত চিহ্ন সম্পর্কে কর্ণেল চাটার্জ্জি একমত হইতে পারেন নাই, কিন্তু চিহ্নের কারণ সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। কর্ণেল ডেনহাম মেজর টমাসের গৃহীত নোট প্রমাণ করেন। কর্ণেল চাটার্জ্জিকে বলা হইয়াছে যে, কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট যাহা বলিয়াছেন এবং ঐ দুইজন ডাক্তার যাহা লিখিয়াছেন উভয়ের স্বীকৃত মতেই তাহা লিখা হইয়াছে। ইহার অপেক্ষা অধিক অসত্য উক্তি আর কিছু হইতে পারে না।

পরে ইহা আর মনে ছিল না এবং তাহা প্রত্যাহার করা হয়। ডাক্তারগণ যখন বাদীকে পরীক্ষা করিতেছিলেন তখন উভয়পক্ষের কৌঁসুলী উপস্থিত ছিলেন। শুধু যখন বাদীর গোপন অঙ্গসমূহ পরীক্ষা করা হইতেছিল, তখন তাঁহারা উপস্থিত ছিলেন না। কর্ণেল চাটার্জ্জি বলিয়াছেন; এবং তাহার লিখিত নোট দ্বারা তাহা সমর্থিত হইয়াছে যে, কর্ণেল ডেনহাম যাহা বলিয়া দিয়াছেন তাহা তিনি লিখিয়া নিয়া তাঁহার সঙ্গে নিজের মন্তব্যও জুড়িয়া দিয়াছেন। তাহার এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, ঐ সব নোট তুলনা করা হইবে এবং পরে তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হইবে। পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে তিনি ডাক্তারের সেরূপ করিয়া থাকেন সেই ভাবে তাহাদের মধ্যে আলোচনার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ঐরূপ কোন আদেশ নাই এই অজুহাতে বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলী তাহাতে বাধা দেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—

"আমি আপনাকে বলিতেছি যে, আপনারা তিনজন ডাক্তারে যাহা দেখিয়া একমত হইয়াছেন তাহাই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

উঃ—না। সামান্য মতভেদ ছিল এবং এইজন্য আমরা মিলিত হইতে চাহিয়াছিলাম।

প্রঃ—আমি আপনাকে বলিতেছি যে, যাহা বলিয়া দেওয়া হইতেছিল তৎসম্পর্কে আপনি কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই ?

উঃ—ইহা সত্য নহে।

প্রঃ—আমি আপনাকে বলিতেছি যে, নোট নিবার পূর্ব্বেই সমস্ত আলোচনা হইয়া গিয়াছিল।

উঃ—হাঁ, আমার মতানৈক্যের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছিল। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আমি আমার মতানৈক্যের কথা লিখিয়া রাখিতেছি এবং কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইটকে তাহা স্থানে স্থানে দেখাইয়াছি।

প্রঃ—আমি বলিতেছি যে, আপনি কখনও তাহা করেন নাই।

উঃ—তাহা মিথ্যা কথা।

ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, কর্ণেল চাটার্জ্জি তাঁহার নোটে তখন তখনই অতিরিক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন এবং তাহা তুলনা করিতে চাহেন। কিন্তু কোর্টের আদেশের ঐরূপ ভাব থাকিলেও বিবাদীপক্ষের উকীল তাহাতে বাধা দেন। যেখানে বিশেষজ্ঞদের অভিমত প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে চলিয়াছে এবং আলোচনা করিয়াও যেখানে কোন অভিমত প্রকাশ করা যায় সেই ক্ষেত্রে কর্ণেল চাটার্জ্জি তাঁহার নিজের মতকে প্রামাণ্য মত বলিয়া অপর দুইজন ডাক্তারকেও নিজের মতে টানিয়া আনিবেন, এইরূপ আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। আর যদি তিনি তাঁহার যুক্তি দ্বারা ঐরূপ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধে কাহারও অভিযোগ করিবার কিছু থাকিবে না।

যেসব চিহ্ন সম্পর্কে বিতর্ক আছে এবং যে সব সম্পর্কে কর্ণেল চাটার্জ্জি নিজের মন্তব্য যোগ করেন, তাহা এই—নাকের উপকার অর্ব্বুদ 'উপদংশ জনিত ক্ষত চিহ্ন' চামড়ার উপরে এইরূপ ৬টি চিহ্ন আছে আর একটী অর্ব্বুদ চিহ্ন সম্পর্কেও মতভেদ রহিয়াছে।

উপদংশ সম্বন্ধে সাক্ষ্য বিশ্লেষণ

বিশেষজ্ঞগণের সাক্ষ্য প্রমাণের মূল্যাবধারণ করিতে হইলে যে সকল বিষয়ে কোনও মতবিরোধ নাই, তাহার কতকগুলি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি। তাহা ছাড়া উপদংশ ব্যাধি সম্বন্ধে যে সাতজন ডাক্তার সাক্ষ্য দিয়াছেন,

তাঁহাদের সাক্ষ্য হইতে (সকলেই ব্যাধি সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলিয়াছেন) এবং ঐ ব্যাধি সম্বন্ধে আমার নিকট যে সকল প্রামাণ্য গ্রন্থ উপস্থিত করা হইয়াছে. (তন্মধ্যে ডেভিড লেসের "প্র্যাকটিক্যাল মেথডস ইন ডায়গনসিস এণ্ড ট্রিট-মেণ্ট অব ভিনিরিয়েল ডিজিসেস—"রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি এবং ধাতুসংক্রান্ত ব্যাধির চিকিৎসা বিশেষ উল্লেখযোগ্য), তাহা হইতে যে আবশ্যক বিষয়গুলি সংগৃহীত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও উল্লিখিত হইতেছে। উপদংশ ব্যাধি সংক্রান্ত বর্ণনার যে অংশ আমি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি, তদ্বিষয়ে কোনও মতবিরোধ নাই। মামলা সম্পর্কে উহার যতটা আবশ্যক, তাহার অধিক এখানে কিছুই উল্লেখ করা হইবে না।

১৯০৯ সালের মে মাসে মধ্যমকুমার যখন দার্জ্জিলিং যান, তখন তাঁহার শরীরে অর্ব্বুদ উৎপাদক উপদংশজ ক্ষত ছিল। ১৯০৮ সালে চিকিৎসার্থ তিনি কলিকাতায় গিয়াছিলেন ; তখনও তাঁহার শরীরে ক্ষত ছিল। বিবাদী পক্ষের সাক্ষী ফণীবাবু বলিয়াছেন, ১৯০৯ সালের পূর্ব্বে তিনি বৎসর যাবৎ মধ্যম-কুমামরের উপদংশ রোগ ছিল। ঠিক সেই সময় আড়াই বৎসর কাল তিনি উপ-দংশজ ক্ষতে ভুগিয়াছিলেন, সুতরাং ইহা স্থির নিশ্চিত যে, ১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে মধ্যমকুমার যখন ইনসিওরেন্স ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার উপদংশ ব্যাধি ছিল না ; এ হিসাবে ১৯০৫ সালে এপ্রিল এবং ১৯০৭ সালের নবেম্বর—এই সময়ের মধ্যে মধ্যম কুমারের উপদংশ সন্দেহ হইয়াছিল, এবং ১৯০৭ সালের নবেম্বরে ক্ষত প্রকাশ পায়। ঠিক কোন দিন যে তিনি রোগাক্রান্ত হইলেন, তাহার ঠিক তারিখ স্থির করিবার প্রয়োজন নাই ; কিন্তু ১৯০৬ সালের প্রথমেই কুমারকে রোগ স্পর্শ করে, তাহা বুঝা যায়—কেনন', ছয়মাস হইতে দুই বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ অর্ব্বুদ বাহির হইবার সময়। ১৯০৬ সালের প্রথম ভাগে বলিলে বিশেষ ভুল হইবে না—কেননা, পুরাতন খানসামা প্রতাপ বলিয়াছে যে, রাণীর জীবিত থাকা কালেই ব্যাধির আক্রমণ আরম্ভ হয়।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে চিকিৎসার জন্য মধ্যম রাণীকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হয়। ইন্দুময়ী এক চিঠিতে রাণীকে লিখিয়াছিলেন (চিঠির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) যে, তাঁহার (মধ্যম রাণীর) রক্ত বিষাক্ত হয় নাই। রাণী ১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসে পরলোকগমন করেন, তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং দার্জ্জিলিং গমনের তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে ব্যাধির সূচনা হয়—এই সিদ্ধান্ত প্রায় ঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

এখন উপদংশের ঔষধ বাহির হইয়াছে। ১৯০৯ সালে এলরিস এই

ব্যারামের 'স্যালভার্সন' নামক ঔষধ আবিষ্কার করেন। ১৯১০ সালে ঐ ঔষধ বাজারে বিক্রয়ের জন্য বাহির করা হয় (ডেভিড লেসের গ্রন্থ, ১৫৫ পৃঃ, ১৯৩১ সালের সংস্করণ)। মধ্যমকুমার এই ঔষধের কোনও সুবিধাই গ্রহণ করিতে পারেন নাই। উপদংশের যদি রীতিমত চিকিৎসা হয়, তাহা হইলে অর্ব্বুদ প্রায়ই হয় না। মধ্যমকুমারের যখন পীড়া হয়, তখনও প্রতিষেধক ঔষধ ছিল—যেমন পারদ। পারদ ব্যবহার করিলে অর্ব্বুদ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তৎসত্ত্বেও মধ্যমকুমারের যখন উপদংশজনিত অর্ব্বুদ হইয়াছিল, তখন বেশ বুঝা যায় যে, মধ্যমকুমারের চিকিৎসার রীতিমত ব্যবস্থা হয় নাই। ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মধ্যমকুমারের কনুইতে এবং তাঁহার পায়ে উপদংশজ অর্ব্বুদ প্রকাশ পাইয়াছিল। এখন প্রশ্ন এই যে, বাদীর শরীরের যে অর্ব্বুদ চিহ্ন আছে, তাহা উপদংশজনিত কি না, এবং ঐ অর্ব্বুদচিহ্ন উপদংশের স্মারক-চিহ্ন কি না। আর একটী প্রশ্ন হইতেছে এই যে, বাদীর উপদংশ রোগ ছিল অথবা ছিল না? এ প্রশ্ন ডাক্তারদের মনে জাগিয়াছিল বটে; কিন্তু এই সাধারণ প্রশ্ন ঠিক খোলাখুলিভাবে উত্থাপন করা হয় নাই। মেজর টমাস বলিয়াছেন,—দরখাস্তের লিখিত চিহ্নগুলির বিশ্লেষণ এবং উপদংশ সম্পর্কিত বিষয় প্রমাণ করা, অথবা তাহা উড়াইয়া দেওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ, আমাদের সাক্ষ্যের বিষয় ছিল।

উপদংশ ব্যাধি দুই প্রকারে সংক্রামিত হয়; এক সংসর্গজ, আর জন্মসহজাত। সংসর্গজ উপদংশে, উপদংশের বীজাণু পরস্পর সংসর্গের ফলে এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রামিত হয়। সংক্রমণের আদি ক্ষেত্রই হইতেছে জননেন্দ্রিয়। লোন্‌ছা হইতে প্রথমে ব্যাধির সূচনা হয়। ক্রমশঃ সেই লোন্‌ছা দুষ্ট ব্রণে পরিণত হইয়া ক্ষত সৃষ্টি করে। সে ক্ষত বেদনাহীন, অবসাদযুক্ত এবং ক্ষয়শীল। এই প্রকারের ক্ষত উপদংশজনিত ক্ষত বলিয়া অভিহিত হয়। ইহার ফলে সচরাচর নিকটবর্ত্তী লসিগ্রাহী গ্রন্থি স্ফীত ও শক্ত হইয়া উঠে। এই সকল এবং কুচকির মাংসপিণ্ড (ইনকুইন্যাল গ্ল্যাণ্ড) রবারের বলের মত নিম্নগামী হইয়া ঝুলিতে থাকে, ইহাকেই উপদংশজ বাগী বলে। অন্য কোনও বীজাণু সংক্রামিত না হইলে ইহাতে পূঁয হয় না। তবে পূঁয হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়।

উপদংশের বীজ রক্তের সহিত মিশ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত, ব্যাধি প্রাথমিক অবস্থায় থাকে। বীজাণু রক্তের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিলেই দ্বিতীয় স্তরের অবস্থা সূচিত হয়। এই প্রাথমিক অবস্থার অব্যবহিত পরেই প্রায় যে সকল বহিঃ-চিহ্ন প্রকাশ আরম্ভ হয়, তাহার মধ্যে স্ফোটকাদি উদ্ভেদ, ব্রণ, কণ্ডু প্রভৃতি প্রধান। এইগুলি ক্রমশঃ মিলাইয়া যায় না, মিলাইলে শেষ অবস্থায় তাহা

হইতে উপদংশ জনিত ক্ষতের উৎপত্তি হয়। এ অবস্থা যে কতদিন চলে, তাহা বলা যায় না। মাংসের নীচে যে কোনও স্থানে—হাড়ে, যকৃতে অথবা অন্য কোনও যন্ত্রে 'গামা' বা উপদংশজ ক্ষত জন্মিতে পারে। মাংসতন্তুর কোনটাই আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পায় না। চামড়ার উপর যে ক্ষতজনিত অর্ব্বুদ জন্মে, তাহা প্রথম অবস্থায় সচরাচর চামড়ার নীচে গুটি বা আঁবের আকারে উঠে; সময় সময় ঐ গুটি চামড়ার নীচে থাকিয়াই শুকাইয়া যায়। তাহাতে চামড়ার উপরে কোনও দাগ রাখে না বটে, তবে চামড়ার উপর একটা গর্ত্তের মত চিহ্ন দেখা যায়। ঐ গুটি আঁব বড় হইয়া চামড়া ফুটিয়াও বাহির হইয়া থাকে। সেক্ষেত্রে শরীরে উপদংশজ ক্ষত জন্মে। ঐ প্রকার ক্ষতের প্রকৃতিই এই যে,—উহার ধারগুলি বসা এবং উহার মধ্য হইতে পচা মাংস আলগা হইয়া আসে এবং ধারের চামড়া মরিয়া উঠিয়া যায়, যখন সেগুলি শুকাইয়া যায়, তখন একটা ক্ষতের দাগ থাকে। এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই হইতেছে যে, বাদী তাহার শরীরে উপদংশজ ক্ষত বলিয়া যে সকল চিহ্ন দেখাইতেছেন, তাহা এই প্রকারের ক্ষতচিহ্ন কি না?

চামড়ার উপর যে ক্ষত জন্মে, তাহা ছাড়া আগে অথবা পরে, অন্য প্রকারের উপদংশ অর্ব্বুদ হইতে পারে। শরীরের অপরাপর অংশের মধ্যে ঐ প্রকারের গুল্ম, জিহ্বার উপরে এবং হাড়ের উপরে জন্মে উপদংশজ অন্যান্য চিহ্নের মধ্যে হাড়ের উপরও অস্থি-গুল্ম হয়, হাড়ের এই বাড়্তি সচরাচর 'অস্থি গুল্ম' নামে অভিহিত হয়।

চামড়ার উপরকার অর্ব্বুদ সম্বন্ধে একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, উপদংশ ব্যাধির মাধ্যমিক অবস্থায় যে প্রকারের স্ফোটক জন্মে, ইহা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। ঐ অর্ব্বুদের আকার সুডৌল ও বৃত্তের ন্যায়, অথবা বৃত্তাংশের মত; আবার ক্ষেত্র বিশেষে উহার আকৃতি বৃত্ত-সমষ্টির ন্যায়।

আমি বিশেষজ্ঞদিগের উক্তি হইতে, এবং আমার নিকট দাখিলী প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হইতে এই বিবরণ সংক্ষেপে সঙ্কলন করিলাম। আমার সিদ্ধান্তে সহায়তা করে—এমন সকল বিষয়ের উল্লেখপ্রসঙ্গে আমি পুনরায় এবিষয়ের অবতারণা করিব।

এক্ষণে দুইটি বিষয় সম্পর্কিত প্রমাণের বিষয় বিবেচনা করিব তাহা এই—(১) উপদংশজ গুল্ম; যাহার সম্বন্ধে মতান্তর আছে; এবং (২) উপদংশজনিত অর্ব্বুদের চিহ্ন।

"যে গুল্ম লইয়া মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ডাঃ ডেনহাম হোয়াইটের নোটের মধ্যে ২য় ও ১০ম দফায় দৃষ্ট হয়, ঐ গুল্ম সম্বন্ধে তিনজন ডাক্তার এই

অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 'নাসিকা সেতু'র ডানদিকে হাড়ের যে বাড়্তি, যাহা একটু উপরে অবস্থিত, এবং যাহাকে সম্মুখ মণ্ডল সম্পর্কিত একটা স্তর বলা যাইতে পারে, তাহাকে গুল্ম বলা চলে না। ডাক্তারেরা (কর্ণেল চাটার্জ্জি) 'নাসিকা-সেতু'র বাম দিকে সেরূপ কোনও হাড় বাড়্তি দেখেন নাই। এখন প্রশ্ন এই যে, 'নাসিকা সেতুর' ডানদিকের 'হাড়-বাড়্তি' যাহা সকলেরই স্বীকৃত, সেটি কি ? লেঃ কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট এবং মেজর টমাস বলেন, উহা উপদংশজ নহে। ইহা ছাড়া তাঁহারা অন্যমত প্রকাশ করেন নাই। প্রথম জবানবন্দীতে ডাঃ ডেনহাম হোয়াইট বলেন,—এইরূপ গুল্ম কোনও আঘাতের ফলে অথবা ঘুষি মারিলে হইতে পারে। জেরার উত্তরে তিনি বলেন, উহা কতদিনের তাহা তিনি বলিতে পারেন না ; তবে এইরূপ চিহ্ন যে অল্প দিনের নয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মতে, খুব জোরে আঘাত করা হইয়াছিল। ঐস্থানে কোনও দাগ নাই। তাঁহার মতে উহা জন্মসহজাত হইতে পারে। কিন্তু তিনি আবার বলেন, সেরূপ নাও হইতে পারে। শেষে তিনি বলেন যে, ঐরূপ চিহ্ন যে কোনও কারণে হইতে পারে। হাড় ভাঙ্গা সে সকল কারণ হইতে বাদ পড়ে না। নাকের মধ্যে হাড় বাড়িয়া গেলেও ঐরূপ গুল্ম চিহ্ন হইতে পারে ; ফলতঃ সাক্ষী জন্মগত কারণ একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন ; তিনি বলেন, সে কারণ সম্ভব নাও হইতে পারে।

মেজর টমাস বলেন যে, ইহা ঠিক কিনা তাহা বলা কঠিন ; হয় ইহা নাসিকার অস্থিতে একটা অস্বাভাবিক কিছু, নতুবা নাসিকার অস্থিতে আঘাত লাগিবার পর উহা তাহার অবশিষ্টাংশ বা উহা অস্থির অস্বাভাবিক পরিবর্দ্ধনও হইতে পারে। লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল ডেনহ্যাম হোয়াইটের মনেও ঠিক এই রকম ধারণাই হইয়াছিল। তিনি এই অস্থির পরিবর্দ্ধনে যে সকল কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে হাড় ভাঙ্গার কথাও বাদ যায় নাই। অবশ্য তিনিও উপদংশের কথা বলিয়াছেন ; কারণ তাঁহার মতে বাদীর যদি উপদংশ কখনও হইয়া থাকে, তবে অবস্থাটা অদ্ভুত রকমের হইলেও এই দুইটি কথা একসঙ্গে মনে হওয়া ছাড়া উপায় নাই।

কর্ণেল চাটার্জ্জির স্থির বিশ্বাস যে, ইহা উপদংশ জনিত অর্ব্বুদ ; একজন বিশেষজ্ঞও এই কথা বলিয়াছেন। অপরদিকে উপদংশের কথা উড়াইয়া দিবার জন্য কেবল নীতিবাচক ও যুক্তিহীন উত্তর। কর্ণেল লেফটেনাণ্ট ডেনহ্যাম উপদংশের কথা এই বলিয়া বাতিল করিয়া দিতে চান যে, উপদংশ হইলে ইহা ক্রমশঃই বাড়িত, এবং যে অবস্থা দেখা যায়, তাহা অস্বাভাবিক। কেহই জানেনা যে, ইহা বাড়িতেছে কি না। স্থান সম্পর্কে কর্ণেল চাটার্জ্জি বলেন যে,

ইহা স্বাভাবিক ও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। টমাস ও মাইলাসব যে "ম্যানুয়েল-অব সার্জ্জারী" আমাকে দেখান, তাহাতে নিম্নের কথাগুলি আছে:—

অর্ব্বুদ উৎপাদক উপদংশ জাতীয় ব্যাধিতে যে সকল অস্থি আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইতেছে, মাথার খুলি, নাসিকার অস্থি, নাসারন্ধ্র ব্যবধায়ক ঝিল্লী, প্যালেট, স্টেরনাম, ফিমার, টিবিয়া এবং বাহুর অগ্রভাগের অস্থি। (৮ম সংস্করণের প্রথম সংখ্যায়, ৯ম পরিচ্ছেদে, ৪০২ পৃষ্ঠায়)। ৫১ পৃষ্ঠায় ডেভিড লীজ বলেন যে, মাংসতন্তু ছাড়াছাড়ি নয়; যদিও ১০১ পৃষ্ঠায় তিনি বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ অর্ব্বুদ কোলার্ট বোন, ষ্টেরনাম, বুকের পাঁজর এবং টিবিয়াতে দেখা দেয়। উপদংশ যে ছিল, একথা উড়াইয়া দেওয়ার কোন কারণ নাই, এবং মিঃ চাটার্জ্জীর উক্তি হইতেই ইহা বিশ্বাস করা যায়। তবে আমি বলিব, সেরূপভাবে ইহা বিশ্বাস করিবারও প্রয়োজন নাই। বাদী যে উপদংশ ব্যাধিগ্রস্ত লোক ছিলেন, তাহা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট নজীর আছে। কর্ণেল চাটার্জ্জি উপদংশের কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অর্ব্বুদ দ্বারাই প্রমাণিত হয়, এবং বিশেষ করিয়া ষ্টেরনামে যে স্থূল চিহ্ন দেখা যায়, তাহাতে আর কোন সন্দেহের অবসর থাকে না। কর্ণেল চাটার্জ্জি জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ স্থূল চিহ্ন একটা উপদংশজনিত অর্ব্বুদ। অপর পক্ষে বলা হইয়াছে যে, খুব সম্ভব চর্ব্বি জমিয়া ঐ স্থানটী ঐরূপ হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলা যায় যে, বাদীর শরীরে উপদংশ আছে।

বাদীর শরীরে বর্ত্তমানেও উপদংশ আছে কিনা, এই কথা ডাঃ টমাস কিংবা ডাক্তার ডেনহাম হোয়াইট—কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই—এ কথাও বলা মুস্কিল, এবং উপদংশ সম্বন্ধে নেতিবাচক মতামত প্রকাশ করিয়া সাদৃশ্য প্রমাণ বাতিল করিয়া দেওয়ায়ও কোন প্রশ্নই উঠে না; কিন্তু যদি স্বীকার করা হয় যে, উপদংশ আছে, তবে সাদৃশ্য প্রমাণের পক্ষে উহা একটি নজির হইয়া দাঁড়ায়। ইহা দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না; তবে দ্বিতীয় কুমারের উপদংশ ছিল, এই ঘা উপদংশের চিহ্ন যে সর্ব্বক্ষেত্রেই থাকিবে এমন কোন কথা নাই। মেজর টমাসের কথা উল্লেখ করিয়া ডাক্তারেরা—উপদংশ ছিল, কি ছিল না—ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া এমন কতকগুলি জিনিষ দেখিতে পান, যাহা লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইটের নোটে উল্লেখ নাই। মেজর টমাস ইহা স্বীকার করেন যে, কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী যেমন বলিয়াছেন, তেমন কতকগুলি কাজ করা হইয়াছে সেইগুলি হইল এই:—কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট বাদীর অণ্ডকোষ টিপিয়া দেখেন। বাদী যেভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়েন, তৎপ্রতি কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী, মেজর টমাস ও কর্ণেল ডেনহামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং বাদীর

পুরুষাঙ্গে উপদংশ জনিত কোন ক্ষত আছে কি না, তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী বলিয়াছেন যে, বাদী বেশ জোরে শ্বাস টানেন, এবং উহাতে শব্দ হয়, কর্ণেল চ্যাটার্জ্জীর এই কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না। নাসারন্ধ্রে শ্লেষ্মা জমিয়া আছে কি না তাহা দেখিবার জন্য মেজর টমাস টর্চ্চ লাইট ফেলিয়া লক্ষ্য করেন। বাদীর শ্বাস-প্রশ্বাস যে অদ্ভুত ধরণের, এই কথা মেজর টমাস স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি পায়ে এবং হৃদ্‌পিণ্ডে শোথের কথা উল্লেখ করেন। ইহা কিন্তু পরীক্ষা করা হয় নাই। বাদীর শ্বাস-প্রশ্বাস কেবল জোরেই বহে এমন নহে, সঙ্গে সঙ্গে শব্দও হয় এবং তাহাতে মনে হয় যে, নাসিকা পথে কোথাও বাধা পাইতেছে। কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী নাকের মধ্যে সাদা সাদা দাগ দেখিতে পান এবং ইহাও লক্ষ্য করেন যে, নাসারন্ধ্র ব্যবধায়ক ঝিল্লী কিঞ্চিৎ স্ফীত। তিনি বলেন যে, উপদংশ থাকিলে এরূপ অবস্থা হয়। ইহার সহিত আরও বলা যাইতে পারে যে, বাদীর অণ্ডকোষে তিনবার টিপিবার পর সে ব্যথায় সঙ্কুচিত হয়। কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী বলেন যে, সাধারণ লোক হইলে ইহাতে চীৎকার করিবার কথা।

কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী বলেন যে, বাদীর জিভের মাঝখানটা যে কাটা, তাহা বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। আমি আদালতে বাদীর জিভ দেখিয়াছি, উহা কাটা বলিয়া মনে হয়। কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী নাকে, জিহ্বায় এবং পায়ের আঙ্গুলে যে সকল লক্ষণ দেখিয়াছেন, তাহা উপদংশ জনিত বলিয়াই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। এতদ্ব্যতীত বাদীর অণ্ডকোষে যে তেমন স্পর্শানুভূতি নাই, ইহা দ্বারাও বাদীর উপদংশ থাকা প্রমাণিত হয়। ডেভিড লীজ ৮৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, উপদংশ জনিত অর্ব্বুদ সাধারণতঃ জিভেই প্রথমে দেখা যায়। খাদ্য বস্তুর সহিত ক্রমাগত ঘষণ লাগার দরুণ ইহা বৃদ্ধি পায়; ফলে জিভে ফাক দেখা দেয়; বিশেষভাবে আক্রান্ত হইলে পরে ক্ষত হয়।

বাদী বহু পূর্ব্বেই উপদংশ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া দেখা যায়। তাহার 'নাসিকা সেতু'র ডান দিকে ৭/১৬ ইঞ্চি ব্যাসের একটি হাড় বাড়িয়াছে এবং বাঁ দিকের হাড় সামান্য মোটা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সেপ্টাম সামান্য ফুলিয়াছে এবং নাসারন্ধ্র ব্যবধায়ক বা ঝিল্লী স্ফীত হইয়াছে। এই সকলের দরুণ এবং অর্ব্বুদ থাকায় নাকের গড়ন পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য। এতদ্ব্যতীত চেহারায় আর কোন বৈসাদৃশ্য নাই; একমাত্র বলা যায়। বাদীর চুল পাকিয়াছে। ডি (২) চামড়ায় উপদংশ জনিত ক্ষত চিহ্ন ডেনহাম হোয়াইটের নোটের মধ্যে উল্লেখ আছে, তথায় ছয়টি চিহ্নের কথা আছে, সেইগুলি এই :—

(১) বাম বাহুতে গোলাকৃতি অসমান চিহ্ন।

(২) ডান বাহুতে গোলাকৃতি অসমান চিহ্ন।
(৩) ডান বাহুর উপর আর একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন।
(৪) কাণের ভিতরে একটী চিহ্ন।
(৫) বাম পায়ের নীচের দিকে চুরুট আকারে একটা চিহ্ন।
(৬) বাম পায়ের পিছনের দিকে একটা চিহ্ন।

শেষ চিহ্নটীকে বাদী উপদংশ জনিত ক্ষত বলিয়া বলেন নাই। চিকিৎসকগণ উহাকে উপদংশের ক্ষত বলিয়াছেন। কর্ণেল চাটুর্য্যে উহাকে 'লিয়োকো মেলানো দেরমা' নামক চামড়ার এক প্রকার রোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লেঃ কর্ণেল ডেনহ্যাম হোয়াইট ইহা শুনিয়াছেন; কিন্তু এই প্রকার অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবগত নহেন বলিয়া বলিয়াছেন। উপদংশের একটা চিহ্ন ব্যতীত এই চিহ্নের আর কোন গুরুত্ব নাই, তিনি উহাকে পোর্টে ওয়াইনের চিহ্ন বলিয়াছেন কিন্তু এই চিহ্ন হইবার কারণ তিনি খুঁজিয়া পান নাই।

অন্য চিহ্নগুলি উপদংশজনিত ক্ষত নহে বলিয়া কর্ণেল ডেনহ্যাম হোয়াইট ও মেজর টমাস অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু কর্ণেল চাটুর্য্যে ঐগুলি উপদংশজনিত ক্ষত বলিয়াছেন।

এই সকল চিহ্নের মধ্যে (১) নং চিহ্ন বাম বাহুর উপর (২) ও (৩) ডান বাহুর উপর কর্ণেল ডেনহ্যাম হোয়াইট (১) ও (২) নং চিহ্নকে একই শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন এবং ঐগুলিকে বসন্তের দাগ বলিয়াছেন (১) (২) ও (৩) নং চিহ্ন গোল এবং (১) ও (৩) নং চিহ্ন অস্পষ্ট (১) ও (২) নং চিহ্নে কর্ণেল চাটুর্য্যে কয়েকটা রঞ্জক চিহ্ন দেখিয়াছেন ও (২) নং চিহ্ন অস্পষ্ট বলিয়াছেন (৩) নং চিহ্ন যে অস্পষ্ট তাহা পরিষ্কারই বুঝা যায়। মেজর টমাস স্বীকার করিয়াছেন যে, অনুমানের উপরই এই চিহ্নগুলি সম্পর্কে তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কর্ণেল ডেনহ্যাম হোয়াইটও অনুমানের উপরই বলিয়াছেন, তিনি ঐগুলি 'পাত্র চিহ্ন' বলিয়াছেন। তারপর (১) ও (২) নং চিহ্ন সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহার উপরই জোর দিতে থাকেন। মেজর টমাস'যে ঐগুলিকে উপদংশজনিত ক্ষত চিহ্ন বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাহার কারণ তিনি যে অবস্থায় এই ধারণা করিয়াছেন, সে সময় উপদংশজনিত ক্ষত শুকাইয়া গিয়াছিল। ইহা স্বীকৃত যে, এই দাগগুলি গোলাকার। সাধারণতঃ এগুলি অস্পষ্ট হয়, এবং তাহাতে কিছুটা রঞ্জক পদার্থ থাকে। এই রঞ্জক পদার্থ আবার দাগগুলির কিনারায় থাকিতে পারে; কিম্বা দাগের কেন্দ্রস্থলেও থাকিতে পারে। কর্ণেল চাটুর্য্যে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ: তিনি এই প্রসঙ্গে

যথেষ্ট অধ্যয়ন করিয়াছেন। অতএব আমি তাঁহার মতামত সমর্থন করি। বিশেষতঃ বাদীর সিফিলিস থাকার দরুণ ১নং, ৩নং এবং ৫নং চিহ্ন গুলি অর্ব্বুদ চিহ্ন বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। তবে ৩নং চিহ্নটিকে চর্ম্মের নিম্নস্থিত অর্ব্বুদ চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। অতএব আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, এই সমস্তই অর্ব্বুদ চিহ্ন ৪নং এবং ৬নং চিহ্ন সম্পর্কে সন্দেহ আছে, এবং আমি নিশ্চয়ই বলিব যে, এইগুলি অর্ব্বুদ চিহ্ন বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। এই বিষয়ের প্রমাণ ততটা সঠিক নহে; হইতেও পারে না। দ্বিতীয় কুমারের দেহের কোন কোন স্থানে ক্ষত ছিল, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা যায় না। সাক্ষ্যে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার কনুইতে এবং পায়ের উপর এই সমস্ত ক্ষত ছিল। ঠিক কোন কোন স্থানে এই সব ক্ষত ছিল. তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিবার জন্য বিবাদীপক্ষ কোন চেষ্টা করেন নাই। ডাঃ আশুতোষকে আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি কুমারের কনুই এবং হাটু সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন। অন্যান্য স্থানেও হইতে পারে, তাহা তিনি স্মরণ করিতে পারেন নাই। অতএব ইহা বলা চলে না যে, বাম পায়ের বাহিরের দিকের দাগ দ্বারা যেরূপ সনাক্তকরণ চলে, এই সকল চিহ্ন দ্বারাও তেমনি সনাক্তকরণের সহায়তা হয়। তবে এই সকল দাগ দ্বারা বাদী ও দ্বিতীয় কুমারের সাদৃশ্য প্রমাণের পথে কোনই বিঘ্ন উৎপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে বাদীর শরীরেও যে সিফিলিস আছে. তাহা দ্বারা সনাক্তকরণের সুবিধাই হয়। অধিকন্তু বাদীর কনুই এবং তাহার নীচে এবং বাদীর পায়ে অর্ব্বুদ চিহ্ন আছে, এতদ্দ্বারাও সনাক্তকরণের সহায়তাই হইতেছে। কারণ একজন সাক্ষী (বাদীপক্ষের ১৫নং সাক্ষী) অস্পষ্টভাবে দ্বিতীয় কুমারের এইসব স্থানে দাগ ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

চিহ্ন দ্বারা প্রমাণ

এখন আমার দুইটি বিষয় বলা উচিত। এই বিষয় দুইটির কথা আরও পূর্ব্বেই উল্লেখ করা উচিত ছিল। বাদীর পুরুষাঙ্গের উপর কোথাও উপদংশ-জনিত ক্ষতের চিহ্ন নাই। কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট বলেন,—পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে গ্রন্থিগুলির মধ্যে যদি আসল উপদংশ জনিত দুষ্ট ক্ষত উৎপন্ন হয়,তাহা হইলে চিরকাল তাহার দাগ থাকে। মেজর টমাস ইহার সহিত একমত, তবে তিনি বলেন যে, উপদংশজনিত যে ক্ষত তাহা একেবারেও বিলুপ্ত হইতে পারে এবং কোনও প্রকার ক্ষত চিহ্ন নাও থাকিতে পারে। বাদী এবং বৃদ্ধ খানসামা যে সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, উপরোক্ত ক্ষতটি অস্থায়ী

রকমের ছিল না, ইহাকে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া পটি বাঁধিয়া রাখিতে হইত ; সে যাহাই হউক, ইহা পুরুষাঙ্গের ঠিক অগ্রভাগে হইয়াছিল, অথবা পুরুষাঙ্গের অপর কোন অংশে হইয়াছিল, তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। সাধারণতঃ পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের কোমল ভাজকরা চর্ম্মের অভ্যন্তরেই এইরূপ ক্ষত উৎপন্ন হইয়া থাকে (ডেভিড লীজের পুস্তকের ৮ম ও ৯মপৃষ্ঠা দেখুন) সাক্ষীরা যে ইঙ্গিত করিয়াছেন (এই বিশেষ প্রশ্নটী উত্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্বেই তাহারা বলিয়াছিলেন) তাহাতে মনে হয় যে, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের চর্ম্মের উপরই ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত এই যে, পুরুষাঙ্গের যে স্থানেই উপদংশজনিত ক্ষত উৎপন্ন হউক না কেন, পরে তাহার কোন দাগ নাও থাকিতে পারে। অতএব যাহার সিফিলিস হইয়াছে কি না এই সম্পর্কে সন্দেহ আছে, সেরূপ কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিবার সময় উপদংশের ক্ষত চিহ্ন থাকা না থাকা দ্বারা বিশেষ কোন সাহায্য হয় না। (টমাস ও মাইলসের লিখিত "ম্যানুয়েল অব সার্জ্জারী" পুস্তকের ৮ম সংস্করণ, ১৫২ পৃষ্ঠা এবং রোসানি এণ্ড মিচেনার লিখিত "জেনারেল সার্জ্জারী" ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ ১৯২৯ পৃষ্ঠা দেখুন)।

অপর কথা হইতেছে বাদীপক্ষের সাক্ষী লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ম্যাকগিল থ্রাইষ্টের উক্তি, তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন, তিনি বাদীর শরীরের উপর কতকগুলি দাগ দেখিয়াছেন এবং সেগুলি সিফিলিসের ক্ষত হইতেই উৎপন্ন ; কিন্তু জেরার সময় তিনি বলেন, সেগুলি উপদংশ জনিত অর্ব্বুদ নহে। তিনি অপর একটি বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন। তিনি কোন চিহ্নের কথা বলিতেছেন, তাহা বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইতেছে না। ইতিপূর্ব্বে আমি যে তিনজন ডাক্তারের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা যেরূপ অভিনিবেশ সহকারে এই বিষয়টি লক্ষ্য করিয়াছেন, কর্ণেল ম্যাকগিল থ্রাইষ্ট তেমনভাবে দেখেন নাই।

সাক্ষীগণের উক্তির বিশ্বাসযোগ্যতার উপর যাহা নির্ভর করে না, এতক্ষণ আমি সেইরূপ চিহ্নগুলির কথাই আলোচনা করিতেছিলাম। খস্‌খসে পা সম্পর্কে উভয় পক্ষই প্রায় একমত। বীমার ডাক্তারের রিপোর্টে বর্ণিত যে চিহ্ন—বাম পায়ের গোড়ালীর বাহিরের দিকের যে অস্বাভাবিক দাগ, তাহা অতি সুদৃঢ় প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্ণভেদের চিহ্ন তো বিবাদী পক্ষের নিজেদের বর্ণিত বিষয়, তারপর অর্ব্বুদ চিহ্নও উভয় পক্ষের স্বীকৃত। সিফিলিস ও দুষ্ট ক্ষতের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি এক্ষণে সেই সকল চিহ্নের কথা আলোচনা করিব ; সে সকল চিহ্ন কেবল সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতার উপর নির্ভর করে।

(ঙ) বাগীর চিহ্ন

ইহা একটি অস্ত্রোপচারের চিহ্ন ; কিন্তু ঐ চিহ্ন কুঁচকীতে নহে, তলপেটে। বাদী সকল সময়ই উহাকে বাগী বলিয়া আসিয়াছেন। বাগী অর্থ 'বিউবো', 'সিফিলিস' অথবা অন্য কিছু। কিন্তু বাদী বলিয়াছেন যে, উপদংশ থাকার ফলে ঐ চিহ্ন হইয়াছে। এই সম্পর্কে তিনি এইরূপ বিবৃতি দিয়াছেন —"পুরুষাঙ্গের উপর একটি ঘা হইয়া প্রথমতঃ উপদংশ রোগ দেখা দেয়, এবং ইহার একমাস পর বাগী হয় এলাহী ডাক্তার তাহাতে অস্ত্রোপচার করে। এই ঘটনা তাহার পিতার মৃত্যুর ৪।৫ বৎসর পর, অনুমান ১৯০৬ সালে হয়। এই কাহিনী দুইজন পুরাতন ভৃত্য এবং পরিবারের একজন কম্পাউণ্ডার সমর্থন করিয়াছেন। এলাহী ডাক্তার এতদঞ্চলের একজন সুপরিচিত ডাক্তার ছিলেন তাহার ডিপ্লোমা রহিয়াছে। খুব আশ্চর্যের বিষয় যে, ১৯২১ সালে বাদীর প্রথম আগমনের পর রায় সাহেব তাহাকে খোঁজ করিতেছিলেন, তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং পরে তাহাকে পাইবার জন্য চেষ্টা করেন (একজিবিট ৩০৪) চিহ্নদ্বারা ঐ উক্তি সমর্থিত হইয়াছে, এবং যদি এলাহী ডাক্তার অথবা বাদী উহাকে বাগী বলিয়াই ধারণা করিয়া আসিয়া থাকেন, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। কারণ মেজর টমাস্ স্বীকার করিয়াছেন যে, কুঁচকির নিকটবর্ত্তী স্থান সম্পর্কে লোকের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে। দ্বিতীয় কুমারেরও ঐ অস্ত্রোপ্রচারের চিহ্ন ছিল, ইহাই আমি সাব্যস্ত করিতেছি। এলাহী একজন সার্জ্জন এবং কুমার তাহার ঐ উপদংশের কথা গোপন রাখিতেন, তিনি এই জন্য গৃহচিকিৎসক ডাকিতেন না।

(চ) ভাঙ্গা দাঁত

বাদীর বাঁ দিকের উপরের পাটির কসের দাঁত ভাঙ্গা।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় কুমারের টমটম হইতে পড়িয়া যাইয়া ঐ দাঁতটি ভাঙ্গিয়া যায়, তিনি এই ঘটনার তারিখ বলিতে পারেন নাই। তিনি তৃতীয় কুমারের বিবাহের সমসাময়িক কোন সময়ের কথা বলিয়াছেন। কাহারও অপর লোকের দাঁত ভাঙ্গিবার সময় মনে করিয়া রাখা সম্ভবপর বলিয়া আমি মনে করি না। এইরূপ একটী মূল্যবান চিহ্ন সম্পর্কে ঠিক তারিখ না বলিতে পারায়, বাদী অথবা তাঁহার সাক্ষীদের বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই থাকে না। যদি কেহ ভাঙ্গা দাঁতওয়ালা একজন প্রতারককে কুমার বলিয়া দাঁড় করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সেই সম্পর্কে তাহার স্পষ্ট ধারণা থাকিবে। কিন্তু এই মহিলাটি কখনও সময় বলিতে পারেন নাই। বাদী তাঁহার জবানবন্দীতে ঐ

দুর্ঘটনার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিলেন, ঐ সময় তাহার ভাইয়ের হাতী দেখিয়া তাঁহার ঘোড়া ভড়কাইয়া যায়, ফলে তিনি পড়িয়া যান, এবং তাঁহার দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়, তিনি সময়ের কথা বলেন নাই। এই বিষয়ে তাঁহাকে জেরা করা হয় নাই। এই তারিখ উল্লেখ না করা আমি খুব বিসদৃশ বলিয়া মনে করি না। কিন্তু বিবাদী পক্ষে বলা হইয়াছে যে, বাদীর চিহ্নসমূহ কুমারের উপর আরোপ করা হইয়াছে। সুতরাং এই সম্পর্কে জেরা হয় নাই, এইরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া আমি এই বিষয়ে আলোচনা করিব না। কিন্তু আমি পুরাতন কর্ম্মচারীদের উক্তি অবিশ্বাস করিবার মত কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। (বাদী পক্ষের ৪৮নং সাক্ষী প্রতাপ নারায়ণ, ৪৯নং প্রভাত দে, ৮নং গঙ্গাবাবু—পুরাতন নাজীর, ৮০৬নং সাক্ষী নগেন) ইহারা কেহই দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখেন নাই। অব্যবহিত পর তথায় গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কুমারের রক্ষিতা এলোকেশী ইহা ছোট কুমারের বিবাহের কাছাকাছি কোন সময়ে দেখিয়াছিল। কিন্তু সেও সময় বলিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে রাণী ইহা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং অপরাপর এমন কোন ঘটনার কথা শুনেন নাই। অনেকের পক্ষেই তাহা জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয়, ফণীবাবু ইহা শুনিয়া থাকিবেন। আমি সাব্যস্ত করিতেছি যে, বাদীর ন্যায় দ্বিতীয় কুমারের ভাঙ্গা দাঁত ছিল।

ঠিক এই চিহ্নটী দ্বারা নহে, অপর ভাবে প্রমাণিত চিহ্নের উপর ভিত্তি সাদৃশ্য সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইবে।

(ছ) মস্তকে স্ফোটক চিহ্ন।

(জ) পৃষ্ঠদেশে স্ফোটক চিহ্ন।

(ঝ) দক্ষিণ বাহুতে ব্যাঘ্র নখ চিহ্ন।

(ঞ) পুরুষাঙ্গের উপর তিল চিহ্ন।

এই চিহ্নগুলি সম্বন্ধে মাত্র বাদী ও জ্যোতির্ম্ময়ীই বলিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী বলিয়াছেন শৈশবে মেজকুমারের গায়ে বহু ফোড়া হয়, মাথায় সর্ব্বাপেক্ষা বড় ফোড়াটির দাগ রহিয়াছে। ৯ বৎসর বয়সে চূড়াকরণের সময় এবং পরে পিতার ও মাতার মৃত্যুর পর যখন মাথা মুড়ান হয়, তখন তিনি এই দাগ দেখেন। ইহা অসম্ভব নহে। অন্য বিষয়ে বাদীতে ও মধ্যম কুমারের মিল আছে; এই দাগ কুমারের অঙ্গে ছিল, তাহা মানিয়া লইতে হইবে। পিঠের ফোড়ার দাগ সম্বন্ধেও ঐ কথা।

বাদী বলেন যে, রাজার মৃত্যুর কিছু দিন পর চিড়িয়াখানায় প্রায় ৬ মাস

বয়স্ক এক ব্যাঘ্র শাবক মেজকুমারের হাতে 'থাবলা' দেয়। এই থাবার চিহ্ন জ্যোতির্ম্ময়ী লক্ষ্য করেন নাই দেখিয়া, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বিবাদী পক্ষ হইতে তাঁহাকে খুব জেরা করা হয়। এই দাগ সত্যসত্যই বাঘের থাবার কি না এ সম্বন্ধে মত দিবার জন্য ডাক্তারদের বলা হয়। কিন্তু ইহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। আমার সিদ্ধান্ত এই যে এই সম্পর্কে যে, প্রমাণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, অন্য বিষয় বাদীর সহিত কুমারের অমিল প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

পুরুষাঙ্গের উপরিস্থিত তিল চিহ্ন সম্বন্ধে কুমারের পুরাতন ভৃত্য ও কুমারের রক্ষিতা এলোকেশী সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে।

মেজ কুমারের বীমার মেডিকাল রিপোর্টের উল্লিখিত টীকার দাগের সহিত বাদীর টীকার দাগের মিল আছে। বিবাদী পক্ষ বলিতেছেন যে, মেডিকাল রিপোর্টে প্রতি হস্তে দুইটি করিয়া দাগের কথা লিখা আছে। বাদীর একটি হাতে দুইটি দাগ আছে, অন্য হাতে আছে মাত্র একটি, এই দাগগুলিও অত্যন্ত অস্পষ্ট। কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট বলিয়াছেন যে, যে স্থানে টীকা দিতে হয় বাদীর অঙ্গে দাগগুলি সেই স্থানে নাই। মেজর টমাস কিন্তু বলেন যে, দাগগুলি টীকারই। ৩১ বৎসরের একটি দাগ মলিন হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

পারিবারিক বিশিষ্টতার কথা

এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে পারিবারিক কতকগুলি বিশিষ্ট চিহ্নের কথা বলিব। ইহাই সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, চুলের বর্ণ, চুলের গঠন, ওষ্ঠ, নাসিকা, ও কর্ণের গঠন পিতৃপুরুষ হইতে সন্তান প্রাপ্ত হয়। ভাওয়াল রাজার তিন সন্তান, মেজকুমার, ছোটকুমার ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, তাঁহার প্রথম দুই সন্তান বড়কুমার, ইন্দুময়ীদেবী হইতে অন্যরূপ দেখিতে। ইন্দুময়ী ও বড়কুমারের গায়ের রং ময়লা ছিল, তাঁহাদের গায়ে লোম ছিল না। মেজকুমার, ছোটকুমার ও জ্যোতির্ম্ময়ীর গায়ের রং ও চুলের রং রাজা কালীনারায়ণের মত। মেজ-কুমারের মত রাজা কালীনারায়ণের বাম হাতের দুইটি অঙ্গুলী প্রায় সমান শঙ্কযুক্ত। পদও পারিবারিক বৈশিষ্ট্য, গণ্ড হইতে ছিন্নলতি বিশেষ আকৃতির কর্ণ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণেরও ছিল।

চলিবার ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর

উভয় ব্যক্তির চলিবার ভঙ্গীর মিল সম্বন্ধে প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে না। বৃদ্ধা মোক্ষদা দেবী (১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সাক্ষ্য গৃহীত) জন্ম হইতে কুমারদের

চিনিতেন। জয়দেবপুরে বাদীর প্রথম আবির্ভাবের সময় তিনি পশ্চাৎ হইতে সন্ন্যাসীকে মাধববাড়ীর দিকে যাইতে দেখিয়া বলেন যে, তাহার চলন-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা মেজকুমারের। এই ভঙ্গী জ্যোতির্ম্ময়ীও লক্ষ্য করেন। অন্যান্য সাক্ষীর মধ্যে ঢাকার অন্যতম সিনিয়র উকিল হিরণ্ময় বাবুও এই ভঙ্গী দেখিয়া তাহাকে মেজকুমার বলিয়া সন্দেহ করেন। আমার সিদ্ধান্ত এই যে, বাদীর চলিবার ভঙ্গীতে এমন কিছু নাই যাহাদ্বারা মনে হয় যে, তিনি মেজকুমার নহেন। আত্ম-পরিচয় দানের পূর্ব্বেও তাঁহার এই ভঙ্গী দেখিয়া লোকে তাহাকে মেজকুমার বলিয়া সন্দেহ করেন।

বহু উপযুক্ত সাক্ষী বলিয়াছেন যে, বাদী ও মেজকুমারের কণ্ঠস্বর একই-প্রকারের। ফণীবাবু এবং ম্যাস্থক্ ব্যতীত আর কেহ ইহা অস্বীকার করে নাই। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্য আদালতে তিনি ১৪৪ ধারার মামলায় জবানবন্দী প্রদান করেন। এই সময় এষ্টেটের পক্ষ হইতে কেহই বলে নাই যে, বাদীর কণ্ঠস্বর মেজকুমারের মত নহে। আমার সিদ্ধান্ত এই যে, বাদী ও কুমারের কণ্ঠস্বর একই প্রকারের। এই সকল মিলের সহিত যোগ করিতে হইবে—

(১) ৬নং জুতা কুমারের পায়েও লাগিত, বাদীর পায়েও লাগে।

(২) কুমারের পুরাতন অপরিবর্ত্তিত পোষাক বাদীর অঙ্গেও ফিট করে।

পূর্ব্বানুবৃত্তি

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—

কুমারদের ভগিনী, বড়রাণী, মেজরাণীর নিজের মাতুলানী সরোজিনী, ও তাঁহার আপন মাসতুতো ভগিনী বলিয়াছেন যে, বাদীই মেজকুমার। ফণী বাবু ও তাঁহার ভগিনী এবং এষ্টেটের কর্ম্মচারী শৈবলিনীর জামাতা ব্যতীত, অন্য সকল আত্মীয় ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ভগিনীর বিশ্বাস আন্তরিক না হইলে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখের ব্যাপার ঘটিত না। রায়সাহেব তাঁহার আন্তরিকতায় বিশ্বাস করিতেন না। এই বিষয়ে স্বার্থহীন প্রবীণ, পদস্থ, বিত্তশালী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শপথ করিয়া বলিয়াছেন বাদীই মেজকুমার। তাঁহাদের প্রমাণের সহিত ভগিনীর আন্তরিকতা যোগ করিলে প্রমাণগুলি সুদৃঢ় হইয়া যায়। বিবাদীপক্ষে এমন একজন স্বাধীন সাক্ষীও নাই, যিনি কুমারকে চিনিতেন এবং যাঁহার কুমারের কথা মনে আছে। বিবাদীপক্ষ বড় জোর এই কথা পর্য্যন্ত বলিয়াছে—প্রথম দৃষ্টিতে বাদীকে মেজকুমার বলিয়াই মনে হয়। তবে নাকটা একটু মোটা। ফটোগ্রাফগুলি হইতে এক নাক ব্যতীত কুমার ও বাদীর চেহারায় অন্য কোন অমিল দেখিতে পাওয়া যায় না।

নাকের যে প্রভেদ দেখা যায়, তাহা বুঝাইয়া বলা হইয়াছে ও প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে ফটো দেখিয়া কেহ যেমন বলিতে পারে না যে,বাদী ও মেজকুমার অভিন্ন, তেমনই আদালতে দাখিল করা কুমারের ফটোগুলি প্রথমে দেখিয়াই কেহ বলিতে পারে না, ঐগুলি এক ব্যক্তি বা পৃথক ব্যক্তির ছবি। বিশেষ ভাবে রিসার্চ করা—কুমারের ইনসেট ছবির অপেক্ষা কুমারের ফ্রককোট ফটোর সহিত বাদীর বেশী মিল দেখা যায়।

এই গুলির সহিত নিম্নলিখিত বিশেষ চিহ্নের মিল আছে—

	কুমার	বাদী
বর্ণ	দুধে আলতা	দুধে আলতা
চুল	ঈষৎ বাদামী	ঈষৎ বাদামী
চুলের ধরণ	ঢেউ তোলা	ঢেউ তোলা
	গোঁফের বর্ণ চুল অপেক্ষা হাল্‌কা	চুল অপেক্ষা হাল্‌কা
	ঠোঁট নীচের ঠোঁটের দক্ষিণ দিকে মোচড়ান	নীচের ঠোঁটের দক্ষিণ দিকে মোচড়ান
হাত	ছোট	ছোট
পা	৬ নম্বর	৬ নম্বর
কণ্ঠমণি	সুস্পষ্ট	সুস্পষ্ট
বাম হাতের তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী ডান হাত অপেক্ষা কম অসমান		ডান হাত অপেক্ষা কম অসমান
দক্ষিণ চক্ষুর নীচের পাতায় মাংস বিন্দু	বর্ত্তমান	বর্ত্তমান
শঙ্কযুক্ত পদ	বর্ত্তমান	বর্ত্তমান
বাম পদের পুরোভাগে গোঁড়ালী-গাঁইটের উপর ক্ষত চিহ্ন	বর্ত্তমান	বর্ত্তমান
বিদ্ধ কর্ণ	বর্ত্তমান	বর্ত্তমান
ভগ্ন দন্ত	বর্ত্তমান	বর্ত্তমান
উপদংশ	বর্ত্তমান	বর্ত্তমান
উপদংশজ ক্ষতাদি	বর্ত্তমান ক্ষতের চিহ্ন	বর্ত্তমান

ইহার সহিত যোগ করিতে হইবে—জুতা ফিট করে, জামা ফিট করে, মেদ বৃদ্ধি ব্যতীত সাধারণ অবয়ব একই। (মেদ বৃদ্ধির লক্ষণ A (15) ফটোতে গলার কাছে দেখা যায়। উভয়েরই বয়স এক। ২১ বৎসর বয়সে কুমারের

উচ্চতার অনুপাতে উচ্চতা বর্ত্তমানে যাহা হইতে পারিত, বাদীর তাহাই আছে। তাহার পর ধরিতে হইবে মাথায় ও পিঠে ফোড়ার চিহ্ন, ব্যাঘ্রের থাবার চিহ্ন, পুরুষাঙ্গে তিল এবং চলিবার ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরের মিল। এই অনুচ্ছেদের কথা ছাড়িয়া দিলেও উপরের তালিকার মিলগুলি সহসা দ্বিতীয় ব্যক্তিতে পাওয়া যাইতে পারে না।

অতএব মেজকুমার যদি দার্জ্জিলিংএ সত্য সত্যই মারা গিয়াছেন, মেজকুমার অপেক্ষা বাদীর মন পৃথক ও হাতের লেখা পৃথক, এবং বাদী বাঙ্গালী নহেন ইহা প্রমাণিত না হইলে, এ বিষয়ে আর কোন প্রকার সন্দেহ নাই যে, বাদীই মেজকুমার স্বয়ং।

বাদীর মনের দৃঢ়তা

জনাকীর্ণ আদালতে বাদী সাক্ষ্য প্রদান করিতে আগমন করেন। আমার অভিজ্ঞতায় এমন ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। কুমার বহুদিন মরিয়া গিয়াছেন বলিয়া সকলেই অবগত। তাঁহার রাণী সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন, ও এই ব্যক্তিকে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি প্রবঞ্চক বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। তাঁহার কাহিনী পাগলের কাহিনী বলিয়া মনে হইল, তাঁহার দাবী মনে হইল অদ্ভুত। ক্ষীণ হিন্দী টানে তিনি যখন কথা বলিলেন, তখন একটা হিন্দুস্থানীভাবে তাঁহাকে দেখা যায়। বিবাদী পক্ষ বলিলেন, বহু বৎসর যাবৎ প্রবঞ্চনার ষড়যন্ত্র প্রমাণিত করিতে তাঁহার আবির্ভাব। স্বীকার করিতেছি আমি বাদীকে তখন অবিশ্বাস করি। তাঁহার প্রত্যেকটি কথা আমি শুনি, তাঁহার প্রতি হাবভাব আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়া যাইতে থাকি।

জবানবন্দীতে বাদী তাহার কাহিনী বলিয়া গেলেন। আপন সংক্ষিপ্ত জীবনী, পরিবারের কথা, উপদংশ চিকিৎসার জন্য কলিকাতা আগমন, দার্জ্জিলিং যাত্রা, দার্জ্জিলিং গিয়া কি হইল, কি করিয়া তথায় তিনি চৈতন্য হারাইলেন, কিরূপে চৈতন্য ফিরিলে তিনি আপনাকে সন্ন্যাসীগণ পরিবৃত দেখিলেন, কি ভাবে তাঁহাদের সহিত ঘুরিয়া নেপাল ব্রহ্মছত্রে সন্ন্যাসীদের সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার পর, নানাস্থান হইয়া তিনি ঢাকায় আসিলেন, সকল কথাই তিনি বলিলেন। তাহার পর বলিলেন কাশিমপুর ও জয়দেবপুর গমনের কথা, আত্মপরিচয় দানের কথা এবং আরও অনেক কাহিনী।

নয় দিন ধরিয়া মিঃ এ, এন, চৌধুরী তাঁহাকে জেরা করিলেন।

মিঃ চৌধুরী যে ভাবে তাঁহারা কুমারকে প্রকাশ করিয়া, কুমারের আচার আচরণাদি, তাঁহার জ্ঞানাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তাহাতে কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই, এক মূহুর্ত্তের জন্যও কোন সুস্থচিত্ত ব্যক্তি কুমারের ভূমিকায় টিকিতে পারিবে। বিবাদী পক্ষ বলেন, কুমার ছিলেন 'সুশিক্ষিত ও সুমার্জ্জিত বনিয়াদ ব্যক্তি'। অথচ বাদী একেবারে অশিক্ষিত, নাম সহি করিতে জানিলেও, তিনি ইংরাজী কোন কথাই জানেন না। কুমার সব রকম খেলা জানিতেন, এই লোকটি কিছুই জানেন না। কুমার সাহেবী পোষাক পরিতেন, পোষাকের নাম জানিতেন, য়ুরোপীয়দের সঙ্গে সান্ধ্য পোষাকে খানা খাইতেন, সাহেবী খানা ও কাঁটা চামচাদির নাম জানিতেন, এই লোকটি তাহার কিছুই জানেন না। কুমার গানবাজনা জানিতেন, ক্যামেরা লইয়া ছবি তুলিতে জানিতেন, এই লোকটি না জানেন গান বাজনা, না জানেন ছবি তুলিতে। কুমার য়ুরোপীয়দের সহিত উঠা বসা করিতেন, অথচ এই ব্যক্তি বলেন যে, তিনি কালেক্টার কমিশনার ও গবর্ণর ছাড়া কখনও কোন সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন নাই, তাহাও করিয়াছেন, তাঁহার ইংরেজী জানা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে। বাদী বলিয়াছেন যে, তিনি দরবারী লোক নহেন, তিনি জানিতেন মাত্র শিকার করিতে ও ঘোড়ায় চড়িতে। অথচ ইনি বন্দুক, গুলী. বারুদ সংক্রান্ত ইংরেজী নাম জানেন না, বা অশ্ববর্ণের ইংরেজী নাম জানেন না।

মিঃ চৌধুরীর বর্ণনা মত কুমার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে ইহাও আমার মনে হইয়াছে যে, বাদী যদি প্রবঞ্চকই হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কৌশলী, ফন্দীবাজী, প্রশান্ত ও সংযত ভাব কোথায়? সাধারণ লোকের বুদ্ধি অপেক্ষা তাঁহার বুদ্ধি যথেষ্ট কম বলিয়া মনে হইয়াছে। ইহা হইতেই হয়ত মনে হইয়াছে যে, লোকটা পুত্তলিমাত্র।

উভয়ই সমান নিরক্ষর

বাদীকে জেরা করার একটা বিশিষ্টতা এই যে, কুমারের স্মৃতি সম্বন্ধে বড় বেশী কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে মাত্র তাঁহার উপদংশের কথা, গৃহ শিক্ষকদের কেরামতির কথা, দার্জ্জিলিং ঘটনার কথা, বড় দালানের কথা ও ম্যানেজারের বাসার কথা। বাদীর পূর্ব্বে যাঁহারা সাক্ষ্য দান করিতে আসেন, মিঃ চৌধুরী তাহাদিগকে দিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, বাদীপক্ষের মতে কুমার মাত্র নাম সহি করিতে জানিতেন। কিন্তু ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, দার্জ্জিলিং যাইবার সময় পর্য্যন্ত কুমার বাদীর মতই নিরক্ষর ছিলেন।

মিঃ চৌধুরীর জেরার ধরণ এইরূপ—এইগুলি কাহাকে বলে জানেন?—এথেলেটিক্স স্পোর্টস, ক্রিকেট ফ্ল্যানেল, বেলব্রিক ক্রিকেট ফ্ল্যানেল, ষ্টাম্পস, উইকেটস, এল বি ডবলু, আম্পায়ার? ডুস, ভাণ্টেজ, ১৫-৩০-৪০? কিউ, মিস-ইন বুক? গোল কীপার, হাফব্যাক, ফুল ব্যাক, সেণ্টার, ফরওয়ার্ড? পলো-টেনিস, ফাউল ইন পলো, ক্রশ, নিয়ার সাইড ব্যাক হ্যাণ্ড, অফ সাইড ব্যাক হ্যাণ্ড, চাকার? বস্ত্রাদি, খানা, কামেরা, গাড়ী প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুরূপ বিশেষ ইংরেজী নাম প্রভৃতি সম্বন্ধে জেরা করা হয়। কতকগুলি ব্যাপার আছে যাহাতে নাম না জানিলে তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকে না। যেমন, টেনিস, বিলিয়ার্ড, ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি। কিন্তু মফঃস্বলে অনেকে 'মাজল এণ্ড' ও 'ব্রীচ এণ্ড'র পার্থক্য না জানিয়াও বন্দুক ব্যবহার করিতে পারে। আবার বন্দুকাদি সম্বন্ধে দেশীয় কথাও প্রচলিত আছে, যেমন ফোর সাইডের নাম মাছি, ব্যারেলের নাম কুন্দা, কার্টিজের নাম কার্ত্তুজ। বাদীর নিকট অশ্ব বিষয়ে যে সকল নাম জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, উহার নাম না জানিলেও লোকে ভাল অশ্ব-চালন করিতে পারে।

মিঃ চৌধুরী জেরায় অনেক অতিরিক্ত শব্দ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কুমার কোন্ কোন্ ইংরাজী কথা জানিতেন এবং বাদী কি জানেন না এতৎ-সম্বন্ধে মিঃ চৌধুরীর জেরার বিস্তৃত আলোচনার কোন প্রয়োজন করে না। বাদী নিরক্ষর ইহা জানিলেই ঐ সকল প্রশ্ন আর উঠিতে পারে না।

কিন্তু বিবাদীগণের প্রদর্শিত প্রমাণ হইতে পাওয়া যায় যে, কুমার একবারে নিরক্ষর ছিলেন, তিনি মাত্র ইংরেজী ও বাঙ্গালায় কোনমতে আপনার নাম স্বাক্ষর করিতে পারিতেন। বিবাদিগণ যখন আপনাদের মনোমত কুমারকে আদালতে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তখন ইহাও প্রমাণ করা প্রয়োজন যে, উক্ত কুমার ইংরেজী জানিতেন, ইংরেজী বেশভূষা পরিতেন, ইংরেজী ধরণের খানা খাইতেন, টেনিস হইতে পলো পর্য্যন্ত খেলা জানিতেন।

আরও প্রমাণ করা দরকার যে, এতৎ সম্পর্কীয় সকল ইংরেজী কথাও তিনি অবগত ছিলেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, কুমার ক্রিকেট বা ফুটবল খেলা জানিতেন না। সুতরাং বাকী থাকিল কুমারের টেনিস, পলো, বিলিয়ার্ডস খেলা জানা, বন্দুকাদি সম্বন্ধে ইংরেজী কথাগুলি জানা ও ইংরেজীর সাধারণ জ্ঞান—এই গুলি প্রমাণ সাপেক্ষ।

মেজকুমারের এক প্রকার দ্বিতীয় মূর্ত্তিরূপে ফণীবাবুর সাক্ষ্য গৃহীত হয়। যেন ইহাই জানাইবার উদ্দেশ্যে যে, মেজকুমার যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে এখন তিনি ফণীবাবুর মতই হইতেন। ফণীবাবু হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণী

রণেন্দ্র, রমেন্দ্র ও রবীন্দ্র—তিন সহোদর

Aparajita Press

পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ঢাকায় আসেন। তিনি এই সময় কথাবার্ত্তা চালাইবার মতন ইংরেজী জ্ঞান মেজকুমারের হইয়াছে দেখিতে পান। হয়ত ছোটকুমার ইংরেজীতে অপেক্ষাকৃত কম কথা বলিতে পারিতেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বড় কুমারের বিবাহের বৎসরে (১৯০০ খৃঃ) কুমারের লেখাপড়া সাঙ্গ হয়।

বাদীকে বিবাদী পক্ষ হইতে যে সকল ইংরেজী কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহা যে মেজকুমার সত্যসত্যই জানিতেন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ফণীবাবুকে প্রশ্ন করা হয়, ফণীবাবু বলেন যে, মেজকুমার ক্রিকেট, টেনিস, প্রভৃতি সকল খেলাই জানিতেন, এবং সকল খেলাতেই তাঁহার সহচর ছিলেন। বাদীকে যে সকল ইংরেজী নাম জিজ্ঞাসা করা হয় তাহার সমস্তই তিনি অর্থ বলিয়া ফেলেন; কিন্তু পরে দেখা যায় যে, তাঁহাকে দিয়া মুখস্থ করাইবার জন্য ঐ সকল ইংরেজী শব্দের একটি ওয়ার্ড বুকের মতন বই ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ডায়রীতে তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। (একজিবিট নং ৪৬৮)। ইহা স্বীকৃত হয় যে, 'ওয়ার্ডস-বুকের' লেখা কতক ফণীবাবুর নিজের হাতের এবং কতক বিবাদী পক্ষের এক উকিলের হাতের। এই খাতা সম্বন্ধে যে কৈফিয়ৎ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। সে যাহা হউক, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের পরও ২৬ বৎসর ফণীবাবু জীবিত আছেন। ইহার মধ্যে তিনি সভা সমিতিতে গিয়াছেন। তিনি এক ফ্রীম্যান্‌স লজের সদস্য; খানাপিনাও যখন দেখিয়াছেন তখন যে সম্বন্ধে 'সব' কথা জানাইবার তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। যখন তিনি নিজে মদ খান, ও মদ খাইতেন তখন 'ওয়াইন গ্লাস' শব্দটিও তাঁহার জানিবারই কথা। নিজে তিনি জমিদার, শিকার করিতেন। তিনি বলিতে চাহেন যে, বাড়ীতে তিনি এম-এ ক্লাশের পাঠ্য পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। যেখানে পড়ান হয় সেখানে ফণীবাবু 'ফ্রক কোট' বলিতে গিয়া বলিয়াছেন "ফ্রগ কোর্ট"। বাদী বলিয়াছেন 'ফ্লেট কোট'। অর্থাৎ বাদীতে ও তাঁহাতে বিদ্যার দৌড় প্রায় সমানই বটে!

মেজকুমার ত রাজপুত্র

বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলী প্রায়ই আমাকে স্মরণ রাখিতে বলিয়াছেন যে, মেজকুমার ছিলেন রাজপুত্র। শিক্ষিতই হউন বা অশিক্ষিতই হউন, তাঁহার মধ্যে একটা সম্ভাবনা অন্ততঃ ছিল। ইহা আমি খুবই মনে রাখিব। কিন্তু ইংরেজী ভাষার জ্ঞান ও ধন-সম্পত্তির জ্ঞান এক নহে। খেলার জ্ঞান না থাকিলে বা নিজে খেলা না জানিলে 'এল-বি-ডবলু' জ্ঞান হইতে পারে না।

উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে বা বড় বড় রাজপুরুষদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় ইংরেজী পোষাক ব্যবহার করা হইলেও কুমারদের আচার ব্যবহার খাঁটি বাঙ্গালীর আচার ব্যবহারের মত ছিল। 'রাজপুত্র' এই কথা দিয়া সাক্ষীদের ভুলান গেলেও আদালতকে উহা দ্বারা বিপথগামী করা চলিবে না।

কুমারের অতীত স্মৃতি সম্বন্ধে কোন কথা জেরায় বাদীকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। অজুহাত—স্মৃতির কাহিনী বাদীকে শিখান পড়ান হইয়াছে। কোন সাক্ষীকে শিখান পড়ান হইয়াছে বলিয়াই তাহাকে জেরা করা চলিবে না, ইহা যুক্তিযুক্ত কথা নহে, বরং তাহাকে অধিক জেরা করাই সঙ্গত। বাদী জয়দেবপুরে আসিয়া ৩৭ দিন থাকিলেন। প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করা আরম্ভ হইয়াছে। বাদী কখনও রাজবাড়ীর ভিতরে বা ঢাকা ভবনে যান নাই। তাহার পক্ষ হইতে কালেক্টারের নিকট তদন্তের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। তদন্ত করা হইবে না, এই কথা কেহ বলেন নাই। বাদী ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আবেদন করিলে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বলা হইল 'আদালত খোলা আছে, তথায় গিয়া প্রমাণ কর।' এতদিন মিঃ লিণ্ডসে হইতে মিঃ কে, সি, দে পর্য্যন্ত বাজে আশা দিয়া আসিতেছিলেন। যেন উদ্দেশ্যই হইল বাদীর সম্মুখীন হওয়া চলিবে না, তাহাকে অভিযুক্তও করা চলিবে না। এই নীতি আদালত পর্য্যন্ত অনুসৃত হইয়াছে। মেজকুমারের জীবনের সকল কথাই কি বাদীকে কেহ শিখাইতে পারে, ইহা কি সম্ভবপর হয়? শিখান পড়ানর ফলে কি বাদী আদালতে মানুষকে বা তাহাদের ফটো সনাক্ত করিতে পারে? সহস্র ব্যক্তির সমবেত স্মৃতির সহিত ব্যবহারজীবিদের কুশলতা ও রাণীর পূর্ব্বকথা সমস্তই কি শিখান পড়ানর নিকট হার মানিয়া গেল? মেজকুমারের সমগ্র স্মৃতি-ভাণ্ডার কি তথাকথিত পাঞ্জাবী কৃষকের ভিতর বেমালুম প্রবেশ করান সম্ভব হইল? মিঃ চৌধুরী কি বাদীর হাতে বন্দুক দিয়া তাহা আদালতে ব্যবহার করিয়া দেখাইতে বলেন নাই? স্মৃতির সম্পর্কে মাত্র জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে উপদংশের কথা, বড় দালানের কথা ও দার্জ্জিলিংএর কথা এবং জিজ্ঞাসা করিয়া ফাঁদে পড়িতে যেন তিনি ভীত হইয়াছেন! সত্যের ভিতরে যদি তিনি পড়িয়া যান! মক্কেলদের উপদেশ অনুসারেই অবশ্য মিঃ চৌধুরীকে এই পথ লইতে হইয়াছে, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রাজকুমারগণ প্রকৃত বাঙ্গালীই ছিলেন

মেজকুমার কি সাহেবী ধরণের লোক ছিলেন? সাহেবী পোষাক পরিয়া হোটেল হইতে অর্ডারি সাহেবী খানা সাহেবদের সহিত বসিয়া কি তিনি

খাইতেন ? সান্ধ্য-পোষাকে কি তিনি ডিনারে বসিতেন ? তিনি কি ক্রিকেট হইতে পলো পর্য্যন্ত সকল খেলা জানিতেন ? ইংরেজী ধরণের আসবাবপত্র ও তাহাদের নাম জানিতেন ? তিনি কি গান-বাজনা জানিতেন ? তিনি কি অশ্বচালনে পটু ছিলেন, ঘোড়দৌড়ে বাজী খেলিতে যাইতেন, দ্রুত গাড়ী চালাইতে পারিতেন, শিকারীরূপে তিনি কি বাঘ মারিতে গিয়াছিলেন ?

মেজকুমার অশ্বচালনা করিতে পারিতেন, তিনি ভাল শিকারী ছিলেন, তিনি ঢাকায় টাট্টু ঘোড়দৌড়ে যোগদান করেন এবং মণিপুরী জকিদের সহিত যে মাঝে মাঝে তিনি পলো খেলিতেন, ইহা বাদী নিজেও বলিয়াছেন।

এই মামলার বিচারকালে আমি বেশ বুঝিয়াছি, বিবাদীদের কুমারকে জাল প্রতিপন্ন করিতে জেরায় বিবাদী সাক্ষীদের বড়ই কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। বাদীপক্ষের বিশিষ্ট ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ সাক্ষ্যে যখন মেজকুমারের শিক্ষা ও আচার ব্যবহারের বর্ণনা দিতে আরম্ভ করেন তখন বিবাদীদের সুর নরম হইয়া আসে। সাগর বাবুর সাক্ষ্য দানের সময় পর্য্যন্ত বিবাদীগণের ইহা মনে পড়ে নাই যে, মেজকুমার যদি সাহেবী খানা খাইতেই অভ্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার খানা খাইতে বসিবার ঘরেরও প্রয়োজন। ইংরেজ অতিথিদের মধ্যে রাজবাড়ীতে মিঃ মেয়ার ছিলেন, দুই বৎসর (১৯০২-১৯০৪) মিঃ র‍্যাঙ্কিন ছিলেন। আর—কালেক্টার ও কমিশনরগণ যাইতেন। মিঃ মেয়ার এই কথা বলেন নাই যে, মেজকুমার তাঁহার সহিত বা অন্য কোথাও সাহেবী খানা খাইতেন। মিঃ র‍্যাঙ্কিনকেও কেহ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হন নাই যে, তিনি কোন দিন কুমারদের সহিত আহারে বসিয়াছেন কি না ! বলা হইয়াছে, লর্ড কিচেনার যখন জয়দেবপুর যান, তখন কুমাররা তাঁহার সহিত খানা খান। তিনি রৌপ্যমণ্ডিত গাড়ীতে বড় দালানের গাড়ী-বারান্দায় পৌঁছিলেন। মধ্যম ও তৃতীয় কুমার সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন ; তিনি গাড়ী হইতে নামিতেই তাঁহারা তাঁহাকে অভিবাদন (সেলাম) করিলেন। লর্ড কিচনার এবং তাঁহার সঙ্গী সামরিক কর্ম্মচারীগণ সে রাত্রিতে বড় দালানে আহার করিলেন, এবং পরদিন প্রাতঃকালে কোড্ডায় নদী পার হইয়া তাহারা জঙ্গল অভিমুখে যাত্রা করিলেন,—একথা আমার আগেকার বিবরণেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে লর্ড কিচনারের আদ্দালির মারফতে হিন্দিতে কি কথা হইল, কারণ মধ্যম কুমার সেই দলের সহিত গিয়াছিলেন—অপর দুই কুমার যান নাই—এবং হিন্দিতে যে কথা হইল তাহা অতি সংক্ষিপ্ত।

বহু সংখ্যক সাক্ষীর কথা হইতে সংগৃহীত এই বিবরণ আমি সত্য বলিয়া

বিশ্বাস করি। (বাঃ সাঃ ৩৯ দিলবর ; বাঃ সাঃ ৬৩৬ আবদুল জমাদার ; বাঃ সাঃ ৯৫২ মনোমোহন ; বাঃ সাঃ ৯০৭ রসিক রায় , বাঃ সাঃ ৮৯২, ৯৭৩, ৯৩৮, ৮, ৯, এবং বাঃ সাঃ ৫৭ আশুবাবু, ষ্টেশন মাষ্টার)। যে সকল কর্ম্মচারী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, যে সকল মাহুত সঙ্গে গিয়াছিল এবং যে সকল রেলওয়ে কর্ম্মচারী তাঁহার স্পেশাল ট্রেণের সময় উপস্থিত ছিল, তাঁহাদের নাম ইহাদের অন্তর্ভূক্ত।

আহার প্রমাণ করার জন্য প্রতিবাদী বাবুর্চ্চি ডিকস্টা (প্রঃ সাঃ ৪৩), এবং মাহুত আমানুল্লা (প্রঃ সাঃ ৬১) এবং রায় সাহেবকে সাক্ষী উপস্থিত করেন। ডিক্স্টা বলিয়াছে যে তিন তিন কুমারই জঙ্গলে (শিকারে ?) গিয়াছিলেন, বড় কুমার লর্ড কিচনার সাহেবের সঙ্গে একই হাতীতে ছিলেন ; এবং ইহারা কাশিমপুরে বাবুদের বাড়ীতে তাঁবুতে খানার সময় যোগ দিয়াছিলেন ! আমানুল্লা বলিয়াছে—কাশিমপুরের বাবুদের বাড়ী দুই মাইল দূরে কোড্ডার তীরে তাম্বুগুলি অবস্থিত ছিল ; এবং বড় কুমার ও তৃতীয় কুমার আদৌ শিকারে যান নাই নাই। লর্ড কিচনার, কর্ণেল বার্ডউড্ ও কাপ্টেন ফিট্জেরাল্ডের সহিত তিন কুমারই খানায় বসিয়াছিলেন। আমি এই সাক্ষ্যের একটি কথাও বিশ্বাস করি না। কুমারগণ যে লর্ড কিচনারের সহিত বসিয়াছিলেন—এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট, ম্যানেজারও বসিয়াছিলেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না।

প্রতিবাদীপক্ষ ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন,—বড় দালানে খানার কথা কেহই সমর্থন করিবে না, সুতরাং তাঁহারা এ ভোজনকক্ষের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং প্রত্যেক কুমারই পৃথক (এক এক) বাবুর্চ্চি থাকার মিথ্যা প্রাসাদের ভিত্তি স্বরূপ হইল। ৯৭৭ সংখ্যক সাক্ষী সাগর বাবুকে বলা হইল যে মধ্যম কুমারের বৈঠকখানা ঘরের পশ্চিমদিকের একটি প্রকোষ্ঠের পরবর্ত্তী প্রকোষ্ঠে তাহার ভোজনকক্ষ। ম্যাপে উহাই ১২১নং কক্ষ। বৈঠকখানা ১১৫ নম্বর কক্ষ। এই ১২১ নম্বর কক্ষ সম্বন্ধে মিঃ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন :—

প্রশ্ন—ইহাই মধ্যমকুমারে ভোজন কক্ষ ?

প্রশ্ন—সেখানে টেবিল, চেয়ার ও সাইডবোর্ড (খাবারের বাসন-কোসন রাখিবার আলমারী) ? সাক্ষী উভয় প্রশ্নের উত্তরেই 'না' বলিলেন।

এখন, বাদীর সাক্ষীগণের—তাঁহার যে সব খানসামা তাঁহার আহারের ব্যবস্থা করে, তাহারা এবং তাঁহার ভাগিনেয়গণ ইহাদের অন্তর্গত—প্রদত্ত বিবরণ ইহাই যে মধ্যম কুমার তাঁহার বৈঠকখানার উত্তর দিকে অবস্থিত শয়ন

ঘরের বারাণ্ডায় আহার করিতেন। তিনি মেঝেয় বসিয়া দেশীয় (ভারতীয়) প্রথায় আহার করিতেন। **তাঁহার আহার্য্য ভাত ও সাধারণ ব্যঞ্জন। ব্রাহ্মণ পাচক প্রস্তুত করিত এবং অন্দর হইতে আসিত।** বাবুর্চ্চি ও খানসামারাও আহার্য্য প্রস্তুত করিত, এবং সেগুলি তাহার মোসাহেবদের সহিত সাধারণ ভাবে আহার করিতেন। বাবুর্চ্চিরা যাহা প্রস্তুত করিত তাহা কাটলেট কিম্বা চপ্, যে সব খাদ্য এখন এবং তখনও দ্রব্যেও নামে বাঙ্গালা হইয়াছে।

এখন, বসিয়া হাত দিয়া খাওয়ার বিবরণ রহিয়া যায়, কিন্তু প্রতিবাদীর সাক্ষিগণ মধ্যে মধ্যে খানা খাইবার প্রয়োজনে 'ভোজন-কক্ষ' যোগ করিয়াছেন। মধ্যম রাণীর সাক্ষ্যেই ইহার সূত্রপাত, কুমারের আহারের সহিত যাঁহার সংশ্রব ছিল না, ইহা আমার উপরের বর্ণনায় বলিয়াছি; এবং তাহার পর বহু সাক্ষী আসিয়া এই ভোজন কক্ষের কথা বলিয়াছে, যাহাতে বাদীপক্ষের জেরায় টিকিতে পারে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, মধ্যমকুমার মধ্যে মধ্যে টেবিলে বসিয়া হাত দিয়া কিম্বা ছুরি কাঁটা দিয়া আহার করিতেন।
বিবাদীপক্ষের সাক্ষী ছোট কুমারের খানসামা রুক্মিণী বলিয়াছে যে, মেজকুমার বারান্দার মেঝের উপর বসিয়াই খাইতেন। বিবাদীপক্ষ 'ডাইনিংরুম' প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা মিথ্যা। কুমারেরা খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন, সাহেবী ভাব তাঁহাদের মধ্যে মোটেই ছিল না।

রাজকুমারদিগের বেশভূষা

মেজকুমারে বেশভূষা সম্বন্ধে ইহা উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ধুতি দুই ভাঁজ করিয়া, বা লুঙ্গি পরিতেন আর গায়ে দিতেন 'নিমা'। ফণীবাবু এবং সত্যবাবুও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। বাদীর রঙ্গিন জামা আদালতে বাদীপক্ষ দাখিল করিয়াছেন, তাহা যে মেজকুমারের ছিল না, ইহা রায় সাহেব বা কেহ বলিতে সাহস করেন নাই। বিবাদী পক্ষের আনীত সাক্ষীগণই প্রমাণ করিয়াছেন যে, দার্জ্জিলিংএ কুমার সাধারণতঃ লুঙ্গি পরিয়া থাকিতেন। রাজকর্ম্মচারীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় তিনি মাত্র পাঞ্জাবী পোষাক পরিতেন। শিকারে তিনি ধুতি বা খাকী পরিয়া যাইতেন। তখন সাহেবী পোষাকের যে তাঁহার নাম জানিতে হইবে এমন কোন মানে নাই।

খেলার প্রসঙ্গ

বাদী খেলা ধুলা জানেন না। মেজকুমারের অভিজ্ঞতা যে তদপেক্ষা অধিক ছিল তাহা প্রমাণিত হয় নাই। ফণীবাবু ছাড়া আর কেহ এ কথা বলেন নাই যে, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রাজার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মেজকুমার ক্রিকেট, ফুটবল খেলিতেন, এতদূর আর কোন সাক্ষী বলে নাই। বাদী পক্ষ হইতে অনেক খেলোয়াড় সাক্ষী বলিয়াছেন যে, কুমার মাত্র খেলা দেখিতেন, খেলিতেন না। বিবাদী পক্ষের ৩৬৪ নং সাক্ষী বৃদ্ধ খাজাঞ্চী বলিয়াছেন যে, মেজকুমার ৮।৯।১০ বৎসর কাল ফুটবল ও ক্রিকেট খেলিতেন, পরে আর খেলেন নাই। তাঁহার খেলার অর্থ ফুটবলসহ মাঠময় দৌড়ান। মেজকুমার ফুটবল সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, এবং তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার জ্ঞান বাদী অপেক্ষা অধিক হইত না। বিবাদী পক্ষ বলিয়াছেন যে, মেজকুমার টেনিস ও বিলিয়ার্ড খেলিতেন। রাজবাড়ীর সম্মুখে একটি টেনিস মাঠ ও বড় দালানে একটি বিলিয়ার্ড টেবিল ছিল। বাদীপক্ষের সাক্ষীগণ বলিয়াছেন যে, বড়কুমার, যোগেনবাবু ও সত্যবাবু টেনিস খেলিতেন; মেজ বা ছোট কুমার কখন ইহা খেলিতেন না। বিলিয়ার্ড সম্বন্ধেও প্রায় একই প্রকারের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ছোটকুমার মাঝে মাঝে ইহা খেলিতেন এবং বড়কুমার রামফল নামক এক ব্যক্তির নিকট খেলা শিখিতেন। মেজকুমার কোন দিন ইহা খেলিতেন না। হাতী ও ঘোড়া, শিকার ও নারীপ্রিয়-মেজকুমার টেনিসকে 'মেগো খেলা' বলিতেন। আমার সিদ্ধান্ত এই যে, মেজকুমার বাদীর মতই বিলিয়ার্ড বা টেনিস খেলা জানিতেন না। পলো সম্বন্ধে বাদী বলিয়াছেন—'জয়দেবপুরে মিঃ মেয়ার একটি পলো খেলিবার ময়দান তৈয়ারী করেন। আমি ও ছোট কুমার পলো খেলা সামান্য শিখি, বড়কুমার শিখেন নাই।' এই কথার সমর্থন করিয়াছে বাদীপক্ষের মণিপুরী সাক্ষিগণ। মণিপুরী জকি সাক্ষি চন্দ্রানন সিং বলিয়াছে যে, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাহাকে মেজকুমারের 'রাইডার'রূপে নিযুক্ত করা হয়। দেড় বৎসর ঐ কার্য্যে থাকিয়া সে ছোটকুমারের অধীনে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাজ করে। চাকুরীতে যোগদান করিবার ২।৩ মাস পর মেজকুমার প্রায় ১৫ দিন তাহার ও রেবতী সিংএর সহিত পলো খেলেন। এই সামান্য অভিজ্ঞতা হইতে কুমার 'নিয়ার সাইড ব্যাক হ্যাণ্ড' প্রভৃতি কথা জানিতে পারেন না, এবং তাহাই ৩৫ বৎসর পর বাদীর মনে থাকিবার কথা নহে।

মিঃ মেয়ারকে পলো সম্বন্ধে একটি প্রশ্নও করা হয় নাই। সত্যবাবু

জবানবন্দীতে বলেন যে, দার্জ্জিলিং যাইবার প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে মেজকুমার পলো খেলা ত্যাগ করেন, কাজেই ঢাকা পলো ক্লাবের ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের রসিদে বর্ণিত চাঁদা মেজকুমার দিতে পারেন না। আমার সিদ্ধান্ত এই যে, মেজকুমার মোটেই পলো ক্লাবের সদস্য ছিলেন না, এবং বাদী যে অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন তদপেক্ষা পলো ক্রীড়াজ্ঞান মেজকুমারের ছিল না। মেজকুমারের পলো না খেলিবার হেতু এই যে, তিনি ডানহাতে লাগাম ধরিতেন। বিবাদী পক্ষের ২৯০ নং সাক্ষী বীরেন্দ্রের কথাই এই ক্ষেত্রে মানিয়া লইতে হয়। বীরেন্দ্র বলিয়াছে যে, মেজকুমার বাড়ী থাকিবার সময় হাতীতে ও টমটমে চড়িতেন, অন্য কোন ব্যায়াম করিতেন না। আমার সিদ্ধান্ত এই যে, এই সকল খেলা-ধূলা সম্বন্ধে বাদীকে যেরূপ অজ্ঞ মনে হয়, মেজকুমার আদালতে উপস্থিত থাকিলে তুল্যরূপ অজ্ঞতাই প্রকাশ করিতেন।

শিকার ব্যাপারে মেজকুমার

শিকার, বন্দুক ও অশ্ব সম্বন্ধে ইংরেজী নাম বাদী কিছুই জানেন না, তবে বিষয়গুলি তিনি অবগত। শিক্ষিত ভদ্রলোক ফ্যাসানের জন্য শিকার করিতেছেন। মেজকুমার এরূপ ছিলেন না। শৈশব হইতেই শিকার তাঁহার খেলা ছিল। ভাওয়াল জঙ্গলাকীর্ণ বলিয়া তথায় বহু অশিক্ষিত শিকারী আছে, তাহারা বন্দুকের ব্যবহার জানিলেও ইংরেজী নামাদি জানে না, অথবা বুঝাইতে পারে না যে, 'ব্রীচ এণ্ড' অপেক্ষা 'মাজল এণ্ড' ছোট কেন। কয়েকজন শিকারী সাক্ষী ইংরেজী কথাগুলির এই প্রকার বাঙ্গালা নাম দিয়াছে—

টারগেট—	চাঁদমারি
ডি-বি বি-এল—	দোনালা কার্তুজ
কার্টিজ—	কার্তুজ
ফোর সাইট—	মাছি
ট্রিগার—	মাইর
কক—	ঘোড়া
রেঞ্চ—	পাল্লা
ষ্টক—	কুন্দা
ব্যারেল—	নল
মজিল লোডার—	গুতাইনা
বুলেট—	গুলী

শট্—	ছররা
সিঙ্গল ব্যারেল	এক নলা

যে ভাবে মেজকুমার শিকারে যাইতেন তাহা লইয়া মতভেদ হয় নাই। তিনি হাতীতে ধুতি বা খাকি পরিয়া যাইতেন। তাঁহার সহিত যাইত ভাওয়ালের প্রজা ও নেটিভ খৃষ্টান মেকবিন, মানি ও মাচিত যাইত। হাওদায় মানি বা মেকবিন মাল উঠাইত ও বন্দুক ধরিত। এক খানসামা হাওদায় কুমারের মাথায় ছাতি ধরিত। বাদী বলিয়াছেন যে, তিনি কোনদিন কখনও কার্তুজ বেল্ট নিজের সঙ্গে রাখিতেন না, উহা অন্যের হাতে থাকিত।

মিঃ চৌধুরী সাগরবাবুকে দিয়া বলাইতে চাহেন যে, বাদী বলিয়াছেন যে, তিনি শট্ গান দিয়া বাঘ মারিয়াছেন, কিন্তু মেজকুমার রাইফেল ছাড়া শট্গান দিয়া বাঘ মারেন নাই। ফণীবাবু এই কথার সমর্থন করিয়াছেন এবং ফটো (শিকার ফটো) দেখান হইলে ফণীবাবু অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে, মেজ-কুমারের হাতে শট্গানই আছে। ফণীবাবু বলিয়াছেন যে, তিনি মেজকুমারের শিকার সহচর ছিলেন এবং রাইফেল সম্বন্ধে অনেক লম্বা চওড়া কথা বলেন। তিনি বলেন যে, মেজকুমার উইঞ্চেষ্টার রাইফেল ব্যবহার করিতেন। ঐরূপ একটি রাইফেল আদালতে ফণীবাবুর হাতে প্রদান করিলে, তিনি তাহা ব্যবহার করিবার কায়দা দেখাইতে পারেন নাই। আমি বাদীর নিজের এবং ১০০২ নং সাক্ষীর কথা মানিয়া লইয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, হাতী হইতে ব্যাঘ্র শিকার করিতে হাতআন্দাজেই গুলী ছুড়িতে হয়।

জুড়ি গাড়ী ও আসবাব পত্র

রাজবাড়ীর যে সকল জুড়ি গাড়ী থাকিত বাদীর তৎসম্বন্ধে জ্ঞান ছিল। আমেরিকান কার্ট কি তাহা বাদী বলিতে পারেন নাই, অশ্বের ইংরেজী নাম বলিতে পারেন নাই। যে লোক ইংরেজী জানা দূরের কথা, একে-বারে নিরক্ষর, তাঁহার নিকট এই সকল প্রশ্ন করা ব্যর্থ। এই সকল কথাগুলি ফণীবাবুকে শিখাইতে হইয়াছিল।

বড়কুমারের বৈঠকখানা বাঙ্গালা ধরণের ছিল। মেঝেতে একটি কারপেট বিছান ছিল। বাদ্যযন্ত্রাদি রাখিবার জন্য ঘরে কয়েকটি চৌকীর উপর একটি চাদর পাতা থাকিত। ঘরে একটি হেলান দেওয়া বেঞ্চও ছিল।

ঘোড় দৌড়

ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছে যে, মেজকুমার ঢাকায় ঘোড়দৌড়ে যাইতেন, বাদীর নিজেরও দৌড়ের টাট্টু ঘোড়া ছিল, ইহারই প্রমাণ বিবাদীপক্ষ

দিয়াছেন। ঢাকা রেস্ মিঃ গার্থের মৃত্যুর পর (১৯০৪) বন্ধ হইয়া যায়। কাজেই বলিতে হইবে, মেজকুমারের বয়স যখন মাত্র ২০ বৎসর, ইহা তখনকার কথা, এই সম্বন্ধে বাদীকে মাত্র প্রশ্ন করা হয়—'ঢাকা রেসে কখন গিয়াছিলেন'?

উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি দেখেছি। উহার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে"। মিঃ চৌধুরী তৎক্ষণাৎ ঐ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেন।

"কলিকাতার ঘোড়দৌড়ের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছেন, আমি কলিকাতার ঘোড়দৌড়ের কথা শুনেছি। আমি সেখানে দু'একবার গিয়েছি। ভাইসরয়ের কাপের জন্য প্রতিবৎসরই একবার করে' ঘোড়দৌড় হয়। ১৩১৬ সালের আগে যে সব ঘোড়া ভাইস্‌রয়ের কাপে জয়ী হয়েছে তার কোনটারই নাম আমার মনে নাই।"

প্রশ্ন—বাজী জিতেছে এমন কোন ঘোড়ার নাম আপনি বলতে পারেন?

উঃ—আমার নিজের ঘোড়ার না অন্য কারুর ঘোড়ার?

প্রশ্ন—আপনার নিজেরটা দিয়েই আরম্ভ করুন না?

উঃ—আমি নিজেই ভাইস্‌রয়ের কাপ জিতেছিলাম।

প্রঃ—কোন্ বৎসর?

উঃ—বলতে পারি না। যে ঘোড়া বাজি জিতেছিল সেটাতে আমি নিজেই চড়েছিলাম, কিন্তু সেটা ভাইসরয়ের কাপ কিনা বলতে পারি না।

প্রঃ—কোথায় ঘোড়দৌড় হয়েছিল?

উঃ—টালিগঞ্জে।

তিনি Steeplechafe (বেড়া, পরিখা প্রভৃতি ডিঙ্গাইয়া যে ঘোড়দৌড় হয়) কথার অর্থ জানেন না। কি করিয়া হেণ্ডিক্যাপ (ভিন্ন ভিন্ন ভারাদি দিয়া সকল ঘোড়ার ওজন সমান করিয়া দেওয়া) করা হয় তিনি তাহা জানেন না; কিন্তু এটা জানেন যে, সকল ঘোড়াকে সমান সুবিধা দিবার জন্য ঐ রকম একটা কিছু করা হয়, তিনি জানেন যে প্রস্তরখণ্ড এবং ভারী ওজন ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, আরোহীর গায়ে যে ৮ কিম্বা ৭—১২ সংখ্যা আঁটিয়া দেওয়া হয়, উহার কি অর্থ তাহা তিনি জানেন না। জেরা করিবার সময় তিনি বুঝাইয়া বলেন, টালিগঞ্জের ঘোড়দৌড়ে বাজি জিতিয়া তিনি একটি 'হাণ্টার' (ঘোড়-সাওয়ারদের ব্যবহার্য্য চাবুক) পাইয়া ছিলেন। একজন সাক্ষী একথা সমর্থন করিয়াছেন। কেহই ইহা অস্বীকার করেন নাই এবং ইহা যে সত্য নয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কিছুই উপস্থাপিত হয় নাই। আমি নিজেকে এই প্রশ্ন করিয়াছি যে, যদি ধরা যায় যে মধ্যম কুমার নিরক্ষর ছিলেন, তবে যে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার কতটা উনত্রিশ বৎসরের বিস্মৃতি প্রসূত,

আবার যদি ধরা যায় যে, তিনি দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী সন্ন্যাস জীবনের অভিজ্ঞতার কথা যাহা সাক্ষ্য দান কালে বলিয়াছেন, তাহার সহিত কোন স্থানীয় সম্পর্ক নাই, যাহা স্মৃতিশক্তিকে সঞ্জীবিত রাখে। ইহা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে বাদীকে একেবারে প্রসঙ্গক্রমে এবং একটা অবান্তর ব্যাপারে মিষ্টার গার্থের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন যে গার্থ নবাব এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন।

"১৩১৬ সালে তিনি জীবিত না কোন্ সালে ঠিক বলতে পারি না। তবে আমি দার্জ্জিলিং যাওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কতদিন আগে বলতে পারি না। দশ বৎসর আগে নয়, তবে এক বৎসর কি দুইবৎসর আগে, বলতে পারি না।"

১৯০৫ সালে মধ্যম কুমার ভাইস্‌রয়ের কাপের ঘোড় দৌড়ে উপস্থিত ছিলেন এবং ইংরাজীতে কথা কহিতেছিলেন ইহা প্রমাণ করিবার জন্য শেষের দিকে একজন সাক্ষী আহুত হইয়াছিল, একথা আমার উল্লেখ করা উচিত। যখন আমি বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিব তখন এই সাক্ষ্য সম্বন্ধে বিচার কবিব, এবং তখন ইহা প্রতীয়মান হইবে যে উক্ত সাক্ষ্য অবিশ্বাস্য, যদিও ঐরূপ উপস্থিতি কোন স্বাভাবিক কারণে অসম্ভব নহে।

বর্ণজ্ঞান

বাদী, এইচ্, ই, এইচ্. এইচ্, সি, এস্. আই, আই, সি, এস্, প্রভৃতি (ইংরাজী) শব্দ জানেন না, কিম্বা "হাউ ডু ইউ ডু" কিম্বা "কোয়াইট্ ওয়েল" কথার অর্থ জানেন না। আই, সি, এস্, সম্বন্ধে তাঁহার একটা ধারণা আছে এবং যদিও তিনি এ, ডি, সি, কাহাকে বলে জানেন না; কিন্তু "এডিকং" সম্বন্ধে ধারণা আছে, যখন কথাটি উচ্চারিত হয়। কুমার ইংরেজী জানিতেন কি না এবং নিরক্ষর ছিলেন কি না, এই সব ধারণা হইতে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় না। ইহা অদ্ভুত বলিতে হইবে যে, তিনি "ক্রাশ্ ড্ ফুড্" কথা জানিতেন। তিনি বলিয়াছেন, উহা ঘোড়াকে খাইতে দেওয়া হয়, যদিও ঐ শব্দটি ইংরেজী পোষাক সম্বন্ধীয় শব্দগুলির মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল। জেরার এক অংশে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে বাদী মোটেই বাঙ্গালী নহেন। নিম্নে ঐ প্রসঙ্গ আলোচনার সময় ইহার বিচার সুবিধাজনক হইবে। ইহার একাংশ এখানেই বিচার করিয়া দেখা যাক্।

একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি অতিশয় ধীরভাবেই বলিয়াছেন যে; "রাজা

রাজেন্দ্র ভালো তবলা বাজাইতে পারিতেন ; কিন্তু গাইতে ভালো পারিতেন না। তিনি সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন।" অপর পক্ষের সাক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাতে দেখা যায় ইহা সত্য। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল :—

"১৩১৬ সালের পূর্ব্বে যে গান শুনেছেন তেমন একটা বাংলা গান থেকেও একটা লাইন উদ্ধৃত করতে পারেন ?"

উত্তর—"পারি না।"

এই উত্তর অদ্ভুত মনে হয়, কারণ দেখিতে পাইতেছি যে রাজা সঙ্গীতের অনুরক্ত ছিলেন, সঙ্গীতের ওস্তাদ রাখিতেন, তাঁহার বৈঠকখানায় গান-বাজনা হইত এবং তাঁহার মৃত্যুর পরেও বড়কুমারের বৈঠক খানায় গান-বাজনা হইত, সেখানে বাদ্যযন্ত্র থাকিত, এবং জগদ্ধাত্রী পূজা, পুণ্যাহ উপলক্ষে

মেজোকুমারের সঙ্গীতানুরাগ

সেখানে নাচ, গান, যাত্রা, কবি হইত এবং "নাচ ঘর" বাঁধা ষ্টেজ্ ছিল ; এবং থিয়েটার অভিনয় হইত। বাদীপক্ষের সাক্ষীদের কথাতেই এই সব জানা যায়, একজন লোক একটা গানের একটা লাইনও (পংক্তি) মুখস্থ করে নাই ইহা অসম্ভব। বাদীপক্ষের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, মধ্যম কুমার কোন যন্ত্রই বাজাইতে পারিতেন না, তবে গানের দুই এক পদ গাহিতে পারিতেন মাত্র। কুমারের ভগিনী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলেন যে তিনি স্নান করিবার সময় গান গাহিতেন। গানের কথা বুঝা যাইত না, কিন্তু একটা গানের আরম্ভ ছিল এই রকম :—

'ঝিলিমিলি পানিয়া, হা রে ননদিয়া'

জেরার সময় তিনি বলিয়াছেন যে তিনি (মধ্যম কুমার) আর যে সব গান করিতেন তাহার এক আধ লাইন বলিতে পারেন, যেমন, একটী গান 'আয়লো অলি, কুসুম তুলি, ভরিয়া ডালা।' ইহা মনে রাখা দরকার যে, ফণীবাবুর নোটবহিতে "মধ্যম কুমারের গান"-এর তালিকার মধ্যে এই দুইটি গান লিখিত আছে।

এ কেমন কথা যে বাদী কোন গানেরই একটা লাইন ও বলিতে পারিলেন না ? একজন ভণ্ড প্রতারকও যদি ১৩ বৎসর কোন বাঙালী পরিবারে বাস করে, তবে সেও একটা গানের একটা লাইন শিখিতে পারে ; বিশেষতঃ বাদী পক্ষের সাক্ষ্যেই প্রমাণ আছে যে তাঁহার ঢাকার বাড়ীতে কীর্ত্তন গান হইত। (দুর্গাপ্রসাদের কমিশনে জবানবন্দী দ্রষ্টব্য) ; এবং এমন বাঙালী পরিবার নাই বলিলেই হয় যেখানে কেহ গান করে না, অথবা যেখানে ভিখারীরা ভিক্ষা

করিতে আসিয়া গান গাহে না? কিন্তু ইহার কারণ সুস্পষ্ট, আমাদের দেশের বাঙালীদের মধ্যে, পেশাদার গায়ক কিম্বা সুগায়ক ব্যতীত, কেহই স্বীকার করিতে চাহে না যে সে গাহিতে পারে। এমন কি যাঁহারা ভালো গাহিতে পারেন, তাঁহাদিগকেও লোকের মধ্যে গান গাহিতে হইলে অনেক অনুরোধ উপরোধ করিতে হয়, এবং তখন তাঁহারা যেন নেহাৎ সঙ্কোচ ও লজ্জার সহিত গাহিতে আরম্ভ করেন।

আমার বিশ্বাস একজন চাষা বা নিরক্ষর ব্যক্তিকেও আদালতে স্বীকার করান যাইবে না যে, সে গান জানে, গান করা ত দূরের কথা। লোকের মধ্যে উহা একটা লজ্জার বিষয়, নির্জ্জন স্থানে যদিও উহা গর্ব্বের বিষয় হইতে পারে। এই জাতীয় বিশেষত্ব ছাড়াও এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা লজ্জায় বলা যায় না, কিন্তু গান করা যায়। ফণীবাবুর তালিকায় মধ্যম কুমারের যে সব গান ছিল সেগুলি ইতর ও নিকৃষ্ট প্রেমের গান, যাহা তিনি আদালতে স্বীকার করিতে কিম্বা বলিতে পারেন না। জনাকীর্ণ আদালতের গম্ভীর কার্য্য-কলাপের মাঝখানে ঐরূপ করা তিনি হয়ত নিশ্চয়ই অতীব গর্হিত আচরণ বলিয়াই মনে করিয়াছেন।

মেজোকুমারের অন্যান্য জ্ঞান

লেখাপড়া জানা ও বিতর্কিত চিঠির ভাষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ফণীবাবু বলিয়াছেন, মেজকুমার থিয়েটার অভিনয়ের সময় 'প্রম্‌টার' হইতেন। কিন্তু এই সাক্ষ্য তাঁহার নিজের স্বীকৃতিতেই মিথ্যা প্রমাণ হইয়াছে ইহা আমি পরে দেখাইব।

মধ্যম ও তৃতীয় কুমার ফোটো তুলিতে জানিতেন, এই সাক্ষ্য আমি বিশ্বাস করি না—যদিও বাড়ীতে ষ্টুডিও (ফোটো তুলিবার ঘর) ছিল। এক জন বেতন-ভোগী ফোটোগ্রাফারও ছিল, এবং বড়কুমার ফোটো তুলিতে জানিতেন, কিন্তু তাহাতেই এমন কথা বুঝা যায় না যে অপর দুইজনও জানিতেন। তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী এই যে, মেজকুমার কখনও ফোটো তোলেন নাই (বাঃ সাঃ ৩৪, ৬৬০, ৯০৭, ৯৩৮)। প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষ্যে অধিক আস্থা স্থাপন করিবার আমি কোন কারণ দেখি না, কারণ যে সমস্ত ব্যক্তি কুমারের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে, এবং আমি যখন বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করিয়াই পক্ষের লোকেরা নানা প্রসঙ্গে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, আমি তাহার আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি এবং তাহাদের অসত্যবাদিতা অন্যান্য কার্য্যকারণেও প্রতীয়মান হয়।

ক্রিকেট, টেনিস বিষয়ক জেরাতেও এমনভাবে কুমারকে প্রশ্ন করা হইয়াছে

যাহাতে কুমার গত জীবনের কোন ঘটনা স্মরণ করিয়া উত্তর দিতে না পারেন। এক্ষেত্রে আমি বলিতে চাই। যদিও এই প্রশ্নগুলি সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, এবং কুমার উহার উত্তর দিতে পারেন নাই, তথাপি বলিতে হয়, কুমার ছাড়া যে কোন ব্যক্তি ঐ প্রশ্নগুলির উত্তরদিতে পারিত, যদি সে শিক্ষিত খেলোয়াড় হইত, যাহা মেজোকুমার ছিলেন না।

স্মৃতিশক্তির কথা

আমি এখন সেই সব প্রশ্নের আলোচনা করিব, যাহা মধ্যম কুমারের মনে থাকিবার কথা। এই সব প্রশ্নের উত্তর সঠিক হইয়াছে, কেবল মধ্যম রাণীর এক ভগিনীপতির নাম বাদী বলিতে পারেন নাই; তিনি কলিকাতার এক যুবক এবং এখন জীবিত নাই; এবং আরও কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। প্রশ্নগুলি নেহাৎ খেলোভাবে করা হইয়াছিল, এবং সংখ্যাতেও অল্প, যে সব প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারেন নাই, সেগুলি এই ধরণের; ১৩০৯ সালে কে ছোটলাট ছিলেন? কিম্বা ১৩১০ সালে? কিম্বা ১৩১১, ১৩১২, ১৩১৩, ১৩১৪, ১৩১৫ ১৩১৬ সালে? রিজলি সাহেব কে? লর্ডমিণ্টোর কথা শুনেছেন? হাঁ, তাঁর কথা হয়ত শুনেছি। তিনি কে ছিলেন তা ঠিক বলিতে পারি না, কিম্বা তিনি কোন্ সালে ভারতবর্ষে ছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। ১৩০৯ হইতে ১৩১৬ সাল পর্য্যন্ত কে কে কমিশনার বা কালেক্টর ছিলেন বলিতে পারি না, তবে র‍্যাংকিন্ সাহেব এক সময়ে কালেক্টর ছিলেন, এবং পরে কমিশনার ছিলেন। হাঁ, ১৩১৬ সালের আগে, তবে কতদিন আগে বলিতে পারি না। মিষ্টার গার্থ? হাঁ, তিনি নবাব এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ১৩১৬ সালে তিনি ম্যানেজার ছিলেন কিনা তাহা বলিতে পারি না। ১৩১৬ সালে তিনি জীবিত ছিলেন না। কোন্ সালে, বলিতে পারি না, তবে আমি দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বে। কত দিন পূর্ব্বে বলিতে পারি না। ১০ বৎসর পূর্ব্বে নয়, তবে ১ বৎসর কি ২ বৎসর পূর্ব্বে তাহা বলিতে পারি না। ৩ বৎসর কি ৫ বৎসর কি তাঁহারও বেশী দিন পূর্ব্বে তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আপনি ঢাকার গঙ্গানারায়ণ রায়কে চেনেন? এক গঙ্গাচরণ ডাক্তারকে চিনিতাম। কুঞ্জবিহারী চাটুয্যেকে চিনেন? আমার মনে নাই। বঙ্কিম চাটুয্যে কে? তিনি কলিকাতার লোক। তিনি কে? তিনি বই লিখেছেন। কোন বইয়ের নাম বলিতে পারেন? কখনো তাঁর বই পড়ি নি। তিনি মৃত। কলিকাতায় মরেন কিনা তাহা বলিতে পারি না।

এই ধরণের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষায় কাহাকেও মর্য্যাদাভ্রষ্ট করিতে পারে না। অন্যদিকে, মিঃ গার্থ সম্পর্কে উত্তর অসামান্যরূপে খাঁটি স্মরণ শক্তির পরিচায়ক— স্মরণ করিবার একটা প্রয়াস দ্বারাই সার বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে। শিখানো হইলে তাহার অন্যরূপ হইত। যাহাই হউক আমি উত্তরের সঠিকতা অগ্রাহ্য করিতেছি না, কিন্তু আমি উত্তরটি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া, এবং এই পরিবারের সমগ্র ইতিহাস আমার যেমন জানা আছে, এবং শিখানো হইলে যে জটিলতা অতিক্রম করিতে হইত, তাহাতে আমি স্মরণ শক্তির চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। 'বড়দালান'কে 'গেষ্ট হাউস' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বাদীকে জিজ্ঞাসা করা হইল "আপনার দাদার ঘর হইতে ইহা কত দূরে ছিল?"

উঃ—তাঁহার কোন্ ঘর, বৈঠকখানা না অন্য কোন ঘর? মিষ্টার চৌধুরী কি ভাবিয়া সে কথা ছাড়িয়া দিলেন। কিছুকাল পরে আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, গেষ্ট হাউস হইতে তাহার দাদার ঘর কত দূরে ছিল। বাদী উত্তরে বলিলেন, 'প্রায় ৫০ হাত দূরে হইবে'। ইহা ঠিক কথা।

প্রঃ—আপনি এস্, বি, বর্দ্ধনের কথা শুনিয়াছেন?

ইংরেজী জ্ঞানের কথা

উঃ—শশী গোবর্দ্ধন? আমরা তাঁর কাছে প্রায়ই জামা কাপড় অডার দিতাম।

জেরায় তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ছিলেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে বলেন যে, তাঁহার বার কি চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহাকে ঐ স্কুলে দেওয়া হয়। আবার জিজ্ঞাসা করায় বলেন নীচের ক্লাসে। ক্লাসের নাম বলিতে পারেন না। হয়ত শুনিয়া থাকিবেন ৮ম শ্রেণী। সেখানে তিনি ১০ কি ১৫ দিন ছিলেন, প্রধান সাক্ষীরূপে তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাকে শিখানো হয় নাই, শিখান কথা হইলে তিনি আরো কিছু বেশী বলিতেন। বিবাদীপক্ষ পরে ইঙ্গিত করেন যে মধ্যম কুমার এই স্কুলে দুই বৎসর ছিলেন। পরে তাঁহাদেরই সাক্ষ্যে দেখানো হইয়াছে যে তিনি এক বৎসরেরও কম সময় সেখানে ছিলেন। বাদী যে বলিয়াছেন যে, তিনি ১০ কি ১৫ দিন স্কুলে গিয়াছেন ইহা অপ্রমাণিত হয় নাই; ইহা আমি নিম্নে দেখাইব। আর বিবাদী পক্ষের উক্তি যে কুমার এক বৎসরের কিছু বেশী সময় স্কুলে ছিলেন, ইহাও তাঁহাদের প্রথমোক্ত দুই বৎসর স্কুলে থাকার কথার চেয়ে অধিক সত্য নহে।

লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাতের সময় কি কথাবার্ত্তা হয় তাহা তিনি আমাদিগকে সংক্ষেপে বলিয়াছেন, এবং একথাও বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার দাদার সঙ্গে ব্যতীত একাকী কখনো লাট সাহেব কিম্বা কোন ইংরেজের সহিত দেখা করেন নাই, তাঁহার দাদাই কেবল ইংরেজী জানিতেন। নিম্নে এই কথার সত্যতা পরীক্ষা করা হইবে।

অ্যান্‌টনি কি ম্যাক্‌বিনের ছোট ভাই ছিল ? উঃ—না, সে মুনির ভাই।

কুমারের স্মৃতিশক্তি সংশ্লিষ্ট অল্প যে কয়টি প্রশ্ন অত্যন্ত সন্তর্পণে করা হইয়াছে, এইগুলি সেই সব প্রশ্নের অংশ বিশেষ, এবং ইহা ব্যতীত প্রসঙ্গক্রমে 'সিফিলিস্' ও দার্জ্জিলিং সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে এবং তাহাও যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব করা হইয়াছে।

তিনি উপদংশ রোগ সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাই একমাত্র বিবেচনার বিষয় ; দার্জ্জিলিং সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে, কিন্তু এবিষয়ে যে সকল প্রশ্ন তাঁহাকে করা হইয়াছিল, তাহার একটিও এবিষয়ের অনুসন্ধানে যে সকল কথার উত্থাপন হয় তাহার নিকটেও যায় নাই।

বাড়ীর অবস্থান কথা

আর একটি বিষয় লইয়া তাঁহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হয়। সেটি হইতেছে বড় দালান—ম্যানেজারের বাড়ী, ইহার কোন ঘরটি কিরূপে অবস্থিত, এবং ইহার ভিতরকারের আসবাবপত্র প্রভৃতি। প্রত্যেকে এই বাড়ীটাকে বড় দালান বলে, সত্যবাবু তাঁহার ডায়রীতে এই বাড়ীটিকে বড় দালান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এই বাড়ী এবং দেশী অতিথি অভ্যাগতদের জন্য নাচঘরের দুইদিকে যে দালান আছে, ইহার ভিতর গোলযোগ সৃষ্টি করা হইয়াছিল। তথাপি আমি আসবাবপত্র প্রভৃতি জিনিষের ইংরাজী নামের অজ্ঞতাটাকে চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না।

বাদীর সাক্ষ্যের ভিতর দুইটি দফাকে অসত্য বলিয়া খুব আক্রমণ করা হইয়াছে। বাদী বলিয়াছেন চিড়িয়াখানায় একটী শ্বেতশৃগাল ছিল। এ বিষয়ে যাহারা সাক্ষ্য দিয়াছিল তাহাদিগকে এমনভাবে জেরা করা হয় যেন, তাহারা ভুলের সমর্থন করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু প্রতিবাদী পক্ষের একজন সাক্ষী (প্রঃ সাঃ ২৬৭, গোলাম নবী) স্বীকার করে যে সে চিড়িয়াখানায় শ্বেতশৃগাল দেখিয়াছিল। বাদী বলিয়াছেন যে তিনি হাতীর শুঁড়ের উপর পদক্ষেপ করিয়া তাহার পর তাহার কাণ দুইটি ধরিয়া হাতীর পৃষ্ঠের উপর গিয়া আরোহণ করিতেন। এরূপ কাজ সকলে করিতে পারে না।

বিবাদীপক্ষ বাদী যে ঐরূপে হাতীতে উঠিতে পারিতেন না, এবং হাতীতে উঠিবার জন্য স্থানে স্থানে মঞ্চ প্রস্তুত থাকিত, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য রাণীকে, মাহুতকে এবং আবদুল মুন্সী, প্রঃ সাঃ ৩৭ প্রভৃতিকে সাক্ষী ডাকিয়াছেন। মধ্যম কুমার হাতী চালাইতে জানিতেন, ইহা তাহারা স্বীকার করিয়াছে, এবং বিবাদীপক্ষের একজন সাক্ষী (প্রঃ সাঃ ২২৬, আবদুল হামিদ) মধ্যম কুমারকে বাদী কর্ত্তৃক উক্ত উপায়ে হাতীতে উঠিতে দেখিয়াছে। বাদী বলিয়াছেন ঘোড়ায় চড়া অথবা গাড়ী চালান এসব ক্ষেত্রে তিনি দক্ষিণ হস্তে লাগাম ধরিতেন; এ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ইহা একেবারেই অসম্ভব।

শকট চালন

মধ্যম কুমার যে জয়দেবপুরে এবং ঢাকার পথে টমটম চালনা করিয়া বেড়াইতেন, এবিষয়ে সকলেই একমত। অসংখ্য লোকে তাঁহার গাড়ী চালাই-বার ধরণ সম্বন্ধে সাক্ষী দিয়াছে, তিনি খুব দ্রুত গাড়ী চালাইতেন। ঘোড়া খুব তেজী ছিল, এবং তিনি ডান হাতে লাগাম ধারণ করিতেন। একথা বহু সাক্ষীর মুখে প্রকাশ পাইয়াছে (বাঃ সাঃ ১৬৭, ৩২৬, ৩৮৭, ৫৩০, ৪৮৯, ৭৩৬, ৬৬৬, ৭৮৯, ৮০১, ৫৮০ এবং আরও অন্যান্য)। ইহাদের ভিতর আমি বিশেষ করিয়া ব্রজগোপাল বসাকের নাম করিব, কারণ তিনি এ সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি কথাই বিবৃত করিয়াছেন। ব্রজগোপালবাবু ঢাকার একজন অতি সম্ভ্রান্ত এবং ধনী মহাজন লোক। তিনি বলেন কুমারের গাড়ী চালাইবার রীতি ছিল এইরূপ—গাড়ীতে কোণাকোণি ভাবে বসিয়া দক্ষিণ হস্তে লাগাম ধরিয়া খুব জোরে চালান। সাক্ষী নিজে একখানি টমটম চালাইয়া থাকেন, প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় তিনি বলিতে পারেন নাই, তিনি কি জাতীয় টমটম চালাইতেন।

প্রঃ—এটা 'ডগকার্ট', 'কেব্রিয়লেট', অথবা 'আমেরিকানকার্ট' ইহার কোন্‌টা ছিল? উঃ—যে স্থানে পা রাখিতে হয় সেটা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি।

মাটির উপর হাত উঠাইয়া দেখাইলেন। বসিবার জায়গাটা যে সাড়ে তিন ফুট উচ্চ তাহা দুইজনে বসিতে পারিত, কখনও কখনও তিনজনও বসিত। তাঁহার সহিত সকল সময়ই কেহ না কেহ থাকিত। সঙ্গে কেহ থাকিলে তাহার উপর তিনি পা তুলিয়া দিতেন না। সাক্ষীর কিরূপ টমটম ছিল জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি তাহার নাম বলিতে পারেন নাই। সাক্ষী বিদ্বান্ নহেন, কিন্তু তাঁহার আয়ের দিকে লক্ষ্য করিলে একথা বলা শক্ত হইবে যে তাঁহার টমটম ছিল না, অথবা তিনি একটি টমটম রাখিতে পারিতেন না।

এ বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করা হয় নাই যে এই বাদী সন্ন্যাসী, তাঁহার জয়দেবপুরে ৩৭ দিন অবস্থানকালে এবং পরে ঢাকায় একখানি টমটম চালাইয়াছিলেন। সে সময়ে কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা জয়দেবপুর ছিলেন ও এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়াছেন, এবং অপর কেহ, এমন কি ফণীবাবু পর্য্যন্ত একথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। জয়দেবপুরে বাদীর গাড়ী চালনা সম্বন্ধে বাঃ সাঃ ৯৭৭, ৯৭৫, ৯১৮, ৮০৬, ৯৩৮, ৯৩৯, সাক্ষ্য দিয়াছেন; এবং ইহা হইতে আরও বেশী লোক বাদীকে ঢাকায় গাড়ী চালাইতে দেখিয়াছে (বাঃ সাঃ ৪৫০, ৪৭২, ৬০২, ৬৬৬, ৭৩৯, ৭৮৯, ৮১২, ৮৩৩, ৯১৫, ৯১৮, ৯০১, ৭৯২, ৯৬১, ৯৭৭, ১০০৯, ১০১৫, ১০০২, ৯৭০, ৯৭৬, ৯১৮)। এই সাক্ষ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই হয় নাই, এবং ইহার বিপরীত কোন সাক্ষ্য প্রদান করাও হয় নাই। মেয়ার সাহেব বাদীকে রমনার মাঠে একখানি টমটমে দেখিয়াছিলেন; প্রতিবাদীর পক্ষ হইতে সর্ব্বমোহন চক্রবর্ত্তী (কমিশনে) একদিন বাদীর সহিত দেখা করিতে যাইয়া দেখিতে পান যে, তিনি টমটম হাঁকাইয়া যাইতেছেন। বাদী পক্ষের মাত্র একজন সাক্ষী, যতীন্ বলে যে মধ্যমকুমার বামহস্তে লাগাম ধরিতেন, এবং সে এটাকেই কুমারের বৈশিষ্ট্য বলিতে চায়। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে দক্ষিণ বলিতে ভুল করিয়া সে বাম বলিয়াছে। দক্ষিণ হস্তে গাড়ী চালানর মধ্যে অসম্ভবতা কি থাকিতে পারে, তাহা আমি বুঝি না; এমন কথা ত কেহ বলিতেছে না যে তিনি নেস্তা (যাহারা সব কাজে বাঁ হাতে চালায়) ছিলেন, কিন্তু উহাই ছিল তাঁহার নিয়ম। বাদী যে টমটম চালান এবং তাঁহাকে১৯২১ সালের ৪ঠা মে হইতে ৭ই জুনের মধ্যে টমটম চালাইতে দেখা গিয়াছিল, একথা অবিসংবাদিত থাকায়, ১৯২১ সালে একজন সন্ন্যাসীর মধ্যে এ ব্যাপারের নূতনত্ব থাকিয়া যায়; এবং আমিও বাদীর সেই পুরাতন ধরণে অর্থাৎ কুমারের ন্যায় গাড়ী চালানো সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য পাইয়াছি তাহা নাকচ করিয়া দিবার কোন হেতু দেখতে পাই না।

উচ্চারণের কথা

অবশেষে আমি একটি কথার উল্লেখ করিতে চাই, যাহার উপর বাদীপক্ষ কতকটা গুরুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। বাদীকে ভাওয়ালের বিখ্যাত খাবারের নাম বলিতে বলায়, তিনি জবাব দেন 'দধি সন্দেশ।' সাক্ষ্য প্রমাণদ্বারা দেখান হইয়াছে যে ইহাকে 'দাউদি সন্দেশ' বলে। বাদীপক্ষের সাক্ষীরা বলে যে ইহাকে দাউদি বা দধি বলা হয়, দধি কথাটা নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বলে।

প্রতিবাদী পক্ষের একজন সাক্ষী ইহাকে দাউধি সন্দেশ বলে, এবং এই কথাটাই উচ্চারণের সামান্য পরিবর্ত্তনে দধিতে আসিয়া দাঁড়ায়। অশিক্ষিত লোকদের একটা অভ্যাস দেখিতে পাই,তাহারা অনেক সময় আদালতে আসিয়া সাধারণ কথাগুলিকে একটু বেশী শুদ্ধ করিয়া বলিতে চেষ্টা করে। আমার মনে আছে বাদী তাঁহার সাক্ষ্যদিবার সময় একজায়গায় 'জিগাই' এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। 'জিগাই' জিজ্ঞাসা শব্দের অপভ্রংশ। ভাওয়ালে জিগাই কথাটি প্রচলিত আছে। আমাকে বাদীর এই কথাটি তাঁহার পক্ষ সমর্থন হিসাবে লিখিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করা হয়। বাদীও তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া অর্থাৎ জিগাইএর বিশুদ্ধ এই 'জিজ্ঞাসা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন।

বাদী হিন্দুস্থানী কিনা

বাদীর জেরায় যে রাশিকৃত কথার ধাঁধাঁর মধ্যে তাঁহাকে ফেলান হইয়াছিল, তাহা বিচার করিতে হইলে একথা ভাবিয়া দেখা দরকার যে একজন অশিক্ষিত লোকের নানাপ্রকার অজ্ঞাত, অশ্রুত ও যোগসূত্রহীন কথার উত্তর দিতে কি অবস্থা হয়। এরূপ লোকের মাথা বিগড়াইয়া দিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় তাঁহাকে দ্ব্যর্থক প্রশ্ন করা এবং শব্দ বা শব্দার্থের দ্রুত পরিবর্ত্তন করা। বাদীকেও এইরূপ অবস্থায় আনা হইয়াছিল। বাদী হিন্দুস্থানী কিনা এই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি উহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখাইব। ১৯০৯ সালে মধ্যমকুমার কতদূর শিক্ষিত ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; সেই শিক্ষা সময়ের ব্যবধানে কতদূর হ্রাস পাইতে পারে ভাবিয়া দেখিলে, বাদীর জেরায় প্রতিবাদীপক্ষ তাঁহার মনের যতটুকু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে আমি সহজেই এ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, বাদীর মনের সহিত মধ্যম কুমারের মন আজ যেরূপ হইত, তাহার কোন পার্থক্য নাই। বাদীর মনের বা জ্ঞানের অনেক কিছু প্রতিবাদীপক্ষ দেখাইতে চেষ্টাই করেন নাই। ইহার কারণ, ইহা নহে যে বাদী 'শিখান' কথা বলিবেন এবং তাহাতে প্রতিবাদীর জেরা শুধু মিছামিছিই হইবে। আমার বিবেচনায় বিবাদীপক্ষ বাদীর স্মৃতিশক্তিকে ভয় করিয়া চলিয়াছেন।

মধ্যমকুমারের শিক্ষা-দীক্ষা

বাদীপক্ষ বলেন মধ্যমকুমার অশিক্ষিত ছিলেন, কেবল ইংরেজীতে ও বাংলায় নিজের নাম সহি করিতে জানিতেন মাত্র। বাদীও তাহার বেশী জানেন না; এবং জেরায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে তিনি তাঁহার স্বাক্ষরের অক্ষর গুলির মধ্যে ইংরাজী 'N' ছাড়া আর কিছুই জানেন না।

প্রতিবাদীপক্ষ বলেন মধ্যমকুমার শিক্ষিত ছিলেন। ১৯৩৩ সালে বাদীর পক্ষে কমিশনে মিঃ ঘোষালের যে সাক্ষ্য লওয়া হয়, তাহাতে তাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন তুলেন :—

"আপনি তাঁহাকে বাংলার একজন সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত যুবক বলিয়া জানিতেন।"

বাদীব জেরার সময়েও প্রতিবাদীপক্ষ এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। তখন কুমারের যে ছবি তাঁহারা দেখাইতে চাহিয়াছেন তাহাতে কুমারকে সুশিক্ষিত, সমস্ত ক্রীড়া নিপুণ বলা হইয়াছে। তিনি সাহেবী সাজ পোষাকে অভ্যস্ত ছিলেন, ইংরেজী বলিতে পারিতেন এং ইংরাজদের সহিত মেলা মেশা ও খানাপিনা করিতেন। মামলার প্রারম্ভেই বাদীপক্ষের জনৈক সাক্ষীকে (বাঃ সাঃ ৩৫) প্রশ্নে বলা হয় যে, রাজা পুত্রদিগকে ইউরোপীয়দের সহিত মেলা মেশা করাইতে চাহিতেন, এবং এই উদ্দেশ্যে একজন সাহেব শিক্ষক রাখিয়াছিলেন। এই সাহেব শিক্ষক বলিতে স্পষ্টতঃ হোয়ার্টন সাহেবকে বুঝাইতেছে, তিনিই মাত্র এইরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রতিবাদীপক্ষের মতে বাদী একজন অশিক্ষিত পাঞ্জাবী, এখানে আসিয়া এক রাজকুমারের ভূমিকায় নামিয়াছেন ; অথচ যাঁহারা তাঁহাকে এইভাবে রাজকুমার বলিয়া দাঁড় করাইলেন, এই সুদীর্ঘ বার বৎসরের মধ্যেও তাঁহারা তাঁহাকে বর্ণপরিচয় দিবার চেষ্টাও করেন নাই।

মামলার তারিখে দাখিল করা নয়খানি বাংলা চিঠি ছাড়া মধ্যমকুমারের অন্য একলাইন লেখাও ছিলনা। বাদীপক্ষ এই চিঠিগুলি সম্বন্ধে আপত্তি তুলিয়াছেন। এই চিঠিগুলি শীল করা খামে দাখিল করা হইয়াছিল, এবং বাদীর জেরার পূর্ব্বে ইহা খোলা হয় নাই। চিঠিগুলি সবই বাংলায় লেখা। এইগুলির মধ্যে একখানি ছাড়া সবগুলিই মধ্যমকুমার তাঁহার পত্নীকে লিখিতেছেন বলা হইয়াছে। ঐ একখানা কুমার তাঁহার শ্যালিকা প্রভাবতী দেবীকে লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই প্রভাবতী দেবী ছয় বৎসর হইল মারা গিয়াছেন। এই চিঠিগুলির আট খানির শীর্ষে ইংরাজীতে 'God' কথাটি লেখা আছে।

কুমারের বলিয়া কথিত কতকগুলি ইংরাজী স্বাক্ষর ও কুমার কর্ত্তৃক নিজ একৃজিবিট্ (নং ২) বলিয়া স্বীকৃত একটি বাংলা স্বাক্ষর বাদ দিলে মামলার তারিখে কুমারের ঐ 'God' কথাটি ছাড়া অন্য কোন ইংরাজী লেখা এবং ঐ অবিসংবাদিত চিঠিগুলি ছাড়া আর কোন বাংলা লেখা ছিল না।

আত্মপরিচয়ে বিবাদীপক্ষ

বাদী যেমনি আত্মপরিচয় প্রকাশ করিলেন, সত্যবাবু তাঁহার নিজের উক্তি-মত প্রকাশ যে, প্রায় তন্মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর নিদর্শনগুলি সংরক্ষণের জন্য যত্নবান হইলেন এবং নিজে সরকারী উকীল রায়বাহাদুরের সহিত দার্জ্জিলিংএর দিকে ছুটিলেন। ইহা ১৯২১ সালে মে মাসের মাঝামাঝির কিছুদিন আগে। সরকারী উকীল রায়বাহাদুর শশাঙ্ককুমার ঘোষ সেই হইতে প্রথম প্রতিবাদীর পক্ষে এই মোকদ্দমায় কাজ করিতেছেন। মধ্যমকুমারের যদি কোনও লেখা থাকিত তাহা ধনরত্নের মত সযত্নে সংরক্ষিত হইত; এবং ইহা ভাবিতে ইচ্ছা হয় না যে তাঁহারা সে প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে ১৯৩২ সালে হস্তলিপি বিশারদের মত লওয়া স্থিরীকৃত হয়, এবং সেজন্য মধ্যমকুমারের কতকগুলি স্বাক্ষর এবং বর্ত্তমান। বাদীর কতকগুলি স্বাক্ষরই শুধু পাঠান হইয়াছিল। বাদীর এই স্বাক্ষরগুলি ১৯২৯ সালের ল্যাণ্ড্ রেজিষ্ট্রেশনের মামলায় কতকগুলি দলিল সংক্রান্ত ব্যাপারে পাওয়া গিয়াছিল; আর কোন লেখাই পাওয়া যায় নাই।

বাদীর জেরার পরে

বাদীর জেরা শেষ হইবার প্রায় চারি মাস পরে প্রতিবাদীপক্ষ কতকগুলি দলিল দাখিল করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন যে, মধ্যমকুমার তাঁহার নিজের স্বাক্ষর ছাড়া আরো কিছু লিখিতে পারিতেন এবং জেরায় বাদী যাহা যাহা জানেন না বলিয়া দেখান হইয়াছে, তাহার অনেক বিষয়েই কিছু তিনি জানিতেন। এই দাখিলী দলিলগুলি দেওয়ানী কার্য্যবিধির অর্ডার ১৩ নিয়ম ২ ধারা অনুসারে অচল এবং সেগুলি নাকচ করিবার আমি যথেষ্ট কারণ দেখাইয়াছি। বাদীর জেরাতে যে সকল কাগজপত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল, এই দলিলের অধিকাংশই সেই জাতীয়; কিন্তু পার্থক্য এই যে জেরার কাগজগুলিতে অন্যের লেখার নীচে মধ্যমকুমারের শুধু স্বাক্ষর ছিল এবং এই নূতন দাখিলী কাগজগুলির প্রায় ছয়খানাতে "মঞ্জুর (Sanctioned),' অথবা "অনুমোদিত (approved)" প্রভৃতি কথা দেখা যায়। প্রতিবাদী পক্ষ বলেন এই কথা গুলি কুমারের নিজেরই লেখা, কোনও মুহুরী বা সরকারের লেখা নহে। এ বিষয়ে প্রতিবাদী পক্ষ দুইটি যুক্তি দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহারা বলিতে চাহেন বাদী যাহা যাহা জানেন না, তাহা স্থির জানিয়া পরে কুমারের সেই সব যে জানা ছিল সে বিষয়ে প্রমাণ পেশ করিবার অধিকার প্রতিবাদী পক্ষের আছে। দ্বিতীয়তঃ একান্ত নিরক্ষরতা কৌঁসুলীকে বিষম মুস্কিলে ফেলিয়াছে। বোধহয় যে, তিনি

কুমারের বিদ্যাবত্তা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু কুমার তাঁহাকে বর্ণজ্ঞান প্রমাণের অসুবিধায় টানিয়া লইয়াছে। এ যুক্তি মূল্যহীন। এ যুক্তির এই প্রকার অর্থ হয়, বাদীর নিরক্ষরতার এই অবস্থা জানিয়াই কৌন্সিলি কুমারের শিক্ষাকে অযথা বড় করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন। কুমারের শিক্ষার শেষে তাহা যে পর্য্যায়ের ছিল, ইহারা তদনুরূপ দেখাইয়া, সময়ের এই ব্যবধানে তাহা বাদীর শিক্ষার সহিত কতকটা পৃথক হইয়াছে তাহা দেখাইলেই হয়ত ভাল করিতেন।

ধীরস্থিরভাবে দেখিতে গেলে তিন কুমারের শিক্ষার যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাব পদ্ধতিতে উভয়পক্ষই একমত, শুধু ফল সম্বন্ধে মতানৈক্য হইয়াছে। মিঃ চৌধুরী সুশিক্ষার ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোন কার্য্যকারণ সঙ্গতি নাই। বাদী বলিয়াছেন—তাঁহার দুইজন গৃহশিক্ষক ছিলেন,—দ্বারিক মুখোপাধ্যায় ও অনুকূল। তিনি শুধু ইংরেজী ও বাংলা বর্ণমালা এবং এই দুই ভাষাতে নিজের নাম সহি করিতেই শিখিয়াছিলেন। পরে সময়ের অপব্যবহারে তিনি অক্ষর ভুলিয়া গিয়াছেন। তবে ইংরাজী ও বাংলায় নাম সহি করিতে এখনও পারেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যে বর্ণনা দেন, তাহা এই,—তিনি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইন্দুময়ী দেবী ১২৯৬ সালের পূর্ব্বে একজন গৃহ শিক্ষকের নিকট পড়িতেন (তাঁহার বয়স হিসাব করিয়া এই সাল ঠিক করিয়াছেন), এই সময় দ্বারিক মাষ্টার আসেন। বড় কুমারের বর্ণজ্ঞান পূর্ব্বের শিক্ষকের নিকট কতক হইয়াছিল। বড় কুমার ও তাঁহার দুই ভগ্নী নূতন শিক্ষকের নিকট পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার বয়স তখন ৮।৯ বৎসর। ইহার পরে ১২৯৬ হইতে ১৩০০ সালে (ইং ১৮৮৯ হইতে ১৮৯৩) মধ্যে মধ্যম ও তৃতীয় কুমার একই শিক্ষকের নিকট লেখাপড়া শিক্ষা করিতে থাকেন।

লেখাপড়ার কথা

১৩০০ সালে উভয় কুমারই কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। বড়কুমার ইহার পূর্ব্ব হইতেই এই স্কুলে পড়িতেছিলেন। মেজো ও ছোট কুমার সর্ব্বশুদ্ধ মোট ২০।২৫ দিন এই স্কুলে পড়িয়াছিলেন। তাহার পর তাহাদিগকে স্কুল ছাড়াইয়া পুনরায় দ্বারিক মাষ্টার ও অনুকূল বাবুর নিকট পড়িতে দেওয়া হয়। তাহাদের শিক্ষা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না; তবে বড় কুমার কিছু লেখা পড়া করিয়াছিলেন, তিনি ইংরেজী খবরের কাগজও পড়িতে পারিতেন। অপর দুই কুমার পাঠে অত্যন্ত অমনোযোগী ছিলেন, মেজো অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ছিলেন, ফলা বানান পর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়াছিলেন।

১৩০০ সালের পর তিনি মেজোর শিক্ষার বিষয় আর কিছুই বলিতে পারেন না। কিন্তু ১৩০৬ সালের পর যখন কুমারদের ভাগিনেয় বিল্লু একই শিক্ষকের নিকট পড়িতে আরম্ভ করেন, তখনও উভয় কুমারই লালা (অমূল্য) এবং বলার সহিত সেই মাষ্টারদের নিকট পড়িতেছিলেন।

বিল্লুবাবু মেজো কুমারের হাস্যোদ্দীপক কৌতুকের বিষয় এবং তাহাদের পড়িবার ঘরের বিষয় বর্ণনা করেন। পড়ুয়ারা ফরাসের উপর বসিয়া এবং টেবিলের কাজ চালাইবার জন্য একটী ছোট কাঠের বাক্স সম্মুখে রাখিয়া মাত্র পড়িবার অভিনয় করিতেন, এবং শিক্ষক মহাশয় তখন তাঁহার নিজের আবিস্কৃত হিষ্টিরিয়ার পেটেণ্ট ঔষধ সম্বন্ধীয় চিঠি পত্র বিক্রেতাদের নিকট লিখিতেন। কুমারেরা কি কি পুস্তক পাঠ করিতেন, তাহা অবশ্য তাহার ঠিক স্মরণ নাই, তবে তাহারা ইংরেজী এবং বাংলা উভয় জাতীয় পুস্তকই পড়িতেন, এবং ইংরেজীতে এক্স, এব, এট্ প্রভৃতি শব্দ লিখিতে পারিতেন। বড়কুমার অবশ্য এই সময়ে আর পড়াশুনা করিতেন না। রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মেজো ও ছোট কুমারের শিক্ষাও শেষ হইয়াছিল।

বিবাদী পক্ষে কুমারদের শিক্ষার বিষয় ফণীবাবু সাক্ষ্য দেন। ছোটকুমার ও তিনি উভয়েই একবয়সী ছিলেন। তিনি বলেন ১২৯৮ হইতে ১৩০০ সাল—তিনি ও ছোট কুমার চা-কর মিঃ ট্রানসবারীর নিকট শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন, এই সময়ে তাহারা পাঁচ বৎসরের বালক ছিলেন। বৈকালে রাজবাড়ীর স্কুলে তাহারা দ্বারিকা মাষ্টারের নিকট পড়িতেন। মেজো কুমার উভয় মাষ্টারের নিকট বহু পূর্ব্ব হইতেই পড়িতে আরম্ভ করেন; এবং তিনি তাহাদের অপেক্ষা লেখা পড়ায় অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন।

১৩০০ সাল—কুমারেরা ঢাকা স্কুলে পড়িতে যান। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পড়াশুনা সাঙ্গ হয়। এই বিষয় জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীও সকলের সঙ্গে একমত।

১৩০০—১৩০৩—উভয় কুমারই ফিরিয়া আসেন, এবং সাক্ষী তাহাদের সহিত পুনরায় একসঙ্গে পাঠ আরম্ভ করেন।

১৩০৩—সাক্ষী ঢাকা স্কুলে পড়িতে যান।

১৩০৭—মেজো কুমারের লেখা পড়া শেষ হয়।

১৩০৯—সাক্ষী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া স্কুল ছাড়িয়া জয়দেবপুর আসেন। তিনি দুই কুমারকে তাহারই মত ইংরেজীতে ব্যুৎপত্তিশীল দেখিতে পান। ছোট কুমার শুধু বাংলায় একটু কাঁচা ছিলেন। তিনি উভয় কুমারের প্রত্যেক সময়ের শিক্ষার বিবরণ বর্ণনা করেন। ১৩০০ সালে মেজো কুমার অল্প ইংরেজী বলিতে পারিতেন; ছোট খাট অঙ্ক

কষিতে পারিতেন এবং নামতা জানিতেন। ১৩০৩ সালে মেজো কুমার কি কি ইংরেজী বই পড়িতেন, তাহা পূর্ব্বদিন জেবায় বলিতে না পারিলেও পরের দিন বলেন যে মেজো রয়েল রীডার ৩নং পড়িতেন, এবং তিনি ও ছোট কুমার ১নং পুস্তক পাঠ করিতেন। ফণীবাবু কিছু অঙ্কও কষিতে পারিতেন, এবং নামতা বলিতে পারিতেন। নামতা কি তাহা বাদী বুঝিতে পারেন না, তবে ছেলেরা নামতা পড়ে তাহাই তিনি জানেন। সংখ্যা গণনা—তিনি তাহা জানেন না, তবে জবানবন্দীতে অনেক জায়গায়ই 'সংখ্যা' এই কথাটী বলিয়াছেন।

দুইজনই সমান। ফণীবাবু ও মেজোকুমার

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও বিল্লুর কথিত মেজো কুমারের শিক্ষার ইতিহাস হইতে ফণীবাবুর ইতিহাস অনেক বিভিন্ন; তাহারা উভয়েই বলেন যে মেজোকুমার অক্ষর চিনিতেন, সামান্য ফলাবানান জানিতেন এবং সামান্যই লিখিতে পারিতেন। আর এদিকে হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ফণীবাবু বলেন যে উভয় কুমারই ইংরাজীতে তাহার সমান ব্যুৎপত্তিশীল ছিলেন—ছোট কুমার কেবল মাত্র বাংলায় তাহার (ফণীবাবুর) অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন ছিলেন।

ফণীবাবুর এই বিবৃতি একেবারে ডাহা মিথ্যা। প্রথমেই বলিতে হয় ফণীবাবুর অষ্টম শ্রেণীতে স্কুল পরিত্যাগ করার কথা। পূর্ব্ব জবানবন্দীতে ফণীবাবু বলিয়াছেন যে তিনি এণ্ট্রাস ক্লাসে স্কুল পরিত্যাগ করেন। দ্বিতীয়তঃ কোন প্রকারে চা-কর মিঃ ট্রানস্‌বারীকে আমদানী করা হইয়াছে। বিবাদী পক্ষ বলিতে চাহিয়াছেন যে রাজা ছেলেদের সাহেবিয়ানা শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া জনৈক সাহেব শিক্ষক নিযুক্ত করেন। প্রথমে মিঃ হোয়ার্টনের কথাই বিবাদীপক্ষ ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু পরে তাহার চাকুরী ত্যাগ-পত্র প্রমাণ হইবার পর তাহারা ঐ স্থানে মিঃ হোয়ার্টনকে নিয়োগ করেন। ঐ পত্রে জানা যায় যে রাজার মৃত্যুর পর রাণী বিলাসমণি মিঃ হোয়ার্টনকে নিযুক্ত করেন।

জ্যোতির্ম্ময়ীদেবীর সাক্ষ্যে দেখা যায় যে ১২৯৬ সাল হইতেই চা-বাগান উঠিয়া যায় এবং মিঃ ট্রান্সবারীও জয়দেবপুর পরিত্যাগ করেন; তবে তিনি ইহার পর মাঝে মাঝে জয়দেবপুরে আসিলে বড় দালানে থাকিতেন। শুধু ফণীবাবুই বলিয়াছেন যে, তিনি চা-বাগান উঠিয়া গেলেও জয়দেবপুরে রাজার অধীনে কুমারদের শিক্ষার জন্য চাকুরী গ্রহণ করেন। প্রত্যেক সাক্ষীই স্বীকার

করেন যে ১২৯৬ সালে চা-বাগান উঠিয়া যায়, অথচ ঐ সময় মেজকুমারের শিক্ষা আরম্ভই হয় নাই।

তাহার পর ১৩০০ সালে কলেজিয়েট স্কুলে যাইবার বিষয় আলোচনা করা যাক। বিবাদীপক্ষ প্রথমে গঙ্গাচরণকে (বাঃ সাঃ ৯) জিজ্ঞাসা করেন যে কুমার ২ বৎসর যাবৎ স্কুলে পড়িয়াছেন কিনা? যখন এই 'আষাঢ়ে গল্প' ফাঁসিয়া যায়, তখন তাহারা ফণীবাবুর দ্বারা প্রমাণ করাইতে চেষ্টা করেন যে, কুমার প্রায় বৎসর খানিক ঐ স্কুলে পড়িয়াছিলেন। তৎকালীন স্কুলের কয়েকটী ছাত্র আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসিয়া বাদীর বক্তব্যই সমর্থন করেন। তাহারা বলেন যে উভয় কুমারই ১০।১৫ দিনের জন্য স্কুলে আসিয়াছিলেন। তাহারা উভয়েই সর্ব্ব নিম্ন "অষ্টম বী" শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। উভয়ে ফীটনে চড়িয়া পড়িতে আসিতেন, তাহাদের জলযোগের জন্য তাঁবু খাটানো হইয়াছিল। লেখা পড়া কিছুই করিতেন না। কেবলমাত্র খেলা ধুলা নিয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। মোট কথা তাহারা রাজপুত্রের মত স্কুলে আসিবার খেয়াল চরিতার্থ করিতে আসিয়াছিলেন, এবং তাহাই করিয়াছিলেন। ঐ সব ছাত্রদের মধ্যে নিম্নলিখিত, বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের নাম করা যাইতে পারে ; যথা :—

১। আনন্দ রায়—ঢাকার জনৈক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি (বাঃ সাঃ ৭৯২)

২। কামিনীবাবু—(বাঃ সাঃ ৯৯৭) তিনি একই ক্লাসে পড়িতেন।

৩। অমূল্যবাবু উকীল—(বাঃ সাঃ ৯৭৬) ওকালতি না করিলেও তিনি স্বনামখ্যাত পদস্থ ব্যক্তি। সাক্ষ্য দিতে আসিয়া তিনি ভুলবশতঃ বলিয়াছিলেন যে, মহাতাপ ঘোষ ও ঐ সময় অষ্টম বি শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন ; বস্তুতঃ মহাতাপ ঘোষ* তখন উপরের এক শ্রেণীতে পড়িতেন। স্কুলের রেজিষ্টার নাই, এ বিষয়ে কোনই প্রমাণও নাই। রেজিষ্টার থাকুক বা নাই থাকুক ; স্কুলের বিষয় সাক্ষ্য দিতে বহু লোকেই পাওয়া যাইত, কিন্তু বিবাদী পক্ষ কোন সাক্ষীই ডাকেন নাই

ফণীবাবুর মিথ্যা সাক্ষ্য

স্কুলের পাঠ্যাবস্থার বিবরণ বিবাদীপক্ষ যাহা বলিল তাহা সবই মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। ফণীবাবুর তৃতীয় শ্রেণীতে বিদ্যালয় পরিত্যাগের ইতিহাস ; মিঃ ট্রান্সবারীর আবির্ভাব ; কুমারদের ঢাকা পরিত্যাগের পর ফণীবাবুর সঙ্গে পুনরায় একই শিক্ষকের (তত্ত্বাবধানে বিদ্যাশিক্ষার কল্পিত ইতিহাস। বিশেষভাবে মনে রাখিবেন ফণীবাবুরা ১৩০০ সালে নয়াবাড়ীতে উঠিয়া যান) এই সমস্ত ঘটনা ছাড়াও অন্য ঘটনাবলীর দ্বারা মিথ্যা

* সাক্ষ্য দেওয়ার পর কি জানি কেন, ইঁনি আত্মহত্যা করিয়াছেন—প্রঃ

প্রমাণিত হইতেছে। নিজের পুত্রদের অর্দ্ধশিক্ষিত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া রাজা তদীয় পুত্রদের শিক্ষার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ দেখান নাই। কিন্তু ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, একাদিক্রমে নয় বৎসর কিছুকাল গৃহ-শিক্ষকের নিকট পড়িয়া এবং কিছুকাল ফণীবাবুর কল্পিত স্কুলে পড়িয়া কুমারেরা এত অল্পই শিখিবে! কিন্তু বিবাদী পক্ষ যে সমস্ত চিঠি দাখিল করিয়াছেন তাহা পড়িয়া সমস্ত ঘটনা দিবালোকের মতই পরিষ্কার হইয়া যায়। ছোটকুমার বাংলা লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন, উভয় পক্ষই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিয়াছেন যে,বড় কুমারের মৃত্যুর পর ছোট কুমার সংসারের কর্ত্তা হইয়া পুনরায় ভাল করিয়া বাংলা লিখিতে ও পড়িতে শিখেন। ছয়খানা চিঠি (এঃ ৩৮·—৪৩) জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সাক্ষ্য সমর্থন করিতেছে। এই চিঠিগুলির তারিখ দেওয়া আছে; কিন্তু কোন বৎসরের তাহা লিখা নাই; তবে ভিতরের লিখিত ঘটনা পড়িয়া বোঝা যায় যে এই সব চিঠি কুমারের মৃত্যুর পরে লিখা হয়। একখানা পত্রে পানুর কথা আছে, পানু বড়কুমারের মৃত্যুর পর জন্ম গ্রহণ করেন। ইহারই একখানা পত্রে ছোটকুমার সগর্ব্বে লিখিয়াছেন,—"এখন হইতে আমি আমার নিজের হাতে পত্র লিখি, আমি একটু একটু ইংরেজী ও বলিতে পারি; কিন্তু এখনও ইংরেজী লিখিতে পারি না। আপনাদের উপদেশানুযায়ী আমি এখন হইতে ইংরেজী লিখিতেও শিখিব।"

ছোট কুমার যে পূর্ব্ব হইতেই লিখিতে পারিতেন তাহা প্রমাণ করিতে বিবাদী পক্ষ ২ খানি চিঠি দাখিল করিয়াছেন। ইহার একটী ১৩১৪ সালে লিখা। অপরটীতে মাসের তারিখ আছে কিন্তু বৎসর লেখা নাই (এঃ জেড ১৪৫, ১৪৬)। ছোট কুমার যে পরে নূতন করিয়া লিখিতে ও পড়িতে শিখেন ইহা নূতন কথা নহে। কেননা এই বিষয়ে আলোচনা হইবার পূর্ব্বেই ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে একটী সাক্ষী বলিয়াছেন যে, ছোটকুমারও ঠিক মেজকুমারের মতই মূর্খ ছিলেন,তবে পরে অনেকটা শোধরাইয়াছিলেন। এই দুই সেট্ পত্রের মধ্যে কোন গুলি যথার্থ তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে, বাদীপক্ষের পত্রগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে,বহু বৎসর ধরিয়া শিক্ষকের নিকট পড়িয়াও তিনি বিশেষ কিছুই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। এই পত্র লিখিবার সময় ছোটকুমারের বয়স ২১ বৎসর ছিল; কিন্তু যে পত্র তিনি লিখিয়াছেন তদ্দৃষ্টে দেখা যায় যে, ছাপান বই পড়িবার পূর্ব্বে লিখিতে সক্ষম শিশু যে ভাষায় লিখিতে চেষ্টা করে, উহাতে ঠিক সেই ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছে। "আমি" "য়ামি" রূপে এবং "আজ" "য়ায" রূপে ঐ চিঠিতে লিখা হইয়াছে। এই চিঠিগুলি হইতেই বোঝা যায় যে ৭ বৎসর যাবৎ গৃহ

শিক্ষকের নিকট পড়িয়া ছোটকুমার কতটা শিক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন ! এখন আমরা দ্বিতীয় কুমারকে ভালমতে চিনিত এইরূপে সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বাদী পক্ষের ৬২নং সাক্ষী রেবতী বাবু ১৮৯৯ খৃঃ বি, এ, পাশ করিবার পর জয়দেবপুর স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন, এবং ১৯০২ খৃঃ পর্য্যন্ত ঐ চাকরী করেন। মেজো কুমার অত্যন্ত বদমেজাজী ছিলেন, এবং যদি জানিতে পারেন যে তাহাকে রেবতী বাবু ইংরাজী শিখাইতেছেন, তাহা হইলে একটা গোলমাল করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় রেবতী বাবুকে মেজো কুমারের অজানিতে মুখে মুখে ইংরাজী পড়াইতে নিযুক্ত করা হয়। তিনি বলেন মেজো একটাও ইংরেজী শব্দ জানিতেন না; তিনি তাহাকে হ্যাঁ, না, ভাল মন্দ ইত্যাদি শব্দ ইংরেজীতে শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কোনই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মেজো কুমার বুদ্ধিমান লোক ছিলেন কিন্তু "কিছুতেই শিখিব না" এইরূপ তাহার দৃঢ় পণ ছিল।

এই বিষয়ের ইহাই শুধু একমাত্র সাক্ষ্য নয়। উভয় পক্ষের বিশ্বাস্য সাক্ষীদের দ্বারা ইহা সমর্থিত হইয়াছে। বড় কুমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী বলিতে পারিতেন। মিঃ র‍্যাঙ্কিন বলিয়াছেন যে, তিনি দ্রুত ইংরেজী বলিতে পারিতেন, তবে তাহাতে যথেষ্ট ব্যাকরণ ভুল থাকিত। মিঃ কে, সি, দে বলেন যে তাহার কথায় পূর্ব্ববঙ্গীয় টান ছিল। মিঃ ষ্টিফেন (বাঃ সাঃ—১১২) বলেন যে, বড় কুমার তাহার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা আরম্ভ করিলেও মাঝে মাঝে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিতেন; কিন্তু অপর দুই কুমার তাহার সঙ্গে কেবলমাত্র হিন্দীতেই বাক্যালাপ করিতেন। আরও দেখুন :—

হোয়ার্টনসাহেবের পত্র

(১) রাজার মৃত্যুর পর মিঃ হোয়ার্টন তিন কুমারকেই কথ্য-ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হন। তাহার লিখিত ২৫।৭।০২ তারিখের চাকুরী পরিত্যাগ পত্রে অতিশয় বিরক্তির সহিত লিখিয়াছেন (এঃ ৪)

"আপনার পুত্রেরা তাহাদের পাঠেই অবহেলা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; তাহারা ঘৃণাজনক কুৎসিৎ আচার ব্যবহার শোধরাইতে মোটেও চেষ্টা করেন না, ইহাতে আমার নিকট ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আমার উপদেশ গ্রহণ করিতে কিংবা আমার নিকট পড়িতে তাহাদের মোটেই ইচ্ছা নাই।"

বাদী বলিয়াছেন যে, মিঃ হোয়ার্টন তাহাকে কিছুই শিক্ষা দেন নাই।

তিনি শুধু আস্তাবলের তত্ত্বাবধান করিতেন। মিঃ হোয়ার্টনের উপরোক্ত চিঠি এবং আস্তাবলের তত্ত্বাবধান বিষয়ক কতকগুলি ক্ষুদ্র পত্র হইতে বাদীর উক্তি সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। (নং ১৬নং একজিবিট)।

(২) ১৯০৪ খৃঃ মায়ার সাহেব কালেক্টর সাহেবের নিকট এষ্টেটের আমূল অবস্থা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহার নিয়োগকর্ত্রী রাণী বিলাসমণির বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, তাহা লিখিতে যাইয়া বলেন :—(এঃ ২৮৪)

"ছোট কুমারদের সম্বন্ধে যে কোন কিছুই করা যায় না, তাহা আপনার অজ্ঞাত নয়। তাহারা সর্ব্বদাই একশ্রেণীর ছোটলোক সঙ্গীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। এই সব সঙ্গীরা তাহাদিগকে ঠকায় এবং নানারকম আহাম্মকী করিতে প্রবোচনা দেয়। কোন রকম কাজ কর্ম্ম তাহাদের দ্বারা করান একরূপ অসম্ভব। তাহারা আদৌ লেখা পড়া করেন না। বড় কুমার বেশ মহৎ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট একজন যুবক বটেন। যতদিন আমি তাহার সহায়কারী থাকি, ততদিন সমস্ত ব্যাপারই তাহাকে বেশ স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিব। বড় কুমারের কাজকর্ম্ম বুঝিবার বেশ ক্ষমতাও আছে।"

বড কুমার অল্প শিক্ষিত এবং ইংরাজী ভাষায় তাহার সামান্য ভাষা-জ্ঞান ছিল। তাঁহার এবং ছোট কুমারদের মধ্যে কি প্রভেদ ছিল তাহাই তিনি দেখাইতেছেন—ইহা আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। সুতরাং উহাকে যাহা বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা প্রকৃতই সামান্য শিক্ষা বা কোনপ্রকার শিক্ষাই নয় বুঝায়।

(৩) রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ঐ এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি কুমারদের জন্মাবধি জানিতেন, এবং তাহাদের শিক্ষা সময়ে বরাবর জয়দেবপুরে থাকিতেন। তিনি ২৬।৪।০৫ তারিখে বড়কুমারকে এক চিঠি লেখেন। তাহাতে তিনি দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে যদিচ তিনি ঢাকায় আসিয়াছেন, তিনি তাঁহার সহিত দেখা করেন নাই; রায়বাহাদুর তাঁহার সম্প্রতি যে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি ঐ পুস্তকখানি তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে চাহেন, এবং আরও পুস্তক যাহাতে তিনি বাহির করিতে পারেন তজ্জন্য একজন কেরাণীর কথাও লিখিয়াছেন। ঐ পত্রে তিনি আরও লিখিয়াছেন,—ছোট কুমারদের সামান্য একটু ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি করিতে পারেন কিনা—কেননা তাহাদের কর্ম্মচারী, সহচর কিংবা অনুচরগণ তাঁহাদিগকে মহারাজা বলিলে বিশেষ কিছু আসে যায় না—বাহিরের লোকের কাছ থেকে যে সম্মান পাওয়া

যায় উহাই প্রকৃত সম্মান—(এক্সিবিট প্রদর্শনী ৮৯২)। বড় কুমার নিজেই নিরক্ষরের চেয়ে সামান্য একটু উপরে, এবং রায়বাহাদুরের মত অত বড় পণ্ডিতের নিকট সামান্য ইংরাজী মানে কিছুই নয়, সুতরাং বড কুমারকেও উপদেশ দেওয়া হয় নাই—ইহাই বলা হইয়াছে।

(৪) ৯৪৫ নং বাং সাঃ শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয়ের বয়স ৫২ বৎসর। তিনি একজন হাইকোর্টের উকিল এবং পদস্থ ব্যক্তি: তিনি কলিকাতার একজন অধিবাসী এবং নাটোরের মহারাজার জামাতা। তিনি এ পরিবারকে জানেন না। তবে ১৯০২ সালে তিনি ঢাকার 'সুসঙ্গ হাউসে" অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভাওয়াল রাজার ঢাকার বাড়ীতে এক সান্ধ্য ভোজে যোগদান কালে ঐ উপলক্ষে বড় কুমারের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ছোট দুই কুমার ঐ সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন না, এবং মধ্যম কুমার কোথায় ছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি কিছু শুনিয়াছিলেন না। ঐ সম্মিলনে শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয় সুসঙ্গ পরিবারের কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সহিত গিয়াছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের কথা জেরাতে কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলে কুমার তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন, ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অথবা ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে মধ্যম কুমার দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার ল্যান্স্‌ডাউন রোডস্থিত বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। দুই জনই যে তখন কলিকাতা ছিলেন, একথা মানিয়া লওয়া হইয়াছে। দ্বিজেন কলিকাতায় চাকরী করিতেন (দ্রষ্টব্য প্রঃ বি সাঃ ৮৭) সৌভাগ্যবশত—ঐ সময় কলিকাতায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন এবং তাহার সঙ্গে দ্বিজেনের দেখা হইয়াছিল)। লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন দুই জনেই টম্‌টমে আসিয়াছিলেন এবং দ্বিজেন (লাহিড়ীর সহপাঠী) কুমারকে তাহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। মধ্যমকুমার লুঙ্গি পরিয়া আসিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কুমার লাহিড়ী মহাশয়কে তাহার বাসায় যাইবার জন্য বলিয়া দিয়াছিলেন। সাক্ষী তাহার বাসা কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে কুমার বলিয়াছিলেন (ওয়ালিশ আই ষ্ট্রীট) দ্বিজেনবাবু বুঝাইলেন (ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট) এবং সাক্ষীর উহা স্মরণ ছিল: কেননা সাক্ষী কাহাকেও ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীটকে ওয়ালিশ ষ্ট্রীট বলিতে শুনেন নাই, (কিন্তু আমি ৪৩ নং প্রঃ সাঃ এক্সিভিট।) ১৯০৮ সালে কুমারেরা কলিকাতায় ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে আসিবার কথা প্রসঙ্গে ঐ রাস্তার নাম 'ওয়ালিশ আই ষ্ট্রীট' বলিতে শুনিয়াছি।

লাহিড়ী মহাশয়কে গুরুতররূপে জেরা করা হইয়াছে, এবং তাহার সাক্ষ্য

বিশ্বাস যোগ্য হয় নাই, মেজরাণী গম্ভীরভাবে বলিয়াছেন যে তাঁহার স্বামী "ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, একথা যিনি বলিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। রাণীর নিজের সাক্ষীর দিকে দৃষ্টিপাত করুন, দেখিতে পাইবেন তিনি কি বলিয়াছেন। ৭৩৩নং প্রঃ সাঃ মিঃ আর, সি, সেন বার, এট, ল, প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে কুমার ১৯০৫ সালের "ভাইসরয়ের কাপ" ঘোড়দৌড়ে উপস্থিত ছিলেন। এবং ইংরাজীতে কথা-বার্ত্তা বলিতে পারিতেন। সাক্ষী মিথ্যা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, তিনি এক মামলার জন্য একটী ঘটনার সাপক্ষে একটী এফিডেভিট করিয়াছিলেন এবং অন্য মামলার জন্য তিনি উহার বিরুদ্ধে এফিডেভিট করিয়া ছিলেন।

একটী দলিল দ্বারা তাহার সাক্ষ্যের কতকাংশ কিরূপে একেবারে সম্পূর্ণ ওলটপালট হইয়া গিয়াছে, আমি সম্প্রতি তাহার উল্লেখ করিব। এই ভদ্রলোক বলিয়াছেন মধ্যমকুমারের সহিত ১৯০৫ সালের নবেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসে (বরং ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই) তাঁহার দেখা হইয়াছিল, এবং "ভাইস্‌রয়ের কাপ" দিবসে পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। "ভাইসরয়ের কাপ দিবস" ২৬শে ডিসেম্বরে রবিবার না পড়িলে ঐ দিনেই বরাবর হইয়া থাকে। ঐ সালের সম্বন্ধে সাক্ষী খুব নিশ্চিত এবং ঐ সালেই প্রিন্সঅব্‌ ওয়েলসের আগমন হয়। তিনি ১৯০৬ সালের ২রা জানুয়ারীতে আগমন করেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে ২রা এবং ৩রা জানুয়ারী ছুটী ঘোষণা করা হইয়াছিল।

ইংরেজী জ্ঞানে মিথ্যার অবতারণা

ঐ ঘোড়দৌড় দিনে মধ্যম কুমারের সহিত ঘোড়দৌড় মাঠে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাক্ষী বলিয়াছেন, তিনি কুমারকে ডব্লিউ, লেস্‌লি কোং এর মিঃ লেস্‌লীর সহিত আলাপ করাইয়া দেন, এবং জয়দেবপুরের পূর্ব্বকার চা-বাগানের সম্বন্ধে ইংরাজীতে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা হয়, উপরোক্ত চা-বাগান ১৫ বৎসরের অধিক দিন হইল উঠিয়া গিয়াছে। তবুও ঐ সম্বন্ধে আলোচনা হইল। সাক্ষী বলিয়াছেন কুমার ভাঙ্গা ইংরাজীতে মিঃ লেস্‌লীর সহিত কথাবার্ত্তা বলেন। উদাহরণ স্বরূপ সাক্ষী বলেন—কুমার বলিয়াছিলেন "টি গডেন" অর্থাৎ চা-বাগান উঠিয়া গিয়াছে। সাক্ষী বলেন—লেস্‌লী সাহেবের "গডেন" বুঝিতে কষ্ট হইয়াছিল এবং সাক্ষীর তাহা বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল। এক্ষণে দেখা যা'ক "টি গডেন গন্‌" বাঙ্গালীর অথচ বাঙালের ইংরাজী নহে; যে ব্যক্তি ইংরাজী একেবারেই জানে না ইহা তাহারই ইংরাজী। আমার মনে হয় "ওয়ালিশ আই ষ্ট্রীট" কথা ত উহা অপেক্ষা অনেক ভাল ইংরাজী, এবং ঐ সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়।

এইক্ষণ "ইংরাজী" এবং "কাটা চাম্‌চে" সম্বন্ধে এই সাক্ষীর মুখ দিয়া কি বাহির হইয়াছিল তাহা কিছু শুনা যা'ক্। সাক্ষী বলিয়াছেন ব্যারিষ্টার মিঃ জে, এন, রায় 'পেলিটি'র বাড়ীতে এক সান্ধ্য জলযোগের আয়োজন করেন এবং কুমার তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং "কাঁটা এবং চাম্‌চ" দিয়া জলযোগ করিয়াছিলেন। "কুমারের মত শ্রেণীর লোক কি পেলিটির বাড়ীতে যাইবেন—এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলিয়াছেন—"আমি এরূপ বহু রাজাদের জানি, যাহারা ইংরাজীতে একটীও কথা বলিতে জানে না, এবং "পেলিটী'র বাড়ীতে কিরূপ ভাবে চলিতে হয় তাহাও জানে না, অথচ তাঁহারা পেলিটীর বাড়ীতে যান। সাধারণতঃ যে ব্যক্তি 'টি গডেন" উচ্চারণ করেন তাঁহার পক্ষে অবশ্য 'পেলিটি'র বাড়ী যোগ্যস্থান হইবে না, তবে এখানে ব্যাপারটা ছিল অন্যরূপ। কুমার মিঃ রায়কে 'ব্রুহামের' জুড়ী গাড়ী উপহার দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য মিঃ রায় এই সান্ধ্য ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই ভোজে মিঃ গিরিধারীলাল নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, এবং মধ্যম কুমার তাঁহার সহিত হিন্দীতে কথোপকথন করিয়াছিলেন।

এই সাক্ষী "টি গডেন" এইরূপ ইংরেজী তাঁহাকে কেবল মাত্র ঘোড়দৌড় দিবসে কহিতে শুনিয়াছেন, তাহা ব্যতীত আর কখনও মধ্যম কুমারকে ইংরাজীতে কথা বলিতে শুনেন নাই। কুমারের জীবনবীমার প্রস্তাব পত্রে মিঃ জে, এন রায়ের নাম 'বন্ধু'স্থলে লেখা হইয়াছিল, তাহার কারণ পাওয়া গেল। বিবাদীপক্ষ 'ইংরাজী জ্ঞান' প্রমাণ করিবার জন্য সান্ধ্য ভোজের কথা আনিয়াছেন। যদিও শুধু রাজার ছেলেরা কেন রাজারাও ইংরাজী না জানিয়াও ঐ সব ভোজ খাইতে পারেন। দলিলাদির দ্বারা ঐ সব ভোজের সাক্ষ্য খণ্ডন করা হইয়াছে। ঐ সব ভোজ যে ১৯০৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ঘোড়দৌড় দিবসের পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সাক্ষী খুব নিশ্চিত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ২৫শে ডিসেম্বর মধ্যম কুমার জয়দেবপুরে ছিলেন, এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সম্পাদক (Secretary) হিসাবে একখানা চিঠিতে সই করিয়াছিলেন।

কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়

জয়দেবপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক
সমিতির সম্পাদকের নিকট হইতে

শ্রীযুক্ত সিভিল সার্জ্জন, বরাবর—ঢাকা

২৫শে ডিসেম্বর ১৯০৫।

প্রিয় মহাশয়,

আপনার বর্ত্তমান মাসের ২রা তারিখের চিঠি এবং আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে সব চিঠি পত্রের আদান প্রদান হইয়াছে সেই সব চিঠিতে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং যাহাতে অনুগ্রহ করিয়া এই ব্যাপারের সত্বর কোন ব্যবস্থা করেন, তাহার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। ইতি—

(স্বাক্ষর) রমেন্দ্রনারায়ণ রায়
সম্পাদক।

এই চিঠি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কেরাণী বাবু সহি করিবার স্থল দেখাইয়া দেন নাই। এই পত্রের সহি রায় সাহেব যোগেন নিজেই প্রমাণ করিয়াছেন। মিথ্যার ভিতর দিয়া প্রমাণ করিবার জন্য যে চেষ্টা করা হইয়াছে ইহা কেবলমাত্র সেই সিদ্ধান্তকেই দৃঢ় করিয়া দেয়। এমন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের সত্যতা নির্দ্ধারণ করা যাইত, যদিও উহা করিতে যাওয়া নিস্ফল। বাদীপক্ষের বিস্তর সাক্ষী বলিয়াছেন যে, মধ্যম কুমার তাহার নিজের নাম স্বাক্ষর ছাড়া আর কিছু লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন না। আমি সেই সব সাক্ষীদের কতক কতক উল্লেখ করিব। ঢাকার উকিল রেবতী বাবুর (বাঃ সা নং ৬২) নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মিঃ ষ্টীফেনের কথাও বলিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন—ছোট দুই কুমার তাঁহার সহিত হিন্দীতে কথা বলিতেন। ১৫৫নং বাদীর বিশিষ্ট সাক্ষী মণীন্দ্র বসু এম, এ, যিনি বর্ত্তমানে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এবং পূর্ব্বে জয়দেবপুর স্কুলেই সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, মধ্যম কুমার ইংরাজী জানিতেন না। তিনি তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় ইহাও দেখিয়াছেন যে সাধারণ বাংলার সঙ্গে ইংরাজী শব্দ মিশাইয়া কথা বলিলে কুমার বুঝিতেন না। জয়দেবপুর স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক যোগেশ রায় বলিয়াছেন—মধ্যম ও তৃতীয় কুমারকে কখনও ইংরাজী বলিতে শুনেন নাই। ব্যারিষ্টার মিঃ এন, কে, নাগ, যিনি যুবা বয়সে মধ্যম কুমারের সহিত খুব ঘনিষ্ট ভাবে মিশিয়াছেন, কুমারকে একটী ইংরাজী শব্দও উচ্চারণ করিতে কখনও শুনেন নাই। মিঃ পি, সি, গুপ্ত ইঞ্জিনিয়ার 'হাউ ডু ইউ ডু' (আপনি কেমন আছেন) এ কথাটীও কখনও কুমারকে ব্যবহার করিতে শুনেন নাই। পুরাতন কর্ম্মচারীরা তাঁহার নিকটে পেশ করা কাগজ পত্রে তাহাকে সহি করিতে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা খুব সচরাচর নহে। ৮৯নং বাঃ সাঃ মিঃ জি, সি, সেন (জীবন বীমার এজেণ্ট), যাহাকে মিথ্যা সাক্ষী এবং তিনি কখনও

এজেণ্ট ছিলেন না বলিয়া আক্রমণ করা হইয়াছিল,—অবশ্য যতদিন না বীম'র ডাক্তারের রিপোর্ট না আসিয়াছিল, এবং উহা স্কট্‌ল্যাণ্ড থাকায় পাওয়া যাইবেনা এইরূপ মনে হইয়াছিল, তখন একথা মনে করিয়াই ঐরূপ আক্রমণ করা হইয়াছিল। উক্ত মিঃ জি. সি, সেন আদালতে শপথ করিয়া বলিয়াছেন ডাক্তার কেডী যে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, প্রতি প্রশ্নই কুমারকে বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল, তাঁহাকে যে জায়গায় সহি করিতে বলা হইয়াছিল তিনি কেবলমাত্র সেই সব জায়গায়ই সহি করিয়াছিলেন। পলিসিতে কি সর্ত্ত ছিল তাহা তিনি জানিতেও চাহিতেন না। তিনি সে রকমের লোকই ছিলেন না। সাক্ষীর ধারণা কুমার সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন, তবে কষ্টে স্বষ্টে নাম সহি করিতে পারিতেন।

বাবু সন্ন্যাসীচরণ রায় ঢাকায় ৩০ বৎসর ধরিয়া ওকালতি করিতেছেন। তিনি সদর লোক্যাল বোর্ডের একজন ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান, জেলা বোর্ডের একজন ভূতপূর্ব্ব সদস্য এবং সম্পত্তিশালী বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি ১৮৯৭ কি ১৮৯৮ সালে একদিন পুলিশ সাহেব মিঃ টাকারেব বাড়ীতে তিন কুমারকে দেখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কুমারের বয়স তখন ১৪ বৎসর হইবে। রায় বাহাদুর কালী প্রসন্ন ঘোষ ম্যানেজার কুমারদিগকে লইয়া পুলিশ সাহেবের বাড়ীতে যান। "মিঃ টাকার কুমারদের ইংরাজীতে কতিপয় প্রশ্ন করেন, কিন্তু তাহারা জবাব দিলেন না। কেবল মুচকি হাসি হাসিলেন, তখন মিঃ টাকার বাংলায় কথা বলিলেন, এবং কুমারেরা বাংলায় উত্তর দিলেন, কুমারদের প্রত্যেকই কথা বলিয়াছিলেন কিনা আমি বলিতে পারিনা। তবে বড় কুমার যে কথা কহিয়াছিলেন এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

কুমারের শিক্ষা ১৯০০ সালে শেষ হয়। উহার পরে তিনি কোন পুস্তক পড়িয়াছিলেন কিনা, কিংবা কোন পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন কিনা এ বিষয়ে কোন পক্ষই কোনরূপ ইঙ্গিত করেন নাই।

মিঃ ষ্টেপ্‌লটনের কথা

১৯০৬ সালে পূজার পরে স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ষ্টেপ্‌লটন, জয়দেবপুরে রাণী বিলাসমণি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের কথা ১৪নং প্রঃ সাক্ষী জনৈক শিক্ষক বলিয়াছেন। ৯০৯নং বাদীর সাক্ষী ঈশ্বরগঞ্জের উকিল মিঃ যোগেশ রায় তখন এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন যে এই উপলক্ষে মধ্যমকুমার পাজামা ও চাপকান পরিয়া সেক্রেটারী রায় সাহেবের সঙ্গে মিঃ ষ্টেপলটনকে ঢাকায় যাইবার সময় ষ্টেসনে

গিয়াছিলেন। এবং ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের পরিদর্শনের জন্য, তাঁহার সম্মানার্থে স্কুল বন্ধ দেওয়া হইয়াছিল, তিনি বলেন মিঃ ষ্টেপলটন, মধ্যম কুমার এবং রায় সাহেব ষ্টেসনের বসিবার ঘরে ট্রেণের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিলেন, এবং সেক্রেটারী সাহেবের সহিত কথা বলিতেছিলেন। সেক্রেটারী বাহিরে গেলে সাহেব মধ্যম কুমারকে ইংরাজীতে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। মধ্যমকুমার নীরব ছিলেন, এবং কোন কথাই বলেন নাই। সেক্রেটারী আসিয়া সাহেবকে বলিলেন যে কুমার ইংরাজি জানেন না। তখন মিঃ ষ্টেপলটন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আমি বাংলায় উহার সহিত কথা বলিব।

রায় সাহেব প্রায় সমস্ত ঘটনাই স্বীকার করেন, কেবল তিনি বলেন যে কুমার ইংরাজী জানিতেন। এ বিষয়ে সকল সাক্ষীর কথাই বিবেচনা করা প্রয়োজন করে না। কোনও বিশেষ সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতার উপর সিদ্ধান্ত খাড়া করিবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে প্রমাণের ভার প্রতিবাদীর উপর, কিন্তু ইহার বিপরীত দিকটা প্রমাণিত হইয়াছে। মিঃ হোয়ার্টনের চিঠি, মেয়ারের রিপোর্ট, রায় বাহাদুর কে, পি, ঘোষের চিঠি, ঔষধালয়ের চিঠি, এগুলি আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। প্রতিবাদীপক্ষের নিজেদের সাক্ষী ইংরেজীতে "Tea goden gan" টি গডেন গ্যান পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। "ওয়ালিশ-আই-ষ্ট্রীট" কথাটাও রহিয়াছে, যাহা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে, মধ্যম কুমার বলিতেন। প্রতিবাদী পক্ষের রায় বাহাদুর এস্, পি, ঘোষ জয়দেবপুরে থাকিতেন, এবং বলিতে গেলে কুমারদের সহিতই তিনি লালিত পালিত হইয়াছিলেন। প্রতিবাদীপক্ষ কুমারের শিক্ষা সম্বন্ধে যে তাঁহাকে একটিও প্রশ্ন করেন নাই, তাহা একেবারে বিনা কারণে নহে। জেরায় তিনি,—"তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় তিনটি ভাই একত্রে অল্প অল্প লেখা ও পড়া অভ্যাস করেন। পরে পিতার মৃত্যুর কিছু পরে তিনি অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠেন। আমি কেমন করিয়া বলিব তিনি কি করিতেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত খারাপ হয়।"

কুমারের ইংরেজী জ্ঞানের সাফাই সাক্ষী

ইহা সত্ত্বেও মধ্যমরাণী, ছোটরাণী, ফণীবাবু, বীরেন্দ্র (বাঃ সাঃ ২৯০) রায় সাহেব (প্রঃ সাঃ ৩১০), সত্যবাবু (প্রঃ সাঃ ৩৮০) এবং আরও কতকগুলি তাঁহাদের পক্ষীয় সাক্ষী আসিয়া বলিতেছেন যে, কুমার ইংরাজীতে কথা বলিতে পারিতেন। সত্যবাবু আরও বলেন যে, তিনি তাঁহাকে শিক্ষিত লোক বলিবেন। তিনি ইহার কম কিছু বলিতে পারিলেন না। মাননীয় উকিলকে যে পরামর্শ

দেওয়া হয় তাহা এই যে, কুমার শিক্ষিত এবং খুব আদবকায়দা দুরস্ত ছিলেন। মিঃ কে, সি, দে মহাশয় রেলওয়ে ষ্টেশনে এবং উদ্যানসম্মিলনে যে তিন ভ্রাতার সঙ্গে একত্র কয়েক মিনিটের জন্য সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুনিশ্চিত স্মৃতি, অথবা ছোট কুমারকে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যখন লেফ্টনান্ট হোসেন বিলিয়ার্ড খেলার কথা চাপা দিবার জন্য পার্ক ষ্ট্রীটে রাখিয়াছিলেন, এবং যে সব ভোজের কথা জেরায় টিকিতে পারে না এবং যাহার সহিত ঢাকায় মেজকুমারের প্রীতি, তাহার কলেজ জীবনের অজ্ঞাত বিচ্ছেদ দ্বারা চাপা পড়িতে পারিত,—তাহার বিবরণী এই সিদ্ধান্ত সন্দেহের বাতিল করিতে পারে না। মিঃ র‍্যাঙ্কিনের সাক্ষ্য পড়িয়া Tea goden gonএ বিশ্বাস লওয়াইয়া দেয়।

মিঃ র‍্যাঙ্কিনের কথা

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ২রা আগষ্ট হইতে তিনি আর ঢাকা জিলার কালেক্টার ছিলেন না, এবং তারপর প্রায় ২৯ বৎসর পরে এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৬ বৎসর পর সাক্ষ্য দিতেছেন। তিনি যখন কালেক্টার ছিলেন তখন এই তিন কুমার মাঝে মাঝে সম্ভ্রম দেখাইবার জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিতেন। তাঁহারা প্রায়ই একত্রে আসিতেন, যদিও কখনও কখনও এই নিয়মের অন্যথাচরণ করা হইত। তিনি বলেন যে যখন কনিষ্ঠকুমার দ্বয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, তাঁহাদের সহিত আর এক ব্যক্তি ইংরাজীতে কথা বলিতে সহায়তা করিতে আসিতেন। তাঁহার স্মরণ আছে যে বড় কুমার বেশ তাড়াতাড়ি ইংরাজীতে কথা বলিতে পারিতেন, যদিও তাহার ইংরাজীতে ব্যাকরণের অনেক ভুল থাকিত, এবং দ্বিতীয়কুমার কখনও যে তাহার সহিত একাকী দেখা করিয়াছে বলিয়া তাহার বিশেষ কোন ঘটনার স্মরণ নাই। সুতরাং তাহার স্মৃতি যে কতটা ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত তাহা বলা শক্ত; কিন্তু যে ব্যক্তি তাহাদের সহায়তা করিতে আসিতেন। তিনি সাক্ষ্য প্রদানকালে বলিয়াছেন যে, তাহার উচ্চারণ একজন শিক্ষিত বাঙ্গালীর চেয়ে অনেক খারাপ এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে দ্বিতীয় কুমার তাহার উত্তর দিতেন এবং বড়কুমার সাধারণভাবে কথা বলিতেন—এই সব বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমার মনে হয় যে, দ্বিতীয় কুমারের ইংরেজীভাষার উপর সামান্য দখল ছিল।

আমি দেখিয়াছি যে ছোট লাটের সহিত দেখা করিবার জন্য যে সব অনুমতি পত্র আসিত, সেগুলি বড়কুমারের নামেই পাঠান হইত, এবং ঐগুলিতে তাহার ভ্রাতাগণের সহিত আসিবার অনুরোধ থাকিত (২ × ২৮৫ – ২৮৫ (৪))।

আমি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে মিঃ অ্যানেম যিনি মিঃ র‍্যাঙ্কিনের পর কালেক্টর হইয়া আসেন তিনিও বড়কুমারকে তাহার ভ্রাতাগণের সহিত আসিতে অনুরোধ করিতেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের পরও তাহাকে ভাইদের সহিত আসিবার জন্য অনুরোধ করা হইত। আমার মনে হয় যে বড় কুমারের মৃত্যুর পর ছোট কুমার সব সময়ে অন্য কাহারও সঙ্গে বাহির হইতেন। দ্বিতীয় কুমারের কেরাণী, বীরেন্দ্র যিনি এখনও কাজ করিতেছেন (প্রঃ সাঃ ২৯০) বলেন যে তিনি কখনও দ্বিতীয় কুমারকে একাকী সাহেবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দেখিয়াছেন বলিয়া তাহার স্মরণ নাই। বড়কুমারের মৃত্যুর পর ছোট কুমারকে একাকী কিংবা অন্য কাহারও সহিত যাইতে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন এই ব্যক্তি যোগেন্দ্রবাবু, কিন্তু যোগেন্দ্র একথা অস্বীকার করেন।

ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইংরেজীভাষা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যে দুই একটি ইংরেজী শব্দ শিখে, তাহা ছাড়া দ্বিতীয় কুমার আদৌ ইংরেজী জানিতেন না। বাদী সাক্ষ্যপ্রদান কালে যে সব কাজের কথা ব্যবহার করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় কুমার যেরূপ ইংরেজীতে কথা বলিয়াছেন, তাহাকে যদি ইংরেজী বলা যায়, তবে আজ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের পর যে ২৪ বৎসর গত হইয়াছে এবং উহার মধ্যে ১২ বৎসর কাল ঢাকার বাহিরে এবং ঢাকার স্থানীয় সংযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সন্ন্যাসীগণের সহিত কাটাইয়া দুর্দ্দশায় পড়িয়াছেন। তাহাকেও সেই অবস্থায় পড়িতে হইবে। তাহাতে মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা সরাইবার ইহা অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক ষড়যন্ত্রের বিষয় কল্পনা করা যায় না, কিন্তু ইহার প্রতি অংশ সত্য ঘটনা দ্বারা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। একজন গ্রাম্য রাজকুমারকে সাহেব করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইল। রাজা তাহাকে সাহেবিয়ানা শিখাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন এবং মিঃ হোয়ারটর্নকে গৃহশিক্ষক ভাবে নিযুক্ত করিবার কথা হইল। হোয়ার্টর্ন চলিয়া যাইবার পর মিঃ ট্রান্সবেরিকে শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু অনেক দিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিবার ফলে আবার তাহাকে নূতন করিয়া অক্ষর পরিচয় হইতে আরম্ভ করিতে হইল। এবং যখন দেখা গেল যে গৃহশিক্ষকের চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষা ফলবতী হইল না, তখন তিনি আদবকায়দা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। বড়দালান হইতে ভোজ উঠিয়া গেল। লর্ড কিচেনারের সহিত ভোজ স্থানান্তরিত করা হইল। গুদামের ভিতরে খাওয়ার ঘর ছিল না। তারপর ইংরেজী পোষাক, সাহেবী খানা, হোটেলে ভোজ, সাহেবদের সাহচর্য্য এবং ইংরেজ খেলোয়ারের শব্দসমূহ শিখাইবার চেষ্টা চলিতে লাগিল।

কলিকাতায় মেজকুমার

অবশেষে এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নারীকে লইয়া কুমার যখন কুৎসিৎ ব্যারামের চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন, তখন কুমার এক মণিকারের দোকানে আসিয়া ইংরেজীতে কথা বলেন এবং সেই রমণীর জন্য ৭০০০৲ টাকার গহনা খরিদ করেন। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, দ্বিতীয় কুমার আদৌ ইংরেজী জানিতেন না। এবং বাদীর আজ পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাষার জ্ঞান সম্বন্ধে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় নাই।

লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল পুলির কথা উল্লেখ করিবার দরকার নাই। আমি পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, তাহার সহিত লর্ড কিচনারের শিকারের পূর্ব্বে কুমারের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা গেজেট দ্বারা এবং তাহার উক্তি যে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে বড়কুমার ভিন্ন অন্য কোন কুমারকে দেখেন নাই, ইহা দ্বারা নিরাকৃত হয়; এবং ইহাও আমি নির্দ্দেশ করিয়াছি যে তাহাকে এমন কতকগুলি জিনিষ বিশ্বাস করান হইয়াছে, যে সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞাত ছিল না। দ্বিতীয় কুমারের ইংরেজী পদের উপর জোরের কথা মিথ্যা ইহা তিনি স্বীকার. করিয়াছেন। মিঃ এবং মিসেস মেয়ার, হোয়ারটনকে অবসরগ্রহণ করিবার পর জয়দেবপুরে গিয়া দেখা করেন।

বিবাদীপক্ষের কথা

বাদীর সাক্ষী শেষ হইলে প্রতিবাদীগণ হাইকোর্টের নিকট হইতে ১৯০৫ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ দেওয়া একখানা ১০,০০০ টাকার কুমারের লিখিত হ্যাণ্ডনোট চাহিয়া পাঠাইলেন। তাহার স্বাক্ষরের নীচে দশ হাজার টাকা লেখা দেখিয়া মনে হয়, যেন উহা কুমারের দ্বারাই লিখিত। মিঃ জি, সি, সেন কর্ত্তৃক যাহাকে মিথ্যা সাক্ষী বলিয়া উক্ত হইয়াছিল এবং যিনি আদৌ জীবন বীমার এজেণ্ট ছিলেন না, তিনি এই ঋণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন। তিনি এবং জমিদারীর কেরাণী শ্রীশচন্দ্র রায় এই ঋণ সত্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইহার ফলে ১৯০৯ সালে convart decase হয়। মিঃ সেনকে ঐ বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। শ্রীশ রায়কে ডাকা হয় নাই। এবং রায়সাহেব, শশীবাবু এবং সত্যবাবু এই তিনজন সাক্ষী বলিয়াছেন যে দশহাজার এই শব্দগুলি কুমারের হস্তলিখিত; এবং হস্তাক্ষর বিশিষ্ট মিঃ হার্ডিলেস যখনই দরকার হয়েছে তখনই তিনি অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি এই সাক্ষিগণের সাক্ষ্য হইতে কিছুই সিদ্ধান্ত করিব না, কারণ এই হ্যাণ্ডনোটের কথা মিঃ সেন ৫।২।৩৭ তারিখে উল্লেখ করিয়াছেন এবং যদিও হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ আসিয়া চলিয়

গিয়াছেন এবং বাদী তাহাকে জেরা করিয়াছেন। তথাপি হ্যাণ্ডনোট একবৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে চাওয়া হয় নাই। এবং যদিও মিঃ সেন সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, তিনি ইহা সম্পাদনের সময় উপস্থিত ছিলেন, তথাপি সাক্ষ্যদান কালে বলিয়াছেন যে বীমা করিবার সময় এবং হ্যাণ্ডনোট সম্পাদনের সময় তাহার ধারণা এইরূপ ছিল যে, কুমার নিরক্ষর ছিলেন, যদি ধরিয়া দেওয়া হয় যে কুমার "দশহাজার" এই শব্দদ্বয় লিখিয়াছেন, তথাপি ইহা বলা চলে না যে কুমারকে অন্য কেহ বানান বলিয়া দেয় নাই। ইহা দ্বারা কোনমতেই ইহা প্রমাণিত হয় না যে কুমার ইংরেজীতে কথা বলিতে পারিতেন। তবে একটি কথা বেশ ভালভাবেই প্রতীয়মান হয় যে তিনি যখন গৃহশিক্ষকের শিক্ষাধীন ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই হস্তলিপি অভ্যাস করিয়াছিলেন অন্যথা তিনি নিজের নাম সই করিতে পারিতেন না। এই বিষয় "হাতের লেখা" শীর্ষক বিষয়ের সম্পর্কে আলোচনার সময় করিব।

বাদীর অঙ্ক-জ্ঞান

আমি কেবলমাত্র আর একটি বিষয়ে বলিব। বাদী জেরার সময় বলিয়াছে যে সে গণনা করিতে জানেনা, এমন কি ১ হইতে ১০ অথবা ১০ হইতে ২০; ৬০ হইতে ৭০ ও গণনা জানে না। সে দুইটি ক্ষুদ্র সংখ্যার বিয়োগফলও বলিতে পারে না। আমি একথা বিশ্বাস করিনা যে, সে গণনা করিতে পারে না। যদিও সে একজন 'প্রতারক' হয় তথাপি সে বহু জিনিসের কথা, এবং পরিমাণ জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করিয়া বলিতেছিল; যথা—এত গুলি হাতী, এতগুলি ঘোড়া এবং ইহাও বিশ্বাস করি না যে মেজকুমার সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে গণনা দরকার, অথবা দিনের ঘণ্টা বলিতে কি বুঝায় তাহা জানেন না। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিয়াছেন যে তিনি বিশেষ কোন সংখ্যা পর্য্যন্ত গণনা করিতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি না যে বাদী ১০ টাকা ২০ টাকা বলিতে কি বুঝায় তাহা জানে না, কারণ নিতান্ত নিরক্ষর ব্যক্তিও সংখ্যা এবং পরিমাণসূচক শব্দ বোঝে, যদিও একক্রমে গণনা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং দ্বিতীয় কুমার দশ টাকা এবং কুড়ি টাকার পার্থক্য জানিত কি না, অথবা সে দশজন লোক এবং কুড়িজন লোকের মধ্যের বিভিন্নতা বুঝিত কি না, এবং যদি কুড়ি টাকা দিতে গিয়া সে দশ টাকা দেয় তবে, উহার পার্থক্য বুঝিতে পারিবে কিনা—এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। তাস দেখিয়া সে কুড়ি গণনা করিতে পারে কি না, প্রশ্নেরও কোন মূল্য নাই। যে ব্যক্তির জ্ঞানের পরিমাণ জানা নাই সে ব্যক্তি ঐরূপ

গণনা করিতে পারে কিনা, ইহা কেহই বলিতে পারে না ! ইহা বলা সম্ভব যে, কোন ব্যক্তি, সে কৃষকই হউক আর রাজাই হউক, জীবনে সংখ্যার ব্যবহার না করিয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক হইয়াছে। হিসাব রাখিবার জন্য দ্বিতীয় কুমারের একজন কেরাণী ছিল, এবং আমি মনে করি না যে তাহাকে কখনও কোন বিয়োগ করিতে হইয়াছে ; ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, একজন লক্ষাধিপতি ব্যক্তি হলধর রায়, যে এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়াছে, সে ১৩১৩ কে ১৩৪০ হইতে বিয়োগ করিতে পারে নাই ।

বাদী বাঙ্গালায় রমেন্দ্রনারায়ণ রায় নামটি লিখিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধভাবে কোন অংশ কি, তাহার একমাত্র (ম) অক্ষরটি ভিন্ন অন্য কিছুই বলিতে পারে না। সে আর জানে যে (ন্দ্র) একটি যুক্তাক্ষর, কিন্তু ইহাকে সে (দইন্ত) বলে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সে অক্ষরগুলি চেনে না। ইংরাজীতেই হউক বা বাংলায়ই হউক নাম স্বাক্ষর তাহাব নিকট একটি চিহ্নমাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। হাতের লেখার মধ্যে আমাকে ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে এই লেখা তাহার শৈশবকালের শিখা বিদ্যার শেষ চিহ্ন, না পরবর্ত্তী কালের অর্জ্জিত জালিয়াতি, কারণ ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে স্বাক্ষরগুলি কুমারের স্বাক্ষরের সহিত মিলিয়া যায়, এবং যে সাদৃশ্য দেখা যায় উহা সম্পূর্ণ বিকৃতির পরিচায়কমাত্র।

হস্তাক্ষর বিষয়ক কথা

দ্বিতীয় কুমারের বাঙ্গালা হাতের লেখার নিদর্শনস্বরূপ তিন ভাই একত্রে স্বাক্ষর করিয়া মায়ের নিকট যে চিঠি লিখিয়াছেন, উহাতে একটি মাত্র স্বাক্ষর এবং একখানি বাদে আরও নয়খানি চিঠি, যাহা তিনি স্ত্রীর নিকট লিখিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে। যেখানির সম্বন্ধে সন্দেহ আছে সেখানি তাহার ভগ্নী প্রভাবতী দেবীর নিকট লেখা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। (Ex2)র স্বাক্ষর স্বীকার্য্যরূপে আসল এবং উহাই উল্লিখিত পত্রগুলির সহিত তুলনা করিবার একমাত্র মাপ কাঠি। বাদী ঐ পত্রগুলি লিখিয়াছে, একথা অস্বীকার করে, এবং যে সব সাক্ষী তাহার শিক্ষার সম্বন্ধে বলিয়াছে, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, এবং বিল্লু এবং যাহারা তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিত, তাহারা বলেন যে পরবর্ত্তীকালে তাহার পক্ষে বাঙ্গালা লেখা অসম্ভব। ইহা অতি স্পষ্ট যে দ্বিতীয় কুমার অত্যল্প মাত্র বাঙ্গালা লিখিতেন এবং এমনকি কদাচিৎ নাম স্বাক্ষর করিতেন, নতুবা প্রতিবাদীর জবাব সম্পর্কিত চিঠিগুলি ভিন্ন একটি মাত্র স্বাক্ষরে তাহা নিবদ্ধ থাকিবে না। জমিদারীর কোন

কাগজপত্রে তাহার স্বাক্ষর নাই। বাদীপক্ষের একজন মোসাহেব যতীন (বাঃ সাঃ ৯) ভিন্ন অন্য কোন সাক্ষী তাহাকে বাঙ্গালায় লিখিতে দেখে নাই। যতীন বলে যে একদিন তাহাকে দিয়া বাঙ্গালায় তাহার খুড়ীমার নিকট একখানি চিঠি লিখাইয়া লইয়াছিল এবং উহাতে তিনি বাঙ্গলায় নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। বিবাদীপক্ষের কেহ দ্বিতীয় কুমারকে বাঙ্গলায় লিখিতে দেখে নাই। তর্কবিষয়ক চিঠিগুলি কুমারের হাতের লেখা ভিন্ন তাহাদের সাক্ষ্য হইতে অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, ইহাদের নাম ফণীবাবু, রায় সাহেব (প্রঃ সাঃ ৩১০) ছোটরাণী এবং বীরেন্দ্র (প্রঃ সাঃ ২৯০)। তাহা আমার বিশ্বাস হয় না যে, ইহাদের মধ্যে কেহ দ্বিতীয় কুমারকে বাঙ্গালা লিখিতে দেখিয়াছে। একমাত্র ছোটরাণী বলেন যে, তিনি দ্বিতীয় কুমারকে দ্বিতীয় রাণীর নিকট লিখিত চিঠি দেখিয়াছেন। তাছাড়া অন্য কেহ তাহাকে বাঙ্গালা লিখিতে দেখিয়াছে বলিয়া বলেন না। আমি বিশ্বাস করিনা যে এই মহিলা দ্বিতীয় কুমারের কোন চিঠি কখনও দেখিয়াছেন, এবং তিনি কোন হাতের লেখা পুনঃ পুনঃ না পড়িয়া এবং সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা না করিয়া কোন মতামত প্রকাশ করিবেন। সুতরাং এই বিতর্কিত চিঠির বিষয় একমাত্র দ্বিতীয় রাণীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে; বাদীকে হারাইবার জন্যে পত্রগুলি জাল করা হইয়াছে এতদ্ভিন্ন অন্য প্রশ্ন নাই, এই পত্রগুলি আসল হইয়া তাহাকে পরাস্ত করিতেছে।

উপরিউক্ত চিঠির মর্ম্ম সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি যে কুমারগণ স্বল্পকাল অবস্থানের জন্য প্রায়ই ঢাকায় আসিয়া নিজেদের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। এখানে অবস্থানকালে জয়দেবপুর হইতে ঢাকায় পিয়নেরা আসিত, এবং সাক্ষ্যে বলা হইয়াছে যে অধিকাংশ চিঠিগুলি ঢাকা হইতে সংবাদ বাহকের সঙ্গে জয়দেবপুরে পাঠান হইত। পত্রগুলির তারিখ এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং সেগুলির মর্ম্ম এইরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে—

(১) ২৫শে শ্রাবণ ১৩০৯—X(৯) Z (১৪২) (১)

লাটসাহেব আগামীকল্য ১২টার সময় আসিবেন, এবং রাত্রি কমিশনারের বাড়ীতে কাটাইবেন। অদ্য অপরাহ্নে কমিশনারের সহিত আমি দেখা করিয়াছিলাম। আমি বাড়ী গিয়া তাহার সহিত আমার যে সব আলাপ হইয়াছে তাহা তোমাকে বলিব।

(২) ৩০শে বৈশাখ ১৩১১—X (7) Z (143).

প্রভাকে, শালী, দ্বিতীয় রাণীর ছোট বোন প্রভৃতি লেখা হইয়াছে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে :—

এতদিন পর্য্যন্ত তোমার নিকট হইতে কোন পত্র না পাইয়া আমি ভাবিয়াছিলাম যে তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছ। আশা করি তুমি আমার নিকট সর্ব্বদা পত্র ব্যবহার করিবে। এই চিঠি হইতে বুঝা যায় যে এই দুইজনের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে চিঠিপত্রের আদান প্রদান ছিল।

(৩) ৯ই শ্রাবণ, ১৩১২ বুধবার—X (৮) Z (১৫২)

ঢাকা হইতে জয়দেবপুর দ্বিতীয় রাণীর বর্ণনানুযায়ী—

অশ্বিনীবাবুর সহিত দেখা হইয়াছিল। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিবেন, এবং তিনি যেমন বলিবেন আমরা তদনুযায়ী কাজ করিব। লাটসাহেব আসিবেন কি, না আসিবেন এখনও জানিতে পারি নাই।

চিঠি-পত্রের কথা

(৪) ১২ই ভাদ্র ১৩১২ (২৮।৮।০৫)

ঢাকা হইতে জয়দেবপুর ছোটরাণীর বর্ণনানুযায়ী—বৃষ্টির জন্য মিছিল বাহির হইতে পারে নাই। আমি প্রাতঃকালে নূতন ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিব।

(৫) ১৯শে পৌষ, ১৩১২—Ex z (১৪২) (৩)

দ্বিতীয় রাণীর বর্ণনানুযায়ী ঢাকা হইতে জয়দেবপুর অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে উল্লেখ আছে যে, চার পাঁচ দিনের পূর্ব্বে আমি গৃহে ফিরিতে পারিব না, কারণ এখনও লাটসাহেব ঢাকায় পৌছেন নাই। তিনি আগামীকল্যের পরের দিন আসিবেন।

(৬) ১১ই শ্রাবণ ১৩১২—

দ্বিতীয় রাণীর বর্ণনানুযায়ী ঢাকা হইতে জয়দেবপুর—

অন্যান্য বিষয় প্রসঙ্গে বলেন—

ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে আজ দেখা হইয়াছে। আগামীকল্য স্যাভেজ সাহেব এবং র‍্যাঙ্কিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করিব এবং তাহাদের সহিত দেখা করিয়া ৫টার সময় লাটসাহেবের সহিত দেখা করিব।

(৭) ১২ই শ্রাবণ ১৩১২

অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে উল্লেখ আছে ;

লাটসাহেবের সহিত দেখা হইয়াছে। আগামীকল্য র‍্যাঙ্কিন সাহেবের সহিত দেখা করিব।

(৮) ১৯শে পৌষ ১৩১২

রাণীর বর্ণনানুযায়ী জয়দেবপুর হইতে কলিকাতা। দ্বিতীয় রাণী তখন

ধর্ম্মতলার বাড়ীতে ছিলেন (পূর্ব্বের বর্ণনা দ্রষ্টব্য)। অন্যান্য বিষয় প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, যতদিন তুমি ওখানে আছ, আমার নিকট প্রত্যহ চিঠি লিখিও। ২৪শে তারিখ আমাদের যাত্রার দিন স্থির করা হইয়াছে। মা আমার সঙ্গে যাইতেছেন।

(৯) ১৬ই বৈশাখ ১৩১৫

সত্যবাবুর বিবাহের জন্য রাণী তখন সেখানে গিয়াছিলেন। রাণীর বর্ণনানুযায়ী জয়দেবপুর হইতে উত্তরপাড়া অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে চিঠির উল্লেখ আছে।

আমি ক্রমান্বয়ে চার পাঁচখানা চিঠি লিখিয়াছি, কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই। ২০শে তারিখ রওনা হইব। পত্রগুলি কোর্টে ১৯।১।৩২ তারিখে শীলমোহর করা খামের মধ্যে করিয়া দাখিল করা হয় এবং বাদীকে জেরার সময় তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল। সে অবশ্য ঐ সমস্তই অস্বীকার করে এবং সত্যই তাহার পক্ষে ঐগুলি অসম্ভব ছিল।

আমি চিঠিগুলি সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিয়াছি, এবং হস্তলিপি বিশেষজ্ঞদের মতামত বিবেচনা করিয়াছি। আমি এখনই সেই মতের আলোচনা করিব। চিঠিগুলি অতি সাধারণ রকমের, যদিও এগুলি একজন লোক ১৮ হইতে ২৪ বৎসর বয়সের মধ্যে লিখিয়াছিল। শালীর নিকট যে পত্র লেখা হইয়াছিল সেখানির কথা আমি বলিতেছি না। সেখানিতে একটু ভাবাবেগ আছে, কিন্তু উহা কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয় কুমারের বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই একজন প্রণয়িনী ছিল, এবং তাঁহার নৈতিক চরিত্র আগাগোড়াই কলঙ্কিত ছিল, কিন্তু তথাপি যখন অল্পকালের জন্য তিনি ঢাকায় আসিতেন তখনও স্ত্রীর নিকট পত্রলেখা তাঁহার স্বভাবতই ইচ্ছা হইত। আমি এইরূপ এক ব্যক্তিকে চিঠিতে সোহাগসূচক ভাবপ্রকাশ করিতে আশা করি। যদিও আমি বলিতে বাধ্য যে দ্বিতীয় কুমার তাহার চালচলনের বিষয় কাহার নিকট হইতে গোপন রাখিতেন না।

পত্রের বিশেষত্ব

একটা বিষয় খুব আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় যে, প্রায় প্রত্যেক চিঠিতে পদস্থ ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাতের উল্লেখ আছে, এবং এই সমালোচনার উদ্রেক করিয়াছে, যে, যে ব্যক্তি ঐ পত্রগুলি লিখিয়াছে সে এই প্রকার সাক্ষাৎগুলিকে একটা অসাধারণ সম্মানজনক ব্যাপার বলিয়া মনে করিত। ১৩ বৎসর বয়স্ক স্ত্রীর নিকট লিখিত চিঠিখানি একবার দেখা যাক্। যাহার সহিত তিন মাস

পূর্ব্বে মাত্র বিবাহ হইয়াছে এবং যে অতি দরিদ্র পরিবার হইতে আসিয়াছে; এবং যাহার 'কমিশনার' সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই; এবং তাহার স্বামী কমিশনার কি বলিয়াছে সে বিষয়ে লিখিতেছে ইহা হইতে মনে হয়, যেন দ্বিতীয় কুমার একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্তশ্রেণীর লোক, এবং সাহেবদের সহিত তাহার বেশ যাতায়াত আছে। কিন্তু ইহার উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

একটা বিষয় আমার নিকট অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় যে কুমার প্রায়ই ঢাকার বাড়ীতে আসিতেন, এবং যদি এই প্রকারের পত্রলিখেন যাহাতে কেবলমাত্র যেগুলিতে পদস্থ ব্যক্তিগণের উল্লেখ আছে সেগুলিই রক্ষিত হইয়াতে। রাণী অবশ্য বলিয়াছেন যে আরও কতকগুলি চিঠি আছে, সেগুলির মধ্যে একটু লঘুতার পরিচয় প্রকাশ পাইবে বলিয়া কোর্টে প্রদর্শন করিবার যোগ্য নয়, কিন্তু তথাপি ইহা অদ্ভুত যে সেগুলির মধ্যে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় নাই, সেগুলি প্রায় এই বিষয় অবলম্বনে লেখা। যদিও এই চিঠিগুলি ছয়বৎসর ব্যাপিয়া লিখিত, তাহা হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহাদের মধ্যে বিষয় বৈচিত্র্য অথবা লিখনপদ্ধতির বিভিন্নতার বিশেষ অভাব এবং এইগুলির মধ্যে একজন বালক বা একজন যুবক যে তাহার স্ত্রীর নিকট লিখিতেছে ইহার প্রমাণ খুবই কম আছে। এই সময়ের আরও একটি আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, যদিও দ্বিতীয় কুমারের সাক্ষ্য সম্বন্ধে কোন শেষ নাই, কিন্তু সে যাহা বলিয়াছে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। যে ভাবে তিনি কথা বলিতেন তদনুরূপ দুই একটি বাক্য আছে কিন্তু এমন কিছুই নাই যাহা হইতে কোন ব্যক্তি এই চিঠিগুলির মর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া রচয়িতার সম্বন্ধে কৃতনিশ্চিত হইতে পারেন। কিন্তু যদি ইহা মনে করা যায় যে তাহার শিক্ষা সামান্য বাংলা পর্য্যন্ত হইয়াছিল এবং ১৩০৭ সালে ইহার পূর্ণ সমাপ্তি হয়, তবে যে কেহ এই চিঠিগুলি সম্বন্ধে এই ধারণা করিবে যে ইহাদের সর্ব্বপ্রথমখানিও তাহার সাধ্যাতীত। যেরূপ এই চিঠিগুলি দ্বিতীয় কুমারের ক্ষমতার বহির্ভূত, সেরূপ তাহার লিখিত চিঠি যেখানি প্রতিবাদিগণের মতে ২৪ বৎসর বয়সে লেখা, সেখানি একটি শিশুর লেখা বলিয়া মনে হয়। কার্য্যতঃ এই দুই ভ্রাতার শিক্ষা প্রায় সমান ছিল, এবং সেইজন্য ফণীবাবু (প্রঃ সাঃ ৯২) বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে ছোট দুই কুমারের শিক্ষাবসানে তাহাদের ইংরেজীতে জ্ঞান প্রায় সমান ছিল এবং তৃতীয় কুমারের বাঙ্গালায় দখল অপেক্ষাকৃত কম। যদি ছোটকুমারের চিঠিগুলিকে দ্বিতীয় কুমারের লেখার ক্ষমতার মাপকাঠি বলিয়া ধরা হয়; তাহা হইলে তাহার পক্ষে আলোচ্য চিঠিগুলি লেখা অসম্ভব।

বিশেষত বাদী পক্ষের সাক্ষ্যে বলা হইয়াছে ছোটকুমার বড়কুমারের মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার লিখন শিক্ষা করিয়াছিলেন।

আমার এই কারণগুলির জন্য এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে পত্রগুলি অকৃত্রিম নয়;

পত্রগুলির গূঢ় রহস্য ভেদ

(১) আমার মনে হয় লাটসাহেবের আগমন অথবা লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ, এগুলি মাত্র গূঢ় অভিসন্ধির মূলে ছিল এবং ইহার উপর কাঠাম খাড়া করা হইয়াছিল; কিন্তু এই সব ব্যাপারে যেমন প্রায়ই ঘটে, কাঠামটি দুই জায়গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ১৩০৯ সালের ২৫শে শ্রাবণ তারিখের চিঠিতে বলা হইয়াছে। লাটসাহেব আগামীকল্য ১২টার সময় আসিবেন।

২৫শে শ্রাবণ ইংরেজী ১০।৮।০২ তারিখের সহিত অনুরূপ। দেখা যায় যে স্যার জন উডবার্ণ ১১।৮।০২ তারিখে ব্যবস্থাপক সভায় সভাপতি ছিলেন এবং তাহার পর তিনি পরিদর্শনের জন্য বিহার গিয়াছিলেন। (কলিকাতা গেজেট, ২০।৮।০২)।

১৩১২ সালের ১৯শে পৌষের চিঠিখানি বিশেষ লোভনীয় বটে। ইহা ইংরেজী ৩।১।০৬ সনে লিখিত। ইহাতে আছে যে লাটসাহেব আগামী কল্যের পরের দিন আসিবেন, এবং ৪ কিম্বা ৫ দিন বিলম্ব করিয়া বাড়ী যাইবেন। এখন এই তারিখগুলি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

১৯০৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর—প্রতিবাদী পক্ষ হইতে মিঃ আর, সি, সেন বলিয়াছেন যে দ্বিতীয় কুমার ভাইসরয়ের কাপের দিন কলিকাতা ছিলেন।

৩রা জানুয়ারী, ১৯০৬ সালে—হিজ রয়াল হাইনেস্ প্রিন্স অব ওয়েলস কলিকাতায় পৌছান।

কুমারগণের কলিকাতা গমন

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে তিনজন কুমার কলিকাতায় গিয়াছিলেন, এবং তাহারা ১৯নং ল্যান্সডাউন রোডে অবস্থান করিতেছিলেন, এবং প্রতিবাদিগণ একজন সাক্ষীকে জেরা করায় সে বলে যে ঐ সময়ে সে গৃহ সজ্জিত করে। দ্বিতীয় কুমার ১৯০৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতায় ছিলেন, কারণ সেইদিন তিনি ম্যানেজারের নিকট ৩০৲ টাকা পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রের তারিখ ছিল ৪।১।০৬ এবং চিঠিখানি ১৯ ল্যান্সডাউন রোড হইতে লিখিত, এবং ম্যানেজার তাহাকে ঐ তারিখে টাকা পাঠান (Ex ৪৭০ এবং ৪৭০ (ক))। সুতরাং ঐ তারিখে ঢাকা হইতে চিঠি লেখা দূরে থাকুক

কুমার ৩রা জানুয়ারী ঢাকায় ছিলেন না, এবং এই বিষয় এত গুরুতর বলিয়া মনে হইল যে আমি প্রতিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলির, এই বিষয়ের বক্তব্য শুনিয়াছিলাম। তিনি বলেন যে ছোট লাট ১৬ই জানুয়ারী ঢাকা পরিদর্শন করেন এবং আমি যদি ২৯শে পৌষকে ভ্রমবশতঃ ১৯শে পৌষ বলিয়া ধরি তাহা হইলে ঠিক হয়, অর্থাৎ আমি যদি ৩রা কে ১৩ই বলিয়া ধরি। কেহই সম্ভাবনা বাদ দিতে পারেন না। কিন্তু উহাও ঠিক হয় না। ১৩ই তারিখে কেহ কেহ ১৬ই তারিখকে আগামী কল্যের পরের দিন বলিবে না। স্যর ব্যামফিল্ড্ ফুলারের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় এই প্রথম পরিদর্শন এবং সেইদিনটা নিশ্চয়ই ঘোষিত হইয়াছিল।

পত্রের রচনা ভঙ্গী

(২) রচনা ভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য কর। স্ত্রীর নিকটের পত্রগুলি নীরস, এবং শালার নিকট লিখিত পত্রখানি গ্রন্থভক্ত এবং শব্দাড়ম্বরময়। যদি কোন ঘটনা থাকে যে সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। তবে তাহা এই যে দ্বিতীয় কুমারের কখনও পুস্তকের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। সুতরাং পত্রের এইরূপ রচনা ভঙ্গীর কারণ নির্দ্দেশ করিবারও প্রয়োজনিয়তা ছিল না এবং ফণীবাবু সেই কারণ প্রদর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বলেন যে দ্বিতীয় কুমার নাটক আলোচনা করিতেন, জয়দেবপুরে অভিনীত নাটকগুলির দোষগুণ বিচার করিতেন, এবং সাক্ষী মনে করেন যে তিনি নাটকের অন্তর্গত প্রণয়পত্রগুলি পাঠ করিয়াছিলেন। বড় কুমারের মৃত্যুর পর এই নাটকখানি জয়দেবপুরে আর অভিনীত হইয়াছিল কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, সেখানি একটি ভিন্ন নাটক। সে সকল নাটকের মুদ্রিত বির্বরণ পত্র তাহাকে দেখান হইলে তিনি সেগুলি স্বীকার করেন। (Ex ৩৩৪ হইতে ৩৩৪ (৩))। আমি সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। শালীর চিঠির দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং রাণীও সাক্ষ্য প্রদানে বলিয়াছেন যে (শালী) এবং দ্বিতীয় কুমারের মধ্যে বিবাহের জন্য এক বৎসর পর্য্যন্ত পত্রের আদান প্রদান চলিতেছিল। দ্বিতীয় রাণী বলেন যে, তিনি এই পত্র ১৯৩৩ সালের অক্টোবর কিম্বা নভেম্বর তাহার স্বামীর নিকট হইতে পাইয়াছেন। ভগ্নী ছয়বৎসর বয়ঃক্রম কালে মারা গিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আর কোন চিঠি ছিল না অথবা তাহার স্বামী অথবা বাড়ীর অন্য কেহ আসিয়া বলেন না যে এই চিঠিখানি সেখানে ছিল অথবা এই প্রকার পত্রের আদান প্রদান চলিয়াছে, অথচ বিবাহের পূর্ব্বে লিখিত এই পত্রখানি রক্ষিত হইল।

(৩) তুইজন হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ এই চিঠিগুলি সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তুইজন হস্তলিপি বিশারদ এই চিঠিগুলি সম্বন্ধে এবং মেজকুমার (Ex. 2) যাহা তাঁহারই স্বাক্ষর বলিয়া স্বীকৃত—এবং বাদীর আর কতকগুলি বাঙ্গালা স্বাক্ষর সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ এস, সি, চৌধুরীর অভিমত এই যে ইহাই যদি তাঁহার (বাদীর) স্বাভাবিক স্বাক্ষর হয়, তাহা হইলে (Ex. 2) এবং বাদীর স্বাক্ষরগুলি একই হাতের। প্রতিবাদী পক্ষের মিঃ হার্ডলেস্-এর অভিমত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঐ সকল মতামতের কারণ বিবেচনা করিয়া আমি এ বিষয়ে নিম্নলিখিত রূপ পর্য্যালোচনা করিতেছি: মিঃ চৌধুরীর অভিমতই ঠিক। ইহা বুঝা যাইবে, যে এই তুইজন বিশেষজ্ঞই যুক্তির ভিত্তি সম্পর্কে একমত, এবং ইহাতে একটিমাত্র সিদ্ধান্তেই পৌছান যায়; কিন্তু মিঃ হার্ডলেস্ তাহা স্বীকার করিবেন না। তিনি সুস্পষ্ট বিচারের ভিত্তি প্রমাণ এবং যুক্তিগুলিকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই, কিন্তু যুক্তিগুলি যদিও স্বতঃসিদ্ধ, তথাপি সিদ্ধান্তটিকে এড়াইবার জন্য সেগুলিকে বরাবর বদ্‌লাইয়া ধরিয়াছেন।

আমার মনে হয় যে এই আলোচ্য বিতর্কিত পত্রগুলি আসল নহে; সেগুলি মেজকুমারের লেখা নহে। এসকল কথা ছাড়িয়া দিলেও, বাস্তবিক পক্ষে মেজকুমার যে শুধু নাম সহি করা ছাড়া বাঙ্গালায় কখনও কিছু লিখিয়াছেন, এ বিষয়ে প্রমাণের একেবারে অভাব; এবং যদিও যাহা করিয়াছেন তাহা এতো কদাচিৎ যে অতি অল্পলোকেই তাঁহাকে ইহা করিতে দেখিয়াছে। এখন যে বিষয়টি বিবেচ্য তাহা এই যে, তিনি তাঁহার গৃহশিক্ষকদের নিকট যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহাতে এমন কি নামের বানান না জানিয়া মাত্র নাম সহি করিতে পারা ছাড়া তাঁহাকে একেবারে নিরক্ষর করিয়া তুলিয়াছিল কি না। ইহা হইতেই পরের বিষয়টিতে যাওয়া যাইবে।

বাদীর এবং মেজকুমারের হস্তলিপি

বাদীর পূর্ব্বতন স্বাক্ষরগুলি আদালতে যাহা উপস্থিত করা হইয়াছে, সেইগুলির বিষয় বলিতে গেলে বাদীর সর্ব্বপ্রথম সহি ১৯২৯ সালে এক জমি রেজেষ্ট্রী মামলায় দাখিলী তুইটী ওকালত নামা ও কতিপয় দরখাস্তের উপর রহিয়াছে (একজিবিট পি, সিরিজ)। পরবর্ত্তী তারিখের সহি সমূহ ৮।১২।২৬ তারিখে রেভিনিউ বোর্ডে প্রদত্ত তাঁহার আবেদনে ১৯টী স্বাক্ষর। পরবর্ত্তী তারিখের সহিগুলি হইতে ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আদালতে

তিনি যে কতিপয় স্বাক্ষর দাখিল করিয়াছিলেন—এইগুলিকে আদালতে দাখিল করা নমুনা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। আর সব চেয়ে আধুনিকগুলি হইতেছে তাঁহার জেরার সময়ে তিনি প্রকাশ্য আদালতে যেগুলি লিখিয়াছিলেন। এগুলিকে আদালতে লিখিত নমুনা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত স্বাক্ষরগুলি ইংরাজীতে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই এবং বিশেষজ্ঞগণও একমত যে এই সমস্ত স্বাক্ষর একই হস্তের অর্থাৎ বাদীর হস্তের।

বাংলা স্বাক্ষরগুলির মধ্যে দুইটী হইতেছে ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার আদালতে লেখা। জেরার সময়ে একজিবিট নং ১০ (৫) (১) ও ১৬২ (১) ও তৎসহ z ১৬২ (১) মত একই কাগজে লেখা কেবলমাত্র রমেন্দ্র কথাটী; এবং এই সকলের মধ্যে আদালতে দাখিলী তিনটা স্বাক্ষর (একজিবিট নং ৩ (১) হইতে ও (৫)) এবিষয়েও কোন সন্দেহ নাই যে এই সহিগুলি সমস্তই তাঁহার দ্বারা লিখিত।

৮।২।৩২ তারিখে অর্থাৎ মামলা আরম্ভ হইবার প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে এবং রেভিনিউ বোর্ডে আবেদনের সহিত বাদীর ১৯টী স্বাক্ষর প্রেরিত হইবার পাঁচ বৎসরেরও অধিককাল পরে, গবর্ণমেণ্ট উকিল রায়বাহাদুর শশাঙ্ক কুমার ঘোষ মামলাকারী বিবাদীর পক্ষ হইয়া হস্তলিপি সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞের মত লইতে মনস্থ করিলেন। তিনি কলিকাতা পুলিশ কমিশনারের নিকট তাঁহার রিকুইজিশান (লিখিত প্রার্থনা) পাঠাইলেন এবং অনুরোধ করিলেন যেন মিষ্টার এস, সি, চৌধুরীর মত লওয়া হয়, এবং তিনি তাহার নমুনাগুলি ও একটী মন্তব্য পাঠাইলেন।

এইগুলি মিষ্টার এস, সি, চৌধুরীকে দেওয়া হইল। লিখিত প্রার্থনা এই মর্ম্মে ছিল :—

(ক) শ্রেণী

স্বর্গীয় কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায় ও তদীয় ভ্রাতাগণের দ্বারা স্ব সম্পাদিত হুণ্ডি।

৭ খানি হুণ্ডি ও একটী হ্যাণ্ডনোট।

(খ) শ্রেণী

রমেন্দ্র নারায়ণ রায় বলিয়া প্রতারকের সহি।

১। ১৯২৯ সালে ঢাকায় জমি রেজেষ্ট্রী মোকদ্দমায় দাখিলী রমেন্দ্র নারায়ণ রায় রূপে প্রতারকের স্বাক্ষর সম্বলিত ৪ খানি ওকালত নামা।

২। ১৯২৯—৩০ সালে ৫০ নং ও ৫১ নং জমি রেজেষ্ট্রী আপিসে ঢাকার কালেক্টরের নিকটে দাখিলী ৮ পাতার তিনখানি টাইপ করা দরখাস্ত এবং তদুপরি প্রতারক রমেন্দ্র নারায়ণ রায় বলিয়া স্বাক্ষর।

৩। ১৯২৯—৩০ সালের ২৭১৮ নং ও ২৭১৯ নং জমি রেজেষ্ট্রী মামলায় ল্যাণ্ড রেজেষ্ট্রী ডেপুটী কলেক্টারের আদালতে দাখিলী ৬ পাতার দুইখানি বাংলা ভাষায় দরখাস্ত এবং তদুপরি রমেন্দ্র নারায়ণ রায় বলিয়া প্রতারকের স্বাক্ষর।

স্বাক্ষর পরিচয়

(বিঃ-দ্রঃ) ক শ্রেণীতে কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায়ের লাল পেন্সিল দ্বারা চিহ্নিত স্বাক্ষরগুলি খ শ্রেণীতে সেইরূপ ভাবে চিহ্নিত প্রতারকের স্বাক্ষরগুলির সহিত তুলনা করিতে হইবে। প্রত্যেক শ্রেণী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বিসদৃশ ৫টী স্বাক্ষর তুলনার জন্য বাছিয়া লইতে হইবে, এবং কারণসহ দয়া করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ছাপ বিবর্জ্জিত চিত্র ও চিত্রের নিগেটিভ্ (বিপর্য্যস্ত চিত্র) গুলির মত ও দলিল পত্রাদির সহিত ফিরাইয়া দিতে হইবে।

তারপরেই একটী মন্তব্য লিখিতে অনুরোধ করা হইয়াছে যে বিশেষজ্ঞ যেন ১৯ নং ল্যান্সডাউন রোড ঠিকানায় মিষ্টার এস, সি, ঘোষের নিকট মত প্রেরণ করেন কিম্বা ঐ ঠিকানায় মিষ্টার এস, এন, ব্যানার্জ্জীর নিকট (অর্থাৎ সত্য বাবুর নিকট) উহা প্রেরিত হয়। এই লিপিতেও পুনরুক্তি করা হইয়াছে যে "প্রত্যেক শ্রেণী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বিভিন্ন রকমের পাঁচটী করিয়া স্বাক্ষর যেন নির্ব্বাচিত করা হয়।"

এই চিঠি রচনা করিবার সময় রায় বাহাদুর হয়ত নিশ্চয়ই কম্পিত হইয়াছিলেন, তিনি কি চাহিতেছিলেন তাহা গোপন করেন নাই। এবং তিনি পুলিশ কমিশনারের মারফতে তাঁহার রিকুইজিসান প্রেরণ করিয়াছিলেন। মিষ্টার এন, সি, চৌধুরী পূর্ব্বে একজন পুলিশ ইনস্‌পেক্টর ছিলেন, আর তাহার কাজ ছিল পুলিশি মামলার জন্য হাতের লেখা তুলনা করা এবং যদিও তিনি পুলিশের কাজ পাইতেন।

চিঠিগুলি তুলনা করিতে বসিলেন; যতগুলি পারিলেন ততগুলি চিঠির পার্থক্য লিপিবদ্ধ করিলেন, কিন্তু অবশেষে এই বলিয়া বক্তব্য শেষ করিলেন যে, ইহাই অধিকতর সম্ভব বোধ হইতেছে যে, ক শ্রেণীর লেখকই খ শ্রেণীর লেখক ইহা বেশ বুঝা যায়, পার্থক্যগুলি দৌর্ব্বল্য, বার্দ্ধক্য বা ব্যাধি দ্বারা ঘটিয়াছে। তিনি উভয় শ্রেণীতেই কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখিয়াছিলেন

যাহা আকৃতিগত নয়, এবং মনে করিয়াছিলেন যে অনুকরণকারী তাহার প্রতিলিপি করিতে পারিত না, এবং দৌর্ব্বল্য বা বার্দ্ধক্যের চিহ্নটীও দিতে পারিত না।

পূর্ব্বোক্ত লিখিত প্রার্থনামত যে বিশেষজ্ঞ এই মত দিতে পারিয়াছিলেন যে কতকটা বিজ্ঞানের নিরপেক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিল। অবশ্য এইমত রেভেনিউ বোর্ডের নিকট হইতে গোপন রাখা হইয়াছিল। সত্যবাবু বলেন যে, ইহা গোপনে পাঠান হয় নাই। কারণ ইহা চুড়ান্ত ছিল না। মিষ্টার এস, সি, চৌধুরী বাদী কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন, এবং উহার লক্ষ্য একই বিবেচনা করা যাইবে। আহূত হইবার পূর্ব্বে তিনি আর দুইটী লিখিত প্রার্থনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে মিষ্টার পঙ্কজকুমার ঘোষ বিবাদীর পক্ষে তাঁহার সমক্ষে ৬ খানি বিবাদস্থানীয় বাংলা চিঠি, (একজিবিট নং ২) ও আমি বাদীর যে বাংলা স্বাক্ষরের কথা বলিয়াছি এইগুলি স্থাপন করেন এবং তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাঁহাকে যে মত দিয়াছিলেন তাহা এই যে—২নং একজিবিটের লেখকের যদি এই সাধারণ সহি হয়, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা এই চিঠিগুলি লেখা হইতে পারে না এবং বাদীর সহিগুলি সেই হস্ত দ্বারাই লেখা হইতে পারে (তাহাকে বলা হয় নাই যে, সেগুলি বাদীরই স্বাক্ষর)।

৯ই জানুয়ারী বা সেইরূপ সময়ে দুই সেট্ ইংরেজী সহি ও বাংলা লেখা গুলির সম্বন্ধে মত জানিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করেন। মিষ্টার চৌধুরী বাংলা লেখাগুলিতে তাঁহার মত দিতে অস্বীকার করেন। কারণ তিনি ইতিপূর্ব্বে মত দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজী সেট গুলির মধ্যে নূতন উপাদান ছিল বলিয়া তিনি মত দিলেন, যে সেগুলি একই হাতের লেখা।

তাঁহার সাক্ষ্যের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে কতিপয় সহজ বাহ্যাকার ও স্বতঃসিদ্ধ উৎপত্তির উল্লেখ করা আবশ্যক। অনুকরণকারী বাহ্যাকার বা তাহার কতকটা আয়ত্ব করিতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহার নিজস্ব লিখিবার ধরণ আছে বলিয়া সে তাহার অজ্ঞাতসারে অনুকরণের মধ্যে তাহার অভ্যাসের এমন চিহ্ন বলিয়া যায়, যাহা আসল জিনিষ ছিল না। এইগুলিকে বলে মৌখিক লক্ষণ। আপত্তিজনকই হউক আর আদর্শই হউক সুদীর্ঘ দলিলাদির সময়ে বিরাম লিখিবার অভ্যাস কিংবা অপরিবর্ত্তনশীল অক্ষরও এই অর্থে মৌলিক হইতে পারে, কিন্তু আসল ব্যাপার হইতেছে গতিশীলতা, যদি দুইটি লেখা গতির পার্থক্য প্রকাশ করে।

লিখন সময়ে হস্তের অবস্থান

এক্ষণে গতির অর্থ এই—তুমি তোমার হস্তদ্বারা লিখিয়া থাক। এমন হইতে পারে তোমার আঙ্গুলগুলি হয়ত আদৌ নড়িতেছে না। কিন্তু, হাত ও আঙ্গুলগুলি কলমের উপর সংবদ্ধ রহিয়াছে এবং কব্জি কাগজের উপর রহিয়াছে। কিংবা এমনও হইতে পারে যে তোমার কনুটীই ভার-কেন্দ্র, এবং সে ক্ষেত্রে তোমার লিখিবার সময় কব্জি নড়ে না, অপিচ বাহুর অগ্রভাগ নড়িয়া লেখা হয়। এমন কি স্কন্ধকেও কেন্দ্র করিয়া লিখিতে পারে; যাহারা বোর্ডের উপরে লেখে কিংবা পোষ্টারের উপর প্রকাণ্ড কিছু লেখে তাহারা ছাড়া অতি অল্প লোকে এরূপ করে। যদি তুমি অঙ্গুলির সাহায্যে লেখ তাহা হইলে তুমি চলন্ত অঙ্গুলি দ্বারা প্রত্যেক অক্ষরটি পৃথক্‌ভাবে লিখিবে, এবং তাহাতে লেখা আস্তে আস্তে হয়, বক্রতাও খারাপ হয়, কলমের টান অসংলগ্ন হয় ও পরিষ্কার হয় না। প্রত্যেক অক্ষরে এমন কি অক্ষরাংশে কলম পরিত্যক্ত হয় বলিয়া কলমের দোলন থাকে না। এই লেখাই হইল লেখার আদিম অবস্থা, এবং কব্জির সাহায্যে লেখার সহিত পার্থক্য দেখাইবার জন্য ইহা উল্লেখ করা হইল। যদি কব্জিকে কেন্দ্র করিয়া লিখ তাহা হইলে দোলন পাইবে। কিন্তু তাহার পরিসর সীমাবদ্ধ, যতদূর পর্য্যন্ত তোমার কব্জি নড়িতে পারে, ডানদিকে ততদূর পর্য্যন্ত তোমার কলম যাইবে। এবং এই লেখার একটী লক্ষণ এই যে ইহা এরূপভাবে উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

যদি তুমি না থাম কিন্তু তোমার কব্জি বলপূর্ব্বক প্রসারিত হইয়া যতদূর পর্য্যন্ত লইয়া যাও ততদূর পর্য্যন্ত চালাও, তাহা হইলে লেখা ঢেউয়ের মত বাঁকা হয় এবং কোনগুলি ডান দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। কব্জির সাহায্যে লেখক কিন্তু তাহার লিখনের ভারকেন্দ্র পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহা নিবারণ করে, কিন্তু লাইনটী উঁচুদিকে উঠিতে থাকে বলিয়া এরূপ পরিবর্ত্তন অনবরত না হইলে এইরূপ রেখা বিন্যাস বা নক্সায় পরিণত হয়।

কিন্তু যদি তুমি বাহুর অগ্রভাগের সাহায্যে লিখ, তাহা তোমার কলমের পরিসর দীর্ঘতর হয় এবং যদি না তুমি বাহুর অগ্রভাগের শেষ সীমায় আইস তাহা হইলে বক্রতা সংঘটিত হয় না এবং ইহা সকলেই স্বীকার করে যে ফুলস্‌-ক্যাপ্‌ কাগজের প্রস্থের মধ্যে ইহা ঘটে না, কারণ ফুলস্‌ক্যাপ্‌ কাগজের প্রস্থ বাহুর পরিসরের মধ্যেই থাকে। মিষ্টার এস, সি, চৌধুরীর সাক্ষ্যে দেখা যায় তিনি বলিয়াছেন যে একজিবিট নং ২ (কুমারের স্বাক্ষর) হইতেছে কব্জির সাহায্যে লেখকের স্বাক্ষর, আর বিতর্কযুক্ত পত্রগুলি। বাহুর সাহায্যে

লেখকের লেখা সাক্ষ্য : একজিবিট্ নং ২এর রেখা বিন্যাস উপরের দিকে হেলান; আর বিতর্কনীয় পত্রগুলির লাইন সোজা, যদিও সেগুলি কাগজের সমস্ত প্রস্থ ব্যাপিয়া চলিয়াছে, তথাপি তাহারা সমান্তরাল, তাহারা বেগদ্যোতক, তাহাদের রেখা গুণ উত্তম চাপের গতি নিয়মিত, এবং সুন্দর সূচালো অগ্র ভাগের আভাস রহিয়াছে, সবদিকে বিবেচনা করিলে ইহা উৎকৃষ্টধরণের লেখা।

কি ভাবে কিরূপ লেখা হয়

আলিপুর বারের মিষ্টার মুখাৰ্জ্জী এই বিশেষ তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি মিষ্টার চৌধুরীকে জেরা করেন। এই জেরা করিবার পূর্ব্বে তিনি যে জেরা করিতে যাইতেছেন তাহা না বলিয়া তাঁহার সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করেন। যে প্রশ্নে উত্তর প্রকারান্তরে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয় সেইরূপ প্রশ্নের দ্বারা তিনি অঙ্গুলি, কব্জি ও বাহুর অগ্রভাগ দ্বারা লেখার চিহ্নগুলি বাহির করিয়া লইয়া ছিলেন, এবং সেইরূপ করার পর ব্যাপারটী এই ভাবে দাঁড় করাইলেন যে একজিবিট নং ২টী অবশ্য কব্জির দ্বারা লেখা, কিন্তু তর্কবিষয়পূর্ণ চিঠিগুলি কব্জি লিপি আর বাদীর স্বাক্ষরগুলি অঙ্গুলিলিপি। তিনি বাহির করিলেন যে একজিবিট নং ২ উৎকৃষ্টতর ও শোভনতর বক্রতা প্রদর্শন করিতেছে, এবং অঙ্গুলি অপেক্ষা অধিকতর পরিসর দেখাইতেছে। এবং তিনি বাদীর স্বাক্ষর গুলিতে চিহ্ন বাহির করিতে চেষ্টা করিতেন ইহা দেখাইতেন যে এগুলি এক নিরক্ষর লোকের অঙ্গুলিলিপি। ইহা নিশ্চয়ই বোধ হইয়াছিল যে এরূপ তর্ক করা অসম্ভব হইবে যে, বিতর্কময় পত্রগুলি কব্জিলিপি, সুতরাং— মিষ্টার হার্ডলেস্ এই বলিলেন যে বিতর্কযুক্ত পত্রগুলি অবশ্য বাহু লিপি, কিন্তু একজিবিট নং ২ (কুমারের স্বাক্ষর) ও বাহুলিপি। বিতর্কযুক্ত পত্রগুলি সম্বন্ধে তিনি তাহাদের প্রশংসায় প্রায় মুখর হইয়া উঠিলেন এমন কি তাহাতে বিবাদীপক্ষের ভীতির সঞ্চার হইল, সুতরাং মধ্যাহ্নে জলযোগের পর তিনি ইহা কতকটা কমাইলেন, কিন্তু তাঁহার মত এখনও এই যে সেগুলি অসাধারণ কৌশল প্রদর্শন করিতেছে এবং সেগুলি বাহুলিপি ও অঙ্গুলিলিপি। ঠিক যেমন মিষ্টার চৌধুরীও বলিয়াছেন সেগুলি সুন্দর বক্রতা প্রদর্শন করিতেছে, তাহাদের সোজা লাইনগুলি ঠিক একরূপভাবে মোটা যে তিনি একথা বলিতে সক্ষম যে, "যতই কেন পারদর্শী হউক না অতি অল্প লোকই তাহাদের পার্শ্বিক টানগুলি এই লেখকের মত এতটা সুদীর্ঘভাবে বরাবর একরূপ মোটা রাখিতে পারে।" মিষ্টার এস, সি চৌধুরীর ঠিক ইহাই মত এবং তাঁহার এই

মত যে, ২নং একজিবিটের লেখক, যে সামান্য সহি করিতে গিয়াই লাইন অতিক্রম না করিয়া পারে না সে কখনই এরূপ চমৎকার লিখিতে পারে না।

এখানে মিষ্টার হার্ডলেসের মতেও ২নং একজিবিট এই এইরূপ চমৎকার। তিনি ইহাতে লাইন অতিক্রম স্বীকার করিতেছেন এবং তিনি ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে দ্বিতীয় কুমারের ইংরাজী স্বাক্ষর ও এইরূপ উপরের দিকে হেলান ও বক্রতা প্রদর্শন করিতেছে এবং ইহা যে কেহই দেখিতে পারে (একজিবিট এ ১৩০ দ্রষ্টব্য), ইহাতে কুমারের স্বাক্ষর সমূহের ছবিগুলি একসারে বাঁধিয়া সাজান হইয়াছে।) লেখক যদি বাহুলিপিকর হয়, তাহা হইলে এগুলি কিরূপে বক্র হইল বা লাইন অতিক্রম করিল. তিনি সাধারণ প্রস্তাব স্বীকার করিলেন যে কব্জিলিপি বক্র হইতে পারে বা উপরের দিকে উঠিতে পারে, কিংবা ভারকেন্দ্র যদি সংশোধনার্থ সরান না হয় তাহা হইলে একটী সম্পূর্ণ খিলানের আকার হইতে পারে, তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে ইহা উপরের দিকে উঠিতে থাকে এবং লেখাটী উত্থানশীল রেখা, পরম্পরার ন্যায় দেখাইবে, প্রত্যেকটী একটী প্রারম্ভিক খিলান স্বরূপ যাহাব নিম্নপ্রান্ত এক লাইনে থাকিবে, সুতরাং জিনিষটীকে দেখিতে একটী মইএর মত বোধ হইবে। তিনি এই বিপদ দেখিলেন এবং তাঁহার উপপত্তি দৃঢ়ভাবে জ্ঞাপন করিলেন, অস্বীকার করিলেন এবং পুনরায় স্বীকার করিলেন, ভাবিলেন গুরুগম্ভীর শব্দাবিন্যাস হয়ত কিছু অর্থ আনয়ন করিবে, বলিলেন যে বাহুলিপিকর ও বক্রভাবে লিখিতে পারে কিংবা লাইন অতিক্রম করিতে পারে এবং যদি সে তাহার বাহু কব্জির নিকটে কাগজের উপরে স্থাপন করে তাহা হইলে ইহা করিতে পারে। সংক্ষেপে যদি সে তাহার কব্জি দিয়া লেখে; সংক্ষেপে, সে যদি বাহুলিপিকর হয়, অথচ তাহার কব্জি দিযা লেখে। তাহার বাহু বজায় রাখিতে তিনি তাঁহার সাক্ষ্যে মিথ্যা বলিয়াছেন যে কুমারের স্বাক্ষরে লেখা বিন্যাস সমান ছিল। তাহাকে উহা বদলাইতে হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহার মত বদলাইতে পারেন নাই।

ইহা স্পষ্টই পরিষ্কার যে কুমার বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই কব্জির সাহায্যে লিখিতেন, ইহা আলিপুর বারের মিষ্টার মুখার্জী ঠিকই দেখিয়াছেন। মিষ্টার হার্ডলেস্ বাংলা জানেন না, তিনি বিতর্কপূর্ণ চিঠিগুলি রক্ষা করিতে বিপুল প্রয়াস করিয়াছিলেন; এবং বলিয়াছিলেন যে, যে লোক কব্জির সাহায্যে ইংরেজী লেখে সে বাহুর সাহায্যে বাংলা লিখিতে পারে। এরূপ হওয়া সম্ভবপর কিনা ইহা বলিতে পারি না—প্রথমে এই কথা বলার পর তিনি বলিয়াছিলেন। মিষ্টার এস, সি, চৌধুরী বলিয়াছিলেন যে কব্জি লিপিকর

দুই কব্জির সাহায্যে লিখিবে, এবং ইহার চূড়ান্ত ব্যাপার হইতেছে ২নং একজিবিট রেখা ব্যতিক্রম। কোন একটা বৈশিষ্ট্যগত ব্যাপারে কোন পক্ষ কোন উপস্থাপিত ব্যাপারের দ্বারা বাধ্য নহে, কিন্তু ইহা দেখিয়া আনন্দ হয় যে মিষ্টার এস, সি, চৌধুরী, তাঁহাকে যিনি জেরা করিয়াছেন সেই মিষ্টার মুখার্জ্জী এবং মিষ্টার হার্ডলেস্ ও কব্জি ও বাহুলিপি দ্বারা পরিত্যক্ত সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন এবং যদিও মিষ্টার হার্ডলেস অনুমানের দিকে লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন তথাপি তিনি সম্ভবতঃ তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাহাদের উক্তি সমর্থন করিয়াছেন এবং ২নং একজিবিট্ ও কুমারের ইংরাজী স্বাক্ষরগুলি কব্জি হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য উদ্‌ভ্রান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন।

লেখা পরীক্ষা

এক্ষণে বাদীর স্বাক্ষর সমূহ সম্বন্ধে—ইংরেজী গুলিতে হার্ডলেস্ বলিতেছেন অঙ্গুলিলিপি, এবং তিনি বাংলা সহিকেও অঙ্গুলি লিপি বলিতেছেন। এজাহারের সময় তিনি বলিয়াছেন যে বাদীর ইংরাজী স্বাক্ষরের রেখা বিন্যাস বক্রাকার, কিন্তু বাংলা স্বাক্ষর সম্বন্ধে তিনি এবিষয় উল্লেখ করেন নাই। ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে বাদীর বাংলা ইংরাজী উভয় স্বাক্ষর বক্রাকার ও লাইন বহির্ভূত এবং ইহার অর্থ এই যে তিনি কব্জির সাহায্যে লেখেন। অঙ্গুলির সাহায্যে কথিত লাইন বাঁকাইবে না। মিষ্টার হার্ডলেস্ অঙ্গুলি লিপির পুঁথিগত সংজ্ঞা অনুসারে বাদীর স্বাক্ষর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে সেগুলি অংশ অংশ করিয়া লেখা হইয়াছিল, এবং ইহার অর্থ এই যে প্রত্যেক অক্ষর পৃথক্‌ভাবে লেখা হইয়াছিল এবং ইহার অর্থ এই যে প্রত্যেক অক্ষর বা অক্ষরের অংশেও ভার কেন্দ্র পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। ঐরূপ হইলে খিলানের মত বক্রাকারে কিংবা ঐরূপ লাইনের উর্দ্ধগতি ঘটিত না। বাদীর স্বাক্ষর তাহাকে দেখান হইলে—সেগুলি তাঁহার নিজেদেরই চার্টের [১৬০ (২)]—তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে তিনি প্রত্যেক অক্ষরে ভারকেন্দ্রের পরিবর্ত্তন দেখিতেছেন, কিন্তু এরূপ ব্যবধান দেখাইতে কোথায় কলম তোলা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে কলম না তুলিয়াও ভারকেন্দ্রের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, যেমন অন্ধ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যাহারা পাছে লাইন হারাইয়া ফেলে এই ভয়ে ভারকেন্দ্র পরিবর্ত্তন করে কিন্তু কলম তোলেনা। অর্থাৎ বাদী ভারকেন্দ্র পরিবর্ত্তন করিতে ছিল কিন্তু উহা করার কোন প্রমাণ রাখিতেছিল না। সমস্ত জিনিষটাই হাস্যকর।

মিঃ হার্ডলেস গেভির এই বিভিন্নতা ছাড়াও বাদীর ও কুমারের স্বাক্ষরের মধ্যে বহুসংখ্যক বিভিন্নতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলির কোনটাই মূলগত নহে। সেগুলি একই ব্যক্তির দুইটী স্বাক্ষরের মধ্যে দেখা যাইতে পারে; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি এবং সমস্তগুলিই বহুবর্ষের ব্যবধান গত দুইটী স্বাক্ষরের মধ্যে দেখা যাইতে পারে, বিশেষতঃ এই বহুবর্ষ ধরিয়া যখন লেখার কাজ বন্ধ ছিল আমি এই সকল বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিতে চাহি না এবং মানুষের লেখার উপর বার্দ্ধক্য, অনভ্যাস বা দৌর্ব্বল্যের ফল গণনা করিতে চেষ্টা করিব না, কারণ মিঃ হার্ডলেসের সাক্ষ্যই সপ্রমাণ করিয়াছে যে বাদী ও কুমারের স্বাক্ষরগুলি একই হাতের লেখা। আমি এখনই সেই সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বর্ণনা করিতেছি।

পত্রগুলির বিস্তৃত বর্ণনা

ইহা স্মরণ থাকিতে পারে যে রেভিনিউ বোর্ডে যে আবেদন পাঠান হইয়াছিল তাহাতে বাদীর ১৯টী স্বাক্ষর ছিল, এবং ১৯২৯ সালে দাখিলা দলিলে কতকগুলি স্বাক্ষর ছিল, এবং কতগুলি স্বাক্ষর বিচারের সময় আদালতে লেখা হইয়াছিল, আর কতকগুলি কোর্টে দাখিল করা হইয়াছিল কিন্তু যখন লেখা হইয়াছিল তাহা কেহ জানেন না। এক্ষণে মিঃ হার্ডলেস তাঁহার চার্টে আবেদন হইতে ৭টী স্বাক্ষর লইয়া আঁটাদিয়া বসাইয়াছেন এবং তাহার নীচে ১৭টী স্বাক্ষর বসাইয়াছেন যাহার মধ্যে ১৯২৯, ১৯৩০ ও ১৯৩৩ সালের লেখা স্বাক্ষর আছে। এই সমস্ত পাইনরকে পি পর্য্যায় বলা যাইতে পারে, এগুলি ঐ একই চার্টের বামদিকে কাগজে লাগান আছে; সুতরাং যে কেহ দুইটী পাইয়াই পাশাপাশি দেখিতে পারে। বিবাদীদিগের মধ্যে আবেদন মধ্যহইতে গৃহীত ৭টী স্বাক্ষরকে জে পর্য্যায় বলা যাইতে পারে, এবং তাহ্যই বলা হইয়াছে।

মিঃ হার্ডলেস্ জে পর্য্যায় সহ পি পয্যায় এক হাতের লেখা। এবং তিনি আরও বলিতেছেন :—

(১) কে পর্য্যায়ের একটী স্বাক্ষরের মত নমুনা হইতে জে পর্য্যায় নিশ্চয়ই নকল করা হইয়াছে। যেগুলি আস্তে আস্তে ও যত্ন করিয়া লেখা এবং উপরের ও নীচের টান গুলি ঠিক একই রূপ মোটা, যেন লেখক ড্রয়িং আঁকিতে ছিলেন।

(২) পি পর্য্যায়ে বাকী গুলি নমুনা না দেখিয়া আনাড়ি লোকের সহজ স্বাভাবিক লেখা।

(৩) যে পর্য্যায়ের কতকগুলি নিজস্ব একরূপতা আছে, জে পর্য্যায়ের

বাকীগুলির ও তাহাদের নিজস্ব সমরূপতা আছে, এবং এই সমরূপতা গুলি একই ব্যক্তির লেখার অভ্যাসের রূপান্তর।

(৪) সমস্ত পি পর্য্যায়ের লেখক লেখা অভ্যাস করিয়াছে এবং সমস্ত পর্য্যায়ের একরূপতা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে।

(৫) এই সকল সামঞ্জস্য বিশিষ্ট এবং বারংবার দৃষ্ট লক্ষণগুলির পর্য্যায় বিদ্যমান নাই।

জে পর্য্যায়ের অবনতি হইয়া পি পর্য্যায় পরিণত হইতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি একটি সাধারণ উপপত্তি প্রকাশ করিলেন। যদি তুমি কতকগুলি বাঁধাধরা লক্ষণ অর্জ্জন করিয়া থাক। তাহা হইলে তুমি সেগুলি হারাইবে না, যদিও সেগুলির রূপান্তর হইতে পারে; এবং একটু অভ্যাস করিলেই সেগুলি ফিরিয়া আসিবে। তাঁহার একটি বাঁধাধরা লক্ষণ ত গিয়াছে—কলম ধারণ। বাকীগুলির সম্বন্ধে বলিতেছেন, সেগুলির মধ্যে একটিও বাঁধাধরা বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।

আমি আবেদনের ১৯টি স্বাক্ষর লক্ষ্য করিয়াছি। এইগুলির মধ্য হইতেই আসিতেছে মিষ্টার হার্ডলেসের যে পর্য্যায় যাহা তিনি বলিতেছেন একটি নমুনা হইতে নকল করা হইয়াছে। সাদৃশ্য সম্বন্ধে কোনই ভুল নাই বলিয়া তাহাকে ইহা বলিতে হইয়াছিল। তাঁহার বিবৰ্দ্ধিত চিত্র ভ্রান্তি জনক। আসল দলিলে আমি দেখিতেছি যে ১৯টী স্বাক্ষরই একবার বসিয়া সামান্য মাত্র চাপ দিয়া লেখা হইয়াছে। উহা অসম্ভব যে কেহ লিখিতে না জানিয়া সেগুলি লিখিতে পারিত। বাদী কখনও লিখিতে শিখিলেন? নিশ্চয়ই ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পর নহে, যেহেতু তিনি অক্ষর চেনেন না। এই ব্যাপারে সম্ভাবনার কথা বিতর্ক করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা কি সম্ভব যে যদি কেহ এই লোকটীকে দ্বিতীয় কুমারের স্বাক্ষর অনুকরণ করাইতে চাহিত তাহা হইলে সে অক্ষর লইয়া আরম্ভ করিত না। ড্রইং করা নিরাপদ বলিয়া কি কোন শিক্ষিত লোকের মনে উদয় হইত, অক্ষর না জানিয়া ড্রইং করা যাহাতে প্রত্যেকেই অবাক হইত এবং বাদীকে যাহা অপদস্থ করিত, এবং এই অপদস্থতাই সে প্রবল ভাবে অনুভব করিতেছিল। যতই সাক্ষ্য দেওয়া হউক না উহা আমাকে বিশ্বাস করাইতে পারিবেনা যে ১৯টী স্বাক্ষর ড্রইং করা। উহা অসম্ভব। ১৯২৯ সালের ও ১৯৩০ সালের সাক্ষের মধ্যে পার্থক্যের দ্বারা উহা বাদ পড়িতেছে, এই পার্থক্য স্বাভাবিক এবং নমুনার অভাবের দ্বারা উৎপাদিত নহে। ইহাই বা কিরূপে সম্ভব যে সে বাংলা স্বাক্ষরের ম অক্ষর এবং ইংরাজী স্বাক্ষরের 'M' অক্ষর জানে? অক্ষর সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞাত চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিতেছে যে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তাহার

আবির্ভাবের পর তাহাকে লেখা শেখান হয় নাই কিন্তু সে ইংরেজী ও বাংলা স্বাক্ষর অন্ততঃ ১টা অক্ষরের ক্ষীণ স্মৃতিসহ লিখিয়া থাকে। মিঃ হার্ডলেস যে লেখার অভ্যাস সম্বন্ধে বলিতেছেন এবং যাহার পরিমাণ তিনি এইরূপ দিয়াছেন যে 'এ' হইতে 'জেড্' পর্য্যন্ত ধরিলে যোগ্যতা অনুসারে তাহার স্থান 'ডাব্লিউ' অক্ষরে পড়ে। এই লেখার অভ্যাস তাহার দার্জ্জিলিং গমনের আগের দিন হইতে চলিয়া অসিতেছে। এবং তাহার স্বাক্ষরগুলি ঐ সমস্ত দিনগুলির অবশিষ্টাংশ। ইহাতে আমার ই, বি, ফ্লোটিলা কোং লিমিটেড কোম্পানীর ডিরেক্টর মিষ্টার হলধর রায়ের এই সাক্ষ্যে মনে পড়িতেছে যে অন্ততঃ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে, যদি আরও পূর্ব্বে না হয় (একজিবিট নং ২৪ দ্রষ্টব্য), বাদী ঐ কোম্পানীর প্রথম ডিরেক্টারগণের মধ্যে একজন ছিলেন এবং তিনিও হয়ত রায়ের মতই মিষ্টার সহি করিতেন। বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী মিষ্টার চৌধুরী জেরায় এই কথা বাহির করেন। এই তর্ক উপস্থিত করা হইয়াছিল যে বাদী যদি কুমার হইত তাহা হইলে অক্ষরগুলি ভুলিয়া যাইত না। যেহেতু কেহই ভোলে না। অন্যান্য জ্ঞানের ন্যায় অক্ষর জ্ঞানও বিস্মৃত হওয়া যায় এবং সামান্য মাত্র অক্ষর পরিচয় হইতে নিরক্ষরতা প্রাপ্তি একটী সাধারণ ও সহজবোধ্য অভিজ্ঞতা, এবং ইহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সুপণ্ডিত অধ্যাপকের সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই। যিনি একটী প্রকৃত ঘটনা উল্লেখ করিবেন। যে কেহ উর্দ্দু কিংবা সংস্কৃত শিখিতে চেষ্টা করিয়াছে বা শিখিয়াছিল এবং সামান্য বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে নিরপবতা প্রাপ্তি ও তৎসহ স্বাক্ষর করিবার ক্ষমতা বজায় রাখা সংঘটিত হয়। যদি সে সহি করিতে থাকে; কিন্তু অন্য কোন লেখা পড়া করে না; এবং এইরূপে অবশেষে স্বাক্ষরটি একটি চিহ্নে পরিণত হয় এবং যে স্মৃতি হইতে চলিয়া যায় বিশেষতঃ যদি স্বাক্ষর ও বহু বৎসর ধরিয়া লেখা না হয়।

আমার মতে মেজকুমারের ও বাদীর যে স্বাক্ষরগুলি দুইজন বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে ইহা একই হাতের লেখা এবং এস, সি চৌধুরী ঠিকই বলিয়াছেন।

এই বর্ণ পরিচয়ের অজ্ঞতা, জবানবন্দীতে যে পোলো খেলা সম্বন্ধে অজ্ঞতা তাহারই মত, এই সম্পূর্ণ অজ্ঞতা তাহাই দৃঢ়ীকৃত করে যে শেখান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে অস্পৃশ্য রহিয়াছে; এবং রেভেনিউবোর্ডে বিকৃত ফটো পাঠানর মত লোকটীর সম্বন্ধে নিশ্চিত না হইলে ইহা কেহই করিত না।

বাদীর জেরার যে অংশে সে বাঙ্গালী নয় দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে সে অংশের এখনও আমি আলোচনা করি নাই। ইহার অধিকাংশই কথার

উপর বা বাক্যবিন্যাসের উপর মারপ্যাচ খেলাইয়া অশিক্ষিত ব্যক্তিকে উহা বিভ্রান্ত করিতে পারে। আমি এবিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিব; বিশেষতঃ তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গের যে ঘুমপাড়ান ছড়া পছন্দ করা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বাদী অ-বাঙ্গালী কিনা সে বিষয়ের যখন আলোচনা করিব তখন সেই সঙ্গে এবিষয়েও আলোচনা করিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি।

উভয় পক্ষের স্বীকারোক্তি ও অন্যান্য বিষয়

জেরার সময় বিবাদীগণ বাদীকে তাহার স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে প্রায় স্পর্শই করে নাই। কিন্তু বাদীর কেস শেষ হইলে তাহারা নানা কথা তাহার মুখে আরোপ করিতে লাগিল; সে অমুক লোককে ইহা বলিতে পারে নাই, সেগুলি পরবর্ত্তী চিন্তা বলিয়া বাদ না দিয়া আমি কতকগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কুমার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে সে সব সম্বন্ধে তাহাকে প্রশ্ন না করার হয়ত কোন অর্থও থাকিতে পারে, যদিও আমি উহা দেখি নাই, কিন্তু সে নিজে যাহা বলিয়াছে বা যাহা করিয়াছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে তাহাকে কোন প্রশ্ন না করার কোন অর্থই নাই।

অতীতের কথা আলোচনা

এই সকলের মধ্যে আমি ১লা বৈশাখের টি-পার্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। সেখানে যে সকল স্বীকারোক্তি করা হইয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে তাহা সত্য নহে, ঠিক যেমন পার্টি রচনা প্রকৃত ঘটনা নহে এবং আমি যে বিষয় উল্লেখ করিয়াছি সেই সকল ঘটনা দ্বারা উহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে।

মিষ্টার কিরণ গুপ্তের সঙ্গে, একজন ডি, এস, পি—তিনি একস্থানে মিষ্টার কোয়ারী ও রায় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন বলা হইয়াছে —তাঁহার সহিত যে সাক্ষাৎকারের কথা বলা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমি আলোচনা করিয়াছি।

মিষ্টার কে, সি, দের সহিত তথা কথিত সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য ঘটনা দ্বারা এবং তাহার নিজের স্বীকারোক্তি দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ইহা অসম্ভব—ঢাকায় ১৯২৬ সালের বাদীর সহিত এই সাক্ষাৎকার, এবং মিষ্টার দের ১৯২৩ সালে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জামাতার সহিত সাক্ষাৎকার স্বীকার করিয়াছেন; এবং তাঁহার নিজের পত্রই উহার সাক্ষ্য দিয়াছে; স্মৃতির কৌশল দ্বারা উহা বাদীর উপর চাপান হইয়াছে। বাদী বলেন তাঁহাকে তিনি কলিকাতাতেই

প্রথম দেখিয়াছেন, এবং উহাই তিনি স্বীকার করিয়াছেন এবং উহা অবশ্যই ১৯২৪ সালে বা তৎপরে সংঘটিত হইয়াছিল।

বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল যে মিষ্টার মেরিজান নামে এক পুলিশ কর্ম্মচারী ১১ই মে তারিখের কাছাকাছি বাদীর সহিত দেখা করিয়াছিল এবং একটী রিপোর্ট দিয়াছিল। রিপোর্টটী তলপ করা হইয়াছিল কিন্তু দাখিল করা হয় নাই, এবং ঐ ব্যাপারের ঐ খানেই শেষ হইল। আর একটা বিশেষ জরুরী সাক্ষাৎকার রহিয়াছে। সে হইতেছে ১৯২১ সালের ২৯শে মে তারিখে মিষ্টার লিণ্ডসের সহিত সাক্ষাৎকার। মিষ্টার লিণ্ডসে বলিতেছেন যে সেইদিনই তিনি উহা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে এবং সেই স্থানে নহে, সুতরাং এটা হইতেছে বাদী যাহা হিন্দীতে বলিয়াছিল তৎসম্বন্ধে তাহার স্মৃতি হইতে লেখা, কারণ তিনি বলিতেছেন যে কথাবার্ত্তা হিন্দীতে হইয়াছিল। উহা বাদীর নিকটে পড়িয়া শুনান হয় নাই, এবং মিষ্টার লিণ্ডসের হিন্দী বুঝিবার ক্ষমতা—ইহার পরিমাণ—জানা নাই। মিষ্টার লিণ্ডসের একখানি পত্র নথীভুক্ত হইয়াছে এবং উহা হইতে ইহা বোধ হইতেছে যে বাদীর গুরু ধর্ম্মদাস যখন ঢাকায় পৌছিয়াছিলেন তখন মিষ্টার লিণ্ডসে দেখা করিতে বিলম্ব করিতেছিলেন, কারণ তিনি মিষ্টার কোয়ারীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি হিন্দী ভাল বুঝিতেন। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণে বাদীর বিরুদ্ধে কিছুই নাই, কেবল এইটুকু আছে যে ঐ বিবরণ অনুসারে তিনি বলিয়াছিলেন যে, দার্জ্জিলিঙ তিনি ২।৪ দিনের জন্য নিউমোনিয়া জ্বরে পীড়িত ছিলেন এবং যখন তিনি জয়দেবপুর হইতে দার্জ্জিলিঙ যান তখন তাঁহার দক্ষিণ হাঁটুর উপরে একটী ফোড়া ছাড়া আর কোন অসুখ ছিল না। এই উত্তরগুলি মিষ্টার লিণ্ডসের প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল। বিবরণটী সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও সে যে ফোঁড়ার উল্লেখ করিয়াছিল এবং সিফিলিস্ স্বীকার করে নাই উহা খুব দুর্ব্বোধ্য নহে, কিন্তু যে রিপোর্ট বাদীকে পড়িয়া শুনান হয় নাই কিংবা তাহার সামনে লেখা হয় নাই, তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা মোটেই নিরাপদ হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ বাদী যদি ঠিক নিউমোনিয়া কথাটী ব্যবহার না করিয়াছিল, তাহা হইলে মিষ্টার লিণ্ডসে যে নিউমোনিয়ার হিন্দী জানিত অনুমান করা আমার পক্ষে শক্ত হইতেছে, এবং আবার এইখানেই এই ব্যাপার দ্বারা একটী মুস্কিলের সৃষ্টি হইতেছে যে বাদী যদি স্বয়ং কুমার না হইত তাহা হইলে ৪ঠা মে তারিখের অল্প পরেই কলিকাতা সত্যবাবুর নিকট যাহা টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল সেই বিষ প্রয়োগের কাহিনী না শিখাইয়া বাদীকে মিষ্টার

লিণ্ডসের সাম্‌নে দাঁড় করান সম্ভব হইত না। এই দলিলটীতে যে বিষয় বলা হইয়াছিল, তাহার সঠিক বর্ণনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে বলিয়া আমি ধরিতে পারি না এবং ইহার সম্বন্ধে মিষ্টার লিণ্ডসের আদৌ কোন স্বতন্ত্র স্মৃতি ছিল না।

বিশিষ্ট সাক্ষী

স্বীকারোক্তির আর একটি সাক্ষ্য হইতেছে অবসর প্রাপ্ত সাব্‌জজ্‌ বাবু দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য। তিনি যখন নদীতীরে যাইতেন তখন তিনি বাদীকে সন্ন্যাসীরূপে তথায় দেখিতেন, এবং তিনি বলিতেছেন যে বাদী ১১ বৎসর বয়সের একটি বালককে দেখাইয়া বলিত যে, এই বয়সে সংসার ছাড়িয়াছে। এইরূপ একটা আকস্মিক কথোপকথনের স্মৃতির উপর আমি কোনই বিশ্বাস স্থাপন করিনা, এবং আমি দেখিতেছি যে স্মৃতি তাহার সহিত চাতুরী খেলিয়াছিল, এবং অন্য একটা উক্তি সে বাদীর মুখে স্থাপন করিয়াছিল, যাহা সে তাহার পূর্ব্বের এক উক্তিতে করে নাই। এবং যেমন সে পূর্ব্বে উক্তিটী তাহাকে দেখান হইল অমনি তিনি উহা প্রত্যাহার করিলেন। তিনি যে নূতন উক্তিটী প্রত্যাহার করিলেন উহা বিবাদিগণ বাদীর সনাক্ত সম্বন্ধে যে কেন খাড়া করিয়াছিলেন তাহার সহিত বেশ মিল খাইত। ইহা দ্বারা উহাই প্রমাণ করিতেছে যে, অনেক কথাই শুনা যাইতেছিল এবং স্মৃতির সহিত অনেক কথা মিশিয়া যাইতেছিল। স্বীকারোক্তি প্রমাণিত হয় নাই এবং আত্মপরিচয়ের পূর্ব্বে বাদীর যে জীবন যাত্রা ছিল তাহার সহিত উহা অসঙ্গত নয়।

১৯২৬ সালে বাদী কর্ত্তৃক মহামান্য রেভিনিউ বোর্ড যে আবেদন দেওয়া হইয়াছিল বিবাদীপক্ষের কৌশুলী দ্বারা উহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু ইহার সহিত অসঙ্গত যে ঘটনা আছে তাহা সত্য বলিয়া ধরা হয় না, যদি না উহা সাধারণ স্বীকৃত হইয়াছে কিংবা বিবাদীপক্ষের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে আবেদনটী আর্জ্জেণ্ট নহে। পরন্তু উহা অনুসন্ধানের জন্য দরখাস্ত, এবং বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য এই যে উহা এক সাব্‌ডেপুটী কালেক্টর কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল, ইনি এই বংশকে জানিতেন, তাঁহাকে যে সমস্ত খবর দেওয়া হইয়াছিল, তাহাই লইয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, এই সকল খবরের মধ্যে আশুতোষ ডাক্তারের মানহানির মামলায় গৃহীত সাক্ষ্য ও ছিল। ইহা বেশ জাঁকজমক ও বেশ আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় লেখা এবং মানহানির মামলার গৃহীত সাক্ষ্য এই সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং বিবৃতি হইল

যে এইগুলির ফলে বাদীর সাপক্ষে বিচার হইয়াছিল। আমার এইরূপ মত না— যে উহা দ্বারাই ঐ সাক্ষ্য বাদীর স্বীকারোক্তি হইবে, কারণ সে উহাতে সাক্ষ্য ছিল না, যেমন এই আদালতে সাক্ষীরা যাহা বর্ণনা করিয়াছে উহা যে পক্ষ দ্বারা ঐ সাক্ষিগণ আহূত হইয়াছিল, তাহাদের স্বীকারোক্তিতে ইহা প্রমাণিত হইতে পারে না।

বাদীর কতগুলি স্বীকারোক্তি আছে যাহা বাদী সন্ন্যাসী জীবনের যে বর্ণনা দিয়াছে। তৎসংক্রান্ত কিংবা আমি তাহার যে কথা আটকাইয়া যাওয়ার উল্লেখ করিয়াছি তাহার সে যে কারণ দিয়াছে তৎসংক্রান্ত। এগুলি সেই সেই দফায় বিবেচিত হইবে। যে সাক্ষ্য দ্বারা মেজরাণীর আচরণ বা স্বীকারোক্তি প্রদর্শন করিতেছে, তৎসম্বন্ধে আমি নিম্নলিখিতগুলি লক্ষ্য করিতেছি। ফণী বাবুর খুড়ী কমলকামিনী দেবী সাক্ষ্য দিতেছেন যে, বাদী আসিয়া উপস্থিত হইবার পর, কলিকাতায় মেজরাণীর সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। রাণী ইহা অস্বীকার করিতেছেন। কিন্তু কথাবার্ত্তায় এমন স্বীকারোক্তি প্রকাশ পাইতেছে না। মিথ্যা সাক্ষী বেশী করিয়া দিলে যাহাতে এবিষয়ে কিছুই বলিবার প্রয়োজন থাকে না।

মেজকুমারের মামী সুধাংশুবালা দেবী বলিতেছেন যে তিনি কলিকাতায় বাদীর গৃহে বাসকালীন কলিকাতায় মেজরাণীর গৃহে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি জেরায় বলিতেছেন যে, তিনি যখন বাদীকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তখন প্রত্যেকেই এমনকি বাদী ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীও ইহা জানিতেন। তিনি রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি লোকটিকে চিনিতে পারিয়াছেন এবং এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে লোকটি মেজকুমার। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "খুকী একবার মেজ খোকাকে দেখ।" তিনি বলিয়াছিলেন, "কি দরকার। দাদার কিংবা আর কারও কাছে শুনিয়াছি যে সে, সে লোক নয়। কিন্তু সে একজন পাঞ্জাবী, মহিলার সাক্ষাৎকারের কথা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার উক্তি বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিতেছেন। ইহাকে স্বীকারোক্তি বলা চলে না। এবং কথাবার্ত্তায় ভিন্ন প্রকার বিবৃতি দিতেছেন। ইহার উপর কিছুই সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু রাণীর নিজের বৈপরীত্য ইহার সারাংশ পরিত্যাগ করিতেছে। তিনি স্বীকার করিতেছেন সুধাংশু বালা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তুমি তাহাকে একবার দেখ না? রাণী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তাহাকে যদি দেখার দরকার হইত তিনি তাহা করিতেন এবং তাঁহার বলার অপেক্ষা করিতেন না, এবং তা ছাড়া তিনি

তাঁহাকে দেখিয়াছেন ইত্যাদি। তিনি আরও বলিতেছেন যে সুধাংশুবালাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ী হইতে আসিয়াছেন। এই স্বীকারোক্তিতে কিছুই নাই। যদিও কিছুই অসম্ভব নহে। ইহা আদৌ বলা চলে না যে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যদি জানিয়া শুনিয়াই একজন প্রতারককে খাড়া করিয়াছিলেন তাহা হইলে তিনি এই মহিলাকে (সুধাংশুবালাকে) রাণীকে হাত করিবার জন্য রাণীর নিকট পাঠাইযাছিলেন। ইহাতে আমি দেখিতে পাই উহারা আশা করিয়াছিলেন যে তাহাকে দেখিয়া পত্নীর হৃদয় হয়ত স্বামীর জন্য বিগলিত হইবে এবং ভ্রাতার (সত্যর) অবাধ্য হইয়াই চলিবে।

রাণীর কুমার দর্শন কথা

সাক্ষ্য প্রদানকালে রাণী আদালতকে বলিয়াছেন, তিনি কিরূপে এবং কখন বাদীকে দেখিয়াছিলেন। ইহা বাদীর কলিকাতায় অবস্থান কালে এবং আমরা জানি যে উহা ১৯২৪ হইতে ১৯২৪ হইতে ১০২৯ সালের কোন একটা তারিখ পর্য্যন্ত। তিনি প্রথম তাহাকে দেখেন যখন সে ও বুদ্ধু তাঁহার বাড়ীর সামনে দিয়া আস্তে আস্তে ফিটনে চড়িয়া যাইতেছিল। তিনি রাস্তার সামনেই গাড়ী বারান্দায় ছিলেন, গাড়ী বারান্দাটী খোলা ও যেখানে পথি পার্শ্বের কৃষ্ণচূড়া গাছের দ্বারা কতকটা ঢাকা। ফিটন আস্তে আস্তে আসিয়া তাঁহার বাড়ীর সামনেই দাঁড়াইল। বুদ্ধু তাঁহাকে দেখাইয়া দিল এবং বাদী পিছন ফিরিয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে দেখিতে ফিরিল। ফিটন সেখানে পাচ মিনিট দাঁড়াইয়াছিল। এক সপ্তাহের মধ্যেই সেই সময়ে এবং সেই স্থানেই দ্বিতীয় বার দেখা হয়। এবারও ফিটন দাড়াইয়াছিল, বাদী এইরূপে অনেকবার তাঁহার বাড়ীর সামনে দিয়া যাওয়া আসা করিয়াছিল, কিন্তু ফিটন থামে নাই, এই সকল সময়েও তাহারা সম্ভবতঃ তাঁহাকে (কুমারকে) দেখিয়াছিল।

মেজোরাণী আরও বলিতেছেন বাদী ও রাণী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে পরস্পরকে দেখিয়াছিল, এই সময়ে তিনি একটী মোটরগাড়ী বা ল্যাণ্ডোতে যাইতেছিলেন, আর বাদী একটী ট্যাক্সিতে যাইতেছিলেন, কিংবা বেড়াইতে ছিলেন, এবং গঙ্গার ধারে লোকে সন্ধ্যায় যেখানে বেড়াইতে যায় সেখানেও তাহারা পরস্পরকে দেখিয়াছিলেন, আর অনেক পরে একবার কলেজস্কোয়ারের নিকটে দেখিয়াছিলেন।

মিষ্টার চাটার্জ্জী এই সময়গুলিতে দেখিতেছেন যে চিনিবার ভাব এবং রমণী হৃদয়ের প্রবল আগ্রহ না হউক অন্ততঃ কৌতূহল

যাহা চাপা থাকে না। আবার এরূপও হইতে পারে প্রতারকের দ্বারা এই কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইয়াছিল আর বাদীর পক্ষে তাহাকে দেখিয়া লইবার চেষ্টা যাহাতে দরকার হইলে কে তাঁহাকে চিনিতে পারে। এই সকল দিক দিয়া বিচার করিলেও এই সব দেখা শুনার মধ্যে একটু বাড়াবাড়ি ছিল, এবং সেটা অদ্ভুত বোধ হইতেছিল এবং রাণী ও তাহা স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু এই আচরণের পরিষ্কার অর্থ হয় না এবং উহা কোন সিদ্ধান্তেও উপনীত হইতে কোন প্রকার সাহায্য করে না।

মেজ রাণীর জয়দেবপুরে পুনরাগমন

জয়দেবপুর পরিত্যাগ করার প্রায় ২৩ বৎসর পরে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর শেষ দিকে রাণী জয়দেবপুরে গিয়াছিলেন। তিনি পর্দ্দার আড়াল হইতে বহুলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন তাহার সম্মান দেখাইতে আসিয়াছিল, কিন্তু সাক্ষীরা বলিতেছে যে রাণীকে দেখিবার জন্য তাহাদিগকে আনিয়াছি এবং রাণী তাহাদিগকে বাদীর হইয়া সাক্ষ্য না দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। (P. w. ১০৮, ১১০, ১২৪, ১৪৭, ১৫১, ১৭৭, ২০৮, ৭৪, ১০৪, ১১০, ১৪৭) কেহ কেহ বলিয়াছে যে, রায় সাহেব, আশু ডাক্তার এই সাক্ষাৎকারের সময় ঐখানে উপস্থিত ছিলেন। তাহারা বলিয়াছে যে তাহাদিগকে সাক্ষ্য না দিতে অনুরোধ করায় তাহারা বলিয়াছিল যে, তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে, কিন্তু তিনি কি একবার তাঁহাকে দেখিতে পারেন না? 'মেজবাহাউদ্দীন নামক এক সাক্ষী এক বড় তালুকদার, তিনি ও রাণীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। এই সাক্ষী সেই দিনের কথাই বলিতেছেন, তিনি বলিতেছেন যে তিনি ও ডাক্তার সামসুউদ্দীন বসিলেন এবং রাণী পর্দ্দার আড়ালে রহিলেন। যেমন তাহারা আসন গ্রহণ করিলেন অমনি আশু ডাক্তার পর্দ্দা তুলিয়া দিলেন, এবং সাক্ষী প্রণাম করিলেন এবং কটাক্ষে একবার নজর দিলেন। রাণী তাহাকে বলিলেন যেন তাহাদের অঞ্চলের কেহ সাক্ষ্য না দেয়। ইহা শুনিয়া সাক্ষী তখনই বলিলেন—"আমরা তাঁহাকে কুমার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। আপনি যদি অনুমতি করেন তাঁহাকে জয়দেবপুরে লইয়া আসি, এবং আমাদের সকলেরই স্থির বিশ্বাস যে আপনিও তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন। এষ্টেটের টাকা নষ্ট কবিয়া লাভ কি?" এই কথা শুনিয়া রাণী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "এখন কিরূপে আর তাহা সম্ভব হয়?" মনমোহন ভট্টাচার্য্য

নামে এক সামান্য ব্যক্তি ও মেজরাণীর এক পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী লাল-গোলার অন্তর্গত রাজবাড়ীতে রাণীর নিকটে গিয়াছিলেন, এবং রাণীকে মামলা হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় রাণী এই সাক্ষাৎকার স্বীকার করিতেছেন কিন্তু বলিতেছেন সে বাদীর দূতরূপে তাহাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছিল। উভয়েরই উভয়ের কাছে যাইবার সাহস হইত কিন্তু কিরূপে ? এই ধরণের স্বীকারোক্তি দ্বারা মামলার সিদ্ধান্ত হইবে না, এবং সনাক্ত যদি অন্যরূপে প্রমাণ না হইত তাহা হইলে ইহার কোনই মূল্য নাই। কিন্তু যদি এই সনাক্ত প্রমাণ হয় আমি তাহাদিগকে এই সাক্ষ্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব। আমি আর একটা ব্যাপার উল্লেখ করিব। যে সকল সাক্ষীরা শপথ- পূর্ব্বক বাদীকে সনাক্ত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই তাহার সহিত কথা কহিয়াছে, এবং অনেককেই তিনি চিনিতে পারিয়াছেন এই কথা বলিতেছে।

দর্জ্জির পুরাতন কথা

শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী নামে এক সামান্য সাক্ষীর কথা আমি বলিব—গ্র্যাজুয়েট ফ্রেণ্ড নামক অধুনা বিলুপ্ত দর্জ্জির দোকানের সে একজন কর্ম্মচারী ছিল এবং ১৯০৭ সালের মার্চ্চ হইতে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত অর্ডার লইবার জন্য জয়দেবপুরে যাইত। সে তথায় গিয়া ১০।১৫ দিন থাকিত। সে কুমারদিগকে চিনিত এবং ১৯২৪।২৫ সালের জানুয়ারী মাসে বোস পার্কে বাদীকে দেখিতে গিয়াছিল। সে বলিতেছে যে ২।৩ মিনিট দেখার পরই সে কুমারকে ভালমতে চিনিতে পারিয়াছিল। 'সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আগন্তুকের মত 'বেয়ারা', 'বেয়ায়া' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল, কিন্তু বাদীকে মুখোমুখি দেখিতে পাইল। সে তাঁহাকে চিনিল, তাহার কাছে গেল, তাঁহাকে প্রণাম করিল আর বাদী জিজ্ঞাসা করিল সে কে।

আমি বলিলাম আমাকে ভালকরিয়া দেখুন এবং বলুন আমি কে ? তিনি আমার প্রতি তাকাইলেন এবং বলিলেন আমি তোমাকে ঠিক উত্তমরূপে চিনিতে পারিতেছি না। আমি বলিলাম "আমি জয়দেবপুর যাইতাম ও জামার অর্ডার লইতাম।" তখন বাদী বলিলেন, "আপনি গেজুট বাবির মহাশয়" মেজকুমার আমাকে গেজুট বলিয়া ডাকিতেন (গ্র্যাজুয়েটের সংক্ষিপ্ত আকার)।

গৃহীত সাক্ষ্যের মধ্যে এই ধরণের অনেক ছোট ছোট কথায় ছড়ান আছে এবং সেগুলির মধ্যে আমার বিশেষ করিয়া স্মরণ হইতেছে আব্দুল মান্নান ও

যাদব বসাকের সহিত সাক্ষাৎকার, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্যক্তি বিশেষের সাক্ষ্যের উপর মোকদ্দমার বিচার হইবেনা, যদিনা উহাস্বীকারোক্তি ও অখণ্ডনীয় ঘটনা দ্বারা প্রতিপালিত হইতে পারে।

এতদূর পর্য্যন্ত আমি বাদীর দেহ ও দেহের প্রত্যেক অংশ পরিষ্কার করিয়া দেখিয়া এমন কিছুই দেখিনাই, যাহা প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের দ্বারা এবং যে সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমবায় কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া যায় না। উহাদ্বারা প্রমাণিত সনাক্তকে বিভ্রান্ত করে। আমি দেখিয়াছি হস্তলিপি একই এবং বাদীকে মোটেই কোন লিখান পড়ান হয় নাই। আমি বিবাদীপক্ষের অর্থপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করিতেছি। উদাহরণস্বরূপ ডাক্তারি রিপোর্টের 'ভয়' অর্থাৎ যে ভয়ে সত্যবাবু সনাক্ত প্রকাশ করার ২।১ দিনের মধ্যেই মিঃ লেথব্রিজকে মৃত্যুর সাক্ষ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার অনুরোধ করিয়াছিল, এবং অপর যে কতিপয় বিষয়ের আমি উল্লেখ করিয়াছি এবং যাহা আমি উপসংহারের সময় পুনরায় উল্লেখ করিব এবং যেন সবগুলিই বাহির হইয়া পড়িবে। আমার মতে কিছুই সনাক্তকে বিচ্যুত করিতে পারে না, যদি না ইহা প্রকাশ পায় যে, মেজকুমার দার্জ্জিলিংএ মরিয়াছিলেন, কিংবা বাদী আউজলার মালসিং, কিংবা আদৌ বাঙ্গালী নহে। দার্জ্জিলিং এর আসার উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে আর দুইটী ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাদী মেজরাণীর দেহের তিনটী চিহ্নের উল্লেখ করিয়াছেন উহাদের মধ্যে দুইটি পরিবারের সকলেই নিকটেই বিদিত। সুতরাং এই দুইটি চিহ্ন জানা থাকিলে কিছুই প্রমাণ হয় না। সে যে তৃতীয় চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেটি যদি বিদ্যমান থাকিয়া যায় তবে তাহা কেবল রাণীর স্বামীরই জানা থাকিতে পারে। তিনি এই চিহ্ন অস্বীকার করিতেছেন, এবং এক পক্ষ জোর করিয়া বলিতেছে ও আর একপক্ষ অস্বীকার করিতেছে। এক্ষেত্রে এবিষয়ের কোনই মূল্য আছে বুঝি না।

আমি জানিনা কি কারণে মিঃ চৌধুরী কুমারের ভাগিনেয়ের নিকট একটি প্রশ্ন করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন **মেজরাণী একবার গর্ভধারণ করিয়াছিলেন একথা সত্য কিনা?** বিল্লু কখনও একথা শুনে নাই, এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে আগের সাক্ষ্যদিতে ডাকা হইল, যাহাতে তাঁহাকে আগে একবার জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

রাণী যে কোনকালে গর্ভধারণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি অস্বীকার করিলেন। এবং মিষ্টার চৌধুরী জেরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিন মাসের জন্য মাসিক ঋতু বন্ধ হইলে তাহা ননদের পক্ষে জানা সম্ভবপর কিনা?

তিনি বলিলেন যে এরূপ ঘটনা হইলে তিনি জানিতে পারিতেন। আমরা মনে করিতে পারিনা ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইয়াছিল, কিন্তু রাণী প্রাথমিক জবানবন্দীর সময় বলিলেন যে শাশুড়ী সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার গর্ভ হইয়াছে, কিন্তু আবার তাহার মাসিক ঋতু আরম্ভ হইয়াছিল, এবং তারপর জেরার সময় তিনি গর্ভপাতের কথা বলেন। এই জন্যই স্বামীর অধীনে বাসকালের বাহিরে গর্ভ ও প্রসবের অভিযোগ আনা হইয়াছিল, কিন্তু এ বিষয়ে পূর্ব্বে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না এবং এ বিষয়ে কিছুমাত্র সাক্ষ্য প্রমাণও নাই। এরূপ বিষয়ের অবতারণা হইয়াছিল তজ্জন্য আমি দুঃখিত এবং ইহা হইতে যে অভিযোগ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আমি গর্হিত মনে করি।

দার্জ্জিলিঙ কি হইয়াছিল

এই রায়ের প্রথম অংশে বলিয়াছি যে মেজ কুমার ১৯০৯ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসেন এবং ৮ই এপ্রিল দার্জ্জিলিঙ যাত্রা করেন। সত্যবাবু প্রায় একমাস পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন, এবং প্রথমে এরূপ করিবার একটা মিথ্যা কারণ দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন যে তিনি শিলং যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন এবং একটি সরকারী চাকরীর জন্য শিলং গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে একটা চিঠি দেখান হইলে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি তখন শিলং যান নাই, বিশেষত অক্টোবর মাসে গিয়াছিলেন। কলিকাতায় কুমারের সহিত অনবরত দেখা হওয়ার পরে এত শীঘ্রই কুমারকে মারিবার উদ্দেশ্যে দার্জ্জিলিঙে লইয়া যাইবার জন্য প্রবর্ত্তিত করিতেই তিনি জয়দেবপুর আসিয়াছিলেন কিনা, এই প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ করা দরকার মনে করি না। এখন বিচার্য্য বিষয় এই—কুমার দার্জ্জিলিঙএ দেহত্যাগ করেন। উহা বিচার করিতে হইলে তথাকথিত মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে, এই মৃত্যু যদি ঘটিয়াই থাকে তবে উহা স্বাভাবিকই হউক বা অবৈধ উপায়ে সাধিতই হউক উহাতে বাদীর মোকদ্দমা শেষ হইয়া যাইবে। কেহই ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হয় নাই ; এবং রাণীর সম্পর্কে বাদীর যে মামলা তাহাতে রাণী কোন বিষয়েই অভিযুক্ত হন নাই।

মেজকুমার দার্জ্জিলিং যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সত্যবাবু ও মুকুন্দ (যিনি তাঁহার পার্শ্বন্যাল ক্লার্ক ও যিনি সেক্রেটারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন) একটা বাড়ী ভাড়া করিতে গিয়াছিলেন এবং সত্যবাবু ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বাড়ীটি ছোট এবং বিধবার পক্ষে অসুবিধা জনক, সুতরাং এইবার মেজরাণীকে সঙ্গে কোন বয়স্থা আত্মীয়া না লইয়াই যাইতে হইয়াছিল।

স্বীকার করা হয় নাই যে, সত্যবাবু জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বা সত্যভামা দেবীকে এই ব্যাপার হইতে দূরে রাখিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু এটা সত্য ঘটনা যে ইতিপূর্ব্বে মেজরাণী বা অন্য কোন বউ, ভগিনীগণকে বা তাহাদের মধ্যে একজনকে সঙ্গে না লইয়া তাঁহারা স্বামীর সাহত একাকী যান নাই।

জয়দেবপুর হইতে যে দল দার্জ্জিলিং যাত্রা করে তাহা নানারকম লোকের সংমিশ্রণে গঠিত দল, বলিয়া বর্ণনা করা ঠিকই হইয়াছে, এবং সম্পূর্ণ তালিকা ৬১ পাতায় দেওয়া হইয়াছে। চাকরদের মধ্যে সরিফ খাঁ নামক দারোয়ানের নাম স্মরণ করা বিশেষ প্রয়োজন হইবে। তিনজন চাকরাণী ছিল। অম্বিকা ঠাকুর নামে একজন পাচক ছিল। একজন বাবুর্চ্চি ছিল এবং গুর্খা রক্ষিগণ ছিল। চারিজন খানসামা ছিল এবং তাহাদের মধ্যে একজন বিপিন (বিবাদীর সাক্ষী ১৪১) চাকর বাকর ছাড়া দলে বাকী লোকগুলি এই :—

১। ডাক্তার আশুতোষ দাসগুপ্ত।
২। বীরেন্দ্র নাথ বানার্জ্জী।
৩। ক্যাব্র্যাল।
৪। সত্য বাবু।
৫। রাণী।
৬। কুমার।
৭। এণ্টনি মোরেল।
৮। সেক্রেটারী মুকুন্দ গুণ।

ক্যাব্র্যাল এক পুরাতন ভৃত্য, কিন্তু চাকরদের মধ্যে উচ্চস্তরের। সত্যবাবু বলে যে, সে (কাব্রাল) দার্জ্জিলিঙে বাজার করিত এবং ঢাকাতে ভাওয়াল বংশের কতকটা দর্জ্জি ও কতকটা এজেণ্ট ছিল। সত্য বাবুর ডাইরী অনুসারে সে যে কাজ করিতেছিল তাহা দেখিলে তাহাকে নিম্নস্তরের চাকর অপেক্ষা বেশী বলা চলে না, এবং সে নিরক্ষর ছিল। যদিও সে তাহার নাম সহি করিতে পারিত। (বাদী পক্ষের সাক্ষী ২৫০ কৃষ্ট এণ্টনি মোরেল একজন উচ্চস্তরের চাকর এবং বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। সে প্রায় ৫ বৎসর চাকরী করিতেছিল)।

এণ্টনি ও ক্যাব্র্যাল ছাড়া বাকী লোক গুলি সকলেই যুবক এবং ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বয়স্ক মুকুন্দ গুণ, ৩০ বৎসর বয়স্ক ছিল। কুমারের বয়স ছিল ২৫ বৎসর। সত্যবাবুর বয়স ছিল ২৪ বৎসর ও বীরেন্দ্রের ছিল ২১ বৎসর। রাণীর বয়স ছিল মাত্র ২০ বৎসর। বীরেন্দ্র স্বীকার করিতেছে যে সে এষ্টেট হইতে কোন বেতন পাইত না। কেবল মুকুন্দ গুণ মাহিনা পাইত

এবং সে মৃত মেকৃবিনের পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। মুকুন্দ ও বীরেন্দ্র মেজকুমারের হিসাব রাখিত এবং দার্জ্জিলিংএও তাহারা হিসাব রাখিয়াছিল। বীরেন্দ্র বলে যে প্রায় ৮ মাস পূর্ব্বে সে নিযুক্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় কুমারের কেরাণীরূপে মুকুন্দ এষ্টেটের কর্ম্মচারীর কাজে সম্প্রতি যোগ দিয়াছিল, এবং তাঁহার ভাই বলে সে বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। সত্যবাবু বি, এ পাশ করিয়া বি, এল, পড়িতেছিল।

ষ্টেপ এসাইড বাড়ীর কথা

এই দল ষ্টেপ্ এসাইড্ বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল, চৌরাস্তা হইতে রঞ্জিৎ রোড ধরিয়া যাইতে বাম দিকে ইহাই প্রথম বাড়ী। নথীতে দার্জ্জিলিঙের একটি বর্ত্তমান ম্যাপ রহিয়াছে, এবং ইহাতে এই বাড়ীটী অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহা ২০১নং বাড়ী। একখানি দ্বিতল গৃহ, প্রত্যেক তলায় পাঁচটী করিয়া কক্ষ এবং উত্তর দক্ষিণে লম্বা, রঞ্জিৎ রোডের সহিত সমান্তরাল। দুই তলারই সামনের কক্ষগুলি দক্ষিণ দিকে মুখ আছে এবং বাড়ীর সামনে একটি ছোট কম্পাউণ্ড ও ছোট ফুলবাগান। রাস্তা হইতে কম্পাউণ্ডে ঢুকিতেই রাস্তার উপরেই একটী গেট পার হইয়া গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। একটী বারান্দা দুই তলায় পাঁচটী কক্ষ হইতেই সমস্ত অট্টালিকাটীর দৈর্ঘ ধরিয়া অবস্থিত। বাড়ীর পিছনদিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে একটু জায়গা, পরে চাকরাণ বা চাকরদিগের বাসস্থান ও রান্নাঘর, এবং এগুলির জন্য হইতে একটী পৃথক রাস্তা ছিল।

নিম্নের নক্সার দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই দোতালার কক্ষগুলির অবস্থান দেখিতে পাওয়া যাইবে।

১ হইতে ৫—বারান্দামুখী কক্ষগুলি

৬—রাস্তার ধারের বারান্দা

৭—সামনে একটী সংকীর্ণ বারান্দা

—চাকরদের বাসস্থান—

—দোতালায় ৭নং বারান্দা পর্য্যন্ত এক পার্ব্বত্যপথ গিয়াছে। এই হইল দোতালা এবং নীচের তলায় অনুরূপ কক্ষের কথা। গৃহের পিছনের রাস্তাটী একজায়গায় বাঁকিয়া আছে এবং তদনুসারে রাস্তার ধারের বারান্দাটীও বাঁকিয়াছে। বাড়িটী পশ্চিম দিকে একটী পাহাড়ের গায়ে সংলগ্ন রহিয়াছে এবং সেই পাহাড়ে 'পিকোটিপ্' নামে একটী বাড়ীও রহিয়াছে।

ফটকের সামনে কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিয়াই একটী পার্ব্বত্য পথ দেখা যাইবে, এবং এই পথ ধরিয়া গেলে ৭ নম্বরের একটী ছোট বারান্দায় যাওয়া

যাইবে, এবং সেখান হইতে ১ নম্বরে সামনের কক্ষে যাওয়া যাইবে। এই পথটিকেই ক্রমশঃ ঢালু রাস্তা বলা হইয়াছে। দোতালার কক্ষগুলির পশ্চিম-দিকে প্রত্যেকটীর সংলগ্ন স্নানের কক্ষ আছে। এগুলির পশ্চিমে একটী রাস্তা পিছনের রান্নাঘর পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং তথায় পূর্ব্বোক্ত ঢালু রাস্তা দিয়াও যাইতে পারা যায়। আরও বেশী দূর গেলে পিকোটিপে উপস্থিত হইবে।

আলোচনা কালে দার্জ্জিলিঙের ভূপৃষ্ঠ-সংস্থান সম্বন্ধে এত বেশী খবরের দরকার হইবে যে আমি সাক্ষ্য হইতে গৃহীত একটী নক্সা দিতেছি, এটী স্কেল অনুসারে আঁকা নয়। মাত্র পারস্পরিক সম্বন্ধ জানাইতে ও সুদীর্ঘ বর্ণনা এড়াইবার জন্য অঙ্কিত হইয়াছে।

১। ষ্টেপ এসাইড্

২। পিকোটিপ্

৩। মলভিলা নং ১, ২, ৩

৪। ডাটপোটি একটী ভিলা

সি, এইচ চৌরাস্তা

এ, বি, সি, ডি, পুরাতন সুধীর কুমারী রোড্

ডি, সব্জী বাগান

ই, এফ, জি, এইচ নূতন সুধীর কুমারী রোড্, কনসারী রোড্ হইতে বাহির হইতেছে।

কে, একটী ছোট পথ সব্জী বাগান পর্য্যন্ত গিয়াছে।

টি, ট্যানারী '

৬। এসিলস্কট্

ইহা দেখা যাইবে যে ষ্টেপ এসাইড্ রঞ্জিৎ রোডের উপরে, রঞ্জিৎ রোড্ চৌরাস্তা হইতে বাহির হইতেছে এবং ভুটিয়াবস্তী ও আরও বেশীদূর গিয়াছে।

ষ্টেপ্ এসাইড্ হইতে নূতন বা পুরাতন শবদাহ স্থান বরাবর পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া নিম্নাভিমুখে গিয়াছে এবং আঁকা বাঁকা পার্ব্বত্য রাস্তা দিয়া দুই বা আড়াই মাইল, এবং বরাবর সোজা ধরিলে ম্যাপ অনুসারে একমাইল লম্বা হইবে। ষ্টেপ্ এসাইড্ হইতে শবদাহ স্থানে যাইতে হইলে পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া নীচের দিকে যাইতে হয় এবং যাইতে প্রায় একঘণ্টা সময় লাগে। রোজ্ ব্যাঙ্ক নামক বর্দ্ধমানের মহারাজার বাসবাড়ী এইখানে অবস্থিত। ম্যাপে ইহা দৃষ্ট হইবে যে রোজব্যাঙ্কস্ হইতে শবদাহ ঘাট দেখা যায়। মহারাজা ১৯২১ সালের মে মাসে ইহা লিখিয়াছেন। শবদাহ স্থল

অঞ্চলে ১৯০৯ সালের মে মাসের পর বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবং শবদাহ ভূমির সম্বন্ধে বিবাদী পক্ষে দলিল পত্রাদি দাখিল করিবার পর এবং বাদীর দ্বারা উপস্থাপিত ম্যাপের সহিত পড়ার পর, বিবাদী পক্ষে ১৯০৯ সালের পরে যাহার উদ্ভব হইয়াছে সেইরূপ ব্যাপার ১৯০৯ সালে আরোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ১নং মলভিলায় ১৯০৯ সালের মে মাসে কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য বাস করিতেছিলেন।

দার্জ্জিলিঙে রাস্তা পরিচয়

ইহা দৃষ্ট হইবে যে গাড়ীর রাস্তা দার্জ্জিলিঙের মধ্য দিয়া গিয়াছে। দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলওয়ে যেস্থানকে মালগুদাম বলে, সেই পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। কিন্তু আরোহীগণের জন্য ষ্টেশনে আমি যে স্থান চিহ্নিত করিয়াছি, সেই স্থানের নিকটে, কিন্তু সেনিটোরিয়াম লুইস্ জুবিলি অপেক্ষাকৃত নিম্নতলে অবস্থিত, এই সেনিটোরিয়ামে যে সকল অবস্থাপন্ন ভারতবাসী বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিঙ আসেন তাহারা বাস করেন। ইহাও দৃষ্ট হইবে যে চৌরাস্তায় উঠিয়া আসিবার সময় ষ্টেপ এসাইড্ হইতে তুমি তোমার বামদিকে কমার্শ্যাল রো নামক একটী রাস্তা দেখিতে পাইবে। এই রাস্তায় উঠিয়া যাও এবং উহা যেখানে রবার্টসন রোড্ ও অকল্যাণ্ড রোডের সহিত মিশিয়াছে সেই স্থলে আইস। তুমি রবার্টসন রোড্ ধরিয়া কতকটা নীচের দিকে যাও এবং তারপর লয়েড্ রোড ধরিয়া কিছুদূরে যাও এবং তুমি দেখিবে তুমি মালগুদামের নিকটস্থ গাড়ীর রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছ। মালগুদামে পশ্চিমের দিকে একটী রাস্তা গিয়াছে, ইহার নাম ফার্ণভেন রোড্,'তুমি এই রাস্তাটী ধরিয়া যাও এবং তারপর কনজারভেন্সী রাস্তায় গিয়া পড় তারপর এই আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরিয়া গিয়া ভিক্টোরিয়া রোডে পড়িবে এবং ভিক্টোরিয়া রোড ধরিয়া কিছুদূর গেলে তুমি তোমার বামদিকে একটী হাঁটা রাস্তা পাইবে ; যাহা শ্মশান পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই হাঁটা রাস্তা কিংবা তিনফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা, যাহার দুইপাশে গাছ ও ঝোপ জঙ্গল এবং স্থানে স্থানে যাহাতে দুইটী লোক পাশাপাশি চলিতে পারে না। ১৯০৯ সালে উহারই নাম ছিল সুধীর কুমারী রোড্। এই পর্য্যন্ত কোনই বিতর্ক নাই এবং এই বর্ণনায় আমি কোন ব্যক্তিগত জ্ঞান সন্নিবিষ্ট করি নাই। বিবাদী আর্য্য-হিন্দু-শবদাহ-সমিতির যে দীর্ঘ বিবরণ দাখিল করিয়াছে, তাহার সহিত এবং ১৯২২ সালে নিউ সুধীর কুমারী রোড্ খুলিবার পূর্ব্বে যে সব চিঠিপত্র লেখা হইয়াছিল তাহার সহিত সেগুলি আমি নক্সাতেও সূচিত করিয়াছি। এই ম্যাপের সহিত সাক্ষ্য পাঠ

করিলে ইহাই দেখা যাইবে। মেজকুমারের শবদাহ সংক্রান্ত ব্যাপার পরীক্ষা করিবার জন্য আমাকে এই সকল কাগজ পত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু আমি এইমাত্র যে রাস্তার বর্ণনা করিয়াছি, উহাকে শ্মশান যাইবার কমার্শাল রো রাস্তা নামে উল্লেখ করা হইবে। ষ্টেপ্ এসাইড্ হইতে অন্য রাস্তা ধরিয়া শ্মশানে যাওয়া অসম্ভব। তুমি চৌরাস্তা পার হও এবং কমার্শাল রোডে যাইবার জন্য বাম দিকে না ফিরিয়া ডানদিকে ফিরিয়া হর্ণ রোড ধরিয়া বরাবর নীচে চলিয়া যাও, এবং অনেকগুলি রাস্তার মধ্য দিয়া ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতালের পাশ দিয়া হাসপাতাল রোড নামক রাস্তা দিয়া গিয়া বোটানিক্যাল্ গার্ডেন রোড পার হইয়া খানদিবীতে পড়িবে। অবশেষে কাটরোডে নামিয়া আসিবে। বাজারের উত্তরে একটা জায়গায় নামিয়া যাও এবং বাজারের পাশ দিয়া মালগুদামের দিকে অগ্রসর হও। কাছারী বাড়ীর পাশ দিয়া মালগুদামে আসিয়া পড়িবে। সেই স্থল হইতে রাস্তা একই এবং একটী রাস্তা মাত্র ছিল; ফার্ণডেন রোড, কনজারভেন্সি রোড্, ভিক্টোরিয়া রোড্, পুরাতন সুধীর কুমারী রোড্।

তুমি এই রাস্তা ধরিয়া চলিয়া যাও, পরে যেখানে উহা বাঁকিয়াছে, সেখানে বাঁক অতিক্রম করিয়া পরে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে তোমার দক্ষিণে পুরাতন শ্মশান দেখিতে পাইবে। যদি তুমি আরও নীচে যাও তবে তুমি ইহার দক্ষিণে নূতন শ্মশানে আসিবে। ১৯০৯ সালের মে মাসে যখন নূতন শ্মশান গঠিত হইয়াছিল, তখন উহাতে আসিবার রাস্তা সম্পূর্ণ ছিল কিনা সে বিষয়ে এখনও সন্দেহ আছে। এবং দুইটী শ্মশানের মধ্যে ম্যাপে যে ঝোরা দেখা যাইতেছে, উহা তখন ছিল কিনা সন্দেহ আছে। এই বিষয়গুলির জন্য আর একটী নক্সার প্রয়োজন, এবং একটু বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন, কিন্তু ইহা এক্ষণে স্বীকৃত হইয়াছে যে ১৯০৯ সালের মে মাসে পুরাতন শ্মশানের স্থানে কোন রকমের চালা ছিল না। কিন্তু নূতন শ্মশানে একটী চালা ছিল।

শ্মশানভূমির পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে কতকগুলি সব্জী-বাগান ছিল, পূর্ব্বে সেগুলির মালিক ছিল মিউনিসিপ্যালিটি, এবং পরে সেগুলি মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা মিঃ মরজেনষ্টিন্ কে ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল, আমি তাহার গৃহ ৬ এই চিহ্নদ্বারা সূচিত করিয়াছি। ইহার নাম ছিল এথিনম্কটু, যদি ও পরে ১৯১৪ সালের পরে ইহার নাম হয় রোজারি।

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে বেঙ্গুইন ঝোড়া ও কাগ ঝোড়া নামক দুইটী ঝোড়া বা গিরিনদীর মধ্যে শ্মশান ভূমি অবস্থিত। এই দুইটি ঝোড়ার মধ্যবর্ত্তী বস্তুতঃ ভিক্টোরিয়া রোডের পশ্চিম দিকের ভূমি নীচু ও জঙ্গলময়, এবং যদিও

উচ্চতা সম্বন্ধে কোন সঠিক সাক্ষ্য নাই তথাপি তুইটী ঝোড়া উপত্যকার একটু পশ্চিম দিকে মিশিয়াছে, যদিও দার্জ্জিলিং প্রায় ৬৮০০ ফিট উচ্চ।

কুমার ও তাঁহার দলবল ২০শে এপ্রিল দার্জ্জিলিং পৌছিয়াছিলেন। এবং ১৯০৯ সালের ৮ই মে শনিবার কুমার মারা যান বা মৃত বলিয়া অনুমিত হন। সুতরাং তিনি ঠিক ১৯ দিন দার্জ্জিলিংয়ে ছিলেন, অবশ্য ঐ তারিখের পরে কি ঘটিয়াছিল তৎসম্বন্ধে বাদীর বর্ণনা বাদ দিয়া ধরিলে। বাদী বলিতেছেন যে, ১৯০৯ সালের মার্চ্চ মাসে সত্যবাবু জয়দেবপুরে আসিয়া পৌঁছিবার পর পাহাড়ের যাদুমন্ত্রের কথা বলেন এবং তদনুসারে বাদী দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। সিফিলিস্ ছাড়া তাহার আর কোন অসুখ ছিলনা, দার্জ্জিলিং আসার পর তিনি বলিতেছেন (আমি ইহা কিছু সংক্ষেপে করিয়াছি)।

দার্জ্জিলিং ঘটনার বাদীর উক্তি

"আমি বেশ ভালই ছিলাম, তারপর এখানে পৌছিবার ১৪।১৫ দিন পরে আমি অসুস্থ হইলাম। রাত্রে পেটফাঁপা লইয়া অসুখ আরম্ভ হইল। সে রাত্রে আমি আশু ডাক্তারকে বলিলাম। পরদিন এক সাহেব ডাক্তার আসিয়া তিনি একটি ঔষধ ব্যবস্থা করিলে আমি এই ঔষধ খাইলাম। তৃতীয় দিনও আমি ঐ ঔষধই খাইলাম কিন্তু ইহাতে কোন উপকার হইল না। সেই রাত্রে ৮টা ৯টার সময় আমাকে একটা গ্লাসে (একটী ছোট গ্লাস দেখাইয়া) এক ঔষধ দিল। ইহাতে আমার কোনও উপকার হইল না। বরং এই ঔষধ খাইতেই আমার বুক জ্বলিয়া উঠিল, আমি বমি করিলাম ও অস্থির হইয়া পড়িলাম। আমার ঔষধ খাওয়ার ৩।৪ ঘণ্টার পরে এই লক্ষণ গুলি প্রকাশ পাইয়াছিল। আমি চীৎকার করিতে লাগিলাম। সে রাত্রে কোন ডাক্তার আসিল না।

চতুর্থ দিনে—"পরদিন প্রাতঃ কালে আমার রক্ত বাহ্যে হইল—খুব ঘন ঘন বাহ্যের বেগ হইল। আমার শরীর তুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তার পর আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম। শেষ মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত কোন ডাক্তার আসিয়াছিল কি-না তাহা আমি জানি না।

জেরার সময় মিষ্টার চৌধুরী এই বিবৃতি কেবল স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র। তিনি এইটুকু মাত্র বাহির করিয়াছেন, যে মাত্র বাদী প্রথমদিন ডাক্তার ক্যালভ্যার্টের নাম শুনিয়াছিল; এবং দ্বিতীয় দিন আশুডাক্তার তাহাকে ঔষধ দিয়াছিল, তখন সে চাৎকার করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তাহার বুক জ্বলিয়া যাইতেছিল। তাহার বমি হইয়াছিল এবং সে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল— "আশু তুমি আমাকে কি ঔষধ খাইতে দিয়াছ?"

এই বর্ণনা ঠিক পর পর এইরূপ দাঁড়ায়। ৫ই রাত্রি—পেট ফাঁপা।

৬ই—ডাক্তার ক্যালভ্যার্ট আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

৭ই—একই ঔষধ। ডাক্তার আসে নাই। রাত্রে আশু একটা ঔষধ দিয়াছিল, যাহাতে কিছুক্ষণ পরে তাহার বুক জালা করিয়াছিল, ও তাহাকে বমি করিতে হইয়াছিল।

৮ই—রক্ত বাহ্যে এবং তৎসঙ্গে সংজ্ঞাহীনতা। বাদী যতদূর জানে তখন পর্য্যন্ত কোন ডাক্তার আসে নাই।

শ্মশান রহস্য

বাদীর মামলা এই যে—পূর্ব্বোক্ত ৮ই তারিখে সন্ধ্যা ৭।৮ টার মধ্যে তাহাকে মৃত বলিয়া ধরা হয়, এবং পোড়াইবার জন্য একদল লোক কর্ত্তৃক পুরাতন শ্মশানে নেওয়া হয়। এবং তথায় পৌছিবার কয়েক মিনিট পরে খুব প্রবল বৃষ্টিপাত হয় তাহাতে অতিষ্ঠ হইয়া শববাহী দল তথায় কোন আশ্রয় না পাইয়া, আশ্রয়ের জন্য ছুটিয়া পলায়ন করে। শব দেহ একাকী ফেলিয়া যায় এবং চারিজন সন্ন্যাসী নিকটস্থ গুহার মধ্যে ছিলেন তাঁহারা তাহাকে দেখিতে পায় এবং তাহাকে জীবিত দেখিয়া তাহাকে লইয়া পালায় এবং লুকাইয়া রাখে। তারপর যখন ঝড় বৃষ্টি থামিল, তখন শব সৎকারের দল ও তৎসহ সত্যবাবু ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে শব উধাও হইয়াছে, তখন তাহারা চলিয়া গেল এবং পরদিন প্রাতঃকালে রাত্রে সংগৃহীত একটী শবদেহ সম্পূর্ণরূপে ঢাকা দিয়া শোভা যাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হয় ও পোড়ান হয়। এই কথা হইয়াছে যে ভাওয়ালের এক কুমারকে কুকুর বিড়ালের ন্যায় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, এই অপবাদ এড়াইবার জন্য ইহা করা হইয়াছিল।

বিবাদী পক্ষের মামলা এই যে, কুমার ৬ই মে তারিখের ভোর রাত্রে অসুস্থ হইয়া পড়েন, ৭ই তারিখেও অসুস্থ থাকেন এবং ৮ই তারিখ মধ্যরাত্রে মারা যান। তিনি পিত্তশূল রোগে মারা যান। দার্জ্জিলিঙে রাত্রে শবদাহ অসম্ভব বলিয়া তাহার মৃতদেহ পরদিন শোভা যাত্রা করিয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়, এবং তাহা সেইদিনের মধ্যে নূতন শ্মশানে পোড়ান হয়, যাহা বাদীপক্ষের মতে তখন মড়াপোড়াবার জন্য ইহাই একমাত্র শ্মশান ছিল। বাদীপক্ষে অসুখ সম্বন্ধে বাদীর নিজের ছাড়া আর কোন সাক্ষ্য নাই। এবং মৃত্যু হওয়ার সময় পর্য্যন্ত কি কি হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তাহার সাক্ষ্যই একমাত্র সাক্ষ্য। কিন্তু বিবাদীপক্ষের সাক্ষীগণের দ্বারা তাহার ইহা প্রমাণ করিবার অধিকার আছে যে, কি ঘটিয়াছিল বা তাহার বর্ণনার বিরুদ্ধে তাহারা যাহা বলিতেছে

তাহা অসত্য, এবং বাদী সেই সকল সাক্ষীগণকে বলিয়াছে যাহারা সন্ধ্যার একটু পরেই তাহাকে মৃত দেখিয়াছে কিংবা প্রায় রাত্রি ৯টার সময় তাহাকে পোড়াইবার জন্য শ্মশানে লইয়া গিয়াছে এবং বৃষ্টির সময় যেখানে আশ্রয় লইয়াছিল তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মৃতদেহ আর দেখিতে পায় নাই।

বিবাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন ডাক্তার ক্যাল্‌ভার্ট, যিনি কুমারের চিকিৎসা করিয়াছিলেন এবং নিম্নলিখিত সাক্ষীগণ। ১। মেজরাণী ২। সত্যবাব ৩। ডাক্তার আশুতোষ ৪। বিপিন খানসামা ৫। পার্শন্যাল ক্লার্ক বীরেন্দ্র ৬। দার্জ্জিলিঙের দলবলের অন্যতম এণ্টনি মোরেল ৭। ধাত্রী জগৎ মোহিনী দেবী (দাসী) ৮। সত্যবাবুর সম্পর্কীয় প্রজা শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়। ইহারা অসুখ সম্বন্ধে বলিতেছে এবং প্রথম ৬ জন অসুখের সমস্ত সময় ও মৃত্যু সম্বন্ধেও সাক্ষী দিতেছে। ডাক্তার ক্যালভার্ট কার্য্যতঃ অসুখের সমস্ত কাল ব্যাপী ও মৃত্যু সম্বন্ধেও সাক্ষী দিতেছেন। ঐ সকল সাক্ষী ছাড়া আরও বহু সংখ্যক সাক্ষী আছে, যাহারা প্রাতঃকালের শোভা যাত্রার সম্বন্ধে বলিয়াছে এবং এই সম্বন্ধে বলিতেছে যে শব বাহিত ও পোড়ান হইয়াছিল, তাহা কুমারের মৃত দেহ কিংবা বিবাদীপক্ষের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যাহা যথেষ্ট অর্থাৎ উহা ঢাকা ছিল না। দেহটী দেখা যাইতেছিল। এই সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য ৯৬ জন সাক্ষী ছিল। যদিও সকলেই মৃত্যু সম্বন্ধে এবং অসুখ বা শবদাহ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় নাই, কিন্তু অধিকাংশ সাক্ষী ঐ সাক্ষ্য দিয়াছে এবং বিবাদীপক্ষের অনেকে কমিশনে সাক্ষী দিয়াছে। সমস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্যক বুঝিতে হইলে কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা করা আবশ্যক হইবে। ইহা স্মরণ থাকিতে পারে যে, ৪ঠা মে তারিখে বাদীর সঙ্গে পরিচয় দানের পর সত্যবাবু ১৫ই মে তারিখের পূর্ব্বে কোন এক তারিখে একজন ব্যারিষ্টার সহ দার্জ্জিলিঙ গিয়াছিলেন, এবং সেই যাত্রায় দার্জ্জিলিঙের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ মিষ্টার এন, এন, রায়ের দ্বারা কতকগুলি সাক্ষীর সাক্ষ্য ও তাহাদের জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল। তখন কতকগুলি সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছিল তাহা জানা নাই, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ছিলেন ক্ষেত্রলাল মুখোপাধ্যায়, বাদীর দ্বারা যাহার জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে, এবং ১৭।৫।২১ তারিখে দার্জ্জিলিঙে যাহার সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছিল। যখন সাক্ষীদের বিবৃতি লওয়া হইতেছিল তখন সত্য বাবু ও গভর্ণমেণ্ট উকিল রায় বাহাদুর দার্জ্জিলিঙে ছিলেন, এবং তাহারা সকলেই একই হোটেলে অবস্থান করিতেছিলেন। একজন ব্যারিষ্টারও তথায় ছিলেন। এই ব্যারিষ্টার, মিষ্টার এন, এন, রায়ের আত্মীয়। আমি এতদ্বারা মিষ্টার এন,

এন, রায়ের উপর কোনরূপ দোষারোপ করিতে চাহিনা, কিন্তু সত্য বাবু যখন বলিতেছেন তিনি তাঁহাকে কেবল "চেঞ্জ" দিবার জন্য দার্জ্জিলিঙে লইয়া গিয়াছিলেন, তখন আমি তাহাকে বিশ্বাস করি না, তিনি যখন বলিতেছেন যে সাক্ষীরা কি বলিতেছিল তাহা তিনি জানিতেন না, তাহাও আমি বিশ্বাস করি না; কিন্তু উহা বিশেষ কাজের ব্যাপার নয়, যাহা আসল কাজের ব্যাপার তাহা হইতেছে এই যে, যে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল তাহা কালেক্টারের ইচ্ছায় হয় নাই, বা সেইরূপ হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। যদিও পরে ইহা কালেক্টারের ইচ্ছাতেই চলিয়াছিল।

যে সালে মিষ্টার এন, এন, রায় সাক্ষীদিগকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই প্রশ্ন কে গঠন করিয়াছিল তাহা জানা নাই; কিন্তু পরে অনেকগুলি প্রশ্ন তৈরী করা হইয়াছিল এবং অনুসন্ধান এইভাবে হইয়াছিল যে সাক্ষীদিগকে ঐ প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগের নিকট হইতে ঐগুলির উত্তর লওয়া হইয়াছিল। এই প্রশ্নগুলি ৩রা জুন তারিখে সরকারী উকিল রায় বাহাদুরের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল এবং যাহাতে এই প্রশ্নগুলি সাক্ষীদিগকে করা হয় ও তাহাদেব বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়, তজ্জন্য সেগুলি দার্জ্জিলিঙে পাঠান হইয়াছিল। রায়বাহাদুরের দ্বারা গঠিত এই প্রশ্নগুলি ৭।৬।২১ তারিখে একটী মন্তব্য সহ দার্জ্জিলিঙের ডেপুটী কমিশনার গুড্ সাহেবের নিকট পাঠান হইয়াছিল; এবং আরও পরে এক সেট প্রশ্ন এই উদ্দেশ্যে গঠিত ও ছাপান হইয়াছিল। এই শেষ সেটটী ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর রমেশ চন্দ্র দত্তের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল, এবং তিনি এই অনুসন্ধান সংক্রান্ত কাগজ পত্রের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। বিবাদীপক্ষে মিষ্টার রমেশ দাশ সাক্ষ্য প্রসঙ্গে বলেন যে তিনি এই প্রশ্নাবলী গঠিত করেন, এবং রায়বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করেন এগুলিতে চলিবে কিনা; এবং এই প্রশ্নগুলি যাহা সর্ব্বপ্রথম ৭ই জুনের পর গঠিত হইয়াছিল, তাহা সাক্ষীদিগকে প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণ করা হইয়াছিল, কিংবা অপিসারদিগকে পাঠান হইয়াছিল যাহাতে তাহারা বিবৃতিগুলি লিপিবদ্ধ করিতে পারে। তথাপি মিষ্টার চৌধুরী যে সাক্ষীরা এই ছাপান প্রশ্নগুলি গঠিত হইবার পূর্ব্বে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাদিগকে প্রশ্ন করেন যে, এই এই প্রশ্নের তাহারা উত্তব দেয় না কেন, এবং প্রশ্নগুলি দেখিয়া তাহারা কতকগুলি খুঁটিনাটি ব্যাপার বলেন নাই কেন? এই মামলায় যাহা ঘটিতেছে তাহা আরও পূর্ব্বের তারিখে স্থাপন করার ইহা আর একটি উদাহরণ। ৩রা জুন তারিখের গঠিত হাতের লেখা প্রশ্নাবলী পাঠাইবার সঙ্গে রায়বাহাদুর এই মন্তব্য পাঠাইয়াছিলেন।

সাধুর কাহিনী ঃ—

"সাধু বলিতেছে যে সে ভাওয়ালের মধ্যম কুমার, কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। তাহার কাহিনী এই যে, ১৯০৯ সালের ৮ই মে তারিখে ডাক্তারগণ মনে করেন যে সে মরিয়াছে, এবং তাঁহারা তাহাকে মৃত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তারপর শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল ও তথায় উহা চিতার উপরে স্থাপন করা হইল, কিন্তু চিতায় আগুন দিবার পূর্ব্বে এরূপ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল যে শবযাত্রীদল পলায়ন করেন এবং বৃষ্টি কমিলে তাহারা শ্মশানে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু দেখিল যে, মৃতদেহ উধাও হইয়াছে। যাহাহউক তাঁহারা চিতায় আগুণ দিল এবং গৃহে ফিরিয়া গিয়া বলিল যে কুমারের দেহ দাহ করা হইয়াছে। কাহিনীতে আরও প্রকাশ যে শব যাত্রীরা পলায়ন করিলে পর নিকটস্থ এক সন্ন্যাসী চিতার নিকটে আসিয়া দেখিল যে দেহে জীবন নাই, শবটি তাহারা আবাসস্থলে লইয়া গেল এবং মন্ত্রবলে দেহে জীবন সঞ্চার করিল।

তার পরে এই নোটে দ্বিতীয় কুমারের দেহের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে; গৌর বর্ণ, মোটাসোটা শরীর, সবল স্বাস্থ্য, বাদামী রঙের চুল, ২৭ বৎসর বয়স, সে ষ্টেপ-এ সাইডে মরিয়াছিল। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে সে তথায় তাহার পত্নী, ভ্রাতা, কতিপয় কর্ম্মচারী ও চাকর সহ বাস করিতেছিল এবং আরও বলা হইয়াছে, বৃষ্টিপাতের রেকর্ড হইতে জানা যায় যে ৮ই ও ৯ই তারিখে দার্জ্জিলিঙে বৃষ্টি হয় নাই।

এ বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন রহিয়াছে এবং ৭ই তারিখের শেষে একটি নোট আছে যে শবযাত্রার সময় টাকা ও খুচরাপয়সা ছড়ান হইয়াছিল ও গরীবদিগকে পয়সা দেওয়া হইয়াছিল।

বাদীর মামলা কখনও এরূপ ছিল না,—কেহ কখন প্রকারান্তরেও বলে নাই যে, সে মধ্যরাত্রে মারা গিয়াছিল, কিংবা সে মৃতপ্রায় হইয়াছিল, অতঃপর মন্ত্রবলে পুনর্জীবিত হইয়াছিল, কিংবা কেহ দেহ ব্যতিরেকে কাঠ পোড়াইয়াছিল। তাহার মামলা যথেষ্ট অসম্ভব, কিন্তু নোটটি যদি সাক্ষীদিগকে সংবাদ জানাইবার জন্যই লিখিত হইয়াছে, তবে তাহা ছাড়া অন্য কি উদ্দেশ্যে হইয়াছিল বলা শক্ত,—তাহা হইলে এইরূপ বোধ হইতেছে যে মৃত্যুর কথা মধ্যরাত্রি সর্ব্ববাদিসম্মত ধরিলেও সাক্ষীর মন আর তাহার পূর্ব্বে যাইবে না, এবং বৃষ্টিপাতের পূর্ব্ব হইতে বৃষ্টি হয় নাই বলিলে পূর্ব্বস্মৃতি আর জাগিবে না। কিম্বা প্রাতঃকালে শবযাত্রা হইয়াছিল বলিয়া সেই দিকেই মন যাইবে।

পরে যে ছাপান প্রশ্নাবলী সৃষ্ট হইয়াছিল এবং যাহা বিবাদীপক্ষ দ্বারা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, সেগুলি এই :—

১। তুমি ১৯০৯ সালের মে মাসে দার্জ্জিলিংএ উপস্থিত ছিলে ?

২। যদি তাই হয়, তোমার কি ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার, কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায়ের মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় ?

৩। তুমি কি দ্বিতীয় কুমারের মৃত্যু, শবযাত্রা এবং শবদাহের সময় উপস্থিত ছিলে ?

৪। তুমি কি দ্বিতীয় কুমারকে পূর্ব্বে জানিতে ? যদি তাহা না হয়, তুমি মৃত্যুর পর শব দেখিয়াছিলে ? যতদূর সম্ভব শবের বর্ণনা দাও।

৫। কখন শব যাত্রা কুমারের বাড়ী হইতে যাত্রা করে ? কখন শবদাহ ক্রিয়া শেষ হয় ? কোন্ শ্মশানঘাট ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং কোন পথে শবযাত্রা গিয়াছিল ?

৬। শবযাত্রার সময়ে বা শবদাহের সময়ে কোন ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল কিনা ?

৭। শবদাহক্রিয়া যদি প্রাতঃকালে হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব রাত্রে কোন ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল কি না, তাহা তোমার স্মরণ হয় ?

৮। যথাসম্ভব তোমার কি এমন লোকের নাম ও ঠিকানা মনে পড়ে যে তোমার জ্ঞান মতে মেজকুমার মৃত্যুকাল, কি শবযাত্রার সহিত বিংবা শবদাহের সময় উপস্থিত ছিল ?

৯। সাক্ষীকে সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে মেজকুমারের মৃত্যু শবযাত্রা ও শবদাহ সংক্রান্ত কোন ঘটনা মনে করিতে পারে কি না।

এই প্রশ্নাবলীকে তৈরী প্রশ্নাবলী বলিয়া উল্লেখ করা হইবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহা আর, সি, দত্তের দ্বারা তৈরী হইয়াছিল, এবং তিনিও তাহাই সাক্ষ্য দিয়াছেন। মিষ্টার লিণ্ডসে ভুল করিয়া বলিয়াছেন যে সম্ভবতঃ তিনিই সেগুলি গঠিত করিয়াছেন। যে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা যে এই সকল প্রশ্নের উত্তরে হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, কিন্তু প্রদত্ত উত্তর হইতে বুঝিতে পারা যায় সেরূপ হইয়াছে কিনা। সাক্ষ্যের বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে যে বিষয়ে আমি বলিতে চাই তাহা এই যে, ঠিক সেই সময়ের দলিলাদি, অসুখের সময়ের ঔষধের ব্যবস্থাপত্র, ও প্রেরিত টেলিগ্রাম, এইসবগুলির উপর বাদী নির্ভর করিয়াছিল। বিবাদীগণ দার্জ্জিলিঙের হিসাবপত্রাদি দাখিল করেন নাই। এইগুলি হইতে ডাক্তারের ভিজিট ও শব দাহের খরচ-পত্রাদি পাওয়া যাইত। ইহা স্মরণ হইবে যে ঢাকার কালেক্টর মিষ্টার লিণ্ডসেকে ২৭।১০।২১ তারিখে বড় রাণীকে মৃত্যু ও

অসুখ সংক্রান্ত সমস্ত টেলিগ্রামের কথা লিখিয়াছিলেন (একজিবিট নং ৫৫) এবং বড় রাণী ৯।১১।২১ তারিখে সেগুলি পাঠাইয়াছিলেন। জয়দেবপুরে মৃত্যু-জ্ঞাপক যে টেলিগ্রাম অবশ্যই পাঠান হইয়াছিল এগুলির মধ্যে সেটি নাই। একবার এইরূপ সূচিত হইয়াছিল যে বড়রাণী সেটি পাঠান নাই; কিন্তু পরে এই সূচনা স্পষ্টভাবে প্রত্যাহার করা হইয়াছিল। (৪-৭-৩৫ তারিখের ১০৭৯নং অর্ডার দ্রষ্টব্য)। বিবাদী পক্ষের মামলা এই যে বড়রাণী ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই, এবং ইহা ঠিক করিয়া বলা যায় না যে, তিনি ইহা গোপন করিতেছিলেন। কে এরূপ করিতেছিল তাহা নিম্নে জানা যাইবে।

১০ই মে তারিখে, যেদিন দাৰ্জ্জিলিঙের দল, দার্জ্জিলিঙ পরিত্যাগ করেন, সেইদিনই কর্ণেল ক্যালভার্ট বড়কুমারের নিকট একখানি মৃত্যুর শোক-সূচক পত্র রচনা করেন। সেই পত্রখানি বিবাদীপক্ষের সওয়াল জবাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ক্যালভার্ট বড় কুমারকে চিনিতেন না। বিবাদীপক্ষের কেহই জানে না কেন তিনি এই পত্র লিখিয়াছিলেন, কিংবা কখন তিনি উহা লিখিয়াছিলেন, এবং সত্যবাবু কখনও আসল চিঠিখানি দেখেন নাই। ১নং বিবাদী ৫-৬-২১ তারিখে উহার একটি নকল রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইয়াছিলেন (একজিবিট নং ২১৬০) কিন্তু তিনি বলেন যে জয়দেবপুর হইতে তাঁহার নিকট যে নকল পাঠান হইয়াছিল, উহা সেই নকলের নকল। লণ্ডনে যখন কর্ণেল ক্যালভার্টের সাক্ষ্য লওয়া হয়, তখন তিনি প্রথম জবানবন্দীতে এই বলিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন যে—উহা তাঁহার চিঠি। তিনি বলেন নাই যে তিনি উহা পাঠাইয়াছিলেন, আর তিনি যে উহার উত্তর পাইয়াছিলেন সে ত আরও দূরের কথা, যদিও চিঠির উপরেই একটা লেখা আছে—"২০-৫-০৯ তারিখে উত্তর দেওয়া হইল"; আর চিঠিতে যাহা লেখা আছে তৎসম্বন্ধে তিনি মাত্র এই কথা বলিয়াছেন যে চিঠিতে শুশ্রূষার কথা আছে। এই পত্রখানি, মূলতঃ সাক্ষ্য নহে, কিন্তু সমর্থনভাবে অত্যন্ত মূল্যবান, এবং বিবাদীপক্ষের মামলা যতদূর সম্ভব ইহাকে অবলম্বন করিয়াছে এবং সাক্ষ্যের বিচার করিতে হইলে উহা এখনই বিবৃত করা উচিত।

১, মণ্টেগ ভিলা
দার্জ্জিলিং
১০ই মে, ১৯০৯

প্রিয় কুমার,

আপনার সদয় হৃদয় ও কোমল প্রকৃতির ভ্রাতার মৃত্যুজনিত আপনার যে বিয়োগ সহ্য করিতে হইয়াছে, তজ্জন্য আমার আন্তরিক শোক গ্রহণ করুন। আমার মনে হয় তাঁহার অসুখের প্রকৃতি ও তাহার পরিণতি সম্বন্ধে বিশ্বাসের ফলেই এই আকস্মিক মৃত্যু-সংঘটিত হইয়াছে।

যেদিন সকালে আমাকে ডাকা হয়, সেদিন তখন তিনি এত সুস্থবোধ করিতে ছিলেন যে, আমি যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি, তাহাতে তিনি রাজী হন নাই, এমন কি তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর আন্তরিক প্রার্থনায় এবং উপদেশ তাঁহার অবস্থার সম্বন্ধে অত্যন্ত ব্যগ্র বন্ধুগণ ও তাঁহার মত করাইতে পারিলেন না। দিনের শেষদিকে তিনি পুনরায় আক্রান্ত হইলেন, অত্যন্ত গুরুতর আকারে শূল বেদনা উপস্থিত হইল। তাঁহার সেক্রেটারী প্রশংসনীয় আগ্রহসহকারে স্বয়ং বাহির হইয়া পড়িয়া আমাকে আমার কাজের মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং সময় থাকিতে এই অসুখে আমাকে চিকিৎসার জন্য ব্যাপৃত করিলেন। এইবার তিনি তাঁহার সেক্রেটারী ও বন্ধুগণের পরামর্শ শুনিলেন এবং আমাকে যথাযথ চিকিৎসা করিতে দিলেন। চামড়ার নীচে ফুঁড়িয়া ঔষধ দিতেই শূল বেদনা শীঘ্রই আরোগ্য হইল, কিন্তু ইতিমধ্যেই শরীরের বেদনায় এরূপ হইয়াছিলেন যে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন,এবং আমাদের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও অতিরিক্ত অবসন্নতাহেতু প্রাণ ত্যাগ করিলেন। আপনার ভ্রাতার জীবন রক্ষা করিতে যাহা কিছু করা সম্ভব সমস্তই করা হইয়াছিল এবং তাঁহার সঙ্গের লোকেরা যথেষ্ট সেবা যত্ন করিয়া ছিল। তাঁহার বন্ধুগণ যদি নিকটে থাকিতেন তাহা হইলে খুবই সুখের বিষয় হইত, কিন্তু তাঁহার রোগের প্রকোপ এত সহসা আসিয়া পড়িল এবং এত শীঘ্র শেষ হইল যে, ইহা সম্ভবপর হইল না। পূর্ব্ব হইতেই এই ধরণের অল্প অল্প আক্রমণ হইয়াছিল, এবং ইহা হইতে আরোগ্য লাভ করায় শেষ অসুখ সংঘাতিক হইবার পূর্ব্বে তাহার গুরুত্ব তিনিও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

আপনার আন্তরিক

জে, টি, ক্যালভার্ট

ক্যালভার্টের আরও কথা

কর্ণেল ক্যালভার্ট স্বীকার করিতেছেন যে, পরিবারের কোন লোকের প্ররোচনায়ই এই চিঠি লেখা হইয়াছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে ১০ই মে তিনি উহা লিখিয়াছিলেন, এবং ইহাতেও সন্দেহ নাই যে আমার সামনে যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেই কোন না কোন ব্যক্তি—ষ্টেপ এসাইড বাড়ীর লোকেরা—এসম্বন্ধে সমস্ত জানিত, যদিও তাঁহাদের মধ্যে কেহই একথা স্বীকার করিলেন না যে, তাঁহারা দার্জ্জিলিংএ ডাক্তার ক্যালভার্টের বাড়ী চিনিতেন।

ঠিক দুই মাস পরে ১৯০৯ সালের জুলাই তারিখে ডাক্তার ক্যালভার্ট হলপ করিয়া এভিডেবিট করিলেন, যাহা ইন্‌সিওরেন্সের টাকা বাহির করিবার জন্য সত্যবাবুর প্রয়োজন হইয়াছিল। আমিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ বিষয়ে যাহা কিছু করা হইয়াছিল তাহা সত্যবাবুই করিয়াছিলেন, এষ্টেট করে নাই। এবং যখন তাঁহার ডায়েরীতে উহা দেখা গেল এবং ইহাও দেখা গেল যে এ বিষয়ে নীডহাম চেষ্টা করিতেছেন,তিনি বাধা দিয়াছিলেন তখন এষ্টেট এই এফিডেবিট লইয়াছিল, এই জবাব পরিত্যক্ত হইল। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে উহা লইবার জন্য তিনি দার্জ্জিলিং যান নাই, কিন্তু নিশ্চয়ই তিনি উহার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এফিডেবিট কোম্পানীর ছাপা ফর্ম্মে এবং উহা এই মর্ম্মে লেখা :—

ডাঃ ক্যালভার্টের সার্টিফিকেট

পলিসি নং ৭৪৭৮৯

জীবন বীমাকারী—কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়

মৃত্যুর সার্টিফিকেট

আমি, জন টেল্‌ফু ক্যালভার্ট লেফ্‌টনান্ট কর্ণেল, আই এম,এস, সিভিল সার্জ্জেন, দার্জ্জিলিং

এতদ্বারা শপথপূর্ব্বক ঘোষণা করিতেছি যে. আমি কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায়কে ১৪ দিন ধরিয়া জানি; যে আমি তাঁহার শেষ অসুখের চিকিৎসা করিয়াছি; যে তিনদিন অসুখের পর ১৯০৯ সালের ৮ই মে তারিখে রাত্রি ১১টা ৪৫ মিনিটের সময় দার্জ্জিলিঙে প্রায় ২৭ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, যে তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইতেছে পৈত্তিকশূলের (গলষ্টোনের) তীব্র আক্রমণের পর অবসাদ।

জীবিতকাল লক্ষণসমূহও চেহারা হইতে অনুমান করা হইয়াছিল। যে রোগে মৃত্যু হইল তাহার লক্ষণ ১৯০৫ সালের ৬ই মে তারিখে প্রথম আমা কর্তৃক লক্ষিত হইয়াছিল ; এবং ৮ই তারিখের প্রাতঃকালে আক্রমণ প্রবল হয় এবং সেই রাত্রেই তিনি মারা যান।

জে, টি, ক্যালভার্ট।

দার্জ্জিলিঙের জেলা ম্যাজিষ্টেট এইচ, এম, ক্রকোডের সম্মুখে ইহার হলপ গ্রহণ করা হয়। যিনি উহা সহি করিতেছেন এবং পদবী দিতেছেন জাস্‌টিস্‌ অব দি পিস্‌।

মিষ্টার ক্রকোর্ড ৮।২।১০ তারিখে নিজে একটি মৃত্যুর সার্টিফিকেট সহি করিতেছেন (একজিবিট নং ২১১৩)। কেহই বলিতেছেন না যে তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কিছু জানিতেন। লণ্ডনে সাক্ষ্য গ্রহণ করায় মিঃ ক্রকোর্ড স্মরণ করিতে পারেন নাই, কিরূপে তিনি উহা দিলেন কিংবা কিরূপে উহার মধ্যে এত বিস্তারিত বিবরণ আসিয়া পড়িল।

ইহা এক্ষণে সর্ব্ববাদীসম্মত যে মেজকুমার ১৯০৯ সালের ৬ই মে তারিখের ভোররাত্রে অসুস্থ হইয়া পড়েন। বাঙ্গালীরা উহাকে রাত্রি বলিবে এবং বাদীর ন্যায় প্রত্যেক সাক্ষীই বলিয়াছে যে ৫ই তারিখের রাত্রে অসুখ আরম্ভ হয়।

বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, যখন সাক্ষীদের কমিশনে সাক্ষ্য লওয়া হইতেছিল, তখন বাহ্যতঃ এইরূপ মনে হইতেছিল যে ৭-৭-০৯ তারিখের বর্ণনা। ক্যালভার্টের এফিডেবিট দৃষ্টে অসুখটা চৌদ্দ দিনের ব্যাপার। ইহা যেন এই সূচনা করেছিল যে যদিও ইহা পরিষ্কার করিয়া বলে নাই তবুও ১৪ দিন ধরিয়া তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সাক্ষ্যে তিনি ইহা সন্দেহের মধ্যে রাখেন নাই। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে সাক্ষ্য দিতে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে কতকগুলি কাগজপত্র দেখান হইয়াছে এবং সেগুলির মধ্যে একটা হইতেছে "মামলার বিবরণ" যাহার ঠিক বিষয় বস্তু দুর্জ্ঞেয় ও অস্পষ্ট রাখা হইয়াছে। যদিও তাঁহাকে যিনি প্রথম জবানবন্দী করান, সেই মিঃ প্রিঙ্গেলের বিবৃতি হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে উহা মোকদ্দমার আরজি মাত্র। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে ঃ

প্রশ্ন। আপনাকে কি বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, নিবারণও গৃহচিকিৎসকের সাহায্যে আপনি ১৪ দিন কুমারের চিকিৎসা করিয়াছিলেন

উত্তর। কিছু বলিয়া না দিলেও আমি এই ঘটনা জানিতাম। তিনি আরও বলিলেন যে যখন তিনি কুমারকে প্রথম দেখেন, কুমার তখন যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন—তলপেটের ডানদিকে যন্ত্রণা অর্থাৎ পৈত্তিক শূলের

বেদনা। কুমারের দার্জ্জিলিঙ আসার মত দিবার জন্য আমি যখন কুমারকে প্রথম দেখি তখন ঐ যন্ত্রণাই ছিল। আমি দিনের পর দিন এই অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলাম। আমার যতদূর স্মরণ হয় মধ্যে মধ্যে তাঁহার সামান্য সামান্য আক্রমণ হইত, এবং পরিশেষে এই মারাত্মক আক্রমণ ইহাই হইয়াছিল যাহা আমরা পূর্ব্বে কখনও ভাবি নাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তিনি জানেন যে এটা ১৪ দিনের ব্যাপার, এবং মাঝে মাঝে শূল বেদনা আসিতেছিল এবং তাঁহার লক্ষ্য করিতে করিতে অবশেষে শেষ আক্রমণ ৮ই মে তারিখে প্রবলভাবে আসিল, এবং ইহাই তাঁহার এফিডেবিটের সহিত সামঞ্জস্য বিশিষ্ট। বাহ্যতঃ বাদীদের ইহা মনে হইয়াছিল যে এফিডেবিট কেবল কর্ণেল ক্যালভার্টের দ্বারা নহে, অপরাপর ব্যক্তির দ্বারা পোষণ করা হইবে,এবং ক্যালভার্টের পরে অ্যাণ্টনিমোরেলের সাক্ষ্য লওয়া হইলে তিনিও এই মর্ম্মেই সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে অসুখটা ছিল মধ্যে মধ্যে সংঘটিত জ্বর ও শূল বেদনা। এবং উহা ১০।১২ দিন ধরিয়া চলিতেছিল—প্রথম জবানবন্দীতে এইরূপই বলা হইয়াছিল যে, কুমারকে দার্জ্জিলিং আসিবার দুইতিন দিন পরেই কর্ণেল ক্যালভার্ট দেখিতে লাগিলেন, তিনি মধ্যে মধ্যে আসিতেছিলেন এবং প্রত্যেকবারই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল।

সাক্ষ্যের অনৈক্য

এক্ষণে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে এই সমস্ত মিথ্যা, যে কুমার ৬ই মে তারিখে অসুস্থ হন, এবং ৮ই তারিখে মারা যান। দার্জ্জিলিং আসার পর হইতে তিনি সুস্থ ছিলেন, ইহাই মেজরাণী, আশু ডাক্তার, বীরেন্দ্র ও সত্যবাবুর সাক্ষ্য। ৬ই তারিখে অসুস্থ হওয়ার পূর্ব্বে তিনি সুস্থ ছিলেন, এবং সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে যে তিনি দার্জ্জিলিঙে এখানে সেখানে বেড়াইতেছিলেন, সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছিলেন, বাহিরে আহার করিতেছিলেন, একটা সেলুনে বিলিয়ার্ড খেলিতেন, এমনকি একটা শিকারে যাওয়ার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা ও ব্যবস্থা করিতেছিলেন (বিবাদীর সাক্ষী ৫৭, ৭৯, ৭২, ১০)। আশু ডাক্তার এই দলের সঙ্গে যোগ দিয়া বলিতেছেন যে ৬ই পর্য্যন্ত কুমার সুস্থ ছিলেন, এবং সত্যবাবু ও অপর কতিপয় সাক্ষী তাঁহার মৃত্যুর ৬ দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সুন্দর স্বাস্থ্যের কথা বলিতেছেন (বিবাদীর সাক্ষী ৫৭) যদিও এ্যাণ্টনি মোরল বলিতেছেন যে কুমার কার্ল্টনস্ হোটেলে ভোজন করেন নাই, যাহা মিষ্টার প্রিভঁা পরে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহার ১২ দিন বা আরও কিছু পরে বার্লী ও সাগু খাওয়াইয়াছেন।

যাহা হউক ডাক্তার ক্যালভার্টের এফিডেবিট রক্ষা কল্পে কিছু কেরদানী করা হইয়াছিল। আশু ডাক্তার বলিতেছেন যে, তাঁহাদের দার্জ্জিলিঙ আসার ৩ কি ৪ দিন পরে ডাক্তার ক্যালভার্টকে ডাকা হইয়াছিল, এবং তিনি কুমারকে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার পরবর্ত্তী আসার তারিখ, পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত ৬ই তারিখ হয়। তাহা হইলে ১৪ দিন পাওয়া গেল। আশু ডাক্তার বলিতেছেন যে এই প্রথম আসার দিন আন্দাজ ২৪শে এপ্রিল তারিখে, তিনি ডাক্তারকে কুমারের ইতিহাস বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে কুমারের সিফিলিস্ ছিল, ও তাঁহার পৈত্তিকশূলবেদনা ছিল। সে সময়ে তাঁহার পৈত্তিকশূলের কোন লক্ষণ ছিল না, অর্থাৎ কোন যন্ত্রণাই ছিল না। ডাক্তার ক্যালভার্ট সিফিলিসের ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

নিম্নে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে এই পৈত্তিকশূল একটা সাজান বা বানান কথা, এবং বিবাদিগণ যে ম্যালেরিয়া জ্বরের কথা বলিতেছে তাহাও তাই। কিন্তু এখনকার মত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে যদিও তাঁহার পৈত্তিক শূল ছিল অর্থাৎ সে মধ্যে মধ্যে এই রোগে ভুগিত, কিন্তু তথাপি কর্ণেল ক্যালভার্ট কখনও উহা দেখেন নাই। বাদীকে জেরা করার ফলে যে অবস্থা দাঁড়াইল তাহাতে তাহাকে সাহেবের পোষাকে বাহির করা, সাহেবদের সঙ্গে কথা বলা ও ছুরি কাঁটা ব্যবহার করান দরকার হইয়া পড়িল, বলিয়া বিবাদী পক্ষ ক্যালভার্টকে এই ভাবে পরিত্যাগ করিল কিনা সে বিষয়ে আমি যে বিবেচনা করিয়াছি, উহা ঠিক নহে। ক্যালভার্টের কথামত ১৪ দিনের অসুখ ও মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণা—যাহার উপর তিনি দিনের পর দিন নজর রাখিয়াছিলেন এই সমস্ত একটি ঘটনার দ্বারা বাদ পড়িতেছে।

ঔষধ ব্যবস্থা

৬ই মের পূর্ব্বে কোন ঔষধের ব্যবস্থা পত্র নাই। বিশেষত বাদী স্মিথষ্টানি ষ্ট্রীটে কোম্পানীর খাতা হইতে নকল দাখিল করিয়া ব্যবস্থাপত্র গুলি প্রমাণ করিয়াছে এবং এগুলি ৬ই তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষত আশু ডাক্তার স্বীকার করিতেছেন তিনি ব্যবস্থা পত্র ও তাহার নকলগুলি সযত্নে রক্ষা করিতেন। সেগুলি উপস্থিত করা হয় নাই, এবং এইরূপ ইঙ্গিত করা ও হয় নাই যে ডাক্তার ক্যালভার্ট প্রথমবার আসিয়া যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে তাহার নকল লইতে কোন চেষ্টা করা হইয়াছে কিম্বা বলা হইয়াছে যে সেগুলি পাইবার উপায় নাই। ইহা সত্য নহে যে কর্ণেল ক্যালভার্ট ৬ই মের পূর্ব্বে কুমারকে দেখিয়াছিলেন এবং ইহা সেইরূপই মিথ্যা।

যে ৬ই মের পূর্ব্বে তিনি পৈত্তিক শূল দেখিয়াছিলেন। কর্ণেল ক্যালভার্টের এফিডেবিটে বহু দিনের অসুখ; ইহা সত্য বলিয়া তাঁহার সাক্ষ্য এবং তিনি যে মধ্যে মধ্যে বেদনা দেখিয়াছিলেন ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। এই বিষয়টী উল্লেখ যোগ্য যে ক্যালভার্ট যদি সিফিলিস্ দেখিতেন, বা উহার জন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলে তিনি এফিডেবিটে লিখিতেন, কারণ পার্শ্বেই একটা ছাপান নির্দ্দেশ আছে যে কোন ব্যক্তি মরিল ডাক্তার কেবল তাহাই লিখিবেন না, অধিকন্তু আর কোন পুরাতন বা নূতন রোগ থাকিলে তাহাও লিখিবেন। ইহা ও উল্লেখযোগ্য যে এফিডেবিটে তিনি কুমারের বয়স লিখিয়াছেন "প্রায় ২৭ বৎসর, যদিও কুমারের বয়স তখনও ২৫ হয় নাই।" বিবাদী পক্ষে বলা হইয়াছে ক্যালভার্ট একটা আন্দাজ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সেরূপ কিছুই করেন নাই। রায় বাহাদুর কে, পি, ঘোষের ছাড়া এই বিষয়ের অন্যান্য হলফ নামাতে এই ভুল দেখা যাইতেছে। এই সাধারণ ভুলটির একটি সাধারণ কারণ আছে। আমি সত্যবাবুর ডাইরীতে দেখিতেছি যে তিনি কুমারের জন্ম তারিখ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন, ইহাতে দেখা যাইতেছে যে তিনি ঠিক বয়স জানিতেন না। ইহা স্পষ্ট যে ক্যালভার্ট তাঁহার হলফ নামায় যাহা কিছু দরকার হইয়াছিল তাহাই লিখিয়াছেন; খুটি নাটি বিষয় সত্য কিনা আদৌ চিন্তা করেন নাই,—যতক্ষণ তাঁহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে মৃত্যু সত্যই ঘটিয়াছে। ১১টা ৪০ মিনিটের সময় যে মৃত্যু ঘটিয়াছিল, হলফ নামার এই বাকী অংশটা আমি এই সংক্ষিপ্ত কারণে মিমাংসা করিতে চাই না, বিশেষতঃ তিনি যখন হলফ করিতেছেন যে মধ্যরাত্রে মৃত্যুকালে তিনি সত্যই উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে যে অন্যান্য ঘটনা বলা হইতেছে তাহার দ্বারাই উহা বাদ পড়িবে।

দেহের কোনও স্থানে কোনও প্রকার যন্ত্রণা হইলে লিষ্ট ওপিয়াইর বাহ্যিক প্রয়োগ করা হয়; অর্থাৎ ইহা দ্বারা পিত্তশূলের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। ৬ই তারিখে যখন ডাক্তার ক্যালভার্ট তাহাকে পরীক্ষা করেন, তখন উদরে কোন শূল ছিল না, ইহা ডাক্তারের কথা হইতেই বোঝা যায়। অধিকন্তু ৬-৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত যে টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে কোন শূলের উল্লেখ নাই এবং ঐ বেদনার জন্য কোন প্রকার ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা করা হয় নাই। এই কারণে এই শূলের সত্যতা সম্বন্ধে আমার বিষম সন্দেহ আছে। তবে এই কথা সর্ব্বতোভাবে সত্য যে ডাক্তার ক্যালভার্ট ৬ই তারিখ পর্য্যন্ত কোন যন্ত্রণার লক্ষণ দেখেন নাই এবং ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া মনে হয় যে লিষ্ট ওপিয়াই যকৃতের বেদনার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছিল। এই শূল

কখনই পিত্তশূল নহে। কারণ ডাক্তার ক্যালভার্ট তাহা হইলে ইহাকে একটা বিচ্ছেদ বলিতে পারিতেন না। এমন কি প্রতিবাদীপক্ষের যে সব ডাক্তার ডাকিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ ঔষধের ব্যবস্থা করিবার সময় এই পিত্তশূলের কোন লক্ষণ দেখেন নাই।

ষষ্ঠ রাত্রি

এই রাত্রি ভালভাবেই কাটিয়াছিল, কারণ ৭ই তারিখের প্রাতের ৭-১০ মিনিটের টেলিগ্রামে লেখা ছিল (Ex ২৮২ (এ))

জয়দেবপুরে সংবাদ দান

গত রাত্রে কুমারের সুনিদ্রা হইয়াছিল, কোন জ্বর বা যন্ত্রণা হয় নাই।

৭ই মে তারিখে সত্যবাবু তাহার দৈনন্দিন-লিপি পুস্তকে লিখিয়াছেন, "রমেন্দ্রের অসুস্থতা এখনও বর্ত্তমান। পাকস্থলীর বেদনার সহিত সামান্য জ্বর আছে; রাত্রে আদৌ নিদ্রা হয় নাই, ফল পাঠাইবার জন্যে তার করিয়াছি।"

টেলিগ্রামে লেখা আছে যে, ৬ই তারিখের রাত্রিতে কুমারের সুনিদ্রা হইয়াছিল। ইহাতে মনে হয় যে এই ডায়েরীর লিপি মিথ্যা। সত্যবাবু বলিয়াছেন যে ডায়েরীর লিখিত বিষয় হয়ত তাহার নিজের অনিদ্রার বিষয়ে ইঙ্গিত করিতেছে, কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ তিনি যদি পনের দিন পরে অতীত বিষয়ের অনুধ্যান করিয়া ডায়েরী লিখিতেছিলেন, তবে সেখানে কোন বিশেষ রাত্রিতে নিজের নিদ্রা হয় নাই—ইহা যেন একটি প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া মোটেই মনে হয় না।

আশুর কাণ্ড

কুমারের অবস্থা সম্বন্ধে ৭ই মে এই দিন কেবল টেলিগ্রাম পাঠান হয় নাই। এই দিনে ডাক্তার আশুতোষ ভিন্ন অন্য কোন ডাক্তারের কোন ব্যবস্থাপত্র নাই এবং পূর্ব্বেকার মামলায় সাক্ষ্য দিবার সময় ডাক্তার আশুতোষ এই ব্যবস্থাপত্র গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এখন তিনি ইহা নিজের বলিয়া অস্বীকার করিতেছেন।

ব্যবস্থাপত্রখানি এইরূপ :—

ভাওয়ালের কুমার আর, এন, রায়ের জন্য

কুইনাইন সাল্ফ্	৬ গ্রেণ
অ্যালয়েন	$\frac{১}{২}$ গ্রেণ
এক্স নাক্স ভমিকা	$\frac{১}{৪}$ গ্রেণ

ইনানমিন	১ গ্রেণ
আর্সেনিয়াস অ্যাসিড	$\frac{1}{50}$ গ্রেণ
ইম্পট পিল (সিলভার)	কিউ আর এস (উপযুক্তপরিমাণ)

আই, টি, ডি, এস। পি, সি, এস। এ, টি, দাস গুপ্ত

শেষের অক্ষরগুলির অর্থ পঁচিশটি পিল এবং খাইবার নিয়ম প্রত্যহ আহারের পর তিনবার সেব্য।

ডাক্তার ম্যাক্‌গিলক্রায়েষ্টের মতে এই ব্যবস্থাপত্র কুইনাইন, আর্সেনিক এবং নাক্স ভমিকায় ষ্ট্রিক্‌নিন আছে। ইহা অ্যালয়েন এবং এনোনিয়াম নামক দুইটি দারুণ জোলাপ আছে। ইহার সম্বন্ধে তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী এইরূপ ব্যবস্থাপত্র পুরাতন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে সাধারণ টনিকরূপে দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু টনিক মাত্র এক গ্রেণ ইননিমিনের সঙ্গে অর্দ্ধগ্রেণ অ্যালয়েন অতিরিক্ত। ঔষধের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ না ছাড়াইয়া যাইলেও তাহা রোগপ্রতিকারে বিশেষ সাহায্য করে নাই। নির্দ্দেশানুযায়ী দৈনিক তিনবার ঔষধ সেবন করিলে রোগীকে মলশূন্য করাইবে। কর্ণেল ম্যাক্‌গিলক্রায়েষ্ট মনে করেন যে এই ব্যবস্থাপত্র ৬ই তারিখের ব্যবস্থাপত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত।

পরবর্ত্তী ব্যবস্থাপত্রের ঔষধ উদরের উত্তেজনা প্রশমন কারক। এবং ৭ই তারিখের ব্যবস্থাপত্রের আর্সেনিক পাকস্থলীর প্রদাহ উৎপাদন করিবে—কুইনাইন এবং আর্সেনিক উভয়েই পাকস্থলীর পক্ষে উত্তেজক। কেহ এই ঔষধ পিত্তশূল, কিংবা পাকাশয়ের প্রদাহে এবং পেট ফাঁপায় দেয় না।

মেজর টমাস এই ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে বলেন :—কুইনাইনের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে তাহার ম্যালেরিয়া থাকিতে পারে। অ্যালয়েল ও ইননিমিন এই দুটি জোলাপ, এবং আমার সন্দেহ হয় যে রোগীর কোন কোষ্ঠকাঠিন্য ছিল এবং তাহার জোলাপের প্রয়োজন ছিল।

নাক্স্ ভমিকা এবং আর্সেনিক এই দুইটিই টনিক। আর্সেনিক নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় দেওয়া হইয়াছিল।

"নির্দ্দেশমত বটিকা সেবন করিলে কুমারের ৫ই এবং ৬ই তারিখে পেটের বেদনা অথবা পাকস্থলীর প্রদাহ থাকিলেও আর্সেনিক বিষ প্রয়োগের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে না।" (প্রশ্নে এই দুইটি তারিখের উল্লেখ ছিল)।

ইহাদের মধ্যে তিনটি একত্র মিশাইলে আর্সেনিক গলিবে না। ডাক্তার ম্যাকগীলক্রায়েষ্ট্ ঔষধগুলির ফল ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে এই ব্যবস্থাপত্রের বারগুণ ঔষধে ১৪৮ গ্রেণ কুইনাইন ৬ গ্রেণ অ্যালয়েন, $\frac{1}{2}$ গ্রেণ ষ্ট্রিকলিন, ($\frac{1}{8}$ হইতে $\frac{1}{2}$ গ্রেণ মারাত্মক), ১২ গ্রেণ ইননিমিন, প্রায় $\frac{1}{2}$ গ্রেণ আর্সেনিক (২ গ্রেণ মারাত্মক) থাকিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ডাক্তার ম্যাকগিলক্রিষ্ট এবং মেজর টমাসের উক্তির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। এবং সম্ভবতঃ ম্যাকগিলক্রিষ্ট মেজর টমাসের সহিত একমত হইবেন যে, এই ঔষধ ম্যালেরিয়া সারাইবার উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়াছিল।

কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট প্রতিবাদীগণের পক্ষে বলিতেছেন :—

প্রঃ—এই ব্যবস্থা পত্র কিসের জন্য ? (প্রদর্শক Ex ৫১ (এ),

উঃ—আমার মনে হয় ডাক্তার দীর্ঘকাল স্থায়ী ম্যালেরিয়ার সঙ্গে রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, ইহাই সন্দেহ করিয়াছিলেন। পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্যে হয়ত কুইনাইন এবং আর্সেনিক সাধারণ প্রতিষেধক, এবং অ্যালয়েন এবং ইননিমিন জোলাপ মাত্র হিসাবে দিয়াছেন।

প্রঃ—মাত্রাগুলি কি স্বাভাবিক ?

উঃ—মাত্রাগুলি ঔষধ প্রস্তুত করণ বিদ্যার নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে নয়।

ইহার পর তিনি বলেন যে কোন মানুষকে এইরূপ বারটি বটিকা সেবন করান যাইতে পারে না। এবং যদি উহা সেবন করাইতে প্রবর্ত্তিত করা যায়, তবে ফলাফল সম্বন্ধে ম্যাকগিলক্রিষ্টের সঙ্গে তাহার মতের কোন বিভিন্নতা নাই, এবং তারপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল।

প্রঃ—যদি নাক্সভমিকা মারাত্মক মাত্রায় সেবন করান যায়, তবে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পাইবে ?

উঃ—ষ্ট্রীকনিন বিষপ্রয়োগের লক্ষণ দেখা যাইবে।

তিনি বলেন যে, এই লক্ষণগুলি অর্দ্ধ ঘণ্টা বা ঘণ্টার তিন চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। এই প্রসঙ্গে কর্ণেল ম্যাকগিলক্রিষ্ট বলিয়াছেন সে বিদ্রাবণের উপর সময় নির্ভর করে, পাকাশয়ে শূন্যতা অথবা খাদ্য পরিপূর্ণ ছিল কিনা ইহাও একটি দেখিবার বিষয়।

দুইজনেই ইউল্যান্সের ব্যবহার শাস্ত্রের সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিয়াছেন, এবং সেই পুস্তকে এই অনুচ্ছেদটি আছে।

"বিষগ্রহণের এবং উহার লক্ষণ প্রকাশিত হইবার মধ্যবর্ত্তী সময়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানে গৃহীত আর্সেনিকের বেশী বা কম মাত্রার উপরে নির্ভর করে এবং সে

সময়ে পাকস্থলী শূন্য অথবা খাদ্যপূর্ণ ছিলকিনা তাহার উপরেও নির্ভর করে।" (লায়ন্সের ব্যবহার স্বতন্ত্র নবম সংস্করণের ৪৮৮ পাতা)।

এই ব্যবস্থাপত্র যে পুরাতন ম্যালেরিয়ার পক্ষে উপযুক্ত এবং ইহা মলশূন্য করিতে ও পাকাশয়ের উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে পারে এ বিষয়ে ডাক্তারগণের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ নাই। কেহই এমনকি ডাক্তার আশুও বলেন যে এই ব্যবস্থাপত্র পিত্তশূলের উপযোগী নয়।

একটা কথা বার বার বলা হইয়াছে, যে সব চিকিৎসকগণ কুমারের চিকিৎসা করিয়াছেন তাহারাই ঔষধের উপযোগিতা সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল জানেন, (যদিও প্রত্যেকেই ৫১ (এ) নম্বরের প্রদর্শিত বস্তু অস্বীকার করিয়াছেন) এবং এই সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন করা হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে যদি ৭ই তারিখে কুমারের শরীরে আর্সেনিক বিষ প্রবেশ করিয়া থাকে তবে ইহার উৎপত্তিস্থল নিশ্চয়ই এই ব্যবস্থাপত্র। ডাক্তার টমাস স্বীকার করেন যে যদি কেহ অন্য কাহাকেও আর্সেনিক বিষ প্রয়োগে প্রাণসংহার করিতে মনস্থকরে তবে সে এমন একটি ব্যবস্থাপত্র করিবে বা করাইয়া লইবে যাহা দ্বারা উদরাময়ের লক্ষণগুলি, মলের সহিত রক্তের মিশ্রণ, এবং মলের সহিত আর্সেনিকের একত্র সংযোগের কারণ দেখা যায়। আমি ইহা হইতে অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবস্থাপত্রের সাক্ষ্য আলোচনা করিয়া দেখি নাই। ইহা একটি হত্যা বা চেষ্টিত হত্যার মামলা নয়।

কুমার মরিয়াছে কিনা, অথবা তাহাকে মৃত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে কিনা, অথবা সঠিক ভাবে তাহার মৃত্যুর সময়ের বর্ণনা দেওয়া হইতেছে কিনা, অথবা সাক্ষ্যদ্বারা তাহার মৃত্যু গোধূলির সময়ে কিংবা একটু পরে ঘটিয়াছে কিনা, এই সম্বন্ধে আমি তদন্ত করিতেছি।

এখন আমি ৭ই তারিখে মেজকুমারের অবস্থা এবং এই ব্যবস্থাপত্রের বিষয়ে আলোচনা করিব।

আশুর পূর্ব্ব সাক্ষ্য

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ডাক্তার আশু ১৯২১ সালের শেষভাগে উপস্থাপিত মানহানির মামলায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, পি, ঘোষের নিকট এবং পুনর্ব্বার সেই মামলাতেই মিঃ বি, এম, ঘোষের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। সে শ্রীপুরের মামলায়ও সাক্ষ্যদান করিয়াছে, মিঃ এস, পি, ঘোষের নিকট সে ১৯২১ ডিসেম্বর মাসে সাক্ষ্যদান করেন। এবং এই জেরা ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসের কোন বিশেষ দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। মিঃ বি, এম, ঘোষের নিকট

তিনি ৬-১২-২২ তারিখ হইতে ১৫-১-২৩ তারিখ পর্য্যন্ত, এবং সাবজজের সামনে ১৯২২ সালের ১২ই হইতে ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সাক্ষ্য প্রদান করেন। প্রতিবারেই কুমারের অসুখের চিকিৎসা এবং দার্জ্জিলিংএ মৃত্যুর বিষয় লইয়া তদন্ত করা হয়। প্রতিবারেই তিনি জেরার সময় ৬ই তারিখ হইতে ৮ই তারিখ পর্য্যন্ত রোগচিকিৎসার বিষয় বর্ণনা করেন। ইহার কোন বারেই তিনি কোন ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন বলিয়া অস্বীকার করেন না।

৭ই মে তারিখের ঘটনা সম্পর্কে তিনি মিঃ এস, পি, ঘোষের সামনে বলেন কর্ণেল ক্যালভার্ট বৈকাল প্রায় ৯টায় বা ৯৷৷টায় আসেন। তখন কুমার পিত্তশূলে ছট্‌ফট করিতেছিলেন। তিনি ইনজেক্‌সন করিতে চাহিতেন কিন্তু কুমার সে প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় তিনি একটি খাইবার ঔষধের ব্যবস্থা করেন (প্রদর্শিত বস্তু ৩৯৫)। তিনি বলেন যে কুমারকে কে সেই ঔষধ খাইতে দিয়াছিল তাহা আমি জানি না। সম্ভবত নার্স এবং অন্যান্য লোকেরা ঔষধ খাইতে দিয়াছিল। মিঃ বি, এম, ঘোষের সামনে তিনি বলেন, আমি দার্জ্জিলিংএ মেজকুমারের জন্য কোন ঔষধের ব্যবস্থা করি নাই। তিনি ডাক্তার ক্যালভার্ট অথবা নিবারণবাবুর নির্দ্দেশমত ঔষধ সেবন করাইতেন (প্রদর্শিত বস্তু ৪৬০—৪৬৬ (এফ) দাগযুক্ত অনুচ্ছেদ। এই মামলায় তাহাকে ব্যবস্থাপত্রখানি দেখান হয়। কিন্তু তিনি পূর্ব্বের ন্যায় একই উত্তর দেন, এবং শ্রীপুর মামলায় তিনি বিষয়টি বেশ খোলাখুলিভাবে বুঝাইয়া দেন। তিনি বলিয়াছেন:—

৬ই মে ডাক্তার ক্যালভার্ট তলপেটে বেদনার জন্য এবং জ্বরের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা দেন। জ্বরের জন্য কি ঔষধ দেওয়া হয় তাহা আমার স্মরণ নাই। অজীর্ণতার জন্য ৬ই তারিখে কোন ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল কিনা তাহা আমার মনে নাই। ৬ই তারিখে প্রাতঃকালে ডাক্তার ক্যালভার্ট মাত্র একবার আসিয়াছিলেন। ৭ই তারিখে ক্যালভার্ট আসিয়াছিলেন এবং আমি সেদিন কোন ব্যবস্থাপত্র করি নাই। ৭ই তারিখে ডাক্তার ক্যালভার্ট কি ব্যবস্থাপত্র দিয়াছিলেন তাহা আমার মনে নাই। ৬ই এবং ৭ই তারিখে অন্য কোন ডাক্তার আসেন নাই। (Ex ৩৯৪ (২))

তারপর তাহাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করা হইল যে, তিনি আর্সেনিকের ব্যবস্থাপত্রখানি করিয়াছিলেন কি না, এবং ইহা তাহাকে দেখান হইয়াছিল অথবা তাহাকে পড়িয়া শুনান হইয়াছিল এবং তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, কিনা?

আশু.—আমি কোন ঔষধের ব্যবস্থাপত্র করি নাই।

তাহা হইলে ব্যাপারটি এইরূপ দাঁড়ায় যে, কর্ণেল ক্যালভার্ট ৭ই তারিখে আসিয়া এই ব্যবস্থাপত্র করেন এবং তাহার স্থির বিশ্বাস যে ডাক্তার নিবারণ

সেদিন আসেন নাই। মিঃ এস, পি, ঘোষের সামনে তিনি বলিয়াছেন ডাক্তার নীলরতন দুইতিন দিন ধরিয়া চিকিৎসা করিতেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ৭ই তারিখের বেদনার বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন তিনি কেবল মাত্র ডাক্তার ক্যালভার্টের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সেই শূলবেদনার উপশমের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং শ্রীপুরের মামলায় তিনি ইহার পুনরাবৃত্তি করেন এবং পরিষ্কার বলিয়াছিলেন যে সেইদিন ডাক্তার নিবারণ আদৌ আসেন নাই। এই শ্রীপুরের মামলার সময় যখন ডাক্তার আশু প্রতিবাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছিলেন তখন তাহাকে সমস্ত ব্যবস্থাপত্রগুলি দেখান হয়, তথাপি তাহার উত্তর একই, যে তিনি ঐ ব্যবস্থাপত্র করেন নাই, ক্যালভার্ট করিয়াছেন।

লণ্ডনে প্রতিবাদীগণ ডাক্তার ক্যালভার্টের নিকট এই ব্যবস্থাপত্র দেন নাই। ইহা দেওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল, কারণ ইহাদ্বারা পিত্তশূলের, শোকজ্ঞাপক চিঠির, এবং মৃত্যুর এফিডেভিটের প্রমাণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। জেরার সময় তাহাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, কুমারের ঐরূপ অবস্থায় তিনি এই ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন না। আসল কথা এই যে সংক্ষেপে তিনি ব্যবস্থাপত্রের বিষয়ে অস্বীকার করেন।

সুতরাং যখন ইহার জন্য আর তাহাকে দায়ী করা গেল না, তখন মিঃ চৌধুরী এই বলিয়া মামলা আরম্ভ করিলেন যে, ডাক্তার নিবারণের নির্দ্দেশমত এই ব্যবস্থাপত্র আশু ডাক্তার লিখিয়া লইয়াছিল, এবং তিনি ডাক্তার ম্যাকগিল-ক্রিষ্টের নিকট আভাস দিয়াছেন, ডাক্তার কিংবা ডাক্তারগণ সেইজন্য ম্যালেরিয়া আছে বলিয়া সন্দেহ করেন। এই বিষয়ে আশু ডাক্তার সাক্ষ্যদানকালে এইরূপ বলিয়াছে :—

প্র—কুমার যখন অসুস্থ হইয়া দার্জ্জিলিংএ ছিলেন তখন আপনি কি কোন ব্যবস্থাপত্র করিয়াছিলেন ?

উ—না।

প্র—আপনি কি কোন ব্যবস্থাপত্র লিখিয়াছিলেন ?

উ—আমি ডাক্তারগণের পরামর্শমত একখানি লিখিয়াছিলাম, আমি ব্যবস্থাপত্রখানি করি নাই, আমাকে লিখিবার জন্য বলা হয়, আমি উহা লিখিয়াছিলাম। হয় ডাক্তার নিবারণ অথবা ডাক্তার ক্যালভার্ট আমাকে ইহা লিখিতে অনুরোধ করেন।

এই ব্যবস্থাপত্র কখন লেখা হইয়াছিল, কেন অথবা কোন অবস্থায় এই

ঔষধ সেবন করান হইয়াছিল কিনা, এবং হইয়া থাকিলে উহার কি ফল হইয়াছিল এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই।

ইহা ডাক্তার ক্যালভার্টের লেখা নয়, কারণ তিনি সেকথা অস্বীকার করিয়াছেন। ইহার জন্য ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার নিবারণকে দায়ী করা যাইতে পারে না। কারণ তিনি ৭ই তারিখে আসেন নাই। ইহা হইতে এইরূপ মনে হইবে যে ব্যাপারটির এইখানেই শেষ মীমাংসা হইয়া গেল, এবং এই ব্যবস্থাপত্রের জন্য আশু ডাক্তারই সর্ব্বতোভাবে দায়ী। কারণ তিনি নিজেই উহা লিখিয়াছেন এবং উহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। এইরূপ মনে হয় যে, তাহাদের মধ্যে কাহারও উপর ইহা আরোপ করা না হইলেও যখন নিবারণ ডাক্তার মারা গিয়াছে, তখন তাহার ঘাড়ে সহজেই ঐ দোষ নির্ভয়ে চাপান যাইতে পারে।

৭ই তারিখে ডাক্তার ক্যালভার্ট বা নিবাবণ কেহই কোন ব্যবস্থাপত্র করেন নাই। সুতরাং এই ঔষধের ব্যবস্থা পত্রখানি একটু অশুভ ও অতিশয় আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হয়। কেহই ইহা লিখিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন না। সাক্ষ্য দেখিয়া বুঝা যায় যে এই প্রকারের ব্যবস্থাপত্র সেইদিনকার অসুখের অবস্থার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

৭ই তারিখে মেজকুমারের অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে!

এই দিনের টেলিগ্রামে কুমারের ৬ই তারিখে রাত্রিতে সুনিদ্রা হইয়াছিল—ইহা ভিন্ন অন্য কোন কথার উল্লেখ নাই।

সকাল ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত জ্বর বা বেদনার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। ডাক্তার ক্যালভার্ট এবং ডাক্তার নিবারণ উভয়েই রোগী দেখিতে আসিয়াছিলেন।

দিবা ১০টা হইতে বৈকাল ৪টা পর্য্যন্ত সত্যবাবুর মতে রোগীর একই অবস্থা। আশুবাবুর কথানুযায়ী তখন কুমারের জ্বর আরম্ভ হইয়াছে।

অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত বেদনা এবং যন্ত্রণা ছিল, এবং সত্যবাবু বলিয়াছেন যে তাহার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছিল কিনা ইহা বলা শক্ত, তবে তিনি প্রাতঃকালের ন্যায় সুস্থ ছিলেন না।

সত্যবাবু বলেন যে হয় ক্যালভার্ট অথবা নিবারণবাবু সন্ধ্যার সময় একবার আসিয়াছিলেন। তাহারা কোন ব্যবস্থাপত্র দিয়াছিলেন বলিয়া তাহার মনে নাই।

ডাক্তার আশুতোষ এই দিন সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহা এইরূপ :—

৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত (সকাল)—কুমার ভাল ছিলেন।
১০টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত —জ্বর হইয়াছিল বলিয়া তাহার স্মরণ নাই।
২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত —হয়ত জ্বর হইয়াছিল, তবে তিনি সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না।

গোধূলি হইতে রাত্র দশটা পর্য্যন্ত } পিত্তশূলের বেদনা গোধূলির পূর্ব্বে হইয়াছিল, সন্ধ্যার সময় জ্বর খুব বেশী ছিল, কি কম ছিল তাহা আমার ভাল করিয়া মনে নাই

আমি তাহার মনের ভাব স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। তিনি জ্বরের উপযোগী ব্যবস্থাপত্র প্রমাণ করিবার চেষ্টায় আছেন, কিন্তু বেদনার পক্ষে অনুপযোগী। অবশেষে তিনি বলেন:—

গোধূলির সময় কুমারের পিত্তশূল হইয়াছিল। টেলিগ্রাম দেখিয়া আমার একথা মনে হইল। তাহার বেদনার আতিশয্য এত গুরুতর হইয়াছিল যে তজ্জন্য তাহাকে বিশেষ ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার দরকার হইয়াছিল। আরও একখানি ব্যবস্থাপত্রের সম্ভবত দরকার হইয়াছিল। সেইদিন তাহার যে বেদনা উঠিয়াছিল সে কথা আমার বেশ মনে আছে। ইহা পিত্তশূল ছিল। যখন তাহার বেদনা উঠিয়াছিল তখন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি যে ঘরে মারা যান, সেই ঘরের পরের ঘরে তখন তিনি শুইয়াছিলেন। যখন শুইয়া ছিলেন তখন তিনি বিষম বেদনায় ছটফট করিতেছিলেন।

এই বেদনার সময়ে কুমারের সম্মতি না থাকায় 'মরফিয়া' ইনজেকশন দেওয়া হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে কোন আফিংও সেবন করান হয় নাই। এমন সময় হয় কর্ণেল ক্যালভার্ট অথবা ডাক্তার নিবারণ আসেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ আর্সেনিকের ব্যবস্থাপত্রখানি বলিয়া যান। তিনি আমার নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে পিত্তশূলে এই ঔষধ দেওয়া চলে না। এমন কি পিত্তশূল থাকিলে জ্বরের সময়ও ইহা প্রয়োগ করা যায় না। তিনি বলেন যে ইহা একমাত্র ম্যালেরিয়া এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের লক্ষণ থাকিলে দেওয়া চলে, কিন্তু মেজ কুমারের সেরূপ কোন অসুখ ছিল না। তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে কুমারের এইদিনে সামান্য উদরাময় হইয়াছিল, এবং তিনি পূর্ব্বে যখন সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তখন ম্যালেরিয়ার কথা বলেন নাই। ডাক্তার নিবারণ মারা গিয়াছে বলিয়া তিনি শূলের সময় ইহা দিয়াছিলেন ইহা ধরিয়া লওয়া চলে না, এবং তাহার কথানুযায়ী তিনি ঐদিন মোটেই আসেন নাই।

দুইটি বিষয় বেশ সুস্পষ্ট। ক্যালভার্ট কিংবা নিবারণবাবু কেহই ৭ই মে

আসেন নাই, কারণ আসিয়া থাকিলে সেইদিনের অবস্থার উপযোগী তাহাদের স্বাক্ষরযুক্ত ব্যবস্থাপত্র রাখিয়া যাইতেন। আপাততঃ ধরিয়া লওয়া যাউক যে কুমারের রাত্রিকালে পিত্তশূল হইয়াছিল, এবং পাশের ঘরে যেখানে তাহাকে পরের দিন ৮ই তারিখে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেখানের কথা যেন তখন স্মরণ হয় নাই। প্রতিবাদীপক্ষ স্বীকার করিয়াছে যে, তাহাকে ৭ই তারিখে দিবাভাগে পাশের ঘরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। জমিদারীর দপ্তরী বিপিন, বীরেন্দ্র এবং সত্যেনবাবু এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন।

গোধূলির পরেও ৭ই তারিখের সন্ধ্যাবেলা তিনি তাহার শয্যাগৃহে ছিলেন। যখন তিনি যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিলেন তখন আশু ডাক্তার তাহাকে নিজের বিছানায় শুইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন এবং সেই সময়ে যে ব্যবস্থাপত্রের আবির্ভাব হয় তাহাতেই আর্সেনিকের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

প্র—আপনি কি তাহাকে উহাদ্বারা বেদনার উপশম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন?

উ—না, উহা দ্বারা নয়।

ইহা কখনও যন্ত্রণা দূর করিতে পাবে না। পরন্তু বেশীমাত্রায় সেবন করিলে ইহা দ্বারা বেদনার সৃষ্টি হইতে পারে। ডাক্তার ম্যাকগিলক্রিষ্ট এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, কুমার যখন বেদনায় কষ্ট পাইতেছিলেন তখন তাহাকে রাত্রিকালে পাশের ঘরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সত্যের ভাই শ্যামাদাস তখন সেক্রেটারিয়েটে কেরাণী ছিল। টাকা আত্মসাৎ করিবার অপরাধে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। ইহাতে বোঝা যাইবে যে প্রাতঃকালে শবদাহ ব্যাপারে সে-ই (সত্যের ভাই) সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডা ছিল। ৭ই তারিখে সন্ধ্যা ৬-৩০টার সময় তাহার কুমারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তখন কুমার বেদনায় খুব কষ্ট পাইতেছিলেন, এবং তাহার মলনিঃসরণ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পরের দিন ৮ই তারিখে গিয়া দেখেন যে কুমারকে অন্য এক ঘরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কুমারকে যে দিনেরবেলা সরান হইয়াছিল এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য সত্যবাবু বলেন যে ৬ই তারিখ হইতেই তিনি অসহ্য বেদনায় গড়াগড়ি দিতেছিলেন। ৬ই তারিখের টেলিগ্রামে বেদনার কোন উল্লেখ না থাকায়, এবং শুধু ৯৯ ডিগ্রি জ্বর ছিল এই কথার উল্লেখে তিনি বলেন যে ৭ই তারিখের রাত্রিতে বেদনা খুব বৃদ্ধি পায় বলিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তবে তিনি বলিলেন যে শয্যায় শুইয়া তিনি ছটফট করেন নাই। উহা বাড়াইয়া বলা হইয়াছিল মাত্র।

আশু ডাক্তার যে ব্যবস্থাপত্র দিয়াছে তাহা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া মনে হয় না যে, কুমারের জ্বর ছিল। (Ex৫১ (এ)। ৭ই তারিখের পূর্ব্বে কুমারের কোন জ্বর ছিল না, যদিও ডাক্তার আশুতোষ ৬ই তারিখের বায়ুনিঃসারক ব্যবস্থাপত্রে জ্বরের আভাস পাইয়াছেন। আমার মনে ইহা দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে জ্বর ছিল, এই কথা ব্যবস্থাপত্র দ্বারা প্রমাণ করাইবার প্রয়োজন ছিল; এবং এই কারণেই রায় সাহেব এবং ফণীবাবু এবং প্রতিবাদী পক্ষের ভৃত্যগণ কুমারের মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া হইত এই কথা বলিবার জন্য ব্যস্ত ছিল।

আমি এই সাক্ষ্যের একটি কথাও বিশ্বাস করি না। মিঃ চৌধুরী বড়রাণীর লিখিত ৬-২-০৯ তারিখের একখানি চিঠির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উহাতে বড়রাণী লিখিয়াছেন :—

"সেজ ঠাকুরপো ভাল আছেন, আবার গতরাত্রে তাহার জ্বর হইয়াছে।" এখানে তিনি তাহার নিজের স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছেন— আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা পত্রের মধ্যেও নিজেদের স্বামীর নাম উল্লেখ করে না। এবং ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসের শাশুড়ীর চিঠিগুলিতে তখন মেজকুমারের জ্বরের কথা আছে এবং তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যাইবেন। আমরা জানি তিনি সিফিলিসের চিকিৎসার :জন্য কলিকাতা গিয়াছিলেন। কুমারের ম্যালেরিয়া ছিল, একথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। কারণ একথা ব্যবস্থাপত্রদ্বারা প্রমাণিত হয় না। এমন কি ডাক্তার আশুতোষও বলেন না যে, কুমারের ম্যালেরিয়া ছিল, অথবা তিনি সেজন্য তাহার চিকিৎসা করিয়াছেন। তিনি তখন একজন যুবক এবং সবেমাত্র এক মেডিক্যাল স্কুল হইতে সাধারণ পরীক্ষা পাশ করিয়া বাহির হইয়াছেন! এ অবস্থায় তিনি কুমারের চিকিৎসা করিবার ভার গ্রহণ করিবার কথাও ভাবিতে পারেন না। তাহার মুখ দিয়া সত্য কথা বাহির হইয়াছিল যে ৭ই তারিখের বেদনার জন্য ইহা কোন প্রকারেই প্রতিষেধক হইতে পারে না।

কুমারের পীড়ার অবস্থা

এই দিনের ব্যাপারগুলি অতি সহজেই বুঝা যায়। এই দিনে কোন ডাক্তার আসে নাই, টেলিগ্রাম না করিয়া ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল যে গোধূলি পর্য্যন্ত কুমারের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু ডাক্তারেরা ক্যালভার্টের ইনজেকসন দেবার প্রস্তাবের কথার সাক্ষ্যের সত্যতা রক্ষা করিবার জন্য রাণীকে ঐরূপ বলিতে বিশেষ বাধ্য করান হইয়াছিল। বেদনার কেবল লক্ষণ না থাকিলে এই প্রস্তাবে স্বতঃই সন্দেহের উদ্রেক

করে। 'মরফিয়া' পিত্তশূলের প্রতিষেধক নয়, ইহাতে বেদনার উপশম হয় মাত্র। সত্যবাবু বলিয়াছেন যে কেহ পিত্তশূল সন্দেহে মরফিয়া ইনজেকশন দেয় না, যেমন লোকে ফোঁড়া কাটিবার পূর্ব্বে রোগীকে ক্লোরফর্ম্ম করিয়া লয়। ইহা নিশ্চিত করিয়া কখনই বলা যায় না যে কখন আবার পিত্তপাথরী হইতে আরম্ভ করিবে।

প্রতিবাদীপক্ষের বর্ণনা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ডাক্তার ক্যালভার্ট ৬ই তারিখের প্রাতঃকালে কোন বেদনার লক্ষণ দেখেন নাই। তিনি ৭ই তারিখে আদৌ আসেন নাই বলিয়া মনে হয়। যদি তিনি আসিয়া থাকেন তিনি কোন উদরশূলের লক্ষণ দেখেন নাই। ৬ই তারিখের পূর্ব্বে কুমারের কোন প্রকার অসুখ ছিল না; এবং ১৪ দিনের অসুখের কথা প্রতিবাদীপক্ষ ছাড়িয়া দিয়া কুমারের সুস্থতার কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। ৭ই তারিখ পর্য্যন্ত ক্যালভার্ট উদরশূল দেখেন নাই, অথচ তিনি বরাবরই মাঝে মাঝে বেদনার কথা আলোচনা করিতেন এবং তিনি দিনের পর দিন এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। প্রথম দিন তিনি দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা দেখেন এবং তদনুযায়ী ঔষধের ব্যবস্থা করেন। এই ভাবে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহার কোন সত্যতা নাই। তিনি কেবলমাত্র ৬ই তারিখে পেটফাঁপা দেখিয়াছেন এবং তজ্জন্য সেইদিন একখানি মাত্র ঔষধের ব্যবস্থাপত্র করিয়াছেন। তিনি পুনরায় ৮ই তারিখে কুমারের সঙ্গে দেখা করেন। এখন দেখা দরকার, এই মারাত্মক দিনে কি ঘটিল।

৮ই মে,

৮ই মে তারিখের সম্পর্কে বিবাদীদের কাহিনী সুস্পষ্ট। মেজরাণী বস্তুতঃ বলিয়াছেন—

সকাল বেলার অবস্থা

রাণীর কথিত বিবরণী এই প্রকারের—

ডাঃ ক্যালভার্ট আসিয়া ইনজেকসান দিতে চাহিলে কুমার রাজী হইলেন না। কুমার তাঁহার শুইবার ঘরের পাশের এক ঘরের মেঝেতে তোষকের উপর শুইয়াছিলেন, রাণী এই ঘরটিকে সাম্‌নের ঘর বলেন না; বলেন এটি চতুর্থ ঘর অর্থাৎ সাম্‌নের ঘরের পরের ঘরটী।'

নিবারণ সেন, ডাক্তার প্রথমে ৮টা অথবা ৯টায়—ডাঃ ক্যালভার্টের কিছু আগে অথবা পরে—আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কুমারের ঘরে ঢুকিলেন এবং আমি পাশের ঘরে ঢুকিয়া দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী দরজায় গিয়া দাঁড়াইলাম।

আশু ডাঃ এবং সত্যবাবু ছিলেন, আর বোধ হয় মুকুন্দও ছিল। ডাক্তারেরা ঘরের মধ্যে মিনিট দশেক থাকিয়া রোগীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। তারপর তাঁহারা বসিবার ঘরে যান।

রাণী বলিয়াছিলেন যে. উপরতলার সাম্‌নের ঘরই বসিবার ঘর; এবং আমি বলিয়াছি যে এই ঘরে দিকেই সেই ক্রমনিম্ন রাস্তাটী গিয়াছে। রাণী, বলিতে চান যে, রাস্তার ধারের দিকের ঘরটি পাঁচ নম্বর ঘর।

তিনি বলিয়াছেন যে কুমার ৪নং ঘরে শুইয়াছিলেন, এবং ৩নং ঘর তাঁর (রাণীর) নিজের শুইবার ঘর ছিল, পরে দেখা যাইবে যে ৪নং ঘরই তাঁর শয়ন ঘর এবং কুমার সাম্‌নের ৫নং ঘরেই শুইয়াছিলেন। এই ৫নং ঘরকে বসিবার ঘর বলিবার উদ্দেশ্য হইতেছে যে ইহা দ্বারা বাদীপক্ষের সাক্ষ্য—যে কুমারকে সাম্‌নের ঘরে প্রায় ৭টার সময় মরার মত পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে বলিয়াছিল তাহাকে অবিশ্বাসযোগ্য করা যায় না।

এই কথা এখন ছাড়িয়া দিলেও ব্যাপারটা দাঁড়ায় এইরূপ—সকালে কুমার ভাল ছিলেন এবং রাণী খোলাখুলি বলিয়াছেন যে তাঁর (কুমারের) তখন অম্লশূল বা অন্য কোন ব্যথা ছিল না। সকাল দশটায় কিম্বা সাড়ে দশটায় একটু শূলবেদনা ও বমি দেখা যায়। ১২টা হইতে ২টা অথবা ২-৩০ পর্য্যন্ত শূলবেদনা খুব বাড়িয়াছিল। দাস্তের সঙ্গে আম ও রক্ত পড়িয়াছিল; স্নানের ঘরে ৪।৫ বার দাস্ত হয় এবং তারপর বেড্‌প্যানে বাহ্যে গিয়াছিলেন। রক্ত ও আম দেখা গেলে ডাঃ ক্যালভার্টকে ডাকা হইয়াছিল কিন্তু তাঁহাকে তখন পাওয়া যায় নাই।

প্রশ্ন :—দাস্তের সঙ্গে আম ও রক্ত বাদে আর কোনও লক্ষণ ছিল?

উত্তর :—শূলব্যথা, ছটফটানি, বমির ভাব এবং দুএকবার বমি করা ছাড়া আর কোন উপসর্গ ছিল না।

জেরার সময় রাণী বলিয়াছিলেন যে, দাস্ত পাত্‌লা ছিল, কিন্তু জলের মত পাত্‌লা নহে।

তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে কুমারের পেটের অসুখ হইয়াছিল।

২।২।৩০ টার সময় ডাঃ ক্যালভার্ট আসিয়া ইন্‌জেক্‌শানের জন্য পীড়াপীড়ি করেন কিন্তু কুমার রাজী হন নাই।

বৈকাল ৪টা ৫টার মধ্যে কুমার ইন্‌জেক্‌শান্‌ লইতে রাজী হন। ইহার পর হইতে বেদনা কমিতে থাকে, কিন্তু কুমার তখনই অধিকতর দুর্ব্বল ও শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন।

জেরায় রাণী জোর করিয়া বলিয়াছেন যে, ইন্‌জেক্‌শানের অল্প পরে

নার্স আসিয়াছিল। কুমারের শরীর ঠাণ্ডা হইতেছিল। নার্সরা তাঁর শরীরে একপ্রকার পাউডার দিয়া মালিশ করিতে থাকে, এবং তিনি বিছানার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। কর্ণেল ক্যালভার্ট রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আহার করিতে চলিয়া যান।

রাণী বলিয়াছেন যে ইন্‌জেক্‌শান্ বোধ হয় দুইবার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ঠিক তাহা স্মরণ হয় না।

গোধূলি সময়ের অবস্থা

তাঁহার (রাণী) মামা, সূর্য্যনারায়ণ বাবু, ডাঃ বি, বি, সরকারের সঙ্গে আসিলেন। তাঁহারা দুজনেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ডাক্তার বাবু কুমারকে পরীক্ষা করিয়া প্রায় ৭ হইতে ১০ মিনিটকাল ঘরে থাকিয়া চলিয়া যান। সূর্য্যনারায়ণ বাবু প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে চলিয়া গেলেন। যখন ডাঃ সরকার রোগীকে পরীক্ষা করিতেছিলেন তখন ডাঃ ক্যালভার্ট এবং ডাঃ নিবারণ ঘরের ভিতর যান নাই। দুজনেই ঘরের মধ্যে ছিলেন এবং যখন ডাঃ সরকার কুমারকে পরীক্ষা করেন তখন কুমারের শরীর ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা হয় নাই।

রাণী অস্বীকার করিয়াছেন যে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে ডাঃ সরকার কুমারকে মৃত বলিয়া জানাইয়াছিলেন।

মধ্যরাত্রের অবস্থা

ডাঃ ক্যালভার্ট ডাঃ নিবারণের এবং আশু ডাক্তারের সম্মুখে কুমারের মৃত্যু হয়, বিবাদীপক্ষ ঐ কথা বলেন।

ডাঃ ক্যালভার্ট যাইবার পরে ফিরিয়া আসিয়া মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। বাদীর পক্ষের কোনও সাক্ষ্য মৃত্যুর পরের এই দিনের সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই ষ্টেপ্ এসাইডেব জমিদার মিঃ ওয়ার্ণিকল্—যিনি সত্যবাবু ও মুকুন্দের সঙ্গে চুক্তি করিয়া কুমারকে বাড়ীভাড়া দিয়াছিলেন—তাঁহার এক মুন্সি, নাম ছিল রাম সিং সুবা, সে বলিয়াছে যে সে ঐদিন সাড়ে চারিটার সময় লেবং-এ ঘোড় দৌড় দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল এবং খাইয়াছিল। সে ষ্টেপ্ এসাইডের ১৫ ফিট্ নীচে থাকিত। খাইবার দুঘণ্টা পরে সে ষ্টেপ্ এসাইডের দিকে মেয়ে মানুষের কান্না-কাটি শুনিয়া ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছিল। তখন প্রায় সাতটা অথবা সাড়ে সাতটা হইবে। সে নীচের তলায় চাকর বাকরদের কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিল এবং শুনিল যে কুমার মারা গিয়াছেন। সে উপরে উঠিয়া ৫নং ঘরের সম্মুখে বস্ত্রাচ্ছাদিত কুমারের মৃতদেহ দেখিতে

পাইল, এবং তখনইদেখিল যে সেই ঘরে ডাঃ বি, বি, সরকার বসিয়া আছেন। ডাঃ আশু, শালাবাবু, অর্থাৎ সত্যবাবু, এবং বাড়ীর আরও দু একজন সেখানে ছিলেন। সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন; সাক্ষ্য তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলে নাই, শুধু ৮।১০ মিনিট দাঁড়াইয়া চলিয়া আসিয়া ছিল। সাম্‌নের ঘরে যাইবার ও আসিবার পথে বারান্দা সংলগ্ন ঘরগুলি অতিক্রম করিয়া যখন সে চলিয়া যাইতেছিল তখন সে চক্‌চকে দরজার মধ্য দিয়া দেখিল তৃতীয় ঘরটিতে একখানি লোহার খাটে পড়িয়া রাণী খুব চেঁচাইয়া কাঁদিতেছেন। 'এই ঘর বাহির হইতে তালা বন্ধ ছিল।'

এই সাক্ষীই প্রথমে ডাঃ বি,বি,সরকারকে রাত্রি ৭।৭-৩০টার সময় সেইখানে লইয়া গিয়াছিল। জেরার সময়ে মনে হয় নাই যে বিবাদীপক্ষ হইতে সন্ধ্যা কালে ডাঃ বি, বি, সরকারের সম্বন্ধে কিছু বলিবার ছিল। এবং সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে এইরূপ মতপ্রকাশ করা হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালের এই ডাঃ বি, বি, সরকার এখন সাধারণ স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং তিনি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় সকল প্রমাণ করিবেন, কিন্তু রাম সিং সুবাকে এখনও দুর্ণাম দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে এই বলিয়া, যে কুমার ৫নং অথবা সাম্‌নের ঘরে মারা যান্ নাই, ৪নং ঘরে মরিয়াছিলেন।

এখন এই দিনের টেলিগ্রাম ও ঔষধের ব্যবস্থাপত্রগুলি দেখা যাক্ :—

একৃস্ ২২৫ ৭-২০ (সকালে) কল্য জ্বর ও অল্প বেদনা ছিল, এখন অবস্থা স্বাভাবিক, আশঙ্কার কারণ নাই।

এক্স ২২১ সকালে ১১-মিঃ—জ্বর নাই, অল্প বেদনা, বমির ভাব আছে। সিভিল্ সার্জ্জন দেখিতেছে; ভয় নাই, অন্নপথ্য দিয়া 'রওনা হইতেছি, ১০০০৲ টাকা পথ খরচা পাঠাইবেন। এক্স ২২২ বৈকালে ৩-১০মিঃ—কুমারের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন কেবলই জলের ন্যায় রক্ত মিশ্রিত দাস্ত হইতেছে; শীঘ্র আসুন।

ইহার পরের টেলিগ্রামে মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয়। সে টেলিগ্রাম দেখানো হয় নাই। প্রশ্ন হইতে পারে এই টেলিগ্রাম কখন প্রেরিত হইয়াছিল এবং মৃত্যুর সময়ে সম্বন্ধে ইহাতে কি বলা হইয়াছিল ?

আমার বিবৃতির উপর আস্থা স্থাপন করিয়াই বসিয়া থাকিবে না যে "৮ই তারিখের প্রাতঃকালে আক্রমণ প্রবল এবং এদিন সন্ধ্যায় মৃত্যু।"

৬ই মের ভোররাত্রে অসুখ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মেজকুমার সুস্থ ছিলেন এই স্বীকৃত বিষয়ের এক্ষণে আমি আলোচনা করিব।

এ বিষয়ে সাক্ষ্যের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে পৈত্তিকশূল কি তাহা আমি

বিবৃত করিব, কারণ ঔষধের ব্যবস্থাপত্র ইহার সহিত মিল খায় কিনা তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। উপস্থিত বিষয়ে বাদীর সাক্ষী লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ম্যাক্‌গিলক্রিষ্ট, অবসর প্রাপ্ত আই, এম, এস, এম, বি, সি এইচ, বি, (এডিনবরা) এম ডি, (এডিনঃ) এম, আর, সি, পি (লণ্ডন), ডি, এস, সি (এডিনবরা)। তিনি ঔষধের ক্রিয়া-বিজ্ঞানে ডি, এসসি উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি আট বৎসর ধরিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ফিজিওলজির অধ্যাপক ছিলেন এবং যথাস্থানে সিভিল সার্জ্জন ছিলেন। কুইনাইন, মশা ও পীতজ্বর সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় নৌ-বহর জরিপ বিভাগে সার্জ্জেন ও ভারতগভর্ণমেণ্টের ষ্টাটিস্‌টিক্যাল অফিসার এবং ইলেক্‌ট্রো-কার্ডিয়াগ্রাফের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী।

বাদীর আর একজন সাক্ষী ডাক্তার ব্র্যাড্‌লী, এম ডি (কানাডা) সি এইচ, এস (কানাডা) ট্রপিক্যাল মেডিসিনের রয়াল সোসাইটির সভ্য।

বিবাদীগণ সাক্ষ্য দিয়াছেন দুইজন ডাক্তারের, মেজর টমাস আই, এম, এস, এম, ডি (ডারহাম), এম, আর, সি পি (লণ্ডন) ও লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট এল, আর, সি, পি, এম আর, সি, এম, এস, বি, বি, এফ (লণ্ডন) মেডিক্যাল কলেজের অস্ত্রচিকিৎসক ও ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক। এই সকল ডাক্তারের সাক্ষ্য, সাক্ষ্যরূপে তাহাদের আলোচনা চলিতে পারে; কিন্তু এই বলিতে চাই যে সামান্য কয়েকটি ছাড়া ম্যাক্‌গিলক্রিষ্টের কোন উপপত্তির সম্বন্ধে ঔষধের ক্রিয়া বিষয়ে আপত্তি তোলা হয় নাই, এবং যদিও ৮ই তারিখের প্রদত্ত লক্ষণগুলিতে কি ঘটিয়াছিল সে বিষয়ে তাঁহার মতের সহিত কর্ণেল ডেন্‌হাম্ হোয়াইটের মতের সহিত প্রায় মিলিয়া গিয়াছে; ইহা মেজর টমাসের বিরুদ্ধমত। তাঁহার নিকট হইতে ৮ই তারিখে কুমারের উদরাময় হইয়াছিল এই গুরুতর বিষয় গোপন করিয়া মিষ্টার চৌধুরী ম্যাক্‌গিলক্রীষ্টকে এই প্রশ্ন সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন যে, কোন এক মিষ্টার এক্সের (নাম করা হয় নাই) নামে যখন ডাক্তার নালিশ করিয়াছিলেন, তখন সে তাহার লিখিত বিবরণে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনিয়াছিল কিনা। গিলক্রীষ্ট এই উত্তর দিলেন যে এইরূপ ইঙ্গিত মিথ্যা, কিন্তু আমি তখন মনে করিয়াছিলাম এবং এখন মনে করি যে এই প্রশ্ন করিবার কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ ছিল না।

পৈত্তিকশূল কি এবং ইহার দূরবর্ত্তী কারণ যাহাই হউক আসন্ন কারণ কি সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। যকৃতে সঞ্চিত পিত্ত হিপ্যাটিক্ নল নামক একটি নলের দ্বারা সিষ্টিক্ নামক নলে চালিত হয় এবং তথা হইতে উহা পিত্তকোষে চালিত হয়। এই পিত্তকোষ একটি আধারের কাজ করে এবং

সিষ্টিক্ নলের দ্বারা আবার পিত্তকে পিষিয়া আর একটি সাধারণ নল দিয়া বাহির করিয়া দেয় এবং পরিপাকের জন্য উহা যখন প্রয়োজন হয়, তখন উহাকে অন্ত্রের মুখস্থিত নলের সহিত সংযুক্ত করে। পার্শ্বের নকসাটি এই তিনটি নল দেখাইতেছে—পাথরি পিত্তকোষে অসুস্থ অবস্থা আনয়ন করে এবং তাহারা নানা আকারের হইয়া থাকে, কখন কখন বালির দানার মত হয়, সেগুলি পিত্তের সহিত বাহির হইয়া যায়, এবং কোন অসুখ সৃষ্টি করে না; কিন্তু খুব বড় পাথরি সিষ্টিক্ বা সাধারণ নলে আটকাইয়া যায়, এবং যখন আটকাইয়া যায় তখন তীব্র যন্ত্রণা হয়। ইহাকে বলে পৈত্তিক শূল। পুস্তকে এই যন্ত্রণাকে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বহুদর্শী ডাক্তার ম্যাকৃগিল-ক্রীষ্টের যে সাক্ষ্য সম্বন্ধে কেহই আপত্তি উত্থাপন করে নাই, আমি তাহা হইতেই বর্ণনা দিতেছি। যন্ত্রণা দুই এক মিনিট অন্তর অন্তর প্রবল হয় কিংবা যখন একবার আক্রমণে পাথরি বাহির হইয়া যায়, তখন হঠাৎ যন্ত্রণা বন্ধ হয়, এবং তখন রোগ আপনা আপনি ভাল হইয়া যায়, ও ভবিষ্যতে সাবধান হওয়া ছাড়া আর কোন চিকিৎসার দরকার হয় না। শূল যন্ত্রণার আক্রমণের মধ্যে মধ্যে যে চিকিৎসা করা হয়—তাহাকে 'বিরাম চিকিৎসা' বলে। কোন নিয়মিত বিরাম আছে বলিয়া বোধ হয় না, কারণ কখন যে আবার পাথরী হইবে এবং বাহির হইয়া যাইতে না পারে আবার কখন এতটা বড় হইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে এইরূপ প্রস্তর বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বে ও পরে অজীর্ণ হয়, কর্ণেল ম্যাকৃগিলক্রীষ্ট ইহা অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু তিনি কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধে স্বীকার করেন নাই; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে ইহা ফলই হোক্ আর সহ-ফলই হউক, ইহা সাধারণতঃ এক সঙ্গেই বর্ত্তমান থাকে। মিষ্টার চৌধুরী ব্র্যাড্লিকে জিজ্ঞাসা করেন যে প্রাইস সাহেবের মত প্রামাণ্য কিনা এবং ডাক্তার স্বীকার করেন যে প্রাইস্ প্রামাণ্য গ্রন্থকার। তাঁহার ঔষধের গ্রন্থে তিনি আর বেশী কিছু বলেন নাই এবং ম্যাকগিল ক্রীষ্ট পীড়ার আসন্ন কারণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ঠিক তাহাই পোষণ করিতেছেন। সর্ব্বশেষ দূরবর্ত্তী কারণ সংক্রমণ ও পিত্তকোষের সর্ব্বদা প্রদাহই হউক কিম্বা আসল পাথর বলিয়াই কোন জিনিষ থাকুক উহাতে কিছু আসে যায় না, তবে ডাক্তার টমাস এবিষয়ে একটা কল্পনা করিয়াছেন যাহা আমিও পরে বলিব। কিন্তু প্রাইস্ ইহা সম্ভব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সত্য সত্যই এরূপ পাথর দেখিয়াছেন। পীড়ার আক্রমণের সময় এই যন্ত্রণা যাহা অববাহিকাতে উৎপন্ন হয়। পাকস্থলীতে না গিয়া বরাবর দক্ষিণ

স্কন্ধে উঠিয়া থাকে। পাকস্থলীর সহিত এই ব্যাপারের কোনই সম্বন্ধ নাই, পাকস্থলীতে পিত্ত প্রত্যক্ষভাবে প্রবাহিত হয় না, কেবল মাত্র অন্ত্রমুখের নলের দ্বারা যায়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে পিত্তকোষের পাথরি পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দ্বিগুণ দেখা যায়, এবং মৃত্যুর পর পরীক্ষায় প্রায় পাঁচ গুণ দেখা যায়, এবং চিকিৎসার জন্য যাহা আসে তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ দেখা যায়,— যে সকল পীড়া চিকিৎসাধীনে আসে তাহা ৩০ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যে দেখা যায়, ৪০ হইতে ৬০ বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ বয়স (প্রাইস)। ইহাও সকলে স্বীকার করেন যে পৈত্তিক শূল হইতে মৃত্যু অতি কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে, এবং যে বিষয়ে কোনই মতদ্বৈধ নাই তাহা এই যে গলষ্টোন্ পীড়ায় সম্পূর্ণরূপ কোষ্ঠ বদ্ধ হয়। এই বিষয়ে সকলে একমত যে পৈত্তিকশূলের অস্ত্রোপচার ছাড়া কোন আরোগ্য নাই। পীড়ার আক্রমণের সময় একমাত্র চিকিৎসা এই যে যন্ত্রণা উপশমের জন্য আফিং দিতে হয় এবং উহার সাধারণ ও সর্ব্বাপেক্ষা ফলদায়ক উপায় হইতেছে চামড়ার নীচে মরফিয়া ইন্‌জেক্‌শন্। অসুখ উপশম অবস্থায় আর একটি চিকিৎসা আছে যাহাতে পাথরি বাড়িতে না পারে ও পিত্ত অধিক সঞ্চারিত হয় এবং যদিও এবিষয়ে বিভিন্ন মত আছে, ইহার বিশেষ চিকিৎসা আছে এবং তাহার নাম বিরাম কালের চিকিৎসা।

ডাক্তার ক্যাল্‌ভার্টের সাক্ষ্য এই যে পূযাশয়ের নলে পাথর আট্‌কায় পৈত্তিক-শূলে কুমারের মৃত্যু হয়।

আর একটা ব্যাপার উল্লেখ করা প্রয়োজন। কুমারের অসুখ ও মৃত্যু বর্ণনা দিতে গিয়া রাণী ও সত্যবাবু পূর্ব্বের কোন বিবৃতি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু ডাক্তার আশুতোষ পূর্ব্বে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, এবং সেই মামলায় এই ব্যাপার বিচার্য্য বিষয় ছিল। ডাক্তার আশুতোষ ১৯২১ সালে মানহানি মামলায় দুইবার সাক্ষ্য দিয়াছিল এবং এই মামলায় কুমারকে দার্জ্জিলিঙে সে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে অভিযুক্ত করায় সে লোকটীর নামে মোকদ্দমা করিয়াছিল। সে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ এস, পি, ঘোষের নিকট সাক্ষ্য দিয়াছিল এবং পুনরায় মিঃ বি, এম, ঘোষ নামক যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ পুনর্ব্বার বিচার করেন তাঁহার সমক্ষে সে সাক্ষ্য দিয়াছিল। ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট শ্রীপুর মামলা নামক যে সত্ত্বের মামলার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতেও সাক্ষ্য দিয়াছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানহানির মামলা ঢাকার গভর্ণমেণ্ট উকিল রায় বাহাদুর এস, সি, ঘোষ ফরিয়াদী পক্ষ চালাইয়াছিলেন এবং তিনি এই মামলায় বিবাদীর পক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ মামলা বাস্তবিক পক্ষে ভাওয়াল রাজের দ্বারায় আনিত

হইয়াছিল। স্মরণ থাকিতে পারে যে এই মোকেদ্দমায় সাফল্য লাভের নিমিত্ত সহকারী ম্যানেজারকে প্রশংসা করা হইয়াছিল। শ্রীপুর মামলাতেও ডাক্তার আশুতোষ এই বিবাদীপক্ষের হইয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, বিবাদীপক্ষ ঐ মামলায় বাদী ছিল। বীরেন্দ্র এই শেষোক্ত মামলায় সাক্ষী দিয়াছিল। আশু ডাক্তারের পূর্ব্বের সাক্ষ্য ও বর্ত্তমান সাক্ষ্য পড়িলেই বুঝা যাইবে যে, আশুডাক্তার এই মোকদ্দমায় আমার নিকট কি ঘটিয়াছিল তাহা স্পষ্টভাবে বলিতে আসে নাই, পরন্তু উহা সম্পূর্ণভাবে লুকাইতে আসিয়াছিল। সুতরাং তাহার প্রথম জবানবন্দি অত্যন্ত অল্প। যখন তাহাকে দেখান হইল, তখন সে এই বলিয়া ব্যাখ্যা করিল যে তাহার বর্ত্তমান স্মৃতি পূর্ব্বের চেয়ে ভাল এবং উহা এখন ব্যবস্থাপত্র ও টেলিগ্রামের সাহায্য পাইয়াছে। তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, সে পূর্ব্বে ব্যবস্থাপত্র দেখিয়াছিল, এবং আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে টেলিগ্রামগুলি ১৯২১ সালের অক্টোবর হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তাহাকে বিভ্রান্তভাবে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল এবং সেরূপ করিতে গিয়া রাণী যে মামলার বিবরণ দিয়াছিল, তাহার সহিত মিল করিতে গিয়া—সে নির্লজ্জ বলিয়া অস্বীকার করিয়া গেল। সে সরলভাবে বলিল যে, সে যখন কাগজে রাণীর সাক্ষ্য পড়িল : "দেখ তিনি বলিতেছেন আর আমি কি বলিলাম?" আমি এক্ষণে সাক্ষ্যের আলোচনা করিতে যাইতেছি। সত্যবাবুর ডাইরীতে ৭ই, ৮ই, ৯ই এবং ১০ই মে তারিখে তিনি কতকগুলি ঘটনা লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে তিনি ১৯শে বা ২০শে তারিখে ডাইরি খুলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কুমারের অসুখ ও মৃত্যু সম্বন্ধে ব্যাপারগুলি লিখিয়াছিলেন, কারণ তিনি প্রথম হইতেই এইরূপ করিতে চাহিয়াছিলেন, যদিও বাস্তবিক পক্ষে তিনি ৭ই মে তারিখে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

৬ই মে

ভোর ৩টা হইতে সকাল ৬টা পর্য্যন্ত।

অসুখ আরম্ভ হইল এবং উহা জর ও শূল বেদনা। (রাণী, সত্য, আশু ডাক্তার, বীরেন্দ্র)

যখন কুমারের পৈত্তিকশূলের বেদনা আরম্ভ হয়, তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। ইহা আমার পরিষ্কার স্মরণ হইতেছে। আশুডাক্তার বলিতেছেন, "সত্যবাবু, আমি ও আর সকলে উপস্থিত ছিলাম।" সত্যবাবু আরও বলিতেছেন যে, তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। তিনি বলিতেছেন যে

বেদনা অত্যন্ত তীব্র ছিল এবং কুমাব যাতনায় গড়াগড়ি দিতেছিলেন। কুমারকে ৭ই তারিখে কেন তাঁহার শয়ন কক্ষ হইতে সরান হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী কক্ষে যেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়—সেইখানে মেজের উপর পাতা বিছানায় শুইয়াছিলেন তাহা ব্যাখ্যা করিতে এইরূপ বলিতে হইয়াছিল।

প্রাতঃকাল

কর্ণেল ক্যালভার্ট আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

রাণীর কথামত এই সময়ে কুমার সুস্থ ছিলেন।

রাণী বলিতেছেন তিনি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সুস্থ ছিলেন।

সত্যবাবু কিছু অস্পষ্টভাবে বলিতেছেন, যখন ডাক্তার ক্যাল্‌ভার্ট আসিয়াছিলেন সে সময়ে তিনি কোন যন্ত্রণার কথা বলেন না।

আশু ডাক্তার এই সময় সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কিছু বলিতেছেন না। এইমাত্র বলিতেছে যে, এই সময়ে যে ঔষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা পৈত্তিক শূল ও জ্বরের উপযোগী ছিল।

ক্যালভার্ট চলিয়া যাওয়ার পর সকাল ১০টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত জ্বর ও যন্ত্রণা ছিল।

বেকাল

অদ্য সকালের কথামত পৈত্তিক শূল বেদনা, কিন্তু ডাক্তার ক্যালভার্টকে ডাকা হয় নাই। সত্যবাবু জ্বরের কথা বলিতেছেন এবং রাত্রে জ্বর ও শূলের কথা বলিতেছেন। কেহই বলিতেছে না যে যখন কর্ণেল ক্যালভার্ট আসিয়াছিলেন তখন কুমারের পৈত্তিক শূল ছিল। তাহাদিগকে প্রাতঃকালে শূল ছিল না এইরূপ ঘটনা রাখিতে হইবে, কারণ এই দিনের ব্যবস্থা পত্র ও টেলিগ্রামের প্রতি দৃষ্টিপাত কর—

টেলিগ্রাম

একজিবিট নং ২৬১ (এ) সকাল ১০টা। গত রাত্রি কুমারের জ্বর ৯৯ ডিগ্রীর কম ছিল, এখন জ্বর নাই, দয়া করিয়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি করা তার করুন।

মুকুন্দ

একজিবিট নং ২২৩ বৈকাল ৬টা ৪৫ মিনিট। গত রাত্রি হইতে কুমারের জ্বর ও তৎসহ পাকস্থলীর যন্ত্রণা হইয়াছে, সিবিল সার্জ্জেন চিকিৎসা করিতেছেন।

ক্যাব্রাল

একজিবিট নং ২২৪। ৮-৫৫। জ্বর ও তলপেটের বেদনা ২ ঘণ্টা ছিল। এক্ষণে ছাড়িয়াছে। কোন চিন্তা নাই, পুনরায় আক্রমণের ভয় নাই। **মুকুন্দ**

(প্রথম কথাটি পড়িতে "lever" এর মত এবং শেষ কথাটি "recruiting" এর মত)—সকাল ১০টার টেলিগ্রামে যন্ত্রণার কথা নাই। এমন কি ৬-৪৫ মিনিটের টেলিগ্রামে, সেই টেলিগ্রাম পাঠানর সময় পর্য্যন্ত ৬ই তারিখের কোন যন্ত্রণার কথাই নাই, কিন্তু উহাতে গত দিনের অর্থাৎ ৫ই তারিখের পাকস্থলীতে যন্ত্রণার কথা আছে, যদিও প্রাতঃকালের টেলিগ্রামে ৫ই রাত্রিতে জ্বর ৯৯ ডিগ্রীর কম ছিল, কেবল এই কথাই বলা হইয়াছে। সত্যবাবু স্বীকার করিতেছেন যে বাঙ্গালীরা সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত সময়কে রাত্রি বলে। যাহাই হউক, ৬ই প্রাত্যকাল হইতে বৈকাল ৬-৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত কোন প্রকার শূলবেদনা নাই। সুতরাং সাক্ষিগণ প্রাতঃকালে যে সময়ে ডাক্তার ক্যালভার্ট আসিয়াছিলেন সেই সময়টাকে শূল ও জ্বর বিহীন করিয়া রাখিয়াছে; এবং জ্বর কিংবা শূল যে ছিল না তাহা কেবল তাহাদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে না, টেলিগ্রাম হইতেও প্রমাণ হয়। যখন ডাক্তার ক্যাল্‌ভার্ট আসিয়াছিলেন তখন তিনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপত্র দিয়াছিলেন :—

ভাওয়ালের কুমারের জন্য—

Re
স্পিরিট্ য়্যামন্ য়্যারোমেট্
সোডি বাই কার্ব
টিঙ্ক্ কাড্‌কো
স্পিরিট্ ক্লোরোফর্ম্ম্
য়্যাকোয়া সিলেমন্

প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর এক দাগ

Re
লিণ্ট্ ওপিয়াই
বাহিরে প্রয়োগের জন্য

জে, টি, সি।

লণ্ডনে কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসিবার পূর্ব্বেই কর্ণেল ক্যাল্‌ভার্টকে এই ব্যবস্থাপত্র দেখান হইয়াছিল। তাঁহার জেরার সময়েও উহা তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল। তাঁহার প্রাথমিক জবানবন্দীর সময় তাঁহাকে ব্যবস্থাপত্র দেখান হয়, কিন্তু তিনি বলেন যে সাক্ষী দিতে আসিবার পূর্ব্বে মিষ্টার হান্টার্ সেগুলি তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন, এবং তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন যে,

পাকস্থলীর পীড়ার তিনি যে ব্যবস্থা পত্র দিতেন উহা তাহাই। জেরার সময় তাঁহাকে এইগুলি দেখান হয় এবং এই নির্দ্দিষ্ট প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন্‌টি (এক্‌জিবিট্‌ ৫১) সম্বন্ধে তিনি বলেন—স্পিরিট য়্যামোনিয়া প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন্‌—উহা অজীর্ণ রোগে ব্যবহৃত অম্বলনাশক ঔষধ। আর লিণ্ট ওপিয়াই সম্বন্ধে তিনি বলেন:— ইহা যে কোন রকমের স্থানীয় যন্ত্রণার উপযোগী। আমি এবিষয়ে একমত যে, ব্যাহ্যিক যন্ত্রণা তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, পৈত্তিক শূলের বেদনা ডাক্তার ম্যাক্‌গিলক্রীষ্ট যাহা বলিয়াছেন, সেইরূপ কিছুক্ষণ অন্তর প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে পৈত্তিক শূলে ইহা ব্যবহার করা সম্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণ দিতে পারেন কিনা। তিনি বলেন যে তিনি তাহা বলিতে পারেন না; কি চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ছিল না, প্রশ্ন এই ছিল যে কুমার কিরূপ চিকিৎসা গ্রহণ করিবেন! তাঁহার সাক্ষ্য এই যে কুমার ইন্‌জেক্‌শন্‌ গ্রহণ করিবেন না, সুতরাং ইহাই ছিল ইন্‌জেক্‌শনের পরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। তাঁহাকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে এই প্রেস্‌ক্রিপশন্‌ পৈত্তিক শূলের কিরূপ উপযোগী হইয়াছিল, তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে প্রথমটির—(৬ই তারিখের একজিবিট নং ৫১) সহ এইগুলি বিরামকালের উপযুক্ত ছিল। যখন তিনি এই ব্যবস্থাপত্র দিয়াছিলেন, সে সময়কে তিনি 'বিরাম কাল' করিতেছেন, ইহা তাঁহার চৌদ্দ দিন ব্যাপী অসুখের সহিত বেশ মিল খাইতেছে, কিন্তু ৬ই তারিখের পূর্ব্বে তিনি যে কোন যন্ত্রণা দেখেন নাই, এই ঘটনা ইহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে। এবং যখন তিনি বলিতেছেন যে স্পিরিট য়্যামোনিয়া ব্যবস্থাপত্র বিরাম কালের জন্য এবং সেই সঙ্গে লিণ্ট ওপিয়াইএর ব্যবস্থা ইন্‌জেকশনের পরিবর্ত্তে তৎকালীন শূলের জন্য করিয়াছিলেন, তখন যে পরস্পর বিরুদ্ধতা হইতেছে তাহা তিনি দেখিতে পাইতেছেন না।

ইহা বেশ পরিষ্কার যে এই দুইটি ব্যবস্থাপত্রের সহিত (একজিবিট নম্বর ৫১) পৈত্তিক শূলের কোনই সম্বন্ধ নাই। ডাক্তার ডেন্‌হাম হোয়াইট্‌ বিবাদী পক্ষের সাক্ষ্য দিয়া বলিতেছেন, প্রথমটি সাধারণ ঔষধ। ডাক্তার ম্যাকগিল্‌ক্রীষ্ট বলিতেছেন ইহা সাধারণ অজীর্ণের ঔষধ। বিশেষত পেট-ফাঁপার ঔষধ। তিনি পৈত্তিকশূলে এ ঔষধ দিতেন না এবং লিণ্ট ওপিয়াই পৈত্তিকশূলের কোনই কাজ করিবে না, কারণ বাহিরে আফিং লাগাইলে ভিতরে তাহার সক্রীয় গুণগুলি কাজ করিবে না। ডাক্তার ব্রাডলি উহাকে অজীর্ণের জন্য মৃদু ব্যবস্থা বলিতেছেন—যাহাকে আমরা পেট ফাঁপার জন্য ঔষধ বলি—যাহা আফিসে রাখা হয়—অর্থাৎ যাহাকে ডাক্তার ডেন্‌হাম

হোয়াইট সাধারণ সজ্জী-ঔষধ বলিতেছেন। বিবাদী পক্ষের মেজর টমাস বলিতেছেন যে প্রথম ব্যবস্থাপত্রটি ক্ষারবৎ অম্লনাশক ঔষধ, এবং যে কোন রকমের অজীর্ণ রোগ, এমন কি পেট ফাঁপা অজীর্ণের পক্ষেও উপযোগী।

ভাওয়াল কুমারের জন্য ঔষধের ব্যবস্থাপত্র

প্রমাণস্বরূপ প্রদর্শিত বস্তুর সংখ্যা— ঔষধ বিক্রেতার ধারাবাহিক চিহ্ন—

রি—

৫১(ই) ৩৪৩৯ ম্যাগ কার্ব

সোডি কার্ব

বিস্‌মাথ কার্ব

পালভ্ ট্রাগাকান্থ্ কো, প্রত্যেকটি 3i

অয়েল ক্যাজিপুট, মিনিম্ xii

একোয়া মেন্থ্ পিপ এ্যাড আউন্স্ xi

প্রত্যহ তিনবার সেব্য।

স্বাঃ জে, টি, সি।

৫১ (বি) ৩৪৪০

রি—

৩৪৪০।১ সোডি সাইট্রেট্ 3i

একোয়া ষ্টেরিলাইজ্‌ড্ এ্যাড্ 3vi

3i দুগ্ধের সহিত নির্দ্দেশমত

রি—

গ্লিসারিন্ পেপ্‌সিন্ 3ii

নির্দ্দেশমত—

পেপ্ পাউডার ফ্রেশ্

স্বাঃ এন্, সি, সেন।

রি—

এ্যাট্রোপিন্ ট্যাব গ্রেন্ ১/১০০

ষ্ট্রিনিন্ ট্যাব্ গ্রেন্ ১/৩০

ডিজিট্যালিস্ ট্যাব গ্রেন্ ১/১০০

ইথার পিওর ½ আউন্স

মরফিয়া ট্যাব্ গ্রেন ১/৮

স্বাঃ এন্, সি, সেন।

স্পিরিট্ ইথার্ 3iv
স্পিরিট্ এমন এ্যারোম্যাট্ 3iv
একোয়া ক্যাম্ফর এ্যাড্ আউন্স্ viii
½ অংশ একমাত্রা

আই, টি, এস্।

রি—
একস্ট্রাক্ট ওপিআই
বেলেডোনা
স্যাপনিস্ প্রত্যেক গ্রেন ½
৬টি বড়ি করিয়া পাঠাও
প্রত্যহ তিনবার সেব্য।
স্বাঃ জে, টি, সি।

প্রমাণ স্বরূপ প্রদর্শিত বস্তুর সংখ্যা—	ঔষধ বিক্রেতার ধারাবাহিক চিহ্ন—
৫১ (ডি) ৪২০	লিণ্ট্ স্যাপনিস্ 3ii সিনাপিস্ কো এ্যাড্ 3ii

আদার গুঁড়ার সহিত সর্ব্বগাত্রে মালিশ করিতে হইবে।

রি—
বেলেডোনা এ এ Zii
পেটের উপর প্রলেপ দিতে হইবে।
স্পঞ্জিস্ লেনিন্ ১২ × ১২
স্বাঃ এন্, সি, সেন।

ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে ঔষধের দোকানের ব্যবস্থা পত্র গুলি সমান ভাবে ধারাবাহিক রূপে চলিয়াছে, কোথাও একটু বাদ নাই, এবং ইহাদ্বারা সে গুলি কত দ্রুত পর পর আসিয়াছে তাহাও বুঝা যায়। মেসার্স স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট্ কোম্পানী বোধহয় সেদিন সর্ব্বক্ষণ প্রতিবাদীর ব্যবস্থা পত্রের ঔষধ প্রদান করা ছাড়া আর কাজ করে নাই। শেষ ঔষধ পাউডারটি সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বেই দেওয়া হয়। রাণী বলিয়াছেন সন্ধ্যার পূর্ব্বে নার্সেরা কুমারের দেহে এই পাউডার লাগাইতেছিল। ঔষধ বিক্রেতার ক্রমিক চিহ্নের উপর ভিত্তি করিয়া কত দ্রুত এইসকল ঔষধ আসিয়াছে আমি সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিতে

চাই না, কিন্তু সেগুলি ফলানুযায়ী কিরূপ পর পর চলিয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের ফলরূপে পরবর্ত্তিতাটা মাত্র বুঝাইতে চাই। প্রতিবাদী পক্ষ নিজেরাই তাঁহাদের সাক্ষ্যে এই পরবর্ত্তিতা দেখাইয়া দিয়াছেন, যদিও আশুডাক্তার অথবা অন্য কোন সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলেন নাই। আশুতোষ এ সম্বন্ধে খুবই জানেন বলিয়া মনে হয়। পরপর কিরূপ অবস্থা হইতেছে সে সম্বন্ধে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র হইতে নিম্নলিখিতরূপ বুঝা যায়:—

১। ম্যাগ কার্ব (ঔষধ)—

অম্ল; পাকস্থলীতে ব্যথা; বমি; উদরাময় এবং অন্ত্রদাহ—(কর্ণেল ক্যালভার্ট)।

উল্লিখিতরূপ রোগে প্রযোজ্য; উদরাময় এবং অন্ত্রদাহ্ ব্যতীত—(কর্ণেল ম্যাকগিলক্রাইষ্ট্)।

অজীর্ণ; অন্ত্রদাহ অল্প ব্যবহার; উদরাময়ে ফলদায়ক নহে; ঔষধের ব্যবস্থা জোরাল নহে, এবং ইহাদ্বারা কোনরূপ গুরুতর অবস্থার বিষয় প্রকাশ পায় না (ডাক্তার ব্র্যাড্লি)।

অজীর্ণ রোগ চিকিৎসার জন্য, যেরূপ ৫১নং একৃজিবিট ৬ই মে তারিখের ব্যবস্থাপত্র (মেজর টমাস্)।

ডাক্তার অশুতোষ, ডাক্তার ক্যালভার্টের সহিত একমত, কিন্তু তিনি বলিতে পারেন না যে অন্ত্রদাহের জন্য অনবরত বাহের বেগ হয় তাহার ঔষধ কোন্‌টি।

২। সোডি সাইট্রেট্ এবং গ্লিসিরোপেপ্‌সিনের ব্যবস্থা।

পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য (কর্ণেল ক্যালভাট্, কর্ণেল ম্যাক্‌গিলাক্রষ্ট, মেজর টমাস্ ও ডাক্তার ব্র্যাড্লি)।

মেজর টমাস্ আরও বলেন যে পিত্তশূল বেদনায় ইহা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

(বি) পেপ্ পাউডার ফ্রেশ্—পরিপাক শক্তি সাহায্যের জন্য উপরের সহিত চলিবে। (কর্ণেল ম্যাক্‌গিলাক্রষ্ট্ কোনও মতানৈক্য নাই।)।

(সি) ছয়টি ঔষধ—যেগুলিকে মিঃ চৌধুরী 'অস্ত্রাগার' বলিয়া বর্ণনা করিতেন।

এগুলির উপর মাত্র ডাক্তার ম্যাক্‌গিলক্রিষ্টের বিবরণ আছে। ১।১০০ গ্রেণ্ এ্যাট্রোগিম্ সাধারণতঃ মরফিয়ার সহিত হাইপোডারমিক ইঞ্জেকশনের জন্য।

মরফিয়া—পিত্তশূল এবং যে কোনও বেদনার উপশমের জন্য ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

ষ্ট্রিক্‌নিন্‌—১।৩০ গ্রেণ্‌ স্নায়বিকশক্তি বৃদ্ধি করে।

ডিজিটালিস্‌—সমগ্রভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ভাল করে।

ইথার পিওর—অবসন্নতার জন্য, হাইপোডারসিক ইঞ্জেক্‌শন দ্বারা ব্যবহার করান হয়। ইহাতে খেঁচুনির উপশম হয়।

যে ছয়টী ঔষধকে মিঃ চৌধুরী "আরমোরী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, উহা কোনব্যবস্থাপত্রই নহে। ইহা কেবল "হাইপোডারমিক ইনজেকসনে" কতটুকু মাত্রায় ঔষধ দিবে তাহা বুঝাইতেছে।

৩। (এ) ঈথার মিকশ্চার

সকল ডাক্তারই বলেন—ইহা হিমাঙ্গ অবস্থার ঔষধ। মেজর টমাস বলেন ইহা হিমাঙ্গের শেষ অবস্থার জন্যই কেবল নহে।

(বি) আফিমের বড়িগুলি

কালভার্ট—"হাইপোডারমিকার" জন্য ব্যবহৃত মর্ফিয়ার পরিবর্ত্তে দেওয়া হয়

উদরাময়, টেনেস্‌মাস (ঘন ঘন প্রবল দাস্তের পর মল, বাহির অন্ত্রের ও মলদ্বারেও পেটে মল না থাকা সত্ত্বেও ঘন ঘন মলত্যাগের ইচ্ছা ও কুঁথন) প্রভৃতি অবরোধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়—(কর্ণেল ম্যাগগিলক্রাইষ্ট)

মেজর টমাস বলিয়াছেন—উদরাময়ে আফিমের বহি মর্ফির ইন্‌জেকশনের পরিবর্ত্তে দেওয়া যাইতেও পারে, না ও পারে।

৪ (এ) জিঞ্জার এবং মার্কাড পাউডার (আদা এবং সরিষার গুঁড়া)

ম্যাকগিলক্রাইষ্ট—কলেরায় খিলধরার ন্যায় অবস্থায় প্রয়োগ করা হয়

টমাস—খিলধরা ব্যতীতও কলেরায় হাতে পায়ে মালিস করিবার জন্যও ব্যবহৃত হয়।

(৪ বি) বেলেডোনা প্রলেপ

ম্যাকগিলক্রাইষ্ট—পাকস্থলীর বেদনা কমাইবায় জন্য এবং ব্যবস্থাপত্রদৃষ্টেও তাহাই মনে হয়।

কালভার্ট—ব্যবস্থাপত্রদৃষ্টে বোঝা যায় যে, ইহা পাকস্থলীর প্রদাহ দূর করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় : ইহা স্থানীয় বেদনাও কমাইতে পারে।

টমাস—"বিলিয়ারী কলিকে" তলপেটে মালিশ করিতে দেওয়া যায়।

তলপেট ও পাকস্থলী কিন্তু এক নয়, পাকস্থলী. লীভার, পাকাশয় প্রভৃতি সমস্ত জিনিষই তলপেটের ধরা হয়। এবং বিলিয়ারী কলিকের ব্যথা কাঁধ পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলে।

কর্ণেল ডেনহ্যাম হোয়াইট উপরোক্ত প্রেসক্রপশন-সমূহ সম্বন্ধে বিশেষ

কিছুই বলেন না। একমাত্র আফিমের বড়ি ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে বলেন যে, ইহা মলত্যাগ কালীন যন্ত্রণার উপশম হয় এবং মর্ফিয়া ইনজেকসনের পরিবর্ত্তে দেওয়া যাইতে পারে। জিতোর পাউডার ব্যবস্থাপত্র শরীরের খিল ধরা কমাইতে এবং শৈত্য কমাইয়া উত্তাপ বৃদ্ধি করিবার জন্য ডাক্তারেরা শরীরে ডলিয়া দিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে ডেনহাম হোয়াইট এবং ম্যাকগিল-ক্রাইষ্ট একমত। বিলিয়ারী কলিকে হাতে পায়ে খিল ধরা দূর হয় কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উহা স্বীকার করেন। তাহার মত সমর্থন সম্বন্ধে "সেজার্স এনালিটীক প্রাকটীকাল মেডিসিন" ২য় খণ্ড ১৯১৫ সালের ছাপা ২৯১ পাতায় দ্বিতীয় কলমে একটী প্যারা দেখান। জেরায় স্বীকার করেন যে ঐখানে যে সমস্ত ঘটনার কথা লেখা আছে, তাহা অস্ত্রচিকিৎসার পরের ঘটনাসমূহ। তবে ইহাও বলেন যে তাহার কথিত ঘটনা বিরলই ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রেসক্রুপশনগুলি হইতে অথবা নিম্নলিখিত অভিমতসমূহ হইতে নহে।

বিবাদীপক্ষীয় সাক্ষী মেজর টমাস

১। প্রাথমিক উদারাময়
২। হিমাঙ্গ
৩। পিত্তশূলের জন্য আফিমের বড়ি।
৪। পাকাশয়ের আক্ষেপ ও খিচুনী

বাদী পক্ষের সাক্ষী কর্ণেল ম্যাকগিলক্রাইষ্ট

১। প্রাথমিক উদরাময়
২। হিমাঙ্গ
৩। ঘন ঘন দাস্তের জন্য আফিমের বড়ি
৪। পাকাশয়ের আক্ষেপ ও খিচুনী

মেজর টমাস পাকাশয়ের আক্ষেপ ও খিচুনী স্বীকার করিতে চাহেন নাই। কিন্তু বিবাদী পক্ষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, পিত্তশূলে ঐরূপ হইতে পারে কিনা এবং মেজর টমাস স্বীকার করেন যে তাহা হইতে পারে এবং তিনি বলেন জিঞ্জার পাউডার (আদার গুঁড়া) ঔষধ দৃষ্টে তাহাই মনে হয় তবে তিনি উহা দিবেন না।

মেজর টমাসের সঙ্গে মেজরাণীর বর্ণিত ঘটনাবলী একেবারে হুবহু মিলিয়া যায়। কুমার সকাল হইতে বেলা দশটা পর্যন্ত সুস্থ ছিলেন। ১০টার সময় হিক্কা ও অল্প ব্যথা আরম্ভ হয়, ১২টার সময় হইতে অসহ্য বেদনা ও রক্তদাস্ত

হইতে থাকে। কর্ণেল কালভার্ট ২টার সময় আসেন এবং কুমারকে একটা ইনজেকসন নিতে অনুরোধ করেন। বিকাল ৪টা হইতে ৬টার মধ্যে ইনজেকসন্ দেওয়া হয় এবং বেদনা কমিয়া আসে।

সন্ধ্যার সময় নার্সেরা আসে এবং গুঁড়া ঔষধ গায়ে মালিস করিতে থাকে। ঐ সময় ডাক্তার বি, বি, সরকার আসেন এবং দুপুররাত্রে কুমারের মৃত্যু হয়।

তাহার বিবৃতি হইতে দেখা যায় যে, সন্ধ্যা হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন চিকিৎসাই হয় নাই। ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে আদালতের সম্মুখে যে সমস্ত ব্যবস্থাপত্র ও টেলিগ্রাম দাখিল করা হইয়াছে, উহাই ঐ দিনের সমস্ত ব্যবস্থাপত্র এবং টেলিগ্রাম, কেবল মৃত্যুর টেলিগ্রাম মাত্র আদালতের সম্মুখে স্থাপন করা হয় নাই।

সত্য, আশু, বীরেন এবং বিপিন খানসামা ইহারা সকলেই আদালতে আসিয়া রাণীর কথিত ঘটনা সমর্থন করেন। এখন নিম্নলিখিত ঘটনা সমূহ আলোচনা করা যাক—

(১) সকালে কুমার সুস্থ ছিলেন, ডা ক্যালভার্ট তখন আসিয়া কুমারকে ইনজেকসেন দিবার কথা বলেন। মৃত্যুর জন্য শোক-জ্ঞাপক পত্রে ইহাই বলা হইয়াছে যে, তাহাকে ইনজেকসন দিবার জন্য অনেক অনুরোধ করা হয়। জেরায় জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যখন কুমার সুস্থ ছিলেন তখন তাহাকে কেন ইনজেকসন দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। সত্যবাবু এই মিথ্যা সাক্ষ্যের অসুবিধা দেখিয়া বলেন যে কুমার সম্যক সুস্থ ছিলেন না, তাহার অল্প অল্প বেদনা ছিল এবং আকস্মিক দুর্ঘটনার আশঙ্কায় তাহাকে ইনজেকসন দিবার কথা ওঠে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বর্ণনা, কেননা ডাঃ কালভার্ট বলিয়াছেন যে ঐ দিনের পুর্ব্বে তাঁহার আর বেদনা হয় নাই, কিন্তু তত্রাচ তিনি ইনজেকসন দিতে চাহিয়াছিলেন এবং দিতে না পারিয়া শুধু উদরাময়ের জন্য তিনি একটী ব্যবস্থাপত্র করিয়াছেন।

কিন্তু মানুষের অল্প উদরাময় হইতেই হিমাঙ্গ হয় না।

কখন তিনি হিমাঙ্গ হইয়াছিলেন এবং তাহার পূর্ব্বে কি হইয়াছিল তাহা এখন আলোচনা করা যাক্।

বার বৎসর পূর্ব্বে আশু ডাক্তার অন্য এক মামলায় সাক্ষী দিতে যাইয়া বলেন,—১২ বৎসর পূর্ব্বে একটী মোকদ্দমায় এই হিমাঙ্গ অবস্থাই বিচার্য্য ছিল, এবং ঐ মোকদ্দমা এষ্টেট কর্ত্তৃক করা হইয়াছিল। ঐ মোকদ্দমায় ডাঃ আশুতোষকে রায় বাহাদুর এস, পি, ঘোষ জবানবন্দী করান তাহাতে ডাঃ

আশুতোষ বলিয়াছিলেন,—তাঁহার মৃত্যুর দিনে সকাল বেলা তাহার খুব গুরুতর রকম পেটের অসুখ হয়। তিনি ভয়ঙ্কর রক্তবাহ্য করেন। উহার ২দিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি উদরাময়ে ভুগিতেছিলেন।

জেরায় ডাঃ আশুতোষ ৭ই রাত্রিতে কুমারের পিত্তশূলের কথা বর্ণনা করেন, এবং তজ্জন্য ডাঃ কালভার্ট ব্যবস্থাপত্র দেন। কিন্তু ঐ ব্যবস্থাপত্র ডাঃ কালভার্টের নহে উহা তাহারই, ৮ই তারিখের ঘটনা সম্বন্ধে বলেন—রাত্রি ২।৩টার সময় ডাক্তার কালভার্টকে ডাকিতে পাঠান হয়। পরদিন ৭টা ৭॥ টার সময় ডাঃ কালভার্ট আসেন এবং ইন্‌জেকসন দিতে বলেন। কুমার আপত্তি করেন। ডাঃ কালভার্ট পরে ডাঃ নিবারণচন্দ্র সেনের সহিত আসেন। ডাঃ কালভার্ট তাহাকে ২৪ ঘণ্টার জন্য নিযুক্ত করেন। সকাল বেলা ডাঃ কালভার্ট ব্যবস্থাপত্র দেন, তবে তিনি কি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা আমার স্মরণ নাই। তিনি পুনরায় বেলা ২টার সময় আসেন, কিন্তু অবস্থায় কোন উন্নতি দেখা গেলনা। তিনি আবার রাত্রি ৮টার সময় আসেন, কুমার যেন তখন রক্ত বাহ্য করিতেছিলেন। রক্ত বাহ্যের কোন রাসায়নিক পরীক্ষা হয় নাই। ডাক্তার ক্যালভার্ট উহা পরীক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমার তাহা জানা নাই। ডাঃ ক্যালভার্ট ও ডাঃ নিবারণ সেন, কুমারকে ঔষধ খাওয়ানের জন্য ২।৩ জন নার্স নিযুক্ত করেন। মৃত্যুর দিন বেলা ৮টা হইতে রক্ত দাস্ত আরম্ভ হইল। ১০।১২ বার দাস্ত হয়, বাহ্যেতে রক্তও ছিল। কতবার রক্ত পড়িয়াছিল তাহা আমি আন্দাজে বলিতে পারি না। বাহ্যের সহিত যে রক্ত ছিল তাহা লাল রংএর।—২৭।১।২২ তারিখে এই সাক্ষ্য মিঃ এস, সি, ঘোষের সম্মুখে মানহানির মোকদ্দমায় দেওয়া হয়।

শ্রীপুর মোকদ্দমায় ও ঐ কথা বলেন—যন্ত্রণার কথা ৪টা অথবা ভোর ৫টায়, ডাক্তার ক্যালভার্টের কথা—সকাল ৭টা অথবা ৮টা এবং ইন্‌জেক্‌সনের জন্য বলা, রক্তবাহ্যের কথা বলেন, বেলা ১০টা কি ১১টা এবং আরও বলেন রক্ত বাহ্য বন্ধ করিতে "ডাঃ ক্যালভার্ট, ব্যবস্থা পত্র পাঠান" (এক্সিবিট ৩৯৪ (২) এবং ৩৯৪ (৮)। ৮ই সকাল বেলায় মধ্যম কুমারের যন্ত্রণা ছিল এবং যন্ত্রণায় তিনি ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন। ঐ দিনকার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

"বেলা ২টার পর হইতে কুমারের নাড়ীর অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল"। (Exhibit ৩৯৪।১১) ৪টা ৫টার সময় দেহ হিম হইয়া গেল।" তাহার পূর্ব্বকার সাক্ষ্যে বলা হইয়াছে রাত্রি ২টা, ৩টা অথবা ৪টার সময় যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। যন্ত্রণা এত কষ্টদায়ক হইল যে রাত্রি ৪টার সময়ই ডাক্তার কালভার্টএর নিকট লোক পাঠাইতে হইয়াছিল। ডাক্তার কালভার্ট বেলা

৭টা কি ৮টার সময় আসিলেন, এবং ইন্‌জেক্‌সান দিতে চাহিলেন। ভীষণ যন্ত্রণায় কুমার সকালবেলা এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন এবং বেলা ৮টা অথবা ৯টার সময় রক্ত বাহ্য আরম্ভ হইল। কর্ণেল কালভার্ট রক্ত বাহ্য বন্ধ করিবার জন্য ঔষধ দিলেন। কুমারের নাড়ীর অবস্থা বেলা ২টার সময় খারাপ হইল এবং ৪টা অথবা ৫টার সময় দেহ হিম হইয়া গেল। ৪টা ৫টার সময় দেহ কিরূপ হিম হইয়াছিল তাহাও তিনি বলিয়াছেন; "দেহ ৪টা অথবা ৫টা হইতে হিম হইতে লাগিল। নাড়ী বসিয়া গেল। নাড়ী পাওয়া গেল না।" (প্রদর্শনী ৩৯৫)।

আশুডাক্তার শ্রীপুর মামলার সময় বলিয়াছেন যে, ডাক্তার কালভার্ট রাত্রে ইন্‌জেক্‌শান্ দিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত এস, পি, ঘোষের সম্মুখে তিনি সাক্ষ্যদান কালে একথা বলেন নাই। যখন আশুডাক্তারের নিকট এই নব সাক্ষ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইল,তখন তাঁহার একটি মাত্র জবাব ছিল, 'তিনি' নিশ্চয়ই ঐ রূপ বিবৃতি করিয়া থাকিবেন, তখন তাহার সব স্মরণ ছিল, কিন্তু এখন তাহার স্মরণ নাই এবং যখন তিনি ঐরূপ বিবৃতি করিয়াছিলেন তখন উহা সত্য বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু উহা সত্য নয় এবং তাহার সাক্ষ্য হইতে দেখাযায় ব্যবস্থা পত্র এবং টেলিগ্রাম দেখিয়া তাঁহায় স্মৃতিশক্তির উন্নতি হইয়াছে—যদিও তিনি স্বীকার করেন মানহানির মোকদ্দমার সময়ে এবং শ্রীপুর মামলার সময়ও ঐ ব্যবস্থাপত্র এবং টেলিগ্রাম তাঁহাকে দেখান হইয়া ছিল। ঐ টেলিগ্রামগুলি বিবাদীপক্ষ ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে বড়রাণীর নিকট হইতে হস্তগত করিয়াছিলেন। আশু ডাক্তারের প্রত্যেক বিবৃতি আলোচনা করিয়া উহার কতকটা কৃত্রিম উহা দেখান অনাবশ্যক। বিবেচনা করি উহার সমস্ত বিবৃতি কৃত্রিম। তিনি নিজেই বলিয়াছেন তিনি রাণীর জবানবন্দী পড়িয়া বোধহয় বিস্মিত হইয়াছেন।

আশু ডাক্তার পূর্ব্বে যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাহার স্বীকার-উক্তি ব্যতীত আর কোন কথাই আমি বিশ্বাস করিতেছি না। তাহাকে একেবারে অবিশ্বাস করিবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। তাহাকে অবিশ্বাস করিতে হইলে তাহার নিজের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। এই সাক্ষীর বর্ণনা সত্য অপেক্ষা অসত্যই বেশী বলিতেছেন।

আশু ডাক্তারের বর্ত্তমান সাক্ষ্য হইতে পাওয়া যায় যে কুমারকে ৭ই রাত্রিতে পাশের ঘরে লইয়া যাওয়া হয় এবং পূর্ব্ব হইতেই কুমার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতেছিলেন। যন্ত্রণার সময় ৫১ (এ) প্রদর্শন (একজিবিট)

করা হয় ঐ ব্যবস্থাপত্র ডাক্তার কালভার্ট কিম্বা ডাক্তার নিবারণ দেন নাই, উহা তিনিই (আশু) দিয়াছিলেন।

আশুবাবুর বর্ত্তমান সাক্ষ্যেও আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে, কুমার পরদিন সকাল বেলায় অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন রাত্রি ৩টা ৪টার সময় যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু এখন তিনি তাহা স্বীকার করেন না। যদিও ঐ রাত্রে ডাক্তার কালভার্টের নিকট লোক পাঠানর উদ্দেশ্য ছিল, ডাক্তার কখন আসিবেন সেই সময় ঠিক করিয়া আসা, কিন্তু তিনি স্বীকার করিয়াছেন ৮ই সকালে কুমারের অবস্থা ভাল ছিল না এবং তজ্জন্য ডাক্তার কালভার্টকে ডাকিতে হইয়াছিল, এবং ডাক্তারকে ডাকার আবশ্যকতা হইয়াছিল।

কেহ বলিয়াছেন কুমারের কোন যন্ত্রণা ছিল না, এবং কেহ বলিয়াছে ইন্‌জেকসন লইবার জন্য তাহার সম্মতির জন্য বন্ধুবান্ধবের বিশেষ অনুরোধের আবশ্যকতা হইয়াছিল, এই দুই অসঙ্গত উক্তির সামঞ্জস্য করিবার জন্যই সত্যবাবু ও আশুবাবুকে একথা বলিতে হইয়াছিল। বাদী সকাল বেলায় রক্ত বাহ্যের কথা যে বলিয়াছিলেন, বিবাদী পক্ষের এরূপ কোন স্বীকারোক্তি নাই; কিন্তু যেহেতু বেলা ৩ টা ১০ মিনিটের সময় টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল, রক্তবাহ্য অর্থাৎ উদরাময়ের সহিত যে রক্ত ছিল একথা বিবাদী পক্ষের স্বীকার করিতে হইল। টেলিগ্রামে লেখা ছিল—"কুমার গুরুতর পীড়িত। মুহুর্মুহু রক্তমিশ্রণ পাতলা জলের মত বাহ্য হইতেছে। সত্বর আইস।" এইরূপ টেলিগ্রাম মুমূর্ষু সময়েই পাঠান হয়। পিত্তশূল সম্বন্ধে কোন কথাই লেখা হয় নাই, অথচ কুমারের এই রোগ যে ছিল তাহা তাঁহার পরিবারের লোকদের জানা ত ছিলই, এমন কি বাহিরের লোক অতুল বাবুরও জানা ছিল। তাহার অসুখের মধ্যে যতগুলি টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল তাহার একখানিতেও পিত্তশূলের কথার উল্লেখ ছিল না।

পীড়িত কুমারের অবস্থা

"রক্ত মিশ্রিত পাতলা বাহ্যের" কথা যে বলা হইয়াছে, এখন দেখা যাক্ উহার প্রকৃতি কিরূপ ছিল? কুমারের পুনঃ পুনঃ রক্ত মিশ্রিত পাতলা জলের ন্যায় বাহ্য হইতেছিল কিন্তু ডাঃ আশুতোষ তাহা "ভীষণ রক্তবাহ্য" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি এখন আর "ও কথা" বলিতে পারেন না। কেননা টেলিগ্রাম এবং ব্যবস্থাপত্র তাহার নষ্ট স্মৃতিশক্তির পুনরুদ্ধার করিল। তথাপিও তিনি

বলেন বাহ্য পাতলা ছিল এবং তাহার মধ্যে রক্ত ছিল, এবং কুমারের এরূপ ১০।১২ বার বাহ্য হইয়াছে। রাণী বলেন—বাহ্য পাতলা, কিন্তু ঠিক জলের ন্যায় নহে। রাণী আরও বলেন তাহাতে আমও মিশ্রিত ছিল। আম কেন মিশ্রিত ছিল তাহার কারণ পাওয়া যাইবে,আশুবাবুও অবশ্য ঐরূপ কথাই বলেন, —পাতলা বাহ্য কিন্তু জলের ন্যায় নহে, তবে চা'ল ধোয়া জলের ন্যায় এবং তাহার সঙ্গে রক্ত ছিল। রক্ত যে লাল রংএর একথা সকলেই স্বীকার করেন। আশুবাবু এবং সত্যবাবু জল বাহ্য মানে ঠিক জলের মত নহে, তবে তরল এবং ছাকা ছাকা ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বহু অবান্তর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু "জল বাহ্য" একথাটা মুকুন্দই ব্যবহার করিয়াছিল। মুকুন্দ একজন বি, এ, ফেল ব্যক্তি। বাঙ্গালী জলের মত পাতলা বাহ্য বুঝাইতে "জল বাহ্য" এই কথাই ব্যবহার করিয়া থাকেন, সত্যবাবু তাহা স্বীকার করিয়াছেন। রক্তের পরিমাণ যখন সঙ্গে জড়ান ছিল তখন উহা পরিমাণে কম অথবা মলের মত একথা কেহই বলেন নাই। কিন্তু আদালতে মল অতিরিক্ত এবং ভয়ানক একথা কেহই বলেন নাই। আশুবাবু "ভয়ানক" শব্দটী পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং মিষ্টার এস, পি, ঘোষের নিকট আগেকার মোকদ্দমায় যে অভিমত দিয়াছিলেন, এখনও সেই অভিমত পোষণ করেন। যে তাঁহাকে যদি ঐ রক্ত সম্বন্ধে চিকিৎসা করিতে হইত তাহা হইলে তিনি, —ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অথবা ল্যাক্‌টিট অথবা এড্রেনের্শেন দিয়াই চিকিৎসা করিতেন। যখন তিনি কুমারের ঐ বাহ্যকে ভয়ঙ্কর বলিয়াছিলেন তখন এই কথা বলিয়াছিলেন এবং তাহা এখনও বলেন, এবং ঐ ঔষধগুলি রক্ত-স্রাব বা গুরুতর শোণিত নিঃসরণের জন্যই ব্যবহৃত হয়। এ সম্বন্ধে হল-হোয়াইটের ভৈষজ্যদ্রব্য তত্ত্ব (Materia Medica) হইতে দেখান হইয়াছে (হল হোয়াইটের ভৈষজ্য দ্রব্যতত্ত্ব পৃষ্ঠা ৫৩,—১৮ সংস্করণ) যে, যখন ভীষণভাবে শোণিত নিঃসরণ হয় তখন উহাকে ঘনীভূত করিবার জন্য অতিরিক্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অথবা ল্যাকটেট ব্যবহৃত হয়। উপরোক্ত পুস্তকের ৬১ পৃষ্ঠায় "এড্রেনের্গেল" দ্রষ্টব্য। এড্রোনলে ধমনীর সঙ্কোচনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। ঐ দিনের প্রধান উপসর্গই ছিল রক্তস্রাব।

বাদী আসিবার বহুপূর্ব্বে ১৯১৭ খৃঃ রাণী সত্যভামা বৰ্দ্ধমানের মহারাজকে পত্রে কুমারের মৃত্যুর গুজবের কথা লিখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে কুমার রক্ত দাস্ত হইয়া মারা যান। বিবাদী পক্ষ খবরের কাগজে যে মৃত্যুর রিপোর্ট বাহির করেন, তাহার উপর জোর দেন। মৃত্যুর কারণ বাহির করিতে, শুধু এই দুইটা দলীলের উপরই একমাত্র নির্ভর করি

নাই। কিন্তু আদালতের যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে এবং এই টেলিগ্রামগুলি একথা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে কুমার ঘন ঘন দাস্ত করিয়াছিলেন। মেজোরাণী বলেন যে, প্রায় অৰ্দ্ধ ঘণ্টা পর পর রক্ত দাস্ত হইতেছিল, এবং প্রতিবারই দাস্ত হইবার সময় কুমারের অসহ্য বেদনা হইত তথাপিও রাণী বলেন যে কুমার বিলিয়ারী কালিকে মারা যান।

রক্ত দাস্ত হইল কেন

কেন যে রক্ত দাস্তের সহিত অসহ্য ব্যথা ছিল তাহা আমি পরে আলোচনা করিব। কিন্তু আমার সন্দেহ নাই যে এই রক্ত দাস্ত ও অসহ্য যন্ত্রণার পরই দুপুর বেলায় কুমার হিমাঙ্গ হইয়া পড়েন।

যদি তাহাই হয় তাহা হইলে রক্ত দাস্ত সকাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে এবং পূৰ্ব্বে একবার সাক্ষ্যেতে আশু ডাক্তার ও তাহাই বলিয়াছে।

কুমার যে দুপুরেই হিমাঙ্গ হইয়া পড়েন তাহা নিম্নলিখিত কারণ দৃষ্টে আমার মনে হয়। নিবারণ ডাক্তার ১২টার সময় আসিয়া এট্রোফিন আরমারী এবং হিমাঙ্গ অবস্থায় ব্যবহৃত অন্যান্য ঔষধ ব্যবস্থা করেন। ডাঃ ম্যাকগিলক্রাইষ্ট বলেন, যে আরমারী হিমাঙ্গ অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, এবং অন্য কেহ ঐ অভিমতের প্রতিবাদ করেন নাই। মিঃ চৌধুরী এই সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেন।

প্র :—এই সমস্ত ঔষধ কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্যও আনা হইয়া থাকিতে পারে ?

উ :—হাঁ, উহাদের মধ্যে কোন ২ ঔষধ হিমাঙ্গ হওয়া অথবা ঐরূপ হইবার আশঙ্কা থাকিলে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ইহা অতি স্পষ্ট যে, বেলা ১২টার সময় যখন নিবারণ ডাক্তার এই "আরমারী ঔষধ ব্যবস্থা করেন তখন উহা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য ব্যবস্থা করা হয় নাই; কেননা তখন ডাক্তার ক্যালভার্ট ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনা তখন উপস্থিত হইয়াছিল, এবং উহার উপশম করিতেই এই ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কুমারের তখন রক্ত দাস্ত হইতেছিল, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন এবং ঐ ব্যবস্থা হইতেই তিনি তখন হিমাঙ্গ হন।

কোন্ ব্যারামের কোন্ ঔষধ

ডাঃ ক্যালভার্ট হিমাঙ্গের জন্য অপর ব্যবস্থাপত্র দিয়াছিলেন; ইহার সহিত তিনি পেটের অসুখের জন্য আফিমের বড়িও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন;

নিবারণ ডাক্তার দুগ্ধ হজম করিবার জন্য সোডি সাইট্রেট্, হিমাঙ্গ বন্ধ করিবার জন্য "আরমারি" এবং আরও কতকগুলি ঔষধ একত্রে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইরূপ হরেক রকম ঔষধের 'জগাখিচুড়ী' কোন ব্যবস্থাপত্রেই দেখা যায় না।

(এঃ ৫১ বি এবং ৫১ সি) এই সময়ে দোকানে পাঠান হইয়া থাকিবে, কেননা তাহারা পর পর নম্বর দেওয়া দেখা যায়। পূর্ব্ব মামলায় আশু ডাক্তার বলিয়াছেন যে ডাঃ ক্যালভার্ট ও নিবারণ ডাক্তার একই সঙ্গে আসেন। এই আদালতে আশু তাহা স্বীকার করেন না। তিনি রাণীর উক্তি সমর্থন করিয়া বলেন যে, নিবারণ ডাক্তার বেলা বারটার সময় আসেন, এবং ক্যালভার্ট ২টার সময় আসেন। বিবাদীপক্ষ বলেন যে ২টার সময় আফিমের বড়ি দেওয়া হয় এবং উহা "বিলিয়ারী কলিকে" মর্ফিয়ার পরিবর্ত্তে দেওয়া হয়। যদি ইহাই সাব্যস্ত হয় যে নিবারণ ডাক্তার আসিয়া হজমী ঔষধ এবং "আরমারী" ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তাহারি চোখের সামনে কুমার রক্ত বাহ্য করিতে করিতে শনৈঃ শনৈঃ মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন, তবে ইহাও ঠিক হইবে যে ডাঃ ক্যালভার্ট আসিয়া আফিমের বড়ী "বিলিয়ারী কলিকের" জন্য দিয়াছিলেন এবং উহা পেটের অসুখের জন্য দেওয়া হয় নাই। আফিমের বড়ি পেটের অসুখের জন্য দেওয়া হইয়াছিল বলিতে হইবে, নতুবা ইহাই বলিতে হইবে যে পেটের অসুখের জন্য কোনই ঔষধ দেওয়া হয় নাই। যখন ঘন ঘন রক্ত দাস্ত হইতে থাকে তখন রোগীকে জলীয় খাদ্য দেওয়া উচিত। ইহাই সর্ব্ববাদী সম্মত ডাক্তারী মত (টমাস মাইলস ও উইলকি সাহেবের কৃত অষ্টমবারের ছাপা অস্ত্রচিকিৎসার পুস্তক প্রথম খণ্ড ২৭৬৯ পৃষ্ঠা দেখুন) এই জন্যই দুগ্ধ হজম করিবার জন্য রোগীকে নিবারণ ডাক্তার সোডিসাইট্রেট্ প্রভৃতি ঔষধ দেন। কেননা রক্তদাস্তে ঐ ঔষধ প্রয়োগের আর অন্য কোন প্রয়োজনীয়তা নাই।

আশু ডাক্তার অবশ্য এখন বলিতেছেন যে, ডাঃ ক্যালভার্ট ও নিবারণ ডাক্তার একসঙ্গে আসেন নাই। যদিচ পূর্ব্বে সাক্ষ্যে তিনি তাহা বলিয়াছেন। ইহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হইয়া যাইবে। বারটার সময় "আরমারি" ঔষধ দেওয়া হয় এবং তাহার পর আর ২টা পর্য্যন্ত রক্ত বন্ধ করিতে কোন ঔষধ দেওয়া হয় না; এবং ডাঃ ক্যালভার্টের অধুনা বিবৃত ঐ দিনের ঘটনার ইতিহাস হইতে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয়। তাঁহাকে ঐ দিনের প্রথম ব্যবস্থাপত্র যাহাতে ম্যাককার্ব্ব দেওয়া আছে তাহা দেখান হইলে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে আশু যাহা বলেন, তাহার নমুনা :—

আশুর উত্তরের নমুনা

প্রঃ— যদি রোগীর তরল মলের সহিত রক্ত বর্ত্তমান থাকে, তবে এইরূপ ব্যবস্থা পত্রে এমন কোন ঔষধ আছে যাহাদ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ হইতে পারে ?

উঃ— তরল মলের সহিত রোগীদের সাধাণতঃ রক্তস্রাব হয় না, এবং যদি তাহার ঐরূপ হইত তাহা হইলে সম্ভবতঃ সেই অবস্থার কারণের অনুরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইত। কুমার রক্তমিশ্রিত আম বাহ্য করিয়াছিলেন, এবং তাহার সঙ্গে কিছু টাট্‌কা রক্তও পড়িয়াছিল।

প্রঃ— সে, কখন ?

উঃ— প্রাতঃকালে অথবা দুপুরবেলা হইবে।

প্রঃ— তিনি কি ঐরূপ অনেকবার বাহ্য করিয়াছিলেন ?

উঃ— ঐরকম বারবার বাহ্য হইয়াছিল বলিয়া আমাকে বলা হইয়াছিল।

আশু ডাক্তার বলে যে ডাক্তার ক্যালভার্টের আগমনের পূর্ব্বে যে মলত্যাগ হইয়াছিল তাহা, সে ডাক্তার ক্যালভার্টকে দেখাইয়াছিল। কর্ণেল ক্যালভার্ট বলেন যে তিনি মলে যে সামান্য টাট্‌কা রক্ত দেখিয়াছিলেন,তাহা তাজা টাটকা এবং লাল। ডাক্তার ক্যালভার্টের ঐ দিনের ডাকের পর হইতে সমস্ত ঘটনা মনে আছে এবং আম ও কিঞ্চিৎ কাঁচারক্ত মিশ্রিত বাহ্য দেখিয়া তিনি তাহাকে উদারময় বলিয়া স্বীকার করেন নাই , যদিও তাহা এখন ঐ রোগ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এবং তাহার সাক্ষ্যমতে এই রক্ত এবং আম মিশ্রিত বাহ্য পিত্তশূলের ফল। সমস্ত তরল পদার্থ বাহির হইরা যাইবার পর শেষবারে যখন রক্ত এবং আম নির্গত হইতেছিল, শেষবারের বাহ্যের কথা কেবল তাহার পরিষ্কার ভাবে মনে আছে।

আমি দেখিতে পাইতেছি যে সকালবেলাই তাহার রক্তবাহ্য হইয়াছিল এবং প্রায় বারটার সময় তাহার মৃত্যু হয়। ১৯০৯ সালের ৮ই মের দুইমাস পরে কর্ণেল ক্যালর্ভার্ট মৃত্যু সম্বন্ধে যে এফিডেভিট্‌ দিয়াছিলেন তাহা দ্বারা ইহা সমর্থিত হয়। উক্ত এফিডেভিটে এইরূপ বলা হইয়াছে।

"৮ই তারিখের সকাল বেলা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং সেইদিন সন্ধ্যার সময় তাহার মৃত্যু হয়।"

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে সকালবেলায় যে কুমার ভাল ছিলেন এবং কর্ণেল ক্যালভার্ট তাহাকে ইনজেক্‌সন্‌ দিবার জন্য যে জিদ করিয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা,ঐ তারিখে তাহার জ্বর এবং সামান্য ব্যথা ছিল বলিয়া যে সেইদিন সকাল-বেলায় টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল, তাহা এখন ৭ তারিখের প্রদত্ত বিবরণ দ্বারা

মিথ্যা প্রমাণিত হয়, এবং সেইদিন দুপুর বেলায় মৃত্যু হওয়ায় সকালবেলা যে ভাব ছিল তাহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। আশুর পূর্ব্বকার সাক্ষ্যানুসারে রক্তমিশ্রিত বাহ্য নিবারণ করিবার জন্য প্রাতঃকালের অনুগ্র ঔষধের ব্যবস্থাপত্র প্রেরিত হইয়াছিল, কারণ ঐ রোগের উপযোগী আর কোন ব্যবস্থাপত্র নাই। আশু এখন তাহা স্বীকার করেন না, কিন্তু তিনি এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে ডাক্তার ক্যালভার্ট যদি প্রাতঃকালে রক্তবাহ্য দেখিতেন তবে তিনি এইরূপ ব্যবস্থা অনায়াসেই করিতে পারিতেন। তাহার পরীক্ষার জন্য দুপুরবেলা যে রক্তবাহ্য রাখা হইয়াছিল তাহা দেখিবার পূর্ব্বে তিনি সকালবেলা যাইয়া যে এই ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন কি না, তাহা তাহার স্মরণ নাই।

আমার মনে হয় উদরাময়ের সহিত রক্তবাহ্য হওয়াই প্রধান রোগ। ইহা যে পিত্তশূল নয় তাহার পক্ষে অশেষ কারণ আছে। আমি এখানে তাহাদের কয়েকটি কারণ মাত্র উল্লেখ করিব।

(এ) কোন টেলিগ্রামে এমনকি আশুর (টেলিগ্রামে) পিত্তশূলের কোন উল্লেখ নাই। (২) পিত্তশূলের ফলে উদরাময় বা রক্তমিশ্রিত বাহ্য হয় না। কোষ্ঠকাঠিন্যই ইহার সহচর। ডাক্তার ক্যালভার্ট একথা স্বীকার করেন এবং উদরাময় না দেখিয়া তিনি যে রক্তমিশ্রিত আমবাহ্য দেখিয়াছেন, উহা ইহার ফলমাত্র। পৃযকোষস্থ রসবাহিকা নালীর অভ্যন্তরে পাথরের ঘর্ষণের ফল। তিনি বলেন যে তিনি শব পরীক্ষার সময় অন্ত্রের মধ্যে রক্ত দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, যখন রক্ত রসবাহিকা নালীর এবং অন্ত্রের মধ্য দিয়া আসে তখন উহার বর্ণ কৃষ্ণ হইয়া যায়। কর্ণেল ম্যাকগিলক্রিষ্ট্ ইহার এইরূপ কারণ দেখাইয়াছেন, যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে পাথর গুলি নালীর ভিতরে ক্ষত করায় রক্ত বাহির হইতে আরম্ভ হয়, এবং এই রক্ত 'ডিউডেনামে' প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে পঁচিশ ফিট লম্বা ছোট বড় অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মলদ্বার দিয়া বাহির হয়; ইহা নিঃসরণ সময়ে পরিপাক হইবে, কাজে কাজেই ইহা বাহির হইলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে। টাটকা লালরক্ত মলদ্বারের সঙ্কুচন বুঝায় অর্থাৎ গুহ্যদ্বার দিয়া রক্ত পড়িতেছে। ইহার উপর কিছু হইলে লালরক্ত পড়িবে না। মেজর টমাস্ ভিন্ন অন্য কেহ ইহার যাথার্থ্য অস্বীকার করিতে পারিত না। তিনি বলেন যে তাহাকে উদারময়ের কথা বলা হয় নাই, কিন্তু তিনি ধরিয়াছিলেন যে ঐ দিন যে বাহ্য হইয়াছিল তাহার মধ্যে আম এবং যৎসমান্য রক্ত বর্ত্তমান ছিল। এবং ঐ বিষয়ে জেরার সময় যখন তাহার অভিমত লওয়া হয়। তখন আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় কল্পনার আশ্রয়

লইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে 'গলষ্টোন' বলিতে 'গলব্লাডারের' প্রদাহ বুঝায়। ইহার ফলে পূয জন্মায় এবং এই পূয অন্ত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া এমন এক প্রদাহের সৃষ্টি করিতে পারে, যাহার ফলে রক্তামশায়ের ক্ষত হইয়া, আম এবং রক্ত মিশ্রিত মলত্যাগের কারণ হইতে পারে। তাহার অভিমত এইভাবে লওয়া হইয়াছিল।

প্র—কর্ণেল ক্যালভার্ট জানাইয়াছেন বাহ্যের সহিত রক্তমিশ্রিত আম এবং কাচা রক্ত পড়িয়াছে বলিয়া তাহাকে আর্সেনিক বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল ?

উ—না, উহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

জেরার সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল।

প্র—কুমারের উদরাময় হইয়াছিল, এ খবর আপনি কি জানিতেন ?

উ—না, জানিতাম না।

প্র—আপনি কি জানেন যে কুমারের বমন হইয়াছিল এবং তাহাকে জোলাপ দিয়া মলত্যাগ করান হইয়াছিল ?

উ—আমার মনে হয় যে তাহার বমনেচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু বমন হয় নাই। মলত্যাগ করাইবার বিষয়ে আমার মনে হয় যে তাহার বাহ্যের সহিত আম এবং একটু রক্তও পড়িয়াছিল। কেহ কেহ উহাকে রেচন করান বলিবেন। আমি ইহাকে রেচন করান বলি না।

এই অভিমত কোন কাজেই লাগে না। রক্তামশায়ের কথা উদরাময়ের দ্বারা বাতিল হইয়া যায়।

প্রতিবাদীপক্ষের কর্ণেল ডেনহাম-হোয়াইটকেও ঐরূপ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, মলের সহিত আম এবং রক্ত থাকিলে উহাদ্বারা আর্সেনিক বিষ প্রয়োগের লক্ষণ প্রকাশ পায় কিনা ? তিনি উত্তরে না বলিয়াছেন—প্রত্যেকেই না বলিবেন। তরল বাহ্যের সহিত রক্ত এবং উদরাময়ের কথা স্বীকার করিয়া লইলে ডাক্তার ক্যালভার্টের রক্তমিশ্রিত আম বাহ্যের বিষয় আলোচনা করিলে কি ফল হইবে তাহা বুঝা কঠিন; যে সব লক্ষণ মানিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে পিত্ত-শূলের ফলে উদরাময়ের সহিত টাটকা লাল রক্ত পড়িতে পারে না।

(সি) পিত্তশূলের যন্ত্রণার সময় কুমারকে ইনজেকসন দিবার প্রস্তাবে তিনি অসম্মত ছিলেন, ইহা ভিন্ন তাহার পিত্তশূলের কোন চিকিৎসা করার চেষ্টা করা হয় নাই। আফিংয়ের বটিকা সেবন ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না; এবং যদিও উহা পিত্তশূলের প্রতিষেধক হয়, উহা দ্বারা রক্ত নিঃসরণ বন্ধ হয় না; এবং যদিও উপস্থিত ক্ষেত্রে অবশেষে একটি ইনজেকশন দিবার পর বেদনা

বন্ধ হইয়াছিল, তথাপি তিনি রোগমুক্ত হন নাই। কর্ণেল ক্যালভার্ট বলেন যে দেহযন্ত্র অতি গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে, এবং 'মরফিয়া' সেবন করিবার পরও পাকস্থলীতে বেদনা ছিল। শেষবাবের ব্যবস্থাপত্রে পাকস্থলীর উপর প্রয়োগ করিবার জন্য বেলেডোনা লিনিমেণ্টের নির্দ্দেশ ছিল, ইহাতে বুঝা যায়। আমার মতে এই শেষ ব্যবস্থাপত্র দ্বারা পাকাশয়ের অভ্যন্তর যন্ত্রণার সমস্ত গূঢ় তথ্য ধরা যায়; এবং ইহা দেখিয়া বেশ আশা হয় যে ডাক্তার ডেনহাম-হোয়াইট রোগের লক্ষণগুলি দেখিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ডাক্তার ম্যাকগিলক্রিষ্টের সহিত মিলিয়া যায়। প্রতিবাদীপক্ষের তিনি (কর্ণেল ডেনহাম-হোয়াইট) বলেন ;—

"ব্যবস্থাপত্রগুলি এবং কর্ণেল ক্যালভার্টের সাক্ষ্য দেখিয়া আমার মনে হয় রোগটা রক্তামাশয়, কিন্তু উহাব কোন চিকিৎসা হয় নাই।"

পুনর্ব্বার কর্ণেল ক্যালভার্টের সাক্ষ্য পাঠ করিয়া আমার মনে হয় যে, "হয়ত অন্ত্রপ্রদাহের চিকিৎসা করা হয়।" অন্ত্রপ্রদাহ কি প্রকারের রোগ সে সম্বন্ধে মেজর টমাস আমাদিগকে বলিয়াছেন। অন্ত্রপ্রদাহ হইলে অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে প্রদাহ হয়। ইহা উত্তেজনা দ্বারা সৃষ্টি হয়। উত্তেজক বস্তুটি জৈব বা অজৈব হইতে পারে। আর্সেনিক একটি রাসায়নিক উত্তেজক বস্তু।

কর্ণেল ডেনহাম-হোয়াইট বলিয়াছেন :—

আর্সেনিক বিষপ্রয়োগের লক্ষণের সহিত তীব্র অন্ত্রপ্রদাহের লক্ষণের কোন বিভিন্নতা নাই।

(ড়) পরিবারের কেহ পিত্তশূলে মৃত্যুর কারণ বলিয়া শোনে নাই। টেলিগ্রামেও ইহার উল্লেখ নাই।

খবরের কাগজে যে শোকসংবাদ বিবাদীগণ পাঠাইয়াছিল, তাহাতে রক্ত দাস্তের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীপুর মামলায় বীরেন্দ্রের, কুমারের রোগ ও মৃত্যু-সম্বন্ধীয় জবানবন্দীতে বলা হইয়াছে যে, মৃত্যুর দিন ডাক্তার কালভার্টকে কি রোগ তাহা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। বীরেন্দ্র এই দিনের কথা বলিতে যাইয়া বলিতেছে, "ডাক্তার কালভার্টকে কি রোগ জিজ্ঞাসা করা হইল। ডাঃ কালভার্ট বলিলেন—"পেটে চাকা রক্ত আছে, তাই বেদনা বোধ হইতেছে" (একজিবিট ৩৫০) কিন্তু ডাঃ কালভার্ট ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি ইহা বলিতেও পারেন না। ইহাতেই দেখা যায় অসুখের সময় কেহই পিত্তশূলের কথা শুনেন নাই। কাজেই সত্যবাবু ও আশুবাবু পেট ব্যথার কথা বাড়াইয়া বলিয়াছেন। আশুবাবু পূর্ব্ব হইতেই যকৃতেয় ব্যথা বলিয়া বলিতেছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন একথাটি তাহাদের নিকট নূতন হইবে;

বেশী কথা এইজন্যই টেলিগ্রামে লেখেন নাই। কিন্তু বিবাদীপক্ষের সাক্ষী সত্যবাবুর জবানবন্দীতে দেখা যায় পিত্তশূল কুমারের পুরাতন ব্যাধি। এবং তিনি যে কলিকাতায় চিকিৎসা করাইতে গিয়াছিলেন তাহা কেবল উপদংশের জন্যই নয়—এই পিত্তশূলের জন্যও।

কিন্তু আশু ডাক্তার এইভাবে তাঁহার জবানবন্দি আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে কলিকাতায় ডাক্তারদের তিনি পিত্তশূলের কথা বলেন নাই এবং তাহার জন্য কোন চিকিৎসাও হয় নাই। তার পর তিনি এই উক্তি বদলাইয়া দিয়া বলিতেছেন যেন আর একজন ডাক্তারকে তিনি পিত্তশূলের কথা বলিয়াছিলেন। এ সমস্তই মিথ্যা কথা। পিত্তশূলের কথা প্রথমে ডাঃ কাল্‌ভার্টের ১০ই তারিখের লিখিত শোক-জ্ঞাপক চিঠিতে আসে—সেখানেও কেবলমাত্র শূল বেদনার কথা আছে। তিনি মেজকুমারকে ৮ই তারিখের পূর্ব্বে কেবলমাত্র ৬ই তারিখে দেখিয়াছিলেন। সেদিন তাহার কোন বেদনা ছিল না। ৮ই তারিখ তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতে এখন জানা যায়—রক্ত দাস্ত......তবু যখন তিনি সেই শোকসূচক চিঠি লিখিলেন তাহাতে পিত্তশূলের কথাই বলিলেন—আরও লিখিলেন যে এই ব্যথা তাঁহার প্রায়ই হইত—আত্মীয়স্বজনের অনুরোধ সত্ত্বেও ইনজেকসন নেন নাই। তাহার পরের এ্যাফডেভিটে দেখা যায় তিনি চৌদ্দদিন ধরিয়া চিকিৎসা করিয়াছেন এইরূপ বলিয়াছেন। তাহাতেই তিনি দেখাইয়াছেন যে তিনি প্রত্যহই পিত্তশূলের কথা লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু বিবাদীগণের মতে ৭ই তারিখের পূর্ব্বে তিনি উহা এক দিনের জন্যও দেখেন নাই। এই দিন বেদনার মধ্যেই আর্সেনিক ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া বলা হইয়াছে কিন্তু আমি দেখিতেছি তিনি তখন উপস্থিতই ছিলেন না। ইহা বেশ বুঝা যায় যে কেহ তাঁহার কাছে এই শোকসূচক চিঠিটি, রক্তদাস্ত, কোলাপস্ ও বাহ্যতঃ মৃত্যু ঘটার কারণ ঢাকিবার জন্যই চাহিয়াছিল। ডাঃ কালভার্ট স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি কখনও আর্সেনিক বিষের রোগী দেখেন নাই,—কাজেই পিত্তশূলের কথা যখন বলা হইল,—তখন এ বিষয়ে চিন্তার পর নিজ হইতেই তাহাই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ স্থির করেন, এবং ইহার জন্য আর যাহা কিছু লেখা দরকার—যেমন ১৪ দিন ধরিয়া চিকিৎসার কথা লিখিয়াছেন। ১৯০৯ সালে জুলাই মাসে এই এভিডিবেড্ দেওয়া হইয়াছে। সত্যবাবু, আশুবাবু কি অন্য কেহই বলিতে পারেন না এই চিঠি কেমন করিয়া এবং কেন লেখা হইয়াছিল—কাহার কাছেই বা দেওয়া হইয়াছিল। ডাঃ কালভার্টের কথা ত পরের কথা—এই চিঠির কথাই বলেন নাই। ১৯২১ সালে

বাদী ফিরিয়া আসিলে সত্যবাবুই ইহার নকল রেভিনিউ বোর্ডের নিকট পাঠাইয়া দেন। এই সকল হইতে বোঝা যায় যে ১৯২১ সালের মে মাসে এই পত্র প্রথম বাহির হইয়াছে। ২০দিন পূর্ব্বে বাদী নিজ পরিচয় দিয়া সম্পত্তির দাবী করিলে মিঃ নিড্হাম বাদীর মৃত্যুর প্রমাণ চাহিয়া পাঠান। তখন এই চিঠি এবং ইহার একখানা নকল মেজরাণীকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আমি এই সকল কথা বিশ্বাস করি না। ইহা আবিষ্কৃত হওয়ার জন্য প্রথমে জয়দেবপুরে পাঠান হইয়াছিল; পরে যথাসময়ে বড় সাহেবের কাছে পাঠান হয়। আমি দেখিতেছি পিত্তশূল গল্প মাত্র। ইহাতে মলে তাজা রক্ত থাকিতে পারেনা এবং কর্ণেল ম্যাকৃগিলক্রাইষ্টের মতে পিত্তশূলের চিকিৎসাও হয় নাই। কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট ইহার সহিত একমত। মেজর টমাস—যখন বলিলেন যে আফিংয়ের বড়িই এ জায়গায় একমাত্র ঔষধ, পেটের অসুখ হইলেও উহাই দেওয়া উচিত ছিল—আর শূলবেদনা ধরিলে পেটের অসুখের কোন চিকিৎসাই হইবে না। এই বিষয় তিনি স্থূলত উক্ত দুইজন ডাক্তারকেই সমর্থন করিয়াছেন।

কুমারের চিকিৎসা বিভ্রাট

ডাঃ কালভার্ট ইহা দেখিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন,—রক্তের জন্য কোন চিকিৎসার দরকার নাই, কারণ রক্তের সঙ্গে কোন তরল মল নাই। মলে যে আম রক্ত আছে তাহা সামান্য (fivial)। রক্তশূলের কথা ছাড়িয়া দিলেও ৮ই তারিখের উপসর্গগুলির কারণ কি? যে উপসর্গগুলি স্বীকৃত হইয়াছে তাহা প্রাতঃকালে' বমি, ঘন ঘন রক্ত দাস্ত, অস্থিরতা এবং অবসাদ ও হিমাঙ্গ অবস্থা—তারপর খিঁচুনি এবং শেষ পর্যন্ত যাহা দেখা যায় তাহা হইতেছে পাকস্থলীর ব্যাঘাত; আশু ডাক্তার ও ইহা স্বীকার করিয়াছে। পাকস্থলীতে বেলেডোনা মলমই শেষ ঔষধ প্রয়োগ। খিচুনিদ্বারা শরীরে জলীয় পদার্থের অল্পতা—হিমাঙ্গ অবস্থা অর্থে রক্তের অপ্রাচুর্য্য, তীব্র বেদনা ও স্নায়ুকেন্দ্রে অতিরিক্ত উত্তেজনা বুঝায়। মলের রক্ত লাল—সে জন্যে রক্তদাস্ত দ্বারা অন্ত্রের চাপ (congestion) বোঝা যায়। ডাঃ ম্যাকৃগিলক্রাইষ্টের মতে এই সকল আর্সেনিক বিষের লক্ষণ। ইঁহার অন্যমতগুলিরও কেহ আপত্তি করেন নাই। তাহার এই মতটী কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইটও সমর্থন করেন। অন্ত্রের এই স্ফীতি কোন উত্তেজক পদার্থের ফল। এই উত্তেজক পদার্থ অনেক কিছুই হইতে পারে, আর্সেনিক ও তাহার মধ্যে একটা। লায়নের জুরিস্প্রুডেনস্ বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমার কাছে উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহাতে

ধাতব উত্তেজক পদার্থ সম্বন্ধে ৪৭ পৃষ্ঠায় এক অধ্যায় বলা হইয়াছে। (১ম সংস্করণ ১৯৩৫) এই অনুচ্ছেদটি তুলিয়া দেওয়া হইল।

এখানে তীব্র আর্সেনিক বিষের ক্রিয়া, লক্ষণ সহ লেখা আছে। কোনও লক্ষণই স্থায়ী না হইলেও মোটের উপর কতকগুলির কথা বলা হইয়াছে, যথা বমি—পেটের তীব্র বেদনা, দাস্ত,—প্রথমে পাকস্থলীতে যাহা ছিল তাহা—পরে পচা দুর্গন্ধযুক্ত চামড়া ও মাংসের ক্ষুদ্র টুকরার সহিত জলীয় পদার্থ, আরও পরে চাল ধোয়া জলের ন্যায় ঘোলা কলেরার দাস্তের ন্যায় দাস্ত। গুহ্যদ্বারে ব্যথা, অবসাদ এবং খিঁচুনি। ঔষধ প্রয়োগের কয়েক মিনিট মধ্যেই লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে, অনেক সময় কয়েক ঘণ্টা দেরীও হইতে পারে। এক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হইতে পারে। তবে সাধারণতঃ ৩৬ ঘণ্টার মত দেরী হয়। (৪৮৮ পৃ)

বিষ প্রদানের প্রমাণ প্রয়োগ

আর্সেনিক বিষের রোগীর মল যে কলেরার রোগীর মলের ন্যায়, একথা ডাঃ ম্যাকগিলক্রাইষ্ট ঠিকই বলিয়াছেন, প্রভেদ এই মাত্র যে এখানে রক্ত থাকে। কলেরার মলে জলের ভাগ বেশী রক্তের জলীয় ভাগ যেন বাহির হইয়া আসে, অন্ত্রের রং ফ্যাকাশে হইয়া যায়। আর্সেনিকের বেলায় জল-স্রাবের আকারে বাহির হইয়া আসে ও উপরে পাকস্থলী হইতে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত সমস্ত অন্ত্র লাল হইয়া যায়। এইদিনের লক্ষণগুলি কোন উত্তেজক জিনিষের জন্য হইয়াছে এবিষয়ে উভয় পক্ষের ডাক্তারের একমত—কুমারের এই অবস্থা কোন রোগের জন্য হয় নাই, কোন উত্তেজক জিনিষ খাওয়ানের জন্য হইয়াছে, এইরূপ সাব্যস্ত করার পক্ষে ঐ মতই যথেষ্ট। আর্সেনিক ছাড়া যে অন্য কোন উত্তেজক পদার্থ দেওয়া হইয়াছিল কোন জবানবন্দীতে তাহা দেখা যায় না।

৭ই তারিখ আশু ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে আর্সেনিক দেখা যায় তাহার এই প্রেস্‌কিপসন করার পর অস্বীকার করিয়া উহার কথা গোপন করিবার চেষ্টা ও অন্যের উপর দোষ দিয়া ৮ই তারিখে পিত্তশূল হইতে পেটের অসুখ—অথবা আগের পেটের অসুখের জন্য দেওয়া হইয়াছে এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করার জন্য তাহার উপর গভীর সন্দেহের কারণ হইয়াছে। এই সকল সে আগাগোড়া মিথ্যা বলিয়াছে।

আশুর স্বীকারোক্তি

অনেক কথা কাটাকাটি করিয়া জেবায় সে একথা স্বীকার করিয়াছে যে, সে-ই রাত্রে আর্সেনিক দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহার নিজের একটি ঔষধের বাক্স আছে।

কিন্তু তাহাতে আর্সেনিক ছিল না। পিত্তশূলের কথার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যে তাহাকে বলিতে হইতেছে যে যখন এই ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল তখন পিত্তশূল বেদনা ছিল। কিন্তু ইহা কখনও হইতে পারেনা—কারণ ইহাতে কোন বেদনার উপশম হয়নাই, বেশীমাত্রায় হইলে বেদনার সৃষ্টিই করে। গোপনের চেষ্টা না করিলেও এইরূপ ভাবে ঔষধ দেওয়াই গভীর সন্দেহের সৃষ্টি করে। এই পর্য্যন্ত যাহা প্রমাণ হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি হাতুড়ে ডাক্তারের ন্যায় ঔষধ দিয়া উহার ফল দেখিয়া ভীত হইয়া ছিলেন—আমার মনে হয় না যে মারিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া তিনি উহা করিয়াছিলেন। আমার মনে হয় যে উত্তেজক পদার্থটি আর্সেনিক ছাডা আর কিছুই নয়—আর্সেনিক ছাড়া আর কিছুরই সঙ্গে হইয়া পরের দিনে লক্ষণগুলি খাপ খায় না। এখন বলা হইতেছে যে মেজ কুমার মধ্যরাত্রে মারা গিযাছিলেন কি সন্ধ্যার অল্প পরেই মারা গিয়াছিলেন। এই মোকদ্দমায় এটা একটা গুরুতর বিষয় যে কুমার মাঝ রাত্রে মারা গিয়াছিলেন কিনা? তাহা হইলে ৯টায় দাহের কথা গল্পমাত্র হইয়া দাড়ায়। এই সম্বন্ধে ডাঃ ক্যালভার্টের একটী এফিডেবিট্ রহিয়াছে যে কুমার ১১টা ৪৫ মিনিটের সময় মারা গিয়াছেন—এবং তিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাবতী কি করিলেন

মেজরাণী বলিতেছেন যে, বেলা ২টার সময় যখন রক্তদাস্ত হইতেছিল এবং ডাঃ ক্যালভার্ট আসিয়াছিলেন তখন হইতেই তিনি কুমারের বিছানায় ছিলেন এবং মাঝ রাত্রে মারা যাওয়ার আগে তাঁহাকে ছাড়িয়া যান নাই,—তারপরও পরদিন প্রাতঃকালে মৃতদেহ লইয়া যাওয়ার আগে তাহা ছাড়েন নাই,—ঐখানেই পড়িয়াছিলেন। অন্য যে সকল সাক্ষী এই দিনের কথা বলিয়াছে সকলেই তাঁহার কথা সমর্থন করে। তিনি একথাও বলেন যে ডাঃ ক্যালভার্ট বেলা ২টা হইত মৃত্যুর কিছুপর পর্য্যন্ত সে বাড়ীতেই ছিলেন। কেবলমাত্র আহার করিবার জন্য রাত্রে ৮টায় একবার বাহিরে গিয়াছিলেন। ডাঃ ক্যালভার্ট যে ঐখানে এতক্ষণ পর্য্যন্ত ছিলেন,—কিন্তু বিশেষ কিছুই করেন নাই।

এমনকি সন্ধ্যারপর রোগীর জন্য কোন প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন পর্য্যন্তও দেন নাই ইহা বিশ্বাস করা শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বলা হইয়াছে যে, পরলোকের যাত্রী কুমার যে ঘরে মেজেতে ছিলেন তাহার পাশে একটি বসিবার ঘরে ডাঃ ক্যালভার্ট বসিয়াছিলেন—আর এক কথা তিনি (মেজরাণী) বলিয়াছেন (এবং অন্য প্রত্যেকেই এই কথা বলিয়াছে) যে তিনি কখনও মনে করেন নাই। ডাঃ ক্যালভার্ট তাহার মূল জবানবন্দীতে বলিয়াছেন,—আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯০৯ সালে ৭ইজুলাই তারিখের—মৃত্যুর এফিডেভিট তাঁহাকে দেখান হয়।

প্রঃশ্ন—জীবনের সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়াছিল এ বিষয়ে কি আপনি নিশ্চিত ছিলেন।

উঃ—সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলাম।

তিনি জেরায় বলিয়াছেন—'সার্টিফিকেট না দেখিয়াই আমার মনে হইল যে কুমার মধ্যরাত্রে মারা গিয়াছেন'—তিনি কোন মেমো বা টোকা কিছুই লিখিয়া রাখেন নাই। তিনি চিকিৎসাও করেন নাই, কেবল পরামর্শের জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া লেওয়া হইয়াছিল, তবুও ২২ বছর পরে তাঁহার এই কথা মনে আছে,—কারণ তিনি বলেন, আমার সমস্ত কথা স্মরণ আছে, কারণ কুমারের মৃত্যু আমার মনে গভীর দুঃখের রেখা পাত করিয়া গিয়াছিল। কারণ চিকিৎসা স্বীকৃত হইলে তিনি এভাবে মারা যাইতেন না। "তিনি তখনও যুবক"। জুলাইমাসের এফিডেবিট্‌ না দেখিয়া তাঁহার এই কথা মনে ছিল কিনা তাহার উত্তরেই তিনি এই কথা বলিয়াছেন।

জবানবন্দি দেওয়ার আগে তিনি তাঁহার প্রেস্‌ক্রুপসনগুলি, তাঁহার এফিডেবিড্‌ ও ১৯২১ সনে মিঃ লিণ্ডসের কাছে লেখা চিঠি ও একটী জবানবন্দি যাহার কথা পরে আর কিছুই জানা যায় নাই,—এইরূপ কতকগুলি কাগজ পত্র দেখিয়াছেন, একথা স্বীকার করেন। এফিডেবিট দেখা মৃত্যুর সম্বন্ধে সকল কথা মনে হওয়ার কারণ বলেন। এফিডেবিটে বলা হইয়াছে ১৪ দিন অসুখ ছিল, এবং ১১টা ৪৫ মিনিটে মৃত্যু হইয়াছে। ১৪ দিন অসুখের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। তবু ক্যালভার্ট বলিয়াছেন, —প্রায়ই ব্যথা হইত, তিনি প্রায়ই দেখিতেন, অসুখের সময় ইন্‌জেক্‌সেন নিতে অস্বীকার করিয়াছেন। দেখা উচিত যে ১৪ দিন ব্যাপী অসুখ ও ১১টা ৪৫ মিনিটে মৃত্যুর মূল প্রকৃত পক্ষে এক কিনা ?

১৯২১ সালের ৩রা আগষ্ট তারিখে যখন মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছিল এবং এ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট লোকদের নিকট ছাপান প্রশ্ন পাঠান হইয়াছিল তখন নীচের এই চিঠিখানি লিণ্ডসে সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছেন। (Z 129)

গোপনীয় · টেম্পেল কম্ব
১০৩ উইলিংডন রোড
ঈষ্ট বোর্ণ
৩রা আগষ্ট ১৯২১।

প্রিয় মহাশয়,

ভাওয়ালের কুমারের কথা আমার মনে আছে। তিনি ১৯০৯ সালের মে মাসে দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। তিনি 'গলষ্টোনে' ভুগিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যু আমার মনে রেখাপাত করিয়া গিয়াছে। যদি তিনি আমাদের উপদেশ মত চলিতেন, তাহা হইলে এভাবে মারা যাইতেন না। মৃত্যুদিনে তাঁহার তীব্র পিত্তশূলের ব্যথা হয়। একটা মরফিয়া ইন্‌জেকসনেই তৎক্ষণাৎ আরাম পাওয়া যাইত। তিনি সাব্‌কিউটিনাস্ ইন্‌জেকসন নিতে অস্বীকার করেন, কারণ মৃত্যুকালে তাঁহার মা একটী হাইপোডারমিক ইন্‌জেক্‌সন দেওয়ার পরেই মারা যান—তিনি, রোগ যে মৃত্যুর কারণ ইহা না বলিয়া এই ইন্‌জেকসনকেই মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই রোগের জন্য চিকিৎসা করা উচিত ছিল। ভেদ বমির জন্য মুখ দিয়া ও গুহ্যদ্বার দিয়া আফিং দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। উৎকট যন্ত্রণা যখন উপশম করা গেল না; তখন তাহা হইতে অবসাদ আসিল এবং অবসাদ হইতেই মৃত্যু ঘটিল। আমি মৃত্যুর সময়ে তাঁহার কাছে ছিলাম কিনা সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারিতেছি না—কিন্তু মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে অবসন্ন ও ~~হিমাঙ্গ অবস্থায় তাঁহা~~কে দেখিয়াছি। শেষ বার যখন তাঁহাকে দেখি তখন তাঁহার বাঙ্গালী চিকিৎসকটি উপস্থিত ছিলেন, এবং অধুনামৃত কর্ণেল মেকাস্ আই, এম এস্, কে পরামর্শের জন্য সকাল বেলায় ডাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কর্ণেল মেকাস্ ঢাকার সিভিল সার্জ্জেন ছিলেন এবং এই পরিবারটির সহিত পরিচিত ছিলেন। কুমার এই অবসাদ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই এবং ঐ রাত্রেই মারা যান।

ভবদীয় বিশ্বস্ত—
জে. টি, ক্যালভার্ট

ইহা জানা যায় না যে, চিঠিতে তাঁহাকে কি খবর দেওয়া হইয়াছিল—যাহার উত্তরে তিনি উপরের এই চিঠি লিখিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন, একথা ১৯২১ সালে তাঁহার স্মরণ ছিল না। এফিডেবিট্ দেখিয়া পরে তাঁহার ইহা মনে হইতে পারে। এই চিঠির পর তিনি অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এই ঘটনার কথা তাহার মনে ছিল

ডাঃ কালভার্টের এই কথাটা সত্য নয়। আমি বেশ ভালভাবেই বুঝিয়াছি যে তাঁহার এই স্মরণ থাকা—'১৪ দিনের অসুখের'—'মাঝে মাঝে ব্যথা' এবং 'প্রত্যহ রোগী দেখা'রই মত। তাহার এফিডেভিট্ ছিল বলিয়া তাঁহাকে স্মৃতি হইতে অনেক কথা বলিতে হইয়াছে। একটী কথা ত সম্পূর্ণই মিথ্যা—আর একটিও প্রায় তদ্রূপ। কারণ যাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না এইরূপ কতকগুলি ঘটনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যায় যে মধ্যম কুমারের ৮ই মে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে মৃত্যু হইয়াছিল বা মৃতবৎ মনে করা হইয়াছিল।

এই সিদ্ধান্তটি নিম্নের ঘটনাগুলির দ্বারা—পৃথক করিয়া নয়, সবগুলিকে একসঙ্গে মিলাইয়া লইলে পাওয়া যায়—

(ক) রোগের গতি অবসাদের মত মৃত্যুর দিকেই ছিল—নাড়ী ছিল না—সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘুঁটের গুঁড়া দিয়া হাত পা ঘষা হইতেছিল—বিবাদীগণই এই কথা স্বীকার করেন। রাণীর জবানবন্দিতে চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাঃ বি, বি, সরকারের আগমনের পর মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোনও কথা নাই।

(খ) মৃত্যুর পূর্ব্বে সর্ব্বশেষ টেলিগ্রামের সময় হইতেছে বৈকাল ৩-১০ মিনিট ষ্টাণ্ডার্ড সময় অর্থাৎ ৩-৪০ এই রকম স্থানীয় সময়।

৪-৪৫ মিনিটে বড়কুমার যে টেলিগ্রাম করিয়াছেন তাহাতে আছে—ভয়ানক চিন্তিত, ঘন ঘন অবস্থা জানাও। সবচেয়ে ভাল চিকিৎসক দেখাও। বর্ত্তমান অবস্থা টেলি করিয়া জানাও। এই টেলির কোন জবাব দেওয়া হয় নাই অথচ ৬টার মধ্যে এর উত্তর আশা করা হইতেছিল।

(গ) সন্ধ্যার পর ডাঃ বি, বি, সরকারের দেখতে আসা।

সত্যবাবু এই ডাক্তারের দেখা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এইরূপ:—সন্ধ্যার সময় তিনি সম্ভবতঃ ঔষধের তাগিদ দিতে বাহির হইয়াছিলেন। সব ঔষধই আগে আসিয়াছিল। এই সময় বিভারাণীর মামা সূর্য্যনারায়ণ বাবুর সঙ্গে চৌরাস্তায় দেখা হয়। তাহার মামা তখন সরকারী উকিল মহেন্দ্রনাথ বানার্জ্জীর বাড়ী 'বলেন ভিলার' এক অংশে বাস করিতেন। তিনি একা ছিলেন, সঙ্গে পরিবার ছিল না।

সত্যবাবু তাঁহার কাছে আসিয়া মেজ কুমারের অসুখের কথা বলেন,—সূর্য্যবাবু অসুখের কথা পূর্ব্বে জানিতেন না,—যদিও তিনি পিতার ন্যায়, সত্যবাবু তাঁহার মা ও রাণীকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া লালন পালন করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহাকে অসুখের কথা বলা হয় নাই। সত্যবাবু তাঁহাকে কুমারের অসুখের কথা এবং কোন্ কোন্ ডাক্তার দেখিতেছে তাহাদের কথা

বলিলেন। ডাক্তার কালভার্ট ও ডাক্তার সেন তখনও বাড়ীতেই আছেন তাহা জানান। সূর্য্যনারায়ণবাবু ডাঃ বি, বি, সরকারকে সন্ধ্যার সময় কুমারকে দেখার জন্য আনেন।

রাণী বলেন ডাঃ বি, বি, সরকার যখন কুমারকে দেখেন, তখন তিনি কুমারের পাশে ছিলেন। তিনি নাড়ী দেখেন, রোগীকে জিজ্ঞাসা করেন ও প্রায় ১০ মিনিট সেখানে থাকিয়া প্রস্থান করেন। তিনি বলেন—এ সময় ডাঃ কালভার্ট ও ডাঃ সেন সে ঘরে ছিলেন না।

তিনি বলেন এঁরা দুইজন সেই বাড়ীর পাশের ৫নং ঘর হইতে যাতায়াত করিতেছিলেন। উহাই ডাক্তারদের বসিবার ঘর ছিল। কিন্তু যখন ডাঃ বি, বি, সরকার দেখেন তখন সেই ঘরে কেহই ছিল না (যদিও একমাত্র আসার সময় ছাড়া ডাঃ কালভার্ট সর্ব্বদাই উপস্থিত) ২টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত দুইজনকে তিনি বাড়ীতেই রাখিয়াছিলেন।

পাছে তাহাদের এই অনুপস্থিতি মোকদ্দমার ক্ষতি করে এই ভাবিয়া ডাঃ আশুতোষকে দিয়া বলান হইয়াছে যে, যখন ডাঃ বি বি সরকার কুমারকে দেখিতেছিলেন তখন ডাঃ কালভার্ট ও ডাঃ নিবারণ উভয়েই সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার সরকারকে আনার কারণ কি ?

সত্যবাবু এর পর আসিয়া বলেন ডাঃ বি, বি, সরকার কুমারকে দুইবার দেখিয়াছিলেন—একবার অপর দুইজন ডাক্তারের সঙ্গে, আর একবার হয়ত একলা দেখিয়াছেন। কিছুই অসম্ভব নয়। ডাঃ বি, বি, সরকারের ডাইরী ও তদীয় পুত্র মিঃ বিজলি সরকারের জবানবন্দীতে দেখা যায় যে ডাঃ সরকারের পসার খুব কম—প্রায় ছিলই না,—তবু ডাঃ ক্যালভার্ট ও রায় বাহাদুর নিবারণ সরকারের মত ডাক্তার বাড়ীতে থাকিতেও বি, বি সরকারের এম, বি-র মত ডাক্তারকে ডাকিয়া দেখান অসম্ভব বলিয়া মনে করি। তিনি যে ডাক্তার ক্যালভার্টের সম্মুখে রোগী দেখিতে সাহস করিয়াছেন এবং ডাঃ ক্যালভার্ট তাহা নীরবে সহ্য করিয়াছেন, ইহাও অসম্ভব মনে হয়। আমি মোটেই ইহা বিশ্বাস করি না, সম্ভবপরও মনে হয় না। ডাঃ বি, বি সরকার যে সন্ধ্যার সময় সেখানে আসিয়া কুমারকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন,—ইহাতেই প্রমাণ হয় যে ডাঃ ক্যালভার্ট তখন সেখানে ছিলেন না। মৃত্যু ঘনাইয়া আসিতেছিল—তা না হইলে ঐ দুইজন ডাক্তার চলিয়া যাইতেন না—এঁকে শেষ আসা মনে করিয়া আনা হইয়াছিল। রামসিংহ সুভা—একথা সত্য বলিয়াছে যে, যখন

৭॥টার সময় তিনি সে ঘরে আসেন তখন কুমারের মৃতদেহ ও ডাঃ বি, বি সরকারকেও সে ঘরে দেখিয়াছেন। তিনি (ডাঃ সরকার) তখনই সেখান হইতে চলিয়া যান নাই। বাঙ্গালী বলিয়া তিনি সেখানে মৃতদেহটী না লইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিয়া ভালই করিয়াছেন। বিবাদীগণ তাঁহার যে ডাইরী দাখিল করিয়াছে, তাহাতে ৮ই তারিখে লেখা আছে—"ভাওয়ালের কুমারের কাছে কয়েক ঘণ্টা।"

বিজলী সরকারের জবানবন্দীতে দেখা যায় যে ১৯৩৫ সালের মে মাসের বিবাদীপক্ষের এক উকিল এই ডাইরী দেখিয়াছেন। রাণীকে ফেব্রুয়ারী মাসে জেরা করা হয়। একথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তাহার উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। ডাঃ আশু ও বীরেন্দ্র তাঁহাকে কয়েক মিনিট রাখা হইয়াছিল বলিয়া বলিয়াছে। দেখা যায় যে ডাঃ ক্যালভার্ট ৮টায় খানা খাইতে চলিয়া গেলে, সত্যবাবু তাঁহাকে পাশের বসিবার ৫নং ঘরে বসান—এখানেই রামসিংহ সুভা কুমারকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়।

তাঁহার (সত্যবাবুর) নিজের ডাইরীতে লেখা আছে—তিনি বলেন ইহা প্রায় তিন দিন পরে লেখা, কাজেই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে। সত্যবাবু ৮ই তারিখে লিখিয়াছেন "কুমার রমেন্দ্র দার্জ্জিলিংএ ষ্টেপএসাইডে মধ্যরাত্রে মারা যান—৪জন ডাক্তার দেখিয়াছিল।"

১। পারিবারিক ডাক্তার আশু দাসগুপ্ত, ২। রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্র ঘোষ ৩। বি, বি, সরকার এম বি ৪। লেফ্‌টানেণ্ট কর্ণেল কালভার্ট। মৃত্যুকালে সকলেই উপস্থিত ছিলেন।"

তিনি বলেন, বি, বি, সরকার ছাড়া আর সকলেই তখন সেখানে ছিলেন এ কথা সত্য। কিন্তু সত্য কথা হইতেছে ডাঃ বি, বি, সরকার ও ডাঃ আশুতোষ ছাড়া আর কেহই ছিলেন না।

মৃত্যুর টেলিগ্রাম কোথায়

বিবাদীরা কেহই এই টেলিগ্রামের কথা জানে বলিয়া মনে হয় না। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে দার্জ্জিলিংএ যে সকল সাক্ষী ছিল—তাহাদের কেহ এমন কি সত্যবাবু কেহই এ কথা জানেন না যে কে, এবং কখন এই টেলিগ্রাম দিল এ বিষয়ে কেহই কিছু বলেন নাই, কেবল বীরেন্দ্র শ্রীপুর মোকদ্দমার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিতে গিয়া বলিয়াছে যে ডাঃ ক্যালভার্ট এই টেলিগ্রাম করিয়াছেন, এখন বলে যে, মৃত্যুর পরে তাঁহাকে (ক্যালভার্ট) টেলিগ্রাম করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। ইহা স্বতঃই দেখা যায় যে, সে বাড়ীতে এতগুলি চাকর ছিল এবং কালভার্ট এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না।

স্মরণ থাকিতে পারে যে বাদী ফিরিয়া আসিয়া নিজের পরিচয় দিলে মিঃ লিণ্ডসে কুমারের মৃত্যু সম্বন্ধে সমস্ত টেলিগ্রামগুলি চাহিয়া ২৭।১০।২১ (একজিবিট ৫৫) বড় রাণীকে এক পত্র দিয়াছিলেন, এবং বড়রাণী ৯।১১।২১ তারিখে সেগুলি মিঃ লিণ্ডসের নিকট পাঠাইয়া দেন। যে টেলিগ্রামগুলির কথা বলিয়াছি তাহা এখান হইতেই পাওয়া যায়। ইহাতে মৃত্যুর টেলিগ্রামটি ছিল না। একবার এ কথা বলবার জন্য ক্ষীণ চেষ্টা করা হইয়াছিল যে, বড়রাণী উহা দেন নাই। কিন্তু পরে সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হইয়াছে,—তাহা অর্ডার সীটে দেখা যায়—(অর্ডার নং ১০৭৯ তাঃ ৪-৭-৩৫) এইরূপ প্রস্তাব করা অসঙ্গত যে যদি একটী গোপন করার ইচ্ছাই থাকিত তাহা হইলে, সবগুলিই ত তাহাই করা যাইত। বিবাদী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে—বড়রাণী ১৯২৮ পর্য্যন্ত বাদীকে প্রতারকই বলিতেন; ১৯১৬ সালে তাঁহার স্বামীর ব্যক্তিগত কাগজপত্রগুলি চাহিয়া পাঠাইলে রায় সাহেব এগুলি তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। (একজিবিট ৩৭০, ৩৭২, ৫৬৫)। চিঠি পত্র দেখিয়া বোঝা যায়,—যাহা কিছু পাঠান হইয়াছিল তাহা তালিকাভুক্ত করিয়া পাঠান হইয়াছিল। তালিকার বাহিরে কিছুই পাঠান হয় নাই, কারণ ইহার সঙ্গে ম্যানেজারের একটি চিঠিও ছিল। এই টেলিগ্রামটি সেই তালিকায় থাকিতে পারেনা, না হইলে উহা দাখিল করা হইত—বিশেষ দরকারী টেলিগ্রামটি উহার মধ্যে না থাকিলে কালেক্টর সাহেব এতগুলি টেলিগ্রাম পাইয়াও সন্তুষ্ট হইতেন না, ঐ টেলিগ্রামটি পাইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। বিবাদীপক্ষের সাক্ষী রায় বাহাদুর এস্, পি, ঘোষ তাহার জবানবন্দিতে বলিয়াছেন ১৯১৩-২৫ সালে তিনি যখন ঢাকার ডিপুটি কালেক্টর হিসাবে বোর্ড অব ওয়াডসের ভার পাইয়াছিলেন,—তখন তিনি সাধু সম্পর্কে সকল গোপনায় কাগজ পত্র দেখিয়াছেন। উহাতে মৃত্যুর টেলিগ্রামটি তিনি দেখিয়াছেন। তাঁহাকে আর সাক্ষী দিতে ডাকা হয় নাই। তাহার জবানবন্দী বেশ পরিষ্কার—কেহই ইহার বিরুদ্ধতা করে নাই। কালেক্টর সাহেব বড়রাণীর প্রেরিত টেলিগ্রাম গুলি পাইয়া খুসি ছিলেন। মিঃ চৌধুরী টেলিগ্রামগুলি বিবাদীদের হাতে ছিল বলিয়া স্বীকার করেন না—বাদীকে যেমন দুইবার সাক্ষী দিতে দেওয়া হইয়াছিল তেমনি তাহাকেও দুইবার সাক্ষী দিতে দেওয়া হইয়াছিল। ব্যাপারটি পরিষ্কার না হওয়ায় ও সাক্ষীদের জবানবন্দিতে খোলাসা না হওয়ার জন্যে,—কাহার কাছে এই কাগজ পত্র গুলি ছিল জানার জন্য আমি দুই পক্ষের সাক্ষীরই পুনরায় বিশেষ জবানবন্দি লইয়াছি।

টেলিগ্রাম দেরীতে বিলি হইল কেন

যাহা আশা করা হইয়াছিল—তাহাই হইল। দুই পক্ষেই বলে যে মৃত্যুর টেলিগ্রামটি ৯ই তারিখ বেলা ৯টায় ছোট কুমারের কাছে বিলি হয়। তখন তিনি দার্জ্জিলিংএর গাড়ী ধরিবার জন্য ষ্টেশনে যাইতেছিলেন। যখন তিনি কয়েকজন লোক লইয়া ষ্টেশনের কাছে পৌছিয়াছিলেন তখন একজন পিয়ন তাহার হাতে টেলিগ্রামটি দিল। এই পর্য্যন্ত দুই পক্ষই এক মত। বিল্লু ও সাগরবাবু বলেন যে তাহারাও সেখানে ছিলেন। টেলিগ্রামটি খুলিয়া পড়া হইলে ছোটকুমার কাঁদিয়া উঠেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসেন। বিল্লু বলেন টেলিগ্রামে কি লেখা ছিল তাহা তাহার মনে নাই। জেরায় বলেন যে, ধারণা এই যে, সন্ধ্যার সময়ই মৃত্যু হইয়াছিল।

সাগর বাবুর টেলিগ্রামের ভাষা মনে আছে, তিনি বলেন তাহা মেজো (অথবা মেজোকুমার) অদ্য সন্ধ্যায় মারা গিয়াছেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল।

প্রঃ— আমি আপনাকে বল্‌ছি, টেলিগ্রামে নিশ্চয় এইরূপ লেখাছিল যে "দ্বিতীয় কুমার মধ্য রাত্রে মারা গিয়াছেন!"

উঃ— "লেখাছিল আজ সন্ধ্যায় মারা গিয়াছেন। আমি নিজের চোখে দেখিয়াছি" টেলিগ্রাম পাইবার সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে ঐ সময় ও দেখিয়াছেন।

প্রঃ— সময়টা অবশ্য বিবাদীগণের দেওয়া নয়।

ফণী বাড়ুয্যের সাক্ষ্যের কথা

বিবাদীরা আর একটী সাক্ষীর জনানবন্দি দিয়াছেন। ইহা ফণীবাবুকে দিয়া দেওয়ান হইয়াছে। ফণীবাবু সেখানে ছিলেন কিনা, সাগর তাহা কিছু বলে নাই, কিন্তু তাহাতেও কিছুই আসে যায় না। ফণীবাবু বলেন যে, তিনিও সেখানে ছিলেন এবং টেলিগ্রামটি দেখিয়াছিলেন। ইহা এইরূপ লিখা ছিল, "লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে মেজকুমার গত মধ্যরাত্রে মারা গিয়াছেন" তিনি বলেন এই গুলিই ঠিক কথা ছিল—কেবোল টেলিগ্রাম করিয়াছিল। চালাকী করিয়া এই মৃত লোকটিকেই প্রেরক ঠিক করা হইয়াছে—যদিও এ কিছুই এ লেখাপড়া জানেনা।

৮ই তারিখের ডাইরীতে, যে রাত্রে কুমার মারা যায়, সত্যবাবু সেখানে লিখিয়াছেন, "দার্জ্জিলিং এ ষ্টেপ, এসাইড কুমার মধ্য রাত্রে মারা যান— ৪ জন ডাক্তার দেখিতে ছিল—

১। তাহার পারিবারিক চিকিৎসক (আশু) ২। রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্র সেন, ৩। বি, বি, সরকার, ৪। লেঃ, কঃ, কালভার্ট। মৃত্যুর সময় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুর একমিনিট পূর্ব্বে তাঁহার শেষ কথা আমাকে বলিয়াছেন—'আশুকে বলুন শ্বাস্ ফেলিতে কষ্ট বোধ করিতেছি'। বিভার ফিট্ হইতেছিল, ডাক্তার একে একে চলিয়া গেল, কেবল নার্শ দুইজন রহিল। সরিফ খাঁ প্রায় পাগল হইয়া গেল। প্রায় ভোর তিনটায় বেহারীকে সেজোমামার কাছে পাঠাইলাম। উত্তর পাড়া ও জয়দেবপুর টেলিগ্রাম করিয়া দিলাম। শব শ্মশানে লইয়া যাওয়ার জন্য সেনিটোরিয়ামে লোক পাঠাইলাম।"

এ সমস্ত কথা ৮ই রাত্রের তবু ইনি টেলিগ্রাম করিয়া ও টেলিগ্রাম সম্বন্ধে জবানবন্দিতে কিছু বলেন নাই। ফণীবাবু পরের দিন টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল এবং এই অস্পষ্ট ধারণা সমর্থন করিবার জন্য তাঁহার স্বরচিত উক্তি "আগের দিনের মধ্য রাত্রে" লইয়া হাজির হইলেন।

কেন যে টেলিগ্রামটি পরদিন বিলি হইয়াছিল তাহা বেশ পরিষ্কার। নিরঞ্জন রায় (বাদীপক্ষের সাক্ষী ৯৮) এই সময় জয়দেব পুর ষ্টেশনের Signaller ছিলেন, তাহার ডিউটি সকাল ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত। ৮ই মে তারিখের ১১টা ৫৫ মিঃ ও ৩টা ১০মি—(১ এক্‌জিবিট্ ২২১ এবং ২২২) টেলিগ্রাম গুলি তাঁহার হাতেরই লেখা। তিনি বলেন, শেষের টেলিগ্রামে কুমারের রক্ত দাস্তের কথা দেখিয়া তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। রাত্রে কোন টেলিগ্রাম আসিয়াছিল কিনা তাহা তাঁহার ঠিক মনে নাই। তবে তাঁহার একথা বেশ মনে আছে যে সেদিন রাত্রি ৯টা কি ৯॥০টায় ষ্টেশনের কর্ম্মচারী দের মধ্যে কুমার মারা গিয়াছেন বলিয়া একটা গোলমাল হইয়াছিল। তখন তিনি ষ্টেশনে ছিলেন—তাহার বাসা ষ্টেশনের কাছে বলিয়া যখন তাঁহার কাজ না থাকিত সাধারণতঃ তখনও ষ্টেশনেই থাকিতেন।

এই সাক্ষী যাহা মনে করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া এবিষয়ে আর কোন কথা বলেন নাই—কিন্তু একথা বলেন যে—পরদিন সকাল ৮টার পূর্ব্বে দার্জ্জিলিংএর কোন গাড়ী না থাকায় টেলিগ্রাম রাত্রে আসিলেও রাজবাড়ীতে বিলি করিয়া সেখানে অশান্তি জন্মান অনুচিত। ঘটনা যাহা দাঁড়ায় তাহা এই যে, সেই রাত্রেই টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল—এই সাক্ষীর কথায় একথা না বলা গেলেও যে ইহা মধ্যরাত্রির পর পাঠান হয় নাই—ইহাতে যাহা লেখা ছিল যে কুমার সন্ধ্যাবেলাই মারা গিয়াছেন,—সাগরবাবুও এই কথাই বলিয়াছেন। যদি ইহার অন্যথা হইত তাহা হইলে মূল টেলিগ্রামটি—যাহা

বিবাদীগণের কাছে আছে—দাখিল করা হইত। যদি রাত্রেই টেলিগ্রামটি পাঠান হইয়া থাকে তাহা হইলে 'গত মধ্য রাত্রে কথাটি মিথ্যা প্রমাণ হয়। উত্তরপাড়ায় রাণীর আত্মীয়দের নিকট যে টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল তাহাও অবশ্য পাওয়া যায় নাই।

(ঙ) বিবাদীপক্ষের একজন সাক্ষী স্বীকার করে যে, সে-রাত্রে ষ্টেপ-এসাইডে কোন পাক সাক হয় নাই, যদিও কেহ—এমন কি সত্যবাবু ও মেজ-রাণী ভাবেন নাই যে কুমার মারা যাইবেন।

(চ) এই দিন সেনিটেরিয়ামে ছিলেন এমন তিন জন ভদ্রলোক এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি দিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে—

বিখ্যাত কয়েকজন বিশিষ্ট সাক্ষী

(১) মিঃ এস্, এন্, মৈত্র এম্ এ, বি, এ, (ক্যান্টার) এ, আর সি এস্ (লণ্ডন)। ইনি ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসের একজন লোক এবং একটি কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া অবসর লইয়াছেন—(বাদীর সাক্ষী ৫৭৪) (স্থরেন্ মৈত্র)

(২) প্রফেসার রাধাকুমুদ মুখার্জ্জি, বয়স ৫০ এম, এ, পি আর, এস্ পি এইচ ডি—লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত-ইতিহাসের অধ্যাপক ও ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের প্রধান কর্ত্তা। ইংলণ্ডে প্রকাশিত একখানি বইএর রচয়িতা ও বিদ্বান বলিয়া ইউরোপেও স্থনাম আছে। বাদীসাক্ষী (৮৪০)

(৩) ডাঃ হীরালাল রায় (৪৫) এ, বি, ডক্টর অব ইঞ্জিনিয়ারীং (বার্লিন)। মেম্বার অব ইন্‌ষ্টিটিউট অব কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ার্স লণ্ডন (বাদী সাক্ষী ৮৪১)

(৪) নগেন্দ্র রক্ষিত (৪৭) টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেডের ম্যানেজার—ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ডষ্টীল কোম্পানী লিমিটেডের ডিরেক্টার, বেঙ্গল ইনডাষ্টীয়াল এসোসিয়সনের ডিরেক্টার (বাদী সাক্ষী ১০২১)।

এই সকল বিশিষ্ট, শিক্ষিত ভদ্রলোকের জবানবন্দি এই যে, একদিন রাত্রে খাওয়ার পূর্ব্বে প্রায় সন্ধ্যা ৮টায় স্যানিটোরিয়ামের কমন রুমে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন—কে কে ছিলেন মনে নাই,—তবে প্রত্যেকেরই সেদিনের কথা এবং তাঁহারা যে প্রত্যহ খাওয়ার পূর্ব্বে কমন রুমে বসিতেন সে কথা মনে আছে। তাঁহাদের তারিখ অন্যকিছু মনে নাই, তবে সেদিনের কথা মনে আছে, যখন একটী ব্যাপার ঘটিল। যখন তাঁহারা অন্য সকলে এইভাবে বসিয়া ছিলেন তখন একটি লোক আসিয়া বলিল যে ভাওয়ালের কুমার এই মাত্র মারা গিয়াছেন—এবং শ্মশানে শব লইয়া যাওয়ার লোকের

জন্য অনুরোধ করে। প্রিন্সিপাল মৈত্রের এই অনুরোধের কথা স্পষ্ট মনে আছে। এই খবরের পর তাঁহাদের গল্প ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাঁহাদের স্মৃতিতে এটা বেশ দাগ কাটিয়া আছে। এই একবার ছাড়া প্রফেসার রাধাকুমুদ মুখার্জ্জী, প্রফেসার মৈত্র ও ডাঃ হীরালাল রায়ের সঙ্গে স্যানিটোরিয়ামে থাকেন নাই। তিনি বলেন এই সময় স্যানিটোরিয়ামে থাকিতে ঐ সন্ধ্যা ছাড়া ভাওয়ালের কুমারের আর কোনও খবর শুনি নাই। তখন আমরা কমন রুমে বসিয়াছিলাম। লোকটি কুমারের মৃত্যু সংবাদ দিয়া চলিয়া গেল।

প্রঃ—আপনাদিগকে মৃত্যু সংবাদ কেন দিয়াছিল?

উঃ—তাহারা মৃত দেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়ার জন্য লোক খুঁজিতেছিল।

আমার যতদূর মনে আছে, তাহাতে মনে হয় মাত্র একজন লোক ঐ সাহায্যের জন্য আসিয়াছিল। কিন্তু কতজন লোক আসিয়াছিল সে সম্বন্ধে আমার সঠিক মনে নাই। কিন্তু আমার ঠিক মনে আছে খবরটি আসিয়াছিল। আমাদের রাত্রে খাওয়ার ১ ঘণ্টার পূর্ব্বেই সে আসিয়াছিল। খাওয়ার ঘণ্টা ৮টা হইতে ৮॥টার মধ্যেই পড়িত—৮টার পূর্ব্বে নয়।

খাওয়ার পর আমি কখনও কমন রুমে আসিতাম না। কারণ শীতের জন্য আমি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতাম না। শ্মশান নীচে অনেক দূরে—এবং শরীর সুস্থ নয় বলিয়া আমি শ্মশানে যাই নাই।

সংবাদটীর স্থান কাল ও সময় সম্বন্ধে ডাঃ রায় বিশেষভাবে একমত। ইহা রাত্রের আহারের পূর্ব্বে যখন তাঁহারা কমনরুমে ছিলেন তখন। মিঃ রক্ষিতের এই খবরটি সম্বন্ধে ঠিক মনে আছে যে, যখন তাঁহারা খাওয়ার পূর্ব্বে কমনরুমে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন তখনই আসিয়াছিল।

দাহ করিবার তারিখ বলিতে পারেন না,—তাহারা খবরটির বর্ণনা ও দিতে পারেন না। কেহই কুমারকে চিনিতেন না,—বা কোন অনুসন্ধিৎসা ছিল না। ডাঃ রায় বলেন ব্যাপারটী তাহার মনে কোন দাগ রাখিয়া যায় নাই,—তবে এটা একটা দুঃসংবাদ। তাহাদের বেশ মনে আছে লোকটি আসিয়া খবরটি দিল এবং সাহায্য প্রার্থনা করিল। তখন তাঁহারা রাত্রে খাওয়ার পূর্ব্বে কমনরুমে ছিলেন—রাত্রের খাওয়া সাধারণতঃ ৮টার সময় হইত।

উল্লেখযোগ্য অভিমত

এতে তাহাদের কোন লাভ নাই। তাঁহারা কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। আমি ইহাদিগকে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক মনে করি,—এবিষয়ে এদের কোনও স্বার্থ নাই। তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাহাদের মনে ছিল না, এই

প্রমাণ করার জন্য তাঁহাদিগকে জেরা করা হইয়াছে,—এবং অভিমত এই যে এবিষয় তাঁহারা কাগজে পড়িয়াছেন। এবং ডাঃ রায় ও ডাঃ মুখার্জ্জী দুইজনই জবানবন্দি দেওয়ার পূর্ব্বে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। মিঃ চৌধুরী, ডাক্তার মুখার্জ্জীর নিকট হইতে বাহির করিয়াছেন যে, যখন তিনি কাগজ পড়িতেন তখন এ ঘটনার কথা মনে হইয়াছে এবং মিষ্টার চৌধুরী ডাক্তার মুখার্জ্জী হইতে বিবৃতি লইয়াছিলেন যে প্রিন্সিপাল মৈত্রের সাক্ষ্য তিনি পড়িয়াছিলেন এবং যত্নসহকারে তাঁহার এজাহারে তাঁহার পক্ষে আসিয়া এজাহার দেওয়ার হাঙ্গামার অসুবিধাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মিষ্টার চৌধুরী সাক্ষীদিগের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করিবার সময় আশুতোষ চৌধুরী কবে মারা গিয়াছিলেন এবং তজ্জাতীয় প্রশ্ন সাক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সাক্ষীগণ ঘটনার তারিখ ছাড়া আর বিশেষ কিছু বলিতে পারে নাই, সমস্ত ঘটনা নিখুঁতভাবে বলাও সম্ভবপর নহে। রাস্তায় কোন ঘটনা কাহারও চক্ষে পড়ে, তখনই সেই ঘটনা তাহার মনে উদয় হইবে এবং ঘটনাটি যে সময়ে ঘটিয়াছিল, সেই সময়ও মনে পড়িবে, যদিও ঠিক তারিখটী তাহার স্মরণ-পথে না আসে। উভয় পক্ষের শত শত সাক্ষী এজাহার দিয়াছে যে তাহারা বাদীকে সকাল বেলা, সন্ধ্যাবেলা, মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে দেখিয়াছে, কিন্তু কেহই তারিখের কথা বিশেষ বলিতে পারে নাই। ৮ই মে তারিখের পর শোকসভা এই সাধারণ ঘরে হইয়াছিল। ডাক্তার তাহার তারিখ বলিতে পারেন নাই। তিনি এই পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন যে এই শোকসভা সন্ধ্যার পূর্ব্বে হইয়াছিল এবং পরে বিবাদিনী কর্ত্তৃক শোকসভায় যে কাগজ পেশ করা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা তাহার সত্যতা নিরূপিত হইয়াছিল। ইহাও সকলের স্মরণ রাখা উচিত। পরে যে সত্য তাহার ডায়রীতে লিখিয়া রাখিয়াছিল যে, স্বাস্থ্যবাসে শবদহন করিবার জন্য লোকের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল।

আমি দেখিতে পাই যে এই সকল লোক ৮টার পূর্ব্বে স্বাস্থ্যবাসে একজন আগন্তুকের নিকট হইতে মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছিল। ইহা লইয়া বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে যে, সকলেরই ইহা কানে শোনা কথা। কেহ চক্ষে দেখে নাই। ইহা যেন মৃত্যুর বাণী!

যদি এই সকল ভদ্রলোক ৮টার পূর্ব্বে ঐ মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া থাকে তাহা হইলে কি কারণে এই সকল সাক্ষীদিগকে অবিশ্বাস করা হইয়াছিল, যাহারা শপথপূর্ব্বক বলিয়াছিল যে তাহারাও ঐ মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াছিল। (বাদীর নং ৮৩৮, ৯৪০, ৯৮০, ৮০৭, ৬৭২ এবং কালিদাস পাল), ইহাদের মধ্যে

মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এবং কালিদাস পালের সাক্ষ্য কমিশন দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল। কালিদাস পাল তখন একজন সেক্রেটারিয়েটের কেরাণী ছিলেন, পরে চিফ্ সেক্রেটারী অফিসে ইস্যু সেক্সনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে অবসর প্রাপ্ত হন। তিনি তাঁহার এজাহারে বলিয়াছেন ১৯০৯ সালের মে মাসে তিনি কাছারিবাটীতে ছিলেন, তখন কাছারিবাটীতে কেরাণীদিগের থাকিবার স্থান ছিল। লোকে যখন ঐ মৃত ব্যক্তিকে বহন করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণকে ডাকিতে আসিয়াছিল, তখন তিনি সান্ধ্যভোজে ব্যাপৃত ছিল। এ কথা তিনি ১৯২১ সালে লেথব্রিজ্ সাহেবের নিকট বিবৃতি করিয়াছিলেন। মধুসূদন চক্রবর্ত্তী ও সেক্রেটারিয়েটেরও একজন কেরাণী ছিলেন, পরে বিহার ও উড়িষ্যা সেক্রেটারিয়েটের বড় বাবু হিসাবে অবসর লইয়াছিলেন। তিনি বস্তিভিলাতে থাকিতেন এবং সেখানে উত্তরপাড়ার সত্য বাবুর গ্রামের অনুকূল চট্টোপাধ্যায় নামক আর একজন কর্ম্মচারী থাকিতেন। অনুকূলবাবু এজাহার দিয়াছেন যে অফিসের ছুটীর পর সূর্য্যনারায়ণ অনুকূলকে কুমারের শবদাহ ক্রিয়া সম্পাদন কবিবার জন্য ডাকিতে আসিয়াছিলেন এবং অনুকূলও তাঁহার সহিত শ্মশানে গমন কবিয়াছিলেন। সূর্য্য জানিত না কিংবা মৃত্যু সময়ে উপস্থিত ছিল না একথা তখন উঠে নাই। কিন্তু কতকগুলি কথা যাহা তাঁহাব বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই কিংবা তাঁহার উক্তি নহে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল এই দেখাইতে যে সে কতকগুলি অনৈক্য কথা কোথাও কোথাও বলিয়াছে। এবং কথা এই যে অনুকূল এক্ষণে মৃত, কাছারীবাটীতে বাস করিতেন এবং মধ্যরাত্রে মৃত্যুর পর ষ্টেপাসাইডে গিয়াছিলেন। ইহা সত্য বাবুর ডাইরী হইতে সপ্রমাণিত হইবে, সে বিষয়ে আমি পরে বলিব।

মৃত্যু সময় সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত

এক্ষণে আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, কুমার রাত্রি ৭টা ৮টার মধ্যে সম্ভবতঃ মারা গিয়াছেন। অসুখের অবস্থায়, ঠাণ্ডা এবং সঙ্কোচন ও রক্ত চলাচল করিবার জন্য শরীর মর্দ্দন, প্রভৃতি কার্য্য সমস্তই সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হইয়াছিল। প্রথম কুমারের ৪-৪৫ মিনিটের টেলিগ্রামের কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই। সন্ধ্যার সময় ডাক্তার বি, বি, সরকারের আগমন, সন্ধ্যার সময় বাটীর রন্ধনাদি স্থগিত, প্রতিবাদীগণ কর্ত্তৃক টেলিগ্রামের লিখিত বিবরণ সংগোপন, চারিজন ভদ্রলোকের কথা যে একজন সংবাদদাতা ৮টার পূর্ব্বে সৎকারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিল, ইহা ভিন্ন অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে।

রামসিং সুবা সত্য বলিয়াছিল, সে সন্ধ্যার সময় লিবং ঘোড়দৌড় হইতে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া তখন বলিল যে সে স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিয়াছিল, ঐ গৃহে গিয়াছিল এবং সম্মুখের ঘরে মৃত কুমারকে দেখিয়াছিল। তথায় ডাক্তার বি, বি সরকার বসিয়াছিলেন। ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে—যদি দ্বিতীয় রাণীর মুখ হইতে এই ঘটনা বাহির হইয়াছে, ইহা কিছু চতুরতার সহিত গঠিত হইয়াছে, যাহাতে ইহা কিয়ৎপরিমাণে আশু এবং বীরেন্দ্রের পূর্ব্ব সাক্ষ্যের সহিত মিল থাকে; এবং সর্ব্বপ্রকারে শোকপ্রকাশক পত্র, ঔষধ তালিকাগুলি, টেলিগ্রামগুলি এবং ডাক্তার ক্যালভার্টের মৃত্যুশপথবাণী। সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত ঘটনার কোন প্রমাণ নাই। ইহা একটী ঘটনা দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে, যাহা আমি অখণ্ডনীয় বলিয়া মনে করি, যে কুমার ৭টা এবং ৮টার মধ্যে সম্ভবতঃ মারা গিয়াছেন কতকগুলি প্রমাণ রাত্রি ৭টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ঘটনাবিহীন মৃত্যুসময় দ্বারা ইহা অবিশ্বাস্য এবং ইহার ভিতরের প্রমাণ দ্বারা বিশ্বাস করা যায় না।

আশুর আরও কথা

আশু ডাক্তার এই সময়ে একটী ইনজেক্‌সন্ দিয়াছিল, সে বলিতে পারে না যে কি ইনজেক্‌সন্ দিয়াছিল, কারণ সে ভালরূপ বলিতে পারেন না যে, যন্ত্রণা থাকিবার পর, হিমাঙ্গের সময় পুনরায় মর্‌ফিয়া ইনজেক্‌সন্ দিয়াছিল কিনা, মানহানি মোকদ্দমায় তাহার বিবৃতিতে ইন্‌জেকসন্ কথার আদৌ উল্লেখ নাই। শ্রীপুর মোকদ্দমায় ইন্‌জেক্‌সন্ রাত্রি ৯টা কিংবা ১০টার সময় হইয়াছিল বলিয়াছিল, '(এক্সিকিট্ ৩৯৪ (১৩)। রাণী বলিয়াছিলেন, ৪টা হইতে ৬টার মধ্যে একটী ইন্‌জেকসন্ হইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ আর একটী ইন্‌জেকসনের কথা তাঁহার মনে ছিল না।

ডাক্তারগণ তখন কোথায় ছিলেন?

বলা হইয়াছে, সত্যবাবু ডাক্তার নিবারণ বাবুকে বৈঠকখানায় রাখিয়াছিলেন, কর্ণেল ক্যাল্‌ভার্ট খাইবার জন্য প্রস্থান করিলে, তিনি তথায় আহার করিলেন। নীচে বৈঠকখানা ছিল, কিন্তু এই পঞ্চম ঘর, রাণীর ঘরের পার্শ্বে, ডাক্তারদের বসিবার ঘর করা হইয়াছিল এই উদ্দেশে যাহাতে রামসিং সুভা, যে মৃতদেহকে সেখানে দেখিয়াছিল, সে বিবরণগুলি অবিশ্বাস করা যাইতে পারে। এই ঘরের বর্ণনা করিতে গিয়া আশু,বীরেন্দ্র এবং বিপিন এত জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন যে বীরেন ৭ই এবং ৮ই রাণীর শয়নকক্ষে নিদ্রা গিয়াছিল বলিয়া শেষ বক্তব্য

করিল, যেহেতু কুমার পীড়িত ছিল এবং ৮ই তারিখে কুমার পীড়িত হইবার পূর্ব্বে বসিবার ঘর কেরাণীদের শয়নঘর করা হইয়াছিল। সত্যবাবু বসিবার ঘর সম্বন্ধে ভুলে সত্য বলিয়াছেন, যখন তিনি বলেন যে, সূর্য্যবাবু আসিলে তিনি এসং ডাক্তার বি, বি সরকার নীচেব ঘরের পাশ দিয়া উপরে আসিয়াছিলেন, যখন নীচের ঘরে অপর দুই ডাক্তার অপেক্ষা করিতেছিলেন, এই ভুলটী তিনি সংশোধন করিয়াছিলেন, কিন্তু জগৎমোহিনী এই বসিবার ঘরের কথা উল্লেখ করে নাই। অধিকন্তু তিনি বলিলেন যে, ডাক্তার নিবারণবাবু রাত্রে এক দাগ ঔষধ খাওয়াইবার জন্য উপরে গিয়াছিলেন। আমি সাক্ষীর একটী কথাও বিশ্বাস করি না। ডাক্তার ক্যালভার্ট একজন আই, এম্ এস্, রাত্র দুটা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত ভোজনের অল্প সময় ছাড়া এই ঘরে অপেক্ষা করিতেছিলেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না। এবং এই মোকদ্দমা গঠিত হইবার কিছুকাল অগ্রে জগৎমোহিনীর সাক্ষ্য ইহার অসত্যতা প্রকাশ করিয়াছে।

তিনি বরং সন্ধ্যা হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার একটী একটী সুন্দর বিবৃতি দিয়াছিলেন। তিনি ঔষধ গুঁড়া করিতেছিলেন, তিনি এবং আব একটী মণ্ডলী ধাত্রী তথায় ছিলেন, এবং ডাক্তাব ক্যালভার্ট চলিয়া গেলেন। ঘর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ছিল, তিনি তাঁহাকে বেদানার রস দিয়াছিলেন। হঠাৎ কুমারের অবস্থা খারাপ হইল এবং রাণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ডাক্তাব ক্যালভার্টকে তৎক্ষণাৎ ডাকা হইল। তিনি আসিয়া রাত্রি ১০টা কিম্বা ১১ টাব সময় কিছু লিখিয়া দিলেন (সন্ধ্যার পর কোন ঔষধ লিপি ছিল না)। কিন্তু ঔষধ আসিবার পূর্ব্বে গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হইল, এবং তিনি মারা গেলেন। তিনি ডাক্তাব বি. বি, সরকারের কথা উল্লেখ করেন নাই। এবং প্রভাত হওয়া পযান্ত রাণী মৃতদেহকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিলেন তাবৎ জগৎমোহিনী নিজে রাণীকে জড়াইয়াছিলেন। সত্যবাবুর ভাই শ্যামাপদ রাত্রি ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে দেখিতে আসেন, রাত্রে কিছু খারাপ ঘটিবে বলা হইল না, রাত্রি ৩টার সময় আবার আসিয়া ধাত্রীদিগকে ঘরে কিম্বা উপরে কোন স্থানে দেখিতে পান নাই। সে সব বিবরণ বাদ দিয়া রাণীর মূর্চ্ছা হইতেছিল এই কথা বলা হইতেছিল। যদিও তিনি ইহা অস্বীকার করিলেন, যেহেতু রাণী স্ত্রীলোক ব্যতীত কাহারও সমক্ষে বাহির হন না। বিপিন এবং তাহার ছোট বীরেন্দ্র পূর্ব্বে শ্রীপুর মামলায় বলিয়াছিল এবং এখনও স্বীকার করে যে খানসামা বিপিন এবং তাহার ছোট ভাই সেখানে উপস্থিত ছিল। যদিও ৭ই এবং ৮ই মে তারিখে তিনি নিজে অনুপস্থিত ছিলেন।

বিভাবতী ছিলেন কোথায় ?

তিনি বলেন রাণী কুমারের শয়ন ঘরে রাত্রে ৯টার সময় আসিয়াছিলেন এবং যদিও তিনি এক্ষণে ইহা অস্বীকার করেন। আমি বিশ্বাস করি যখন ডাক্তার বি, বি, সরকার আসিয়াছিলেন তখন তিনি ঘরে ছিলেন না। রামসিং সুভা বলে তাঁহাকে তৃতীয় ঘরে দেখিয়াছে। রামসিংএর কথা সত্য ঘটনার দ্বারা সমর্থিত হয়, কেবল তাহার বিশ্বাসযোগ্যতার দ্বারা নহে, অধিকন্তু সত্য ঘটনার দ্বারা ইহা সমর্থিত হয়। আমার মনে আছে, যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা বলে যে দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহারা বলেন, এবং এমনকি রাণী কুমারকে খুব ভাল দেখিতে পান নাই এজন্য কাঁদিতেন।

বাদীর সাক্ষীগণের কথা মত ৯টার সময় দেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, এবং বীরেন্দ্রের আগেকার বিবৃতি "৯টার পর রাণী সেই ঘরে ছিলেন, তাহার আগে পাশের ঘরে ছিলেন"। এক্ষণে তিনি ইহা অস্বীকার করেন, কিন্তু আশু ডাক্তার এখনও ইহা স্বীকার করে, যাহা তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন "যে মৃত্যু সময়ে কতকগুলি পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের লোক তথায় উপস্থিত ছিল। এবং ইহারা বাহিরের লোক। যদি এই সমস্ত লোক তথায় থাকে রাণী সেখানে থাকিতে পারেন না। এটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মৃত্যু সময়ে কয়েকজন লোক ছিল কিন্তু বাহিরের একজন লোককেও ডাকা হয় নাই। এবং বিবাদীর বর্ত্তমান এজাহারে, ডাক্তার এবং ধাত্রীগণ ব্যতীত, অপর কেহই উপস্থিত ছিলেন না।

যদি প্রকৃতপক্ষে কুমারের মৃত্যু রাত্রি ৭টা এবং ৮টার মধ্যে হইয়া থাকিত, তবে ইহা প্রায় ধারণাতীত যে তাহাকে রাত্রে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয় নাই। এমনকি মধ্য রাত্রে মৃত্যু হইলে সকালে সৎকার হওয়াটা কিছু অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, কিন্তু উত্তরে বলা হইয়াছে, যে দার্জ্জিলিংয়ের মত যায়গায় মধ্য রাত্রে লোক ডেকে পাওয়া যায় নাই। বাসিমড়া করিবার বিরুদ্ধে হিন্দুদিগের একটা সংস্কার আছে। এবং চৌধুরী মহাশয় সাধারণ লোকের বিষয়েই একথা বলিয়াছেন। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কিংবা দেশবন্ধু সি, আর, দাসের ন্যায় ব্যক্তিগণকে তৎক্ষণাৎ দাহ করা হয় নাই, পরন্তু প্রকাশ্যভাবে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ব্যতিক্রমগুলি অধুনাতন এবং সাধারণ লোকের কথা স্বতন্ত্র। আমার সামনে এরূপ আলোচনা হয় নাই যে, যদি মৃত্যু সন্ধ্যার সময় হইয়া থাকে, তবে দেহটি সমস্ত রাত্রি বাটীতে রাখা হইয়াছিল। রাত্রি ৭টা এবং ৮টার মধ্যে লোকেরা দেহ

বহনার্থ লোকের জন্য ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করিতেছিল। অতএব রাত্রি প্রায় ৯টার সময় শ্মশানে দেহ লইয়া যাইবার প্রমাণ অগ্রাহ্য হইবার কোন কারণ দেখি না।

মৃতদেহ কখনই দাহ করা হয় নাই

মৃত দেহটি কখনই দাহ্ করা হয় নাই। তদন্তের এই অংশ সম্পর্কিত সাক্ষ্যের প্রকৃত পরীক্ষা মৃত্যুর সময়েই হয়। কিন্তু সাক্ষীদের মধ্যে যাহারা ঐ সৎকার-রাত্রে শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিল কিংবা শব লইয়া যাইত দেখিয়াছিল। এ বিষয় একজন এখানে নিজের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন এবং অপরেও তাঁহার মত একজনের উপর নির্ভর করিতে পারেন।

শ্মশানযাত্রী, দেওয়ান পদ্মিনীবাবুর সাক্ষ্য

বাবু পদ্মিনী মোহন নিয়োগী, ৫৫ বৎসব বয়স, (গৌরীপুব ময়মনসিংহ) ষ্টেটের ম্যানেজার, ২০ বৎসর অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের একজন সভ্য, ১৯০৯ সালে বিখ্যাত দৈনিক ইংরেজি বেঙ্গলী কাগজের সব এডিটর, স্বাস্থ্য-বাসে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বলেন, আমি লুই জুবিলি স্বাস্থ্য-বাসে দিলাম। একদিন সন্ধ্যার সময় একটী লোক আসিয়া আমাকে বলে যে, ভাওয়ালের কুমারের মৃত্যু হইয়াছে সে সৎকারের জন্য লোক চায়।' ষ্টেপএসাইডে যে ৭ কিংবা ৮ জন গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে আমি ও একজন। কুমাব সেই বাটীতে ছিলেন বলিয়া আমাদের সেখানে যাইতে বলিল। ৭ কিংবা ৮জন লোক যাহাবা আমার সহিত গিয়াছিল আমি তাহাদের মুখ চিনি। আমি তাহাদিগকে দার্জ্জিলিংএ চিনিয়াছি। ষ্টেপএসাইড্ যাইতে আমাদের প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় লাগিল, আমি নীচে খাটিয়ায় আচ্ছাদিত মৃত দেহ দেখিলাম। ঘরে কি বাহিরে দেখিয়াছি তাহা আমার স্মরণ নাই। পৌছিয়াই কাগ্ঝোরাতে মৃত দেহ লইয়া যাওয়া হইল। তৎপরে শব লইয়া বাহির হইবার পর আবহাওয়া খারাপ দেখিয়া আমাদের মধ্যে যাহারা স্বাস্থ্য-বাসে থাকিতাম তাহারাই ফিরিয়া আসিলাম। সাক্ষী ষ্টেপাসাইডের কোন লোককে জানেন না, কেবল বলেন যে স্বাস্থ্য-বাসে ফিরিয়া আসিতে ১৫ কিংবা ২০ মিনিট কিংবা অর্দ্ধঘণ্টা, ৯-৩০ কিংবা রাত্রি ১০টা হইয়াছিল এবং একটু পরেই বৃষ্টি আসিল। ৭-৬-২১ তারিখে আর, সি, দত্ত মহাশয়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, লিণ্ডসে সাহেবের তদন্তের সময় এই সাক্ষীর এই এজাহার লিখিয়াছিলেন। তিনি মানহানির মোকদ্দমায় এজাহার দেন।

আমি তাঁহার বিবরণে দরকারী বিষয়ে কোন তফাৎ দেখিনা। তাঁহার আচরণে তিনি সত্যবাদী ইহাই আমার ধারণা হইয়াছিল। তিনি স্বীকার করেন যে বাদীর স্বার্থযুক্ত কতিপয় লোক তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, এবং যাহা বলিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেম, এবং এই সময় আর, সি, দত্ত মহাশয় তাঁহার জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া ছিলেন কিন্তু পূর্ব্বে কি পরে তাঁহার স্মরণ নাই। অন্য সাক্ষীরা যাহার রাত্রে মৃতদেহর শোভা যাত্রার যোগদান করিয়াছিলেন এবং শ্মশানে গিয়াছিলেন।

শ্মশানবন্ধু বিশিষ্ট সাক্ষীগণ

বাদীর সাক্ষী ৯৪১ কিরণ মুস্তেফি, দার্জ্জিলিংএর অধিবাসী, ৬০ বৎসব বয়স টি ষ্টেটের অবসরপ্রাপ্ত ম্যানেজার, ১৯০৯ সালে ব্লুমফিল্ড টি ষ্টেটের অবসর প্রাপ্ত ম্যানেজাররূপে তাঁহার বাসস্থানে বাস করিতেন। বাদীর সাক্ষী ৯৪৪ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ৫৮ বৎসর বয়স, পেন্‌সনভোগী, দার্জ্জিংলিংএ ডেপুটী কমিসনারের কার্য্যালয়ে ১৮৯৯—১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত ছিলেন এবং ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত কয়সিংএর ম্যাজিষ্ট্রেটের তখনকার কেরাণী ছিলেন। বাদীর সাক্ষী ৯৪৭ যতীন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৫০ বৎসর বয়স, দার্জ্জিলিংএ তাঁহার ভগ্নীপতী রাজকুমার কুমারির বাটীতে দুই ভাই বসন্ত এবং অন্য আর একজন ১৯০৪ সাল হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন।

বাদীর সাক্ষী ৯৮৬ মন্মথনাথ চৌধুরী, মোটর সারভিস্ দার্জ্জিলিংএ বাস।

বাদীর সাক্ষী, ৯৬৮ চন্দ্রসিং. ডেপুটী কমিশনার কার্য্যালয়ে রেকর্ড কিপার, ১৯০৩—১৯২১ সাল পর্য্যন্ত কলিম্পং খাসমহলে ছিলেন এবং খাসমহলের খাজনার কার্য্যের জন্য দার্জ্জিলিংএ আসিয়াছিলেন। ১৯০৬—১৯১৮ সাল অবধি দার্জ্জিলিং পোষ্ট অফিসে কেরাণী ছিলেন। সকলেই বলেন সন্ধ্যার পরে মৃত্যু হওয়ার কথা শুনিয়াছিলেন, মৃতদেহ লইয়া ষ্টেপসাইড হইতে ২৫ জন লোকসহ রাত্রি প্রায় ৯॥ টায় সময় শ্মশানে পৌছিয়াছিলেন; মন্মথ এবং কিরণ চৌরাস্তায় যোগদান করিয়া ছিলেন। শোভাযাত্রা প্রায় ৯টার সময় বাহির হয়। কিরণ, মন্মথ শ্মশানে মৃতদেহটী রাখিয়া চলিয়া আসেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। তাহারা আশ্রয়ের জন্য স্থানে স্থানে চলিয়া যায়। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসেন এবং চিতা সাজাইবার স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া দেখেন খাটেতে দেহটী নাই। লণ্ঠন লইয়া চারিদিক খোঁজা হইল, কিন্তু দেহ দেখিতে পাইলেন না, তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন।

কমার্সিয়াল রো রাস্তা দিয়া শোক যাত্রা হইয়াছিল—সকল সাক্ষীরা স্বীকার করে।

এই বিবরণ একটী গল্পের মত লাগে। সন্ধ্যার সময় মৃত্যু এবং সেই রাত্রেই শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়, ইহা পদ্মিনীবাবুর এজাহারের সহিত মিল আছে। ইহা ব্যতীত শোভাযাত্রা যাইতে অনেক লোক দেখিয়াছে তাহার প্রমাণ আছে। সন্ধ্যার একটু পরেই এক দোকানদারের দোকান হইতে শবদাহের দ্রব্যাদি খরিদ করা হইয়াছিল। আর একটী দোকানদারের লোকেরা বলিয়াছে সেখান হইতে দাহ করিবার কাঠ ক্রয় করা হইয়াছিল। সুশীলাসুন্দরী (বাদীর সাক্ষী ১০১৬)। তাহার এক ভাইয়ের বসন্ত কুমারকে সৎকার করিতে সেই রাত্রে গিয়াছিলেন। সুশীলাবালা বলেন যে, তাহার ভাইয়েরা ভিজিয়া ঘরে আসে। একজন সাক্ষী বাবু জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দার্জ্জিলিংএ একজিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার কার্য্যালয়ের প্রধান কেরাণী। অনুকূল চট্টোপাধ্যায়কে ভিজিতে দেখেন। আর একজন খাঁসাহেব নাসিরুদ্দিন আহম্মদ, ৭০ বৎসর বয়স, এই শোভাযাত্রা যাইতে দেখিয়াছিলেন। যদি মৃত্যু না হইয়া থাকে, তাহাদের বিশ্বাস করা যায় না এবং আমি তাহাদের অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দখি না। টাউন এণ্ড বাটীর মালিক গিরিশ ঘোষ মহাশয় তাঁহার পুত্র ফণীন্দ্রকে বাটীতে রাত্র ১১টা কিংবা ১২টার সময় ফিরিয়া আসিয়া বলিতে শুনেন যে একটী আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছে, কুমারের দেহ খুজিয়া পাওয়া যায় নাই। এই ফণীর জবানবন্দী ১৯২১ সালে লইবার প্রয়াস হইয়য়াছিল (একজিবিট ৪ ৩১) ২৬ জন লোককে দেখা গিয়াছিল, তন্মধ্যে সঞ্জীব লাহিড়ী, অনুকূল চট্টোপাধ্যায় এবং ফকির রায়।

বিবাদদীরা বলেন, অনুকূল চট্টোপাধ্যায় সকালে শোভাযাত্রায় গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাক্ষী ফকির রায় বলেন যে, তিনি রাত্রে কোন শোভাযাত্রা দেখেন নাই, বা যোগদান করেন নাই, কেবলমাত্র সকালে শোভাযাত্রা যাইতে দেখিয়াছি ইহাতে তিনি যোগদান দেন নাই। ইহার আগে বা পরে অনুকূল চাট্টাপাধ্যায় তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বরাত্রে তিনি কুমারকে দাহ করিতে গিয়াছিলেন।

পূর্ব্বরাত্রে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত কালবৈশাখীর মত ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল।

প্র—অনুকুলের সহিত আপনাদের কথোপকথন কখন হয় ?

উ—সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে।

প্র—সে কি বলিয়াছিল, সে কখন শ্মশান হইতে ফিরিয়াছিল ?

উ—তাহা আমার স্মরণ নাই।

প্র—সে কি বলিয়াছিল ? যে সে শ্মশানে গিয়াছিল ?

উ—হাঁ।

প্র—সে কি বলিয়াছিল, কখন, এবং কোথা হইতে ?

উ—ষ্টেপএসাইড হইতে। রাত্রি কয়টার সময় বলিয়াছিলেন তাহা আমার মনে নাই।

প্র—তিনি কি বলিয়াছিলেন কখন তিনি ষ্টেপএসাইডে গিয়াছিলেন ?

উ—রাত্রিতে।

প্র—আপনি কি অনুমান করিয়া বলিতে পারেন তখন রাত্রি কয়টা হইবে ?

উ—আমি আন্দাজ করব না, সে আন্দাজ করবে।

প্র—অনুকূলবাবুর নিকট হইতে কি শুনিয়াছিলেন ?

উ—সম্ভবতঃ রাত্রি দশটা কিংবা বারটা।

শোভাযাত্রার কথা কাহারও নাম মনে নাই।

প্র—তিনি কি বলিয়াছিলেন যে তিনি শব সৎকার করিয়াছিলেন ?

উ—তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি সৎকার করিতে গিয়াছিলেন, দেহ সৎকার করিয়াছিলেন কিনা তাহা বলেন নাই।

প্র—ঝড়বৃষ্টির জন্য দেহটি ফেলিয়া আসিয়াছিলেন একথা কি তিনি বলিয়াছিলেন ?

উ—না।

প্র—তিনি কি বলিয়াছিলেন যে তিনি সৎকার করিতে পারেন নাই ?

উ—না।

প্র—শব লইয়া কখন রওনা হইয়াছিলেন ?

উ—তিনি কখন মৃতদেহ লইয়া রওনা হইয়াছিলেন, তাহা আমার মনে নাই।

প্র—আপনি জেরার সময় কাল বৈশাখীর (ঝড়বৃষ্টির) উল্লেখ করিয়াছিলেন। উহা কখন আরম্ভ হয় ?

উ—মার্চ্চমাসের শেষভাগ হইতে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত।

প্র—যখন ইহা আরম্ভ হয়, তখন কি ইহা দার্জ্জিলিংয়ের সর্ব্বত্র আরম্ভ হয় ?

উ—হাঁ।

প্র—তিনি কাল বৈশাখের ঝড়বৃষ্টির সময় মারা গিয়াছিলেন। আপনি

বলিয়াছেন যে পূর্ব্ব রাত্রিতে সন্ধ্যা হইতে রাত নয়টা পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু আপনার কি এতদিন পরে মনে আছে যে শোভাযাত্রা বাহির হইবার আগেই রাত্রে প্রকৃতপক্ষে বৃষ্টি হইয়াছিল?

উ—আমার কিছুই মনে নাই।

প্র—আপনি কি বলিয়াছিলেন যে কালবৈশাখীর সময় বলিয়া পূর্ব্বরাত্রে বৃষ্টি এবং ঝড় হইয়াছিল?

উ—হাঁ।

পুনরায় জবানবন্দী গ্রহণ করা অসম্ভব। ইহা একজন কমিশনারের সামনে করা হইয়াছিল। সাক্ষী যে বৃষ্টি এবং ঝড় দেখিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিতে বলা হইতেছিল। অতীত সময়ের কোন এক বিশেষ দিনে বৃষ্টি হইয়াছিল কি না তাহা বিশেষ কোন ঘটনার সহিত জড়িত না থাকিলে উহা কেহ স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে না। এই সাক্ষীর বৃষ্টির কথা মনে আছে, কারণ উহা এক কথোপকথনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। কথোপকথনের যাথার্থ্য যাহাই হউক না কেন, প্রতিবাদীপক্ষ নিজেই আলোচ্য বিষয়ের খুটিনাটী ব্যাপারগুলি বাহির করিয়া কথোপকথনের সত্যতা স্থির করিতে সাহায্য করিয়াছেন। এবং আলোচ্য বিষয়টি কিয়ৎপরিমাণে চিত্তাকর্ষক ছিল এবং প্রতিবাদীপক্ষ বলেন যে তাহার উহা মনে আছে, নতুবা তাহারা তাহার জবানবন্দী করিতেন না।

শ্মশানে আশ্রয় স্থান

পূর্ব্বরাত্রির বৃষ্টির সহিত অন্যান্য ঘটনা একত্র করিয়া ভাবিলে বাদীপক্ষের মামলা সত্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু রাত্রির শোভাযাত্রা এবং পরবর্ত্তী ঘটনাগুলিকে মিথ্যা প্রমাণিত করিবার জন্য যে তিনটি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে সেগুলির একটু বিশদভাবে বিবেচনা করা দরকার। সন্ধ্যার পর মৃত্যুর দৃঢ় ভিত্তির উপর ইহা নির্ভর করিতেছে। কিন্তু তথাপি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। প্রথমতঃ সেদিন কোন বৃষ্টি বা ঝড় হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ শ্মশানে কোন চালা ছিল না। তৃতীয়তঃ নিকটে এমন কোন চালা বা কুড়েঘর ছিল যেখানে লোকেরা আশ্রয় লইতে পারিত। আমি প্রথমেই শ্মশানের চালার কথাটাই আলোচনা করিব।

আলোচ্য দিনে নূতন শ্মশানে একটি চালা ছিল ইহা স্বীকার করা হইয়াছে এবং চালাটী আরও নীচে ছিল। বাদীর বিবরণ এই যে দেহটী পুরাতন

শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, যেখানে কোন চালা ছিল না। এই বিষয়টী বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত নক্সাটী কাজের হইবে।

রাস্তার বিবরণ

পূর্ব্বদর্শিত সুধীরকুমারী রোড দিয়া নূতন কিংবা পুরাতন শ্মশানে যাইবার রাস্তা ছিল।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ষ্টেপ-এসাইড হইতে আসিতে হইলে কামসিয়াল রোডে পড়িয়া কার্ট রোডে নামিয়া, ফার্ণডেল রোড ধরিয়া এবং সেখান হইাত কনসারভেন্সি রাস্তা বরাবর এবং সেখান হইতে ভিক্টোরিয়া রোডে পড়িয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে সুধীরকুমারী রোডে পড়িতে হয়, সেখান হইতে ডানদিকে ফিরিলেই পুরাতন শ্মশান। ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত এই পুরাতন শ্মশানই দার্জ্জিলিংয়ের একমাত্র শ্মশান ছিল।

১৯০৭ সালে নূতন পুরাতন শ্মশানের দক্ষিণে ঝোরার অপর পারে নক্সায় চিহ্নিত স্থানে এক নূতন গৃহতল নির্ম্মিত হইয়াছে। রাস্তাটী ততদূর পর্য্যন্ত যায় নাই, কিন্তু কিছু আগেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। "৬"র নিকট হইতে মিঃ মর্ম্মিষ্টেনের সব্জীবাগানের পশ্চিমদিকে একটু বাঁকিয়া গিয়াছিল।

বিবাদীরা অনেকদিন পর্য্যন্ত নূতন শ্মশানটিই একমাত্র শ্মশান এবং ১৯০৬ সালে ওখানে যে চালা ছিল সেটী বরাবরই ছিল এবং যদিও উহার পুনর্নির্ম্মাণ হইয়াছিল এবং কুমারের দেহ এইস্থান ভিন্ন অন্য কোথাও লইয়া যাওয়া সম্ভব নয় বলিয়াছে। এখন ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে প্রকৃতপক্ষে পুরাতন শ্মশানটীই পূর্ব্বের শ্মশান ছিল কিন্তু নূতন শ্মশানটী ১৯০৭ সালে নির্ম্মিত হইবার পর পুরাতনটীর আর ব্যবহার করা হয় নাই। দার্জ্জিলিংয়ের হিন্দু-সৎকার এবং সমাধি সমিতির সেক্রেটারী মিঃ মণিমোহন সেনকে জেরা করিয়া এই স্বীকারোক্তি পাওয়া গিয়াছে যে দার্জ্জিলিংয়ে একটী পুরাতন শ্মশান ছিল। আর এন ব্যানার্জ্জির কমিশনে জবানবন্দী গ্রহণের সময় প্রতিবাদীরা এই সভার এবং উহার কার্য্যাবলী সংক্রান্ত নানা প্রকার কাগজপত্র দাখিল করিয়াছেন এবং তাহার নিকট হইতে এই সাক্ষ্য আদায় করিয়াছিলেন যে, যে শ্মশানকে তাহারা নূতন শ্মশান বলিয়া ধরিতেছেন সেটি আদৌ নূতন ছিলনা। কিন্তু বরাবরই সেটি চালাসমেত সেখানেই ছিল। এবং এই যুক্তি সমর্থন করিবর জন্যে তিনি মিসেস পিলের সমাধির বিষয় উল্লেখ করেন। প্রতিবাদীরা মিঃ মণিমোহনের নক্সার সহিত কমিটির কার্য্যক্রটির বিবরণ দাখিল করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া এই ঘটনাগুলি জানিতে পারা যায় :—

নূতন শ্মশান এবং পুরাতন শ্মশানের অবস্থিতির যায়গা হিন্দু সম্প্রদায়ের দাহ এবং সমাধিভূমির এলাকার মধ্যে ছিল। এই সমিতি উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার বিষয়ে বিবেচনা করিতে ছিলেন।

বর্ত্তমানের চালাঘরটি ভগ্নাবস্থায় থাকাতে উহা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

২৩।২।০৭—শবদাহভূমি উন্নতিকল্পে সাধারণের সভা আহ্বান ৫।৫।০৭—মিঃ মণিমোহনকে সহকারী সম্পাদক রূপে নির্ব্বাচিত করা হয়। তাহাকে একটি শ্মশানের নক্সা এবং চলা এবং শ্মশানের আনুমানিক ব্যয়ের তালিকা করিতে বলা হয়।

৮।৫।০৫—সমিতি পুরাতন চালার জিনিসপত্র লইয়া নূতন চালা নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করেন।

২১।৫।০৭—মণিমোহন বাবুর নক্সা অনুমোদিত হয় এ-বই এখন কোর্টে উপস্থত করা হইয়াছে। উহা প্রদর্শিত বস্তুর মধ্যে, ইহার নম্বর ২০২। ইহাতে বর্ত্তমান ও পুরাতন শ্মশান এবং পরিকল্পিত চালার নির্দ্দেশিত হইতেছে। ৬।৬।০৭—মিউনিসিপ্যালিটি নক্সার অনুমোদন করেন।

শ্মশানে আশ্রয় স্থল

২৫।৬ হইতে ১১।৭।০৭—নূতন যায়গার উপর নূতন চালা নির্ম্মাণ আরম্ভ।

১৩।২।০৮—মণিমোহনবাবুকে সমিতির পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দেওয়া হয় এবং সমিতি, নূতন চালাটি নির্ম্মিত হইয়াছে এবং পার্শ্ববর্ত্তী যায়গা পরিষ্কার করা হইয়াছে বলিয়া লিপিবদ্ধ করেন।" প্রদর্শিত বস্তু (১২৮ (৪))।

যদি নক্সা না দেখিয়া কেবলমাত্র কার্য্যবিবরণীর আলোচনা করা যায়, তবে ইহাই মনে হইবে যে একই শ্মশানের উন্নতিবিধান এবং একই চালার পুনর্গঠন হইতেছিল মাত্র। উভয়েরই অবস্থিতির যায়গা অন্যত্র ছিল এবং নক্সা দেখিবার পর সভার কার্য্যবিবরণী হইতে ইহার সন্ধান-সূত্র পাওয়া যায়।

কার্য্যবিবরণীর আরও আলোচনা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৯০৯ সালের মে মাসের পূর্ব্বে শ্মশানভূমিতে একটি চালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৯০৭ সালের নক্সাতে নূতন শ্মশানে যাইবার সব্জীবাগানের মোড় হইতে সুধীরকুমারী রোডের প্রান্তভাগের রাস্তাটি তখনও শেষ হয় নাই। ইহা বিন্দু বসাইয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে, এবং মণিমোহনকে যখন জেরা করা হয় তখন তিনি বলেন যে, উহা সম্পূর্ণ হয় নাই।

২৫।৬।০৯ তারিখে নূতন শ্মশানের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, যেখানে সুধীরকুমারী রোড শেষ হইয়াছে ঐ স্থানটি ভাল ভাবে তৈয়ার করা হয় নাই

এবং এই বিষয়টি ৮।১২।০৮ তারিখে প্রকাশ্য সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছিল। মিউনিসিপ্যালিটির নীলবর্ণের মানচিত্রগুলিতে পরে নূতন পরিবর্ত্তন করায় ঐগুলি ভ্রান্তিপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

মিঃ আর এন ব্যানার্জ্জি এবং সাক্ষী ফকির রায় যাহাদিগকে কমিশনে জবানবন্দী করা হইয়াছে তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ইহাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে নূতন শ্মশানটি ১৯০৯ সালের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং ইহাও সত্য যে পুরাতন শ্মশানের আর ব্যবহার করা হইত না এবং কেহ সেখানে মৃতদেহ লইয়া যাইত না।

শ্মশান-স্থান বিষয়ে আলোচনা

প্রতিবাদীরা অবসরপ্রাপ্ত মিউনিসিপ্যালিটির কনজারভেন্সি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে মিঃ লিফট্সকে ডাকিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে তিনি পুরাতন ও নূতন শ্মশান দুইটিকেই চিনিতেন এবং নূতনটি দেখিবার পর মৃতদেহগুলি সাধারণতঃ ইঞ্জিনিয়ার যে চিতা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার উপরেই দাহ করা হইত, এবং তখন আর পুরাতন শ্মশানটির ব্যবহার করা হইত না। তিনি যখন বাজারের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টরূপে ১৯০৭ সালে কার্য্যগ্রহণ করেন সেই সময়কার কথা বলিতেছেন। ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে তিনি ১৯১২ সালের পরেই নূতন শ্মশান দেখিয়াছিলেন, নতুবা নূতন রাস্তা ধরিয়া যাইবার সময় বামদিকে শ্মশানটি পড়ে একথা তিনি বলিতেন না। এই কথা কেবলমাত্র ১৯১২ সালে নির্ম্মিত নূতন শ্মশানে যাইবার রাস্তার সম্পর্কে খাটে—নূতন সুধীরকুমারী রোড দক্ষিণ দিক হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত আসিয়াছে এবং ইহার নির্ম্মাণের কথা সভার কার্য্যবিবরণীতে উল্লিখিত হইয়াছে।

বাদীপক্ষের মিঃ মন্মথ চৌধুরী (বাঃ সাঃ ৯৮৬) বলিয়াছেন, তিনি দার্জ্জিলিংয়ে অনেক শবদাহ করিয়াছেন। যাহারা শবদাহ কার্য্যে কখনও সাহায্য করিতে প্রত্যাখ্যান করে না, তাহাদের তিনি অন্যতম ; এবং বিজ্ঞ কৌশুলী মিঃ চৌধুরী মিঃ আর এন ব্যানার্জ্জির নিকট হইতে এই কথা বাহির করিয়াছেন যে তিনিও ১৯০৯ সালে তাহাদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন যে নূতন সুধীরকুমারী রোড নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি পুরাতন শ্মশানেই অধিকাংশ সময়ই শবসংকার করিতেন এবং ১৯১০ সালে তিনি দার্জ্জিলিংয়ের সরকারী উকীল মিঃ এম, এন, ব্যানার্জ্জির শব নূতন শ্মশানে প্রথম দাহ করেন। মে মাসের চালাঘরের প্রয়োজন বোধ করা ব্যতীত নূতন এবং পুরাতন শ্মশানের মধ্যে নির্ব্বাচনের প্রকৃতপক্ষে কোন আবশ্যক ছিল

না, এবং রাত্রিকালে পুরাতন শ্মশানটি নির্ব্বাচন করাই স্বাভাবিক, কারণ ইহাতে অধিক দূরে নামা এবং ঝোরা অতিক্রম করা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই ঝোরা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও প্রত্যেক মানচিত্রে ইহার নির্দ্দেশ আছে এবং মিঃ মর্গেনষ্টেন একথা স্বীকার করিয়াছেন। ১৯১৯ সালের মে মাসে শ্মশানে যাইবার রাস্তাটি নির্ম্মিত হইয়াছিল না, যদিও মিঃ মর্গেনষ্টেন বলেন যে সুধীরকুমারী রোড নূতন শ্মশান অতিক্রম করিয়া চম্মরঞ্জনশালা পর্য্যন্ত গিয়াছিল। ১৯০৯ সালে তাহার বয়স নয় বৎসর ছিল, একথা বলা ভুল।

শ্মশানের রাস্তা

যদি রাস্তাটি আরও নামিয়া যাইত, তবে মণিমোহনবাবু বিন্দু বসাইয়া উহার নির্দ্দেশ করিতেন না এবং কমিটি সুধীরকুমারী রোডের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন না যে, যে পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তা করিয়াছেন, তাহা নির্ম্মাণ হয় নাই। মিউনিসিপ্যালিটির আমিন সামসুদ্দিন বলিয়াছে, মানচিত্রের পশ্চিমে যে নূতন শ্মশান হইতে চম্মরঞ্জনশালা পর্য্যন্ত রাস্তাটি দেখান হইয়াছে তাহা পরে নির্ম্মাণ হইয়াছে। আমি ইহার পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পুরাতন সুধীর-কুমারী রোড দুর্গম, তিন ফিটেরও কম চওড়া, ইহার উভয় পার্শ্বে জঙ্গাল এবং আলোকবিহীন। অবশ্য পুরাতন শ্মশানের ব্যবহার বন্ধ হইয়া না গেলে, মৃতদেহ লইয়া দক্ষিণদিকের প্রথম শ্মশানে যাওয়াই স্বাভাবিক। যাহা হউক মন্মথবাবুর সাক্ষ্যের দ্বারা মনে হয় যে সম্ভবতঃ ইহার প্রায়ই ব্যবহার হইত, এবং প্রতিবাদীপক্ষের দুইজন সাক্ষীর বিবৃতি দ্বারা এই ধারণা সমর্থিত হয়। তিনি আরও বলেন যে শারদা (প্রঃ সা ৪০২) ১৩১৫ কিংবা ১৩১৬ (১৯০৮—১৯০৯) সালে একটি মৃতদেহ সৎকার করিতে যায়, কিন্তু তিনি বলেন যে সেখানে কোন চালা ছিল না। ইহার অর্থ এই যে নূতন শ্মশানটি সবেমাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন শ্মশানের চালাদ্বারা নূতন শ্মশানের চালা নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে পুরাতন শ্মশান হইতে নূতন শ্মশানে যাইবার রাস্তাটি নূতন শ্মশান নির্ম্মিত হইবার পর তৈয়ার করা হইয়াছিল। ইহা পূর্ব্বে ছিল না। আমি অন্যান্য যুক্তিদ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে মিঃ মর্গেনষ্টেন ভুল বলিয়াছেন। যাহা হউক, তিনি স্বীকার করিয়াছেন ১৯০৭ সালে নিকটবর্ত্তী গৃহে যখন বাস করিতে আরম্ভ করেন তখন তিনি পুরাতন শ্মশান ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছেন, এবং প্রায় এক বৎসর পরে নূতন শ্মশানের ব্যবহার আরম্ভ হয়। কখন হইতে পুরাতন শ্মশান ব্যবহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহা তিনি স্মরণ করিতে পারেন না। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়

যে ১৯১২ সালে নূতন রাস্তা নির্ম্মাণের পর কেহই আর সেখানে যাইত না, কারণ নূতন শ্মশানই তখন সেই পথের নিকটে হয়।

শবদাহকারীরা কোথায় আশ্রয় লইয়াছিলেন ?

ইহার পর সাক্ষীরা যে কুটীরে আশ্রয় হইয়াছিলেন, তাহার বিষয় আলোচনা করা যাক। ইহা দেখা যায় যে, মিঃ মার্গেনষ্টেইন মিউনিসিপালিটীর নিকট হইতে মধ্য খণ্ড, উত্তর খণ্ড এবং পশ্চিম খণ্ড এই তিন খণ্ড বাগান জমী লীজ লইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কসাইখানা উপরোক্ত মধ্য খণ্ড বাগানের উত্তর পার্শ্বে ছিল। বাদী যে দলীল (.২০৩) দাখিল করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে দেখা যায় যে উক্ত কসাইখানা নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে হিন্দু শ্মশান কমিটীর অভিমত গ্রহণ করা হইয়াছিল। মন্মথ বাবুর (বাঃ সাঃ ৯৮৬) সাক্ষ্য হইতেও ইহা প্রতীয়মান হয়। মন্মথবাবু বলেন যে তিনি বর্ত্তমান জবাইখানার নিকটবর্ত্তী স্থানে স্থিত কোন এক কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবশ্য জবাইখানা তখনও নির্ম্মাণ হয় নাই। ইহা পরিষ্কাররূপেই প্রতীয়মান হয় যে, তখন ঐ শাক সব্জী বাগানের ভিতর ম্যাপে দৃষ্ট চালা ঘর ব্যতীতও মালী প্রভৃতির জন্যও কুটীর ছিল। ১৯০৭ সাল হইতে চাকুরীতে বহাল মিউনিসিপালিটীর সার্ভেয়ার বাদী পক্ষীয় সাক্ষী সামসুদ্দীনও বলেন যে বাগানের ভিতর চালা ঘর ছিল, এবং মিউনিসিপালিটীও ঐ সমস্ত ঘর সহিতই বাগান লীজ দিয়াছিলেন। লীজ দেওয়ার সময় ঐ সমস্ত ঘরই ম্যাপে দেখান হইয়াছে ; কিন্তু তাই বলিয়া সকল খুটিনাটী ব্যাপারেই ম্যাপ মানিয়া চলা যায় না। ম্যাপের ভিতর ক্ষুদ্র কুটীর থাকিবে ইহা আমি আশা করি না। ঘটনার সময় মর্গেনষ্টেইন দশ বৎসরের বালক ছিলেন। তিনি বলেন সব্জী বাগানে কাচের ঘর ছাড়া আর কোন ঘর ছিল না। কিন্তু জেরায় স্বীকার করেন যে মালী, চাকর ও সইসদের জন্য ছোট ছোট কুটীর সমূহ সুধীর কুমারী রোডের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল। এই সমস্ত ঘরেই সাক্ষীরা বৃষ্টি হইতে আশ্রয় নিবার জন্য গিয়াছিলেন। চন্দ্র সিং এবং অপর একজন সাক্ষী বলিয়াছেন যে তাহারা কসাইখানায় আশ্রয় নিয়াছিলেন। ঐ ঘরের বিবরণ জিজ্ঞাসা করা হইলে চন্দ্র সিং বলেন যে উহা ২৫।১২ ফিট বড় ছিল ; কিন্তু কসাইখানা উহা হইতে অনেক বড় ঘর। কোন্ ঘরের কথা চন্দ্র সিং বলিতেছেন তাহা বোঝা শক্ত ; সম্ভবতঃ তাহারা বর্ত্তমান কসাইখানা ও যে ঘরে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহা মিশাইয়া 'জগা খিচুড়ী' বানাইয়াছেন। এই ঘটনায় বাদী পক্ষীয় সাক্ষীগণ বলিয়াছেন যে ঘটনার দিন রাত্রি ১০টা হইতে প্রায় ১টা পর্য্যন্ত খুব

জল ঝড় হইতে থাকে। এই সাক্ষীগণ প্রধানত তিন দলে বিভক্ত—শবানুগমনকারিগণ, শবযাত্রাদর্শিগণ এবং শশ্মানবন্ধুগণ। কেহ শশ্মানেই জল ঝড়ের হাতে পড়েন, কেহ শ্মশানে খাটিয়া রাখিয়া গৃহে ফিরিবার পথে এবং কেহ পদ্মিনি বাবুর ন্যায় স্বাস্থ্যনিবাসে ফিরিবার পর জল ঝড় আরম্ভ হয়। প্রতিবাদী পক্ষীয় সাক্ষী ফকীরও বলিয়াছে যে, ঐ দিন ঐ সময় কালবৈশাখীর জল ঝড় আরম্ভ হয়। তখন বর্ষাকাল ছিল না, কাজেই যদি বৃষ্টি হইয়া থাকে তবে তাহা যে কালবৈশাখীরই পূর্ব্বাভাষ এই সম্বন্ধে আর কোনই ভুল হইতে পারে না। বিবাদী পক্ষ বলিতেছেন যে বৃষ্টিমান-যন্ত্রের রিপোর্টের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইবে যে ঐ তারিখে জল ঝড় হয় নাই। যদি তাহারা রিপোর্ট দৃষ্টে তাহা প্রতীয়মান করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমি এই জল ঝড়ের বিষয় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিব।

আবহাওরা কেমন ছিল

দার্জ্জিলিংয়ে সেণ্ট জোসেফ কলেজে, সেণ্টপল গীর্জ্জায়, বোটানিক্যাল গার্ডেনে, মিউনিসিপালিটীতে, এবং চা-করদের ক্লাবে বৃষ্টিমান-যন্ত্র আছে। বাদীপক্ষীয় সাক্ষী ৮৩৯ জগন্নাথকে মানমন্দিরেও উহা আছে কিনা তাহা জেরায় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল।

সেণ্টপলের বৃষ্টির রিপোর্ট গভর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তদ্দৃষ্টে দেখা যায় যে ৪ঠা মে সকাল ৮ টা হইতে ১২ই মে বিকাল ৪ টা পর্য্যন্ত কোন বৃষ্টি হয় নাই।

সম্ভবতঃ মিঃ 'লিণ্ডসে এই রিপোর্ট দেখিয়াই বাদীর বৃষ্টির কাহিনী মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করেন।

সেণ্টজোসেফেও ১১ই তারিখ ব্যতীত এই কয়েক দিনের ভিতর কোন বৃষ্টির উল্লেখ নাই।

সেণ্টপলে ১১ই কিম্বা ১২ই কোনই বৃষ্টি হয় নাই।

কোন পক্ষই চা-কর ক্লাবের রিপোর্ট দাখিল করেন নাই। ক্লাবের তৎকালীন হেড ক্লার্ক মন্মথবাবু বলেন যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ২জন ভদ্রলোক আসিয়া ক্লাবের ১৯০৯ সালের রিপোর্ট লইয়া যান। এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছুই বলা যায় না।

ডাঃ কালভার্ট প্রমুখ সমস্ত সাক্ষীই স্বীকার করিয়াছেন যে দার্জ্জিলিংএ একস্থানে বৃষ্টি হইলে অন্য স্থানে বৃষ্টি নাও হইতে পারে। উপর পাহাড়ে বৃষ্টি হইলে, নীচুতে বৃষ্টি না হইতেও পারে। আবহাওয়ার এই লুকোচুরি

সমতল ভূমিতেও হইয়া থাকে। উপরোক্ত ১২ তারিখের ঘটনা এবিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।

মামলার মাঝামাঝি অবস্থায় বাদীপক্ষ দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটীর বৃষ্টিমান রিপোর্ট তলব করিয়া উহার এক কপি আদালতে দাখিল করেন। বিবাদীপক্ষও তদনুরূপে বোটানিক্যাল গার্ডেনের রিপোর্ট দাখিল করেন। ঐ গার্ডেন বাজার হইতে নীচুতে ভিক্টোরিয়া রোডে অবস্থিত। বাদীপক্ষের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে ঐ রাত্রের বৃষ্টি কার্ট রোডে এবং উহা হইতে অল্প উপরে হয়; কিন্তু কোন সাক্ষীই উহা ম্যাকেঞ্জী রোড, কর্মাশিয়াল রোড কিংবা চৌবাস্তার এত উপরে হইয়াছে বলিয়া বলেন না। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে উহা মিউনিসিপাল অফিস কিম্বা বোটানিকাল গার্ডেন্‌সে কোথায়ও হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া অতি নীচুতে অবস্থিত শশ্মানেও হয় নাই তাহা বলা যায় না।

বাদীর দাখিলীকৃত মিউনিসিপাল রিপোর্টের কপি এবং মিউনিসিপালিটির প্রদত্ত মূল রিপোর্টে ৩।৫।০৯ তারিখের পর, যে তারিখের কথা লিখা আছে উহা কেহ বদলাইয়াছে।
ঐ রিপোর্টে উক্ত তারিখ ১৩।৫।০৯ বলিয়া লিখিত দেখা যায়।

বাদীপক্ষ বলেন যে উহা ৮ তারিখ ছিল, কিন্তু বদলাইয়া ১৩ তারিখ করা হইয়াছে, অথচ বিবাদীপক্ষ বলেন যে, ১৩কেই কেহ বদলানের চেষ্টা করিয়াছেন। বিবাদীপক্ষ বৃষ্টির রিপোর্টের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও তাহারা তারিখ জাল হওয়ার বহু পরে ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে এই রিপোর্ট তলব করেন তাহা আমি বুঝিতে পারি না। এই জাল ধরিবার জন্য ডেপুটী কমিশনার ১৯৩৫ খৃঃ এপ্রিল মাসে তদন্ত করেন। বাদীপক্ষেরও এত পরে ১৯৩৫ সালের জুন মাসে এই রিপোর্ট তলব করিবার কোন সঙ্গত যুক্তি বোঝা যায় না। আমি এই তারিখটা খুব মনোযোগ সহকারে দেখিয়াছি। জাল হইবার পূর্ব্বে ইহা কোন তারিখ ছিল তাহা বোঝা যায় না। আন্দাজ করিয়া কোন কিছুই করা উচিত নয়।

রিপোর্টে রহস্য

বোটানিক্যাল গার্ডেনের 'রিপোর্ট' দেখিয়াছি। আমি বলি যে **ইহা একেবারেই অবিশ্বাসযোগ্য**। গার্ডেনের জনৈক ক্লার্ক ২৩-৭-৩৫ তারিখে সাক্ষ্য দেন, তিনিই ইহা দাখিল করেন। তিনি বলেন যে ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে চাকুরীতে বহাল হন, এবং সেই

হইতে ইহা তাহারই তত্ত্বাবধানে আছে। ১৯০৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর হইতে তারিখগুলি তাহারি হাতের লেখা। জেরায় তাহার উত্তরগুলি সন্দেহজনক হওয়ায় তাহার সার্ভিস বুক দাখিল করা হয়। তাহাতে দেখা যায় যে তিনি ১।৩।০৯ তারিখ হইতে স্থায়ী চাকুরীতে বহাল হয়েন। সম্ভবতঃ তিনি পূর্ব্ব হইতেই চাকুরী করিতেছিলেন; কিন্তু তাহার সাক্ষ্য হইতে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি প্রমাণ হয়। (১) ১৯০৯ সালের বৃষ্টির রিপোর্ট একখানা বহিতে লিখা আছে। প্রতি বৎসরের রিপোর্ট এই বহিতে এক এক পাতায় লিখা আছে এবং তাহারি অপর পাতায় বাৎসরিক তাপমান যন্ত্রের রিপোর্ট লিখা আছে। প্রথম পাতায় বাৎসরিক বৃষ্টির রিপোর্ট পরের পাতায় উত্তাপের বাৎসরিক তাপমান যন্ত্রের রিপোর্ট, এইভাবে ধারাবাহিক চলিতে থাকে। কিন্তু ১৯০৯ সাল হইতে এই পদ্ধতি একেবারে উল্টাইয়া যাইয়া বিপরীত নিয়ম প্রচলিত হয়। তখন হইতে প্রথম পাতায় উত্তাপের রিপোর্ট এবং পরের পাতায় বৃষ্টির রিপোর্টের প্রবর্ত্তন আরম্ভ হয়; শুধু তাহাই নহে—বৃষ্টির রিপোর্টের পাতার শীর্ষ লাইন অন্য কালিতে লেখা এবং উহা অপেক্ষাকৃত নতুন লেখা বলিয়া মনে হয়। কেরাণীবাবু বলেন যে শীর্ষলাইন পূর্ব্বে লিখা হইয়াছিল; কিন্তু আমার মনে হয় যে শুধু কালিই ভিন্ন নয়, লেখাও অপেক্ষাকৃত নতুন। প্রত্যেক পাতার নীচে "তত্ত্বাবধায়ক" এই কথাটি শীল করা আছে কিন্তু তাহার উপর কোন সই নাই। কিন্তু ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টের পাতায় ভূতপূর্ব্ব জনৈক তত্ত্বাবধায়ক মিঃ কেভের নাম সহি দেখা যায়। সাক্ষী ১৯২২ খৃষ্টাব্দের সম্পূর্ণ রিপোর্টই তাহার নিজের হাতের লিখা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু তাহার সার্ভিস বুক দৃষ্টে দেখা যায় যে ১৫ই আগষ্ট হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সে ছুটীতে ছিল এবং ঐ বৎসরের সমস্ত রিপোর্টই একই ব্যক্তির হাতের লিখা। অতএব ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সাক্ষী গার্ডেনের একজন কেরাণী ছিলেন, ইহা সত্য তবে রিপোর্ট-বহি তাহার তত্ত্বাবধানে ছিল না। তারপর নয়া কালিতে শীর্ষ-লাইন লেখা এবং ১৯০৯ সাল হইতে পরিবর্ত্তিত রিপোর্ট রাখিবার পদ্ধতি দৃষ্টে ইহা পরিষ্কারই বোঝা যায় যে **ঐ সমস্ত লেখা পূর্ব্বে ছিল না এবং উহা জাল**। আমি মে মাসের রিপোর্ট জাল এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া মনে করি এবং ইহা জোরের সহিত বলিতে পারি যে ঐ রিপোর্টই বৃষ্টি হওয়া অস্বীকার করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ নয়।

ঝড় বৃষ্টির সাক্ষী

ইহার পর সেণ্ট-জোসেফ কলেজের প্রফেসর ফাদার পীলের সাক্ষ্য আলোচনা করিব। তিনি কলেজের আবহাওয়া ডিপার্টমেণ্টের বিভাগের কর্ত্তা। এই কলেজ বাজার হইতে ৫০০ ফিট নীচুতে অবস্থিত এবং "উত্তর সীমানা" নামক স্থান হইতে সোয়া মাইল হইতে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি বলেন যে যদি ৫ই হইতে ১১ই মে সেণ্ট-জোসেফ কলেজ কিংবা সেণ্টপল গীর্জ্জায় বৃষ্টি না হইয়া থাকে তবে ঐ সময়ে মিঃ মর্গেনিষ্টিনের বাগানে কিংবা বাজারে বৃষ্টি হইতে পারে না। কি কারণে তিনি এইরূপ বলিলেন তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর। দার্জ্জিলিংয়ে বর্ষাকালের পূর্ব্বে যে বৃষ্টি হয় তাহা শুধু একমাত্র কারণেই হইতে পারে এবং তাহা এই : সিঙ্গিলা পর্ব্বতমালা হইতে হিমশীতল বায়ুপ্রবাহ দার্জ্জিলিংয়ে আসিয়া মাঞ্চি উপত্যকা হইতে আগত উষ্ণবায়ু প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হয় : অথবা আরও নীচুতে যাইয়া ঐ হিমশিতল বায়ুপ্রবাহ বালিশান উপত্যকা হইতে আগত উষ্ণবায়ু প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হয়। ঐ পূর্ব্বোক্ত সংমিশ্রণে যে বৃষ্টি হইবে তাহা সমস্ত উত্তর দার্জ্জিলিং ব্যাপিয়া হইবে এবং উহা সেণ্ট জোসেফের মানযন্ত্রে ধরা পড়িবে। সেইরূপ শেষোক্ত কারণে দক্ষিণ দার্জ্জিলিংয়ে বৃষ্টি হইবে এবং উহা সেণ্টপল গীর্জ্জার মানযন্ত্রে রিপোর্ট থাকিবে। ফাদার পীল আরও বলেন যে আবহাওয়ার অবস্থা এবং বাতাসের গতি ও পথ লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে যে ৬ই হইতে ১১ই মে পর্য্যন্ত শুকনা অবস্থা যাইবে অর্থাৎ বৃষ্টি হইবে না। বিবাদীপক্ষের ব্যারিষ্টার বলিয়াছেন যে এই সময়ে ভারতের কোথাও বৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু দার্জ্জিলিং হইতে নিম্নে জলপাইগুড়িতে এই কয়দিন বৃষ্টি হইয়াছিল। ৫ই ২.৪১ হইতে ৪.৯৮ ইং ৬ই ৫. ৭৭ ইঃ ৭ই ; ৩.৩৬ ইঃ ৮ই ১.১৭ ইঃ ৯ই ০. ২১ ইঃ ১০ই ০. ৭৯ ইঃ ১১ই ২. ১০ই : ১২ই। এই বৃষ্টি দার্জ্জিলিং উপত্যকায় এবং শিলিগুড়িতে হইয়াছিল। মার্চ্চের শেষ হইতে মে মাসের প্রথমে যে কালবৈশাখীর বৃষ্টি হয় ইহাই সে বৃষ্টি, তদ্বিষয়ে আর কোনই ভুল নাই। বিবাদীপক্ষের সাক্ষী ফকিরবাবু এবং বাদীপক্ষীয় অন্য সাক্ষীদের বর্ণনা অনুসারে বৃষ্টি হইয়াছিল দেখা যায় এবং তাহা আবহাওয়ার রিপোর্টে ধরা না পড়িলেই যে বৃষ্টি হয় নাই তাহা নয়। যদি দার্জ্জিলিংয়ে কালবৈশাখী হইয়া থাকিত তবে তাহা দক্ষিণ হইতেই আসিয়াছে এবং এই সমস্ত কারণ হইতেই আমি ধরিয়া লইব যে ঐ দিনের বৃষ্টি হইতে এইরূপ ঠুনকো কারণের উপরই অবিশ্বাস করা যায় না।

যদি কুমারের মৃত্যু গোধুলির সময় হইয়া থাকে, তবে তাহার শবদেহকে

সেই রাত্রিতে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল ; এবং শ্মশানে ৮ই মে তারিখের রাত্রিতে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা শ্মশান অথবা আশ্রয় স্থল কিংবা বৃষ্টির সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় না। মৃতদেহ যে প্রকৃত-পক্ষে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহা এই সব ঘটনা দ্বারা অবিশ্বাস করা যায়না এবং আর একটি বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। ৯ই তারিখে প্রাতঃকালে একটি শবদেহ নূতন শ্মশানে দাহ করা হইয়াছিল।

৯ই তারিখের প্রাতঃকালের শোকযাত্রা

এই প্রসঙ্গে ১৩ জন ব্যক্তির কমিশনে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং সত্য ডাক্তার আশু, বীরেন্দ্র এবং বিপিন প্রভৃতি সহবাসী ছাড়াও আরও ২২ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

বাদীপক্ষের নয়জন সাক্ষী শবযাত্রার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছে।

১৯০৯ সালে গবর্ণমেণ্ট দার্জ্জিলিংয়ে ছিল, এবং সেক্রেটোরিটের কেরাণীরা কাচারী দালানে নিজেদের বাড়ীতে বাস করিত। সেই দালানটি বাজারের সামনে অবস্থিত এবং কার্টরোডের সন্নিকটে ছিল। ইহা রেলওয়ে মালগুদামের ঘর হইতে প্রায় ৩০০ গজ দূরে অবস্থিত এবং ফার্ণডেস্ রোড় ধরিয়া আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়া শ্মশানে পৌছান যায়। এই কাচারী দালানে সত্যবাবুর ভাই শ্যামাদাস থাকিত এবং এই মেস হইতে ৯ই তারিখে সকালবেলা কয়েকজন লোক মৃতদেহটিকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেপ-এসাইড বাড়ীতে আসিয়াছিল। তাহারা বলে যে অন্যান্য যায়গা হইতে আরও লোক আসিয়াছিল এবং বিখ্যাত জগৎমোহিনী নার্স এবং অন্যান্য সাক্ষীগণ যে বিবৃতি দান করিয়াছেন তাহা এইরূপ :—

কুমার মধ্যরাত্রে মারা গিয়াছেন। রাণী সারারাত্রি মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিয়াছিল এবং নার্স যে ঘরে কুমার মারা গিয়াছিল সেই ঘরে তাহাকে (রাণীকে) জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। ডাক্তারেরা চলিয়া গিয়াছিলেন। সত্য বাবু বলেন যে তিনি স্যানিটোরিয়ামে তাহার বন্ধু মিঃ রাজেন্দ্র শেঠের নিকট কুমারের মৃত্যুর সম্বন্ধে চিঠিতে লিখিয়া জানান ; এবং কাচারী দালানে তাহার ভাইয়ের নিকট অনুরূপ পত্র লেখেন। প্রত্যুষে প্রায় তিনটা চারটার সময় কয়েকজন লোক আসিয়াছিল, কিন্তু প্রাতঃকালে বহুলোক আসিয়াছিল, এবং কুমারের শব পরদিন প্রাতঃকালে নামাইয়া সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনের খাটের উপর রাখা হয় এবং শবযানের উপর ফুল বিছাইবার পর শোকযাত্রা করিয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। দুইজন গুর্খা প্রহরী বন্দুক বিপরীতদিকে ধরিয়া অগ্রসর

হইতেছিল এবং শোক যাত্রা লইয়া চলিবার সময় পথের ধারে মুদ্রা ছড়াইয়া দেওয়া হইতেছিল। কমার্শিয়াল রোড দিয়া না যাইয়া থর্ণরোড ধরিয়া হাসপাতালের পাশ দিয়া শোকযাত্রা বাজার এবং কাচারী দালান অতিক্রম করিয়া কার্টরোডে পড়িয়া অবশেষে গুদামঘরের নিকটে আসিয়া পৌছিল। এবং সেখান হইতে পূর্ব্ববর্ণিত পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। শোকযাত্রা হাসপাতাল পার হইয়া গেলে উহাকে এম, এন, ব্যানার্জ্জির 'বলেন ভিলা'র এবং দার্জ্জিলিংয়ের জি, পির নিকট গিয়া যাইবে। উহার এক অংশে মেজরাণীর মামা ভাড়াটিয়াভাবে বাস করিতেছিলেন। শ্মশানে চিরাচরিত প্রথানুসারে শবদাহ করা হয়। প্রতিবাদীপক্ষের বক্তব্য এইরূপ।

বাদীপক্ষের মত এই যে ঐ দেহ প্রকৃতপক্ষে কোনক্রমে কুমারের নয়। ঐ দেহটি বাত্রিযোগে যোগাড় করা হইয়াছিল এবং ঐ শব সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে কোন প্রকার আচার না মানিয়া শবদাহ করা হয়। এই ব্যাপারের অসম্ভাবনা অতি সহজেই প্রতীয়মান হয়, এবং বাদী এবং ঘটনার অভিন্নতা যাহা গোধূলির একটু পরে ঘটিয়াছিল এবং রাত্রিকালে দেহটি বাহিরে লইয়া যাওয়া, কিন্তু দাহ করা হয় নাই—ইহাই প্রকৃত ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই বিষয়টির এমনভাবে বিচার করিতে হইবে যেন এই সব ঘটনা অজ্ঞাত ছিল।

যে সব সাক্ষিগণ এই শোকযাত্রার কথা বলিয়াছে অথবা শোকযাত্রা বাহির হইবার পূর্ব্বে দেহটিকে দেখিয়াছে তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

১। কালিপদ মিত্র (কমিশনের সাক্ষী) ৪৫ কলিকাতায় বাস করে।
২। কানাইরাম মুখার্জ্জি, ৪৪ বৈদ্যবাটির হুগলী।
৩। নলিনী ঘোষ, ৪৬ কলিকাতায়।
৪। উত্তরপাড়ার শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জ্জি, ৪৮।
৫। উত্তর পাড়ার মহেন্দ্র ব্যানার্জ্জি ৫২।
৬। ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য, মণিরামপুর, ২৪ পরগণা ৩৯।
৭। তিনকড়ি মুখার্জ্জি, আরামবাগ, হুগলী।
৮। রাজেন্দ্র শেঠ, বালি, ৫২।
৯। বিজয় মুখার্জ্জি, বালি, ৩৯
১০। জগৎমোহিনী দেবী, নার্স ৫০।
১১। মিঃ আর এন ব্যানার্জ্জি, ব্যারিষ্টার, ৪১।
১২। হারাণচন্দ্র চাকলাদার, লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৬।
১৩। গীতা দেবী।

ইহাদের প্রথম ছয়জন সেক্রেটারিয়েটের কেরাণী। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শ্যামাদাসকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং সে ছাড়া অপর সকলে এখনও চাকরী করিতেছে।

এই তের জনের সাক্ষ্য কমিশনে গ্রহণ করা হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে কোর্টে জেরা করা হয়।

প্রঃ সাঃ—১১। আর লিউস, অবসর প্রাপ্ত রেলওয়ে গার্ড।

প্রঃ সাঃ—১৬ ফ্রেড্রিক লক্স্ অবসরপ্রাপ্ত মিউসিপ্যালিটীর কর্ম্মচারী।

প্রঃ সাঃ—এ প্লিভা, দার্জ্জিলিংএর মিষ্টান্ন-ব্যবসায়ী।

প্রঃ সাঃ—৫৭ দুর্গাচন্দ্র পাল, সেক্রেটারিয়েটের এক বিভাগের হেড এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট।

প্রঃ সাঃ—দার্জ্জিলিংয়ের স্বরেন্দ্র চন্দ্র।

প্রঃ সাঃ—জলপাইগুড়ির নুরুল হক্।

প্রঃ সাঃ—৭১ রংপুরের মতিয়ার রহমান।

প্রঃ সাঃ—৭৩ পলমন, দার্জ্জিলিংযের।

প্রঃ সাঃ—দার্জ্জিলিংয়ের লাখী মুদী।

প্রঃ সাঃ—৭৩ কালি ছত্রী।

প্রঃ সাঃ—১০৩ ডাক্তার এস, সি, রায়, এম, বি, আর সি, পি,

প্রঃ সাঃ—১০৫ সতীশ চন্দ্র মুখার্জ্জী।

প্রঃ সাঃ—১১৯ কালী ছত্রিনী।

প্রঃ সাঃ—দার্জ্জিলিংয়ের সত্যপ্রসাদ ঘোষাল।

প্রঃ সাঃ—নন্দগোপাল গরগরী।

প্রঃ সাঃ—৭১ দার্জ্জিলিংয়ের ভূতপূর্ব্ব কনেষ্টবল।

প্রঃ সাঃ—পূর্ণ ব্যানার্জ্জি, দার্জ্জিলিং।

প্রঃ সাঃ—১১৩ বালির পঞ্চানন মিত্র।

প্রঃ সাঃ—৩০৯ মিঃ হল্যাণ্ড, অবসরপ্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী

প্রঃ সাঃ—৪২০ তারাপদ ব্যানার্জ্জী

অধিকন্তু মেজবাণী, সত্য, বীরেন্দ্র, আশু ডাক্তার, বিপিন ইহারা সকলেই সহবাসী, এবং অ্যান্থনী মরেলকেও কমিশনে জেরা করা হয়।

যে সকল সাক্ষিগণকে কোর্টে আনা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সহবাসিগণ এবং দুইজন সাক্ষী, সত্যপ্রসাদ এবং গরগরী ভিন্ন অপর কেহ শ্মশানে যায় নাই, ইহাদের কেহ কেহ কেবলমাত্র শোকযাত্রাটি চলিয়া যাইতে দেখিয়াছে এবং তাহাদিগকে শুধু থর্ণরোড রাস্তার প্রসঙ্গে ডাকা হইয়াছিল।

তাহাদের নাম মিঃ প্লিভা, মিঃ লেক্টস্, মিঃ হল্যাণ্ড, পূর্ণ ব্যানার্জ্জি, পঞ্চানন। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন যে তাহারা তখন কেবলমাত্র ষ্টেপ এসাইডে গিয়াছিলেন অথবা খাটের উপর কুমারের দেহ দেখিয়াছেন অথবা দ্বিতল হইতে খাটের উপর রাখিতে দেখিয়াছেন এবং শোভা যাত্রা করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছেন। তাহারা থর্ণরোড রাস্তার বিষয় বলিয়াছে।

যাহাদের সাক্ষ্য কমিশনে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একমাত্র গীতাদেবী ভিন্ন অন্য সকলে বলিয়াছে যে তাহারা সকালবেলা কিংবা তৎপূর্ব্বে ষ্টেপ এসাইডে আসিয়াছিলেন এবং শবের অনুগমন করিয়া শবদাহ পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন।

এইরূপ বলা হইয়াছে যে প্রায় সকাল ৭-৩০ কিম্বা ৮ পর্য্যন্ত যে ঘরে মৃত্যু হইয়াছিল সেখানে শবটি ছিল, ঐ সময়ে উহাকে নীচে নামান হয়, চত্বরের উপরের খাটের উপর দেহটিকে রাখা হয় এবং কিছু ফুল বিছাইয়া দিয়া শাল দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়; উহার উপর পুনরায় ফুল বিছাইবার পর শব লইয়া শ্মশানে যাওয়া হয়। সেখানে বিধিমত সমস্ত প্রথা অনুষ্ঠিত হয়, ঘৃতদ্বারা দেহ অনুলিপ্ত করা হয়, তারপর স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র পরাইয়া পিণ্ডদান করা হয়, মন্ত্রোচ্চারণ করা হয়, এবং তারপর শব চিতার উপর স্থাপন করা হয়, বীরেন্দ্র মুখার্জ্জি তিল প্রদান করে এবং সর্ব্বশেষে চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হয়। এই বীরেন্দ্র তারপর শোকে মাটির উপর গড়াগড়ি দেয় এবং সারারাত্রি কাঁদে, দ্বারওয়ান শরিফখান অধীর হইয়া জলন্ত চিতার উপর ঝাপাইয়া পড়িতে চায় কিন্তু তাহাকে বাধা দেওয়া হয়। শেষোক্ত বিবরণ দুইটি স্বীকার করা হইয়াছে।

যে সব সাক্ষিগণ এই বিবৃতি দেন তাহাদের মধ্যে চারজন ব্যতীত অন্য সকলে প্রত্যুষের পূর্ব্বে আসিয়াছিল। ইহাদের নাম যথাক্রমে বিজয় মুখার্জ্জি বয়স প্রায় ১৭ কিংবা কিছু কম, এবং স্যানিটেরিয়াম হইতে রাজেন্দ্র শেঠ, এবং কাচারী দালান হইতে শ্যামাদাস এবং অনুকুল চ্যাটার্জ্জি।

বাদীপক্ষে তিনজন সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছে। তাহারা বলেন যে তাহারা ষ্টেপ এসাইড হইতে এই সকাল বেলার শোকযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং শেষপর্য্যন্ত শ্মশানে ছিলেন। ইহাদের নাম :—

১। বসন্ত কুমার মুখার্জ্জি, সুপারিনটেণ্ডেন্ট, ডেপুটি কমিশনারের অফিস, দার্জ্জিলিং। তিনি ১৮৯৯ সাল হইতে দার্জ্জিলিংয়ে বাস করিতেছেন (বাঃ সাঃ ৮২৩)

২। স্বামী ওঙ্কারানন্দ (বাঃ সাঃ ৬০৩)। ইহার পূর্ব্বের নাম ছিল ক্ষেত্রনাথ মুখার্জ্জি এবং ইনি দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটিতে ১৯০১—১৯২৭ পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছেন।

৩। রামসিং সুবা (বাঃ সাঃ ৯৬৭) এই ব্যক্তির কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে ষ্টেপ এসাইডের মালিকের মুন্সী।

নলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ডেপুটি কমিশনারের আফিস (কমিশনে)। বসন্তবাবু যে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন তাহা মোটামুটি এইরূপ। নার্স জগৎমোহিনী দাসীকে আমি চিনি। সে প্রাতঃকালে আসিয়া আমাকে খবর দিল যে ভাওয়ালের কুমার মারা গিয়াছে এবং আমার ব্রাহ্মণ হিসাবে যাওয়া উচিত। সে আমাকে 'ষ্টেপ এসাইডে' যাইতে বলিল। আমি সেখানে প্রায় সকাল আটটার সময় পৌছিয়া দেখিলাম যে মৃতদেহটি বস্ত্রাবৃত হইয়া প্রাঙ্গণস্থিত খাটের উপর শায়িত আছে। সমস্ত দেহটি বস্ত্রাবৃত ছিল বলিয়া আমি মুখ অথবা শরীরের অন্য কোন অংশ দেখিতে পাই নাই। ষ্টেপএসাইডে পৌছিবার কুড়ি পঁচিশ মিনিট পরে শোকযাত্রা বাহির হইল এবং আমি ইহার অনুগমন করি। আমি শোকযাত্রার সঙ্গে গিয়াছিলাম কিন্তু শবদাহ স্কন্ধের উপর গ্রহণ করি নাই। দেহটি লম্বা বলিয়া মনে হইল। আমার চেয়ে খাট নয়, একটু লম্বাও হইতে পারে। আমাদের দেশে মৃতদেহ অস্পৃষ্ট থাকে না, কিন্তু যদিও চত্বরের উপর অনেক লোক চলা ফেরা করিতেছিল তথাপি কেহ উহা স্পর্শ করিয়া ছিল না। একজন অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক উপরে বসিয়া রোদন করিতেছিল। সেই রাণী। অন্য কেহ কাঁদিতেছিল না। কিন্তু তাহারা সকলেই বিমর্ষ ছিল।

শোকযাত্রাটি কমার্শিয়াল রোড রাস্তা ধরিয়া, অকল্যাণ্ড রোড, রবার্টসন রোড, লয়েড রোড বরাবর চলিয়াছিল। কিন্তু থর্ণ রোড দিয়া যায় নাই।

তথাকথিত শবদাহ দৃশ্য

নূতন শ্মশানের একটি অসম্পূর্ণ চিতার উপর দেহটি রাখা হইয়াছিল—এইরূপ চিতা সেখানে সব সময়েই থাকে, এবং উহার উপর দেহটী পূর্ব্বের ন্যায় আবৃত অবস্থায় শায়িত করা হয়; সাধারণতঃ হিন্দুর মৃতদেহ স্নান করান হয়। এই দেহটিকে স্নান করান হয় নাই। ঘৃতদ্বারা দেহটিকে অনুলিপ্ত করান হয় নাই, অথবা নূতন কাপড়ও পড়ান হয় নাই। মুখাগ্নির পূর্ব্বে যে পিণ্ডপ্রদান করা হয় তাহাও দেওয়া হয় নাই।

"আমি এইভাবে কোন শবদাহ করিতে দেখি নাই—যে ভাবে এই দেহের

সংকার হয়।" এই শবের মুখাগ্নির জন্য ১৭।১৮ বর্ষ বয়স্ক একটি বালককে ডাকা হইয়াছিল। সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তারপর আমি একটু সরিয়া গেলাম, এবং প্রকৃতপক্ষে মুখাগ্নি দেওয়া হইয়াছিল কিনা, তাহা দেখি নাই। আমি ২০।২৫ ফিট্ দূরে চলিয়া গিয়াছিলাম বটে কিন্তু আমি চত্বরের মধ্যেই ছিলাম। যখন বালকটিকে মুখাগ্নি দিতে বলা হইল তখন শবের উপর কাঠ স্তূপ করিয়া রাখা হইয়াছিল। আমি একটু দূরে সরিয়া গিয়া চিতা জলিতে দেখিয়াছিলাম। আমি সেখানে শেষ পর্য্যন্ত ছিলাম না, কিন্তু প্রায় দেড় ঘণ্টা কি দুইঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়াছিলাম। আমি যতক্ষণ সেখানে ছিলাম ততক্ষণ জগৎ মোহিনী কিংবা অন্য কোন স্ত্রীলোককে সেখানে দেখি নাই।

স্বামীজির সাক্ষ্য দান

স্বামী ওঙ্কারনন্দ যাহার পূর্ব্বের নাম ছিল ক্ষেত্রবাবু তিনিও সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন যে তাহাকেও প্রায় সকাল ৬টা কিংবা ৬-১০এর সময় জগৎ মোহিনী ডাকিয়াছিল। সেখানে গিয়া একটি মৃতদেহ দেখিতে পাই। উহা সম্পূর্ণরূপে আবৃত অবস্থায় নামাইয়া আনিয়া চত্বর স্থিত খাটিয়ার উপর রাখা হয়। সেখান হইতে উহা শ্মশান পয্যন্ত সম্পূর্ণ ঢাকা অবস্থায় লইয়া গিয়া দাহ করা হয় এবং কোন প্রকার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয় নাই। ইহা তাহার নিকট একটু আশ্চর্য্য জনক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। একটি হিন্দু আচারও পালন করা হয় নাই, এমন কি পিণ্ডদান পর্য্যন্ত করা হয় নাই, আমি সেখানে সংকার শেষ হওয়া পয্যন্ত ছিলাম।"

তিনি বলিয়াছেন যে, লোকটি দীর্ঘাকৃতি ছিল বলিয়া মনে হইল,—মৃতদেহের উপরের আবরণি যখন ষ্টেপএসাইডে এবং শ্মশানে একটু সরান হইয়াছিল তখন মৃতব্যক্তির দেহের রঙ্ ফর্সা ছিল বলিয়া মনে হইল।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রাম সিং সুবা গোধূলির সময় মৃত দেহটি দেখিয়াছিল এবং ডাক্তার বি, বি, সরকার বলেন যে মধ্যরাত্রে কুমারের একজন বালক ভৃত্য তাহাকে জাগাইয়া তুলিয়া বলে যে বাহিরে গোলমাল হইতেছে, কিন্তু অত্যন্ত নিদ্রাকাতর ছিলেন বলিয়া যান নাই, কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে গিয়াছিলেন।

সত্যবাবু তাহাকে একখানি খাট এবং শব দাহ করিবার উপকরণ বাজার হইতে আনিতে বলিলেন এবং শোভাযাত্রার সহিত গমন করিয়াছিলেন। তিনিও বলেন যে মৃতদেহটি কখনও উন্মোচন করা হয় নাই। নলিনী চক্রবর্ত্তী

ও ঐরূপ সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন। তিনিও প্রাতঃকালে গিয়াছিলেন এবং শোভাযাত্রার অনুগমন করেন এবং বলেন যে শবটি আপাদমস্তক আবৃতছিল এবং এমনকি শ্মশানেও উহাকে অনাবৃত করা হয় নাই এবং কোনপ্রকার আচার না মানিয়া ঐ অবস্থায় দাহ করা হইয়াছে।

এই সাক্ষিগণের মধ্যে নলিনীর প্রদত্ত সাক্ষ্য তাহার পূর্ব্বকার বিবৃতির সহিত অসামঞ্জস্য থাকায় উহা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস্য। ইহা স্মরণ থাকিতে পারে যে ১৯২১ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সত্যবাবু এবং রায়বাহাদুর এস, সি, ঘোষ সাক্ষিগণের বিবৃতি ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা লেখাইবার জন্য দার্জ্জিলিং রওনা হইয়াছিলেন। এবং সেইবারে পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রবাবুর সাক্ষ্য ১৭।৫।২১ তারিখে গ্রহণ করা হয়। নলিনীর সাক্ষ্য ৩।৬।২১ তারিখে গ্রহণ করা হয়, এবং তিনি তখন বলিয়াছেন যে দেহটির আবরণ উন্মোচিত হইয়াছিল এবং উহা একজন সবল সুস্থ এবং গৌরবর্ণযুক্ত যুবকের দেহ বলিয়া মনে হইয়াছে; এবং এই সাক্ষ্যের সহিত পরে ২২।৬।২১ তারিখে একখানি 'পুনশ্চ', লিপি যুক্ত করা হইয়াছিল; সাক্ষী মরিয়া গিয়াছে, যদিও যে অবস্থায় এই সাক্ষ্যগুলি গ্রহণ করা হইয়াছিল, ছাপান প্রশ্ন তৈয়ার হইবার পূর্ব্বে ৩রা জুন যে সব প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং তাহারা কি বলিয়াছিল, এবং যাহা সাধুর বর্ণনার সহিত মিলিয়া গিয়াছিল বলিয়া যাহা আমি উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং ৩রা জুন যে সব প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহা জানা নাই। একটি বিষয় বেশ সুস্পষ্ট। বাদীর আত্মপরিচয় প্রকাশ করিবার এগার দিন গত হইবার পূর্ব্বেই, 'দেহ অনাবৃত করাইয়াছিল' এই কথাটা সাক্ষিগণের মুখ হইতে বাহির করিবার বুদ্ধি আসে। বসন্তবাবু এবং ক্ষেত্রবাবু পূর্ব্বের বিবৃতির সহিত বর্ত্তমান বিবরণের কোন বিশেষ বিভিন্নতা নাই, কেবল মাত্র আচার প্রতিপালন করা হয়নাই বলিয়া তাহারা একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

এই প্রকার আচার উল্লঙ্ঘনের বিষয়ে কেন তাঁহারা পূর্ব্বে উল্লেখ করেন নাই—সে বিষয়ে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। ছাপান প্রশ্নাবলীর নয় নম্বরের প্রশ্নের উত্তরে যাহা দুর্ভাগ্যক্রমে পরে মিঃ আর, সি, দত্ত তৈয়ার করিয়াছিলেন এবং রায় বাহাদুর এস, সি, ঘোষ ভিন্ন অন্য কেহ এ সম্বন্ধে বেশী ভাল জানেন না, কারণ মিঃ দত্ত তাহার অনুমোদন লাভের জন্য তাহাকে দেখাইয়াছিলেন, এবং সেগুলি পরে আরও সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল।

অপরপক্ষের সাক্ষ্য এইরূপ, যাহাদিগকে কমিশনে জেরা করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ষ্টেপসাইডের একজন ছাড়া অন্য সকলেই শ্মশানে গিয়াছিল।

যিনি যাইতে পারেন নাই, তাহার নাম ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য। তিনি আসিতে অতিরিক্ত বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি শোকযাত্রার সহ-গমন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু শ্মশানে পৌছিবার পূর্ব্বে মৃতদেহ দেখিতে পান নাই। কানাই নামে আর একজন গৃহের নিকটে শোকযাত্রা দেখিতে ছিলেন, কিন্তু সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে নাই।

কোর্টের নিকট বিচারের আর একটি বিষয় এই—প্রত্যূষের অতি পূর্ব্বে চিঠি পাইয়া রাজেন্দ্র শেঠ ও বিজয়, অনুকুল ও শ্যামাপদ সমভিব্যাহার কয়েক জন লোক সেনিটারিয়াম হইতে আসিয়াছিল। যাহারা সকালে আসিয়াছিল তাহাদের সম্বন্ধে মৃতদেহ লইয়া রওনা হওয়ার পূর্ব্বে মৃতদেহ দেখার চেয়ে শ্মশানে মৃতদেহ কি করা হইয়াছিল, তাহার উপরই: বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। বিচারকালে ইহাই খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এক্ষণের ন্যায় পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে মিঃ এম, এন ব্যানার্জ্জীর স্ত্রী কাশীশ্বরী দেবী ও তাঁহার ছেলে বলেনের এ বাড়ীতে আসা প্রাতঃকালের একটি প্রধান ঘটনা। বলেন শবদেহ লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে থাকে, এবং কাশীশ্বরী দেবী শোকার্ত্তা রাণীকে দেখেন। কৌঁসিলি মিঃ আর এন ব্যানার্জ্জীর পরেও দার্জ্জিলিঙে আরও দুইজন সাক্ষীর কমিশনে সাক্ষ্য লওয়া হয়। তিনি তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে—তিনি নিজে কাশীশ্বরী দেবীর অন্যতম পুত্র। তিনি ও তাঁহার ভাই বলেন দুইজনেই মৃতদেহ লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থায় যোগ দেন। এর পূর্ব্বে ইহার কথা আর কোন সাক্ষীই বলেন নাই। তাঁহার মিথ্যা প্রমাণ ফুটিয়া উঠিয়াছে ও তিনি স্থলবিশেষে বিবাদীগণের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছেন। তাঁহাকে সমর্থন করার জন্য পরবর্ত্তী সাক্ষীরূপে তাঁহার ভ্রাতৃবধূর সাক্ষ্য লওয়া যায়। তাহার বয়স কম, তিনি মিঃ এম এন ব্যানার্জ্জীর পুত্রবধূ, ও বলেন ভিলাতে ছিলেন। তিনি বলেন যে যখন বলেন ভিলার পাশ দিয়া শবযাত্রা যাইতেছিল তখন ঐ শবযাত্রার সহিত মিঃ আর এন ব্যানার্জ্জীকেও যাইতে দেখিয়াছেন। কিন্তু শবযাত্রাটি যদি থর্ণ রোড দিয়া না যায় তাহা হইলে ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? সর্ব্ববাদীসম্মত শবযাত্রার পথ লইয়া যে কেন গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়।

জগৎ মোহিনী কি করিল?

তখনকারমত এখনও মোকদ্দমার আর একটি বিষয় হইতেছে যে নার্স জগৎমোহিনী সকালে কেবল যে লোকজন ডাকিয়াছে তাহা নহে, শ্মশানে গঙ্গাজল লইয়াও গিয়াছিল। এই গঙ্গাজল শ্মশানের অত্যাবশ্যকীয় হইয়া

পড়িয়াছিল। সে বলে কাশীশ্বরী সেই বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে জুতা ছাড়িয়া বর্দ্ধমানের মহারাজের বাড়ী হইতে খানিক গঙ্গাজল লইয়া আসিতে বলেন। তিনি সেখানে যাইয়া গঙ্গাজল লইয়া শ্মশানে যান এবং সেখানে দাহকার্য্য দেখেন।

কাশীশ্বরী দেবীর সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, শব লইয়া লোকজন চলিয়া গেলে পরও তিনি রাণীর সঙ্গে ছিলেন এবং প্রায় বেলা ১২টার সময় রাণীকে তাঁহাদের বাড়ী লইয়া যান। শবযাত্রিগণ ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তিনি এখানেই থাকেন। মিঃ আর, এন, ব্যানার্জ্জী বলেন যে তিনি শবদাহ শেষ হওয়ার পরে ৪টা হইতে ৫টার মধ্যে ঘোড়ায় চড়িয়া ফিরিয়া আসেন যাহাতে ৫টার মধ্যে পঁহুছিতে পারেন। কিন্তু পূর্ব্বের অন্য সাক্ষ্যে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উৎরাইয়ে পথে নামিতে এক ঘণ্টার কি তাহারও উপর লাগিয়াছে। তাঁহাকেও এই দুর্গম রাস্তায়ই ফিরিতে হইয়াছিল। বাড়ীতে ফিরিয়া রাণীকে তাঁহাদের নিজের বাসায়ই দেখেন। রাণী তাঁহার মার সঙ্গে রিক্‌সে চড়িয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন।

শবদেহ নীচে নামানোর কথা

সকালের ঘটনার মধ্যে অন্য আর একটী বিষয়ে বিবাদী পক্ষের সাক্ষীরা জোর দিতেছে যে মৃত দেহটী দোতালার হইতে কাঠের সিঁড়ী বাহিয়া নীচে তাহাদের সম্মুখে আনা হইয়াছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সিড়িটি রাস্তার পাশে ঘরের সম্মুখের বারান্দার শেষ দিকে। ইহা নীচের বারান্দা হইতে উঠিয়া বারান্দা ভেদ করিয়া দোতালায় চলিয়া গিয়াছে। বারান্দাটি সমস্তগুলি ঘরেরই সম্মুখে ছিল। যদি কুমারের মৃতদেহ সকলের দক্ষিণের ঘরে অথবা তাহার পাশের ঘর হইতেই আনা হইয়া থাকে, তবে সিঁড়ির উপরে আসিতে হইলে সমস্তটা বারান্দাই অতিক্রম করিতে হইয়াছে এবং সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া উঠানে যেখানে খাট ছিল সেখানে যাইতে সমস্তটা নীচের বারান্দাও অতিক্রম করিতে হইয়াছে আমার কাছে এরূপ সুস্পষ্ট সাক্ষ্য আছে যে মৃতদেহটী সিঁড়ি বাহিয়া নীচে আনিয়া সমস্ত বারান্দা অতিক্রম করিয়া উঠানে খাটে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু কমিশনে গৃহীত জবানবন্দীতে বলা হইয়াছে যে মৃতদেহটী ভিতর হইতে বাহিরে আনা হইয়াছিল—ইহা উপর বর্ণিত ঘটনার সহিত সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অবশ্য দুই একটী সাক্ষীর সাক্ষ্যেতে মনে হয় মৃতদেহটী নীচতলা হইতেই বাহিরে আনা হইয়াছিল।

মিঃ আর,এন, ব্যানার্জ্জী ২৮।৩।৩৩ তারিখে মির্জ্জাপুরে তাঁহার সাক্ষ্য দেন।

এখানে তিনি হাওয়া বদল করিতে আসিয়াছেন বলেন। যে সকল বিষয় তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা হইল এই যে ১৯০৯ সালের মে মাসে যেখানে শ্মশান ছিল দার্জ্জিলিংএর শ্মশান চিরকালই ঐ এক জায়গায়ই ছিল। চালাটীও চিরকালই সেখানে আছে। ১৯০৫ কি ১৯০৬ সালে যখন তিনি রায় বাহাদুর দাসের শবদাহ করিতে গিয়াছিলেন, তখনও তিনি উহা সেখানে দেখিয়াছেন। তিনি ইহাতে ভুল করেন নাই। কারণ বিবাদীপক্ষের অপর একজন স্থানীয় সাক্ষী বলিয়াছেন যে ১৯০৫ কি ১৯০৬ সালে রায়বাহাদুর দাস মারা যান (বিবাদী সাক্ষী—৪১১) কার্য্যতঃ তিনি একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, যে সকল লোক শবদাহে যোগ দেওয়াও অপরিহার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন,—তিনিও তাঁহাদের মধ্যে একজন। (বাদী সাক্ষী (৯৮৬ মন্মথ)! তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন যে নূতন শ্মশান ১৯০৭ সালে তৈয়ারী হইয়াছিল—এবং অনূপ বাবুর (বিবাদী সাক্ষী ৪১১) মত তিনিও জানিতেন যে এখানে কোন চালা ছিল না। পুরাতন শ্মশান কোথায় ছিল তাহা তিনি জানিতেন। তিনি আদালতকে বলিয়াছেন যে, যে শ্মশানে কুমারকে দাহ করা হয় সেখানে ১৯০৫ কি ১৯০৬ সালে চালা ছিল, এবং ১৯০৯ সালেও ঠিক সেই ভাবেই তাহা দেখিয়াছেন।

ইহা ছাড়িয়া দিলেও ইহার সাক্ষ্যে আরও অনেক বাজে কথা পাওয়া যায়। যাহা সত্য নহে—এগুলি অনেকক্ষণ টিকিতে পারে নাই। মিঃ ব্যানার্জ্জি যে কথাই বলিয়াছেন তাহাতে ঘটনা বাহুল্যের ছোঁয়াচ দিয়াছেন—এবং লোকে মিথ্যা ঘটনা করা ইহার জন্য যেমন বিশদ বিবরণ দেয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনিও তেমনি দিয়াছেন। ইহার ভিতরে কতকগুলি কথা তাহার সাক্ষ্যের সত্যতা সমর্থন করে না। তিনি বলিয়াছেন যে ষ্টেপএসাইডে যাইয়া মায়ের সঙ্গে উপরে গিয়া রাণীর সহিত কথা বলিয়াছেন। কুমারকে দেখা ছাড়া কুমারের সহিত তাঁহার অন্য কোনও পরিচয় ছিল না। তখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর, এবং রাণীর বয়স তখন ১৯ বৎসরের কিছু উপরে। তিনি ভাওয়ালের প্রথা জানিতেন না সেইজনাই মনে করিয়াছিলেন যে রাণীর সঙ্গে তাঁহার এই আলাপ সত্য বলিয়া চলিয়া যাইবে। দার্জ্জিলিংএ রাণী রাত্রি ছাড়া অন্য সময় বাহির হইতেন না,—এমন কি তখনও রিক্শ ছাড়া অন্য কোনও চাকরদের সম্মুখে বাহির হইতেন না। বিপিনের বয়স সে বলে অল্প ছিল।

কুমারকে অনেকটা অসুস্থের মত দেখাইত। এই অসুখ মদ্যপানে

জনিত কি অন্য কোন কারণ বশতঃ তাহা জানে না—কারণ তখন তাঁহার বয়স অল্প ছিল। এখানে ডাঃ ক্যালভার্টের চৌদ্দদিনের অসুখের সার্টিফিকেট ও মোরেলের সাক্ষ্যের অল্প সমর্থন কর। পাকস্থলী ব্যাথা সম্পর্কে বলিতে যাইয়া তিনি বলেন রাস্তায় আসার সময় তিনি তাঁহার মায়ের নিকট হইতে শুনিয়াছেন কুমারের পাকস্থলির অসুখে ভুগিতেছিলেন—এবং তাঁহার মা মৃত্যুর ২।৩ দিন পূর্ব্বে কুমারের জন্য অনেক রকম ফল পাঠাইয়া দিয়াছেন। ১৯২৪ সালের পূর্ব্বে বাদী ফিরিয়া আসিলে ইহাই কোর্টে কোনও লোক বাদীর দাবা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে তাহার সহিত তিনি বিতর্ক করেন এবং বাদী যে দ্বিতীয় কুমার এই গুজবের প্রতিবাদ করেন। ১৯২৪ কি ২৫ সালে আর এক আলোচনায় যখন বাদীর এই দাবীর কথা বলা হইতেছিল তখন তিনি বলেন যে তিনি নিজে কুমারের কাছে গিয়াছিলেন। এত সমস্ত জানা সত্ত্বেও যখন ২-১২-৩২ তারিখে কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে কতকগুলি বিষয়ে তাঁহার বিবৃতি দরকার বলিয়া চিঠি পান, তখনই তিনি ডেপুটি কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া সমস্ত প্রশ্নগুলি দেখিয়া আসেন। তারপর বিবৃতির জন্য দিনস্থির করিয়া—দলটি কোথায় আছে জানিবার জন্য কলিকাতা রওনা হন। ভাইয়ের নিকট হইতে কতকগুলি খবর লইয়া ফিরিয়া আসিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রশ্নগুলির উত্তর দেন।

তাঁহার বিস্তৃত সাক্ষ্যে দেখা যায় তিনি একাধিক শ্মশানের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—৯ই সকালের বিষয় উল্লেখ করিতে যাইয়া তিনি কুমারের বহুদিন ব্যাপী অসুস্থতার কথা বলিয়াছেন। তিনি সেখানে সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন—এবং তাঁহার মা আসিলে কুমারের মৃতদেহটি নীচে আনা হয়। কেমন করিয়া নীচে আনা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনাও তিনি দিয়াছেন। বলেনবাবু ও সাক্ষী একসঙ্গে পাশের পাকা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় সহরের নার্স জগৎমোহিনী দাসীকে দেখিতে পান। তারপর তাঁহারা পূবের দিকের বারান্দায় আসিয়া কতকগুলি লোককে দেখিতে পান। মৃত দেহটা উপরে একটা ঘরের মধ্যে ছিল। সেখানে অন্য লোকের সঙ্গে একটা রিখিও ছিল। এই রিখি তাঁহার আর একটা বিশদ বিবরণ দেওয়ার নমুনা। তিনি বলেন "ইহাকে স্ক্রু খুলিয়া,টীনের পার্টিশন খুলিয়া দিতে আনা হইয়াছিল। এই পার্টিশন বারান্দা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, খুলিয়া দিলে মৃতদেহ লইয়া পাকা সিঁড়ি দিয়া যাওয়ার সুবিধা হইত। তিনি কখনও উপরে কখনও নীচে যাইয়া রিখিকে পার্টিশন খুলিয়া দিতে বলিয়াছেন এবং এ কাজে তাঁহার সাহায্য করিয়াছেন। মিঃ ওয়ানকুল মুন্সীর (রামসিং সুভা) নিকট হইতে খাটিয়া

কিনিয়া পাকা সিড়ির নীচে রাখা হইয়াছিল যখন মৃত দেহ নীচে আনা হয় তখন তিনি আঙ্গিনায় সিড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ইহা হইতে বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে তিনি সম্মুখের ঘর হইতে যে ঢালু রাস্তাটী নীচে আঙ্গিনায় নামিয়া গিয়াছে তাহার কথাই বলিতেছেন। এখানেই তাহার সাক্ষ্যের খতম—কারণ অন্য সকল সাক্ষীই মৃতদেহটীকে কাঠের সিড়ি দিয়া নীচে নামাইয়া ঘেরা বারান্দার অপর পার্শ্বে নিতে দেখিয়াছে।

দাগী সাক্ষী কালু-ছত্রি

এই ভুল সংশোধন করার জন্য ষ্টেপএসাইডের বর্ত্তমান চৌকিদার কালু ছত্রিকে সাক্ষ্যদিতে ডাকা হইয়াছে। সে বলে যে দোতালার ঘেরা বারান্দার মাঝখানে একটি দরজা আছে। দরজা থাকার পক্ষে একটা অতি অস্বাভাবিক স্থান। ইহাতে কিছু খেলার কথার সামঞ্জস্য হয় বটে, কিন্তু পাকা সিড়ি যে আঙ্গিনায় যাইয়া শেষ হইয়াছে তাহার কোন সামঞ্জস্য থাকে না। কালু ছত্রি বলে যে সে সময় সে পিকোটিপে চাকরদের ঘরে থাকিত। সে কুমারের দেহ খাটিয়ায় করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছে। এই লোকটার সম্বন্ধে দেখাযায় যে সে ইণ্ডিয়া পেনাল কোডের ৪৫৭ ধারা মতে ৬-৮-৯৭ তারিখে তিন বছরের জন্য জেল হয়। এর পূর্ব্বেও পিনাল কোর্ডের ৩৮০—৩৮১ ধারা অনুযায়ী আরও পাঁচবার শাস্তি হইয়াছে এবং ঐ অপরাধ সম্পর্কে একবার বেত্রদণ্ডও হইয়াছে। (Bx ৩৪৫)। সে যখন জেলে তখনকার ঘটনা সম্পর্কে অনূপ গোস্বামীর মতানুযায়ী সে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে। কিন্তু এই অনূপ বাবুও ইহার জেলে থাকা সম্বন্ধে অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু তদ্‌বিষয়ের উৎসাহে তিনি একথা তুলিয়া দেখা দরকার মনে করেন নাই।

মিঃ আর, এন্, ব্যানার্জ্জি যে সেখানে সকালে ছিলেন তাহা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। এই অবিশ্বাস কেবলমাত্র তাঁহার পারোসিডির গল্পের জন্যই হয়। প্রত্যেক সাক্ষী সাক্ষ্যের সমস্ত খুটিনাটি দেখা অসম্ভব। অনেক দিনের পুরাণা কথার জন্য অল্প সল্প গরমিল ছাড়িয়া দিলেও এই সমস্ত কথার অসত্যতা ধরা পড়ে। যেমন খাটে শায়িত মৃত কুমারের মুখ গোলাপী ছিল, রাস্তায় মোড় থাকা সত্ত্বেও ফটক হইতে সিড়ি দিয়া কুমারের মৃতদেহ নামানের সময় দেখা গিয়াছে—কুমারের সমস্ত অসুখটাই পিত্তশূল—আঙ্গিনায় প্রচুর লোক দাঁড়াইয়াছিল,—ইত্যাদি। কুমারের মৃতদেহটী যে ঢাকা ছিল না, খোলা ছিল, এবং শ্মশানে সমস্ত অনুষ্ঠানই যথারীতি করা হইয়াছে ইহা প্রমাণ করার জন্য অনেক কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটী স্থূল কথাব

উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় সমস্ত মিথ্যা। ইহা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে রাত্রি ৯টার পর কেহই আসেন নাই। শ্যামাপদ বলে যে—রাত্রি ১টা কি ১॥ টার সময়—"কুমার মারা গিয়াছে—শেষ কার্য্য করার জন্য ব্রাহ্মণ লইয়া আইস" এইরূপ চিঠি পান। তিনি অনুকূলের সঙ্গে আসিয়া উপরে যান—সেখানে মৃতের মুখে মুখ রাখিয়া রাণীকে কাঁদিতে দেখেন। সেখানে কোন নার্স ছিল না,—তাহারা হয়ত নীচে কোথাও ছিল, কিন্তু উপরে ছিল না। ডাক্তার নিবারণ সেখানে ছিলেন—যদিও সত্যবাবুও নিবারণ ডাক্তার সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। রাজেন্দ্র শেঠ ও বিজয় বলে যে সেনিটেরিয়ামে প্রায় ১টার সময় চিঠি পায় এবং বিজয়ের সঙ্গে বাহির হইয়া আসেন। রাস্তায় কাছারী বাড়ীতে লোক ডাকার জন্য যান এবং কয়েকজন লোক বাহিরে আসিলে, তাহাদের লইয়া তিনটার পর ষ্টেপএসাইডে আসেন। এখানে আসিয়া ভোরের পূর্ব্বে মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হইবে কিনা এই সম্বন্ধে আলোচনা হইতে থাকে—এবং পরে স্থির হয় ভোর হইলেই লইয়া যাওয়া, কিন্তু ইহার কিছুই শেষ পর্য্যন্ত টিকে নাই। দেখা যায় যে, কেবলমাত্র সত্যবাবু দোটানা ভাবে বলিয়াছেন, প্রায় রাত্রি ৩টার সময় কতকগুলি লোক আসিয়াছিল। তিনি যে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন—তাহা কেবল খবর জানানোর জন্য, মৃতদেহ বহন করার লোকের জন্য নয়। কিন্তু তাহার ডাইরীই তাহাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে। তারিখে তিনি কুমার রমেন্দ্র মাঝ রাত্রিতে মারা গিয়াছে বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন,—তারপর তিনি ডাক্তারদের চলিয়া যাওয়ার কথা লিখিয়াছেন। তিনি মৃতদেহ লইয়া যাওয়ার জন্য সেনিটোরিয়ামে লোক পাঠানোর কথা লিখেন ও পরে তাহার মামার কাছে লোক পাঠানের কথা লিখেন। তাহার মামার প্রায় রাত্রি তিনটায় আসার কথা লিখা আছে।

৯ই তারিখে—দেখা যায় শেঠ—সেনিটোরিযামের যাত্রীদের লইয়া উপস্থিত হইল,—এম, এন, ব্যানার্জীর ছেলে বলেন, ফটিক, শ্যামদাসও আসিয়াছিল। অনেক কষ্টের পর মৃতদেহটি নামান হইল,—তারপর রেশমী কাপড় শাল ফুল দিয়া সাজান হইল শ্মশানের পথে ২০০৲ টাকা ছড়ান হইল। সেজোমামা ষ্টেপ এসাইডে বিভার কাছে রহিলেন—আমি শবের সঙ্গে গেলাম। বীরেন আগুন দিল, বেলা ২টায় ফিরিলাম।

অনুকূলের আর এক নাম ফটিক। বিভা মেজরাণীর নাম। যে সকল লোক শেষরাত্রে সেখানে ছিল তাদের মধ্যে মিঃ আর, এন, ব্যানার্জ্জি কিংবা তাহার মা কেহই ছিলেন না। অন্য আর একটী ঘটনা দিয়াও এই একই সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা নীচে বলিতেছি।

শব শোভা যাত্রা

সকাল বেলার শবযাত্রাটিকে প্রচার করার জন্য সমস্ত আয়োজন করা হইয়াছিল। কোন সম্পন্ন লোক বৃদ্ধবয়সে মারা গেলে যেমন জাকজমকের সঙ্গে পয়সা ছড়াইয়া, লাঠি সোটা লইয়া শবযাত্রা করা হয় এখানেও তেমনি করা হইয়াছিল—কিন্তু সম্পন্ন হইলেও এইরূপ আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে এইরূপ হওয়ার কোন কারণ ছিল না। এই দিনে কসিয়াংএ একটি শ্রাদ্ধ ছিল—এবং দার্জ্জিলিংএ প্রায় সমস্ত স্থায়ী বাসিন্দাই সকাল ছয়টার গাড়ীতে সেখানে গিয়াছিলেন। মিঃ আর, এন, ব্যানার্জ্জিও সেখানে গিয়াছিলেন এরূপ জবানবন্দী আছে। কেবল কেবাণীও জনকয়েক স্থায়ী বাসিন্দাই আসিয়াছিলেন। রবিবার বলিয়া সেদিন দার্জ্জিলিংএর বাজারবার ছিল। যেমন করিয়া ক্যালভার্টের শোক সূচক চিঠির যোগাড় করা হইয়াছিল, তেমনি করিয়াই যাহারা দাহে গিয়াছিল তাহাদের নামের ফির্ত্তিস্তি যোগাড় করা হইয়াছিল বলিয়া আমি সন্দেহ করি। ডাইরীতে সমস্ত গলদ ধরাইয়া দেয়—যদিও বলা হইয়াছে ডাইরীটি তখন লেখা নয়। তা না হইলে এভাবে দার্জ্জিলিংএর তদন্ত এরূপ ভাবে আরম্ভ ও চালিত হইত না।

বড়বাবু বড় ভুল

এখানেই সত্যবাবু একটি মস্ত ভুল করিয়াছেন। সাক্ষীর সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা তাঁহাকে অনেক দূর লইয়া গিয়াছে। ষ্টেপএসাইডের অপরদিকে মলভিলা। এখানে ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য বাস করিতেন। ইনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত চিকিৎসক—। প্রত্যেকে তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে লইয়া থাকে। নার্স জগৎমোহিনী সকলকে ডাকিতে যাইয়া ইহাকেও ডাকে। ১৯২১ সালে মুসৌরীতে তাঁহাকে কতিপয় প্রশ্ন করিলে—তিনি মি লিণ্ডসের নিকট একটি চিঠিতে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিয়াছেন।—

এইচ, এস, নাভার মহারাজা

মুসৌরী ২৪-৮-২১।

প্রিয় মহাশয়

আপনার ১৩৩ নং ডাবলিউ সি, চিঠি পাইয়াছি। আপনার প্রশ্ন গুলির যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে আমি ঐ ঘটনার প্রায় সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি এজন্য প্রায় প্রশ্নেই 'না' বলিতেছি।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ

৩। কুমারের মৃত্যুর পর কয়েক মিনিটের জন্য কুমার ষ্টেপসাইড ভবনে উপস্থিত ছিলাম। আমি শবযাত্রা কিংবা শ্মশানে উপস্থিত ছিলাম না।

৪। না, হ্যাঁ—আমি তাহার চেহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি।

৫। না, না, না।

৬। বলিতে পারি না।

৭। না।

৮। আমি মৃত্যু সময়ে কে উপস্থিত ছিল আমি বলিতে পারি না। আমি বলিতে পারি না। আমি সরকারী উকিল মিঃ এন্ ব্যানার্জ্জীর ছেলের দাহের যোগাড় করিতে দেখিয়াছিলাম।

৯। মৃত্যুর পরে আমিই প্রথম চিকিৎসক সেখানে গিয়াছিলাম তবু কুমারের কোন আত্মীয়ই আমার নিকট জানিতে চাহে নাই যে কুমারের জীবনান্ত হইয়াছে কিনা, আমার বেশ মনে আছে—ইহা তখন আমার নিকট খুবই আশ্চর্য্যজনক মনে হইয়াছিল। ভবদীয় বিশ্বস্ত

ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যকে কেন আনিল

ডাঃ আচার্য্য কমিশনে জবানবন্দী দেন। তখন বিবাদী পক্ষে এই চিঠি উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বর্ত্তমান প্রমাণের কোনও ক্ষতি করে না। তিনি বলেন তিনি চা খাইতেছিলেন এবং কেবলমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে, এমন সময় একজন অপরিচিত নার্স আসিয়া তাঁহাকে বলিল কুমার মারা যাইতেছেন কি গিয়াছেন। আপনি শীঘ্র আসিয়া দেখুন, এই কথা সে বলিয়াছিল—কুমার মারা গিয়াছেন, কি যাইতেছেন, কি বলিয়াছিল তাহা তাঁহার মনে নাই। তিনি প্রায় ৬টার সময় ষ্টেপএসাইডে পৌঁছিয়া দেখিলেন একটী মৃতদেহ সম্পূর্ণভাবে আবৃত রহিয়াছে। ঐটী কাহার মৃতদেহ তাহা তিনি জানেন না। হৃদপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া উহা মৃত কি জীবিত তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মৃতদেহের নিকটে গেলে সেখানের লোক তাঁহাকে বলিয়াছিল—'ছুঁবেন না—এটা ব্রাহ্মণের মৃতদেহ'। মৃতদেহটী খাটের উপর শায়িত ছিল বলিয়াই তাঁহার মনে হয়।

জেরাতে তিনি বলিয়াছেন—হয়ত ব্রাহ্ম বলিয়া ব্রাহ্মণের শব স্পর্শ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। সাক্ষী যখন বলিলেন যে ব্রাহ্মণ ও অন্য উচ্চ বর্ণের

দেহ মৃত্যুর পরে তিনি স্পর্শ করিয়াছেন তখন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হইল তিনি ভাওয়াল রাজপরিবারের কথা অবগত ছিলেন, কি না? এবং একথা জানা গেল যে ব্রাহ্মণগণকে মৃতদেহ বহন করিতে দেওয়া রীতি ছিল না? আসল কথা এই দাঁড়ায় যে কিজন্য সাক্ষীকে ডাকিয়া আনিয়া মৃতদেহ দেখাইয়া এবং স্পর্শ করিতে না দিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

দাহন কার্য্যে তাঁহার কোন দরকার ছিল না। কোন ডাক্তারই মৃতদেহ দেখার জন্য নিজ হইতে অত্যন্তউৎসুক হইয়া পীড়াপীড়ি করিতে পারেন না, ডাঃ আচার্য্য আপাদমস্তক ঢাকা একটী শবদেহ দেখিয়াছিলেন। খাটে শোয়ান থাকিলেও তাহা দোতালায় ছিল না।

কুমারের মৃতদেহ (?) মেজেতে পড়িয়াছিল। খাট ছিল কিনা এসম্বন্ধে ডাক্তারের স্মরণ নাই। কেবল এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় না যে মৃতদেহটী নীচে ছিল। বাড়ীর অন্যান্য লোকের জবানবন্দীতে ও যাহারা প্রাতঃকালে দেখিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহাদের কথায় বলা হইয়াছে যে ৭॥০টা বা ৭টায় মৃতদেহটী নীচে নামান হইয়া এবং রাণী ঐ দেহটী জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। পরে তাহা তাঁহার কাছ হইতে জোর করিয়া ছিনাইয়া নেওয়া হইয়াছিল। রাণী ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যকে দেখেন নাই এবং ডাক্তারের এই আগমনের কথা কেহই স্মরণ করিতে পারিতেছেন না—কিন্তু তাঁহার ওখানে যাওয়া অবিসম্বাদিত সত্য ঘটনা—এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বেলা ৮টা পর্য্যন্ত মৃতদেহটী উপরে ছিল, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা ছিনাইয়া নেওয়া না হইয়াছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাণী উহা জড়াইয়াছিলেন—এই গল্পটি একেবারেই মিথ্যা।

কমিশন সাক্ষীদের জবানবন্দীতে সত্য ঘটনার কিছু কিছু আভায পাওয়া যায়। মহেন্দ্র ব্যানার্জ্জী বলেন যে বারান্দার সংলগ্ন একটী ঘর হইতে মৃতদেহটী আনা হইয়াছিল এবং তিনি নীচের বারান্দায় ছিলেন। বিজয় ও বলে যে সে অন্য একটী ঘরে বসিয়াছিল, এবং সেই ঘরের ভিতর দিয়াই দেহটী বহন করিয়া আনা হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মৃতদেহটী নীচের একটী ঘরে ছিল। এণ্টনীমরেল বলেন যে, মৃতদেহটী নীচে নামাইয়া বারান্দায় সিঁড়ির গোড়ায় একটী খাটের উপরে রাখা হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে মৃতদেহটী নীচের বারান্দা দিয়া বহন করিয়া আনিয়া আঙ্গিনায় খাটের উপর রাখা হয়।

৭॥টা বা ৮টার সময় মৃতদেহটী যখন লোকজন আসিয়া লইয়া গেল ততক্ষণ

পর্য্যন্ত দেহটী উপরে ছিল এবং রাণী উহা আঁকড়াইয়া ছিলেন।—এই ঘটনাটি যে সর্ব্বৈব মিথ্যা তাহা আর একটী ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়। বলা হইয়াছে যে কাশীশ্বরী দেবী তখন সেখানে ছিলেন। এবং সেই মুহূর্ত্তে তিনি রাণীকে দেখাশোনা করিয়া ছিলেন। ঐ দিনের অনেক ঘটনাই এমন কি জগতমোহিনী দাসীর গঙ্গাজল আনা পর্য্যন্ত,—কাশীশ্বরী দেবীর সহিত জড়িত, কিন্তু আসল কথা হইল এই যে কাশীশ্বরী দেবী সেইদিন প্রাতঃকালে সেখানে মোটেই ছিলেন না। ডাইরীতে লেখা আছে যে মৃত দেহটি লইয়া যখন চলিয়া গেল, তখন মেজরাণী তাঁহার মামা সূর্য্য বাবুর তত্ত্বাবধানে রহিলেন। কাশীশ্বরী দেবী কোনও কথাই ডাইরীতে নাই। এই ডাইরীর কথাতেই ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হইতে পারে। কিন্তু আমি কেবল এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই তাহা করিতেছি না। শববাহী দল চলিয়া গেলে কি ঘটিয়াছিল, বিপিন খানসামা তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছে। রাণী মৃত দেহটি আঁকড়াইয়া ছিলেন এবং কাশীশ্বরী দেবী ও সূর্য্যবাবু তাঁহাকে জোর করিয়া উঠাইয়া লইলেন এই কথা বলিয়া সে বলিতেছে—

বিভাবতী তখন কি করিলেন

"রাণীকে তাঁহার শয়ন ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে তিনি নিজের গা হইতে অলঙ্কার গুলি খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিতে ছিলেন। আমি ঐ গুলি কুড়াইয়া লইয়া বিছানার একপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়া দিলাম। যেগুলি তিনি নিজে খুলিতে পারিলেন না, কেবল সেই অলঙ্কার গুলিই তাঁহার গায়ে রহিয়া গেল। সরকারী উকিলের স্ত্রী তখন তাঁহাকে স্নান করাইবার জন্য স্নানের ঘরে গেলেন। সেখানে তাঁহার স্নান করিলেন ও অবশিষ্ট অলঙ্কার গুলি খোলা হইল। সেইগুলি স্নানের ঘর হইতে আনিয়া আমার কাছে দেওয়া হইল ঐগুলি এবং পূর্ব্বে আমি যেগুলি কুড়াইয়াছিলাম—সমস্ত একত্র করিয়া একটি রুমালে বাঁধিয়াছিলাম। আমি যে সকল গহনাগুলি রুমালে বাঁধিয়াছিলাম তাহা সরকারী উকিলের স্ত্রী আমার হাতে দিলেন।

তারপরে কাশীশ্বরী দেবী মেজরাণীকে লইয়া তাঁহার বাড়ী গেলেন। যখন আমি এই জবানবন্দী শুনিতেছিলাম তখন এ ভাবিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম যে কি করিয়া এই বর্ষীয়সী মহিলাটি এই সময়ে এই বালিকাটিকে অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া দিতে দিয়া ছিলেন। কারণ এ অবস্থায় যে কোন বালিকার প্রথম শোকের আঘাত—হয়ত বা সহানুভূতির আশায়—অলঙ্কার খুলিয়া ফেলাই স্বাভাবিক। তখন বর্ষীয়সী মহিলারা গহনা পরিয়া থাকিতেই

অনুরোধ করে। সাধরণতঃ এইরূপই হয়। এবং শবদাহ শেষ করিয়া না আসা পর্য্যন্ত এই অলঙ্কার খোলা কখনও হয় না—কারণ বিধবা না হওয়ার কারণ তখনও বর্ত্তমান।

এই প্রথার প্রথমে অস্বীকার করিলেও আমার প্রশ্নের উত্তর সে এই প্রথার কথা স্বীকার করিয়াছে। যখন কাশীশ্বরী দেবীর সম্বন্ধে তাঁহার নিষ্ঠুরতার কথা ভাবিতে ছিলাম—তখন তাঁহার উপর অবিচারই করিয়াছি—তাঁহার সম্বন্ধে প্রত্যেকেই উচ্চধারণা পোষণ করিতেন। রাণী সত্যসত্যই তাঁহার বাড়ী গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে নয়। রাণী সূর্য্যনারায়ণ বাবুর সঙ্গে গিয়াছিলেন। সূর্য্যনারায়ণ বাবু বলেনটিলায় ভারাটে ছিলেন। সঙ্গে তাঁহার কোন পরিবাব ছিল না। কাজেই তিনি রাণীকে ঐ বাড়ীর অন্য মেয়েদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। গীতা দেবী ঐ মেয়েদের অন্যতম। তিনি তখন ঐ বাড়ীর বৌ। তিনি তাহার বিবৃতিতে রাণী আসিলে কি হইল তাহা বলিয়াছেন। তখন রাণীর গায় কোনও গহনা ছিল না। তিনি একটি সাধারণ চাকরদের পরনের ন্যায় ধুতি পরিয়াছিলেন।

আমার সর্ব্বস্ব পাহাড়ে রহিল

"আমি আমাব সর্ব্বস্ব পাহাড রাখিয়া গেলাম", বলিয়া রাণী কাঁদিতে ছিলেন। তিনি চাকরদের ন্যায় একটি কাপড় পরিয়াছিলেন। তাঁহাব শরীরে কোনও গহনা ছিলনা। মা বল্লেন,' বাছা এখনি গহনা গুলি খুলে ফেলেছ! রাণী বলিলেন, "তিনি (কুমার) আমাকে কখনও কোন গহনা খুল্‌তে দেন নাই —এখন কেহ খুলিতে বাধা দেয় না।" এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। একটু শান্ত হইলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ দুর্ঘটনা কেমন করিয়া হইল?" খুবসম্ভবতঃ রাণী বলিয়াছিলেন—ডাক্তার কালভাট তাহাকে চিকিৎসা করিতেছিলেন। মা বলিলেন, "তুমি কি একা ছিলে? ভাইদের খবর দিতে পারনি?" রাণী বলিলেন, 'তাহাদের খবর দেওয়া হইয়াছিল, কালও টেলিগ্রাম আসিয়াছে—"যত টাকা লাগে ইহাকে রক্ষা কর."

আমি এই সাক্ষীর প্রত্যেক কথাই বিশ্বাস করি। এখানে সত্যের রেশ্ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কাশীশ্বরী দেবীকে লইয়া ষ্টেপ এসাইডে সেদিন সকালের গল্পটি তৈয়ারী করিয়াছিল সে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কিছুই জানে না। রাণী যে সমস্ত গহনা ত্যাগ করিয়া দাসীর ন্যায় সেই বাড়ীতে আসিয়াছিলেন ইহাতেই প্রমাণ হয় যে তখন সে বাড়ীতে অপর কোনও স্ত্রীলোক ছিল না।

৩। কাশীশ্বরী দেবীর সঙ্গে সঙ্গে আর প্রায় সকল গল্পটাই মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

জগৎমোহিনী দাসী না দেবী, না, আর কিছু ?

জগত মোহিনী নামে—যে গঙ্গা জল লইয়া শ্মশানে গিয়াছিল—তাহার কথাই ধরা যাক। "কাশীশ্বরী দেবী আমাকে ডাকিয়া জুতা খুলিয়া রোজ ব্যাঙ্ক হইতে খানিকটা গঙ্গা জল আনিয়া শ্মশানে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন।" সে সেখানে মোটেই ছিল না। বিবাদীগণ এই স্ত্রীলোকটীকে দিয়া এতদূর পর্য্যন্ত বলাইয়াছে যে, সে জাতিতে চক্রবর্ত্তী—ব্রাহ্মণ। সে নিজে স্বীকার করিয়াছে যে সে নিজকে 'দাসী' বলিত, কোন ব্রাহ্মণের মেয়ে নিজকে 'দাসী' বলে না। সে গল্পের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য মিথ্যার পর কেবল মিথ্যা বলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার নিজের কথা হইতেই দেখা যায় সে হিন্দুই নয়। তাহার মামার কি উপাধি তাহা বলিতে পারে নাই। তাহার বাপের গ্রামের নাম শুনিয়াছে মাত্র। সে স্বীকার করিয়াছে যে, ঢাকা হাসপাতাল হইতে ধাত্রীবিদ্যা পাশ করিয়া সে দার্জ্জিলিংয়ে বাস করিতেছে। যে সমস্ত সাক্ষী তাহাকে চিনিত, তাহারা বলে যে সে একটী মুসলমানের রক্ষিতা—এবং মুসলমানের ন্যায়ই বাস করে। সে যে বাড়ীতে বাস করিত তাহাও খারাপ পল্লীতে। বাড়ীওয়ালার লোক তাহার বাড়ীভাড়ার রসিদ বই দাখিল করিয়াছে। তাহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, সে যাহা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল তাহা পারে নাই। সে দার্জ্জিলিংএ যাহা বলিয়া পরিচিত ছিল, নার্সের পোষাকে সেই নার্সই যদি হইত, তাহা হইলে কোনও হিন্দু তাহাকে শ্মশানে পবিত্র গঙ্গা জল লইয়া যাইতে বলিবে ইহা অসম্ভব।

আসল ব্যাপার হইতেছে এই যে, কোন রূপ অনুষ্ঠানই করা হয় নাই। বিবাদীগণ সমস্ত মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া গঙ্গা জলের কথা বলিয়াছেন। মৃত দেহটি খুলিয়া স্নান করাইয়া, কাপড় পরান হইল। শরীরের নয়দ্বারে সোনা দেওয়া হইল—চাল সিদ্ধ করিয়া চিতায় পূরক পিণ্ড দেওয়া হইল,—তারপর মুখাগ্নি করা হইয়াছে—এবং শেষে চিতা ধোওয়া হইয়াছে ইহা বীরেন ও অন্যান্য

পুরোহিত কোথায় ?

সাক্ষীদের কথা। কিন্তু পুরোহিত কোথায় ? শ্রীপুরের মামলায় বীরেন বলিয়াছে—বাড়ীর পাচক অম্বিকা পুরোহিতের কাজ করিয়াছে। কিন্তু

দার্জ্জিলিংএর আর একজন সাক্ষী শশী বাবু পুরোহিতের কাজ করিয়াছেন—এই বলিয়া ভুল করিয়াছে। অন্যান্য সাক্ষীও তাহার কথা সমর্থন করিয়াছে। মিঃ আর এন ব্যানার্জ্জিও তাহাদের কথা সমর্থন করিয়াছেন।

বীরেন তাহার পূর্ব্ব জবানবন্দি ঠিক রাখিতে যাইয়া পরে বলিয়াছে যে, অম্বিকা মন্ত্র পড়িয়াছে এবং শশী বাবু তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। বীরেন মুখাগ্নি করিয়াছিল কিন্তু সে স্নান করে নাই, অথবা জল আনিয়া পিণ্ড পাক করেনাই। জলের সম্বন্ধে পূর্ব্ব জবানবন্দি ঠিক রাখিতে গিয়া বাধ্য হইয়াই তাহাকে ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। সে বলে যে তখন তাহার জ্বর ছিল, ইহা মিথ্যা কথা—ইহাতে পিণ্ডের জন্য অল্প জল না আনিতে পারা বোঝা যায় না। যদি কোন পাদরী খৃষ্টানদের শেষ কার্য্য করিবার সময় হাফ্ প্যাণ্ট পরিয়া ও সার্ট গাযে উপস্থিত হন তাহা হইলে উহা যেমন অসঙ্গত ব্যাপার হয় ইহাও তেমন অসম্ভব। ডাঃ আশুতোষ পূর্ব্বে জানিতেন না যে এই পুরোহিতটি বাঙ্গালী কি পশ্চিমা (এক্জিবিট-৩৯৫-১)।

তারপর শবযাত্রির দল প্রায় ১০ টায় শ্মশানে পৌছিল—তারপর পিণ্ড পাক ও অন্যান্য ব্যবস্থা হইল। একজন সাক্ষীর কথামত মৃতদেহ নামাইয়া রাখিয়া তাহারা খানিক বিশ্রাম করিল এবং ৪টা কি ৫টার সময় শ্মশান হইতে ফিরিয়া চলিল। কিন্তু সত্য বাবুর ডাইরীতে আছে যে, তিনি শ্মশান হইতে ২টার সময় ফিরিয়া আসিলেন; তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে একটার মধ্যেই সমস্ত কাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল; ফিরিবার সময় চড়াইয়ের রাস্তাও আসিতেই এক ঘণ্টার বেশী লাগিযাছিল। অথচ মিঃ আর, এন ব্যানার্জ্জির কথামত তিনি ৪টা হইতে ৫টার মধ্যে শ্মশান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। গীতা দেবীর সাক্ষ্যে দেখা যায় যে ‘বলেনভিলার’ পাশ দিয়া যখন শবযাত্রা যাইতেছিল তখন তিনি মিঃ আর এন ব্যানার্জ্জিকে উহার সঙ্গে যাইতে দেখিয়াছেন। কিন্তু ঘটনায় যাহা প্রমাণিত হয় না, তাহার সাক্ষ্যে তাহা কখনও সত্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। এখানে তিনি সত্য কথা বলেন নাই।

ভাওয়ালের কুমার ফিরিয়া আসিবার কথা রাষ্ট্র হইলে তাহার শাশুড়ী ও দেবর যে কথা বলাবলি করিতেন এবং বলেনবাবু বলিতেন আমি নিজে গিয়া সাক্ষীদের—তিনি (কুমার) আমার সম্মুখেই মারা গিয়াছেন। মিষ্টার আর, এন, ব্যানার্জ্জির জবানবন্দীতে দেখা যায় যে ১৯১৯এ তাঁহার মা মারা যান এবং বলেনবাবু ১৯১৮ সালে মারা যান।

কাচারী বাড়ীতে তিনি (মিঃ আর, এন, ব্যানার্জ্জি) বিশেষ পরিচিত তিনি

এ শবদাহে অনেক কিছুই করিয়াছিলেন তবুও কোন একজন সাক্ষী ও তাহার কথা বলেন নাই। সত্যবাবুর ডাইরীতে তাহার কোন উল্লেখ নাই অথচ তাহার ভাইয়ের নাম আছে। তাঁর নিজের জবানবন্দীতেই প্রমাণিত হয় যে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। থর্ণ রোডের কথা গীতা দেবীকে সমর্থন করার জন্য পরে সাজান হয়। বসন্তবাবুং প্রথমে থর্ণ রোডের কথা বলেন। অথচ ছাপান প্রশ্ন পত্রে তিনি এই রাস্তা সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। আমার মনে হয় বসন্তবাবুর যখন ২।৬।২১ তারিখে জবানবন্দি হয় তখন থর্ণ রোডের কথা মোটেই উঠে নাই। বিবাদীপক্ষের সাক্ষীগণের জবানবন্দী হইতে মনে হয়, পথটী ঘোরাল এবং লম্বা এবং হস্পিটাল রোডের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ঐ রাস্তায় সাধারণতঃ কোনও শোভাযাত্রা যাইতে দেওয়া হইত না। একজন ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার—যিনি এখনও দার্জ্জিলিংএ বাস করিতেছেন তিনিও এই কথাই বলিয়াছেন। বীরেন্দ্র পূর্ব্বে বলিয়াছে যে, চৌরাস্তা পার হইয়া শবযাত্রাটি রেলওয়ে ষ্টেশন ও বাজারের মধ্য দিয়া গিয়াছে—অর্থাৎ কমার্শিয়াল রো রাস্তায় গিয়াছে। (একজিবিট ৩৫০)।

দার্জ্জিলিঙে কুমারের বেশভুষা

দুইজন ইউরোপীয় সাক্ষী—একজন কনফেক্‌সনার (confectioner) এবং অপরটী মিউনিসিপালিটির কর্ম্মচারী—দুইটী কথা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। একটী কথা যে শবযাত্রাটী 'থর্ণ' রোড দিয়া গিয়াছিল এবং অপর কথাটি যে কুমার সাহেবী পোষাক পরিয়া ইংরাজীতে খানা আনিতে বলিতেন, এবং বিলিয়ার্ড খেলার আবশ্যক দ্রব্যাদি সম্বন্ধে কথা বলিতেন। এই সম্বন্ধে যে সকল সাক্ষী জবানবন্দী দিয়াছেন, তাহার মধ্যে আশু ডাক্তার ও বীরেন্দ্র আছে। বীরেন্দ্র পূর্ব্বে বলিয়াছে, "কুমার সাধারণতঃ কাপড় দু'ভাজ করিয়া লুঙ্গির মত করিয়া পড়িতেন। এই বেশেই তিনি দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন এবং এই বেশেই তিনি দার্জ্জিলিংএ ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি সাহেবী পোষাক পরিতেন।" আশু ডাক্তারও বলিয়াছে দার্জ্জিলিং গিয়া কুমার বেশী বাড়ীর বাহির হন নাই, বাড়ীর আঙ্গিনায় তিনি সামান্য একটু চলাফেরা করিতেন (এক্‌জিবিট ৩৯৪)। বাদীর দুইজন সাক্ষী যাহারা কুমারকে বাড়ীর বাহিরে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার পরণে উজ্জ্বল লুঙ্গী দেখিয়াছেন। রাজেন্দ্র শেঠ (বিবাদীপক্ষের সাক্ষী) বাড়ীতে তাঁহাকে এই বেশেই দেখিয়াছে এবং সত্যবাবুকে সাহেবী পোষাক পরিয়া সোনালী কাজ করা টুপী মাথায় দিয়া

ইংরেজী কথার কায়দা অনুকরণ করিতে দেখিয়াছে। সত্যবাবুই কুমারের মত চলাফেরা করিতেন; যদিও এগুলি মোরেলের মারফত ডাক্তার কালভাটের এফিডেভিড্ অনুসারে, তিনি চৌদ্দ দিন ধরিয়া রোগ ভোগ করিতেছিলেন। তবুও বাদীর সাক্ষ্য নেওয়ার পর কুমার যে খানা খাইতেন, বিলিয়াড খেলিতেন এবং খুব সুস্থ ছিলেন এই কথা প্রমাণ করা দরকার হইয়া পড়িয়াছিল।

৯ই তারিখ সকালে শ্মশানে কি ঘটিয়াছিল, এবং শবযাত্রাটি কি রকমের ছিল এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যে যুক্তির উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে দুইজন সাক্ষীর কথা সত্য না হইলেও এ সম্বন্ধে আমি একটি কথা বলিব।

শিক্ষিতের শিক্ষিত মিথ্যা সাক্ষ্য

হারাণচন্দ্র চাকলাদার ইহাদের একজন। তাহার সাক্ষ্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ৯ই তারিখ ভোরে লোক ডাকিতে আসিলে তিনি সেনিটোরিয়াম হইতে ষ্টেপএসাইডে যান এবং শবযাত্রার সঙ্গে শ্মশানে গমন করেন, সেখানে শবস্নান, দাহ ইত্যাদি সংস্থ অনুষ্ঠান দেখিয়াছেন। মিষ্টার লিণ্ডসে যাহা স্বীকার করিয়াছেন—তিনি তাহা অস্বীকার করেন, যে তাঁহার নিকট যে সমস্ত প্রশ্ন করা হইয়াছিল তিনি তাহার জবাব দেন নাই। কাজেই ১৬।৯।২১ তারিখে সত্যবাবু মিষ্টার লিণ্ডসেকে তাঁহার নিকট লইয়া যান এবং মিষ্টার লিণ্ডসের নিকট তিনি একটা বিবৃতি দেন। কিন্তু সহি দেওয়া ত দূরের কথা মিষ্টার লিণ্ডসেকে তিনি ইহা লিখিয়া লইতেও দেন নাই। তিনি নিজেকে ধরাবাঁধা দিতে চান নাই। তাঁর কথামত দেখা যায় যে তখন তিনি একটা কুটীরে বাস করিতেন। মিষ্টার লিণ্ডসে ইহা লক্ষ্য করেন যে, সত্যবাবু, যিনি তাঁহাকে সাক্ষীর বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন, নিজে ঐ বাড়ীটী চিনিতেন না—যদিও তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, যে সাক্ষীর নাম সমস্ত বাংলা জুড়িয়া পরিচিত? বস্তুতঃ তিনি তেমন কিছু নহেন। **তাঁহার সাক্ষ্য মিথ্যারই পূর্ণ নিদর্শন।** তিনি কুমারকে জানিতেন না, কুমারের সঙ্গে তাঁর কাজ ছিল না, তবুও তিনি বলেন যে তিনি এমন একজন লোকের সঙ্গে গিয়াছিলেন যে এখন মৃত। তিনি বলেন যে মৃত্যুর ৫।৬ দিন পূর্ব্বে তিনি কুমারকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে কুমার শূলবেদনায় অসুস্থ, উহা তেমন সাংঘাতিক নয় এবং বাহিরের ঘরেই কুমারের দেখা পান। পূর্ব্বেও সময় সময় তিনি কুমারের পাকস্থলীর ব্যথা এই অসুখের সংবাদ শুনিয়াছেন। কুমার প্রায় সর্ব্বদাই অসুস্থ থাকিতেন—ইহা পূর্ব্ব প্রচলিত ও

অধুনা অপ্রচলিত মত—তিনিএই মতের পৃষ্ঠপোষন করেন এবং এই সাক্ষীই যে কাগজে কলমে ধরাবাঁধায় যাইতে অস্বীকৃত। তিনি বলেন যে মিষ্টার লিণ্ডসে অনুপস্থিতিতে যে বিবৃতি সম্বন্ধে নোট নিয়াছেন তাহা তাঁহার সাক্ষ্য দেওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহাকে দেখান হইয়াছে—বাদী তাঁহার ভাগনেকে দিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন, যাহাতে তিনি পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া জবানবন্দী দিতে পারেন।

ডাক্তার এস, সি, রায়ের জবানবন্দী সম্বন্ধে কিছুইতে বলিতে চাই না—উহা স্বতঃই মিথ্যা প্রমাণ করে—আমি এর এক বর্ণও বিশ্বাস করি না।

বসন্তবাবু ও রাধানন্দ স্বামী সত্য কথা বলিয়াছেন। দেহটী ঢাকিয়া শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাইয়া কোনরূপ অনুষ্ঠান না করিয়াই অতি তাড়াতাড়ি দাহ করা হইয়াছিল। কুমার সন্ধ্যার একটু পরে মারা যান এই সিদ্ধান্তই আমি সত্য মনে করি—কিন্তু কুমারের শবযাত্রার বিষয়ে সমস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত অন্য দিক দিয়াও সমর্থিত মনে হয়। ইহা হইতেই অস্বাভাবিক শবযাত্রা, ডাঃ আচার্য্যকে ডাকিয়া শব দেখান, দার্জ্জিলিংএর নিজস্ব সংবাদদাতার শোক সংবাদে জ্বর, রক্তক্ষয় ও পেটের বেদনায় ৯ই মধ্যরাত্রে কুমারের মৃত্যু, পরের দিনই শোকজ্ঞাপক চিঠি পাঠান, শ্মশানের জন্য কিছু টাকা দেওয়ার কথা—এবং মধ্যরাত্রে কুমারের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ডাইরী লিখিতে আরম্ভ করা এই সমস্ত ব্যাপারেরই অর্থ বোঝা যায়।

টাকা দেওয়ার কথা কে বলিয়াছিল তাহা এখন কেহই জানেনা। কিন্তু সেনিটোরিয়ামের মিষ্টার চন্দ ইহার কথা জানিতে পারেন, তিনি বড়কুমারের সঙ্গে একটি বিষয়ে চিঠি পত্র লিখিতে আরম্ভ করেন। সেনিটোরিয়ামের আরও টাকার দরকার, একটি শোক সভা করিয়া ঐ টাকা পাইতে চান। চিঠি লেখা লেখি হওয়ার পর এই সভা করার কোন তাগিদ দেখা যায় না। সভার সেই কার্য্য বিবরণী হইতে বুঝা যায় মিঃ হারাণচন্দ্র চারলাদার সেখানে ছিলেন না। কিন্তু তিনি বলেন যে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেনে।

জীবন বীমার টাকা উঠানের জন্য যে শব দাহের সার্টিফিকেট্ লওয়া হইয়াছিল, তাহাতে ইহাই বোঝা যায় যে ৯ই তারিখ সত্য ও কেব্রাল একটি মৃত দেহ দাহ করিয়াছে। কেব্রালের স্বাক্ষরটি অতি সন্দেহ জনক,—কেব্রাল দার্জ্জিলিংএই ছিল এবং দার্জ্জিলিংএর দলে যাহারা ছিল তাহারা প্রত্যেকেই কি ঘটিতে ছিল জানিত। কিন্তু যদি ধরিয়া নেওয়া যায় যে সত্য সত্যই মৃত্যু ঘটিয়াছিল তবুও জয়দেবপুরে উপস্থিত হইয়া আ নাদিগকে তিরস্কারের হাত

হইতে বাঁচাইবার জন্য এই মিথ্যা শবদাহ তাহারা কিছুই মনে করিত না। এই ভাবে পরিবারের সম্মুখে গিয়া কুমারের মৃত দেহ দাহ করা হয় নাই বলা বড়ই শক্ত। কিন্তু তাহারা পরস্পর একথা বলাবলি করিত, এবং এইরূপ বলাতেই আমি এখন দেখিতেছি যে শ্রাদ্ধের সময় কুশপুত্তলিকার কথা উঠে। এই কথা যদি তখন না উঠিত তাহা হইলে রাণীসত্যভামা দেবী ১৯১৭ সালে বর্দ্ধমানের মহারাজার নিকট অনুসন্ধ্যানের জন্য লিখিতেন না। এবং ১৯২২ সালে মেজ রাণীর নিকট চিঠিতে একথার উল্লেখ করিতেন না।

বিবাদী গণের একজন পুরানা আমলাকে কুমারের মৃত্যুর জন্য কাচারীর কাজের আদেশ দেন। এখানে কুমারের মৃত্যুর সময় মধ্যরাত্র বলাইয়াছে। তাঁহারা কালিগঞ্জ স্কুল সাবকমিটির মেম্বার রায়সাহেব উরমশচন্দ্র ধর বাহাদুরকে শোক সূচক প্রস্তাব করিয়া এই সময়টা উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন। রায়সাহেব তাঁহার কমিশনে জবানবন্দিতে বলিয়াছেন—শোক সভায় এই মৃত্যু সময় একটা টেলিগ্রাম হইতে দেখিয়াছেন। স্থানীয় নায়েব তাঁহাকে সেই টেলিগ্রাম দেখিতে দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখা গেল যে ঐ সময় কালিগঞ্জে কোনও টেলিগ্রাম আফিস্ ছিলনা, তখন তিনি তাঁহার পূর্ব্ব মন্তব্য বদলাইয়া ফেলেন। এই সভাতে এবং ইহার বিবরণীও আর কেহই বক্তৃতা দেয় নাই—এমনকি বাদীর তরফ হইতে যে মেম্বার (পার্শ্বনাথ বিশ্বাস্) নিযুক্ত ছিল তাহাকেও দেওয়া হয় নাই। রায়সাহেব বিবাদীগণের হাতের লোক—তাঁহার আত্মীয়েরা এষ্টেটের অধীনে আম্‌লা। তাঁহাকে কালেক্টর সাহেবের নিকট একটি মিথ্যা শোক সভার বিষয় লিখিয়া পাঠাইতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই সভায় কেহই বক্তৃতা দেয় নাই—এমন কি ফণীবাবুও নয়, যদিও তিনি এই মোকর্দ্দমায় সাধুর মতও পক্ষ পোষণ করেন। (এক্‌জিবিট—২২৩) এই শোক সূচক প্রস্তাব—টেলিগ্রাম গায়েব কথা, এই সকল হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে কুমার সন্ধ্যার পরই মারা যান। যদিও পূর্ব্বোক্ত আমলাটী, কিরূপে কাচারী বন্ধের আদেশ কাচারীতে না থাকিয়া তাহার নিকট আসিয়াছিল তাহা বুঝাইতে পারন নাই—তবুও ঐ কাচারী বন্ধ সম্বন্ধে এই এক কথাই খাটে। জয়দেবপুর এষ্টেটের তরফ হইতে এমন কোন কাগজ পত্র দেখান হয় নাই যাহাতে জানা যায় যে মধ্য রাত্রিই কুমারের মৃত্যু সময়—কেবল মাত্র এক জায়গায় যে কুমার রাত্রে মারা গিয়াছেন—যদি এ লেখাটা সত্য বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায়। সত্য বাবুর কথামত বাঙ্গালী সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত সমস্ত সময়টাকেই রাত্রি বলে।

চিতাভস্মে মঠ

আর এক যায়গায় দেখা যায় যে দ্বিতীয় কুমারের অস্থি গঙ্গায় পাঠান হইয়াছিল। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে মেজ কুমারের অস্থি বলিয়া কতকটা ভস্মাবশেষ আনা হইয়াছিল।

বীরেন্দ্র বলিল যে ঐ ভস্মাবশেষ হাড়ের টুকরা মাত্র। কিন্তু মিষ্টার আর, এন, বানার্জ্জির কথামত উহা নাভির দগ্ধাবশেষ—রবারের ন্যায় একটা জিনিষ ছিল। কিন্তু ইহা হইতে একটা মৃত দেহ দাহ করা হইয়াছিল ছাড়া আর কিছুই প্রমাণিত হয় না। কুমারের ভস্মাবশেষের উপর স্মৃতি মন্দির নির্ম্মাণের প্রস্তাব সম্পর্কে, মিষ্টার জে, এন, গুপ্ত আই, সি, এসের লেখা হইতে ইহাই দেখা যায় যে দ্বিতীয় কুমারের ভস্মাবশেষ আনা হয় নাই। এই সম্বন্ধে যে কথা উঠিয়াছিল- তাহা শুনিয়াই তিনি ইহা লিখিয়াছিলেন। এটা তাঁহার অনুমানও হইতে পারে। কিন্তু আমি যে যুক্তির অবতারণা করিলাম তাহাতে এই সমস্তই খণ্ডিত হইয়া যায়—এবং ইহাই প্রমাণ করে যে কুমারের মৃত্যু রাত্রেই হইয়াছিল এবং রাত্রেই শবযাত্রা করা হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত বিষয় হইতে বাদী ও কুমার যে একজন নয় তাহা বোঝা যায় না। ইহা সাক্ষ্যের ও শরীরের চিহ্নগুলির উপর নির্ভর করে। এই চিহ্নগুলি স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। কুমারের এই মৃত্যু সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে ঘটিয়াছিল—এবং প্রায় দশটায় মৃতদেহ শ্মশানে নেওয়া হইয়াছিল—কিন্তু কখনও দাহ করা হয় নাই। সত্য বাবু বলেন যে একথা ঠিক নয় যে মৃতদেহ খুঁজিয়া আনিয়া পরদিন সকালে পুনরায় শ্মশানে আনা হইয়াছিল।

যদি ঐ দেহের পরিচয় ঠিক ভাবেই নেওয়া যাইত, তাহা হইলে পরদিন সকালে অপর শবদাহের কোন স্বার্থকতা থাকিত না। প্রত্যেকেই এই অসম্ভবটী কথার কথা জানিত, কিন্তু ইহাতে ঐ দেহের পরিচয় ও আনুসঙ্গিক ঘটনা সকল—যেমন কাশীশ্বরী দেবী—তাঁহার এ ব্যাপারে অংশ—আনুসাঙ্গিক অনুষ্ঠান—এবং বাদীর আগমনের দশ দিনের মধ্যেই সাক্ষী যোগাড়ের জন্য সত্যবাবুর বেমালুম ভাবে দার্জ্জিলিং ছুটিয়া যাওয়া—এই সমস্ত হইতেই দেখা যায় যে, ঐ শবদাহ সাধারণ রকম নয়। সত্যবাবুর পরের জবানবন্দী ও তাহার ডাইরীতে ও উহার অস্বাভাবিকতা প্রমাণ করে না। এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঝড় বৃষ্টির জন্য মৃত দেহটি শ্মশানে পরিত্যক্ত হওয়ার পরে তাহা উধাও হইয়া যাওয়াতেই ইহা প্রমাণিত হয় না যে ঐ দেহে জীবন ছিল।

বাদীর অঙ্গ সৌষ্টব, তাহার শরীরে দাগ এবং যে সব সাক্ষী বাদীকে মেজ কুমার বলিয়া চিনিয়াছে—তাহাদের সাক্ষ্য হইতেই বাদী ও মেজ কুমার যে একই লোক ইহা যথার্থরূপে প্রমাণিত হয়। এই সমস্ত সাক্ষীকে আমার বিশেষ পরীক্ষার পরেও টিকিয়াছে এবং কেবলমাত্র বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই উহা গ্রাহ্য করা উচিত হইলেও আমি তাহা করিতেছি না। তবু যে সমস্ত লোকের সাক্ষ্যে ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে দেহটা জীবিত ছিল, কুমারকে চারিজন সন্ন্যাসী লইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের সঙ্গে কুমার ঢাকা আসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১২ বৎসর ছিলেন—তাহা উল্লেখ করিতে চাই। কেহই এই সাক্ষী ও বাদীর পরিচয়ের এই প্রমাণ অন্যরূপ প্রমাণ হইলে গ্রহণ করিত না—কিন্তু এই পরিচয় গ্রহণ করিলে তাহা প্রত্যাখ্যান করার কোন কারণ নাই।

সন্ন্যাসী কুমারের বিবৃতি

বাদী বলেন ষ্টেপ এসাইডে অজ্ঞান হইয়া যাওয়ার পর জ্ঞান হইলে একটী কুটীরে চারিজন সন্নাসীর সহিত নিজেকে দেখিতে পান। ঐ সন্ন্যাসীগুলি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দার্জ্জিলিং ছাড়িয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তাহার যত্ন ও শুশ্রূষা করিত। এই চারিজন সন্ন্যাসীর মধ্যে ধরমদাস নাগা একজন—যিনি পরে তাহার গুরু হন; এবং অপর তিনজন,—পিতমদাস, লোকদাস, ও দর্শনদাস—সকলেই নাগা এবং সকলেই পূরাপূরি সন্ন্যাসী। ঘটনার এই অংশটীর সম্বন্ধে আমি অনতিবিলম্বে মন্তব্য করিব। কিন্তু সন্ন্যাসীদের একজন দর্শনদাস এই উদ্ধারের একটী বিবরণ দিয়াছেন। ইহা কেবল তাহার জবানবন্দীতেই পাওয়া যায়। শেষের দিকে অন্য তিনজন সাক্ষীও উহার সমর্থন করিয়াছে, ইহাতে বাদী পক্ষের প্রচুর সাক্ষীর কথা ছাড়া অন্য কোন পরিচয় প্রমাণ করিতে পারে না। কিন্তু এই পরিচয় মিথ্যা বলিয়া ধরিয়া লইলেও এই অশিক্ষিত সাধু পরিষ্কার ও সুন্দর বিবরণ দিয়াছে উহা জেরাতেও অন্যরূপ হয় নাই। দার্জ্জিলিংএ ঐ স্থানে না গেলে এবং কেহ উহা শিখাইয়া দিলে এত

সূক্ষ্মভাবে ঐ বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে না। তবু আমার মনে হয় শিখানো সাক্ষী ঘাব্‌ড়াইয়া যাইত। সে তাহা যায় নাই। সে ধীরভাবে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সমস্ত বিষয় তাহার স্মৃতি হইতে মনে করিয়া তাহার বিবরণ দিয়াছে। এই বিবরণ অশিক্ষিত লোকের স্মৃতি হইতে বিবৃত বিবরণের মতই ঘটনা বহুল।

তাহার বিবরণ এইরূপ ঃ—সে এবং বাদীর গুরু ধরমদাস নাগা হরনামদাস পাঞ্জাবী নামক একই গুরুর চেলা। তাহারা অন্য দুইজন সন্ন্যাসীর সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে দার্জ্জিলিংএ আসিয়াছিল। এই চারিজন সন্ন্যাসী দিনের বেলায় বাজারে কাটায়। কিন্তু রাত্রে একটি নির্জ্জন জায়গায় কাটাইতে চায়। এই জন্য পুরাতন শ্মশানের পশ্চিম দিকের একটী পাথরের গুহায় স্থান নির্ব্বাচন করে। তারপর একদিন যাহা হইয়াছিল তাহা সাক্ষীর নিজের কথায়ই বলি।

নাগা সাধুর সাক্ষ্য

"দার্জ্জিলিংএ আমার যখন সেখানে ছিলাম তখন একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। একদিন একপ্রহর রাত্রির পর যখন আমরা বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছিলাম তখন আকাশে মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। একটু পরেই বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই সময় আমি 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। বাবা লোকনাথজী বলিলেন, 'নেকু বাহিরে যাইয়া দেখ।' তিনি আমা অপেক্ষা বড় বলিয়া আমাকে নেকু বলিয়া ডাকিতেন। বাহিরে আসিয়া অনেক লোক দেখিলাম। এই লোকদের সঙ্গে লণ্ঠনের আলো ছিল।

বাবাজি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি দেখলে ?'

আমি বলিলাম, অনেক লোক। তিনি বলিলেন অনেক লোক ? তুমি কি করিবে ভিতরে আইস। আমি তখন গুহার ভিতরে গেলাম। তখন জোরে বাতাস বহিতেছিল এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আমরা বসিয়া

ভগবানের নাম লইতেছিলাম। অনেক রাত্রে বাবাজি আমাকে বলিলেন—বাহিরে অনেক হরিধ্বনি করিয়াছিল কিন্তু এখন ত কিছুই শুনি না। একবার আগে বাহিরে যাইয়া দেখা উচিত। আমি বাহিরে যাই। তখন বাতাস ছিল না—অল্প অল্প বৃষ্টি ছিল। আমি শ্মশানে একটা শব্দ শুনিতে পাই—আমি অপেক্ষা করি—আবার শব্দ শুনি, আবার অপেক্ষা করি—আবার শব্দ শুনিতে পাই। তখন বাবাজীকে শব্দের কথা বলি। তিনি বলেন কিসের শব্দ? আমি বলি 'জানি না—বাহিরে আসুন।'

বাবা লোকনাথ দাস বাহিরে আসিয়া বলিলেন—'কোথায় শব্দ'? আমি বলিলাম 'এই পূর্ব্বের দিকে'। বাবাজী বলিলেন, 'তাড়াতাড়ি লণ্ঠন লইয়া আইস'।

আমি লণ্ঠন লইয়া গেলে—লোকনাথ দাস বাবাজী বলিলেন 'আমার সঙ্গে আইস।' আমরা দুইজনে শ্মশানে গেলাম। লোকনাথ লণ্ঠন ধরিতে বলিলেন আমি একটি খাটিয়ার উপরে লণ্ঠনটা ধরিলাম। খাটিয়ার উপরে একটা লোক শায়িত ছিল। বাবাজি বলিলেন লণ্ঠনটা এইভাবে ধর। আমি তাহা এই ভাবে ধরিলাম। (দেখাইল)। বাবাজি বলিলেন আমি খুলিতেছি—বাবাজি মাথার দিক হইতে কাপড় তুলিয়া ফেলিলেন এবং কাপড় খুলিয়া পায়ের দিকে সরাইয়া দিলেন—উহার নীচে মশারির দড়ির মত দড়ি দিয়া আর একখানা কাপড় বাঁধা ছিল। উপরের কাপড়খানা খাটিয়ার পায়ার সঙ্গে বাঁধা ছিল। বাবাজী উপরের কাপড়খানা খুলিলেন। তারপর বাবাজী মানুষটীর মুখের উপর হাত দিলেন (মুখে নাকে হাত দিয়া দেখাইল)। বাবাজী বলিলেন, 'দেকু, মানুষটি বাঁচিয়া আছে।'

তিনি বলিলেন, অপর সাধুকে ডাক। (লোকনাথ) ঐখানে রহিলেন এবং আমি আর এক সাধুকে ডাকিতে গেলাম। আমি সাধুকে বলিলাম, বাবাজী তোমাকে ডাকিতেছেন।' তখন অপর দুইজন সাধু আমাদের সঙ্গে আসিলেন। লোকনাথ বাবাজী বলিলেন, 'এই মানুষটী বাঁচিয়া আছে। ইহাকে কোথায় লইয়া যাইব। আমাদের ওখানেও বেশী জায়গা নাই—যাহা হউক লইয়া চল।

যে সমস্ত কাপড়চোপড গা ঢাকা ছিল তাহা আমরা ঐখানে ফেলিয়া দিয়া চলিলাম—বাবাজী বলিলেন, তাড়াতাড়ি কর বৃষ্টি হইতেছে। (আমরা যখন দেহটী বহন করিয়া লইতেছিলাম, তখন শীতে এই রকম করিয়া কাঁপিতেছিল। (দেখাইলেন) এবং হুঁ হু করিয়া শব্দ করিতেছিল। আমরা পাহাড়ের নীচে যেখানে থাকি তাহাকে সেখানে লইয়া চলিলাম। লোকনাথ বাবাজী বলিলেন এ শীতে কাঁপিতেছে। ইহার কাপড়চোপড় খুলিয়া ফেল। তাহার গায়ে গেঞ্জি ও অন্যান্য জামা ছিল—ঐগুলি ভিজিয়া গিয়াছিল। বাবাজী বলিলেন—'শুকনা কাপড় দিয়া ইহাকে জড়াইয়া ফেল। আমি ঐরূপ করিলাম। বাবাজী বলিলেন, একটী কম্বল দিয়া ইহাকে জড়াইয়া দাও। তারপর তিনি বলিলেন, 'নীচের ঘরে লইয়া চল' অর্থাৎ পাহাড়ের আরও নীচে একটা ঘর ছিল।

বাবাজী বলিলেন, খুব বৃষ্টি পড়িতেছে, ইহার কাপড় চোপড় আবার ভিজিয়া যাইবে—আর একখানা কম্বল লও'।

তখন আমরা চার সাধু লোকটীকে লইয়া চলিলাম আমরা তিনজন উহাকে ধরিলাম এবং পিতমদাস—যে একটু দুর্ব্বল ছিল—লণ্ঠন ও চিম্‌টা লইয়া আগে আগে চলিল। আমরা তাহাকে লইয়া ঘরে পৌছিলাম। কিন্তু ঘরে তালা দেওয়া ছিল। লোকনাথ বাবাজী বলিলেন 'বৃষ্টি পড়িতেছে—এখন চাবি পাইবে না—চিমটা দিয়া খোল।' চিম্‌টা দিয়া শিকল তুলিয়া ফেলা হইল—কিন্তু তালাটি ঠিকই রাহিল। আমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম—আমাদের লণ্ঠন ছিল এবং ঘরের মধ্যে একটি খাটিয়া দেখিলাম। লোকনাথ বাবা বলিলেন, 'ইহাকে খাটিয়ার উপর শোওয়াও। আমরা মেজেতেই থাকিব।'

ইহার বিবৃতি এইভাবে চলিয়াছে। জেরায় আরও সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—কোথায় গরমিল নাই। এই সময় মধ্যে দার্জ্জিলিংএর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৯১২ সালে সুধীবকুমারী রোড তৈয়ারী হইলে শ্মশানে স্মৃতি সমস্ত মুছিয়া গিয়াছে, তবুও ইহার দেওয়া দার্জ্জিলিংএর বিবরণ খুবই বিশদভাবে দেওয়া। এই লোকটী দার্জ্জিলিং যায় নাই এবং নক্‌সা

পড়িতে অভ্যস্ত বলিয়াও মনে হয় না। ইহার বিবৃতি রূপকথার ন্যায় আশ্চর্য্যজনক। বাদী যদি ইহার সাক্ষ্যের উপরই নিজের পরিচয় প্রমাণ করিতে চাহিতেন তাহা হইতে তিনি অকৃতকার্য্য হইতেন কারণ ইহার বিবৃতিতে তিনি যে কুমার এমন কোন কথা নাই।

পরেরটুকু—অল্প কথায় বলা যায়। সন্ন্যাসীরা সেই ঘরই সেই লোকটিকে রাখেন। পরের দিন সকালে সেই কুটিরের মালিক তাহাদিগকে দেখিতে আসেন এবং কম্বল তুলিবার ও কবিরাজী ঔষধের কারখানার মত এক জায়গা হইতে তাহাদিগকে কম্বল আনিয়া দেন। কিন্তু এখানে লোকের ভিড় হওয়ার জন্য তাহারা অজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ঐ লোকটিকে লইয়া আরও নীচে অন্য এক কুটিরে চলিয়া যান।

এখানে তাঁহারা ১৪।১৫ দিন থাকেন তারপর দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করেন। উদ্ধারের ২।৩ দিন পরেই লোকটির জ্ঞান ফিরিয়া আসে। কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পরে তিনি কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করিলেও বোবার ন্যায় ব্যবহার করেন। অপর তিনজন সাক্ষীও এই অংশের পোষকতা করেন।

গিরিজাভূষণ রায় ইঁহাদের একজন—ইনি কলিকাতায় কণ্টাক্টার ও কাষ্ঠ ব্যবসায়ী। অপর দুইজন কবিরাজ শ্রীশগুপ্ত ও বিজয়—ইহার আত্মীয়। গিরিজাবাবু বলেন যে তাঁহার মামা একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী। জাজ্‌বাজারে তাঁহার মামার কবিরাজী দোকান ছিল এবং ঔষধ পত্র তৈয়ারী করার জন্য স্যন্দর বঙ্গ রাস্তার উপর—শ্মশানের পশ্চিমদিক চার কামরা বিশিষ্ট একটি কুটির ছিল। শ্রীশ বাবুর সঙ্গে গিরিজাবাবুর তখন কোনও আত্মীয় সম্পর্ক ছিল না। শ্রীশবাবুকে এই ঔষধের কারখানার ভার দেওয়া হইয়াছিল—তিনি এই কুটীরের একটী ঘরে বাস করিতেন। অন্য একটী কোঠায় গিরিজাবাবুর কম্বল বোনার তাঁত ইত্যাদি ছিল। এই কুটীরের নিকট গুদামের মত আর একটী কুটির ছিল। গিরিজাবাবু ১৯০৬ সাল হইতে ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিংএ বাস করিয়াছেন। তিনি বলেন, খবর শুনিয়া সেই গুদামে গিয়া চারিজন সন্ন্যাসী ও একটী রুগ্ন

লোককে দেখিতে পান। সন্ন্যাসীরা তাহাকে বলেন যে, এই রুগ্ন লোকটী তাহাদেরই একজন এবং ইহার রোগের অসুখের জন্য এখানে আসিতে হইয়াছে, জন্য মার্জ্জনা চাহিলেন। খাটীয়ার উপর শায়িত অজ্ঞান লোকটীর প্রতি তিনি বিশেষ কোনও নজর দেন নাই। সন্ন্যাসীদের অনুরোধে তিনি তাহাদিগকে একটা কম্বল আনিয়া দেন, এবং তাহাদের যতদিন খুসী ততদিন সেখানে থাকার অনুমতি দেন। বিবরণটী পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী এবং কারখানার কবিরাজ মহাশয় ও বিজয়বাবু উহা সমর্থন করেন। বিজয়বাবু দার্জ্জিলিংএ ছিলেন। কিন্তু প্রায়ই তাঁহার কাছে আসিতেন। বিজয়বাবু সাহেবের বাগান বেড়া দেওয়া চাষের জায়গার মধ্যে এই কারখানাটীর স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই শেষের ডুইটী সুন্দর বঙ্গের যাওয়ার রাস্তার পশ্চিমের দিকে। তিনি বলেন এই জমিটী বর্দ্ধমানের রাজার অধীনে ছিল এবং কার্টরোড় একটা জায়গা হইতে আঁকাবাঁকা রাস্তায় সেখানে যাওয়া যাইত। এই যায়গাটা রোজ ব্যাঙ্কের ডান দিকে এখান হইতে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরিয়া গেলে গিরিশবাবু নামক এক ভদ্র লোকের বাড়ী পাওয়া যায়। বাড়ীটির নাম টাউন এণ্ড। এখান হইতে সুন্দর বঙ্গের দিকে যে রাস্তাটি গিয়াছে তাহার উপরই কারখানাটী ছিল। তিনি নক্সায় এই যায়গাটী N লিখিত যায়গার কাছে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। গিরীশবাবুর বাড়টী M লিখিত যায়গার কাছে বলেন। ইহা দ্বারা অন্ততঃ তিনি পরেরটীর সম্বন্ধে ভুল করিতেছেন। বিবাদীরা ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে—যেখানে কারখানা ছিল বলা হইয়াছে, সেখানে কোনও কুঠির ছিল না—বর্দ্ধমানের মহারাজের সেখানে কোনও জমি নাই,—সুন্দরবঙ্গের রাস্তাটী কাগঝোরা কাপুর রোডের দক্ষিণে। কাজেই কারখানার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও কাগঝোরা পার না হইয়া কেহই কারখানায় যাইতে পারে না। গিরিজা বাবু ইহার একটী অংশ ছাড়া অন্য অংশ পার হওয়ার কথা বলেন নাই। দর্শনদাসও প্রথম কুটীরে আসার সময় কাগঝোরা পার হওয়া সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। বিষয়টি অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য। মিষ্টার মরগিষ্টাইনের নিকট লিজ লওয়ার জন্য যেটুকু দরকার তাহা ছাড়া সে সময়কার অন্য কোনও নক্সা পাওয়া যায় না। এই সময় তাহার দরকার অনুযায়ী বিষয়টুকুই কেবল দেওয়া আছে।

বিবাদীগণ ১৯০৯ সালে কাগঝোড়া ও বেঙ্গুইন মোড়া মধ্যে কোনও কুটীর ছিল একথা প্রমাণ করিতে তিনজন সাক্ষী আনিয়াছে। মিষ্টার মর্জ্জিস্‌ষ্টাইম তাহাদের অন্যতম। তখন তাঁর বয়স দশ বৎসর মাত্র। তিনি যখন বলিলেন পুরাতন সুধীরকুমারী রোড নূতন শ্মশানের ভিতর দিয়া পশ্চিম দিকে চামড়ার কারখানা পর্য্যন্ত গিয়াছে—তখন তিনি পরের অবস্থার কথাই বলিতেছেন। ইহা ও শ্মশান ও কারখানা কমিটির বিবরণ ও মিউনিসিপ্যালিটির আমলা সামসুবদ্দিনের সাক্ষ্য হইতেই বুঝা যায়। এই প্রশ্ন উঠার অনেক পূর্ব্বেই 'টাউন এণ্ড' বাড়ীর মালিককের সাক্ষ্য হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন এই বাড়ীটি কাগাঝোড়ার দক্ষিণে এবং শ্মশান হইতে ১০০ কি ১৫০ গজ দূরে। গিরিজাবাবু যাওয়ার পরে দার্জ্জিলিংএর একখানা বর্ত্তমান নক্‌সা বাহির করা হইয়াছে। অনূপ বাবুর (বিবাদী পক্ষের ৪১১নং সাক্ষী) কথামত আমার আমারও সন্দেহ হয় ২৩৫০ লিখা বাড়ীটি টাউন এণ্ড বাড়ী কি না? অনূপ বাবু বলেন তিনি যে বাড়ীটি দেখাইয়াছেন তাহা শ্মশান হইতে ৫০০ গজেরও বেশী দূরে কিন্তু তাহা সেখানেই ধরিয়া লইলেও ইহা যে কাগাঝোড়ার দক্ষিণে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। এখানে কাগাঝোড়া সহজেই হাটিয়া পার হওয়া যায়। ১৯১২ সালে ব্রিজ হওয়ার পূর্ব্বে ঢালু জায়গা দিয়া নীচে নামিয়াই উহা হাটিয়া পার হইত। অনূপবাবুর কথামত এই ঢালু যায়গাগুলিতেও রাস্তা ছিল এবং কগোঝোড়ার অনেক নীচের দিকেও জল কম ছিল। যাহা হউক —জিনিষটি অতিশয় দুর্ব্বোধ্য। তবু আমি বলিতে পারি না যে বিষয়টি হইতে কোন প্রমাণযোগ্য বিষয় বাদ দেওয়া হইয়াছে অথবা কোন জিনিষ অপ্রমাণিত হইলেও তাহার পরিচয় গোপন রাখিয়াছে। দর্শনদাসকে উক্ত গল্পটি সাজাইয়া বলার জন্য সাজান লোক বলা হইয়াছে—আরও বলা হইয়াছে তাহার ফটো কোর্টের ফাইলে আছে—কিন্তু দর্শনদাস তাহা অস্বীকার করে। পরে তাহাকে ধরমদাসের একই গুরুর চেলা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। দর্শনদাস তাহার নিজের বাড়ীর তাহার গুরু হরনাম দাসের সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছে তাহা হইতেই একটি লোককে বাদীর গুরু ধরম দাস বলিয়া সাজাইয়া এই কোর্টে সাক্ষ্য দিতে আনা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমি অনতি-বিলম্বেই মন্তব্য করিব।

প্রথম লাইনের বামদিক হইতে—হেনী (কুমারের ভাগিনেয়ী), বিল্লু, টেব্বু, বুদ্ধু, জব্বু (কুমারের ভাগিনেয়)। দ্বিতী লাইনে উপবিষ্ট —মটর, ইন্দুময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী (কুমারের ভগ্নী)। তৃতীয় লাইনে—ভাগিনেয়ী মণি, বুদ্ধুর স্ত্রী, বিল্লুর স্ত্রী ও ভাগিনেয়ী কেনী। চতুর্থ লাইনে—বালক বালিকাগণ

১৯০৯ মে হইতে ১৯২০ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীর জীবন

এই সময় মধ্যে কুমারের নাম শোনা যায় নাই বা কোথায় আছেন তাহাও জানা যায় নাই। কুমার জীবিত আছেন এই গুজব থাকা সত্ত্বেও কেহ তাহাকে জীবিত বলিয়া মনে করে নাই। আমি উপরে এই সময়ের যে বর্ণনা দিয়াছি তাহাতে দেখা যায় যে কুমারের মৃত্যু সর্ব্বজন স্বীকৃত ঘটনা। বাদী নিজের এই সময়ের যে বর্ণনা দেয় তাহা কেবল তাহার নিজের ও দর্শনদাসের কথার উপরই নির্ভর করে। ইহাতে অন্য ভাবে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি করে না। তাহার এই বর্ণনার জন্যই সে মেজ কুমার বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা নহে—সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা এইরূপ।

পাহাড়ের মধ্যে—জঙ্গলের ভিতর এক কুটীরের মধ্যে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে, এবং নিজেকে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখেন—এই চারিজন সন্ন্যাসীর নাম তিনি বলিয়াছেন। 'আমি এই স্থানে ১৫।১৬ দিন ছিলাম। এই সময় সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আমার কোনও কথা হয় নাই। তারপর কি হইয়াছিল তাহা আমার মনে নাই। আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গেই চলিলাম। আমরা হাঁটিয়া ও রেলে করিয়া গিয়াছিলাম। তারপরে যাহা আমার মনে পড়ে তাহা এই যে—আমি বারাণসীতে অসিঘাটে ছিলাম। সন্ন্যাসী চারিজন তখনও আমার সঙ্গে ছিলেন। অসিঘাটে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে বাস করিতাম। এখানে আমাদেব পশ্চিমা ও বাঙ্গালী সাধুদের সঙ্গে দেখা হয়। দুই জন বাঙ্গালী সাধুর সঙ্গে দেখা হয়। আমি তাহাদের সঙ্গে কথা বলিয়াছিলাম, বাঙ্গালাতেই কথা বলিয়াছি। পশ্চিমা সাধুর সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলিয়াছি। আমি ঐ সাধু চারি জনের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলিতাম—তাঁহারা আমার সঙ্গে হিন্দিতে বলিতেন। সেই সময় আমি কে, সে স্মরণ শক্তি আমার ছিল না।

তাঁহার ভ্রাম্যমান জীবনের বাকী অংশ—এক তীর্থ হইতে অন্য তীর্থে ঘুরিয়াই কাটাইয়াছেন। ঘুরিতে ঘুরিতে কাশ্মীরে অমরনাথে পৌছেন। ইহা অসিঘাটের চারি বৎসর পরে। এখানে তিনি মন্ত্র লইয়া গুরু ধরমদাস নাগার শিষ্য হন। যে চারিজন সন্ন্যাসীর সহিত তিনি ঘুরিতে ছিলেন ধরমদাস তাহাদের একজন। শ্রীনগর বাজারের এক উল্কী ওয়ালাকে দিয়া তাঁহার গুরুর নাম বাহুতে লিখাইয়া

লন। শ্রীনগর হইতে বহু স্থান ঘুরিয়া নেপালে আসেন। নেপালে পশুপতি নাথ হইতে তির্ব্বতে যান এবং পুনরায় নেপালে ফিরিয়া আসেন,—এখানে এক বৎসর বাস করেন। কিন্তু নেপাল ত্যাগের পূর্ব্বে ব্রাহোচ্ছত্তরে একটা কিছু ঘটনা হয়—এখানে তিনি সেই চারিজন সন্ন্যাসীর সহিত বাস করিতে ছিলেন। "এখানেই মনে হয় যে আমার বাড়ী ঢাকায়।"

এখানে তাঁহাকে এর পূর্ব্বের মানসিক অবস্থার কথা বর্ণনা করিতে বলা হইল। তিনি যাহা বলিলেন তাহা এই যে—অসিঘাট পর্য্যন্ত তিনি অজ্ঞান ছিলেন। "এমন কি অমরনাথেও আমি মনে করিতে পারি নাই যে, আমি কে, আমার বাড়ী কোথায় এবং আমার আত্মীয় স্বজনই বা কোথায়" ? মন্ত্র লওয়ার পরে তাঁহার গুরুর সঙ্গে এবিষয়ে কথা হইয়াছিল এবং তিনি (গুরু) বলিয়াছিলেন যে তাঁহাকে ভিজা অবস্থায় দার্জ্জিলিংএর শ্মশানে পাওয়া গিয়াছিল। যখন তিনি নিজে চিন্তা করিতেন তিনি কে, তাঁহার আত্মীয়েরা কোথায়, তখন তাঁহার মন আকুলিত হইয়া উঠিত এবং তিনি গুরুকে একথা বলিতেন,—তখন গুরু বলিতেন ঠিক সময় আসিলে আমি তোমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব। তিনি বুঝিয়া ছিলেন যদি তিনি সংসার ও বাড়ীর মায়া ত্যাগ করিয়া গুরুর কাছে ফিরিয়া যান তাহা হইলে তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়া হইবে। তারপর ব্রাহোচ্ছত্তরে যখন তাঁহার এইটুকু স্মৃতি ফিরিয়া আসিল যে, তাঁহার বাড়ী ঢাকায় তখন তাঁহাকে বাড়ী যাইতে বলা হইল, এবং তিনি একাকী রওনা হইলেন। তারপর বহু স্থান ঘুরিয়া ঢাকায় পৌছেন। "যখন ঢাকা ষ্টেশনে নামিলাম তখন আমার মনে হইল যে এস্থানে আমি বহুবার যাতায়াত করিয়াছি এবং জিজ্ঞাসা না করিয়াই বাকলাণ্ড বাঁধের রাস্তা ধরিলাম।"

তারপর যে সকল ঘটনা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—তাহা আরম্ভ হইল। জয়দেবপুরে তাঁহার প্রথম আগমনের সময়—যখন তিনি ঘুরিতে ছিলেন—"তখন আমার কাছে সমস্তই পরিচিত বোধ হইল"।

এর পূর্ব্বে বাকলাণ্ড বাঁধে যে সমস্ত লোক তাঁহার কাছে আসিয়া বলিত, 'এই ভাওয়ালের মেজোকুমার' তাহাদের কোন কোন লোককে তিনি চিনিতে পারিতেন। জয়দেবপুরে প্রথমবার যাওয়ার সময়ই তাহার পূর্ণস্মৃতিশক্তি ফিরিয়া আসে।

এই সমস্তই অদ্ভুত মনে হয়—কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এই সম্বন্ধে যে সকল দৃষ্টান্ত পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণা করিয়া তাঁহাদের প্রামাণ্যগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,

সেগুলিও এই ঘটনা অপেক্ষা কম অদ্ভুত নয়। যুদ্ধের পর এই রকম রোগীর চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল। এইগুলিকে ওয়ার নিউরোসিস নামে অভিহিত করা হয়। বসন্ত বা চুলকানি প্রভৃতি রোগে যেমন কোনও রহস্য নাই ইহাতে তেমনি কোনও রহস্য নাই। উভয় পক্ষ হইতেই এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ চিকিৎসক আনা হইয়াছে। বাদীর পক্ষে রাঁচীর ইউরোপীয় পাগলা গারদের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লেঃ কঃ হিল, আই এম, এস, এম, ডি, এম, এ, জবানবন্দী দিয়াছেন যে তিনি ত্রিশ বছর ধরিয়া মানসিক বিকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেছেন। বিবাদিপক্ষে মেজর ধুন্‌জি ভাই আই, এম, এস, এম-বি, বি, এস, (বোম্বাই) এবং মেজর টমাস আই. এম, এস, জবানবন্দি দিয়াছেন। শেষোক্ত জনের কথা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি ইংলণ্ডে শেল 'শকের' অনেক রোগী চিকিৎসা করিয়াছেন। মেজর ধুঞ্জি ভাই যে সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে একখানা Dr. Taylor's Reading in Abnormal Psychology and Mental Hygiene (১৯২৭ সংস্করণ)। এই বইএর কথা উভয় পক্ষই বলিয়াছেন এবং ইহাতে বিপুল পর্য্যবেক্ষকের দেখা অনেকগুলি দৃষ্টান্তের কথা আছে। এই বই হইতে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি একত্র করা দরকার দেখিনা। কারণ যে সকল বিশেষজ্ঞকে এখানে জেরা করা হইয়াছে—তাহাদের মতানৈক্য দেখা যায় না। যেখানে তাঁহারা একমত নন সেইগুলিই আমি দেখাইব। এই স্মৃতিভ্রংশদোষ বা এ্যমনেসিয়ার কোন বাহিক বা শারীরিক হানি না করিয়াও ঘটিতে পারে। এই গোলমালটাকে মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে,—ইহা অসংখ্য প্রকারের। ইহার গবেষণা পর্য্যবেক্ষণে ছাড়াইয়া বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। ইহার কতকগুলি ব্যাবহারিক শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। ইহার এমন কোন মূল সূত্র নাই যাহাদ্বারা পূর্ব্বে হইতেই বলা যাইতে পারে যে কোন একটি অস্বাভাবিক মানসিক বিকৃতি—কিরূপে আরম্ভ হইবে, বৃদ্ধি পাইবে ও শেষ হইবে।

তবে কতকগুলি বিভাগ মোটামুটি ভাবে দেখা যায়। এইগুলি (১) Regression or পশ্চাদ্বর্ত্তন (২) Double or multiple personality অর্থাৎ একই লোকের বিভিন্ন সময়ে দুই বা ততোধিক লোক বলিয়া ভ্রান্তি। প্রথমোক্তটির সুপরিচিত দৃষ্টান্ত রেভারেণ্ড্ 'হানা'য় (Hanna) ঘটনা। একদিন সকালে উঠিয়া তিনি মনে করিলেন যে তিনি সদ্যপ্রসূত শিশু। স্থান-

কাল পাত্রের সমস্ত ধারণাই তাহার চলিয়া গেল। ইহাকে Baby state বা শৈশবাবস্থা—প্রাপ্তি বলা যাইতে পার। এই ঘটনাটি Sidis and Goodheart's Multiple Personality তে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। পুনরায় সদ্যপ্রসূত শিশু অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন, সম্পূর্ণ স্মৃতি ভ্রংশের একটি দৃষ্টান্ত। এইরূপ ঘটনা খুবই বিরল এবং বোধ হয় এই একটি দৃষ্টান্তই এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় রকমটিকে দ্বৈতীভাব বা double personality বলা যাইতে পারে। ইহাও এক রকমের পশ্চাদ্বর্ত্তনই বটে। ইহাতে মানুষ সাধারণতঃ স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরা করে—কিন্তু সে যে কে তাহা ভুলিয়া যায়। ইহার পরিচিত দৃষ্টান্ত রেভারেণ্ড এনসেল বোর্ণ (Rev, Ansel Bourne) এবং শেলশকের কতকগুলি রোগী। ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত আছে যেখানে আমরা দেখিতে পাই এই লোক এক সময় মনে করে যে সে একজন, আবার অন্য সময় মনে করে সে আর একজন। কিন্তু এই যে কল্পিত দুইজন ইহাদের কেহই কাহাকে চিনেনা। জেমসের Principle of psychologyতে ফেলিডা লিওলিনের ঘটনা ডাঃ প্রেথের গ্রন্থে মিস্ রোকাম্পএর ঘটনা এই রকম ব্যাপার। এই সমস্ত কথা ছাড়িয়া দিলেও মেজর টমাসের অভিমত এই যে বাদীর ব্যাপারটা তাঁহার নিজের বর্ণনা অনুসারে double personalityর ব্যাপার—অর্থাৎ তিনি অন্য অন্য ব্যাপারে স্বাভাবিকই ছিলেন, কিন্তু কিছুদিনের জন্য তিনি কে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। Rev. Ansel Bourne একদিন হঠাৎ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, এবং দুই মাস পর Pensylvania সহরে Brown নামে এক দোকান খুলিয়া বসিলেন। (Morton Princeএর Dissociation of Personality র ১৮৬ পৃঃ) ঐ গ্রন্থেরই ২৩৪ ও ২৩৫ পৃষ্ঠায় মিঃ চার্লসের ঘটনা উল্লিখিত আছে। তিনি একটি ট্রেণ সংঘর্ষের ১৭ বৎসর পরে (যখন তিনি বিবাহিত ও ৪টি সন্তানের পিতা) কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না যে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর নয়। (২৪ বৎসর বয়সে এই রেলওয়ে একসিডেণ্ট হইয়াছিল) Tennetএর বইয়ে আছে Roy যথার্থ কে তাহা ভুলিয়া গেল এবং নানা রকম কাজকর্ম্ম করিয়া ৪ মাস পর তাহার জ্ঞান হইল। বাদীর বিবরণ এই যে তিনি তাঁহার প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃত হইয়া ১২ বৎসর সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বাস করিলেন;

তারপর একদিন তাঁহার মনে হইল তাঁহার বাড়ী ঢাকা এবং ঢাকা আসিয়া তিনি ধীরে ধীর তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন।

মেজর টমাস মনে করেন বাদীর বিবৃতিতে এমন কতগুলি জিনিষ আছে যাহা অসম্ভব। প্রথম বৎসর দার্জ্জিলিং হইতে অসীঘাট যাওয়ার সময় তিনি যে অবস্থায় ছিলেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—"জ্ঞান ছিলনা—বা এই রকম কিছু" —উহা পশ্চাদ্বর্ত্তন—উহা dissociation এবং adoptation এর সহিত একসঙ্গে চলিতে পারে না, তাহা হইলেই বলা যায় Rev. Hannaর ন্যায় তিনি শিশু হইয়া গিয়াছিলেন— Ansel Bourne এর মত তিনি দোকান করিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়তঃ তিনি আশা করিতে পারেন না যে আদিম বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার স্মৃতি আরও ভালরূপে ফিরিতে পারে। তৃতীয়তঃ এইরূপ মানসিক ভাবের একত্ব (dissociation) সাধারণ রকমের নয়। প্রায়ই ইহা হিষ্টিরিয়ার ন্যায় স্নায়বিক রোগীদের হইয়া থাকে। মেজর ধুঙ্গি ভাই কার্য্যতঃ এই মতই দেন। লেঃ কঃ হিলের মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে বেশী অভিজ্ঞতা আছে তিনি বলেন বাদীর বর্ণনায় কিছুই অসম্ভব নয়।

বাদী শৈশব অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন, এই অভিমত সম্বন্ধে বলা যায়—যদি তাহাই হইত—তাহা হইলে তিনি প্রকৃতিস্থ না হইয়া অপ্রকৃতস্থ হইতেন, ইহাই টঠোলজির মত। তিনি যে শৈশবাবস্থায় ফিরিয়া ছিলেন, বাদী একথা বলেন না। সেটা যে কি অবস্থা তাহা তিনি বলিয়াছেন—তিনি ইহাকে অজ্ঞান অবস্থা বলিয়াছেন। এবং জিনিষ পত্র চিনিতে পারিতেন—পাহাড় গাছ, সন্ন্যাসী ঘাট এইরূপ জটিল পদার্থ গুলিও চিনিয়াছেন—কেবল দার্জ্জিলিং হইতে অসিঘাট পর্য্যন্ত বিষয়ের অভিজ্ঞতার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বা অন্য কেউ যে তাহার মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিতে পারেন এ আশা আমি করি না। তাঁহার বিবরণ হুবহু ও কঠোরভাবে মানিয়া লওয়া অস্বাভাবিক, তবে তিনি যে ভাবে বিবরণ দিয়াছেন ঠিক সেই ভাবে দেখিলে— ইহা যে শৈশবাবস্থাতে ফিরিয়া আসা বলা যায় না। ইহা পশ্চাদ্বর্ত্তনের শেষতম দৃষ্টান্ত। ইহাতে যে ক্রমবিভাগ নাই এ বিষয়ে আমি মেজর ধুঙ্গি ভাইয়ের সহিত একমত নহি। মেজর টমাস বলেন "স্মৃতিভ্রংশের সময়ে পারিপার্শিক ঘটনা হইতে উদাসীনতা অনেক রকমের হইতে পারে। অর্থাৎ এরূপ লোক দেখা যায়, মানসিক সুস্থতা যে ন্যূনাধিক বিশৃঙ্খল চিত্ত হইয়াও সম্পূর্ণ উদাসীন নহে, আবার এই রকম

লোকও আছে যে অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াও মানসিক জীবনে বড়ই বিশৃঙ্খল। এই দুই অবস্থার মধ্যে অনেক রকম মানসিক অবস্থা দেখা যায়। এমন কোন নিয়ম নাই যে এক জনই এ সকল অবস্থার মধ্যে দিয়া যাইতে পারে না। টেলারের বইয়ের ৩০৮ পৃষ্ঠায় সৈন্যদের পশ্চাদ্বর্ত্তনে"র চারিটি দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম দৃষ্টান্তটিতে একটি ১৫ মাস বয়স্ক শিশুর অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছিল কিন্তু সে সিগারেট ধরাইতে পারিত, এই সমস্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে "পশ্চাদ্বর্ত্তনের" ও কমবেশী আছে। হানার (Hanna) মত দৃষ্টান্ত অতি অল্প। এ বিষয়ে আমি একটা অনুচ্ছেদ তুলিয়া দিতেছি।

"বিগত যুদ্ধে সৈন্যদের মধ্যে সম্পূর্ণ" স্মৃতিভ্রংশ দোষ" সাধারণ ব্যাপার ছিল। আমার চিকিৎসাধীনে এরূপ অনেক রোগী পাইয়াছি। সাধারণ রকমটিকে এই বলিয়া বুঝান যাইতে পারে যে, রোগী তাহার পূর্ব্ব জীবনে অভিজ্ঞতার অনেক কাজই ভুলিয়া যাইত, চেষ্টা করাইয়াও কাজ করান যাইত না, এই অবস্থায় একটি সৈনিক তাহার নাম, রেজিমেণ্টের নম্বর, সে বিবাহিত কিনা—কোথায় বাস করিত, কি কাজ করিত অথবা পূর্ব্বজীবনের কোন ঘটনা বলিতে পারিত না। অথচ পারিপার্শ্বিক বিষয় সমূহে তাহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল—সাধারণ লোকের ন্যায় সাধারণ জিনিষ ব্যবহার করিত—এবং সাধারণ লোকের ন্যায় লিখিত ও কথা ও ভাষা বুঝিতে পারিত। কতকগুলি বিষয়ে তাহার স্মৃতি ভ্রংশতা ছাড়িয়া দিলে সে এমনি সাধারণ লোকের ন্যায় ব্যবহার করিত যে কোন অপরিচিত লোক তাহার আচার ব্যবহার দেখিয়া তাহাতে কোন কিছু অদ্ভুত আবিষ্কার করিতে পারিত না।' আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এসকল দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন মূলসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। দর্শনদাস যে বৈশিষ্ট না বোকা বোকা ভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছে তাহা পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারের মত সামান্য উদাসীনতার ফল যে নহে তাহা আমি খুজিয়া পাইনা। এই সকল ব্যাপারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত গুলি সংখ্যায় খুব কম। বেশীর ভাগ দৃষ্টান্তই মাঝামাঝি রকমের। দৃষ্টান্ত গুলি নানা প্রকৃতির। একটি নিয়মের দ্বারা ইহাদিগকে ভাগ করা যায় না। স্মৃতিভ্রংশের কাল কয়েক দিনও হইতে পারে, আবার কয়েক বৎসরও হইতে পারে। চার্লসের ব্যাপারে তাহা ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে, এবং যখন মানুষ পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে তখন তাহার পূর্ব্ব অস্বাভাবিক অবস্থার কথা কিছুই মনে থাকে না—এই অভিমতটি সর্ব্বথা স্বীকার্য্য নহে। রেভারেণ্ড হেনা (Rev Hanna) তাহার

স্মৃতিভ্রংশের কাল সম্বন্ধে আত্মজীবনী লিখিয়াছেন। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থার এ ব্যবধান চিন্তা দ্বারা অতিক্রম করা যায়। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে এমন কোন নিয়ম বা সূত্র নাই যাহা দ্বারা বাদীর বিবৃত ঘটনাকে অস্বিকার করা যায়। (মধ্যাকর্ষণ আছে বলিয়া বাদীর শূন্যে উড়িয়া যাওয়া যেমন অসম্ভব এই নিয়ম এমন নহে)। সচরাচর দেখা গেলেও স্নায়বিক রোগ যে থাকিবেই এমন কোন কথা নাই, এবং কুমারের সম্বন্ধে—এ সম্বন্ধে কেহই কোনও প্রশ্ন তুলেন নাই। মিঃ চৌধুরী সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন তুলিয়া ছিলেন যে বাদীর ব্যাপারে এই সমস্ত অস্বভাবিক ঘটনা ঘটিয়া ছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার কি কারণ থাকিতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, দার্জ্জিলিং হইতে এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য বাদীর যথার্থ পরিচয় করা নয়,—কিন্তু অন্যান্য ঘটনার সাহায্যে বাদীর পরিচয় যে ভাবে সাব্যস্ত হইয়াছে ইহা তাহার বিরোধী কি না ?

ইহা যদি একবার প্রমাণিত হয় তাহা হইলে দার্জ্জিলিং হইতে ঢাকায় আগমন পর্য্যন্ত এমন কিছুই ঘটে নাই যাহাতে এই সিদ্ধান্ত অন্যথা হইতে পারে এবং একবার পরিচয় প্রমাণিত হইলে প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী বলিয়া তাহা অস্বীকার করিবার কোনও কারণ নাই। বস্তুতঃ ইহা কোন নিয়মেরই বিরোধী নহে।

বাদী কি হিন্দুস্থানী?

আমার ইহা মনে হয় না দেখিতে মেজকুমারের মত, তাঁহারই শরীরের চিহ্নগুলি লইয়াও ঢাকা আসিবার পূর্ব্বে মধ্যমকুমার কি রকম করিয়া নাম সেই করিতেন তাহা অভ্যাস করিতে থাকে। এ সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে সেইগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার।

বলা হইতেছে যে বাদী একজন পাঞ্জাবী। বিবাদী পক্ষ ইহার অধিক কিছু প্রমাণ করিতে বাধ্য নহেন। বাদীর যথার্থ পরিচয় কি তাহা প্রমাণ করিতে তাঁহারা বাধ্য নহেন, তবুও এই মকোদ্দমায় বাদী যে পাঞ্জাব লাহোর জেলার—আজলা গ্রামের মালসিং তাঁহার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু এই ব্যাপারের উপর তেমন জোর দিয়া কিছু বলা হয় নাই এবং বাদী আজলা গ্রামের মালাসিং কিনা; অথবা ধর্ম্মদাস নাগা তাহাকে সন্ন্যাসী করার পর তাহার নাম সুন্দরদাস হয় কিনা ইহা বাদীকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। এ সম্বন্ধে প্রমাণ বুঝিতে হইলে ১৯২১ সালের কি ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে

আলোচনা করা দরকার। বাদী ৪ঠা মে তাঁহার পরিচয় প্রকাশ করিলেন। ঐ মাসেরই ৬ই হইতে ৯ই তারিখের মধ্যে সত্যবাবু মিঃ লেথব্রিজের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। সেখানে মৃত্যুর এফিডেভিড্ তাহাকে দিয়া মৃত্যু সম্বন্ধীয় প্রমাণ তাঁহাকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। মৃত্যুর এফিডেভিটের একখানা নকল ঢাকার কালেকটার মিঃ লিণ্ডসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং মিঃ লিজের পরামর্শ অনুসারে ইংলিশ-ম্যান পত্রিকায় একখানা চিঠি লিখিলেন, ৯ই মে উহা ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং খুব বিলম্ব হইলেও ৮ই মে তিনি উহা পত্রিকায় পাঠাইয়াছিলেন। তারপর ১৫ই মের পূর্ব্বেই তিনি দার্জ্জিলিং গিয়া ১৯০৯ সালের ৯ই তারিখে যে শবদাহ হইয়াছিল তাহার সাক্ষী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ২৯শে মে বাদী মিঃ লিণ্ডসের নিকট উপস্থিত হইয়া তদন্তের প্রার্থনা জানান্। ৩১শে তারিখে সাব্ ইনস্পেকটার মম্তাজউদ্দিন এবং সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে ষ্টেটের একজন আম্লা বাদীর পরিচয় বাহির করিবার জন্য পাঞ্জাবে চলিয়া গেলেন। মিঃ লিণ্ডসে ইহা জানিতেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি এই তদন্তের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

১৯২১ সালের ২৭শে জুন সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী পাঞ্জাব হইতে ভাওয়ালের অ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজারের নিকট এক রিপোর্ট পাঠান। (একজিবিট ৩৬৭ . ঐ রিপোর্টে তিনি বলেন।

তাঁহারা (সুরেন্দ্র ও মনোমোহন বাবু)—সাব ইন্স্পেক্টার মম্তাজউদ্দিন মনোমোহনবাবু নাম লইয়াছিলেন) এই তদন্তের জন্য কলিকাতায় আসেন এবং সেখান হইতে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া হরিদ্বারে পৌছেন। • হরিদ্বারে সুরেন্দ্রবাবু শুনিতে পান যে কনখলে হীরানন্দ নামে একটা সাধু আছে। "আমি তাঁহাকে , ফটো দেখাই। ফটো দেখাইবামাত্রই তাঁহার চেলা বলিয়া উঠে যে ইহা ধরমদাসের একজন চেলা সন্তদাসের ফটো।" ঐদিন মম্তাজউদ্দিন এবং তিনি অমৃতসর চলিয়া যান এবং অমৃতসর সংগওয়ালা আখড়ায় এ ফটো হীরানন্দ ও তাহার চেলা সন্তরামকে দেখান. ইহা দেখিয়া সন্তরাম বলে যে ইহা ধরমদাসের শিষ্য সুন্দরদাস বাবাজীর ফটো।

তারপর তাঁহারা অমৃতসর হইতে ২০ মাইল দূরে "ছোট সংসার" গেলেন এবং সেখানে ধরমদাসের সহিত দেখা হইল। তাঁহারা পূর্ব্বেই জানিয়া ছিলেন যে ধরমদাস সেখানে আছেন।

জয়দেবপুরের সাধুর ছবি দেখিবামাত্রই ধরমদাস চিনিলেন এবং ধরমদাসের

আর একজন চেলা দেবদাস, তিনিও চিনিলেন। তাঁহারা উভয়েই বলিলেন যে ইহার নাম সুন্দরদাস।" প্রায় ১৫ বৎসর আগে লাহোর আজলা গ্রামের নারায়ণ সিং সুন্দরদাসকে ধরমদাসের নিকট লইয়া আসে। তখন তাহার বয়স ১৫। সে ধরমদাসের শিষ্য হয়। সুন্দরদাসের পিতামাতা কেহই জীবিত নাই। নারায়ণ সিং "মণ্টগোমারী জেলায় ৪৭নং চকে বাস করে। "২৭-৬-২১ তারিখে, ধরমদাস, দেবদাস, বিসণ দাস, চিরণদাস, সন্তদাস—৭।৮ জন লোককে ম্যাজিষ্ট্রেটের সাম্‌নে উপস্থিত করিয়া সুন্দরদাসের ছবি সনাক্ত করিতে বলা হয়। জয়দেবপুরের সাধু যে একজন পাঞ্জাবী এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

রিপোর্টে বলা হয় যে "সংসারে" আসিয়া ধরমদাস সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতে পারিলাম তাহা এই—তাহার অনেক চেলা আছে—তাহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া টাকা রোজগার করে ও পাঠাইয়া দেয়; ধরমদাস নিজেও নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার বয়স প্রায় ৫৫, গায়ের রং কালো—মাথায় জটা আছে ও দাড়ি আছে। ধরমদাস আমাকে বলে যে প্রয়াগের কুম্ভমেলা হইতে ৩।৪ বৎসর আগে সুন্দরদাস কলিকাতার দিকে রওনা হয়। তাহার বয়স প্রায় ৩০ তাহার কটা গোঁফ ও কটা দাড়ি আছে। সুন্দরদাশ তাহার সঙ্গেই থাকিত।

রিপোর্টে একটি পুনশ্চ দিয়া বলা হইয়াছে "সুন্দয়দাসের আসল নাম ও তাহার পিতা মাতার নাম জানা যায় নাই, কেবল তাহার বাপের নাম জানিতে পারা গিয়াছে। ফনিমোহন বসু ল্যাঠিপরা সাধুর যে ফটো দিয়াছিলেন তাহা যদি জয়দেবপুরের সাধুর ফটো হয় তবে এ নিশ্চয়ই সুন্দরদাস।"

এইত রিপোর্ট—তদন্তের ফল, মেজরাণী ৪।৭।২১ তারিখে ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম করিয়া জানান। টেলিগ্রাফটি এইরূপ—"যাহা আশা করা গিয়াছিল সেই ভাবেই পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।"

২।৭।২১ তারিখে ম্যানেজার মি, লেগুসের নিকট সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তির রিপোর্টের ইংরেজী অনুবাদ পাঠাইয়া দিয়া লেখেন তাহারা লোকটির প্রকৃত পরিচয় খুঁজিয়া বাহির করিবার সূত্র আবিষ্কার করিয়াছে। আরও লেখা হয় যে "বোর্ড শবদাহ সম্পর্কে ভাল প্রমাণ পাইয়াছেন এবং সাধুর প্রকৃত পরিচয় সত্বরই জানা যাইবে। নোটিশের অংশ বিশেষ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য যদি কোন সংকল্প হইয়া থাকে তবে তাহা পুনরায় বিবেচনা করা দরকার" (একজিবিট ৩৮৮)

উল্লিখিত নোটিশ বাদীকে জাল বলিয়া ঘোষণা করার—৩।৬।২১ তারিখের

নোটিস। বাদীর পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া যে তার করা হইয়াছিল তাহার কারণ মমতাজ উদ্দিন—১।৭।২১ তারিখে আজলা গিয়া বাদী মালাসিং বলিয়া—ধরমদাস ২৭।৬।২১ তারিখে যে খবর দিয়াছিল তাহার সত্যতা করিয়া আসিয়াছেন। এই টেলিগ্রামের পরেও ইহা কিছুতেই বলা চলে না যে সত্যবাবু এই তদন্তের কথা কিছু জানিতেন না। তাঁহার নিকটই তদন্তের ফল প্রথম আসিয়াছিল—আর ইহা অস্বাভাবিকও নয়।

২৭।৬।২১ তারিখে ধরমদাস নাগা নামে একজন লোক (ইহাকে আমি ২নং ধরমদাস বলিব—এবং বাদীর গুরুকে ১নং ধরমদাস বলিব) অমৃত সহরের ৭।৮ মাইল দূরে রাজাসংসী নামক স্থানে লেঃ রঘুবীর সিংহ নামক একজন অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছে।

হরনাম দাসের চেলা ধরমদাস—সম্প্রদায় উদাসী, বয়স ৭৫—ঠিকানা সংসার, ব্যবসা সেবাদার। আমি অমৃতসহর জেলায় আজলা থানায় সংসার মৌজায় বাস করি। যে ছবি আমাকে দেখান হইয়াছে তাহা আমার চেলা সুন্দরদাসের ছবি—আগে তাহার নাম ছিল মালসিং। সে লাহোর জেলার আজলা মৌজায় বাস করিত। তাহার খুড়তুত ভাই নারায়ণ সিং মণ্টগোমারী জেলার ৭৭ নং চকে বাস করে। প্রায় ১১ বৎসর পূর্ব্বে সে মাল সিংকে লইয়া নানকানা সাহেব'এ আমার সঙ্গে দেখা করে। তখন মাল সিং এর বয়স ২০ বৎসর। মালসিং এর 'পর বারেশ'—(যাহারা তাহাকে লালনপালন করিয়াছিল) অজিলা-গ্রামের তাহার কাকা মঙ্গল সিং ও লাভসিং ছয় বৎসর পূর্ব্বে সুন্দর দাস আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। সুন্দরদাসের চোখ "বিল্লি" ও রং ফরসা। চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি তাহাকে প্রয়াগে কুম্ভ মেলায় দেখিয়াছি। তার পরে আর তাহাকে দেখি নাই। এই তসবীর (একজিবিট পি—১) আমার চেলা সুন্দরদাসের তসবীর (ফটো)। (পড়িয়া শোনান হইল এবং ঠিক বলিয়া স্বীকৃত হইল।

২৭-৬-২১

লেঃ রঘুবীর সিং এই বিবৃতি প্রমাণ করিয়াছেন। এবং ইহা যে ২৭-৬-২১ তারিখে (পি ১নং লেখা ফটো) দেখিয়া রঘুবীর সিংহের সম্মুখে ধরমদাসের বিবৃতি এ সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই। ঐ সময় ও ঐস্থানে ঐ ফটো দেখিয়া আরও তিনজন লোক বিবৃতি দিয়াছে—তাহারা সংসারের দেবদাস, কালা সিং, ভগত সিং ও কর্ত্তার সিং। সাবইনস্পেক্টার মমতাজ উদ্দিন এই কয়জনের নাম দিয়া একটি দরখাস্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি সেই দরখাস্ত ১৬৪

ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডের ধারা মূলে এই ছয় জনের বিবৃতি লইয়াছেন এবং পুলিসের কর্ম্মচারীর হাতে দিয়াছেন।

লোক না দেখিলে এগুলিকে জমানবন্দী বলা যাইতে পারে না।

ধরমদাসের বিবৃতিতে মালসিংহের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। তার বাড়ী আজলা, সে নারাণ সিং ও লাভ সিংএর ভাইপো—ইহাতে দুজনেরই ঠিকানা আছে। ১৯১০ সালে মাল সিং ধরমদাসের চেলা হয় ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত এক সঙ্গে ছিল—এবং ১৯২৭ সালেও এলাহাবাদে কুম্ভ মেলায় দেখা হইয়াছিল। এখন ১৯২০ সালে তাহার বয়স ২০ বৎসর হইলে এখন তাহার বয়স ৪৬ বৎসর হওয়া উচিত। সে লেঃ রঘুবীর সিংএর কাছে পি—১ লেখা ফটোতে এই লোকটিকে দেখিয়াছে।

আমি বলিয়াছি—১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে বাদীর গুরু ধর্ম্মদাস নাগা ২৬শে তারিখে ঢাকা আসেন এবং ৩০শে তারিখে চলিয়া যান। মিঃ লিণ্ডসে তাঁহাকে তাঁহার সহিত দেখা করার জন্য লিখিয়াছিলেন কিন্তু তিনি চলিয়া যান। বাদী তাহার জবানবন্দীতে বলেন পুলিসের ভয়েই তিনি প্রস্থান করেন। তাহার বিবৃতিতে বাদী স্বীকার করিয়াছেন যে বিপক্ষদলের চক্রান্তে পুলিশের নিকট তিনি একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন।

মোকদ্দমার সময় বাদী, ধরমদাস ঢাকায় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা প্রমাণ করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিতে দেওয়া হয় নাই। কারণ সাক্ষ্য দিতে না আসিলে এমন কি আসিলেও—এই বিবৃতিকে জবানবন্দি বলিয়া নেওয়া চলে না—কোন পক্ষ হইতেই তাহাকে সাক্ষী হিসাবে ডাকার প্রস্তাব আসে নাই—যে দশ জন সাক্ষী তাহার ফটো দেখিয়া কমিশনারের সম্মুখে বাদী মঙ্গল সিং এই বিবৃতি দিয়াছিল কেবল তাহাদের কমিশনে জবানবন্দি নেওয়ার কথা হইয়াছিল মাত্র।

ছুটির পাঁচদিন পূর্ব্বে ২৯-৯-৩৫ তারিখে একজন লোককে আমার সম্মুখে আনা হয়—এই লোক নিজেকে ধরমদাস নাগা বলিয়া পরিচয় দেয় এবং বলে সেই লেঃ রঘুবীর সিং এর নিকট বিবৃতি দিয়াছিল। সে বলে—বাদী (তখন আদালতে উপস্থিত ছিলেন) আমার চেলা সুন্দরদাস। সাক্ষী কখনও দার্জ্জিলিং যায় নাই এবং বাদী লাহোর জেলার আজলা গ্রামের মালসিং।

বাদীর বক্তব্য এই যে, যে লোকটি তাহার গুরু বলিয়া পরিচয় দেয়—সে জাল। সে যে জাল এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই, তাহার জবানবন্দি

দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে যে দশজন সাক্ষী লাহোরে বাদীকে মাল সিং বলিয়া জবানবন্দি দিয়াছে তাহাদের কথা আলোচনা করিব; কারণ কোর্টে যে ধরমদাস আসিয়াছিল তাহার উপর ইহাদের কথার মূল্য আছে।

এই সকল সাক্ষীর নাম :—

মহর সিং ৪৫, আজলার লাভসিং ৪৮, আজলার উজাগসিং ৪৪, আজলার মভয়া সিং ৬৫-ডালমুলতানী ওয়াসন সিং ৬৫—আজলার, হুকুম সিং ৫০—আজলা ওয়ায়জর সিং ৫২—আজলার মহন সিং ৪৬ অজুল ইকুমাসিং ৫০ আজুলা ১৯৩৩ সনের অক্টোবরে ইহাদের জবানবন্দি নেওয়া হয়। তাহাদের জবান বন্দিতে দেখা যায় যে এই জবানবন্দি দেওয়ার দুই বৎসর পূর্ব্বে অরুণসিং বিদেশী বলিয়া একজন লোক তাহাদের নিকট আসিয়া বাদীর ফটো দেখায়। তাহারা ঐ ফটো মালসিং এর ফটো বলিয়া সনাক্ত করে। ছেদুসিং ও করম সিং ছাড়া আর সকল সাক্ষীই একথা স্বীকার করে। ১৯৩৩ সালে ৫ই অক্টোবর যখন তাহারা জবানবন্দি দিতে আসে, তখন ঐ দুজন লাহোরে গুরুদ্বারায় অরুণসিং এর সহিত দেখা করে। তাহাদিগকে বাদীর দুইখানা ফটো দেখান হয়.—একথানায় ডি ১ লেখা বাদীর ২৪ বৎসর বয়সের লুঙ্গী পরিয়া বসিয়া তোলা ছবি,—অন্যটী ডি ২ লেখা বাদীর বিকৃত ছবি। সাক্ষীরা এগুলিকে মালসিং এর ছবি বলিয়া সনাক্ত করে। তাহারা আর কতকগুলি ছবিকেও এই একই কথা বলিয়াছে—এই ছবি গুলির মধ্যে পি ৪, পি ১ পি২ প্রভৃতি ছবি ছিল। একজন সাক্ষী মেজ কুমারের পি ৬ লেখা এক ফটোকে সন্দেহ থাকিলেও মালসিং এর ফটো বলিয়া বলিয়াছে।

তাহাদের জবানবন্দিতে দেখা যায় যে, তাহার পিসী আক্কির ছেলে সুন্দর দাস সিং ছাড়া তাহার আর কোন আত্মীয় নাই। সুন্দর সিং থাণ্ডিওয়ালাতে বাস করিত, ওয়াজির সিং এর এখানেই বাস। ওয়াজির আসিলেও সুন্দর সিং কেন আসিল না তাহা বুঝা কঠিন।

মালসিংহের বিষয় যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ—

সে অতি দরিদ্র রাঠোর শিখ শ্রেণীর আতর সিংএর ছেলে। তার মায়ের নাম স্বানী। যখন তার বয়স ৪।৫ বৎসর তখন মা মারা যায় এবং ৭।৮ বৎসর বয়সে বাপ মারা যায়। তখন সে তাহার পিসি আক্কির কাছে তাহার কুটীরের পাশে এক কুটীরে গিয়া থাকে। আক্কি মারা গেলে তাবির কাছে থাকে—

জয়মল সিং ইহার স্বামী। যখন ইহারাও মারা যায় তখন আক্কির ছেলে সুন্দর দাসের সঙ্গে বাস করে, সুন্দরদাস থাণ্ডিওয়ালা গ্রামে বাস করে এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাল্যে সে গরু চড়াইত এবং ষোল বৎসর বয়সে সাধু হইয়া যায়—তার পরে চারিবার গ্রামে আসে—একবার তাহার গুরু সঙ্গে আনে। সে নাকি একবার তাহার হাতে উল্কিতে লেখা তাহার গুরুর নাম দেখাইয়াছে—ইহা সুন্দরদাস ধরমদাস বলিয়া লেখা ছিল। তাহাকে নানকানা সাহেবে দেখা যাইত, নানকানা খুনের ২।১ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আর দেখা যায় নাই। রঘুবীর সিং বলেন—১৯২১ সালের জানুয়ারীতে এই দুর্ঘটনা হইয়াছে।

নানকানা লাহোর হইতে ৪০ মাইল দূরে। আজলার সাক্ষীরা বলে নানকানার মেলা দেখিতে যাইয়া তাহারা বাদীকে সেখানে দেখিয়াছে। বাদী ১৯২০ সালে নানকানা হইতে সোজা ঢাকা আসিয়াছে—কাজেই অতুল বাবুর সঙ্গে অবোধ্য হিন্দিতে কথা বলিয়াছে।

তাহার যে দুই খুড়া ও খুড়তুত ভাইয়ের কথা রঘুবীর সিংএর নিকট জবানবন্দিতে বলা হইয়াছে তাহারা কোথায়! তাহারা উড়িয়া গিয়াছে—তাহারা কখনও বর্ত্তমানই ছিল না। যে সকল সাক্ষীকে ইনসপেক্টর মমতাজ উদ্দিন ১৯২১ সালের জুলাই মাসে আজলায় দেখা পাইয়াছিল এবং যাহারা উত্তমদাস ও মালসিং এর বাড়ীর পরিচয় সম্বন্ধে কথা বলিয়াছিল—এবং যাহাদের কথা মেজরাণী ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়া ছিলেন—তাহাদিগকে ডাকে নাই।

ফটো দ্বারা সনাক্ত করণ সন্তোষ জনক নয় বলিয়া প্রতিবাদী পক্ষ খুঁটি নাটিতে গিয়াছিল—যে মাল সিংহের বাহুতে একটা উল্কিচিহ্ন ছিল। ধরমদাস কোর্টে সাক্ষ্য দিতে আসিয়া এবিষয়ে পূর্ব্ব হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত ছিল না—কারণ সে কখনও উহা দেখে নাই, যদিও সে আবার বলিয়া ছিল যে যখন এলাহাবাদে তাহার সহিত শেষ দেখা হয় তখন সে ঐ উল্কিচিহ্ন দেখিয়াছিল। জেরায় লাহোরের সাক্ষীগণ অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছিল, রঙ গৌর বর্ণ, চুল তাহার পিতার মত কালো, ছোট ছোট বাদামী গোঁফ; স্থূলকায়, লম্বা দাড়ি—, চোখ কালো নয় কিন্তু বিড়ালের চোখের মত, নাক চ্যাপ্টা; নাসারন্ধ্র প্রশস্ত ইত্যাদি। পিতার মত কালো চুল এই কথাতেই যেন এই ব্যাপারের

শেষ হইয়া গিয়াছিল। এবং রঘুবর সিংহের সামনে প্রদত্ত বিবৃতিতে যে আত্মীয়গণের উল্লেখ করা হইয়াছিল, সেরূপ আত্মীয় তাহার ছিলনা এই ঘটনায় ব্যাপারটী আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল এবং স্থূলকায় কথাটী ১৯২১ সালে বাদীর পক্ষে আদৌ প্রযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং ইহা আদৌ আশ্চর্য্যজনক নহে যে মিষ্টার চৌধুরী বাদীকে সে যে অজুলার মাল সিংহ এই উক্তি আরোপ করেন নাই।

কালো চুল তেল না মাখিলে ও যত্ন না লইলে কটা হইয়া যাইতে পারে। সাক্ষীগণের নিকট এই উক্তি উপস্থাপিত করিয়া—এই ব্যাপার আবার তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে ইহা স্বীকৃত হইল যে—বাদীর চুল পিঙ্গল বর্ণ বা রক্তবর্ণ এবং সাক্ষীগণ স্বীকার করিল যে বাদীর চুল দ্বিতীয় কুমারের চুলের মত।

বাদীকে কোন প্রশ্ন না করিয়া সে যে মালসিংহ ইহা প্রমাণ করা—এবং তাহাকে সর্ব্বপ্রকার স্থানে স্থাপন করা এবং তাহার মুখে সর্ব্ব প্রকার উক্তি আরোপ করা—প্রতিবাদীর পক্ষে যে সম্ভব হইতে পারে উহা আমার নিকট অদ্ভুত বোধ হয়, কিন্তু তৎ সত্ত্বেও এই ব্যাপারের গুরুত্ব দেখিয়া আমি- সাক্ষ্য সমুদয় বিবেচনা করিয়াছি। এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে এই মালসিংহের আদৌ কোন আত্মীয় নাই, তাহার পূর্ব্ব আবাসের কোন খবর নাই—কারণ আমি ইহা আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি যে—মেন্দুলওয়ালীতে তাহার এক আত্মীয় ভ্রাতা আছে। কারণ সেরূপ হইলে তাহাকে সাক্ষী ডাকা হইত। এবং এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে লাহোরের সাক্ষীগণ—একদল কৃষক এবং তাহাদিগকে আনা হইয়াছিল যে ফটো সম্বন্ধে তাহারা কিছুই জানিত না সেবিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এবং তাহাদিগের দ্বারায় এমন কতকগুলি বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে বাদীর সনাক্ত নির্দ্ধারিত হয়। ধর্ম্মদাস নাগা (প্রঃ সাঃ ৩২৭) যে মোকদ্দমা বাস্তবিক পক্ষে শেষ হইয়া গিয়াছিল তাহাই পুনর্জীবিত করিবার জন্য আদালতে আসিয়াছিল। অজুলার সাক্ষীগণ যাহা বলিয়াছে; রঘুবর সিংহের নিকটে যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে এবং যে প্রকৃত ধর্ম্মদাস নাগা ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় আসিয়াছিলেন তাঁহার কার্য্যাবলী এই সমস্ত গুলির সহিত যাহা মিল খাইবে এইরূপ বিবরণ এই সাক্ষীকে দিতে হইয়াছে।

এই লোকটীকে কিরূপে যোগাড় করা হইল—এ সম্বন্ধে একটী চমৎকার বিবরণ আছে। ইনস্পেক্টর মমতাজ উদ্দিনকে পাঞ্জাবে গিয়া—এই সাধুকে

যোগাড় করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং ঢাকা বিভাগের কমিশনারের নিকট হইতে তিনি একখানি পত্র লইয়া গিয়াছিলেন যাহাতে তিনি স্থানীয় পুলিশের নিকট হইতে সাধুর সন্ধান করিতে যাহা কিছু দরকার সমস্ত পাইতে পারেন। ১১।৭।৩৫ তারিখে ইনসপেক্টার মমতাজ উদ্দিন অমৃতসর হইতে যাত্রা করেন। ১।৮।৩৫ তারিখে তিনি তাঁহার ভ্রাতার সহিত দেখা করিতে কোনও এক স্থানে গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া অর্জ্জুন সিং পরদেশীর নিকট হইতে সাধু কোথায় আছে তাহা শুনিলেন, এই লোকটা অজুলার সাক্ষীদিগকে যোগাড় করিয়া দিল। সাধু কোথায় আছে তাহা জানিয়া তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া অর্জ্জুন সিং তাহাকে প্রস্তুত রাখিয়াছিল--সে— আমি পত্রের উল্লেখ করিয়াছি সেই পত্রটি উপস্থিত করিতে দার্জ্জিলিং গিয়াছিল, এবং সাধুকে বাহির করিবার জন্য তাহাকে স্থানীয় পুলিশ যাহাতে সাহায্য করে এই মর্ম্মে ডি, আই জি র একটি আদেশ করাইয়া লইয়াছিল। ইনসপেক্টার সাধুকে আদৌ না দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন, যদিও একমাত্র তিনিই বলিতে পারিতেন যে সেই লোকটা আসললোক কি না, যে লোককে রঘুবর সিংহের নিকট হাজির করা হইয়াছিল। ইনসপেক্টার মমতাজ উদ্দিনের সময় যত্রাটাই—একটা ছল মাত্র এবং যে পুলিশ কর্ম্মচারী ১৯২১ সালের সাক্ষীকে বাহির করিয়াছিল তাহাকেই পাঠান হইতেছে। এবিষয়ে রাজকর্ম্মচারীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইহাকরা হইয়াছিল।

সাধু স্বীকার করিতেছে যে সে অর্জ্জুন সিংহের সহিত আসিয়াছিল এবং তিনদিনের জন্য সত্য বাবুর বাড়ীর নিকটে একটা বাড়ীতে বাস করিয়াছিল (সত্যবাবু ও ইহা স্বীকার করিতেছেন), এবং তারপর সে ঢাকা আসিয়াছিল এবং ছুটীর পাঁচদিন পূর্ব্বে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসিয়াছিল। তাহার কাঠগড়ায় আসিবার পূর্ব্বে আমাকে বলা হইয়াছিল যে সাক্ষী কেবল পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলে, হিন্দী বা উর্দ্দু বুঝিতে পারে না, সুতরাং একজন দোভাষীর আবশ্যক হইয়াছিল। মেজর পাটনী দয়া করিয়া দোভাষীর কাজ করিতে রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা প্রতিপন্ন হইল যে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা ছল, লোকঠা উর্দ্দু বলিতে ও বুঝিতে পারিত, তাছাড়া ছোট ছোট বাংলা কথাও বুঝিত এবং জেরার সময় যে হিন্দী, উর্দ্দু মিশাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারিত, যদিও সে এইরূপ ভাণ করিতে চেষ্টা করিতে ছিল যে

সে কেবল মাত্র পাঞ্জাবী ভাষা বুঝিত। যদি ইহা ছল না হইবে তাহা হইলে যে ধরমদাস রঘুবর সিংহের সামনে বিবৃতি দিয়াছেন বলে
সে ধরমদাস হইবে না, কেবলমাত্র এই সংক্ষিপ্ত কারণ এই যে ধরমদাস সহজ উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার বিবৃতি দিয়াছিলেন এবং ঐ ভাষা বড় সহরে যে বাস করে এরূপ বাঙালী বুঝিতে পারিত; এবং যখনই ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে স্নরেন্দ্রনাথ একজন ঢাকার লোক, তাহার রিপোর্টে অনেক সংবাদ দিয়াছিল যাহা, সে ১৯২১ সালে সাংশ্রাতে ধরমদাসের সহিত সাক্ষাতের ফলে জানিতে পারিয়াছিল, এখনই কেসটী এইরূপ দাঁড়াইল যে এই ধরমদাস (প্রঃ সাঃ ২২৭) স্নরেন্দ্রের বিবৃতিমত সাংশ্রাতে এইরূপ আধ হিন্দী আধা বাংলায় কথা বলিয়াছিল যাহাতে সে তাহার কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। আপাততঃ এরূপ আশা করা হইয়াছিল যে পাঞ্জাবী ভাষা ও তাহার ব্যথ্যারূপ অন্তরায় এবং ছুটীর পূর্ব্বে পাঁচদিন এবং তাহাও আবার একটী রবিবার দ্বারা সংক্ষিপ্ত হইবে এবং অসুখের অজুহাতে তাহার বাড়ীতে সাক্ষীগ্রহণ এই সকলের দ্বারা সে রক্ষা পাইবে। কিন্তু ইহা তাহাকে রক্ষা করে নাই।

সে প্রথমে এই বলিল যে সে রঘুবর সিংহের সম্মুখে বিবৃত্তি দান করিয়াছে এবং তাঁহার সামনে এ (২৪) নং ফটো ও উহার একটী কপিতে তাহার চেলা স্নন্দরদাসের ফটো বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে। ফটোটীর উপরে রঘুবর সিংহের দ্বারা প্রদত্ত একজিবিট পি (১) এই চিহ্নটা নাই, এবং ফটো না দেখাইলে বিবৃতির কোনই মূল্য নাই। আমি জিজ্ঞাসা করায় মিঃ চৌধুরী বলিলেন যে রঘুবর সাক্ষীকে যে ফটোর দেখাইয়াছিলেন তাহা উহার কাছে নাই কিন্তু তিনি ইন্‌সপেক্টার মমতাজউদ্দিন ও স্নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট এই উপদেশ পাইয়াছেন যে ২৭।৬।২১ তারিখে রঘুবর সিংহের সামনে সাক্ষীদের যে ফটো দেখান হইয়াছিল এ ২৪নং একজিবিট সেই ফটোর একখানি কপি (২৫।৯৩৫ তারিখের ১২৪৩ নং অর্ডার দ্রষ্টব্য) সেই ব্যাপারের সহিত মিল রাখিয়া ধরমদাস বলিয়াছে যে—রঘুবর সিংহের সম্মুখে এ (২৪) ফটো দেখান হইয়াছিল। এই ফটোতে বাদী একটী লুঙ্গি পরিয়া বসিয়া আছে। প্রতিবাদীপক্ষের কে একজন যেন লক্ষ্য করিয়াছিল যে, স্নরেন্দ্রবাবুর রিপোর্ট আছে যে রঘুবর সিংহের সামনে সাক্ষীদিগকে যে ফটো দেখান হইয়াছিল উহা খাড়া ফটো (দণ্ডায়মান ফটো)। ইহা পরে এবং খুব দেরীতেই লক্ষ্য করা হইয়াছিল কিন্তু সাক্ষী তখনও কাঠগড়ায় ছিল এবং সে বলিল যে—রঘুবীর সিংহের সামনে তাহাকে যে ফটো

দেখান হইয়াছিল তাহা আদৌ বসিয়া থাকা ফটো নহে দণ্ডায়মান অবস্থার ফটো। পূর্ব্বে সে এ (২৪) নং বাসয়া থাকা ফটোটীর সম্বন্ধে হলফ করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছে কি না প্রশ্ন করায় সে বলিল যে সে উহা বলে নাই, অধিকন্তু আরও বলিল যে তাহার সাক্ষ্য লইবার উদ্দেশ্যে এক উকিল যখন তাহার বিবৃতি লইয়াছিল তখন তাহাকে এই ফটো দেখান হইয়াছিল এবং রঘুবর সিংহের সামনে যে এই ফটো দেখান হইয়াছিল—ইহা সে অস্বীকার করিয়াছিল। অর্থাৎ ইহা সত্বেও তাহার প্রামাণিক জবানবন্দীতে সাক্ষী তাহাকে এ (২৪) ফটো দেখান হইয়াছিল এবং সে স্বীকার করিয়াছিল যে এই ফটোই তাহাকে দেখান হইয়াছিল ; এবং মিঃ এ. চৌধুরী এই পরামর্শ পাইয়াছিলেন যে এ (২৪) ফটো ২৭.৬.২১ তারিখে প্রদর্শিত ফটোর একটী কপি।

আসল ব্যাপার কি ঘটিয়াছিল, তাহা বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। রঘুবর সিংহের নিকটে যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছিল তাহাকে বিবৃতিকারীর কোনও সহি বা টিপসহি নাই। ফটো না দেখাইলে উহার কোন মানেই নাই, এবং ঐ ফটোতে রঘুবর সিংহের একজিবিট পি (১) এবং তাঁহার সহি ছিল এবং খুব সম্ভবতঃ বিবৃতিকারীর টিপসহি ছিল অথচ তাহাতে সহি বা টিপসহি লওয়া হয় নাই। সাব ইন্‌স্‌পেক্টার মমতাজউদ্দিন্ অবশ্যই উহা লইত এবং সাধারণ ভাবে উহা সূচিত করে। একজিবিট পি ৮ সম্বলিত ফটো অন্য কোন লোকের ফটো হইবে, নিশ্চয়ই বাদীর ফটো নহে, কিংবা উহা ৩২৭ নং প্রঃ সাঃ ধর্ম্মদাস নাগার না হইয়া অন্য কোন লোকের সহি বা টিপসহি সংযুক্ত হইবে কিংবা একজিবিট, এই ফটো সরাইয়া না লইলে বিবৃতিদ্বারা বাদীর কোন ক্ষতি হইবে না, এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা বিবৃতির অংশ স্বরূপ ফটো যোগার করা হইয়াছিল। একজিবিট এ (২৪) এক উদ্দেশ্যে উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল কিন্তু সুরেন্দ্রের রিপোর্ট দ্বারা উহা ব্যাহত হইল এবং তখন এই গল্প সৃষ্টি হইল যে দাঁড়ান ছবি দেখান হইয়াছিল।

আমি বিশ্বাস করি না যে—পি (১) চিহ্ন কারা ফটো হারাইয়া গিয়াছে, এমনকি ২৫।৯।৩৫ তারিখেও উহা বলা হয় নাই ; উহা কৌঁসুলীর অধিকারে ছিল না। পরবর্ত্তীকালে কোন সাক্ষীর দ্বারা নহে পরন্তু কৌঁসুলীর দ্বারা উক্ত হইয়াছিল যে উহা পাওয়া যাইতেছে না। যদিও ইন্‌সপেক্টার মমতাজউদ্দিন বলিয়াছেন যে তিনি বিবৃতি ও ফটো মিঃ লিণ্ডসেকে প্রদান করিয়াছেন, এবং ইহা সকলেই জানে যে সাধু-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ পত্র বিশেষ ফাইলে রাখা

হইয়াছে। বিবৃতিটি পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু ফটোটি পাওয়া যাইতেছে না। যে ফটোটী দেখান হইয়াছিল তাহার পরিবর্ত্তে এই যে অপর একটী ফটো স্থাপন ইহাকে আমি কেবলমাত্র অতি জঘন্য ধরণের কৌশল বলিনা, ইহাকে জুয়াচুরী বলি।

যে ধর্ম্মদাস বিবৃতি দান করিয়াছেন তাঁহাকে যে ফটো দেখান হইয়াছিল সেই ফটো ব্যতীত বিবৃতির কোনই দাম নাই এবং এটী উপস্থিত না করা এবং তাহার পরিবর্ত্তে জুয়াচুরী করিয়া অন্য ফটো স্থাপনের চেষ্টা করা এবং উহা ব্যহত হইলে তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করা এই সমস্ত হইতেই এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে—ফটোর লোকটী সুন্দরদাস, এই বিবৃতি বাদীর ফটোর পরিবর্ত্তে অন্যের ফটো দেখাইয়া লাভ করা হইয়াছিল, এবং বাদীকে যে পরে সুন্দরদাস বলা হইয়াছে এই সুন্দরদাস নামের উৎপত্তি উক্তরূপে ঘটিয়াছিল।

বিবৃতিটি গেল বটে কিন্তু লোকটি রহিল। যে যদি রঘুবর সিংহের সামনে বিবৃতিদান না করিয়া থাকে তাহা হইলে সে বাদীর গুরু ধর্ম্মদাস নাগা নহে। নিম্নলিখিত বিবেচনা মতে মাত্র একটী সিদ্ধান্ত সম্ভব।

১। ইহা স্বীকার হইয়াছে যে ২৭।৬।২১ তারিখে এ (২৪) একজিবিট বিবৃতিকারীকে দেখান হয় নাই, কিন্তু এই লোকটী জুয়াচুরীর মতলবের একটী অংশ স্বরূপ হলফ করিতেছে যে উহা দেখান হইয়াছিল। সে পরে হলফ করিতেছে যে খাড়া ফটোটী দেখান হইয়াছিল, যাহা আদৌ দেখান হয় নাই, সেরূপ হইলে উহাতে একজিবিটি চিহ্ন থাকিত।

২। সে যদি সেই একই লোক হইত, তাহা একজিবিটি মার্ক বিশিষ্ট ফটোটি উপস্থিত করা হইত।

৩। অজুলার সাক্ষীগণ যে ভুল করিয়াছিল যে সে ভুল করিবে না। সে বলিতেছে যে মালাসিংহ স্থুলাকায় ছিল না। তাহার চুল আমার মত সোনালি ছিল—যেমন পাঞ্জাব হইতে আহূত একজন সাক্ষী বলিয়াছিল যে তাহার চুল ছিল 'কাক্কা ভুরা' এবং আর একজন স্যাক্ষী বলিয়াছিল কাক্কা অর্থাৎ তাহাব ব্যাখ্যা মতে ফিকে সোনালী।

৪। এই বিবৃতিকারী বলিয়াছে যে তাহার পেশা সেবাদার অর্থাৎ সে এক গুরুদ্বারের পুরোহিতের ব্যবসাধারী। এই সাক্ষী বলিতেছে যে সে কোন স্থানে সেবাদার নহে এবং সে সেবাদার এ কথা কখনও বলে নাই। দেবদাস সহ পাঁচজন সাক্ষী রঘুবর সিংহের সামনে ২৭।৬।২১ তারিখে বিবৃতি দিয়াছিল কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত ঘটনা জানে না। অবশ্য সে বিবৃতির মধ্যে এই বর্ণনা

করিতেছে কিন্তু নারায়ণ সিং ব্যতীত কোন আত্মীয়ের উল্লেখ করিতে সাহস করিতেছে না। সে বলিতেছে যে অজুলার সাক্ষীগণ মিথ্যা প্রমাণিত করিতেছে। সে বলিতেছে যে বহুবর্ষ পূর্ব্বে একদিন এক বাঙালী বাবু—ও একটী পুলিশের লোক তাহার কাছে গিয়াছিল এবং তাহাকে একটী ফটো দেখাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—সে কে? তাহারা আসিয়াছিল বেলা ৩টার সময় যখন সে ছোট সংস্রার সংলগ্ন গ্রামে গুরুকাবাস মন্দিরে অবস্থান কবিতেছিল। তাহারা তাহাকে একটী ফটো দেখাইয়াছিল, যে ফটোটি আদালতে তাহাকে দেখান হইল—একজিবিট এ (২১)—এবং পরে খাড়া ফটো। সে ফটো দিখিয়া বলিয়াছিল—আমার চেলা সুন্দরদাসকি হ্যায়। আমার চেলা সুন্দরদাসের ফটো। আগন্তুকেরা ইহা লিখিয়া লইল এবং আর কোন কথা বলিন। তারারা গুরুকাবাসে রাত্রি যাপন করিল এবং পরদিন প্রাতে তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রের নিকট লইয়া গেল এবং তথায় সে এই বিবৃতি করিল। ছুটীর পূর্ব্বে উহাই ছিল সমগ্র বিবরণ, এই বিবৃতি লইবার পূর্ব্বে ফটো দেখান ছাড়া আর কোন কথা হয় নাই এবং "উ লেক কে চুপ্"। ধরমদাসের সহিত সুরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল সে তাহার চেলা সেবাদাসের সহিত ফটোটা চিনিয়াছিল এবং তাহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল সুতরাং সে যে সংবাদ আনয়ন করিতেছিল তাহার সবটা না হইলেও কতকটা ধরমদাসের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। ছুটীর পরে ৩২৭ নং প্রঃ সাঃ কিছু কিছু কথা আরম্ভ করিল এবং রাত্রে দেবদাসের নিকট আসিল সুতরাং এরূপ বলা যাইতে পারে যে দেবদাস তথায় এবং তাঁহার সহিত ফটো দেখিয়াছিল। সে বলিতেছে যে তাহার সর্ব্বসমেত ৪।৫ জন চেলা আছে এবং পূর্ব্বে সর্ব্বসমেত ১২ জন চেলা ছিল এবং টাকা পাঠানের কথা দূরে থাকুক তাহারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিত না। তাহার সাক্ষ্যে যে সব মিথ্যার ছাপ রহিয়াছে সেগুলি নির্দ্দেশ করা বিরক্তিকর। একজিবিট পি (১) এর পরিবর্ত্তে অন্য একটা ফটো স্থাপন করিবার চেষ্টা এবং উহা ব্যাহত হইলে তৃতীয় ফটো স্থাপনের চেষ্টায় সে সহযোগিতা করিয়াছিল এবং উহাই চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিতেছে যে—একজিবিট পি (১) তাহাকে নষ্ট করিবে। রঘুবীর সিংহের সমানে যে বিবৃতি দান করিয়াছিল সে সে-লোক নহে, সুতরাং বাদীর গুরু নহে।

তাহার সাক্ষ্য শেষ হইলে তাহাকে খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করা হইয়াছিল। একজন উকিল বরাবর পঞ্জাব গিয়াছিল, তাহাকে

রঘুবর সিংহকে দেখাইয়াছিল এবং রঘুবর সিংহ সত্যবাবুর পরিচিত সুন্দর সিংহের চিঠি পাইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহার যে ফটো রাখা হইয়াছিল সেটীকে তাঁহার সমক্ষে বিবৃতিদানকারী ধরমদাসের ফটো বলিয়া সনাক্ত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে—তিনি পূর্ব্বে তাঁহাকে জানিতেন না। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে তাহার সাক্ষ্যদানের পরদিন উকিল তাহাকে তাহার গৃহে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে—তিনি একদিনের জন্যও তাহাকে দেখেন নাই এবং তাহার সাক্ষ্য হইতে ইহা পরিষ্কার জানা যায় যে ছয়জন লোকের বিবৃতি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাদের সম্বন্ধে তাহার আদৌ কোন স্বতন্ত্র স্মৃতি নাই এবং সুরেন্দ্রের রিপোর্টে উল্লিখিত বিষান দাস প্রভৃতি আর তিনজনের কিছুই স্মরণ নাই।

এই ধরমদাসকে ১৯২১ সালে ঢাকায় সে কি করিত জিজ্ঞাসা করায় সে বলিতেছে যে সে সুন্দরদাসকে (বাদীকে) সে যে ঘরে বাস করে সেই ঘরে দেখিয়াছিল কিন্তু তাহার সহিত বাক্যালাপ হয় নাই। সে নন্দ্রের বাড়ীতে গিয়াছিল (আনন্দ রায়কে সে নন্দ্র বলিত)—তাহাকে একটি ফটো দেখান হইয়াছিল এবং তাহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারে নাই বলিয়া সে আবার গিয়াছিল। এবারে একজন শিখ দোভাষী ছিল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল ফটোটি কাহার, এবং সে বলিয়াছিল যে সেটা সুন্দরদাসের, কুমারের নহে। ইহাই সব। আপাততঃ এরূপ অনুমান করা হইয়াছিল যে সে এই বলিয়া ঢাকার ব্যাপার হইতে রক্ষা পাইবে যে সে কাহারও সহিত কথা বলে নাই—সে কাহারও কথা বুঝিতে পারে নাই, কেহই তাহার কথা বুঝিতে পারে নাই এবং এই জন্যই সে দোভাষীর জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে সকলেই তাহার কথা বুঝিতে পারিত এবং সুরেন্দ্রবাবু বলিতেছেন যে ১৯১১ সালে জুন মাসে সাংগ্রারায় তিনি তাহার আধাবাংলা ও আধা হিন্দি কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আরও যদি কিছু প্রয়োজন থাকিত তাহা হইলে সেটা ছিল তাহার তলপেটের স্ফীতি—একটা প্রকাণ্ড জিনিষ—এবং সে উহা লম্বা সার্ট দ্বারা ঢাকিতেছিল, সে বলিতেছে যে সে যখন ঢাকায় আসিয়াছিল তখনও উহা ছিল, কিন্তু কেহ উহা দেখিতে পায় নাই, কারণ সে ভোর চারটার সময় স্নান করিত, এবং তাহার আসিবার পূর্ব্বে সাক্ষীরা বলিয়াছে যে গুরু সর্ব্বদা মালা জপিতেন, কিন্তু ইহা না জানিয়া ঐ সাক্ষী ভুল করিয়া বলিল যে সে কখনও মালা জপে নাই।

শিখ উকিল আবার সাংস্রায় ছুটিলেন এবং গুজ্জর সিং, চন্দ্র সিং, বুর সিং ও ভগত সিং নামে চারজন সাক্ষীযোগাড় করিয়া আনিলেন, সে যে ২৭।৬।২১ তারিখে সাংস্রায় ছিল তাই সামঞ্জস্য করিতে, এবং বহু পরে আসিলেন ইন্‌সপেক্টার মমতাজুদ্দীন ও সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তাঁহারা যে বিবরণ দিতেছেন তাহা এই ইনস্‌পেক্টার ও সুরেন্দ্র ২৬শে জুন তারিখে সংস্রারায় গেলেন এবং গুজ্জর সিং নামক তৎকালীন এক ডাক্তারের ছাত্র, এক দোভাষী ও তাহার পিতার সহিত গুরুকাবাদে ধরমদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তারপর সেই রাত্রি ধরমদাস সাংস্রারায় গুরুদ্বারে গমন করিলেন। তথায় দেবদাস সেবাদার ছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে—তিনি বিবৃতি করিবার নিমিত্ত একা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে গেলেন এবং তারপর অন্যান্য সাক্ষীরা গেল, সুতরাং তিনি বাকী সকলকে দেখেন নাই। এমনকি তাঁহার চেলাকেও দেখেন নাই। সুরেন্দ্র বাবু তাহাকে দেখার পর তাঁহার বিবৃতি আরম্ভ করিলেন এবং তাহাকে থাড়া ফটো দেখান হইয়াছে, দেখিয়া তিনি জুন মাসের গরমে পাঞ্জাবে চলিয়া গেলেন এবং অমৃতসর হইতে ৮ মাইল দূর হইতে একদল সাক্ষী পাঠাইলেন এবং তাহাদের বিবৃতি অনুমান করিয়া তাহার রিপোর্ট পাঠাইলেন কিন্তু উহা ঘটিল না। আমি এই বিবরণের একটী কথাও বিশ্বাস করিনা, কারণ প্রঃ সাঃ ৩২৬ ধরমদাস যে যে বিষয়ে অজ্ঞতা দেখাইয়াছিল সেই সকল জ্ঞান ধরমদাসের ছিল না ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য এবং অগত্যা একবার তাহাকে দেবদাসের সংস্পর্শে আনিবার জন্য যাহাতে তাহারা একসঙ্গে ফটোটা দেখিতে পায় এই সকল উদ্দেশ্যে রিপোর্টটা বুদ্ধি করিয়া রচিত হইয়াছিল. কিন্তু রিপোর্ট অনুসারে তাহাকে নির্ব্বাক করিয়া রাখাও সম্ভবপর ছিলনা। এই দেবদাস ছোট সাংস্রারার সেবাদার। এই ছোট সাংস্রার হইতে যে সাক্ষীগুলি আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ভগত সিং একজন। ভগত সিং বলিতেছে যে সে সেই ভগত সিং যে একটা অপরিচিত ফটো দেখিয়া রঘুবরের সম্মুখে বিবৃতি দিয়াছে এবং সে সুন্দর দাসকে জানিত বলিয়া প্রকাশ করিতেছে, কারণ ধরমদাস নাগা তাহার চেলা দেবদাসকে দেখিতে ছোট সাংস্রায় আসিতেন। দেবদাস ২০ বৎসর ধরিয়া সেই গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। শিখ উকিল এই একদল সাক্ষী আনিতে গেল কিন্তু তথাকার গুরুদ্বারে সেবাদার দেবদাসকে আনিলনা, ইহা বোধ হইতেছে যে দেবদাস রঘুবর সিংহের সামনে কি ফটো দেখান হইয়াছিল

তাহা বলিয়া দিত এবং এই ধরণের লোক আদাসতে কিছুতেই এই লোকটাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন না।

এই দলের সহিত আর দুইজন লোক আসিয়া ছিল, উহাদিগকেও শিখ উকিল আনিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজনের ধরমদাসের গুরু হরনাম দাস। তিনি ৩২৭ নং প্রঃ সাঃ ধরমদাসের ফটোকে তাহার দেশী ধরমদাস বলিয়া সনাক্ত করিয়াছিলেন এবং বাদীকে তাহার চেলা চেলা সুন্দরদাস বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন। ধরমদাস ও হরনাম দাসের সমস্ত বিবরণ বাদীর সাক্ষী দর্শনদাসের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু একটী কথা পাওয়া যাইতেছে না। দর্শনদাস বলিয়াছেন যে তাঁহার গুরু লুধিয়ানা জেলার বিলু নামক স্থানের এক গৌর ব্রাহ্মণ। লোকটী দর্শনদাস ওরফে গোপালদাসকে চেনা বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, দিলুকে গ্রহণ করিতেছে কিন্তু সে জানেনা যে সে একজন গৌর ব্রাহ্মণ। সে বলিতেছে যে ধরমদাস ১০।১১ বৎসর পূর্ব্বে সুন্দরদাসকে তাহার চেলা করিয়াছিল এবং সে নিজে ধরমদাসকে ২০ বৎসর পূর্ব্বে দীক্ষা দিয়াছিল। সে যখন বলিয়াছেন যে সে বাকী দলের সঙ্গে আসে নাই, পরন্তু ঢাকা আসিবার পূর্ব্বে প্রায় তিনদিন কলিকাতায় ছিল তখন সে ইচ্ছা পূর্ব্বক মিথ্যা বলিয়াছিল। গুর্জ্জর সিং ও চন্দন সিং তাহাকে লুকাইতে ছিল কিন্তু ভগত স্বীকার করিতেছিল যে এই লোকটী সমেত সমস্ত দল কোথাও না থামিয়া একসঙ্গে ঢাকায় আসিয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে ভালসা দেওয়ানের লোক অর্জ্জুন সিং এই জাল ধরমদাস নাগাকে সংগ্রহ করিয়াছিল, যাহাতে সে আসিয়া বলিতে পারে যে যে ব্যক্তি ১৯২১ সালে রঘুবর সিংহের সমক্ষে বিবৃতি দিয়াছিল সে সেই লোক। সে আসিল এবং তারপর এই বিবৃত যাহাতে বাদীর বিপক্ষে যায় ফটো বদলাইয়া সেই চেষ্টা আরম্ভ হইল। এবং তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ভান করিবার জন্য যে ইনসপেকটার মমতাজ উদ্দিন পাঞ্জাবে গিয়াছিলেন এবং যে সাক্ষী দিতে আসিবার পূর্ব্বে কখনও তাহাকে দেখে নাই—তাঁহাকেই আসিতে হইল এবং তিনি ১৯২১ সালে যে সাধুকে দেখিয়াছিলেন সেই সাধু বলিয়া এই লোকটাকে সনাক্ত করিতে হইল এবং কৌশুলীকে ফটোটী উপবিষ্ট ফটো পরামর্শ দেওয়ার পর বলিতে হইল যে তাহাকে খাড়া ফটো দেখান হইয়াছিল। ইহাকে ভুল হইয়াছিল বলা চলে না, পরন্তু রঘুবর সিং যে ফটোটীতে একজিবিট পি (১) চিহ্ন দিয়াছিলেন সেইটীর পরিবর্ত্তে বাদীর একটী ফটো স্থাপন করার নীচ ষড়যন্ত্রের অংশ বলা চলে।

আমার মত এই যে ২১৭ প্রঃসাঃ ধরমদাস নাগা যে কোন লোক হইতে পারে। নারোয়াল বাসী হইতে পারে তাহার নাম ও ধরমদাস হইতে পারে (উহা পাঞ্জাবে একটা সাধারণ নাম)। কিন্তু সে লোক না যে ১৯২১ সালে রঘুবর সিংহের সম্মুখে বিবৃতি দিয়াছিল। প্রতিবাদীদের কেস হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে বাদীর যিনি গুরু এবং যিনি ১৯২১ সালে ঢাকায় আসিয়া ছিলেন এই লোক সে ব্যক্তি নহে। এমন কি আমি যে সকল সাক্ষী মানিয়া লইতেছি সেগুলি না থাকিলেও যথা, যে ধরমদাস ১৯২১ সালে ঢাকা আসিয়া ছিলেন তিনি বিভিন্ন লোক এবং তাঁহার তলপেটে স্ফীতি ছিল না। গুরু পাঞ্জাব পুলিশের নিকট বিবৃতি দান করিয়াছে এই স্বীকারোক্তি রঘুবর সিংহের নিকট বিবৃতির স্বীকারোক্তি নহে। গুরু এই বিবৃতি করিয়াছে ইহা ধরিয়া লইলেও তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ না করিলে উহা সাক্ষ্য হইবে না, এবং যদি তাহাও হয় তাহা হইলেও যে ফটো দেখান হইয়াছিল তাহা ব্যতিরেকে ইহার কোন অর্থ নাই। আমার মত এই যে উহা যে বাদীর ফটো তাহা প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ বাদীর উপর যে সুন্দর দাস নাম আরোপ করিয়াছিল সেই নামের আবিষ্কার হইয়াছে যে রিপোর্টের ফলে সেই রিপোর্ট সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়াই গৃহীত হইয়াছিল এবং যে বিবৃতির ফলে উহা আবিষ্কার করিয়াছিল সেই বিবৃতি অন্য লোকের ফটো দেখাইয়া গৃহীত হইয়াছিল এবং সেই ফটো এখানে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা নীচতর কার্য্য প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র—এমন এক ব্যক্তির কল্পনা যে—কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য একটা তাড়াতাড়ি রিপোর্ট চাহিতে ছিল এবং ইহা বিদিত যে ইহা মেজরাণীর নিকট এমন সময়ে টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল যখন তিনি বা সত্যবাবু ভয় করিতে ছিলেন যে প্রতারক ঘোষণা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

আমি এই সাব্যস্ত করিলাম যে ইহা প্রমাণিত হয় নাই যে বাদী অজুলার মালসিংহ এবং ২২৭ প্রং সাঃ ধরমদাস নাগা তাহার গুরু নহে।

এষ্টেট্ তাহার সমস্ত উপায় সত্ত্বেও এবং গভর্ণমেণ্টের সাহায্য সত্ত্বেও ১২ বৎসরের মধ্যে বাহির করিতে পারিল না যে বাদীকে যদিও বরাবর কলিকাতা ও ঢাকায় বাস করিতেছিল এবং একদিনের জন্যও লুকাইয়া থাকে নাই।

কিন্তু সে যেই হউক, সেকি হিন্দুস্থানী ? আমি ইহার উত্তরে বলিব, না, এবং তাহার সংক্ষিপ্ত কারণ এই যে আমি যে সমস্ত সাক্ষ্য আলোচনা করিয়াছি

প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য এবং দেশের চিহ্ন সকল এবং আমি যে সকল ব্যাপার দেখিয়াছি এবং তৎসহ হাতের লেখা পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ করিতেছে যে সেই কুমার। কিন্তু আমি দার্জ্জিলিঙের মৃত্যুর ন্যায় এ বিষয়ের সাক্ষ্যেরও আলোচনা করিব; এবং এই বিতর্কে মেজকুমারের বিদ্যাবত্তাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়াছে।

প্রতিবাদী পক্ষের বক্তব্য এই যে ১৯২১ সালে বাদী হিন্দী বলিত এবং তাহা অদ্ভুত ও দুর্ব্বোধ্য হিন্দী অর্থাৎ পাঞ্জাবী ভাষা, এবং কমিশন সাক্ষী মিষ্টার ঘোষালের নিকট এই উক্তি করা হইয়াছিল যে ১৯২৪ সালে যখন ঘোষাল বাদীর সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন বাদী বাংলা বলিতে পারিত না। এই বলা হইয়াছে যে বাদী পরে ইহা শিক্ষা করে এবং তাহার ফল প্রাথমিক জবানবন্দীতে দেখা গিয়াছে।

বাদীর বক্তব্য এই যে সে হিন্দী বলিত এবং প্রায় ১২ বৎসর ধরিয়া সে ঐ সন্ন্যাসীদের সহিত বাস করিয়াছিল, তখন সে কেবল হিন্দীই বলিত এবং ৪।৫।২৬ তারিখে তাহার আত্ম পরিচয় পর্য্যন্ত সে কেবল হিন্দীই বলিত, এবং তারপর সে বাংলা বলিতেছে। মেজকুমার পূর্ব্বে নিছক ভাওয়ালী ভাষায় কথা বলিত কিন্তু সে হিন্দী বলিতেও পারিত। তাহার ভাওয়ালী ভাষা এরূপ ছিল যে একজন কলিকাতায় সাক্ষী যে তাহাকে ১৯০৬ এবং ১৯০৮ সনে দেখিয়াছে সে বলিবে সে উহা প্রায় বুঝিতেই পারিত না (বাঃ সাঃ ২১২) পুস্তক পড়িয়া যাহার ভাষা মার্জ্জিত হয় নাই এরূপ অশিক্ষিত লোকের ভাওয়ালী ভাষা পশ্চিম বঙ্গের অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারে।

আদালতে বাদী বাংলা ভাষায় সাক্ষ্য দিয়াছিল, এবং সে যে কতকগুলি হিন্দী কথা ব্যবহার করিয়াছিল আমি সে কথাগুলি হিন্দী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। ইহা প্রতিপন্ন হইল যে আমি যাহা হিন্দী ভাবিয়াছিলাম এরূপ কতিপয় কথা বাস্তবিক স্থানীয় কথা। উদাহরণ স্বরূপ তিতর কথা পশ্চিমবঙ্গে কথাটা হইতেছে 'তিতির' (পাখি)। ইহা দেখা যাইতেছে যে ভাওয়ালে এই শব্দটী 'তিতর' উচ্চারিত হয়। সেইরূপ গিন্‌তে। পশ্চিমবঙ্গে কথাটা হইতেছে 'গুণতে' (গননা করিতে), কিন্তু প্রতিবাদীপক্ষের এক উকিল সাক্ষীকে প্রশ্ন করিবার সময় 'গিনিতে' কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে ভাওয়ালের নিরক্ষর লোকে ঐরূপ ব্যবহার করে। (বাঃ সাঃ ৫২০) কলিকাতার হিন্দী উচ্চারণ 'কল্‌কাতা'। আমি একজন ভাওয়ালের লোকের দ্বারা লিখিত একটা বাংলা-পুস্তিকায় 'কলকাত্তা'

কথাটি দেখিয়াছিলাম (একজিবিট টি) ফণীবাবুর জয়দেবপুরের বাড়ীর নাম নয়াবাড়ী। যদি উহা জানা না থাকিত এবং বাদী যদি বাড়ীটাকে নয়াবাড়ী বলিত তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হিন্দুস্থানী বলিয়া ধরা হইত। কথার উপর সিদ্ধান্ত করা বিপজ্জনক।

এরূপ করিবার প্রয়োজনও নাই। কারণ এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে বাদী হিন্দী বলিয়া ফেলিত এবং উহা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিত। সে ইংরাজিও বলিয়া ফেলিত—৫০এর অধিক ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল-- যথা বিস্কুট, বডিগার্ড, জেলী, স্কুল, জজ ইত্যাদি। আমার ধারণা এমন কোন ভারতবাসী নাই যে কতকগুলি ইংরাজী কথা জানে না, যথা ট্যাক্সি, ট্রেণ, রেলওয়ে, গার্ড, ডাবস্ এবং যাহারা ইংরাজী জানে তাহারা তর্কের খাতিরে না হইলে পাঁচ মিনিট ধরিয়া ইংরাজী কথার ব্যবহার না করিয়া বাংলায় কথা বলিতে পারে না।

সুতরাং বাদী যখন সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে ১২ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছিল এবং হিন্দী ব্যতীত কিছুই বলে নাই, এবং তাহাদের মত জীবনযাপন করিতেছিল উলঙ্গভাবে—বেড়াইতেছিল, খোলা ভূমিতে শয়ন করিত, বালিশের পরিবর্ত্তে কাঠের গুঁড়ি মাথায় দিত এবং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিত এবং এই সমস্তই তাহার যৌবনের প্রথম অবস্থায় করিয়াছিল, তখন আমি আশা করি যে সে তাহার মাতৃভাষার মতই হিন্দী বলিবে এবং তাহাদের কথার টান ও উচ্চারণ ভঙ্গিলাভ করিবে, সুতরাং সে যখন আবার বাংলা বলিতে আরম্ভ করিল তখন আমি আশা করি না যে সে মধ্যে মধ্যে বাংলা বলিবে না, বা আদৌ হিন্দী বলিবে না বলিয়া সম্ভাবনা করিবে।

কেহই এমন কথা বলে না এবং ইহা বলাও বোকামি হইবে যে যেমন সে আত্মপরিচয় ঘোষণা করিল অমনি সে যেমন লোকে কাপড় ছাড়িয়া ফেলে অমনি সে হিন্দীভাষা পরিত্যাগ করিবে। সুতরাং ইহা দেখিতে হইবে যে এই হিন্দীসুর ও মধ্যে মধ্যে এই হিন্দীবুলীর এবং হিন্দীসুরে ভাওয়ালীবুলী ভাওয়ালীর মত না বলা ইহাতে কি এই প্রমাণ হয় যে—একজন হিন্দুস্থানী বাংলা বলিতে শিখিয়াছে, না একজন বাঙালী কথা বলিবার হিন্দী ধরণ অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে দুইটী জিনিস অবিলম্বে বর্জ্জন করা ভাল, তাহাদের মধ্যে একটী হইতেছে এই মত যে, কোন বাঙালী যতদিনই হিন্দীভাষী

লোকেদের মধ্যে বাস করুক না সে হিন্দী টানলাভ করিতে পারে না। অভিজ্ঞতা ইহা অস্বীকার করিতেছে। মিঃ ও, সি, বাঙ্গালী, কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তিনি সলিসিটর ও বিখ্যাত কলাবিদ্। তিনি এই মত পোষণ করেন যে সকল বাঙালী তাহাদের পরিবার লইয়া পশ্চিমে বাস করেন তাহাদের সম্বন্ধে একথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু যখন বলা হয় যে—বাংলাভাষার উচ্চারণ ভঙ্গী, হিন্দী বা বিদেশী দোষ শূন্য তখন আমি তাহার সহিত একমত নহি। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করা দরকার বোধ করি না কিংবা যাহারা ইংরাজী ধরণে ইংরাজী বলে সেরূপ ভারতবাসী-দের উল্লেখ করি না, কারণ আমার সামনে একজন বাঙালী সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তাহার উচ্চারণের টান হিন্দুস্থানী, সুতরাং তিনি যদি ভিন্নপক্ষে কথা বলিতেন তাহা হইলে কেহই মনে করিত না যে তিনি বাঙালী। তিনি স্বামী নিত্যানন্দ সরস্বতী (বাঃ সাঃ ৯৯০) তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর এবং তিনি ২২ বৎসর বয়স হইতে প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীদের সহিত বাস করিয়াছেন ও ফিরিয়াছেন। অমলেন্দু নামক আর একজন সাক্ষী ঢাকার সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। তিনি বলিতেছেন যে তাঁহার পিতা স্বামী বিষ্ণুজিৎ—প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন এবং একবার যখন তিনি বাড়ীতে দেখা করিতে আসেন তখন তাঁহার কথার টান হিন্দী হইয়াছিল।

আর একটী বিষয় হইতেছে বাদীর কথায় সামান্য বাধ বাধ ভাব। সাক্ষীগণ ইহাকে বলিয়াছে, বাজা বাজা, ভার ভার, চিবান চিবান, আটকা আটকা, ঠেকা ঠেকা, চাপা চাপা, আরা আরা, যেন কথাগুলি উঠিতেছে কিংবা চিবাইয়া বলা হইতেছে, যেন জিহ্বায় আটকাইয়া যাইতেছে, অস্পষ্ট হইতেছে, মন্থর গতিতে হইতেছে, অস্পষ্ট, ভারী ইত্যাদি। জিনিষটী বর্ণনা করা অসম্ভব, কিন্তু কথা বলিবার সময় মুখে একটা জিনিষ রাখিলে যেরূপ হয় কতকটা সেরূপ। মিঃ চৌধুরী বলিতেছেন যে, ভাষা তাহার নিজের নয়, তাহাই বলিতে যাওয়াই এরূপ ইতস্ততঃ হইতেছে, এবং বাহ্যতঃ এই কারণে প্রতিবাদীপক্ষের কোন সাক্ষী এই লক্ষণটির উল্লেখ করে নাই, কারণ তাহারা বলিয়াছে যে—এবং তাহারা ইহা বলিতে বাধ্য যে তাহারা তাহাকে হিন্দী বলিতে শুনিয়াছে, অবশ্য ইহা কত দূর সত্য তাহা পরে দেখা যাইবে। উহা সেরূপ কিছুই নহে। উহা তাহার কথা বলার একটা বিশেষ লক্ষণ। মিঃ ষ্টিফেন যাহার কাছে বাদী হিন্দীতে কথা বলিয়াছেন, তিনিও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মিঃ রামরতন সিবা মাসে পাঁচশত টাকা বেতনের উচ্চপদের ইঞ্জিনার এবং তিনি

একজন পাঞ্জাবী। ১৯২৫ সালে তিনি ৭নং বোস-পার্কে বাস করিতে বাদীর সহিত প্রায়ই হিন্দীতে তাঁহার কথাবার্ত্তা হইত। তিনি এই অস্পষ্টতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন যে বাদীর হিন্দী হইতেছে বাঙালীর হিন্দী। সে বাংলা কথা খিশাইয়া কথা বলিত এবং তাহার মতে পাঞ্জাবীর পক্ষে এরূপ করা অসম্ভব হইত। আমি এই সাক্ষীকে বিশ্বাস করি।

আমি এবিষয়ে এক মত নই যে বাদীকে তাহার বাক্যের এই বিশেষ লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে হইবে নচেৎ অন্য উপায়ে লব্ধ-সনাক্ত নষ্ট হইবে।

যদি ইহা জন্মগত না হয় তাহা হইলে যে সনাক্ত অন্যভাবে পরিষ্কার তাহা ইহা দ্বারা অদৌ নষ্ট হয় না। তাহার জিহ্বার তলস্থ পুংকোষের দ্বারা এরূপ হইতে পারে কিংবা ইহা তাহার জন্য নয় এবং বাদী বা অন্য কেহ বিষ বা অন্য কোন কারণের উল্লেখ করিতে পারিত এবং আসল কথা এই হইতে পারে যে কেহই ইহার কারণ জানে না। কিন্তু এইরূপ হইয়াছে। এইরূপ ঘটা যদি অসম্ভব হইত, তাহা হইলে হয়ত সনাক্ত করণের সহিত ইহার সম্বন্ধ থাকিত, কিন্তু পুংকোষ সিফিলিস, জিহ্বার উপরের দাগ এবং অজ্ঞাত অন্য কোন কারণের কথা বিবেচনা করিলে কেন যে ইহা ঘটা সম্ভব নয় তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না। এবিষয়ে জল্পনা কল্পনা করা নিরর্থক—যেরূপ জল্পনা কল্পনা বাদীর বা তাহার অপর লোকে করিয়াছে—কিন্তু অসম্ভবের কথা বলিতে গেলে উভয় পক্ষে কোন বিশেষজ্ঞ একথা বলে নাই যে ইহা অর্জ্জন করা যায় না কিংবা বাকযন্ত্রের যথেষ্টরূপ দোষ না থাকিলে যথা চেরা জিহ্বা না হইলে ইহা ইহা হইতে পারে না। অসম্ভব সম্বন্ধে বলিতে গেলে ডাক্তার টমাসের —Reading in abnormal Psychology নামক পুস্তকে ৩৯১—৩৯৪ পৃষ্ঠায় বাক বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে একটি অধ্যায় আছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উহাও লিখিত আছে যে মহাযুদ্ধের সময় যে সকল সৈন্যগণের স্নায়বিক অবসাদ ঘটে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের বাক্‌দোষ রোগ দেখা গিয়াছিল—ইহা ছিল এক রকম তোতলান এবং ইহার নাম হইয়াছিল 'যুদ্ধ-তোতলান'। কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকদিনের মধ্যেই—কথা বলিবার অবস্থা ভাল হইয়া গিয়াছিল কিন্তু শতকরা ৫টী ক্ষেত্রে এই অবস্থা বদ্ধমূল হইয়াছিল এবং এখনও এমন অনেক সমর প্রত্যাগত সৈনিক আছে যাহাদের বাক্য-কথনে বিশৃঙ্খলা রহিয়া গিয়াছে। (পৃষ্ঠা ৩৯২)

আমি সাব্যস্ত করিতেছি যে এই বাক্য-কথনে বিশৃঙ্খলা জন্মগত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই, এবং ইহা অন্য ভাষা বলিবার দ্বিধা বোধের জন্য নহে।

বাদীর বাক্য কথন সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে এরূপ বহু প্রমাণ আছে যে সে তাহার স্বরূপ ঘোষণা করার পর সে বাঙলা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভগ্নিও ও আত্মীয় গণের কথা ছাড়িয়া দিয়াও এমন বহু সংখ্যক সাক্ষী যাহারা ১৯২১ সালের কথা বলিয়াছে। এই সকল সাক্ষীর মধ্যে রহিয়াছে বাঃ সাঃ ৬২ রেবতী বসু—উকিল যাহার কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ:—

বাঃ সাঃ ২৬৩ যোগেশ রায় বি, এ, হেড্ মাষ্টার, যাহার কথা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি (জুন ১৯২১)

বাঃ সাঃ ৩৫৫ পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, ঢাকার প্রকাশ পত্রিকার সহঃসম্পাদক এবং পক্ষিতত্ত্ববিদ্। ইনি সনাক্ত করণের সাক্ষী নহেন। (জুন ১৯২১)

বাঃ সাঃ ৩৮৭ অরুণ নাগ (মে ১৯২১)

বাঃ সাঃ ১৫৫ মণীন্দ্র বসু, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট প্রবীণ অধ্যাপক (অক্টোবর ১৯২১)

বাঃ সাঃ বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট (কমিশন সাক্ষী), ইনি বহুকাল ধরিয়া হাইকোর্টে ভাওয়াল এষ্টেটের উকিল ছিলেন।

আমি মাত্র কয়েকটা নাম নির্ব্বাচিত করিয়াছি, কিন্তু আরও অনেক রহিয়াছে, তাহারা ভাওয়ালের লোক, সেই মেজ কুমার ঢাকায় যে সকল লোকের সহিত মিশিয়া ছিলেন সেই সকল লোক, এবং তাহারা তাহার সহিত কথা বলিয়াছিল এবং সেও তাহাদের সহিত কথা বলিয়াছিল, এবং তাহারা সকলেই বলিতেছিলেন, বাদী হিন্দীস্বরে বাংলাতে বলিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীকার করিতেছে যে সে হিন্দী কথাও ব্যবহার করিয়াছিল এবং যে সকল লোক হিন্দীতে কথা বলিয়াছিল তাহাদের সহিত সময় সময় হিন্দীও বলিয়াছিল। অসংখ্য লোকে তাহাকে জয়দেবপুরে ও ঢাকাতে নিশ্চয়ই দেখিয়াছিল এবং নিশ্চয়ই তাহার সহিত কথা বলিয়াছিল এবং যাহাদেরমধ্যে—বাদী অবশ্য অনেকগুলি সাক্ষী আসিয়াছে।

বিবাদী পক্ষের কয়েকটি সাক্ষী—সাক্ষ্যের বিষয়।

কিন্তু প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষী ২।৩ জন মৈমনসিংহের অতি নিঃস্ব উকিল ও নারায়ণগঞ্জের ২জন যুবক মোক্তার এবং একটা লোক যে পূর্ব্বে চরসিন্দুর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিল এবং তাহার নিজ সাক্ষ্যমতে মাহিনাচুরির জন্য কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল, এবং এরূপ সন্দিগ্ধ চরিত্রের অপর কতিপয় ব্যক্তিকে মাত্র সাক্ষ্যরূপে আনিয়াছে। যাহা হউক কতিপয় অন্য লোক ও আছে এবং তাহাদের সাক্ষ্য সম্যক বিবেচিত হইবে।

১৯২১ সাল সম্বন্ধে বলিতে গেলে, বাদী যে পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলিতেছিল এবং বাংলা ভাষার একটা কথাও বুঝিতে পারিত না, এই ব্যাপারটী—অজুলার সাক্ষীগণ যাহা প্রমাণ করিতে চাহিতেছিল অর্থাৎ সে যে নানকানা হইতে আসিতেছে এই ঘটনার সহিত সঙ্গতি-বিশিষ্ট ছিল। কিন্তু ইহা তর্কের অযোগ্য। নদীর ধারে লোকে তাহার সহিত বাংলায় কথা বলিত। দেবব্রত বাবুর সাক্ষীই এবিষয়ে চূড়ান্ত।

তাহার আত্মপরিচয়ের পর ১৯২১ সালের মে মাসে জয়দেবপুরে সে বাংলায় কথা বলিতেছিল, হিন্দীটানে বাংলা এবং হিন্দী কথা মিশান বাংলা, এবিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। মিষ্টার নিডহ্যামের রিপোর্টে (একজিবিট ৫৯ বলিতেছেন যে লোকটী বাংলা বুঝিতে পারিত না। কিন্তু যখন কোর্ট অব ওয়ার্ডস বাদীর বিরুদ্ধে গিয়াছিল, সেই সময়ে ৬ই মে তারিখে লেখা মোহিনী চক্রবর্ত্তী রিপোর্টে লোকটীকে প্রতারক বিবেচনা করিবার কারণ স্বরূপ বাংলা বলিবার বা বুঝিবার অজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার আর একটী কারণ দেখিতেছি। প্রতিবাদী পক্ষ পাঞ্জাব হইতে যে সকল সাক্ষী আনয়ন করিয়াছেন তাহারা আদালতের এই উপকার করিয়াছে যে আদালত দেখিতে পাইয়াছে যে পাঞ্জাব হইতে নবাগত ব্যক্তি কিরূপ আচরণ করে এবং আমি বিবেচনা করি যে তাহাদের মধ্যে সেই যদি বাঙালী হইবার ভাণ করিত তাহা হইলে সে হাস্যাস্পদ হইত। সে বাংলা ভাষার একটী কথাও বুঝিতে পারিত না এবং তাহার সমস্ত আচরণ তাহাকে ধরাইয়া দিত এবং পাগল না হইলে কোন ব্যক্তিই স্বপ্নেও তাহাকে বাঙালী বলিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিত না এবং অনুসন্ধান দাবী করিতে কালেক্টারের সম্মুখে হাজির করিত না। রায় সাহেবের তৎনমুনা সাক্ষ্যের মধ্যে—এই কথাটী আছে যে বাদী বাংলা বলিতে

পারিত না এবং তিনি এক্ষণে যে সাক্ষাৎকারের কথা বলিতেছেন ঐ সকল সাক্ষাৎকার পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং পূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হয় না এইরূপ হিন্দী কথাও বলা হইয়াছিল। আমি পূর্ব্বেই—এই মন্তব্যের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। বাদীকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কিন্তু প্রমাণ করা যায় পূর্ব্বে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিত না।"

১৯।৫।২১ তারিখে জয়দেবপুরে থানার রেজেষ্টারীতে নিম্নলিখিত বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

বৈকাল ৪টা। গতরাত্রে এক প্রবল ঝড় হইয়াছিল এবং তাহাতে বাসার বেড়া উড়িয়া গিয়াছে। এই এলাকায় কোন শান্তিভঙ্গের বা—সংক্রামক রোগের খবর নাই। লোকে দলে দলে সন্ন্যাসীকে দেখিতে আসিতেছে এবং বলিতেছে যে 'সে কুমার' এবং সন্ন্যাসী—লোকের সহিত বাংলায় কথা বলিতেছে। টাকায় ৬ সের চাউল বিক্রয় হইতেছে। সাবইনস্পেক্টার আবদুল করিম (প্রঃ সঃ ১০২৮) তাহার কার্য্যকালে রেজেষ্টারীতে এই বিষয়টা লিখিয়াছে এবং—বাদীর সাক্ষ্যরূপে তাহাকে ডাকা হইয়াছিল, সে এখনও চাকরী করিতেলিছ—এবং সে কুমারের হইয়া কারও সঙ্গে একটী কথাও বেশী বলিত না। ১৯১১ সালের ৫ই মে তারিখে যখন রায়সাহেব মোহিনী বাবু, সাবরেজেষ্টার গৌরাঙ্গ বাবু ও অপর কতিপয় ব্যক্তি বাদীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেছিল, এবং তাহাকে পরীক্ষা করিতেছিল এবং যে দিন তাহাকে পাখী মারা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় এবং যাহার বিবরণ মোহিনী বাবুর ৬।৫।২১ তারিখে রিপোর্টে দেখায়, সেই দিন আব্দুল হামিদ লিখিয়াছে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই আব্দুল হামিদই মানহানির মোকদ্দমায় তাহার বিবৃতি হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সে ও বলিতেছে ঃ—

এই মোকদ্দমায়-বাদীকে আমি দেখিয়াছি। আমি তাহাকে কথা বলিতে শুনিয়াছি। সে হিন্দীটানে বাংলা বলেন, আমি যখন ১৯২১ সালের মে মাসে জয়দেবপুরের অফিসার ছিলাম যেন আমি তাহাকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়াছি। আমি তাহার কথায় আর একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া ছিলাম। উহা অস্পষ্ট ছিল। জেরার সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে বাঙ্গলায় বাঙালীর পক্ষে বাংলা কথা বলা আশ্চর্য্য কিনা। সে বলিয়াছিল, না। ডাইরীতে উহা লিপিবদ্ধ—করার কি প্রয়োজন হইয়াছিল প্রশ্ন করায় সে বলিয়াছিল—বোধ হয় সম্ভবতঃ সে পূর্ব্বে বাংলা বলিতেছিল না। সে এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে

এই তারিখে বাদী বাংলা বলিতে ছিল না—সে বলে যে একটী নাম দিয়াছিল এবং আর ১ জন যে বাদী ১৯মে তারিখের পূর্ব্বে বাংলা কথা বলিতে পারিত কিনা সে সম্বন্ধে তাহার কোন ব্যক্তিগত জ্ঞান নাই; কিন্তু এই সাক্ষী সত্যই তাহার সহিত কথা বলিয়াছিল, কিন্তু উহা ১৯শে মের পূর্ব্বে কি পরে তাহা স্মরণ করিতে পারিতেন না এবং তাহার সাক্ষ্য এইযে বাদী হিন্দীটানে বাংলা বলিতেছিল।

এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, বাদী হিন্দীও বলিত বা হিন্দীকথা ব্যবহার করিত, সুতরাং বাদীর পক্ষে সাক্ষীরা বলিয়াছে যে সে হিন্দীতে কথা বলিত ও হিন্দীসুরে বাংলা বলিলে তাহা অধিকাংশ গ্রামবাসিগণের নিকট হিন্দি বলিয়া বোধ হইবে—এইরূপ হিন্দীসুর উচ্চারিত একটী বাংলা বাক্য প্রতিবাদী পক্ষের এক সাক্ষীর নিকট হিন্দী বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। (প্রঃ সাঃ ৮৫), এবং যদি তাহার কথা বলিবার দরকার না হয় তাহা হইলে কেহই ইহা লক্ষ্য করিবেনা বা স্মরণ করিবেনা যে উহা সুর হইতে পৃথক্ ছিল। এই ব্যাপারের সারসর্ম্ম এই যে বাদী ১৯২১ সনের মে মাসে বাংলা বলিতে পারিত, এবং সে হিন্দীভাষা সযত্নে পরিত্যাগ করিত কিনা তাহা নহে।

আমি দেখিতেছি যে বাদী ১৯২১ সালে মে মাসে বাংলা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং যে সকল সাক্ষী বলিতেছে সে ঐরূপ করিয়াছিল এবং তাহারা তাহার সহিত কথা কহিয়াছিল এবং সে তাহাদের সহিত কথা কহিয়াছিল এবং তাহারা অতীত দিনের কথা গল্প করিয়াছিল সেই সকল সাক্ষীকে অবিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই সকল সাক্ষীদের মধ্যে এমন লোক আছে যাহাদিগকে আমি অবিশ্বাস করিবনা, এবং নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলির দ্বারা তাহাদের মত দৃঢ়ীকৃত হইতেছে।

১৯২২ সালে বাদী বাংলা বলিতেছিল (বাঃ সাঃ ৪৫৮ ভুপেন, বাঃ সাঃ ৯১৪ বিলাস বাবু বি, ই, ইনি অমৃতসহর একটা বড় চাকরি করিতেন, এবং অন্যান্য সাক্ষিগণ)। সে যদি বাংলা বলিতে না পারিত তাহা হইলে জনতার মধ্যে নিজেকে উপহাসাস্পদ না করিয়া সে যে এই বৎসর রাণী সত্যভামার শ্রাদ্ধ করিতে পারিত ইহা—আমি বিশ্বাস করিতে পারিনা।

১৯২৪ সালে মাণিকগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার কে, সি, চন্দ্র আই, সি, এস ঢাকার যে বাড়ীতে বাদী বাস করিতেছেন, তথায় তাহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। মিষ্টার চন্দ্র বলিতেছেন—"সন্ন্যাসীর সহিত আমার কথা-

বার্ত্তা হইল। সন্ন্যাসীর সহিত আমার বাংলায় কথাবার্ত্তা হইল। এই সাক্ষাৎকার প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া চলিয়াছিল। বাদী কি ধরণের বাংলা বলিয়াছিল প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন—"প্রশ্ন বা উত্তরের ঠিক কথাগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে কিন্তু আমার এই ঠিক ধারণা আছে যে সন্ন্যাসী হিন্দী ও বাংলা মিলাইয়া বলিয়াছিল এবং বাংলা ভাষা পশ্চিমের লোকের বাংলা ভাষার মত দোষ হইতেছে।" আর একটা প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে "ব্যাকরণ ও শব্দরূপগুলি সবই ভুল ছিল।" সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে বাদী বাংলা বলিতেছেন এবং উহা যদি হিন্দীটানে ভাওয়ালী বাংলা হয় কিংবা আগন্তুক পূর্ব্ববঙ্গের লোক নহে বলিয়া তাঁহার প্রতি সম্মানার্থ হিন্দী-টানে কলিকাতার বাংলা বলিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে ১১ বৎসর পরে স্মৃতি যে ধারণা জন্মাইয়া তুলিয়াছিল মনের মধ্যে সেই ধারণা রাখিবার পক্ষে উহা যথেষ্ট ছিল।

এই ক্ষেত্রে মিঃ চন্দ্রকে হিন্দী বলিতে হয় নাই, এবং বাদী যখন পরে কলিকাতায় মিঃ ঘোষালের সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন যে তিনি বাংলা বলিতে পারে নাই, বলা হইয়াছে এই সাক্ষী তাহার উত্তরস্বরূপ। ইহা ১৯২৪ সালে জুলাই মাসের কাছাকাছি কলিকাতায় হইয়াছিল। সে তাহার সহিত কয়েক দিন পর সাক্ষাৎ করিয়াছিল। তিনি কথাগুলি লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিন্তু হিন্দীটান লক্ষ্য করেন নাই। বাদী এই বৎসর বড় রাণীর (২ নং প্রতিবাদীর) সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। বাদী কি ভাষার কথা বলিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। ১৯২৫ সালে বাদী রেভিনিউ বোর্ডে তদানীন্তন মেম্বার মিঃ জে, এন, গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করে। মিঃ জে, এন, গুপ্ত দুই এক মিনিট তাহার সহিত কথা বলেন, তাহার 'খোট্টা টান' লক্ষ্য করেন এবং সিদ্ধান্ত করেন যে একজন পশ্চিমদেশীয় প্রতারক, সে আদৌ বাংলা বলিতে পারিতনা, এবং সে যে বাংলা কথাগুলি ব্যবহার করিত সেগুলি 'খোট্টা-টান' বিশিষ্ট ছিল। অন্য কথাগুলি কোন ভাষায় ছিল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিতে পারেন নাই, "আমরা কয়েকটা কথামাত্র বলিয়াছিলাম।"

কথা হইতেছে হিন্দীটানে কথা বলিলে তাহার বিরুদ্ধে লোকের মনে যে বিরুদ্ধভাবের সঞ্চার হয় সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। প্রতিবাদীগণ উহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি তাহাকে চিনিত তাহাদের পক্ষে উহা কিছুই করিতে পারে নাই, এবং সম্পূর্ণ অনুসন্ধানের পর সনাক্ত

সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহাও বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

মিঃ শরদিন্দু ও মিঃ ও, সি, গাঙ্গুলীর সাক্ষ্যও মিঃ জে, এন, গুপ্তের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই এবং একই কারণ দ্বারা উহার বাখ্যা করা যাইতে পারে। তা ছাড়া এই দুই ভদ্রলোকের ব্যাপারে আরও একটী কারণ আছে। তাহারা কলিকাতাবাসী বাঙালী, তাহারা ভাওয়ালী বাংলা জানেনা, তাহারা যে কথা শুনিয়াছিল উহা হিন্দীটানে কলিকাতার বাংলা বলিতে চেষ্টা। বাদীর পক্ষে হিন্দী বলাই সহজ ছিল এবং মিঃ গাঙ্গুলী বলিতেছেন যে এই ব্যাপার কোনরূপে গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া সে হিন্দী বলিয়াছিল। একজন সাক্ষীকে এই প্রমাণ করিতে আনা হইয়াছিল যে ১৯২১ সালে বাদী স্বীকার করিয়াছিল যে সে বাংলা বুঝিতে পারিত না, এই সাক্ষীর সম্বন্ধে আমি এইটুকু বলিতে চাহি যে ইহার প্রতিকূলে সমস্ত সাক্ষীর ভার সে বিচ্যুত করিতে পারে না। বাদী যদি প্রতারকই হইবে তাহা হইলে সে যে বলিবে 'বাংলা বুলি নেহি আতা' ইহা আমি অসম্ভব বলিয়া মনে করি ; কিংবা তাহা হইলে সে যে বাহিরে বসিয়া থাকিয়া সকলের সহিত দেখা করিবে তাহাও আমি অসম্ভব মনে করি। আমার বোধ হইতেছে যে, এই একমাত্র সাক্ষীর সাক্ষ্যের কারণ এই :—যেমন ইহা দেখা গেল যে হিন্দীস্বরে বাংলা বলিলেও সনাক্ত প্রমাণ হইবে অমনি বাদীর স্বীকারোক্তির প্রমাণ আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইল। সুতরাং বাদীর মুখে সত্যসত্যই স্বীকারোক্তি আরোপ করা হইল—অবিরত এইভাবে নানা জিনিষ তাহার সাক্ষ্য দেওয়ার পর তাহার মুখে আরোপ করা হইয়াছে। বাদী যদি একটীও বাংলা কথা না জানিত তাহা হইলে ১৯২১ সালের যেখানে সে অবস্থায় উদয় হইয়াছিল তাহা হইত না। ২৪২ নং প্রঃ সাক্ষীর সাক্ষ্য অপেক্ষা থানার রিপোর্টের পোষকতা সম্বলিত হইতে আব্দুল হামিদের (বাঃ সাঃ ১০২৮) সাক্ষ্য আমি অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য মনে করি।

আমার মতে এ বিষয়ে দুইটি সাক্ষাৎকার চূড়ান্ত বলিয়া মনে হয়, বাদীর সহিত ব্যারিষ্টার এন, কে, নাগের সাক্ষাৎকার ও বাদীর সহিত রাজেন শেঠের (প্রঃ কমিশন সাক্ষী) সাক্ষাৎকার। এই দুই সাক্ষাৎকার কলিকাতায় হইয়াছিল, প্রথমটি ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে এবং শেষোক্ত উহারই কাছাকাছি কোন সময়ে। এই দুইটীরই আমি পূর্ব্বে সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়াছি। এই দুইটীতে দেখা যায় যে একজন বাঙ্গালী আর একজন বাঙ্গালীর সহিত কথা

বলিতেছে—ইহা ভুল হইবার কিছুই নাই এবং উহাতে হিন্দির কিছুমাত্র ইঙ্গিত নাই এবং কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

আমি আর একটি ব্যাপার বলিতেছি :—১৯২৯ সালে ঢাকায় ১৪১ ধারার মামলায় মিষ্টার মার্টিনের আদালতে বাদী প্রকাশ্য সাক্ষ্য দিয়াছিল, ঐ মামলায় মোহিনী বাবুও এষ্টেটের অপরাপর কর্ম্মচারীরাও সাক্ষ্য দিয়াছিল। কেহই বলিতেছেনা যে সে হিন্দিতে সাক্ষ্য দিয়াছিল। ফণীবাবু ও মাহুক ছাড়া আর কেহই এই সাক্ষ্য অস্বীকার করিতেছেনা যে তাহার কণ্ঠস্বর মেজকুমারেরই কণ্ঠস্বর, এবং ফণীবাবুর অস্বীকারের কোনই মূল্য নাই—এবং মাহুক একটা বাজে লোক এবং সে সম্ভবতঃ কণ্ঠস্বর কথাটি একই অর্থে ব্যবহার করিতেছিলনা। যদি কণ্ঠস্বরে কোন পার্থক্য থাকিত উহা তৎক্ষণাৎ দৃষ্ট হইত, এবং—১৯২১ সালের ৬ই মে তারিখের রিপোর্টে লিখিত হইত।

ভাষা ছাড়াও ইহা দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছিল যে, বাদীর মন এক অবাঙালীর মন এবং এই চেষ্টা বাদীর জেরার সময় করা হইয়াছিল। আমি এক্ষণে জেরার সে অংশের অলোচনা করিব।

এই বিষয়েই জেরা সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং বাদীকে কথার ঘূর্ণিপাকে ও শ্লেষোক্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল। শিক্ষিতলোকে অশিক্ষিত অন্তঃকরণের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিবার শক্তি সহজেই হারাইয়া ফেলে এবং নিরক্ষর লোকের পক্ষে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন শব্দের মত এবং দ্ব্যর্থক বাক্যের মত হেঁয়ালি আর কিছুই নাই। খুব কম অশিক্ষিত ব্যক্তিই একটী অর্থ হইতে অন্য অর্থ সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারে। জেরার এই অংশ কেবল ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে বাদীর এই শক্তি নাই। উদাহরণ-স্বরূপ, তাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—

প্র। শ্বেত বর্ণের অর্থ কি!

উ। সাদা।

প্র। রক্ত বর্ণের।

উ। লাল।

প্র। ব্যঞ্জন বর্ণের ?

উ। বেগুনের মত রঙ।

প্রথম দুইটীর উত্তর ঠিকই হইয়াছিল এবং বর্ণ শব্দের অর্থ রঙ, কিন্তু ব্যঞ্জন-বর্ণে বর্ণ শব্দের অর্থ অক্ষর এবং ব্যঞ্জনবর্ণ শব্দটীর অর্থ ব্যঞ্জন অক্ষর। বাদী

উহা জানেনা এবং রুড অর্থটী তাহার মনে ছিল। ইহার ব্যাখ্যা অতি সুস্পষ্ট, এইরূপ বলা হইতেছিল সে ব্যঞ্জন শব্দের অর্থ পাঞ্জাবীতে 'বেগুণ' যতক্ষণ না মিঃ রামরতন সিবা (বাঃ সাঃ ৯৩৯) নামক এক পাঞ্জাবী এই ব্যাপারের সমাধা করিলেন।

শ্লেষোক্তির দ্বারা উপস্থাপিত না হইলেও ব্যঞ্জনবর্ণ শব্দটীর অজ্ঞতা সম্বন্ধে বলিতে গেলে এমন লোক আছে যে a. b. d. ইত্যাদি জানে অথচ consonent কথাটি জানেনা।

অধিকাংশ অজ্ঞতাই এইরূপ কথার উপর মারপ্যাচের দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট ভাগ আমি এক নিরক্ষর বাঙালীর পক্ষে আশা করিতে পারিতাম। এই দ্বর্থক বাক্যগুলির আলোচনা করিতে গেলে অনর্থক সময় নষ্ট হইবে এবং আমি বিশ্বাস করি না যে প্রতিবাদীপক্ষ বাদীকে বাস্তবিকই যদি হিন্দুস্থানী বলিয়া বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে উহা সাধারণে প্রকাশ করিয়া দিবার অন্য কোন উপায় ভাবিতে পারিত না। হিন্দুস্থানীর মনের এরূপ একটা গঠন আছে যে যাহা বাংলা দেশে বহুকাল বাস করিলেও নষ্ট হয় না, বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না, এবং উহা বাহির করিয়া ফেলিতেও খুব বেশী কৌশলেরও প্রয়োজন হয় না, বিশেষতঃ যখন ইহা জানা ছিল যে বাদী নিরক্ষর এবং জড়বুদ্ধি সম্পন্ন।

ভাষা জ্ঞানের পরীক্ষা।

এ বিষয়ে একটী ক্ষুদ্র চেষ্টা করা হইয়াছিল, বাদীকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, এক লাইন বাংলা গান বলিতে পারে কিনা এবং সে ছেলে-ভুলানো ছড়া জানিত কিনা। সে বলিয়াছিল যে সে পারে না এবং ছেলে ভুলানো ছড়া সম্বন্ধে বলিয়াছিল: "স্ত্রীলোকেরা এইগুলি আবৃত্তি করে।" আমি পূর্ব্বেই এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছি—এই গানের বিষয়ে। শিক্ষিত না হইলে এবং শিক্ষিতের মত মানসিক নিঃসঙ্গতা অর্জ্জন না করিলে খুব অল্প বাঙালীই অনেক লোকের মধ্যে স্বীকার করিবে যে সে গান জানে, গান করার কথাত দূরে থাকুক, আর ছেলে ভুলানো ছড়ার সম্বন্ধে নিরক্ষর লোকে ভাবিবে যে স্ত্রীলোকেরই উহা আবৃত্তি করে এবং পুরুষের উহা জানা উচিত নহে। মিষ্টার চৌধুরী অবশ্য একটী ছড়া আবৃত্তি করিয়া গ্রাম্য হওয়ার ভয় ঘুচাইয়া" দিয়াছিলেন

এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে উহা জানে কি না কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ছড়াটী আদৌ পূর্ব্ববঙ্গের ছড়া নহে। তিনি তাহাকে এই ছড়াটি বলেন ;

"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে?"

ভাষাতেই দেখা যাইতেছে যে এটী আদৌ পূর্ব্ববঙ্গের ছড়া নয় এবং বিষয় বস্তুও পূর্ব্ববঙ্গের নহে। পূর্ব্ববঙ্গে বর্গীরা ও মারাঠারা কখনও গিয়া দেখা দেয় নাই। আজকাল ছেলে ভুলানো ছড়া ছাপা হইতেছে এবং প্রাদেশিক সীমা অতিক্রম করিতেছে (প্রঃ সাঃ ৯৩ গিরিশ নামক এক পণ্ডিতের সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য)। এই সাক্ষী স্বীকার করিতেছে যে ছড়াগুলি এখানে ছাপান পুস্তকে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু বলিতেছে যে, সেই ছড়া সে সমস্ত জীবন ধরিয়াই বলিত। এটী আবৃত্তি করিতে বলায় সে প্রথম জবানবন্দীতে যে আকারে বলিয়াছিল এবং বাদীর যে আকারে বলা হইয়াছিল তাহা হইতে বিভিন্ন আকারে আবৃত্তি করিল এবং 'নিমুর' পরিবর্ত্তে দিব কথাটী ব্যবহার করিতে ধরা পড়িল। সে একটী ছাপা বই হইতে শিখিয়াছ এবং এখনও উহা খুব ভাল করিয়া জানে না। সাক্ষী আরও বলিতেছে যে সে বাদীকে যে আর একটী ছড়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহাও সে জানে। যথা, ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি, ইত্যাদি, কিন্তু সে আর কোন ছড়া জানে না। এই ছড়াটী আলোচনা করা আমি প্রয়োজন বোধ করিয়া, ইহার সম্বন্ধেও একই মন্তব্য প্রযুক্ত হইতে পারে এবং আমি লক্ষ্য করিতেছি যে সাক্ষী এই ছড়াটী যে ভাষায় বলিয়াছে উহা পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত ভাষা হইতে বিভিন্ন এবং ফণীবাবু যে ভাবে বলিয়াছেন তাহা হইতেও বিভিন্ন, সুতরাং এইরূপ বোধ হইতেছে যে প্রতিবাদীগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাকে উহা মুখস্থ করিতে হইয়াছিল এবং তারপর সে উহা ভুল করিয়াছিল। এস্থলে আমি আরও বলিতে পারি যে, একজন কলিকাতার সাক্ষীকে জেরায় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, ছেলে ঘুমানো ছড়া তাহার স্মরণ আছে কিনা, এবং সে বলিয়াছিল যে উহা তাহার স্মরণ নাই সুতরাং ইহা বোধ হইতেছে যে এরূপ জিনিষ সম্ভাবনার অতীত নহে এবং তোমার কিরূপ মাতা বা ধাত্রী ছিল কিংবা তোমার সন্তানের সন্ততির কিরূপ মাতা বা ধাত্রী আছে তাহার উপর উহা নির্ভর করে। বাদী যে হিন্দুস্থানী বা অবাঙালী ইহা দেখাইবার জন্য যে জেরা করা হইয়াছিল তাহা আমার বিবেচনায় কেবল এ ব্যাপারটী লইয়া খেলা করা মাত্র এবং যদি ইহা জানা না থাকিত যে বাদী বাঙালী এবং অন্যান্য ব্যাপার হইতে যেরূপ প্রমাণ হইয়াছে

তাহাকে স্বয়ং কুমার তাহা হইলে এরূপ হইতে পারিত না। আমি বিচারে এই সাব্যস্ত করিতেছি যে বাদী একজন বাঙালী।

উপসংহার

আমি এই মোকদ্দমার সমস্ত সাক্ষ্য অত্যধিক যত্নের সহিত বিবেচনা করিয়াছি এবং আমার বিশ্বাস যে সনাক্তের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সূচিতে কৌঁশুলীগণের অত্যুত্তম সওয়াল জবাবে পরিব্যক্ত হয় নাই। এই মামলা সম্পর্কীয় সকলেই বিচার্য্য বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে এবং এই মোকর্দ্দমায় যে সকল প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল তাহাদের দুরূহতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিল। সনাক্ত ব্যাপারে বহু জিনিষেরই শেষ মীমাংসা হয় না কিন্তু একটা মাত্র ঘটনাই সাংঘাতিক হইতে পারে, সুতরাং এই ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে হইয়াছিল এবং অনুসন্ধান যতদূর সম্ভব সঠিকভাবে চালাইতে হইয়াছিল।

সনাক্তের পোষকতা-জনক প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য আমি বিশ্বাস করি। সমাজের সকল স্তরের ও সর্ব্বাবস্থার নরনারিগণ নিজেদের সুবুদ্ধি অনুসারে এই সাক্ষ্য দিয়াছে। এই সাক্ষীদের মধ্যে ছিলেন কুমারের প্রায় সকল আত্মীয় এবং তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন তাঁহার ভগিনী, বড়রাণী, মেজরাণীর নিজের মামা এবং তাঁহার নিকট আত্মীয়া ভগিনী। সাক্ষীগণের মধ্যে বহু শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন, বহু সম্ভ্রান্ত প্রকৃতির প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহাদিগকে অদ্ভুত ও বিচিত্র কল্পনা প্রবণ বলিয়া জগতের কেহই সন্দেহ করতে পারিবেন না, এবং যাহাদের সাধারণের নিকট উপহাসাস্পদ হইবার ভয় ছিল; যাঁহাদের ব্যক্তিগত কোন লাভ বা ক্ষতি নাই এবং যাঁহাদের কুমারকে ভুল করিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ইহা কখনও সম্ভব নয় যে এই সকল লোক একজন ভণ্ডের পক্ষ হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু এই সাক্ষ্য সমুদয় ও কেবলমাত্র সাক্ষিগণের বিশ্বস্ততার উপরে নির্ভর করে না। ইহা সর্ব্বপ্রকার সম্ভবপর পরীক্ষায় সন্তোষজনকরূপে প্রমাণিত করিয়াছে। উহার মধ্যে একটী পরীক্ষা এই যে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে বাদী যখন নিজেকে ভাওয়ালের মধ্যম কুমার বলিয়া ঘোষণা করিলেন তখন এক অখণ্ডনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। সেদিনের ঘটনার সহিত কেবল ইহাই বেশ সুসঙ্গত হয় যে, যে সকল লোক কুমারকে জানিত তাহারা নিজেদের সৎ বিশ্বাস অনুসারেই বাদীকে সনাক্ত করিয়াছিল। বিবাদীপক্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রধান তদ্বিরকারক রায় সাহেব (প্রঃ সাঃ ৩১০) মধ্যম কুমারের আকৃতি ও চরিত্র গত

বৈশিষ্ট সমুদয়ের মিথ্যা কাহিনী সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, ১৯২১ সালের ৪ঠা মে তারিখে তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে কুমারের ভগিনী ও ভাগিনেয়গণ সৎ বিশ্বাস প্রণোদিত হইয়াই সাধুকে কুমার বলিয়া চিনিয়াছিল। তিনি যদি নিজে উহা বিশ্বাস না করিতেন,তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না,কারণ তিনি নিজে সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিলেন এবং তিনি অপর সকলের ন্যায় কুমারকেও চিনিতেন। মিষ্টার নিডহ্যামের রিপোর্ট বাস্তবিক পক্ষে তদ্বিরকারকের রিপোর্ট। সুতরাং উহাও একজন বিশ্বাসকারীর রিপোর্ট। আমি যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি এবং যে সকল বিচার বিবেচনার উল্লেখ করিয়াছি সেই সকল হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে হঠাৎ কোন ষড়যন্ত্র করা হয় নাই, এবং হঠাৎ সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন ভাষা ভাষী এক পাঞ্জাবীকে কুমারের ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য সহসা গ্রহণ করা হয় নাই—সেদিন যে ঘটনার উদয় হইয়াছিল তাহার কারণ দর্শাইতে প্রতিবাদী পক্ষের এই একটীমাত্র মতবাদ রহিয়াছে। যদিও উহা দ্বারা কিছুই পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন হয় না, যদি না ধরিয়া লওয়া হয় যে ভগিনীরও তাঁহার সহিত পরগণার বাকী সকলেরই মাথা খারাপ হইয়াছিল।
ভগিনী যদি সৎবুদ্ধি প্রণোদিতা হয় অন্যান্য সাক্ষীগণও সেরূপ সৎবুদ্ধি প্রণোদিত ছিল।

আর একটী পরীক্ষা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জনক। সেটী হইতেছে দেহের সনাক্ত। শরীরের বিশেষরূপ বৈশিষ্ট্য দ্বারা এবং অন্য সাধারণ শারীরিক চিহ্নদ্বারা এই সনাক্ত সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদিত এবং গণিতের মত নিশ্চয়তার সহিত প্রমাণিত হইয়াছে এবং উহা কাহারও বিশ্বাস—প্রবণতার উপর নির্ভর করে না। এই বৈশিষ্ট্য ও চিহ্নগুলি সমগ্র ভাবে কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্ট হইতে পারে না এবং এই চিহ্ন সকলের মধ্যে অর্দ্ধেক গুলি না থাকিলেও চাকা চাকা দাগযুক্ত পাদ এবং বাম পায়ের বাহির গোড়ালির উপরি ভাগে অসমান পদাচিহ্ন এবং তৎসঙ্গ শারীরিক বৈশিষ্ট্য সমুদয় অনুরূপ নিশ্চয়তার সহিত সনাক্ত বজায় রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। কোন ব্যক্তি বিশেষ কতকগুলি অর্জ্জিত বিশেষ গুণের সমবায় এবং এই গুণাবলী—একত্রে আর ও কোথা দেখা যায় না এবং এই গুলিই সেই ব্যক্তি বিশেষকে অনন্য সাধারণ করে।

বাদীর মনেও এমন কিছু নাই যাহা এই সিদ্ধান্ত বিচলিত করিতে পারে। প্রতিবাদী পক্ষ উহার যতটা—সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতে সাহস

করিয়াছিল তাহা বরং এই সিদ্ধান্তকে আরও দৃঢ় করে। তাহার হস্তাক্ষর এই সিদ্ধান্তকে আরও দৃঢ় করিতেছে। দার্জ্জিলিঙে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার মধ্যে কোন কিছুই এই সিদ্ধান্তকে বিচ্যুত করিতে পারে না এবং তাঁহার নিরুদ্দেশ সময়ের কোন ঘটনাই উহা বিচ্যুত করিতে পারে না। সে যদি অন্ধ, খঞ্জ বা বধির হইয়া ফিরিয়া আসিত তাহা হইলেও এই সিদ্ধান্ত অবিচলিত থাকিত। তোতলামি এবং হিন্দীটান ও সেইরূপ আকিঞ্চিৎ কর।

বাদীর মনের দৃঢ়তা

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মের পূর্ব্বের কোন ঘটনা বা পরবর্ত্তী আচরণের কোন কিছু কোনরূপ ষড়যন্ত্রের সূচনা করে না। সেই তারিখ হইতে মামলা রুজু হইবার সময় পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও বাদী গোপনভাবে অবস্থিতি করে নাই। যে আসিয়াছিল সেই তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিল, বহু লোকই তাহাকে দেখিয়াছিল এবং ১৯২১খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে প্রজাপুঞ্জের বিপুল জনতা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তুমুল আনন্দধ্বনি করিয়াছিল। বাদী তাঁহার স্বরূপতা ঘোষণা করিবার ২১ দিন পরে ২৯শে মে তারিখে ঢাকা কালেক্টারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একাকী তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া ছিলেন এবং তদন্তের প্রর্থনা করিয়াছিলেন। ১৯২১ সালের মে মাস হইতে তাঁহার ভগিনীরা—এবং তাহার পিতামহী তদন্তের জন্য কালেক্টারের নিকট আবেদন করিতেছিলেন এবং বাদী মুখোমুখী হইয়া জেরার উত্তরদানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। খাজনা আদায়ের কাজে চাঁদা সংগ্রহে তিনি অশেষ কষ্ট দিতেছিলেন এবং ১৯২৯ ও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি জমিদারীর খাজনা আদায় কার্য্য একেবারে বন্ধ করিয়াছিলেন। তথাপি কেহই তাঁহার সম্মুখীন হয় নাই। তাঁহাকে প্রশ্ন করে নাই। কিংবা তাঁহাকে ফৌজদারী সোপার্দ্দ করে নাই। তাঁহার সম্মুখীন না হওয়ায়, তাঁহাকে কোন প্রশ্ন না করা—কিংবা তাঁহাকে ফৌজদারী সোপার্দ্দ না করা একজনের প্রার্থনীয় হইয়াছিল; এবং সেই ব্যক্তি কে তাহা একজন ব্যক্তিকেও জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। সে ব্যক্তি কে সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। সেই ব্যক্তি রায় সত্যেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী বাহাদুর; যিনি কুমারের সম্পত্তি উপভোগ করিতেছেন এবং যাঁহার পক্ষে কুমারের প্রত্যাগমন বাস্তবিকই ভীষণ বিপদ। ৬ই মে অর্থাৎ বাদী যেদিন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার দু'দিন পরেই—যখন বাদী কিরূপ সমর্থন লাভ করিবেন তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত

ছিল, সেই সময়েও সত্যেন্দ্রবাবু জানিতেন যে, বাদীর মৃত্যু সম্বন্ধে একাগ্র হওয়াই এই বিপদে তাঁহার রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। তিনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি মিঃ লেথব্রিজের নিকট উপস্থিত হন, তাঁহাকে বলেন যে মৃত্যু-প্রমাণ সুরক্ষিত করিতে হইবে। সেই মৃত্যু-সংক্রান্ত যে এফিডেভিটগুলি তিনি স্বয়ং সংরক্ষিত করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। তিনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখের পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং যান, এবং সে সকল সাক্ষী দ্বিধাহীন চিত্তে শবদাহে যোগদান করিয়াছিল সেই সকল সাক্ষীকে একটা চুক্তিতে আটকাইয়া রাখিতে যান। তিনি মিঃ লিণ্ডসের নিকট মৃত্যুর এফিডেভিট ও শবদাহের প্রমাণ প্রেরণের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং মিঃ লিণ্ডসে কুমারের মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া এই ঘোষণা প্রচারিত করিয়াছিলেন যে বাদী একটা ভণ্ড প্রতারক। অতি অল্প সংখ্যক প্রতারকই এই ঘোষণার পর টিকিয়া থাকিতে পারিত। ইহাতে বহু সাক্ষীর মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, এই মামলা ১ম প্রতিবাদিনী ও বাদীর মধ্যে নহে, পরন্তু বাদীও সরকারের মধ্যে। বাদীর এই ঘোষণা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও টিকিয়া রহিলেন। তিনি এখানে সেখানে গিয়া লোকের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে ও যাহারা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন, এবং পদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদন্তের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মিথ্যা আশ্বাস প্রদান

তাঁহার এই প্রার্থনায় মিঃ লিণ্ডসে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন এবং ১৯২৩ অব্দে মিঃ কে, সি, দে, তাঁহাকে মিথ্যা আশা দিয়াছিলেন।

মিঃ চৌধুরী এই সকল ঘটনা উপেক্ষা করিয়াই মামলা রুজু করিবার বিলম্বের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া এই ইঙ্গিত করিতেছিলেন, যে অভিনয়ের প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে বাদীর সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। বাদী তাঁহার স্বরূপতা ঘোষণা করিবার ২৪ দিন পরে মিঃ লিণ্ডসের নিকট তদন্তের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভগিনী আরও পূর্ব্বে তদন্তের জন্য আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখনও বাদী সকল সময়ের মতই মুখোমুখী হইয়া জেরার জবাব দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তদন্ত যে করা হইবে না ; একথা তাহাকে কোনদিন বলা হয় নাই, এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহাকে বলা হয় নাই যে আদালত খোলা আছে (অর্থাৎ সে দরকার বোধ করিলে

আদালতে মামলা রুজু করিতে পারে)। তারপর মামলা না করিয়া সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা করার পর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এই মামলা রুজু করা হইয়াছিল। এই ষ্টেটের জন্য মামলা করা সোজা কাজ নহে; এবং তাঁহাকে যে কতদূর শিখান পড়ান হইয়াছিল তাহা তাঁহার জেরা হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যে অবস্থায় ছিলেন ঠিক সেই অবস্থাতেই রহিয়া গেলেন।

সত্যবাবুর ব্যবহার কিরূপ ছিল

বাদীর কার্য্যাবলী আগাগোড়া খোলাখুলি ছিল, কিন্তু যে সত্যবাবু এই সম্পত্তি ভোগ করিতেছিল তাঁহার ব্যবহার কিরূপ ছিল? বাদীই যে কুমার ইহা সম্পূর্ণরূপে জানিয়াও সে এই হতভাগ্য ব্যক্তিকে বাধা দিয়াছে, তাঁহার নিজের অর্থে বিবাদীরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, ব্যবহারই সব প্রকাশ করে এবং তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে অর্থাৎ বাদী যেদিন নিজেকে কুমার বলিয়া ঘোষণা করিলেন তাহার দুইদিন পরে সত্যবাবুর আতঙ্ক প্রকাশ পাইয়াছিল, এই আতঙ্কে অভিভূত হইয়া সত্যবাবু মৃত্যুর প্রমাণ সুরক্ষিত করিতে মিঃ লেথব্রিজের নিকট দৌড়িয়াছিল; সেই আতঙ্কে অভিভূত হইয়া সে মৃতদাহের সাক্ষীদিগকে আটকাইবার জন্য ১৫ই মের পুর্ব্বে দার্জ্জিলিঙে ছুটিয়াছিল। ইন্সিওরেন্স ডাক্তারের যে রিপোর্টে কুমারের দৈহিক-চিহ্নগুলি বিবৃত ছিল সেই রিপোর্টের ভয়েও সে অভিভূত হইয়াছিল। উহা ১৯২১ সালের জুলাই মাসে প্রকাশ হইয়াছিল। প্রতিবাদীপক্ষ ভণ্ড প্রতারককে জাহান্নমে পাঠাইবার জন্য এই রিপোর্ট হস্তগত করে নাই। তাহারা উহা তলপ করে নাই। তাহারা আশা আশা করিয়াছিল উহা স্কটল্যাণ্ডে কোম্পানীর অফিসে নিরাপদে সুরক্ষিত থাকিবে। কিন্তু সেই তথা কথিত ভণ্ড প্রতারকই তাহা তলপ দিয়া আনাইয়া সেইরূপ তৎপরতা সহকারে উহা দখিল করিয়া বলিলেন, যেরূপ তৎপরতার সহিত তিনি ব্যক্তিগত দলিলগুলি হস্তগত করিয়াছিলেন। হস্তাক্ষর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মতের জন্য যখন আদালত হইতে দাবী করা হইয়াছিল, তখনও আমি এই আতঙ্ক প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কোর্ট অব ওয়ার্ডস তদন্ত আরম্ভ করিয়া দরজী ও চর্ম্মকারগণের নিকট হইতে সাক্ষীসাবুদ সংগ্রহ করিলেন এবং উহা বিজ্ঞ কৌশুলীকে প্রদান করিলেন। এই সকল উপাদান হইতে একটী জিনিষও

উপস্থাপিত বা প্রমাণিত হইল না, কেবল ৬নং জুতা উপস্থাপিত হইয়াছিল, এবং উহাও কৌঁশুলীর পরামর্শ মত করেন নাই। ভুলক্রমে করিয়াছিলেন, কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, বাদীর জুতা বড় বলিয়া বোধ হইতেছে। বাদীর এজাহার শেষ হইলে এই অদ্ভুত অনুযোগ করা হইয়াছিল যে তিনি ইহা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন যে বাদী লেখাপড়া জানেন কিন্তু এই লোকটীর যে অক্ষর পরিচয় আছে এই কঠিন ব্যাপার এক্ষণে প্রমাণ করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে কুমার যতটা লেখাপড়া জানিতেন, তাহা অপেক্ষা খুব বেশী করিয়া ধরা হইয়াছিল, অথচ এতদিনের অনভ্যাসে—তিনি যে অনেক ভুলিয়া যাইবেন তাহা ধরাই হয় নাই। সর্ব্বশেষে জেবার সময় স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে বাদীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, বলা হইয়াছিল যে এ বিষয়ে বাদীকে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আমি পূর্ব্বেই ইহার আলোচনা করিয়াছি এবং এখন ইহা বলিবার প্রয়োজন হইবেনা যে তাহাকে কোনরূপ প্রশ্ন না করার প্রাচীন পদ্ধতি আদালতে পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছিল। এই অজুহাত ১৯২১ সালে বলা চলিত না, এবং একথা কেহ কখনও শোনে নাই যে, শেখান পড়ান হইয়াছে বলিয়া সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই। ফাঁদকে ভয় করিবার কিছুই ছিলনা, ভয় করিবার ছিল সত্য ঘটনাকে। জটিল মামলার ঘটনাবলী আপনাআপনি বাহির হইয়া পড়িয়া কল্পনাকে ধ্বংস করে, এরূপ ক্ষেত্রে কাহারও মাথা খারাপ না হইলে সে কখনও সত্যকে অধিক দিন বাধা দিতে পারেনা, এবং প্রতিবাদী-পক্ষের কোন এক ব্যক্তির মাথা খারাপ হইয়াছিল এবং সম্ভাব্য বিষয়ের সমস্ত জ্ঞান নষ্ট হইয়াছিল। বাদীর চেহারা সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ ছিল। বিদেশী ভাষায় কথা বলিত। ভগ্নিগণ তাহাকে যোগাড় করিয়া আনিয়াছিলেন, এক ভগ্নী তাহার দিকে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। কেহই তাহাকে যোগাড় করিয়া আনে নাই, কিন্তু সে দৈবক্রমে উপস্থিত আসিয়াছিল এবং নিজেকে কুমার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল ; এবং পরিবারবর্গ অবাক হইয়া তাহাকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতে কোনরূপে প্রস্তুত না হইয়া ভগিনী হঠাৎ প্রকাশ্যে তাহাকে ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং কালেক্টারের নিকট তাহাকে সম্পত্তি দাবী করিতে পাঠালেন। এই ধরণের একটীর পর একটী ঘটনা খাড়া করা হইল, যাহা কিছুদিন টিকিল এবং সত্য ঘটনার চাপে পড়িয়া নষ্ট হইল। সুবিস্তৃত এবং সযত্নে গঠিত ঘটনাগুলি—যাহা দার্জ্জিলিংয়ে অসুখ ও মৃত্যুসংক্রান্ত ঘটনা কেবল যে অন্তর্নিহিত মিথ্যার লক্ষণ দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল তাহা নহে

পরন্তু পর্ব্বতের ন্যায় অচল একটীমাত্র ঘটনার দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল—তাহা—মৃত্যুর সময় বা রক্তবাহে। প্রাতঃকালের শবদাহ এবং উহার প্রকৃতি. ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের আগমন দ্বারা এবং এই কাহিনী সংশ্লিষ্ট কাশীশ্বরী দেবীর অনুপস্থিত দ্বারা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। টি-পাটির স্বীকারোক্তি বাদীকে প্রশ্ন করা হয় নাই। কিন্তু উহা তারিখের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত শিক্ষা, সাহেবী ধরণ, ইংরাজী ভাষা ইত্যাদি মিথ্যা গুণাবলী কুমারের প্রতি আরোপ করা হইয়াছে, এবং প্রত্যেক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মিথ্যা ঘটনা সৃষ্টি করা হইয়াছে। কারণ সত্য বলিলে তাঁহার কোনরূপ বৈশিষ্ট প্রকাশ পাইতনা। লেখাপড়া জানা প্রমাণ করিবার জন্য চিঠিপত্র এরূপভাবে জাল করা হইয়াছিল যে, উহা প্রমাণ হইলে মৃত্যুর মতই কার্য্যকরী হইত। ইহার এই ফল হইয়াছিল যে যদিও প্রতিবাদী মধ্যে এরূপ একদল নিজেদের লোক ও কর্ম্মচারী সংগ্রহ করিয়াছিল যাহারা যাহা কিছু বলার দরকার তাহাই বলিতে প্রস্তুত ছিল, এবং ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল যে, সাক্ষ্য হইতে মামলা গড়িয়া উঠিতেছিল, পরন্তু মামলার অনুরূপ সাক্ষ্য গঠন করিতেছে. তথাপি তাহাদের পক্ষে বাস্তব হইতে এতদূর বিভিন্ন কুমারকে বজায় রাখা অসম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং সাক্ষীদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন তাহারা নিজেদের ভূমিকা অভিনয় করিয়া যাইতেছে; এবং কি ঘটিতেছিল তাহার উদাহরণস্বরূপ দুইটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—ফণীভূষণ ব্যানার্জ্জীর জন্য একখানি বই তৈয়ারী করা হইয়াছিল যাহাতে তিনি মুখস্থ করিতে পারেন এবং বাদী যে সব কথা জানিত না তাহা গড়্ গড়্ করিয়া বলিয়া যাইতে পারেন। আর ডাক্তার আশুতোষ দাসগুপ্তের পূর্ব্বপ্রদত্ত সাক্ষ্য বিবেচনা না করিয়াই তাহার মুখ হইতে অনুরূপ বক্তব্য বলান হইয়াছিল। প্রতিবাদী পক্ষে যে কিরূপ বিপদ হইতেছিল ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। এইরূপ চেষ্টার চূড়ান্ত দেখা গিয়াছিল যখন রঘুবর সিংহের সমক্ষে প্রদর্শিত ফটোর পরিবর্ত্তে মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা ও জাল লোকের দ্বারা বাদীর সাক্ষ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল।

ইহা কোনই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে যদিও বাদী ঢাকা ও কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন এবং অধিকাংশ সময়ই তিনি ঢাকায় বাস করিতেছিলেন, তথাপি এষ্টেট, উহার সমস্ত ক্ষমতা সত্ত্বেও ১২ বৎসরের মধ্যে বাদী যে কে তাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

মিষ্টার লিণ্ডসে পাঞ্জাবে একটা তদন্তের জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন

কিন্তু তিনি জানিতেন না যে পাঞ্জাবে এজেন্টরা কাজ করিতেছে এবং তাহাদের চেষ্টায় প্রত্যেক তদন্তেরই ফল হইতেছে কিংবা জানিতেন না যে—পাঞ্জাবের রিপোর্টের ভিত্তি স্বরূপ বর্ণনাটি একটী ফটোর উপর নির্ভর করিতেছে না, যে ফটোতে ম্যাজিষ্ট্রেট রঘুবীর সিংহের সাক্ষ্য ছিল এবং যাহা এখনও প্রকাশ্য দিবালোকে বাহির হইতে পারে নাই।

ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই যে উত্তর পাড়ায় মেজরাণীর যে সকল ধনাঢ্য ও পদস্থ আত্মীয় ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন নাই। কেবল অসাধুতার জন্য পদচ্যুত এক কেরাণী আর একটী আত্মীয় ভাই বাদীকে অস্বীকার করিতে আসিয়াছিল এবং কি ভাবে তাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহা আমি পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। যে সকল ভদ্রলোক কুমারকে জানিতেন, কিন্তু তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহাদিগকে বাদ দিয়া স্বাধীন মতাবলম্বী এবং অক্ষাপাত শূন্য এমন একটী লোকও নাই যিনি হলপ করিয়া বলিতে পারিতেন যে বাদী কুমার নহেন।

আমি মেজরাণীর অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ আলোচনা করিয়াছি। তাহার ভ্রাতার সম্বন্ধে তাহার নিজের কোন স্বত্ত্বা নাই। জমিদারীর আয়, আয়ের সমগ্র অংশ, তাঁহার ভ্রাতার হাতে যাইতেছে—এমনকি সেই আয়ের পরিমাণ প্রায় লক্ষ টাকা হইলেও তাহার নিজের নামে ব্যাঙ্কের কোন হিসাব নাই। এমন একখানিও কাগজ নাই যাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি হাতে টাকা রাখেন বা টাকা রাখিতে চান। জয়দেবপুরে এই নিঃসন্তানা রমণীর জীবনের সম্বল কিছুই নাই, তাঁহার অতীত জীবনের স্মৃতিতে কিছুই নাই যেদিকে ফিরিয়া চাহিয়া তিনি আনন্দ লাভ করিবেন। যে জীবন যাপনে তিনি অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন সম্পত্তি মালিয়া বলিয়া যে ভান ও গর্ব্ব তিনি এতকাল অনুভব করিয়া আসিতেছেন তাহার এরূপ একটী স্বামীকে তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে যে স্বামী একটা কুচরিত্র লম্পট এবং যাহার দেহ কুৎসিত ক্ষত দ্বারা পূর্ণ। এবং যখন এই সকলের উপর আবার বিষ প্রদানের অভিযোগ আসিল; ১৯২১ সালের যে মাসে তাঁহার ভ্রাতার নিকট, টেলিগ্রাম যোগে এই অভিযোগ আসিল তখন তিনি জানিলেন যে তিনি ভ্রাতার ভগিনীরূপে বিবেচিত হইবেন কুমারের পত্নীরূপে হইবেন না। ভ্রাতার পক্ষে কুমারের এই আবির্ভাবের অর্থ এই যে তিনি একটী সুন্দর সম্পত্তি হারাইবেন এবং এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার

জন্য তিনি সর্ব্বপ্রথমে চেষ্টা করিবেন, এবং আমি আশাকরিনা যে ভগিনী তাহার পথে অন্তরায় হইবেন।

আমি বিচারে এই সাব্যস্ত করিতেছি যে বাদীই ভাওয়ালের মৃতরাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের ২য় পুত্র রমেন্দ্র নারায়ণ রায়।

ইস্যু নং ৬

এই মোকর্দ্দমায় উপযুক্তরূপে মূল্য নির্দ্ধারণ ও ষ্ট্যাম্প প্রদান করা হইয়াছে।

ইস্যু নং ৭

এই ইস্যু উঠিতেই পারে না, কারণ আর্জ্জি সংশোধন দ্বারা উহা ডিক্লেরটরি মামলা নহে উহা অধিকার সাব্যস্তের জন্য মামলা।

ইস্যু নং ৮

এই ইস্যু এইরূপে ধার্য্য হইয়াছিল আর্জ্জির ২য় দফায় শেষ অংশের যেরূপ বলা হইয়াছে, তদনুসারে বাদী আর্জ্জিতে লিখত প্রতিবিধান পাইবার হকদার কিনা ?

যেখানে এই উক্তি করা হইয়াছে যে, "বাদী তাঁহার অতীতের স্মৃতিশক্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছিল এবং সন্ন্যাসীদের দলভুক্ত হইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে ভ্রমণ করিত। সন্ন্যাসী জীবনের অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সংসার সম্বন্ধে উদাসীন হইয়াছিল।"

এইরূপে উল্লিখিত ঘটনার আইনের কোন মূল্য নাই। হিন্দু আইন অনুসারে সংসার ত্যাগ সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইলে আইনতঃ মৃত্যুর সমান হয়। এই পরিচ্ছেদ এইরূপ বলিতেছে না যে বাদী সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন কিংবা তিনি সমস্ত পার্থিব ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং উহা আরও বলিতেছে যে তিনি যে জীবন যাপন করিতেন, উহাই স্মৃতি শক্তি ধ্বংসের ফল। মৃত্যুর সমান ফলোপধায়ক হইতে হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ ইচ্ছাকৃত হওয়া চাই (Maynes Hindr Low 7 Edihion page 801) এই ইস্যু কেবল মাত্র এই পরিচ্ছেদের উপর উপস্থিত করা হইয়াছে।

আমি আরও বলিতেছি যে বাদী যে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই, এবং ইহারও কোন প্রমাণ নাই যে তাহাকে সংসারের মধ্যে মৃত সাব্যস্ত করিতে যে সকল অনুষ্ঠানের প্রয়োজন তাহা তিনি সম্পাদন

করিয়াছেন। এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করার কোন প্রয়োজনও নাই কারণ ইস্যু কেবলমাত্র এই পরিচ্ছেদের উপর ধার্য্য হইয়াছে।

আমি এই রায় দিতেছি যে এই পরিচ্ছেদ যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে তিনি যে প্রতিবিধান দাবী করিয়াছেন তাহার স্বত্ব ব্যাহত হয় না।

৯ নং ইস্যু

আর্জ্জি যে ভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাতে এই ইস্যু আদৌ উঠে না।

ইস্যু নং ২

তামাদি সম্বন্ধে ইহাই বক্তব্য যে বাদী যে সম্পত্তির দাবী করিতেছেন তাহাতে—১৯০৯ সালের ৮ই মে পর্য্যন্ত তাঁহার দখল ছিল, এবং সেই সময়ে তিনি অন্তর্হিত হন এবং মৃত বলিয়া অনুমিত হন। তাঁহার পত্নী তাঁহার বিধবা—রূপে ঐ সম্পত্তি উত্তরাধিকারিণী হন এবং হিন্দু আইন মতে বিধবার সম্পত্তি রূপে উহার অধিকারিনী হন। প্রতিবাদী পক্ষে এই তর্ক উপস্থিত করা হইয়াছেন ১৯০৯ সালের মে মাস হইতে উহা তাহার দখলে আছে, এবং—মামলা দায়েরের পূর্ব্বে ১২ বৎসরের উর্দ্ধ কাল উহা তাহার দখলে আছে সুতরাং এই মামলা তামাদি দোষে বারিত। বাদীর আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি হিন্দু বিধবারূপে সম্পত্তি দখল করিতেছিলেন এবং ১৯২১ অব্দের ৪ঠা মে তারিখে অর্থাৎ যেদিন বাদী নিজেকে কুমার বলিয়া ঘোষণা করিলেন কিন্তু সম্পত্তি হইতে বেদখল ছিলেন সেই দিন তাঁহার অধিকারে বাধা উপস্থিত হইয়াছিল এবং ঐ তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে মামলা রুজু হইয়াছিল। এইরূপ ধারণা করা অসম্ভব হইবে যে বাদীর নিরুদ্দেশ অবস্থায় মেজরাণী এই সমস্ত কাল ধরিয়া বাদীকে মৃত জানিয়া তাহার বিরুদ্ধ স্বত্বে বিধবার সম্পত্তি, দখল করিয়া আসিতেছিলেন। বিধবার সম্পত্তি বলিয়া উহাতে তাঁহার যে দাবী ছিল তাহার অধিক কোন কথা তিনি বলেন নাই—এবং যখনই তিনি উহা স্বীকার করিতেছেন যখন তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে তিনি স্বামীর হইয়া উহা দখল করিতেছেন—ইহাই হিন্দু আইনের সিদ্ধান্ত, এবং এই সিদ্ধান্তে আরও বলিতেছে যে তাঁহার মৃত্যুর পর, স্বামী যদি তৎপুর্ব্বেই মরিয়া থাকেন তাহা হইলে স্বামীর উত্তরাধিকারিগণ উত্তরাধিকারী হইবে (শরৎ চন্দ্র বনাম চারুশীলা দাসী ৫৫ থানিঃ—৯১৮) স্বামীর হইয়াই তিনি দখল করিতেছেন সুতরাং—সম্পত্তির প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য কারলে স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁহার বিরুদ্ধ স্বত্ব একটা অসম্ভব ধারণা। ইহা হইতে

এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে—তাঁহার মৃত্যুর পর—স্বামীর উত্তরাধিকারিগণ সম্পত্তির অধিকারী হইবে অথচ স্বামী তামাদি দ্বারা বারিত হইবে।

১৯২১ সালে ৪ঠা বা ৬ই, তারিখে বাদী—বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ তারিখের—পরেও তাঁহার দখল বিরুদ্ধ স্বত্ব হইবে কিনা তাহার বিচার করা আমার আবশ্যক হইবে না যেহেতু তিনি তখনও এই বলিতে ছিলেন যে তিনি ঐ সম্পত্তিই দখল করিতেছেন তাহার অধিক নহে। মামলা তামাদি দ্বারায়, বারিত নহে।

উভয় পক্ষের কৌশুলীগণের নিকট হইতে আমি যে সাহায্য লাভ করিয়াছি তাহা আমি এস্থলে স্বীকার করিতেছি। তাঁহাদের অভিজ্ঞতার এবং সাক্ষ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনার সম্পূর্ণ সুবিধা আমি লাভ করিয়াছি এবং এই মামলায় তাহাদিগকে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও তাহারা কোনও রূপ অনুযোগ না করিয়া আমাকে যে সাহায্য দান করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি।

এই মামলায় দখল বহাল রাখিবার জন্য বা বে-দখল হইলে দখল পুনরুদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। যদিও আমি দেখিতেছি যে বাদী ১৯৩০ অব্দে খাজনা আদায় করিয়াছিলেন এবং মামলা দায়েরের পর পুণ্যাহের সময় খাজনা আদায় করিয়াছিলেন তাহা হইলেও ইহা সত্য ঘটনা যে তিনি বে-দখল হইয়াছেন এবং এই বে-দখল এখনও রহিয়াছে।

এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে বাদী যদি ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার হন এবং মামলাটী যদি তামাদি দোষে বারিত না হয়, তাহা হইলে তিনি এই নালিসী সম্পত্তিতে এক অবিভক্ত অংশের অংশীদার। আমার বিচারে এই রায় যে —তিনি এই নালিসী সম্পত্তির এই কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং তিনি এই অংশের মালিক।

এইরূপ ডিক্রীর আদেশ হইল, বাদী ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ, রায়ের ২য় পুত্র বলিয়া ঘোষণা করা হইল এই নির্দেশ করা হইল যে তাহাকে নালিসী সম্পত্তির অবিভক্ত এক তৃতীয়াংশের দখল দেওয়া হউক—যে অংশ এক্ষণে ১নং প্রতিবাদিনী ভোগ করিতেছেন—এবং বাকী সম্পত্তির অন্যান্য প্রতিবাদীগণের সহিত সমান দখল থাকিবে।

এই ডিক্রী ২নং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা করা হইল এবং অবশিষ্ট,—প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দেওয়া হইল।

বাদী প্রতিযোগী প্রতিবাদিগণের নিকট—হইতে—বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকা সুদ সহ তাঁহার খরচা পাইবেন।

(স্বাক্ষর) পান্নালাল বসু

এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট জজ

ঢাকা

২৪শে আগষ্ট ১৯৩৬।

পরিশিষ্ট—ক

(The plaint in the Suit)

(আরজি)

জিলা ঢাকার প্রথম সবজজ আদালত

দেঃ মোঃ নং ৭০ । ১৯৩০

কুমার শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ রায়, পিতা স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, সাং জয়দেবপুর, থানা জয়দেবপুর, জিলা ঢাকা, হাঃ সাং ৭ নং আরমানিটোলা, থানা সূত্রাপুর, ঢাকা বাদী—

বনামে—

১। রাজানুপালিতা শ্রীমতী বিভাবতী দেবী পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার মিঃ E. Bignold, সাং জয়দেবপুর, থানা জয়দেবপুর, জিলা ঢাকা। মূল প্রতিবাদিনী—

২। রাজানুপালিতা শ্রীযুক্তা সরযবালা দেবী ৩। নাবালক রামনারায়ণ রায় পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার মিঃ E. Bignold. ৪। শ্রীমতী আনন্দকুমারী দেবী' পতি স্বর্গীয় রবীন্দ্রনারায়ণ রায় সাং জয়দেবপুর, থানা জয়দেবপুর, জিলা ঢাকা মোকাবিলা বিবাদীগণ

Declaratory ডিক্রী ও দখল স্থিরতরের বা দখল পাইবার এবং মূল প্রতিবাদীর উপর চিরস্থায়ী নিষেধআজ্ঞা পাইবার প্রার্থনায় ডিক্লেটারী ডিক্রী ও চিরস্থায়ী নিষেধআজ্ঞা পাইবার তায়দাদ ১০৫০০৲ টাকা ও দখল স্থিরতরের বা দখলের বিষয়ীভূত সম্পত্তির মূল্য মঃ ১৪২০০০৲ একুনে তায়দায় মোট ১৫২৫০০৲।

উপরোক্ত বাদী নিম্নলিখিত বর্ণনা করিতেছে ঃ—

১। জিলা ঢাকা এবং ময়মনসিংহ প্রভৃতির অন্তর্গত পরগণে ভাওয়াল ও অন্যান্য পরগণা মধ্যে যে সমস্ত মৌজা আছে এবং যাহা সাধারণে ভাওয়াল রাজ্য

বলিয়া অভিহিত করে উক্ত সম্পত্তি বাদী এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের জমিদারী পত্তনী ইত্যাদি স্বত্ব দখলিয় হইতেছে। বাদীর পিতা স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় উক্ত সম্পত্তির মালিক দখিলকার থাকা কালে তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার দেহান্তে বন্দোবস্ত জন্ম তাঁহার পত্নী রাণী বিলাসমণি দেবীকে ট্রষ্টি নিযুক্ত করিয়া যান। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ এবং রাণী বিলাসমণি দেবীর মৃত্যুর পর স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের তিন পুত্র কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বাদী, কুমার রনেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায় উক্ত ভাওয়াল রাজ্যে সম অংশে স্বত্ববান ও দখিলকার হয়েন। দাবীকৃত সম্পত্তির পরিচয় নিম্ন তপসিলে লিপিবদ্ধ করা হইল।

২। গত ১৯০৯ সনের এপ্রিল মাসে বাদী তাঁহার পত্নী ১নং বিবাদিনী শ্রীমতী বিভাবতী দেবী এবং কতিপয় আত্মীয় ও কর্ম্মচারী সহযোগে দার্জ্জিলিং শৈলাবাসে বায় পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করেন। দার্জ্জিলিংএ অবস্থান কালে বাদীর শরীর অসুস্থ হইলে,বাদীর চিকিৎসাকালে বিষপ্রয়োগ নিবন্ধন বাদী অচেতন হইলে বাদীকে মৃত জ্ঞানে ১৯০৯ সালের ৮ই মে তারিখে রাত্রিকালে বাদীকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। শ্মশানে বাদীর দেহ-বাহকগণ শ্মশানে বাদীর দেহ রাখিয়া স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া বাদীর মৃত দেহ শ্মশানে না পাইয়া ফিরিয়া চলিয়া যান। ঐ ঘটনার কয়েক দিবস পরে বাদী চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি আপনাকে নাগাসন্ন্যাসীগণের মধ্যে দেখিতে পান। এবং সন্ন্যাসীগণের সেবা ও শুশ্রূষাতে বাদী কতক পরিমাণে সুস্থ হইলে উক্ত সন্ন্যাসীগণের সহিত বাস করিতে থাকেন। তৎকালে বিষ প্রয়োগের ফলে বাদীর পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তিনি সন্ন্যাসীদের সহিত তাহাদের দলভুক্তের ন্যায় দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন। বাদী তৎকালে সন্ন্যাসী জীবনে অভ্যস্ত হইয়া সংসারে বিতৃষ্ণ হন।

৩। বাদীর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া বাদী মৃত উল্লেখে বাদীর পত্নী ১নং বিবাদিনী শ্রীমতী বিভাবতী দেবী হিন্দু আইনের বিধান অনুসারে বাদীর অংশের জমীদারী প্রভৃতি ভোগ করিতে থাকেন। বাদী বর্ণনা করেন যে ১নং বিবাদিনার উক্তরূপ ভোগ বাদীর জীবিত কালে বাদীর দখল বলিয়া পরিগণিত হইবে। পরে ১৯১১ সালের ২৮এ এপ্রিল তারিখে ১নং বিবাদিনীকে disqualified proprietress declare করিয়া বাদীর অংশ Court of Wards charge লয়েন।

৪। গত ১৯২১ সালের প্রথম ভাগে বাদী উপরোক্তরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে ঢাকা সহরে আসিয়া সন্ন্যাসী-বেশে Buckland বাঁধে অবস্থান করিতে থাকেন। তথায় অবস্থান কালে বাদীকে ভাওয়ালের মধ্যম কুমার বলিয়া অনেকে চিনিতে পারেন ও অনেকে অনুমান করেন এবং পরে বাদীর আত্মীয় স্বজন এবং স্থানীয় জমিদারগণ বাদীকে মধ্যম কুমার বলিয়া নিশ্চিত জানিয়া বাদীকে আত্মপ্রকাশ জন্য পীড়াপীড়ি করেন। তাহাতে বাদী আত্মপরিচয় গোপন করিতে অক্ষম হইয়া নিজ পরিচয় প্রকাশ করেন, এবং আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ার প্রবৃত্ত লওয়ান এবং উক্ত ভাওয়াল রাজ্যের প্রজাগণ বাদীকে মধ্যম কুমার স্বীকার করিয়া খাজানা ও নজর দিতে থাকেন। তৎপর ১৯২১ সালের ১৬ই মে জয়দেবপুর এক বিরাট সভা হয়, এবং বাদীর আত্মীয় ও প্রজাগণ বাদীকে মধ্যম কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ বলিয়া স্বীকার করেন এবং প্রজাগণ তাঁহাকে নজর ও খাজানা পূর্ব্বানুরূপ সাধারণ ও প্রকাশ্যভাবে প্রদান করিতে থাকেন। এইরূপে বাদী আপন অংশের খাজানা ও নজর আদায় করিতে থাকিলে, কোর্ট অব ওয়ার্ডের খাজানা আদায় সম্বন্ধে বাধা ও বিঘ্ন হওয়ায় ১নং বিবাদিনীর এবং তাহার ভ্রাতার ষড়যন্ত্র মূলে ও প্ররোচনায় ঢাকার তৎকালীন কালেক্টার Mr. Lindsay গত ১৯২১ সালের ৩রা জুন তারিখে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক declaration প্রচার করেন।

নোটিশ

এতদ্বারা ভাওয়াল ষ্টেটের সমস্ত প্রজাবর্গকে জানান যাইতেছে যে, রেভিনিউ বোর্ড নিশ্চিত প্রমাণ (conclusive proof) পাইয়াছেন যে ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমারের মৃত দেহ ১২ বৎসর পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং সহরে ভস্মসাৎ হইয়াছিল। সুতরাং যে সাধু দ্বিতীয় কুমার বলিয়া পরিচয় দিতেছে সে প্রতারক, যে কেহ তাঁহাকে খাজানা এবং চাঁদা দিবেন, তিনি তাহার নিজের দায়িত্বে দিবেন।

বোর্ড অব রেভিনিউর অনুমত্যানুসারে
জে, এইচ লিণ্ডসে—কালেকটার
ঢাকা ৩।৬।২১

বাদী বর্ণনা করেন যে (বোর্ডের নিম্নলিখিত resolution এর স্বীকৃত মতেই) বাদীর identity সম্বন্ধে পূর্ব্বে কোন তদন্ত না হওয়ায় ও তদ্রূপ তদন্ত কি সাক্ষী

প্রমাণ লওয়া বোর্ডের কোনরূপ ক্ষমতা না থাকায় উক্ত declaration অমূলক এবং ভিত্তিশূন্য ও ultravires বটে।

৫। উপরোক্ত declaration বাদীর অসাক্ষাতে হওয়ায় বাদী মহামান্য বোর্ডে গত ১৯২৬ সালে ৮ই ডিসেম্বর তারিখে এক memorial দাখিল করেন। উক্ত memorial ১৯২৭ সালে ৫৪ নম্বরে রেজিষ্টারী ভুক্ত হইয়া বাদীর পক্ষে এবং বিবাদীগণের পক্ষের বক্তৃতার পর গত ১৯২৭ সালের ৩০শে মার্চ্চ তারিখে মহামান্য বোর্ডের resolution নম্বর ৩৭১৫W অনুসারে বাদীর memorial অগ্রাহ্য হয়। উক্ত resolutionএ প্রজাসাধারণের নিকট বাদীর খাজানা এবং নজর আদায় স্বীকার আছে এবং মহামান্য বোর্ড আরও স্বীকার করিয়াছেন যে বাদীর identity সম্বন্ধে তাঁহারা কোন তদন্ত করেন নাই। কিম্বা তদনুরূপ বা কোনরূপ তদন্ত করিবার কি সাক্ষী সাবুদ লইবার বোর্ডের কোন ক্ষমতা নাই।

৬। বাদী আপন অংশের সম্পত্তি হইতে প্রজাগণের নিকট খাজনা ও নজর আদায় করিতে থাকিলে গত ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকার কালেক্টার Mr. O. M Martin বাদীর নাম সুন্দরদাস ওরফে ভাওয়াল সন্ন্যাসী উল্লেখে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারার বিধান মতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক নোটিশ জারী করেন—

সুন্দরদাস ওরফে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর প্রতি— ঢাকা—

যেহেতু ইহা আমার নিকট প্রতীয়মান হইতেছে যে তুমি জয়দেবপুরে যাইতে ইচ্ছা কর এবং সেখানে তোমার উপস্থিতি ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়াডস ষ্টেটের নিয়মিতরূপে নিযুক্ত কর্ম্মচারিদিগের বিরক্তি এবং প্রতিবন্ধক উৎপাদন করাইবে, এবং সম্ভবতঃ সাধারণ শান্তির বিঘ্ন ঘটাইবে, আমি এতদ্বারা জয়দেবপুর থানার এলাকায় মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করি, তুমি ১৯২৯ সালের ১১ই তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে এই আদেশের বিরুদ্ধে হাজির হইয়া কারণ দর্শাইতে পার।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতে সিলমোহর দেওয়া গেল

স্বাক্ষর—ও. এম. মার্টিন
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা।

৭। বাদী উক্ত নোটিশ তাঁহার প্রতি জারী হইয়াছে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নাম সুন্দরদাস নহে, এবং তিনি ভাওয়ালের মধ্যম কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, উল্লেখ করিয়া জয়দেবপুরে তাঁহার নিজ বাটীতে যাওয়ার অধিকার থাকা উল্লেখ

করিয়া আপত্তি দাখিল করেন। উক্ত মোকদ্দমায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাদীর এজাহার গ্রহণকালে বাদী অন্যান্য বর্ণনার সহিত নিম্নলিখিত বর্ণনা করেন :—

আমি ভাওয়াল সম্পত্তি দাবী করি, ইহা আমার পৈত্রিক। বাঙ্গলা ১৩১৬ সালে আমি জয়দেবপুর পরিত্যাগ করি এবং ১২ বৎসর পরে জয়দেবপুরে ফিরিয়া আসি, কাশিমপুর জমিদার মহাশয় আমাকে সেখানে লইয়া গিয়েছিলেন। সেখান হইতে যোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক জয়দেবপুরে আনীত হই, তিনি আমার জন্য হস্তী পাঠাইয়াছিলেন। আমি প্রজাদিগের নিকট হইতে নজরআনা পাইয়াছিলাম, তাহারা স্বেচ্ছায় এখনকার মত আমাকে তাহা দিয়াছিল। এমন কি এখনও আমি নজরআনা পাই। তাহারা নিজে আসিয়া নজরআনা দেয়, তাহারা ঢাকাতে আসিয়া আমাকে ইহা দেয়। সকল প্রজাই আমাকে কুমার বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহারা স্বেচ্ছায় আমাকে খাজনা দিতেছে, আমি খাজনা দিবার জন্য তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি করি না।

আমি পৈত্রিক সম্পত্তির দাবী ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহি। খাজানা গ্রহণ বন্ধ করিতেও ইচ্ছুক নহি। আমি এখন সম্প্রতি জয়দেবপুরে যাইতে ইচ্ছা করি।

৮। পরে Magistrate সাহেব উক্ত ১৪৪ ধারার হুকুম ৩০।৫।২৯ তারিখে রহিত করেন। উক্ত হুকুম হওয়ার পরে বিবাদী পক্ষের লোকের উক্তি ও ব্যবহারে বাদী আশঙ্কা করেন যে তিনি জয়দেবপুর গেলে তাঁহার উক্তস্থানে যাওয়ার পক্ষে বিঘ্ন ও বাধা জন্মাইবে। এবং উক্ত কারণে বাদী ইচ্ছাসত্বেও জয়দেবপুর যাইতে আশঙ্কা করেন।

৯। পরে বাদী আপন অংশের সম্পত্তির খাজনা প্রজাগণ বাদীর পত্নী বিভাবতী দেবীকে বা তাহার পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজারকে না দেয় এই মর্ম্মে ভাওয়াল প্রজাসাধারণের মধ্যে গত ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নোটিশ প্রচার করেন।

উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর প্রজাসাধারণ বাদীর অংশের দেয় খাজানা বাদীকে পূর্ব্বানুরূপ দিতেছেন এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজারকে ঐ অংশের খাজনা দিতে অস্বীকার করিয়াছেন; এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। এমতে বাদী আপন অংশের জমিদারী প্রভৃতিতে সম্পূর্ণরূপে দখিলকার আছেন। কিন্তু ১নং বিবাদিনীর তরফ হইতে মহালের স্থানে স্থানে লোক প্রেরণ করিয়া বাদীকে খাজনা না দেওয়ার জন্য নানারূপ

বাধা ও বিঘ্ন জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বাদীর খাজানা আদায়ের বিঘ্ন প্রদান করিবার জন্য এবং প্রজাদের নির্য্যাতন ও ভীতি প্রদর্শন করার জন্য ১নং বিবাদিনী এবং তাহার পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার অবৈধভাবে প্রতিবাদিগণের তরফ বেআইনী এবং illegal certificate জারী করিতেছেন। আনন্দকুমারী দেবীর তরফ হইতে যে certificate জারী হইতেছে তাহা আদৌ without Jurisdiction ultravires এবং invalid. উক্ত সার্টিফিকেট জারী সত্ত্বেও বাদীর দখল অক্ষুণ্ণ আছে।

১০। বাদী বর্ণনা করিতেছেন যে ১নং বিবাদিনী এক্ষণে অন্যায় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এবং অসৎ লোকের পরামর্শে বাদীকে না দেখা সত্ত্বেও বাদীর identity অস্বীকার করিতেছেন, এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডের সাহায্যে বাদীর দখল এবং বাদীর বসতবাটী জয়দেবপুরে যাওয়ার সম্বন্ধে বিঘ্ন ও বাধা ঘটাইবার উদ্দেশ্যে নানারূপ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। ২নং বিবাদিনী স্বয়ং বাদীর identity স্বীকার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে থাকায় তাঁহার ম্যানেজার মিঃ E. Bignold বাদীর identity অস্বীকার করিয়া বাদীর খাজানা আদায়ে বাধা প্রদানের চেষ্টা করায় তাহাকে পক্ষভুক্ত করা গেল। ৩নং প্রতিবাদী বাদীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৃত কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের পোষ্য পুত্র উল্লেখে কতক কতক সম্পত্তি দখল করিতেছে, এবং ৪নং বিবাদিনী শ্রীমতি আনন্দকুমারী দেবী উক্ত কুমার রবীন্দ্র নারায়ণের বিধবা পত্নী হইতেছেন। বাদী উক্ত পোষ্য পুত্র বৈধ কি অবৈধ জানেন না। কিন্তু বাদী অবগত হইয়াছেন, যে উক্ত পোষ্যপুত্র রদ সম্বন্ধে ঢাকার ২য় সবজজ আদালতে ১৯২৫ সালের ২১৬নং মোকদ্দমা দায়ের আছে। উক্ত পোষ্য পুত্র বৈধ কি অবৈধ বর্ত্তমান মোকদ্দমায় তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ৩।৪নং বিবাদী বাদীর identity প্রকাশ্যভাবে deny না করিলেও তাহাদের কার্য্যকলাপে এবং তাহাদের পক্ষীয় লোক ও কর্ম্মচারীগণের উক্তি ও ও ব্যবহারে তাহারাও বাদীর identity ভাবতঃ অস্বীকার করা অনুমিত হইতেছে বলিয়া তাহাদের সাক্ষাতে বর্ত্তমান মোকদ্দমা বিচার হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় তাহাদিগকে পক্ষ করা গেল। তাহারা বাদীর দাবীর বিরুদ্ধে উত্তরদাতা হইলে তাহাদিগকেও মূল বিবাদীগণে বাদী তাহাদের বিরুদ্ধেও আরজির প্রার্থিত প্রতিকার দাবী করিতেছেন।

১১। বাদী বর্ণনা করিতেছেন যে উপরোক্ত অবস্থাধীনে বাদীর statu-

সম্বন্ধে ১নং বিবাদিনীর কার্য্যের এবং উক্তিদ্বারা cloud thrown হওয়ায় তাঁহার status declared হওয়া আবশ্যক এবং মূল বিবাদিনী যাহাতে বাদীর দখল সম্বন্ধে এবং বাদীর বসত বাটীতে যাওয়া সম্বন্ধে বিঘ্ন ঘটাইতে না পারে তাহার জন্য চিরস্থায়ী নিষেধ আজ্ঞা প্রচার হওয়া আবশ্যক।

১২। বাদীর বর্ত্তমান মোকদ্দমার cause of action বোর্ডের resolution এর তারিখ ৩০.৩.১৯২৭ হইতে ও তৎপর ক্রমান্বয়ে উদ্ভব হইয়াছে। ডিক্লারেটারী ডিক্রী with consequention relief নিষেধ আজ্ঞার মূল্য ১০৫০০৲ টাকা ধরিয়া তাহার উপর ৭৭১৸০ টাকা কোর্ট-ফি দিয়া বাদী বর্ত্তমান নালিশ দায়ের করিতেছেন। দখল স্থিরতরের বা দখল পাওয়ার প্রতিকারের বিষয়ীভূত সম্পত্তির মূল্য ১৪২০০০ টাকা, উক্ত সম্পত্তির সদর রাজস্ব ষোল আনীতে ৪২৪২৬৷৵৩ পাই বাদীর এক তৃতীয়াংশে ১৪১৪২৵১ পাই, তাহার দশগুণ ১৪১৪২১৷১০ পাই বটে, আদালতের ন্যায় বিচারে, উক্ত এক তৃতীয় অংশ রাজস্বের দশগুণের উপর কোর্ট ফি দেওয়া সঙ্গত বিবেচিত হইল, উক্ত কোর্ট ফি বাদী হইতে গ্রহণে বাদী তদ্রূপ প্রতিকার পাওয়ার প্রার্থনা করিতেছে। অত্রাদালতের এলাকায় বাদীর নালিশের কারণ পুনঃ পুনঃ উদ্ভব হইয়াছে।

সে মতে প্রার্থনা—

(ক) বাদী ভাওয়ালের রাজা স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের মধ্যম পুত্র কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলিয়া প্রচার করিবার আজ্ঞা হয়।

(ক ১) নিম্ন তপশিলের সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ বাদীর দখল স্থিরতর রাখিতে বা প্রমাণ ও অবস্থানুসারে বাদীর দখল না থাকা সাব্যস্ত হইলে উক্ত সম্পত্তির উক্ত অংশে বাদীকে দখল দেওয়াইতে এবং তদবস্থায় বাদী হইতে অতিরিক্ত কোর্ট-ফিস গ্রহণে তদ্রূপ ডিক্রী দেওয়াইতে—

(খ) উক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের ত্যক্ত ও পরবর্ত্তী সময়ে অর্জ্জিত সমুদায় ভাওয়াল রাজ্যের অর্থাৎ নিম্নতপছিলের যাহার পরিচয় বিশেষরূপে দেওয়া হইল, তাহাতে এক তৃতীয় অংশে বাদীর দখলের কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইতে না পারে তন্মর্ম্মে ১নং বিবাদিনীর উপর চিরস্থায়ী নিষেধ আজ্ঞা জারী করিবার আজ্ঞা হয়।

(গ) মোকদ্দমা মুলতবী থাকাকালে বিবাদীগণ যাঁহাতে বাদীর

দখল সম্বন্ধে কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইতে না পারেন, তন্মর্ম্মে বিবাদীগণের উপর অস্থায়ী নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিবার আজ্ঞা হয়।

(ঘ) মোকদ্দমার অবস্থা ও বিবরণ মতে বাদী অন্যান্য যে কোন প্রতীকার পাইবার হকদার তাহা ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঙ) মোকদ্দমার সমস্ত খরচ বাদীর অনুকূলে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

পরিশিষ্ট—খ

Written Statement

[আনন্দকুমারীর লিখিত বর্ণনা]

Filed 25-10-30

First Sub Judge's Court Dacca.

Filed 25, Oct 1930

Sd. Illegible

(স্বাঃ) আনন্দকুমারী দেবী

By Sd.- M. N. Gangul

By Sd.- B. K. Guha.

জিলা ঢাকার ১ম সবজজ আদালত

দেঃ মোঃ নং ৭০ । ১৯৩০

তথাকথিত শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ রায় — বাদী

বনাম

শ্রীযুক্তা বিভাবতী দেবী গং — বিবাদী

উক্ত মোকদ্দমায় ৪ নং বিবাদিনীর বর্ণনা।

১। বাদীর নালিশের কোন হেতু কি অধিকার নাই।

২। বাদীর দাবী তামাদিতে বারিত বটে।

৩। আরজির বর্ণিত ও দাবীকৃত সম্পত্তির বাজার মূল্য অন্যূন মঃ ৫০০০০০০৲ লক্ষ টাকা বটে। উক্ত মূল্যের উপর advalorem কোর্টফি না দিয়া এবং দাবীকৃত সম্পত্তিতে স্বত্বসাব্যস্থ পূর্ব্বক দখলের প্রার্থনা না করিয়া বাদীর বর্ত্তমান দাবী আইনতঃ চলিতে পারে না বিধায়, বর্ত্তমান আর্জিমূলে বাদী কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহে।

৪। আর্জিতে বাদীর যে নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং এই বিবাদিনী তৎসমস্ত দৃঢ়রূপে অস্বীকার করিতেছে। বাদী রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র রমেন্দ্রনারায়ণ রায় থাকা কি হওয়ার উক্তি সমূলে মিথ্যা, বানোয়টী ও ফেরেবী বটে।

৫। ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার ৺রমেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় তাঁহার স্ত্রী অর্থাৎ ১নং বিবাদিনীর সহিত স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন জন্য দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। তৎব্যতীত আর্জির ২য় দফায় বর্ণিত অন্য সমস্ত উক্তি সম্পূর্ণ অলিক বটে। এই বিবাদিনী বিশ্বাস করে যে উক্ত দ্বিতীয় কুমার দার্জ্জিলিং যাইবার অল্পকাল পরে তথায় পরলোক গমন করিয়াছিলেন। এই বিবাদিনী অবগত আছে যে তদনন্তর জয়দেবপুর রাজবাটীতে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম যথাশাস্ত্র নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

৬। আর্জির ৪র্থ দফায় বাদী তাহাকে ভাওয়ালের মধ্যম কুমার বলিয়া অনেকে চিনিতে পারা প্রভৃতি যে সমস্ত উক্তি করিয়াছে, তাহা বিবাদিনী সত্য বলিয়া স্বীকার করে না, এবং তৎসমস্ত মিথ্যা বলিয়া এই বিবাদিনী বিশ্বাস করে। ভাওয়ালের প্রজাবর্গ কিম্বা ভাওয়াল রাজ পরিবারের আত্মীয় স্বজন কেহই বাদীকে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। পরন্তু এই বিবাদিনী অবগত হইয়াছে ও বিশ্বাস করে, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের মাতা ৺স্বর্গীয়া রাণী সত্যভামা দেবী এবং তাঁহার মধ্যমা কন্যা শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যিনি উক্ত কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের বয়োজ্যেষ্ঠা বটেন, তাঁহারা উভয়ে বাদী যে সময়ে জয়দেবপুরে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলেন সেই সময়ে তাহাকে টাকা দিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন এবং বাদী তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। বাদী দুরভিসন্ধি মূলে উক্ত ঘটনা গোপন করিয়াছে। বাদীকে অধুনা কোনও ব্যক্তি তাহাকে মধ্যম কুমার বলিয়া চিনিতে পারা বা তদ্রূপ ব্যবহার করা প্রভৃতি যে উক্তি করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৭। আর্জির ৫ম ৬ষ্ঠ ও ৭ম দফার বর্ণিত বিবরণ সমূহ কিছুই এই বিবাদিনী অবগত নহে এবং ৮ম ও ৯ম দফার বিবরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করে না।

৮। আর্জির ১০ম দফার উক্তি সমূলে মিথ্যা ও অভিসন্ধি মূলক। ১নং বিবাদিনী বাদীকে দেখিয়াছেন এবং তাহাকে প্রতারক বলিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বাদী যে উক্তি করিয়াছে যে, ২নং বিবাদিনী বাদীর identity স্বীকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা এই বিবাদিনী অবগত নহে ও সত্য বলিয়া স্বীকার করে না, ৩নং বিবাদিকে এই বিবাদিনী ও তাহার দত্তক গ্রহণ করা সম্বন্ধে এবং অন্যান্য কারণে এই বিবাদিনী ও তাহার দত্তক পুত্র ৩নং বিবাদীর সহিত ২নং বিবাদিনী শ্রীযুক্তা সরযূবালা দেবীর মনোবাদ হইয়াছিল এবং তদবধি এই বিবাদিনী ও ৩নং বিবাদীর সহিত উক্ত ২নং বিবাদিনী নানারূপ বিরোধ ও শত্রুতা চলিয়া আসিতেছে। এই বিবাদিনী অনুমান করে যে ৩নং বিবাদীর ভাবি স্বত্ব নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত ২নং বিবাদিনী বাদীর সহিত যোগদান করা সম্ভব। বাদী এই বিবাদিনী সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছে তদুত্তরে এই বিবাদিনী নিবেদন করে যে এই বিবাদিনী বাদীকে দেখিয়াছে এবং বাদী যে ভাওয়ালের কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় নহে তাহার সম্পূর্ণ প্রতীত হইয়াছে।

৯। ভাওয়াল রাজ ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডের শাসনাধীনে হওয়ার পূর্ব্বে ভাওয়াল রাজ পরিবারের অনেক আত্মীয়-স্বজন এবং দূরসম্পর্কিত ও নিসম্পর্কিত লোক ভাওয়াল ষ্টেট হইতে অন্ন বস্ত্র ও নানারূপ সাহায্য পাইয়া আসিতেছিল কিন্তু ভাওয়াল রাজ ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডের শাসনাধীন হওয়ার পর হইতে ঐ সমস্ত আত্মীয় স্বজন ও নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ পূর্ব্বের ন্যায় সাহায্য পাওয়া হইতে বঞ্চিত হয়, এবং তদ্দরুণ উক্ত ব্যক্তিবর্গ নিতান্ত মনক্ষুণ্ণ হয়। বিশেষতঃ ১৯১১ সনে ১নং বিবাদিনীর ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডে যাওয়ার পর হইতে ১নং বিবাদিনী নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কলিকাতা বাস করিতেছেন এবং পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়-স্বজন ও স্থানীয় লোক, গুরু পুরোহিতকে তিথি পার্ব্বণ ও ক্রিয়া কলাপে নিমন্ত্রণ এবং লৌকিকতা কিংবা কোনরূপ সাহায্যাদি না করায় ১নং প্রতিবাদিনী তাহাদের কতকের বিশেষ বিরাগভাজন হইয়াছেন।

১০। স্বর্গীয় রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর তদীয় কন্যা ৺কৃপাময়ী দেবীকে কতক সম্পত্তি জীবনস্বত্ব-মূলক মিয়াদে বন্দোবস্ত দিয়াছিলেন। গত ১৩২৭ সনে বৈশাখ মাসে নিঃসন্তান অবস্থায় কৃপাময়ী দেবী পরলোক গমন করায় উক্ত বন্দোবস্তের পাট্টা সমূহের সর্ত্তানুসারে ভাওয়াল রাজ ষ্টেটের

পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ড ৺কৃপাময়ী দেবীর ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডের শাসনাধীনে হওয়ার ঘোষণা করিলে তৎপর হইতে উক্ত সম্পত্তি নিয়া ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডের সহিত কুমারত্রয়ের ভগ্নিগণ, ভাগিনেয়গণ ও কৃপাময়ী দেবীর সতীন পুত্রগণের সহিত শত্রুতা ও মামলা চলিতেছে। কুমারত্রয়ের উক্ত ভগ্নিগণ জয়দেবপুর রাজবাড়ী হইতে কোর্ট অব ওয়ার্ড কর্ত্তৃক তাড়িত হয়; এবং তাহারা ভিন্ন স্থানে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হয়েন। তাহারা রাজ বাটীতে ও রাজষ্টেটে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার জন্য ও কোর্ট অব ওয়ার্ডের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ কতিপয় লোকের পরামর্শে ও সাহায্যে পাঞ্জাব দেশবাসী জনৈক সন্ন্যাসীকে উৎকোচ ও নানা প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহাকে দ্বিতীয় কুমার বলিয়া set-up করিয়াছেন বলিয়া এই বিবাদিনী বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছে ও বিশ্বাস করিতেছে। বিশেষতঃ বিগত ১৩১৯ সনে ৩ নং বিবাদীকে এই বিবাদিনী দত্তক গ্রহণ করায় ভাওয়াল ষ্টেট সম্পর্কে উক্ত কুমার ত্রয়ের ভাগিনেয়গণের ও তদ্‌হেতু তাহাদের আত্মীয় স্বজনের ভবিষ্যৎ আশা সমূলে বিনষ্ট হয়। এই বিবাদিনী বিশ্বাস করে যে উক্ত কুমার ত্রয়ের উক্ত ভগিনী ও ভাগিনেয়গণ উদ্যোগী হইয়া বর্ত্তমান বাদীকে ভাওয়াল রাজষ্টেটের এক অংশে স্বত্ববান উল্লেখে উপস্থিত করিয়া এই অলিক দাবীযুক্ত মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে বাদী কখনই ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার নহে কি হইতে পারে না। সে একজন impostor বটে এবং কোর্ট অব ওয়ার্ড কর্ত্তৃক সে ন্যায্যভাবে impostor declared হইয়াছে। বর্ত্তমানে মোকদ্দমা আক্রোশ ও ষড়যন্ত্রমূলক।

১১। এই বর্ণনার ভাবমর্ম্ম ও স্বীকৃত বিবরণের বিরুদ্ধে ও বিপর্য্যয়ে আরজির কোন উক্তি এই বিবাদিনী সত্য বলিয়া স্বীকার করে না।

১২। উপরি উক্ত অবস্থা ও কারণাধীনে বিনীত প্রার্থনা এই যে বাদীর অলীক ও বে-আইনী ও ফেরেবী দাবী ডিস্‌মিস্ ক্রমে বাদীর বিরুদ্ধে এই বিবাদিনীর আদালত ব্যয় ডিক্রী দিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। ইতি—

এই বর্ণনার ১।৪।৭।১০।১১।১২ দফা এবং আংশিক ৫।৬।৮।৯ দফার উক্তি আমার জ্ঞান মতে ও ২।৩ দফা ও আংশিক ৫।৬।৮।৯ দফার উক্ত আমার অনুসন্ধান ও বিশ্বাস মতে সত্য। অদ্য কলিকাতা নিজ ভাড়াটিয়া ৪৫।৪ এ নং চক্রবেড়ে রোড (South) হাবেলীতে বসিয়া এই সত্যতায় দস্তখত করিলাম। ইতি ১৯৩০ সন ২২শে অক্টোবর।

Sd/ শ্রীআনন্দ কুমারী দেবী

বিভাবতী ও রামনারায়ণের

লিখিত বর্ণনাপত্র

দাখিল ৯-৯-১৯৩০

প্রথম সবজজ আদালত

—ঢাকা

শ্রীযুক্তা বিভাবতী দেবী এবং
শ্রীমান রামনারায়ণ রায় চৌধুরী
ম্যাঃ সঃ আণ্ড কোং, সলিসিটার্স
ও তাহাদের ম্যানেজার দ্বারা স্বাক্ষর
ও, বিরাজেন্দ্র দ্বারা স্বাক্ষর দিঃ দেঃ
ও তুমিকং।

দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৭০।১৯৩০

কুমার শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনারায়ণ রায়—বাদী

শ্রীযুক্তা বিভাবতী দেবী দিগর—প্রতিবাদী

বিবাদী ১নং এবং ৩নং পক্ষে বর্ণনাপত্র—

(১) বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই কিংবা নালিশ করিবার কোন স্বত্ব নাই।

(২) মোকদ্দমা তামাদি-দোষে দূষিত হইতেছে।

(৩) বাদীর ভাওয়াল ষ্টেটের কোন সম্পত্তি নাই এবং কখনও কোন সম্পত্তি নিজের বলিয়া দখল করেন নাই বা অধিকারে নাই এবং ছিল না। ১নং প্রতিবাদিনী বার বৎসরের অনেক উর্দ্ধকাল নিজের স্বত্বে ভাওয়াল ষ্টেটের এক-তৃতীয় অংশ পাইয়াছে এবং অন্যের বিরুদ্ধ-স্বত্বে দখলকার আছে। আর্জির তৃতীয় দফার বিপরীত অভিযোগগুলি মিথ্যা। প্রতিবাদী বলেন যে তিনি নিজে মালিক বলিয়া এক-তৃতীয় অংশ দখল করেন, এবং বাদী নিজে মালিক বলিয়া ধরিয়া লইলেও (যাহা প্রকৃত নহে) তাহার স্বত্ব যদি কিছু থাকে তাহাও সময় অপগত হওয়ায় সম্যক্ নষ্ট হইয়াছে।

(৪) মোকদ্দমা আইনতঃ অচল।

(৫) বর্ত্তমান আকারে মোকদ্দমা চলিতে পারে না।

(৬) স্পেসিফিক অ্যাক্টের ৪২ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা অচল এবং দখল প্রার্থনা ব্যতীত ইহা চলিতে পারে না।

(৭) সম্পত্তির সমুদয় তালিকা কিংবা বিবরণ না দেওয়ায় মোকদ্দমা অচল।

(৮) মোকদ্দামায় সম্পত্তির নিয়মিত মূল্যে নির্দ্ধারিত হয় নাই এবং ঠিকভাবে কোর্ট ফি দেওয়া হয় নাই।

(৯) বাদী ঢাকা জয়দেবপুরের কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং বাদী কিংবা তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ ভাওয়াল ষ্টেট কখনও দখল করিতেন বা তাহাদের যেমন আছে তেমনি থাকা উক্তিগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা, এবং প্রতিবাদীরা ইহা অস্বীকার করেন। বাদীর ভাওয়াল ষ্টেটের অংশের কোন ভোগ দখলে থাকা বা কোন অংশ ছিল, উক্তিসকল সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি বাঙ্গালী নহেন এবং ভাওয়াল রাজপরিবারবর্গের একজন পরিবার হওয়া দূরের কথা কখনও বাঙ্গলা ভাষা জানিতেন না এবং এমন কি এখনও পর্য্যন্ত ১৯২১ সন হইতে প্রায় দশ বৎসর কঠোর চেষ্টায় এবং ষড়যন্ত্র-পরায়ণ ব্যক্তিগণ, যাহারা তাহাদের স্বার্থের জন্য এই মোকদ্দমা তাহার নামে গঠিত করিয়া দাখিল করিয়াছে, তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছেন কিংবা এমনকি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেও একজন বাঙ্গালীর মত ভাষায় সঠিক কথা কহিতে পারেন না।

(১০) বাদীর নিজের স্বীকারোক্তিতে সন্ন্যাসী হইয়াছে এবং আইন-চক্ষে সংসার পরিহার করায় তাঁহার কথিত স্বত্বগুলি হারাইয়াছেন এবং মোকদ্দমায় প্রতিকারের কোন দাবী করিতে উপযুক্ত নহে।

(১১) আর্জির ২ দফায় উল্লিখিত উক্তিগুলি ঈর্ষ্যামূলক ও মিথ্যা এবং বাদীও তাহা জানেন।

(১২) ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার কিছুকাল যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিলেন এবং ১৯০৯ সালে কলিকাতায় চিকিৎসার্থ গিয়াছিলেন। সেখানে কয়েকটী সুদক্ষ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছিলেন এবং হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিং যাইতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তৎপরে গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং শীঘ্রই তাঁহার পত্নী ১নং প্রতিবাদী, তাঁহার শ্যালক সত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৃহ চিকিৎসক ডাঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত, তাহার স্বকীয় সেক্রেটারী ৺মুকুন্দলাল গুপ্ত, তাঁহার কর্ম্মচারী এবং আত্মীয়? বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কয়েকটী অন্যান্য কর্ম্মচারী, ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে দার্জ্জিলিং গমন করেন। পিত্তশূলের তীব্র অক্রমণে কিছুকাল ভুগিতেছিলেন

বলিয় তথাকার সিভিল সার্জ্জন্ কর্ণেল যে, টি, ক্যালভাট আই, এম্, এস্ এবং তখনকার নিবারণচন্দ্র রায় বাহাদুর সহকারী সারজেনের চিকিৎসাধীনে রহিলেন। চিকিৎসায় কোন ফল হইল না এবং তাঁহার জীবন-রক্ষার্থে পত্নীর, আত্মীয় বন্ধুদের এবং চিকিৎসকাদির বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ১৯০৯ সালে ৮ই মে তারিখে প্রায় মধ্যরাত্রে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

১৩। পূর্ব্ব কথিত ১৯০৯ সালে ৮ই মে তারিখে কুমার মরিয়া গেলেন এবং ১০ই মে Calvert জয়দেবপুরে ২নং বিবাদীনীর স্বামী বড় কুমার রণেন্দ্র-নারায়ণ রায়ের নিকট শোক প্রকাশক নিম্নলিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন :—

প্রিয় কুমার—

আপনার ভ্রাতার মৃত্যুতে আপনার যে অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, তাহার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। আমার মনে হয় পীড়ার স্বভাব সম্বন্ধে এবং ইহার সম্ভবপর আরোগ্যের উপর তাহার দৃঢ় বিশ্বাসই তাহার পক্ষে এই হঠাৎ মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। প্রাতঃকালে আমাকে ডাকা হইলে তিনি নিজেকে এত ভাল অনুভব করিয়াছিলেন যে মৎ-নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন, এমন কি তাঁহার বন্ধুদের এবং নিজের সেক্রেটারির আন্তরিক প্রার্থনা এবং তাড়না (যাহারা তাহার অবস্থা সম্বন্ধে খুব ব্যগ্র ছিল) তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। দিনের শেষ ভাগে তাঁহার যন্ত্রণা আবার খুব তীব্র ভাবে দেখা দিল। তাঁহার সেক্রেটারির আগ্রহান্বিত চেষ্টায় যখন তিনি আমাকে আমার পরিভ্রমণ অবস্থায় দেখিলেন তখনই এই ঘটনার প্রতি আমার প্রথম মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। এই সময় মধ্যম কুমার সেক্রেটারি এবং বন্ধুবর্গের পরামর্শ শুনিলেন এবং আমাকে নিয়মিত চিকিৎসা করিতে আদেশ দিলেন। ইন্‌জেক্‌সন্ করায় যন্ত্রণা থামিল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সময়ের মধ্যে তাহার অবস্থা এমন একটা আতঙ্কজনক হইল যে সকলে ইহাতে অভিভূত হইল এবং সকলের চেষ্টা সত্ত্বেও হিমাঙ্গ হইয়া মরিয়া গেলেন। আপনার ভ্রাতার জীবন রক্ষা করিতে সম্ভবপর সমস্তই করা হইয়াছিল এবং তাহার কাছে যাহারা ছিল তাহাদের সকলেরই মনোযোগ এবং যত্ন পাইয়াছিল। তাঁহার নিকটে আপনারা থাকিলে তাহা সুখের হইত কিন্তু তাহার পীড়ায় আধিক্য এত হঠাৎ হইল এবং এত শীঘ্র শেষ হইল যে ইহা ভাবা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

আপনার বিশ্বাস ভাজন—

স্বাক্ষর—যে, টি, ক্যালভার্ট"

১৪। কুমার মধ্য রাত্রে মারা গিয়াছেন বলিয়া রাত্রে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আবশ্যক মত আয়োজন করা সম্ভব হয় নাই এবং পরদিন প্রাতে তাঁহার মৃতদেহ তাঁহার পদানুযায়ী উপযুক্ত শোভাযাত্রা করিয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। অনেক লোক গরীবদিগকে যাইবার পথে পয়সাদি বিতরণ করিতে সঙ্গে গিয়াছিল। সেখানে তাঁহাকে নিয়মিতরূপে সৎকার করা হইয়াছিল এবং তাহার মৃতদেহ পুড়িয়া ছাই হইয়াছিল।

১৫। মৃত কুমার সিটি অফ গ্লাসগো লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানিতে জীবন বীমা করিয়াছিলেন। কর্ণেল ক্যালভার্ট মৃত্যু-নিদর্শনী সার্টিফিকেটরূপে পূর্ব্ব-কথিত লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানির আদেশে দার্জ্জিলিংএর তখনকার ডেপুটী কমিশনার মিঃ ক্রফোর্ড আই-সি, এস মহাশয়ের (অবসর প্রাপ্ত) নিকটে শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি নিম্নলিখিত মর্ম্ম লিখিত রাখিয়াছেন।

এতদ্বারা জানান যায় যে ঢাকা জিলায় ভাওয়ালের জমিদার কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায় ষ্টেপএসাইড দারজিলিং বাটীতে থাকিয়া ২৭ বৎসব বয়সে ১৯০৯ সালের মে মাসের ৮ই তারিখে উদরের সাংঘাতিক পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

স্বাক্ষর ডবলিউ এন ক্রফোড্
ডেপুটী কমিসনর, ও জাসটিস্ অফ্ দি পিস্, দার্জ্জিলিং।

মৃত্যুর সার্টিফিকেট ঐ পলিসি নং ৭৪৭৮৯

জীবন বীমা—কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়।
দাবিকারিনী—রাণী বিভাবতী দেবী।

গ্লাস্‌গো নগরী জীবন বীমা কোম্পানী।

শেষ অসুখে উপস্থিত ডাক্তার কর্ত্তৃক প্রদত্ত। আমি যে, টি, ক্যালভার্ট এল্ টি কর্ণেল আই, এম, এস্ চিকিৎসক, দার্জ্জিলিং, এতদ্বারা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি যে আমি কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়কে ১৪ দিন ধরিয়া জানি এবং আমি ১৪ দিন পরামর্শদাতা ডাক্তাররূপে উপস্থিত ছিলাম। আমি তাহার শেষ অসুখে উপস্থিত ছিলাম এবং——বৎসর——মাস——দিন ভুগিয়া ১৯০৯ সালে ৮ই মে তারিখে রাত্রি ১১-৪৫ মিনিটের সময় দার্জ্জিলিংএ প্রায় ২৭ বৎসর বয়সে মারা যান। এই মৃত্যু তীব্র পিত্তশূলে সংঘটিত হয়। জীবদ্দশায় লক্ষণ এবং আবির্ভাব হইতে ইহা অনুমেয়, যে অসুখের লক্ষণগুলি (যাহাতে মৃত্যু

হইয়াছে) প্রথম আমা কর্ত্তৃক ১৯০৯ সালের ৬ই মে তারিখে দৃষ্ট হয় এবং ৮ই তারিখে সকালবেলা আক্রমণ ভীষণ হয়, এবং সেই রাত্রিতে তাহার মৃত্যু হয়।

স্বাক্ষর—যে, টি, ক্যাল্‌ভার্ট
পদবী—এল্, টি, আই, এম্, এস্
সিভিল ডাক্তার, স্থান—দার্জ্জিলিং।

১৯০৯ সালে ৭ই জুলাই তারিখে আমার সমক্ষে বিবৃত করিয়াছে—

স্বাক্ষর—
ডবলিউ এম, ক্রফোর্ড
জাস্‌টিস্ অফ্ দি পিস্ এবং ম্যাজিষ্ট্রেট্, জেলা দার্জ্জিলিং।

১৬। দ্বিতীয় কুমারের মৃত্যুর পর ১নং প্রতিবাদী দার্জ্জিলিংএ কুমারের সহযাত্রী অবশিষ্ট লোকের সহিত জয়দেবপুরে ফিরিয়া আসিল এবং স্বাভাবিক মৃত্যু-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের মত নিরূপিত হিন্দু নিয়মানুসারে শ্রাদ্ধকার্য্যাদি সঠিক সম্পন্ন হইল এবং শ্রাদ্ধসম্পাদনার্থ প্রয়োজনীয় বন্দোবস্তগুলি তখন জীবিত ১ম এবং ৩য় কুমার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি জয়দেবপুরের রাজবাটীতে হিন্দু বিধবার মত অপর কুমারদ্বয়ের ২নং প্রতিবাদীর স্বামী রণেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং ৪নং প্রতিবাদীর স্বামী রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের সহিত একান্নভোজী ছিলেন এবং অপর অংশের সহিত স্বীয় অংশ মিলিতভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ১৯১১ সালে কোর্ট অফ ওয়াড্‌স তাঁহার সম্পত্তির অংশের ভার গ্রহণ করিলে তিনি কলিকাতায় যান এবং তদবধি সেখানে বাস করিতেছেন। ১নং প্রতিবাদির পক্ষে কোর্ট অব্ ওয়াড্‌স্ কর্ত্তৃক দখলের ফলে সেই দখল বাদীর দখলের প্রতিকূলে হইয়াছে।

১৭। ১৯১০ সালে বড় কুমারের মৃত্যু হয় এবং ১৯১৩ সালে সর্ব্ব কনিষ্ঠ কুমারের মৃত্যু হয়। সেই সময় হইতে কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্ তিন বিধবার সম্পূর্ণ সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিয়া আছেন, যে পর্য্যন্ত না ১৯১৯ সালে সর্ব্বকনিষ্ঠ মহিলার অংশ কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস ছাড়িয়া দেয়, (কিন্তু ইহা এখনও কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্ অধীনে অন্যের সহিত মিলিতভাবে ম্যানেজার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে)। কুমারদিগের ভগ্নিগণ অন্যান্য আত্মীয়গণের সহিত ভাগিনেয়গণ এবং অধীন ব্যক্তিগণ রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের মত প্রায় ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত জয়দেবপুরে রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন এবং ষ্টেট্ (সম্পত্তি) সেই পর্য্যন্ত

তাহাদের খরচাদি বহন করিত। এই সুবিধা আর রহিল না, ফলে তাহারা সকলে নিজেরা পৃথক হইল, এবং ভগ্নীরা প্রত্যেকে মৃত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের উইল অনুসারে মাসিক দুই শত টাকা বৃত্তি পাইত। কিছু কিছু দয়ার দান যাহা রাজা এবং কুমারদের আমলে গরীব এবং দূরবর্ত্তী আত্মীয়দিগকে এবং রাজ পরিবারবর্গের অধীনগণকে দেওয়া হইত, তাহা অনেক স্থলে বন্ধ করা হইয়াছিল, এবং অন্যান্যস্থলে অনেক পরিমাণে কমান হইয়াছিল। সংক্ষেপে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পরিত্যক্ত উইল কিংবা ট্রাষ্টডিডে যে সমুদয় বৃত্তি, দান, এবং অন্যান্য সুবিধা লিখিত ছিলনা, তাহা কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্‌কে বন্ধ করিতে হইয়াছিল, ফলে কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্ কর্ত্তৃক সম্পত্তির পরিচালনা কুমারদের অধীন ব্যক্তিগণের এবং আত্মীয়গণের নিকট অতি অপ্রিয় হইল।

তাহা ছাড়া কুমারদের প্রশস্ত জমিদারী সম্পত্তি, পৈত্রিক বসত বাটীর অংশ এবং অন্যান্য ঘটনা লইয়া কুমারদের ভগ্নীগণের এবং কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডের মধ্যে অনেক মোকদ্দমা এবং গোলমাল হইল।

১৮। ষ্টেটের ভাওয়াল পরগণার মধ্যে অনেক বড় বড় বন আছে এবং কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্ ইহার ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ষ্টেটের প্রজারা কেবলমাত্র সামান্য মূল্য দিয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আদৌ না দিয়া ঐ বন হইতে স্বাধীনভাবে গাছ কাটিত এবং যদিও এইরূপ ভাবে গাছ কাটিবার প্রজাদিগের কোনও প্রথামুলক বা অন্য কোন স্বত্ব ছিল না, ভাওয়াল ষ্টেট্ এইরূপ অবৈধ কর্ত্তনে প্রায়ই হস্তক্ষেপ করিত না। তাহারা কেবলমাত্র জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য নিজেদের দরকারের জন্য গাছ কাটিত না, কিন্তু অনেকে অবৈধভাবে গাছ কাটিয়া এবং কাঠ বিক্রয় করিয়া জীবিকা চালাইত।

কোর্ট অব ওয়ার্ড ভার গ্রহণ করিয়া বনস্থিতি এবং রক্ষণের জন্য একটী বনবিভাগ স্থাপন করিল, ফলে কেবলমাত্র অবৈধ কর্ত্তন এবং বিক্রয় বন্ধ হইল যে তাহা নহে, কিন্তু প্রজাদিগের এমন কি তাহাদের জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য এক্ষণে উক্ত বন হইতে

গাছ ক্রয় করিতে হয়। সনদ পন্থা প্রবর্ত্তনার জন্য এবং কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডের ম্যানুয়াল অনুসারে যাহা কোর্ট করিতে বাধ্য, আদায়ের এবং সঠিক পরিচালনার অন্যান্য নিয়মগুলির জন্য তাহারা কোর্টের শাসনপ্রণালীকে ঘৃণা করিত।

১৯। এইরূপ অবস্থাকালীন সময়ে বাদী ১৯২০ সালে ঢাকায় আবির্ভূত হইল। সে একজন সন্ন্যাসী, সে দিবারাত্র সর্ব্বসময়ে বাকল্যাণ্ড বাঁধে খোলা স্থানে বাস করিত; সে হিন্দুস্থানী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় কথা কহিত না। চারিমাস ধরিয়া বাঁধে বাস করিলে সেখানে দলে দলে লোক তাহার নিকট যাইত এবং তাহার সহিত কথা কহিত। তাহার গুপ্ত ক্ষমতা আছে বলিয়া বিশ্বাস করিত, তাহা তৎশ্রেণীর লোকেরাই সাধারণতঃ আছে বলিয়া দাবী করে এবং সে অনেক লোককে ঔষধ বিতরণ করিত। সাক্ষাৎকারী লোকদিগকে তাহার অতীত জীবনের কথা হইলে, সে বলিত যে সে পাঞ্জাবী, পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া ১০ কিম্বা ১২ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়াছে।

২০। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে দ্বিতীয় কুমারকে বিষপ্রয়োগ করা হইয়াছিল, তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় রাত্রে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তৎপরে ঝড় বৃষ্টি আসায় মৃতদেহবহনকারী লোকেরা মৃতদেহকে তথায় ফেলিয়া অন্যস্থানে আশ্রয় লইয়াছিল। বৃষ্টি থামিলে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তথায় মৃতদেহটীকে দেখিতে পায় নাই এবং সেইজন্য গৃহে ফিরিয়া আসে। ইহাও মিথ্যা যে কয়েকদিন পরে সে জ্ঞানলাভ করে এবং নিজেকে একদল নাগা সন্ন্যাসীর মধ্যে দেখিতে পায়, পরে তাহাদের চিকিৎসার ফলে সে সারিয়া উঠিয়া তাহাদের সহিত বাস করিতে থাকে। বিষপ্রয়োগফলে তাহার স্মৃতিশক্তি প্রায় লোপ পাইয়াছে। সে দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে তাহাদের মত একজন হইয়া তাহাদের সহিত পর্য্যটন করে, তাহাদের জীবন-যাপনরীতিতে অভ্যস্ত হয় এবং সংসারে বিতৃষ্ণ হয়।

২১। এটীও সম্পূর্ণ মিথ্যা যে অনেক লোক তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল।

এবং অপর অনেক লোকও তাহাকে বাদী দ্বিতীয় কুমার বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। যখন সে বাক্‌ল্যাণ্ড বাঁধে অবস্থান করিতেছিল বাদীর আত্মীয়রা এবং স্থানীয় জমিদারগণ তাহার স্বরূপতায় বিশ্বাস করিল ; এবং তাহাকে সেইরূপভাবে পরিচয় দিতে পীড়ন করিল, এবং আর্জির বর্ণিত এক বৃহৎ সভায় দ্বিতীয় কুমার বলিয়া তাহাকে ভাওয়াল প্রজারা এবং আত্মীয়েরা চিনিল কিংবা স্বীকার করিল, ষ্টেটের প্রজারা তাহাকে নজর এবং খাজনা দিল। লিণ্ড্‌সে কর্ত্তৃক ১নং প্রতিবাদী এবং তাহার ভাইয়ের ষড়যন্ত্রে এবং উৎসাহে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল, কিংবা কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্ কর্ত্তৃক খাজনা আদায়ের বিঘ্নের জন্যই ইহা প্রচারিত হইল।

২২। কতকগুলি কুচক্রীলোক বাদীকে জয়দেবপুরের দ্বিতীয় কুমার বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল; এবং গোলযোগ বাঁধাইতে লাগিল এবং বাঙ্গালার বোর্ড অফ্ রেভিনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক এ বিষয়ে সম্যক তদন্ত আরম্ভ হইল। তখন বহু উপযুক্ত লোক এবং দলিলাদি পরীক্ষিত হইল, বোর্ড ১৯০৯ সালে ৮ই মে তারিখে দার্জিলিংএ দ্বিতীয় কুমারের মৃত্যু, এবং পরদিন তাহার সৎকার, এইসব বিষয়ে সম্যক্ সন্তোষজনক প্রমাণ অবগত হইয়া সেই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করেন। এবং তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট লিণ্ড্‌সে মহাশয় আর্জির চতুর্থ দফায় বর্ণিত প্রজাদিগকে কোন প্রকার সাক্ষ্য প্রদান করিতে নিষেধ করিয়া এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন।

২৩। আর্জির পঞ্চম দফায় বর্ণিত ১৯২৭ সালের ৩০শে মার্চ্চ তারিখে বোর্ডের আদেশ বাদী সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছে। সেই আদেশে বোর্ড স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বতদন্তে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৯০৯ সালে দার্জিলিংএ মারা গিয়াছে, এবং তাহার দেহ নিয়মমত সৎকার করা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে পূর্ব্বকথিত তদন্তের পর কলেক্টরকে আদেশ প্রচার করিতে আদেশ দিল যে, বোর্ডে চূড়ান্ত প্রমাণ পাইয়াছেন যে ভাওয়ালের দ্বিতীয়

কুমারের মৃতদেহ দার্জিলিংএ সৎকার করা হইয়াছে। যে সাধু আপনাকে দ্বিতীয় কুমার বলিয়া পরিচয় দিতেছে সে এক প্রতারক। বোর্ড সেই আদেশে কখন স্বীকার করে নাই যে বাদী কোন খাজনা আদায় করিতেছে এবং প্রকৃত পক্ষে কখনও ঐরূপ কোন আদায় করে নাই।

২৪। বাদী এবং কতকগুলি কুচক্রী লোক তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার বলিয়া তাহাকে খাড়া করিয়াছে, তাহারাই বিদ্রোহ ও শান্তিভঙ্গের জন্য দায়ী এবং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ জনসাধারণের শান্তিভঙ্গ রহিত করিবার উদ্দেশে সময় সময় তাহাকে জয়দেবপুর থানার এলাকার মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন, এবং ১৯২৯ সালে এপ্রিল মাসে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রদত্ত একখানি ঐরূপ আদেশপত্র। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে সে ঐসময়ে কোন খাজনা বা নজর আদায় করিত কিংবা তাহার পক্ষে ঐরূপ কথিত কার্য্য আর্জিতে ষষ্ঠ দফায় বর্ণিত ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডের ১৪৪ ধারায় বিজ্ঞাপন জারির প্রয়োজন হইয়াছিল।

২৫। বাদী সর্ব্বদা প্রজাদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় করার অভিযোগগুলি বা তাহারা খাজনা দিতে অস্বীকার করিয়াছিল বা কোর্টঅফ্-ওয়ার্ডের খাজনা আদায় দেওয়া বন্ধ করিয়াছে বা বাদী ভাওয়াল ষ্টেটের কোন অংশ দখল করিয়াছিল বা ১নং প্রতিবাদী পক্ষে মফঃস্বলে লোক পাঠাইয়া বাদীকে খাজনা দিতে নিষেধ করার উক্ত উদ্দেশে তাহাদিগকে উৎপীড়ন করা এবং আর্জির সপ্তম দফায় লিখিত তাহার এজাহারে অন্য অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রজারা সবসময় খাজনা দিয়াছে এবং কোর্টঅফ্ ওয়ার্ডস্‌কে খাজনাদি দিতেছে। গত বৎসর কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্ যাহারা খাজনা বাকী ফেলিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে সাটফিকেট্ নিয়মমত দাখিল করিয়াছে এবং বিবাদী দিগকে জানাইয়াছে যে, বাদী কোন প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যে সাটিফিকেট্ কোর্টে প্রজাদের নামে আপত্তি দাখিল করাইতেছে। যখন ঐ আপত্তি

গুলি নামঞ্জুর হইতেছে সে অনেকগুলি সার্টিফিকেট্ সম্পূর্ণ তুচ্ছ এবং বিরক্তিকর কারণে নষ্ট হইবার জন্য অনেকগুলি মোকদ্দমা দাখিল করাইয়াছে। ইহা মিথ্যা যে ৪নং প্রতিবাদীর পক্ষে সার্টিফিকেট্গুলি অন্যান্য আদালত বহির্ভূত বা আর্জির নবম দফায় কথিত এলাকা বহির্ভূত। ৩নং প্রতিবাদী ৪নং এর ন্যায়তঃ পোষ্যপুত্র হইতেছে।

২৬। ১নং প্রতিবাদী তাহার স্বামীর মৃত্যু সময়ে উপস্থিত ছিল এবং এমন কি কলিকাতায় তাহাকে অনেকবার দেখার পর ও সে মনে ধারণা করে এবং নিঃসন্দেহ মনে করিতে পারে যে বাদী একজন শঠ প্রতারক।

২৭। প্রতিবাদীগণ ২নং প্রতিবাদী স্বীকৃত ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমারের সহিত বাদীর স্বরূপত্ব অস্বীকার করে এবং প্রতিবাদিগণ আরও বলে যে ২নং প্রতিবাদী যে স্বীকার হইয়াছে, তাহা অনুনয়াদির ফলে বা বাদী এবং তাহার পৃষ্ঠপোষকদের চাপে বা ভুলক্রমে। অধিকন্তু অন্যান্য প্রতিবাদীগণের প্রতি তাহার মনের ভাব ধরিলে এবং মৃত কুমারদের ভগ্নীগণের কোর্ট অফ ওয়ার্ডস সহিত মোকদ্দমাতে সে যে কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত ভাবে অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতে বাদীর স্বরূপত্ব সম্বন্ধে তাহার কোন উক্তি বা স্বীকার মূল্যবান নহে এবং বাদীর মোকদ্দমায় সাপক্ষে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

২৮। বাদী স্থায়ী বা অস্থায়ী কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা পাইতে পারে না এবং নিষেধাজ্ঞায় কোন ঘটনা প্রকাশ পায় নাই।

২৯। এই লিখিত জবাবে যাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হইল না, তাহা প্রতিবাদী অস্বীকার করিল বিবেচিত হইবে।

৩০। বাদী আর্জির প্রার্থিত কোন প্রতীকার পাইতে স্বত্ববান নহে এবং মোকদ্দমা খরচাসহ খারিজ হইবে।

আই, ঈ, বিগ্নল্ড ম্যানেজার ভাওয়াল ষ্টেট ব্রতদ্বারা স্বীকার করেন যে লিখিত জবাবের তৃতীয় দফায় উক্তিগুলি আমার জ্ঞানতঃ সত্য এবং ৯, ১১,

হইতে ২২ এবং ২৪ হইতে ২৭ দফায় বিবরণ আমার জ্ঞান, বিশ্বাস এবং অনুসন্ধান মতে সত্য এবং অবশিষ্টগুলি কোর্টের নিকট সবিনয়ে নিবেদন এবং জয়দেবপুরে আমার কার্য্যালয়ে অদ্য ১৯৩০ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমি ইহাতে দস্তখত করিলাম।

স্বাক্ষর—ঈং, বীগ্‌নল্

পরিশিষ্ট

১নং বিবাদিনী রাণী (?) বিভাবতীর জেরা *

মিঃ বি, সি, চাটার্জ্জির জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন—আমি আমার মামাদের খুব ভাল রকম জানিতাম। প্র—(একখানা চিঠি দেখাইয়া) দেখুন ত এ চিঠিখানা কার লেখা? উ—এই চিঠিটাতে আমার মামা সূর্য্যনারায়ণ বাবুর নাম আছে, কিন্তু আমি তাঁহার লেখা চিনি না। প্র—আপনি কি জীবনে তাঁহার হাতের লেখা দেখেন নাই? উ—ছোটবেলায় বিয়ের আগে দেখেছি। প্র—আপনি হলপ করে বলতে পারেন যে, তারপরে আর তাঁহার লেখা দেখেন নাই? উ—হাঁ, দেখি নাই। মামা সূর্য্যনারায়ণবাবু আমার মাকে সময় সময় "ফেলা দিদি" বলে ডাকিতেন। সময় সময় ছোড়'দি ব'লে ডাকিতেন। প্র—এচিঠিতে যাহা লেখা আছে, সেটা কি আপনার পক্ষে নূতন বলে বোধ হচ্ছে? উ—না কতকগুলি নাম টাম যা আছে, তাহা আমি জানি। যেমন "থনি" হল আমার মাসতুত ভাই, তাহার ভাল নাম অমূল্য। "কেষ্ট" বলে একজন আছে—সেও আমার মাসতুত ভাই। তাহার ভাল নাম কৃষ্ণপ্রসাদ বানার্জ্জি। "আল্লাপদ" আমার ভাইয়ের নাম অর্থাৎ সত্যর নাম। প্র—এই যে "আল্লাপদ ফেল" এই কথা লেখা আছে—কি পরীক্ষায় ফেল? উ—বোধ হয় বি, এ, ফেল করার কথা। যে বৎসর তিনি বি, এ পাশ করেন, সে বৎসর তাঁহার বিবাহ হয়। প্র—আপনি যে বলেছেন, কুমারেরা বাবুর্চ্চির রান্না খেতেন—কাঁটা চামচ ব্যবহার করিতেন, তাহাতে কি আমি এই বুঝে নিব যে, তাঁহারা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না? উ—'গোঁড়া' আপনি কাকে বলেন? প্র—আপনি কি বলতে চান আজ পর্য্যন্ত আর কোনদিন "গোঁড়া-হিন্দু" শব্দ শোনেন নাই? উ—"গোঁড়া হিন্দু" শব্দ শুনেছি ঐ শব্দের অর্থ আমি বুঝি যে যাহারা অখাদ্য খায় না, এবং যাহারা "ছোঁয়াছুঁয়ি" মানে। কুমারদের গোঁড়ামি ছিল না—তবে তাঁহারা হিন্দু ছিলেন।

[১৯৩৫ সনের ৫ই মার্চ্চ হ'তে আরম্ভ করে ২৭শে মার্চ্চ বিবাদিনীর সাক্ষ্য ও জেরা শেষ হয়। মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জির মত শ্রেষ্ঠ আইনজীবীও তথা-কথিত রাণীর নিকট হ'তে বহু সত্য ঘটনা বাহির করিতে পারেন নাই।

বৈশিষ্ট্য

আপনি কি আজ পর্য্যন্ত জানেন যে বাদী তাঁহার সাক্ষ্য দেবার সময় বলেছেন যে, আপনার দেহে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে? উ—শুনেছি, কি কি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, তাহাও শুনেছি। আমার পায়ের দ্বিতীয় আঙ্গুল লম্বা, চোকের কোণ বসা—এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন বলে শুনেছি। প্র—আপনি কি আপনার পায়ের আঙ্গুল জজ সাহেবকে দেখাতে রাজি আছেন? অতঃপর সাক্ষী তাঁহার পায়ের আঙ্গুল কোর্টকে দেখান। কোর্ট আসিয়া লিপিবদ্ধ করেন যে, সাক্ষীর দুই পায়েরই বুড়া আঙ্গুলের পরবর্ত্তী আঙ্গুল দুইটি দুই পায়ের অন্যান্য আঙ্গুল অপেক্ষা লম্বা। সাক্ষীর চোখের কোণ বসা এবং কাল দাগ আছে। প্র—আপনি কি আজ পর্য্যন্ত জানেন যে, জেরার সময়ে মিঃ চৌধুরী বাদীকে বলিয়াছিলেন যে, এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের একটিও আপনার নাই? (মিঃ চৌধুরী এই প্রশ্নে আপত্তি করেন)। উ—না, শুনি নাই। প্র—চৌধুরী সাহেব আমার মক্কেলের জেরার আগে আপনার এই বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, সে সম্বন্ধে খবর নিয়াছিলে কি না? উ—খবর নিই নাই। প্র—তাঁকে কি এমন কথা বলেছেন যে, তিনটী বৈশিষ্ট্যের একটীও আপনার নাই? উ—দুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকার করেছিলাম, কিন্তু তৃতীয়টার কথা সবাই জানে, একথা আমি বলেছিলাম যে, আমার পায়ের আঙ্গুলে কোনও বৈশিষ্ট্য নাই। যাহা আছে তাহা আমি বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করি না। সে কথা আমি দাদার নিকট বলিয়াছি। তাঁহাকে বলিয়াছি যে, প্রত্যেকেই জানে যে, ঐ বৈশিষ্ট্য আমার আছে—সুতরাং বাদী যে জানিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? দাদা কাহাকে সে কথা বলেছেন জানি না। প্র—একথা কি সত্য যে, বাদীর জেরার আগে আপনাদের এই ধারণা ছিল যে আপনাদের এ রকম বলা হইয়াছিল যে, এই মোকদ্দমায় আপনার সাক্ষ্য দিতে হইবে না? উ—নিশ্চয়ই না। প্র—আমি বলছি যে, ঐ ভাবের বশবর্ত্তী হয়ে আপনি চৌধুরী সাহেবকে ঠিক কথা বলেন নাই? উ—না। প্র—আমি বলছি যে, বাদীকে জেরা করার ফলে আপনার ঐ বৈশিষ্ট্যের কথা চৌধুরী সাহেবের অস্বীকার করার আর কোনও কারণ থাকিতে পারে না। উ—একথা ঠিক নয় যে, আমায় ভুল খবর পাঠিয়েছিলেন। প্র—তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা আপনি যে অস্বীকার কর্চ্ছেন, তার উত্তরে আমি বলছি যে **আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।** উ—কখন নয়। কোর্ট যদি ইচ্ছা

করেন, তবে পরীক্ষা করাইতে পারেন। তৃতীয় চিহ্নটা **যদি থেকে থাকে, তবে তাহা স্বামী ছাড়া অন্য কাহারও জানা সম্ভব নয়।**

প্র—আপনি আপনার আইনজীবিদের এরকম খবর পাঠিয়েছিলেন যে, আপনি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন? উ—আমি যে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলাম এই খবর জানিয়েছিলাম। প্র—আপনি যে আজ সাক্ষ্য দিলেন, তাতে একথা বুঝা যায় নাকি যে, আপনি সত্যি সত্যি অন্তঃসত্ত্বা হন নাই? উ—আমি ত সে রকম বলি নাই। প্র—তখন আপনাদের পরিবারে খুব আনন্দের ব্যাপার হয়েছিল না কি? উ—একথার কি আমাকে উত্তর দিতে হবে? প্র—হাঁ, নিশ্চয়ই! এই প্রশ্ন করতে আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে। উ—আমার শাশুড়ী এই বিষয়ে বলাবলি করিতেন। খুব আনন্দের সহিত তিনি অনেকের সঙ্গে বলাবলি করিতেন যে, **"মেজ বউর ছেলে হবে।"** প্র—এই তিনমাস ঋতু বন্ধ থাকাতে আপনার কোন চিহ্ন হয়েছিল কি? উ—না।

প্র—আপনি কাল বলেছেন যে, শনিবার ১২—১২॥ টাতে কুমারের পিত্তশূল বেদনা বাড়ে এবং বাহ্যের সঙ্গে রক্ত ও আম দেখা যায়—এই বাহ্যটা কি পাতলা হয়েছিল? উঃ—পাতলা বাহ্য হয়েছিল, কিন্তু কমোডে বাহ্য করার সেটা ভাল বুঝা যায় নাই। প্রঃ—মুকুন্দ গুণ জয়দেবপুর একটা টেলিগ্রাম করেছিল যে, "কুমারের ঘন ঘন জলের মত দাস্ত হচ্ছে—সঙ্গে রক্তও পড়ছে।" একথা কি সে ঠিক লিখেছিল? উ—পাতলা দাস্তই হয়েছিল, তবে জলের মত পাতলা নয়। প্র—আপনি কি বলতে চান যে, যখন মুকুন্দ গুণ সেই টেলিগ্রাম পাঠায়, তখন তাহার মিথ্যা খবর পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল? উঃ—না? প্র—এই মোকদ্দমায় দার্জ্জিলিংএর এক ঘটনা সম্বন্ধে রাণী শুনেছেন? উঃ—কতকটা শুনেছি। আমি ভাইয়ের সঙ্গে নিশ্চয় সে বিষয়ে আলাপ করেছি। আমার উকীল বাবুদের সঙ্গে সেই বিষয়ে মুখোমুখি কথা হয় নাই। বাদীর জবানবন্দী খবরের কাগজে পড়েছি, আনন্দবাজার ও বসুমতীতে পড়েছি। অন্যান্য সাক্ষীর জবানবন্দীও পত্রিকাতে পড়েছি।

বাদীর বক্তব্য

প্রঃ—এটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, বাদীর Case হচ্ছে যে, তাকে দার্জ্জিলিংএ আর্সেনিক খাইয়েছিল। উঃ—হাঁ। প্র—আর আপনি বলেন যে মেজকুমারের পিত্তশূলের বেদনা খুব বেড়েছিল তারপর এবং হাইপোডার্মিন

ইঞ্জেকশনে তাঁহার বেদনা কমেছিল ? কুমার যে অপ্রত্যাশিতভাবে মারা যাবেন আপনারা বা ডাক্তাররা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা ? তবে আমার কাছে মৃত্যু অপ্রত্যাশিত ছিল। আমি আজ পর্য্যন্ত শুনি নাই যে, ক্যালভার্ট সাহেবের নিকট কুমারের মৃত্যু অপ্রত্যাশিত ছিল। ক্যালভার্ট সাহেব বিলাতে যাহা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা শুনিয়াছি। আমাকে সে সাক্ষ্য আগাগোড়া পড়িয়া শোনান হয় নাই, তবে আমি মোটামুটি শুনেছি। প্রঃ—তাহলে আজ আপনি আমার নিকট প্রথম শুনেছেন যে, কুমারের মৃত্যু ক্যালভার্ট সাহেবের নিকট অপ্রত্যাশিত ছিল ? উ—না, একথা আগেই শুনেছি।

প্র—আমি এই কথা বলছি না, যে আপনি নিজ হাতে কুমারকে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন, বা আপনি বিষ প্রয়োগের কথা জানিতেন,—এই কথাও আমি বলছি না; সুতরাং আমার কথাগুলি ধীরভাবে বিবেচনা করে উত্তর দিবেন। আপনি কি জানেন যে পিত্তশূলের ব্যথাতে মৃত্যু খুব বিরল ? একথা আপনি মেনে নিতে রাজি আছেন কি ? উ—হ্যাঁ। প্র—আপনি বলেছেন যে, তাঁকে হাইপোডার্মিক ইঞ্জেকসন দেওয়া হল, তাতে ব্যথা কমিল ; কিন্তু তিনি ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়লেন—আর এটাও দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণতঃ যখন এই অসুখে মৃত্যু হয় না, তখন এই ইঞ্জেকসনের পরে কুমারের উচিত ছিল সেরে উঠা ; তাহলে এটা বেশ বোঝা যায় না কি যে পিত্তশূল ছাড়া কুমারের এমন একটা কিছু ঘটেছিল, যাতে ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরেও কুমারের মৃত্যু ঘটে ? উঃ—একথা আমি কি করে বলব—আমি কি ডাক্তার ? প্রঃ—আপনি এটা শুনেছেন কি যে, যদি জলের মত পাতলা বাহ্য থাকে এবং তার মধ্যে যদি রক্ত ও আম থাকে তাহলে সেটা আর্সেনিকের একটা লক্ষণ ? উঃ—না, একথা আজ পর্য্যন্ত শুনিনি। প্র—আপনাকে বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কেহ বলে নাই যে, পিত্তশূলের ব্যথাতে কোন রোগী জলের মত রক্ত ও আম বাহ্য করে না ? উঃ—না। প্রঃ—আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, পিত্তশূলে রক্ত বাহ্য হয় না এবং আর্সেনিক খাওয়ালে রক্ত বাহ্য হয়। এখন আপনি বুঝতে পাচ্ছেন কিনা যে আপনার স্বামীকে আর্সেনিক খাওয়ান হয়েছিল ? উঃ—কি করে বুঝব ? প্রঃ—আপনি নিজে কখনও তলিয়ে ভেবে দেখেছেন কি যে সত্যই আপনার স্বামীকে আর্সেনিক খাওয়ান হইয়াছিল ? উঃ—আমি জানি ওটা মিথ্যা কথা। প্র—আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল না। (কোর্ট এই প্রশ্ন অগ্রাহ্য করেন) উ—আমার ভাববার দরকার হয় নাই, কারণ ঐ কথা মিথ্যা।

আর্সেনিকে কি হয় বা না হয়, তাহা জানতাম না এবং আজ পর্য্যন্ত জানি না। প্রঃ—তাহলে কুমারকে আর্সেনিক খাওয়ানে কি কি উপসর্গ হ'ত, সে কথা আজ পর্য্যন্ত আপনি কখনও ভাবেন নাই? উঃ—না।

প্র—আপনি যে উপসর্গের কথা বলেছেন—যেমন বমি করার কথা, পেটের ব্যথার কথা এবং অস্থির ভাব—সে সব লক্ষণ আর্সেনিকে হয়, কেহ আজ পর্য্যন্ত আপনাকে সে কথা বলেছে? উ—কুমারের লিভারের নিকট হইতে ব্যথা উঠে। এই উত্তরে মিঃ চাটার্জ্জি হাসিয়া উঠেন। তাহাতে রায় বাহাদুর আপত্তি করেন। তাহাতে মিঃ চাটার্জ্জি বলেন নাগরিক হিসাবে আমার হাসিবার অধিকার আছে, রায় বাহাদুর ইহা পছন্দ না করিলেও তাঁহার সহ্য করিতেই হইবে। প্রঃ—আপনি হয় ত এনাটমি পড়েন নাই এবং ফিজিওলজিও পড়েন নাই, তাহা ধরে নিতে পারি কি? উ—না, পড়ি নাই। প্রঃ—আপনি আজ পর্য্যন্ত জানেন যে, কর্ণেল ক্যালভার্ট কুমারকে লিভারের উপরে লাগাবার ঔষধ দেন নাই। পেটে লাগাবার জন্য দিয়াছিলেন? উ—মনে নাই। প্রঃ—আপনি হলপ করে বলতে চান যে কুমারের পেটের ব্যথা হয় নাই? উ—লিভার থেকে ব্যথা উঠে বুকে, পিঠে এবং পেটে ছড়িয়ে যেত।

প্র—আপনাকে কি কেউ আজ পর্য্যন্ত বলে গেছে যে, পেটে ব্যথা, বমি অস্থিরতা আর্সেনিকে হয়? উ—না। প্র—একথা আজই আমার নিকট প্রথম শুনলেন? উ—হাঁ। প্র—এটা ধরে নিতে পারি যে, আপনার স্বামীর অসুখের সময় আপনি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন? উ—না, আমি, তাহার মৃত্যুর আশঙ্কা করি নাই। তবে আমি একটু ভয় পাইয়াছিলাম। প্র—আপনি কি হলপ করে বলতে পারেন যে, তাঁর যত উপসর্গ হয়েছিল, তা আপনার মনে এটা ফটোগ্রাফের মত হয়ে আছে? উ—সমস্ত বলা শক্ত, তবে মোটামুটি বলতে পারব। আমি স্বামীর মৃত্যুর আগে ও পরে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করেছিলাম। প্র—আপনি এটা জানেন কি যে, যদি রোগীর শরীর থেকে ক্রমাগত জলীয় পদার্থ বাহির হইতে থাকে তবে তার খুব পিপাসা হয়? উ—হাঁ, কলেরা রোগীর যে রকম হয়। প্র—এ রকম জলীয়-পদার্থ বাহির হইয়া গেলে রোগীর মাংসপেশীতে খিল ধরে? উ—হাঁ শুনেছি। প্র—আপনার কি এই কথা মনে আছে যে, আপনার স্বামী বরফ দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে চীৎকার করেছেন? উ—না, ওরকম চীৎকার করেন নি। আমাদের সঙ্গে যে বাবুর্চ্চি গিয়াছিল তাহার নাম বোধ হয় আফিলদ্দি।

আমাদের সঙ্গে দার্জ্জিলিংএ একজন বাবুর্চ্চি এবং একজন মশালচি গিয়াছিল। প্র—আপনি একথা শুনেছেন যে, মানহানির মোকদ্দমায় আলিমুদ্দি বাবুর্চ্চি সাক্ষ্যে বলেছিল যে, কুমার মাঝে মাঝে বরফের জন্য চীৎকার করেছে? উ—ইহা অনেকদিন পূর্ব্বের কথা, শুনেছি কিনা মনে নাই। প্র—আপনি কি এই বলিতে চান যে, আপনার সঙ্গে দার্জ্জিলিং এর ঘটনা সম্বন্ধে বর্ণনাতে কাহারও মিল না হলে সে মিথ্যাবাদী? উ—না, তবে এই ক্ষেত্রে আলিমুদ্দি বাবুর্চ্চির থেকে আমার নিজের মনে থাকাই বেশী সম্ভব। প্র—আপনি এটা কি বুঝতে পেরেছিলেন যে কুমারের দেহ হইতে অনেক জলীয় পদার্থ বাহির হইয়া গিয়াছিল? উ—বাহ্যি ছাড়া আর কিছুই জলীয় পদার্থ বাহির হইয়াছিল বলিয়া মনে নাই। তাঁহাকে গুঁড়া মাখান হইয়াছিল এইজন্য যে তাঁহার শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছিল। প্র—অনেক জলীয় পদার্থ বাহির হইয়া যাইতেছিল। প্র—অনেক জলীয় পদার্থ বাহির হইয়া শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়, একথা মানেন কি? উ—হতে পারে। কুমারের দেহটা বৈকালের দিকে ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করে। ৪টা হইতে ৬॥১টার মধ্যে কুমারের দেহ ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ হয়। প্র—আপনি কি জানেন, ১৯২১ সনে ক্যালভার্ট সাহেব কুমারের অসুখের সম্বন্ধে লিণ্ডসে সাহেবকে একখানা চিঠি লিখে পাঠান? উ—না জানি না—মনে পড়ে না। প্র—তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন পূর্ব্বে আমি তাঁকে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন দেখেছিলাম। উ—একথা শুনেছি কিনা মনে নাই। প্র—ক্যালভার্ট সাহেব বলেছিলেন যে মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তাহার গভীর হিমাঙ্গ অবস্থা হইয়াছিল এই কথা কি মিথ্যা বলেছেন? উ—আমি মিথ্যা বলিতে চাই না। তবে হিমাঙ্গ হয়েছিল; গভীর কিনা বলিতে পারি না। প্র—আপনি কি ব'লতে চান যেন ক্যালভার্ট সাহেব যাহাকে গভীর হিমাঙ্গ অবস্থা বলেছেন, তাহাতেও কুমার কথা কহিতেছেন? উ—মৃত্যুর অল্প পূর্ব্বেও তিনি কথা বলেছেন। কয়েকটি কথা ভুলও বলেছেন। আমি শুনেছি মাঝে মাঝে তার মধ্যে ২।১টা ভুলও বলেছেন। আমি শুনেছি যে, আর্সেনিক বিষ প্রয়োগেও হিমাঙ্গ হয়!

প্র—আপনি বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত জানেন না যে, আশু ডাক্তারের স্বাক্ষরিত একটা ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আর্সেনিক ছিল? উ—না। প্র—আপনি বোধ হয় একথা শোনেন নি যে এই ব্যবস্থাপত্রের কথা সাহেব জানিতেন না? উ—না শুনি নাই। প্র—ক্যালভার্ট সাহেব যদি একথা

বলে থাকেন যে, এই ব্যবস্থাপত্রের কথা সাহেব জানিতেন :না তবে যে কথা আপনি মেনে নিতে রাজি আছেন? উ—হাঁ। প্র—এটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছেন যে কুমারের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর একটা কারণ ছিল? উ—অসুখই কারণ। প্র—এখন আর্সেনিক বিষ প্রয়োগের লক্ষণ শুনে বুঝতে পাচ্ছেন কি যে কুমারের তথাকথিত মৃত্যু আর্সেনিকে হইয়াছিল? উ—কি করে বলব? আপনার কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছি। প্র—আপনি জানেন যে ক্যালভার্ট সাহেব যখন একই ঘটনা সম্পর্কে অন্য কথা বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কোনও গলদ ছিল? (কোর্ট এই প্রশ্ন অগ্রাহ্য করেন) প্র—একথা যদি কেহ বলে, "কুমার ইঞ্জেকসন লইলেন না—সে জন্য তাঁহার মৃত্যু হইল, তাহলে সে কথা কি সত্য হবে? উ—না। প্র—আপনি কি জানেন ক্যালভার্ট সাহেব লিগুসে সাহেবকে চিঠি লিখেছেন যে, কুমার কিছুতেই ইঞ্জেকসন গ্রহণ করে নাই উ—না, শুনি নাই। এই সময় মিঃ চৌধুরী এই সব প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাহাতে মিঃ চাটার্জ্জি বলেন, আমার মনে হয় যে, কর্ণেল ক্যালভার্ট বলেছেন, এই সব বলে আপনি সাক্ষীকে ভয় দেখাতে চান।" তাহাতে মিঃ চাটার্জ্জি বলেন, "কোনও ভদ্র মহিলাকে আমি ভয় দেখাতে চাই না, আমার বক্তব্য এই যে, এই মহিলার নিকট হইতে সমস্ত কথা গোপন রাখা হইয়াছে।" প্র—আপনার দাদা কি কুমারের মৃত্যু শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন? উ—কান্নাকাটি করেছিলেন বৈকি। প্র—ক্যালভার্ট সাহেবের নিকট হইতে ১০ই মে সোমবার ১৯০৯ তারিখে একটা প্রশংসাপত্র যোগাড় করা হইয়াছিল—সে বিষয়ে আপনি কিছু জানেন? উ—কিসের প্রশংসাপত্র? প্র—সেদিন কালভার্ট সাহেবের নিকট হইতে একখানা চিঠি নেওয়া হইয়াছিলেন—তা আপনি জানেন কি? উ—আমি কিছুই জানি না। আমি আজ পর্য্যন্ত শুনি নাই যে বাড়ীর কাহারও দ্বারা ক্যালভার্ট সাহেবের নিকট হইতে একখানা চিঠি নেওয়া হইয়াছিল। প্র—আপনি বোর্ড অব রেভিনিউর নিকটে ক্যালভার্ট সাহেবের ১৯০৯ সালের ১০ই মে তারিখে চিঠি পেয়েছিলেন সে বিষয়ে কিছু মনে পড়ে? উ—কি বিষয় বলুন। প্র—ক্যালভার্ট সাহেবের কোন চিঠি পেয়েছিলেন? উ—আমার মনে পড়ে, ক্যালভার্ট সাহেব বড় কুমারের নিকট যে চিঠি লিখেছিলেন, বাদী আসার পর তাহার একখানা নকল বোর্ড অব রেভেনিউ সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইয়া দেই। সেই

সকল যোগেন বাবু আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। সেই চিঠিতে কি লেখা ছিল তাহা আমি শুনেছি। সেই চিঠি যে ক্যালভার্ট সাহেব দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছেন তা মনে আছে। সেই চিঠি আমার ভাই আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। আমি তখন লিখেছিলাম যে, সে চিঠিখানা ভাওয়ালের সেরেস্তায় খুঁজে হঠাৎ পাওয়া গিয়াছিল—কারণ যোগেন্দ্রবাবু সে কথা লিখেছিলেন। আমি ইংরাজী বিশেষ কিছু পড়ি নাই। ছেলেবেলায় ফাষ্ট বুক সেকেণ্ডবুক এসব বই পড়েছি। নাম টাম ইংরাজীতে লিখতে শিখেছিলাম। প্র—আপনি চৌধুরী সাহেবের জবানবন্দীতে অনেক ইংরাজীতে কথা বলেছেন? উ—হাঁ কিছু কিছু বলেছি। আমি এখন ইংরাজীতে আমার নাম সই করিতে পারি। মিঃ চাটার্জ্জি বলেন (কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য!)। আমি ইংরাজি লেখা পড়িতে পারি না। খবরের কাগজের নামটা টামটা পড়তে পারি। প্র—আপনি নিজের নাম লেখা ছাড়া আর কিছু লিখতে পারেন? উ—যেমন ল্যান্সডাউন রোড, ঢাকা এই রকম দুই একটা কথা লিখতে পারি। দার্জ্জিলিং থেকে ফিরে আসা অবধি আমার ভাই ও তাঁহার স্ত্রী আমার সঙ্গে আছেন। আমার ভাই ইংরাজী বাংলা লিখিতে ও বলিতে পারেন। আমি তাহার ইংরাজী বাংলা লেখা দেখিয়াছি। আমি আমার ভাইয়ের বাঙ্গলা লেখা দেখলে চিনিতে পারিব। প্র—আপনার ভাইয়ের ইংরাজী লেখা দেখে চিনতে পারবেন কি? উ—না দেখে বলতে পারি না। প্র—তার ইংরাজী লেখার ছাঁদ আপনার মনে আছে ত? উ—তা আছে বৈকি। প্র—আপনি কি জানেন যে আপনার ভাই একটা ডায়েরী রাখিতেন? উ—ডায়েরী রাখেন কিনা জানি না অতঃপর সাক্ষী বলেন, আমি যখন আষাঢ় মাসে জয়দেবপুর হইতে ঢাকা আসি, তখন মাকে ষ্টেশনে দেখি নাই। প্র—আমি বলছি আপনাদের দাদা জয়দেবপুর হইতে আপনার সঙ্গে এসেছিলেন। উ—এসেছিলেন কি না মনে পড়ে না। সাগর ছিল না একথা হলফ করে বলতে পারি না—তবে তাঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। প্র—আপনি একটু মনে করে দেখেন ত যে, সাগরের সঙ্গে আপনার ষ্টেশনে কোন গণ্ডগোল হয়েছিল কিনা? উ—আমার ত মনে পড়ে না। সে ব্যাপারের সব কথা মনে করা অসম্ভব। প্র—কেউ যদি বলে যে, সে দিন আপনার মা ঠিকা ল্যাণ্ডোতে ষ্টেশনে গিয়াছিলেন—তাহলে সে কথা স্বীকার করিতে পারেন না? উ—না। প্র—কেউ যদি বলে যে সে দিন ছোটকুমারের সঙ্গে ষ্টেশন হতে আসেন না। উ—খুব সম্ভব ছোট

কুমার আমার সঙ্গে ষ্টেশন হইতে নলগোলা আসেন নাই। সেদিন গিরীন্দ্র বাবু আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন কিনা মনে নাই। আমাদের সঙ্গে অনেক কর্ম্মচারী ছিল। ঝাণ্ডা সিং বলে আমাদের একটি সিপাহী ছিল।

প্র—এটা কি আপনার মনে পড়ে যে, সাগর আপনাকে নলগোলার বাড়ীতে আন্‌তে চায় এবং আপনার দাদা বলেন, "না তাকে মা'র কাছে যেতে দাও।" উ—না একথা ঠিক না। প্র—কেউ যদি একথা বলে যে সাগর ঝাণ্ডা সিংকে বলেছিলেন, "সত্যবাবুকে ধর" তবে সেকথা সত্য হইবে? উ—আমি সাগরকে সে কথা বলিতে শুনি নাই। প্র—কেউ যদি বলেন যে আপনার দাদা বাধা দিয়ে বললেন, "ওকে নলগোলা বাড়ীতে নিয়ে যেও না।" তবে সেটা সত্য কথা হইবে? উ—আমি ত বলিতেছি আমার সামনে হয় নাই—বলতে পারবো না। প্র—কেউ যদি একথা বলে যে, আপনাকে মার কাছে যেতে না দিয়ে জোর করে নলগোলার বাসায় নিয়ে আসা হল—তবে সেটা সত্য কথা হইবে? উ—সত্য হইবে বলে মনে হয় না। প্র—এটা আপনি অস্বীকার করিতে পারেন যে, আপনার ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটির পরে নলগোলা বাসায় আপনাকে নিয়ে আসা হল? উ—ঝগড়া হইয়াছিল কিনা জানি না। প্র—আমনি বোধ হয় এখন বলতে রাজী নহেন যে, আপনার ভুল হইতে পারে? উ—ভুল হতে পারে বৈকি। প্র—এটাকি আপনি বলতে পারেন যে, সেদিন শুনেন নি আপনার মা ষ্টেশনে গিয়েছিলেন? উ—না আজ পর্য্যন্তও শুনি নাই সেদিন মার সঙ্গে আমার ঢাকা আসার বিষয়ে কোন আলাপ হয় নাই। প্র—মার বাড়ীতে আপনার সঙ্গে বা সে বাড়ীর অন্য কাহারও সঙ্গে আপনার ঢাকা আসার বিষয়ে কোন কথা হয়েছিল? না হয় নাই। মার বাড়ী হইতে আমাকে পুনঃ নলগোলার বাড়ীতে আনতে চেষ্টা করা হয়েছিল কিনা মনে নাই। প্র—বিল্লু ও কি আপনাকে তাড়া দিয়ে বলেছিল 'চলুন নলগোলায়" উ—আমার মনে নাই। প্র—আপনি যখন জয়দেবপুরে ছিলেন তখন প্রভাবতীর সঙ্গে আপনার চিঠি লেখা চলিত? উ—চলিত বৈকি। প্র—মার সঙ্গেও চিঠি লেখা চলিত?—হাঁ। প্র—প্রভাবতী আপনাকে খুব ভালবাসতেন—না? উ—হাঁ। আমাদের দু'জনার সঙ্গে খুব ভালবাসা ছিল। আমার মাও আমাকে স্নেহ করিতেন। প্র—(একখানি চিঠি দেখাইয়া) বলুনত, এই চিঠি প্রভাবতী দেবী আপনাকে লিখিয়া ছিলেন কিনা? উ—(অনেকক্ষণ চিঠিখান পড়িয়া) ইহা প্রভার ছোটকালের লেখা।

চিঠিখানার ভাষা ও বৃত্তান্ত দেখে মনে হচ্ছে যে আমার বোনের লেখা। প্রভা ছোটকালে আমাকে চিঠি লিখত। প্র—আমি ধরে নিতে পারি যে, ওই চিঠিখানা প্রভাবতীর লেখা? উ—তার লেখা কিনা বুঝতে পাচ্ছি না। কথাগুলো দেখে মনে হয় যে, তার এই চিঠি। লেখাটা তার হাতের কিনা বুঝতে পাচ্ছি না। কোর্ট—তা হ'লে ছোটবেলার লেখা কি বলেছেন? উ—তাহার ছোট বয়সের লেখা ভুলে গিয়েছি। প্র—তাহ'লে ইহা প্রভার চিঠি, তাহা আপনি অস্বীকার কর্ত্তে পারেন না? উ—না। প্র—আপনি সাক্ষ্য দিতে আসার সময় এই স্থির করে এসেছেন কি যে কাহারও চিঠি আপনি প্রমাণ করবেন না? (হাস্য) উ—না। ওই চিঠি প্রভার হইতেও পারে, প্র—কোন কারণে আপনার সন্দেহ হয় যে ইহা প্রভার চিঠি নয়? উ—তাহার ছোটকালের লেখা ভুলিয়া গিয়াছি। আপনি দিচ্ছেন বলে এই চিঠির সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে—তাহা বলিতেছি না। প্র—ঐ চিঠিতে এমন কোন লেখা আছে, যাতে আপনার সন্দেহ হয় যে, ইহা তার লেখা নয়? উ—না। প্র—তাহ'লে আপনার কথা হইল যে তার ছেলে বেলার চিঠি আপনার মনে নাই? ইহা ছাড়া এই চিঠি সন্দেহ করিবার আপনার আর কোন কারণ নাই? উ—না। আমি আমার মার লেখা চিনি। প্র—আপনি বিবাহের পরে যে সব চিঠি লিখেছেন তাতে এমন ভাব দেখিয়াছিলেন না কি যে, "আপনি যেন অশোক বনে সীতা?" উ—মনে নাই। প্র—আপনার মনে পড়ে কিনা যে আপনার নাম লিখতেন নিজেকে "হতভাগিনী" বলে। উ—মনে পড়ে না। প্র—(একখানা চিঠি দেখাইয়া) দেখুনত এখানা আপনার মার চিঠি কি না? উ—চিঠিখানা মার লেখা বলেই মনে হচ্ছে। (চিঠিখানা আদালতে দাখিল করা হয়)। এই চিঠি আমার নিকট লেখা। শ্বশুর বাড়ী এসে আমি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম; কিন্তু বই টই পড়িতাম। প্র—আপনার মনে আছে যে আপনার ছোট বোন প্রভা আপনাকে লিখেছিলেন, "তুমি ইংরেজী পড়া ছেড়ো না।" উ—হতে পারে—লিখতে পারে। প্র—(একখানা চিঠি দেখাইয়া) দেখুন এই চিঠিখানা প্রভাবতী দেবী আপনাকে লিখেছিলেন কি না? উ—চিঠিখানা তারই—তবে কার লেখা বলিতে পাচ্ছি না। প্র—এই দেখুন আর একখানা চিঠি। উ—চিঠিখানা তারই তবে কার লেখা বলতে পাচ্ছি না। প্র—আপনার বিবাহের পরে যখন জয়দেবপুর এলেন, তখন আপনার কি একথা মনে হয়েছিল যে আপনি। একটা "অকাট মূর্খ ও দুশ্চরিত্র লোকের হাতে পড়েছেন?—"

না ? ধর্ম্মসাক্ষী করে বলুন দেখি যে, আপনার স্বামী আপনার সঙ্গে শুতেন না বলে আপনার ভীষণ দুঃখ হয়েছিল কি ? উ—না, দুঃখ হয় নাই। প্র—আপনার কি মনে পড়ে যে, আপনার মা বলে পাঠিয়েছিলেন যে, "বিভা যেন চেষ্টা করে যাতে তার স্বামী তার সঙ্গে এক বিছানায় শোয় ?" উ—পাঠাতে পারেন। অতঃপর মিঃ চাটার্জ্জি বলেন, আচ্ছা এখন আমরা পুনঃ দার্জ্জিলিং ফিরে যাই। প্র—আপনি বলেন যে, শনিবার বেলা ১২টা ১২॥টার সময় কুমারের রক্ত বাহ্য আরম্ভ হয় ; এতদিন পরে আপনার সে কথা কি একেবারে ঠিক মনে আছে। উ—সময়ের একটু আধটু এদিক ওদিক হতে পারে। আশু ডাক্তারকে আমার বিবাহের পর থেকেই জানি। তাকে সৎলোক বলেই জানি। প্র—আশুবাবু মানহানি মোকদ্দমায় বলেছেন যে, শনিবার সকাল ৮টা হইতে কুমারের বাহ্য আরম্ভ হয়। উ—বলেছিলেন কি না মনে নাই। প্র—তিনি যদি বলে থাকেন, তা'হলে অসৎ অভিপ্রায়ে সে কথা বলেছেন আপনি তাহা বলিতে পারেন না ? উ—তিনি ভুল বলিতে পারেন ! আমার ভুল হতে পারে না এই কথা বলি না। তবে আমার যতদূর মনে হয় এটা আমার ঠিক মনেই আছে। কুমারের যখন দার্জ্জিলিংএ অসুখ হয়, তখন আশুবাবু যথাসাধ্য করেছিলেন ; প্র—আপনি যখন এই মোকদ্দমায় জবাব দাখিল করেছিলেন তাহাতে ডাক্তার ক্যালভার্টের দেওয়া মৃত্যুর সার্টিফিকেট উদ্ধৃত করে দিয়েছিলেন, তাহা জানেন কি ? উ—জানি না। প্রঃ—ডাক্তার ক্যালভার্ট যে মৃত্যু সার্টিফিকেটে কি লিখেছিলেন, তাহা মনে আছে কি ? উঃ—আমাকে পড়ে শুনানো হয়েছিল মোটামুটি শুনেছি তবে উহার ভাবটা মনে নাই। পড়ে শোনান হয় নাই—তবে ডাক্তার ক্যালভার্ট সার্টিফিকেট দিয়েছে, তাহা শুনে ছিলুম। আমি আজ পর্য্যন্ত জানি না যে ক্যালভার্ট সাহেব সেই সার্টিফিকেট লিখেছিলেন যে, শনিবার দিন সকাল বেলা কুমারের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হয় ক্যালভার্ট সাহেবের নিকট হইতে সার্টিফিকেট কে আনিয়াছিল তাহা আমি জানি। আমার ষ্টেটের ম্যানেজারকে দিয়ে আনান হইয়াছিল। —শিশির বাবু বা হরিমোহন চন্দকে দিয়ে আনান হয়েছিল কি না জানি না। প্রঃ—আপনি এটা জানেন কি যে বড় কুমারের যত চিঠি পত্র দলিল ছিল সব কোর্ট অব ওয়ার্ডস বড় রাণীকে পাঠিয়ে দিয়েছিল ? উঃ—শুনেছি। প্র—বাদী যে জয়দেবপুরে আত্মপরিচয় দিয়ে ছিলেন তাহা শুনেছেন ? উঃ—শুনেছি। বাদীর আসার কথা শুনেছি।

প্র—এটা কি সত্য যে, আত্ম পরিচয়ের কিছুদিন পর থেকে রায় সাহেব যোগেন্দ্র বানার্জ্জী আপনার দিকে এবং বাদীর বিরুদ্ধে আছেন? উ—না একথা ঠিক নয়। আমি জানি যে রায় সাহেব যোগেন্দ্রবাবু আমার পক্ষে প্র—আপনি যেমন বাদীকে মেজকুমার বলে স্বীকার কচ্ছেন না। রায় সাহেবও সেই রকম স্বীকার কচ্ছেন না, ওটা ঠিক ত।—হাঁ। প্র—আপনি যেমন বাদীর বিপক্ষে—তা হলে যোগেন্দ্রবাবুও বাদীর বিপক্ষে। উ—তিনি বাদীর বিপক্ষে কি স্বপক্ষে বলিতে পারি না। প্র—আপনার কি কখনও সন্দেহ হয় যে তিনি বাদীর পক্ষে? উ—জানি না। প্র—আপনার ভাই বাদীর পক্ষে? উ—জানি না। আমার ভাই বাদীর বিপক্ষে। প্র—আপনি যেমন, সত্যবাবুর বেলায় স্পষ্ট বলিলেন যে, তিনি বাদীর বিপক্ষে কিন্তু যোগেন্দ্র বাবুর বেলায় তেমন স্পষ্ট কিছুই বলিতে পারেন না? উ—সাক্ষী হিসাবে যোগেন্দ্রবাবু বাদীর বিপক্ষে বই কি? প্র—আপনার মনে কি সন্দেহ হয় যে যোগেন্দ্রবাবু আপনার পক্ষে সাক্ষ্য নাও দিতে পারেন? উ—তাহা তাঁহার বিবেকের উপরে নির্ভর করে। (মিঃ চাটার্জ্জি বলেন—"ও! তা হ'লে সন্দেহ আছে?") প্র—দেখুন, বড় কুমারের সব চিঠি বড়রাণীর নিকটে গেল—ডাঃ ক্যালভার্ট চিঠি কিরূপে ভাওয়ালে রইল—বলতে পারেন? উ—না বলতে পারি না। প্র—আপনাকে আমি বলছি যে আপনার ভ্রাতা সত্যবাবু সেই চিঠিখানা নিজের কাছে রেখেছিলেন। —এই জন্য যে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইলে কাজে লাগতে পারে? উ—না একথা ঠিক নয়। লোকে বড়ভাইকে যেমন ভালবাসে, ভক্তি করে আমিও আমার দাদাকে সেই রকম ভালবাসি ও ভক্তি করি! প্র—কুমারের দার্জ্জিলিং যাওয়ার আগ পর্য্যন্ত তিনি খুব চাকরীর চেষ্টা করেছিলে? উ—তিনি বি, এল পড়িতেছিলেন। এবং ডেপুটির চাকুরীর চেষ্টা করিয়াছিলেন। বড়কুমার দাদাকে বলেছিলেন "আমি চাকুরী করে দিব।" প্র—দার্জ্জিলিং হইতে আমার ১ বৎসরের কিছু বেশী পরে কুমারের ইন্সিওরেন্সে টাকা পাওয়ার পূর্ব্বে সত্যবাবুর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না? উ—ভালও ছিল না—খারাপও ছিল না। তবে দস্তুর মত ছিল। এখানকার চেয়ে তখন অনেক খারাপ অবস্থা ছিল। ১৯নং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ী আমার ভাইয়ের নামে। বাড়ীটা খুব বড়। ল্যান্সডাউন রোডটা ধনী ব্যক্তিদের থাকবার জায়গা। ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীটা কত টাকা খরচে হয়েছে তাহা ঠিক করে বলিতে পারি না—আমার ভাই বলিতে পারেন। প্র—আপনি কি জানেন যে কলিকাতার অনেকে

আপনার ভাইকে "ভাওয়ালের রাজা" বলে ডাকে? (হাস্য) উ—জানি না।

প্র—আপনি ইহা ভাল জানেন যে, এই মোকদ্দমায় যদি বাদীর জিত হয় তবে আপনার ভাইয়ের খুব বিপদ?

উঃ—আমি বুঝতে পারি না—ভাইয়ের কি বিপদ হইবে?

প্রঃ—আপনার কি কোন ধারণা নাই যে, এ মোকদ্দমায় যদি বাদী জিতেন তা হলে আপনার ভাইয়ের আশু বিপদ?

উঃ—যখন হইবে তখন দেখা যাইবে।

মিঃ চাটার্জ্জী বলেন—আমরা সকলেই প্রার্থনা করছি যেন বাদী মোকদ্দমায় জিতেন।"

বিবাদিনী—আমি জানি না যে. এ মোকদ্দমায় বাদী জিতিলে ভাইয়ের কি বিপদ? বাদীর সাক্ষীরা যে জবানবন্দী দিয়াছেন তা জানি।

প্র—এ সমস্ত জানা সত্ত্বেও কি বলিতে চাহেন যদি বাদী মোকদ্দমা জিতেন আপনার ভায়ের কোন আশঙ্কা নাই?

উঃ—না আমার ভাইয়ের কোন আশঙ্কা নাই।

ভাওয়াল মামলার সম্পর্কে মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জী রাণী বিভাবতী দেবীকে যে সকল পত্র শুনাইয়াছিলেন এবং যে গুলি রাণী বিভাবতী তাঁহার জননীর ও ভগিনীর লিখিত বলিয়া সনাক্ত করেন তাহার মধ্যে কয়েকখানি আদালতে দাখিলী পত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১)

Ex 293 (3)

উত্তরপাড়া, ২৯শে পৌষ।

বিভারাণী!

তোমার ২৯ শে পৌষ তারিখের পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। তোমাকে আনা কি আমাদের অসাধ? না অনিচ্ছা? তবে তোমাকে আনিবার হুকুম পাশ করা ত বড় সহজ ব্যাপার নয়। এই যে এতদিন ধরিয়া আমি এত লেখালেখি করেছি কিন্তু কলে তো কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তুমি যদি আসিতে পার তা সে তো আমাদের পক্ষে খুবই আনন্দের বিষয়, কিন্তু তোমারই বা তেমন আগ্রহ কোথায়? তুমি যদি যথার্থই আসিতে ইচ্ছা করিতে তবে বড় কুমারের সহিত অবশ্যই আসিতে পারিতে। * * * * কিন্তু রমেন্দ্রের ব্যবহারে আমি বড় মর্ম্মাহত হইয়াছি

সে যদি বড় কুমারের ন্যায় একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিত তবে আমি যে কত সুখী হইতাম তাহা বলিতে পারি না।

শুনিলাম তোমার ভাসুর ঠাকুরও তাহাকে এখানে আনিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আসিবে না বলিয়াই যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আসা দূরে থাক্ সেতো কখন আমাদের একখানা পত্রও লিখিতে চায় না। ছেলে-মানুষ বলিয়া এতদিন তাহার ব্যবহারে আমি কিছু মনে করি নাই; কিন্তু ক্রমশঃই বড় হইতেছে সুতরাং তাহার এই প্রকার ব্যবহার আমার পক্ষে অতীব মর্ম্মান্তিক হয়। আমি আর কতদিনই বা বাঁচিয়া থাকিব? যে কয়দিন বাঁচিয়া আছি মধ্যে মধ্যে যদি তোমাদিগকে দেখিতে না পাই তবে আমার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। অবশ্য আজ আমি নিতান্ত বিপন্ন বলিয়া তাহার উপযুক্ত আদর যত্ন করা দূরে থাক আপন কর্ত্তব্যই সম্পন্ন করিতে পারি না. তাই সেও আমাদের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না। কিন্তু এখানে কে তাহার আদর করিবে? সে তাহার উপযুক্ত আদর যত্ন করিতে পারিত সে ত বহুদিন চলিয়া গিয়াছে।

বিভারাণী! এই সকল কষ্ট দুঃখ একত্রে আমার স্মৃতিতে আসিয়া আমাকে বড়ই ব্যাকুল করিয়া তুলে। তুমি ছেলে মানুষ তাই বুঝিতে পার না যে, কি ভয়ানক মনোকষ্টই আমি সহ্য করিতেছি।

তোমার তাবিজ যদি পাঠাইতে হয় তবে তোমার হাতের মাপ ও টাকা পাঠাইয়া দিও। সোনার চেনে গাঁথা হইলে বোধ হয় ৬০০৲ টাকারও অধিক লাগিবে। কারণ ২৩।২৪ ভরি সোনার কম চেনে গাঁথা হইবে না। যাহা হউক হাতের মাপ পাইলে কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা সকলেই ভাল আছি, তোমাদের কুশল লিখিয়া সুখী করিবে।

তোমার "মা"

(২)

Ex 293 (4)

উত্তরপাড়া, ৬ই কার্ত্তিক।

বিভু ধন!

গতকল্য তোমার একখানি পত্র পাইয়াছি, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তোমার দাদার একটা টেলিগ্রাম পাইয়াছিলাম তাহাতেই জানিলাম, সে শিলং রওনা হইয়াছে।

তোমাদের নিকট যদি তাহার কোন সংবাদ আসিয়া থাকে তবে আমার নিকট তাহা পাঠাইতে বিলম্ব করিবে না। উহার জন্য আমি অতীব উৎকণ্ঠিত আছি।

অনেকদিন হইতেই জানি যে এই **হতভাগ্য বালককে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, সেজন্য তোমার ভ্রাতা যাহাতে কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারে চিরদিন আমি এরূপ চেষ্টাই** করিয়াছি। কিন্তু কার্য্যতঃ সে কিছুই কষ্ট করিতে পারে না। সুতরাং সে যত নানা স্থানে ছুটাছুটি করিতেছে আমার দুর্ভাবনাও তত বৃদ্ধি পাইতেছে। উহাকে এই সময়ে জয়দেবপুর পাঠাইতে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। ৮।১০ দিনের মধ্যে ফিরিব বলিয়া সে কেবল জোর করিয়া গিয়াছে। এত কষ্ট করিয়া শিলং গিয়াছে বটে, কিন্তু পুলিস বিভাগে কার্য্য করা তাহার পক্ষে পোষাইবে বলিয়া আমার বোধ হয় না, আর ভদ্রলোকের পক্ষে ইহা আমি বড় সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচনা করি না। ভালরূপে লেখাপড়া করিতে পারিলে উহার পক্ষে ভাল ছিল, এবং আমিও চিরদিন উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী; কিন্তু দুঃখের বিষয় ইদানীং সে বড় অলস ও অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছে। অতএব আর যে সে বিদ্যালাভ করিতে পারিবে তাহা বোধ হয় না।

তোমার ভাসুর ঠাকুর উহার চাকরীর জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছেন, সাহেবদিগকে বলিয়া কহিয়া যদি উহাকে ডেপুটী কিম্বা সাব ডেপুটী কার্য্য দেওয়াইতে পারেন তবেই উহার পক্ষে ভাল হয়। তোমার দাদা যদি শিলং হইতে ফিরিয়া আবার জয়দেবপুর যায় তবে তাহাকে শীঘ্রই বাড়ী পাঠাইয়া দিবে।

মলিনা ভাল আছে, কিন্তু তাহার খোকার চক্ষু এখনও ভাল হয় নাই ভাবিত আছি। বৌ ও অপরাপর সকলেই ভাল আছে। তোমার শারীরিক লিখিয়া সুখী করিবে।

—তোমার "মা"

(৩)
Ex 283 (5)

উত্তরপাড়া ১১ই মে

বিভুধন !

সেদিন যে অবস্থায় তোমাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি তাতে আমি বড় দুর্ভাবনায় আছি। তুমি কলিকাতায় আসিয়াছিলে কিন্তু একদিনের জন্যও তোমাকে নিকটে আনিতে পারি নাই কিম্বা একদিনও তোমার সহিত ভাল করিয়া কোন কথা কহিতে পারি নাই। যখনই তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে তখনই তোমাকে অত্যন্ত মলিন ও বিষণ্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছে, সে কারণ মনে করিয়াছিলাম যে তোমার শরীর একটু সারিলেই তোমাকে কিছুদিনের জন্য নিকটে আনিয়া রাখিব কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় তাহার কিছুই হইল না। কোন কথাই আর কহিতে পারিলাম না।

এখন তোমার এই দুর্ব্বল শরীরে যে নানা প্রকার অত্যাচার অভিনয় হইতেছে এবং মনের উপরও যে আঘাত লাগিয়াছে তাহা তুমি কিরূপে সহ্য করিবে ? ভাবিয়াই আমি আকুল হইয়া পড়িয়াছি। তোমার সম্বন্ধে এতদিন আমি একরূপ নিশ্চিন্তই ছিলাম। তোমার জন্য কোন কিছু করান আবশ্যক হইলে আমি তোমার শাশুড়ীকে লিখিয়াই আমার কর্ত্তব্য শেষ করিতাম, জোর করিয়া তাঁহাকে দুইটী কথা বলিতে পারিতাম তিনিও আমার অনুরোধ রাখিতেন কিন্তু এখন আমি তোমার জন্য কাহাকে বলিব কে বা আমার কথা রাখিবে ? তাহাত আমি ভাবিয়া পাই না। রমেন্দ্রের যদি কিছু কর্ত্তব্য বোধ থাকিত সে যদি তোমাকে আপনার ভাবিয়া স্নেহ মমতা করিতে জানিত তাহা হইলে আজ তোমার জন্য আমায় এত চিন্তিত হইতে হইত না। কিন্তু আমার দারুণ দুভাগ্যবশতঃ আজও তাহার বুদ্ধির স্থিরতা হইল না, সে আজও আপনার হিতাহিত কিছু বুঝিতে জানিল না। অধিক কি আপনার শরীরের যত্ন শিখিল না। সুতরাং তোমাদের জন্য আমি যে কতদূর উৎকণ্ঠিত আছি তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব। এখন সেখানে তোমার মুখ চাহিয়া তোমাকে যত্ন করিবার কেহ নাই। এ বিপদে তোমার ননদদিগেরও কিছুমাত্র মাথা ঠিক নাই—অতএব তুমি এখন আপনার শরীরের যত্ন আপনি লইবে নতুবা শীঘ্রই তোমার ব্যারাম বাড়িয়া উঠিবে।

তোমার শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে কাঁদা কাটা করা কিম্বা কোনরূপ

কোনরূপ চিন্তা সহ্য হইবে না অতএব তুমি স্থির হইয়া আপন শরীর রক্ষায় মনোযোগী হইবে এবং রমেন্দ্রের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। তাহারও কিছুমাত্র ভাল নাই, সেদিন তাহাকে দেখিয়া আমি বড় শঙ্কিত হইয়াছি। তুমি তাহাকে খুব সাবধানে থাকিতে বলিবে। তাহার পেটের অসুখ সম্পূর্ণরূপে ভাল হইয়াছে কি না লিখিবে।

এই কয়দিন অবশ্য তোমার খাওয়ার খুব গোলযোগই হইবে, তবে মধ্যে মধ্যে ঠিক সময় মত দুধ যেন খাওয়া হয়। মিষ্ট সামগ্রী লঙ্কা এবং অম্ল ফল তুমি খাইও না। কেবল বেদানা বেশী করিয়া খাইবে। ঔষধগুলি ঠিক নিয়ম মত খাইও—ইহার যেন অন্যথা না হয়। ঔষধ যখন না থাকিবে তখন এখানে লিখিলে তোমার দাদা তাহা পাঠাইয়া দিবে।

সেদিন তোমার ঠাকুরঝিদিগের কাতরতা দেখিয়া তাহাদের জন্য আমি বড় দুঃখিত আছি। তাহারা এখানে কেমন আছে ও অপেক্ষাকৃত স্থির হইয়াছে কিনা লিখিবে। * * * অধিক কি লিখিব তোমাদের জন্য বড় উৎকণ্ঠিত আছি। তোমাদের বিস্তারিত সংবাদ লিখিয়া নিশ্চিন্ত করিবে।—আশীর্বাদিকা ফুলকুমারী দেবী। উত্তরপাড়া।

রাণী বিভাবতী দেবীর জননীর নিম্ন কয়খানি পত্রও আদালতে দাখিল করা হয়। প্রথম পত্রখানি সত্যবাবুর নিকট লিখিত।

(১)

উত্তরপাড়া, ১লা ডিসেম্বর।

বেশ চাকরী করিয়াছ, আর চাকরীতে কাজ নাই বাটী ফিরিয়া এস, কিন্তু আমাকে যাহা তাহা বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিও না আমি সকল সহ্য করিতে পারি কিন্তু আমায় যে বোকা বানায় তাহা সহ্য করিতে পারি না। তোমরা আমাকে যত বোকা, মূর্খ ভাব, সত্যই আমি তত বোকা নই। তোমার ভাব ভঙ্গি বুঝিতে আমার আর বাকী নাই। আজ নূতন কথা শুনিতে পাই—রমেন্দ্রের অসুখ বলিয়া তুমি আসিতে পারিতেছ না। কৈ এতদিন ত এই কথা কেহ আমাকে ঘৃণাক্ষরেই লিখে নাই? আমি জানি যে, জয়দেবপুর যাইলে তোমার কখনই আসিতে ইচ্ছা হয় না কিন্তু লেখাপড়া ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে **জীবিকার উপায় হইবে কি করিয়া?** আমি আর

এখানে থাকিব না। কলিকাতায় বাসার চেষ্টা করিতেছি। তুমি অনর্থক সেখানে বসিয়া থাকিবে না। রমেন্দ্র যে শীঘ্র আসিতে পারে তাহা আমার বোধ হয় না। উহাদের ১৮ মাসে বৎসর (?) কোন কাজই সত্বর করিয়া উঠিতে পারে না। অকারণে টাকার শ্রাদ্ধ করে, কিন্তু সময়ে কোন কাজেরই ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং তুমি বসিয়া বসিয়া কি করিবে? যদি সত্যই আসা হয় তবে তুমি বরং আগে আসিয়া বাসা ঠিক করাইয়া রাখ পরে উহারা আসিবে, নতুবা বাসা ঠিক করিতে করিতে দুই মাস কাটিয়া যাইবে। রমেন্দ্রের শরীর যদি অসুস্থ হইয়া থাকে তবে তাহার আর জয়দেবপুরে থাকা উচিত নয়। তুমিও তাহাকে এইরূপ বুঝাইয়া এবং বড় কুমারকে বলিয়া উহাকে লইয়া শীঘ্র করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। উহাদের অপেক্ষায় থাকিলে চলিবে না। **তোমার জন্য এখানে শ্লেষ বিদ্রূপ সহ্য করিতে করিতে আমি অস্থির হইয়া উঠিয়াছি।**

(Sd) ফুলকুমারী দেবী—

(২)

Ex 293 (2)

উত্তরপাড়া, ১৩১১।২১শে ভাদ্র।

বিভুধন।

বহু দিবস হইতে আমি তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই সে কারণ তুমি যে দুঃখিত আছ তাহা আমি জানি কিন্তু বৎসরাধিক কাল দারুণ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আমার শরীর মন উভয়ই এখন এত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে আমি আর কিছুই করিতে পারি না।............................ ....মলিনা আজ এক বৎসর রোগ ভোগ করিতেছে, এখন একেবারে শয্যাশায়ী কিন্তু তাহার চিকিৎসা বা শুশ্রূষা কিছুই ভাল হইতেছে না। ডাক্তারের চিকিৎসায় তাহার কোন উপকার হয় না। কলিকাতা থাকিয়া ভাল কবিরাজ দেখাইলে কিম্বা বোটে করিয়া গঙ্গা বেড়াইলে নিশ্চয়ই সে ভাল হইতে পারিত, কিন্তু রাজন ও মলিনা যে বাঁচিয়া থাকে ঈশানের তাহা ইচ্ছা নয়। রাজনের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াও তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। সে এখন নানাপ্রকারে তাহার শত্রুতা সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু রাজন বড় নির্ব্বোধ, এখনও তাহার হিতাহিত জ্ঞান কিছুই হয় নাই, সে ভাইএর কু অভিসন্ধি বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। পিতৃহীন

অসহায় বালককে সুবুদ্ধি দিবার সৎপরামর্শ দিবারও কেহ নাই। সুতরাং তাহাদের জন্য আমি বড় কাতর আছি। বতীর বিবাহের এখনও কিছু ঠিক হয় নাই যেখানে ভাল পাত্র দেখিয়া আমরা পছন্দ করি সেইখানেই বতী বরের সহিত মাথায় সমান হইতেছে। সুতরাং ইহার বিবাহ হইতেছে না। কিন্তু ইহার বিবাহের জন্য আমি বড় অস্থির হইয়া পড়িয়াছি কারণ আমি যদি মরিয়া যাই তাহা হইলে এখানে থাকা বতীর পক্ষে কত কষ্টকর হইবে তাহা বোধ হয় তুমিও বুঝিতে পারিতেছ। ইহার অদৃষ্টে বোধ হয় অনেক কষ্ট আছে নতুবা আমরা সকল চেষ্টা ভাসিয়া যাইতেছে কেন? তোমার দাদাকে জয়দেবপুর যাইতে লিখিয়াছ কিন্তু আমার অসুখের জন্য ২।৩ বার জয়দেবপুর যাওয়ায় তাহার কিছুই পড়া হয় নাই। তাহার পরীক্ষার সময় নিকটে আসিয়াছে, সুতরাং তাহাকে এ সময় পাঠাইতে পারিলাম না। অতএব তুমি কিছু মনে করিবে না। আমি যদি মরিয়া যাই তবে তোমার দাদার সহিতই কেবল তোমার সম্বন্ধ থাকিবে। রমেন্দ্রকে দেখিবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। তাহার মুখখানি দেখিলে যে আমি কত শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করি তাহা লিখিয়া কি জানাইব। কিন্তু সে এখন কলিকাতায় আসিবে না? তোমাদের কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। আজ আর লিখিতে পারি না। তোমার "মা"

(৩)

Ex 293 (2)

২৪শে কার্ত্তিক, উত্তরপাড়া।

মা ইন্দু! আমি ক্রমান্বয়ে তোমার ২।৩ খানি পত্র পাইয়াছি, কিন্তু ঐ সময় ভ্রাতা সূর্য্যনারায়ণ অত্যন্ত পীড়িত থাকায় তাহার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, ভরসা করি এজন্য তুমি কিছু মনে করিবে না। শ্রীমতী বিভারাণীর পত্রে তোমার জর হইয়াছে জানিয়া অত্যন্ত চিন্তিত আছি পত্রের উত্তরে তোমার শারীরিক কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। শ্রীমান রমেন্দ্রনারায়ণ বাবাজীবনের শরীর ভাল নাই, বহু দিবস হইতেই সে জর ভোগ করিতেছে, এই সময় তাহাকে কিছুদিনের জন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইলে ভাল হয়; নতুবা জয়দেবপুরে থাকিয়া সে কখনই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে না। শুনিতে পাইতেছি তাহার শরীর দিন দিন দুর্ব্বল ও রক্তহীন হইয়া পড়িতেছে—এ সময় রোগ অগ্রাহ্য করিয়া বসিয়া থাকা কখনই সুবিবেচনার কার্য্য নয়। অতএব

তুমি তোমার ঠাকুর মাতা ঠাকুরাণীকে সম্মত করিয়া তাহাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থানান্তরিত করলে—আমি পরম সন্তোষ লাভ করিব, এ বয়সে যতদূর জ্ঞানলাভ করা উচিত, দুঃখের বিষয় রমেন্দ্রের সেরূপ জ্ঞান কিছু জন্মিল না। এখনও সে আপনার হিতাহিত চিন্তা করিতে শিখিল না, এই যে এত দীর্ঘ দিন ধরিয়া জ্বরে কষ্ট পাইতেছে তাহারও কোন প্রতিকার করিতে চায় না। কোন বিষয়েই ত আমি তাহার বিবেকবুদ্ধি, আত্মনির্ভরতা কিছুই দেখিতে পাই না। আজিও সে বালকের ন্যায় হাসিয়া খেলিয়া শিকার লইয়া থাকে মাত্র। পিতামাতা বর্ত্তমানে এরূপ বালকের উচিত কার্য্য করিলে একদিন শোভা পাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের অবর্ত্তমানে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া এরূপ ভাবে দিন কাটাইলে ভবিষ্যৎ জীবনের সার আত্ম-উন্নতি ও আত্মা নষ্ট হয়। এই সকল কারণে উহার জন্য আমি সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত আছি।

জ্যোতির্ম্ময়ী মাতা, মটর, ও অপরাপর সকলে কেমন আছে? তাহাদিগকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইবে। এখানকার সমস্তই মঙ্গল—তোমাদিগের কুশল লিখিয়া সুখী করিবে।

আশীর্ব্বাদিকা—

ফুলকুমারী দেবী।

মিঃ পার্শি ব্রাউন

গত ১৩ই মার্চ্চ বুধবার রাণী বিভাবতীর জেরা স্থগিত থাকে এবং বিবাদিনী পক্ষের অন্যতম সাক্ষী মিঃ পার্শি ব্রাউনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। মিঃ পার্শি ব্রাউনের বয়স ৬৮; তিনি কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল হলের তদানীন্তন সেক্রেটারী এবং কিউরেটর।

মিঃ এ, এন, চৌধুরীর প্রশ্নে সাক্ষী বলেন:—আমি লণ্ডনের সাউথ রয়েল আর্ট কলেজে চিত্র-শিল্পীদের শিক্ষা দিয়াছি। আমি উক্ত আর্ট কলেজের এসোসিয়েট। আমি বিলাতে কতকগুলি প্রতিষ্ঠানেই চিত্রকলা শিক্ষা দিয়াছি। অতঃপর দুই বৎসর কাল আমি লণ্ডনের রয়েল আর্ট কলেজের চিত্র অধ্যাপক ছিলাম। আমি ভারতে ১০ বৎসর লাহোর গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলাম এবং কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ১৮ বৎসর প্রিন্সিপাল

ছিলাম। আমি কেন্সিংটন (লণ্ডন) ও বোম্বে প্রদর্শনীতে চিত্র-শিল্প প্রদর্শন করিয়াছি। ভারতীয় শিল্প-কলা সম্বন্ধে কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছি—যেমন 'ইণ্ডিয়েন পেণ্টীং আণ্ডার দি মোগল।' এই বইখানা খুব দামী।

আর একখানা বই অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের নাম "ইণ্ডিয়েন পেণ্টিং" ইহা অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটী প্রেসে মুদ্রিত ও বর্ত্তমানে ইহার পঞ্চম সংস্করণ চলিতেছে। আমি বহু চিত্র-প্রদর্শনীতে 'ঝজ' ছিলাম—যথা সিমলা, কলিকাতা একাডেমির চিত্র-প্রদর্শনী। গত সেপ্টেম্বর মাসে সিমলার প্রদর্শনীতে আমি একজন 'জজ' ছিলাম।

আমি ভাস্কর বিদ্যা শিখিয়াছি। আমি রাইট অনারেবল বি, সি, মিত্রের প্রতিমূর্ত্তি করিয়াছি।

আমি জাতীয় রৌপ্য পদক পাইয়াছি, এবং বিভিন্ন বিষয়ে বহু পদক প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি কলিকাতা ফাইন আর্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান। আমি আর্কিটেকচার বিদ্যালয়ের অনারারী ডিরেক্টর ছিলাম। আমি গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগের চাকুরীতে ২৮ বৎসর কাল ছিলাম। আমি ১৮৮৬ সন হইতে বহু বৎসর ফটোগ্রাফার অনুশীলন করিয়াছি।

আমি মিঃ জে, পি, গাঙ্গুলীকে ভালরূপ চিনি। তিনি ভাস্করবিদ নহেন। আমি ফটো হইতে প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ার করিয়াছি। ফটোগ্রাফার অনুশীলন ভাস্কর-কার্য্যে খুব সাহায্য করিয়া থাকে।

কতকগুলি ফটো দেখান হইলে সাক্ষী বলেন—আমি এই ফটোগুলি পরীক্ষা করিয়াছি এবং তুলনা করিয়া দেখিয়া এই ফটোগুলি একই ব্যক্তির নহে। ৪৮ এবং ৪৯ এই দুই ফটো দুইজন ভিন্ন ভিন্ন লোকের। আমি তাহাদের পার্থক্য চিত্রে প্রদর্শন করিয়াছি।

পুনরায় রাণী বিভাবতীর জেরা

বৃহস্পতিবার বেলা ১০ হইতে পুনরায় নলগোলা রাজবাড়ীতে রাণী বিভাবতী দেবীর জেরা চলিতে থাকে।

প্র—আপনি যখন ঢাকায় ছিলেন তখন নীডহাম সাহেবকে এই একখানা চিঠি লেখা হয়েছিল মনে আছে?

উ—আমার মনে নাই। সাহেবের নাম কখনও শুনিয়াছি কিনা মনে নাই।

প্র—আপনি যে কোর্ট অব ওয়ার্ড হইতে আপনার ষ্টেট আনিবার দরখাস্ত নেড্‌হাম সাহেবের একখানা চিঠি গাঁথিয়া দিয়াছিলেন ?

উঃ—আমার মনে নাই।

জেরার উত্তরে বলেন—দরখাস্ত দেওয়া হয়েছিল, তাহা মনে আছে। খুটী-নাটী কথা আমি বলিতে পারিব না। আমার ভাই বলিতে পারিবেন কিনা তাহা কি করিয়া বলিব ?

প্র—১৯০৯ সনের ডিসেম্বর মাসে নলগোলায় বাসার বাড়ীতে ছিলেন ?

উ—হাঁ। তখন আমার ভাই কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া-ছিলেন কিনা মনে নাই। আমার স্মৃতিশক্তি কেমন ঠিক বলিতে পারি না।

প্র—আপনি তখন চিঠিতে লিখেন যে দুই কুমারও আপনার বিপথগামী স্বামীর মত ভুলপথের চলিতেছেন ?

উ—এই কথা লিখিবার কোন কারণ দেখি না। লিখিয়াছি কিনা আমার মনে নাই।

প্র—আপনার মেয়ার সাহেবের কথা মনে পড়ে ?

উ—হাঁ।

প্র—আপনার ভাই বোন যখন কলিকাতায় গেলেন তখন রাজপরিবারের ও অফিসারদের ভিতরে কোনও কথা হয় ?

উ—জানি না।

প্র—১৯১১ অব্দে আপনার সঙ্গে ছোট কুমারের কিরূপ ভাব ছিল ? সৎ ভাব, না অসদ্ভাব ?

উ—অসদ্ভাব কিছু ছিল না।

প্র—১৩১৭।১৮ সনে ছোট কুমারের সঙ্গে কি সৎ ভাব ছিল, না অসদ্ভাব ছিল ?

উঃ—কোনও অসদ্ভাব ছিল না।

আপনি কি এই কথা জানেন ১৩১৭ সনে চৈত্রমাসে ছোট কুমার ষ্টেট্ কোর্ট অব ওয়ার্ডসে ষ্টেট দিতে চাহেন ?

উঃ—হাঁ আমার মনে আছে। আমার কলিকাতায় যাওয়ার কয়েকদিন পর শুনিয়াছিলাম।

-আপনার মনে আছে, এই ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডে যাওয়ার আগে এই

রকম কথা হয় যে সত্যবাবু আপনাকে দিয়া একটা জীবনস্বত্ব লিখাইয়া লইবেন ?

উ—শুনি নাই, জানিও না।

প্র—কোর্ট অব ওয়ার্ডস ষ্টেট যে লইলেন তাহার প্রধান কারণ হইতেছে ইহাই যে, তাঁহারা ভয় করিয়াছিলেন যে, সত্যবাবু আপনার অংশ হাত করিয়া লইবে ?

উ—আমি জানি না।

প্র—আপনি যখন কোর্ট অব ওয়ার্ডস হইতে আপনার অংশ পাইবার দরখাস্ত করেন তখন ছোট কুমার আপত্তি করিয়াছিলেন আপনার মনে আছে ?

উঃ—জানি না।

প্রঃ—আপনি জানেন সত্যবাবু আপনার পরিবারে একটা বিসম্বাদ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে ?

উঃ—না।

প্রঃ—ছোট কুমার একথা প্রমাণ করিতে রাজি ছিলেন যে, সত্যবাবু দ্বারা ষ্টেটের ক্ষতি হইয়াছে ও হইবে, একথা আপনি জানেন ?

প্র—আপনি ন্যাথেন সাহেবের চিঠিতে লিখেন যে, দিগেন বাবু ও অশ্বিনী বাবুর চাকুরী থাকা উচিত নহে ?

উ—মনে নাই।

প্র—ছোট কুমার এই কথাও কি বলেছিলেন যে, সত্যবাবু পারিবারিক ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা করেন ?

উ—আমি জানি না।

প্র—যদি আপনার ভাইয়ের ডায়েরী হইতে দেখা যায় যে, রাজপরিবারে বিসম্বাদে তাহারও একটু উৎসাহ আছে, তাহা হইলেও কি আপনি বলিবেন মিথ্যা ?

উঃ—আমি কখনও তাহার উৎসাহ দেখিনি।

প্রঃ—তাহার সে রকম উৎসাহ থাকিলে আপনার অজানিত ছিল ?

উঃ—আমি এরূপ ভাব কখনও দেখি নাই।

প্র—আপনি কি এই রকম বলিতেছেন যে, কলেক্টর কমিশনার, ম্যানেজার ছোটকুমার সবাই আপনার ভাইয়েয় বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন ?

উ—আমি শুনি নাই। আমি নিজেও কোন কথা বলতে চাই।"

প্র—আপনি ঢাকার সিভিল সার্জ্জন ডাঃ হলের নাম শুনিয়াছেন ?

উ—আমি তাহার নাম শুনিতে পারি। আমার এটাও মনে পড়ে না যে আমার মাতার চিকিৎসা করিতে ডাঃ হল ও লেডী ডাক্তার মিস শশীমুখী নাগ আসিয়াছিল। আমি আজ পর্য্যন্ত তাহাদের কথা শুনিনি।

প্র—আপনার নিকট কত টাকা আছে বলিতে পাবেন ?

উ—তাহা আমি বলতে চাই না।

প্র—সে টাকা এখন কোথায় কিভাবে আছে বলিতে পারেন ?

উঃ—আমার নিজের হাতে আছে। নিজের নামে কি ভাবে আছে, তাহা নাই বা বলিলাম। আমার কত টাকা আছে আমি বল্‌তে চাই না তবে যদি কোর্ট বলেন আমি বলিতে পারি।

কোর্টের প্রশ্নে বলেন আমার কোম্পানার কাগজ ও ব্যাঙ্ক একাউণ্ট আছে। আমার ভাইয়ের কত টাকা আছে আমি জানি না।

প্র—আপনি একথা জানেন আপনার ভাই এ মোকদ্দমা আরম্ভ হবার পর হইতে তাহার বাড়ী বিক্রয় করিতে চাহে ?

উ—একথা আমি কখনও শুনি নাই। ইহাও জানি না যে, বাদীপক্ষ হইতে নোটীশ হয় যেন সত্যবাবুর সম্পত্তি কেহ না কেনে।

প্র—ইহা ঠিক কিনা যে আপনার স্বার্থের জন্য আপনি পদস্থ লোকজনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করিতে একটুও কুন্ঠিত হন নাই।

এই সময় মিঃ চ্যাটার্জ্জী কাগজে একজন ভদ্রলোকের নাম লিখিয়া প্রশ্ন করেন এই ভদ্রলোকের নামে অভিযোগ করিয়াছিলেন ?

উ—সুরেন্দ্র মতিলাল যখন জীবিত ছিলেন তখন ইহার সম্বন্ধে একটা দরখাস্ত করি ; কিন্তু কারণ ছিল। আমি জানিতাম যে, তিনি একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ষ্টেটের উকিল।

প্র—সুরেন্দ্র মতিলাল যদি আপনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে আপনার অজ্ঞাতে এসে কিছু বলিতেন আপনি বিশ্বাস করিতেন ?

উ—আমি ভাইকে জানি। আমি কি করিয়া বিশ্বাস করিব ? তবে সুরেন্দ্র মতিলালের পরামর্শ লইয়া কাজ করিতাম কারণ বড়রাণীর ও আমার এক স্বার্থ।

প্র—আপনি জানেন আপনাকে আমার কথার জবাব দিতে হইবে ?

উ—তাহা জানি। স্বরেন্দ্র মতিলাল আসিয়া যদি বলিত যে, আমার ভাই ষ্টেটের অনিষ্ট করিতেছে, আমি নিশ্চয়ই তাহা হইলে অনুসন্ধান করিতাম।

প্র—দার্জ্জিলিংএ যখন নার্স এসেছিল, তখন কি আপনার স্বামীর দেহ ঠাণ্ডা হয়েছিল? উ—হাঁ, পা ও হাত ঠাণ্ডা হয়েছিল দেখেছি। প্র—আর কোন অংশ ঠাণ্ডা হয়েছিল? উ—তাহা ডাক্তার বলতে পারে। আমি গায়ে পায়ে হাতে হাত দিয়ে দেখেছি। তখন শরীর অসম্ভব কিছু ঠাণ্ডা হয় নি। জ্বরের মতও গরম ছিল না। প্র—নার্স কি এসেই গুড়া মাখাতে আরম্ভ করেন? উ—তাহা মনে নাই। যখন তারা এল, তখন আমি ঘরে ছিলাম। তারা এসে কিছুক্ষণ পর গুঁড়াটা মাখাতে থাকে। প্র—ঠিক কতক্ষণ পর? উ—১০।১৫ মিনিট হবে, ঠিক বলিতে পারি না। ২০ মিনিটের মধ্যে হয়েছিল স্নুরু প্রথম ঘরে আমি এবং চাকর বাকর ২।১ জন ছিল। নার্সের সঙ্গে পাশের ঘর থেকে সাহেব ডাক্তার আসে ক্যালভার্ট সাহেব ও আশুবাবু আসেন ইহা মনে আছে, নিবারণবাবুর কথা মনে নাই। প্র—২।২৷৷টার সময় ডাক্তার নার্সের সঙ্গে এসে দেখেছেন, তারপরেও মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করেছেন। গুঁড়াটা কে দিতে বলেছিল? উ—ডাক্তার সাহেব? প্র—গুঁড়া ইঞ্জেকশনের আগে মালিশ করা হয়েছিল? উ—ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয় আগেই গুড়া মালিশ করা হইয়াছে। প্র—আপনি বলেছেন যে ইঞ্জেকশন বিকেল ৪টা থেকে ৬টার মধ্যে হয়েছে, তাহা হইলে গুড়া মালিশ করা কয়টা পর্য্যন্ত হয়? উঃ—তখনও সন্ধ্যা হয়নি, দিনের আলো ছিল। প্র—ইঞ্জেকশন নেবার কতক্ষণ পর? উ—আগে কি পরে ঠিক বলতে পারি না। যখন গুঁড়া মালিশ করা হয়, তখন বিছানায় বসেছিলাম। বিছানা থেকে একবারও উঠিনি, সাদা গুঁড়াটা মাখার পর মৃত্যু পর্যান্ত আমি ঘর ছাড়ি নাই। একবার যখন আমার মামা আসেন, তখন ঘর ছেড়েছিলাম। প্র—তাহা হইলে ইঞ্জেকশনের পরে গুঁড়াটা আধ ঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টা সময় মাখান হয়।

প্র—গুঁড়াটা মাখার সময় তার সমস্ত দেহ ঠাণ্ডা হয়েছিল? উ—হাঁ, নচেৎ গুঁড়া মাখাতে বলবে কেন? প্রঃ—গুঁড়া মাখাতে কোনও ফল হয়েছিল?—উঃ—তাহা আমি বলিতে পারিব না। আমি তার পরও শরীর ঠাণ্ডা দেখিলাম। প্রঃ—আপনার মামা সন্ধ্যাবেলা যে ডাক্তার এনেছিল, তিনি রোগা না মোটা ছিলেন? উঃ—তাহা আমি বলিতে পারি না। তিনি কোট প্যাণ্ট পরে এসে-

ছিলেন। প্রঃ—তার নাম কি ডাঃ বি, সি, সরকার? উঃ—হতে পারে, ঠিক মনে নাই। প্রঃ—আজ পর্য্যন্ত আপনার কখনও ফিট্ হয়েছে? উ—কখনো না। প্র—কখনো জীবনে অজ্ঞান হয়েছেন? উ—মনে হয় আমি কখনো অজ্ঞান হইনি। জ্বরটর হলে যদি কখনো হ'য়ে থাকি, তাহা মনে নাই। প্রঃ—আশুবাবুর মানহানির মামলায় বলেছেন কুমারের অসুখ হবার পর তাকে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে নেওয়া হয়েছিল? উ—ইহা ঠিক। প্রঃ—কুমারের দেহ রবিবার আপনার মতে সকালে কখন নামান হয়? উ—৭টা থেকে ৭৷৷টার মধ্যে। প্রঃ—তাহার পূর্ব্বে কুমারের দেহ কোথায় ছিল? উ—যে ঘরে এবং বিছানায় তিনি মরেছিলেন। মৃত্যুর পর কুমারের দেহ না নামানো পর্য্যন্ত সারারাত আমি জাগিয়াছিলাম। মৃত্যু-রাত্রি প্রভাত হইবার পর এবং দেহ নামাইবার পূর্ব্বে মামা সূর্য্যনারায়ণ বাবু এবং অনেক বাইরের লোক সেই ঘরে এসেছিলেন। প্রঃ—নীচে নামাইবার পূর্ব্বে কি দেহ সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা ছিল? উ—মাঝে মাঝে কেহ ঢেকে দিয়েছেন। আমি দেখিবার জন্য খুলিয়াছি। প্রঃ—মৃত্যুর পর কুমারের দেহ নীচে নামাইবার পূর্ব্বে কেহ কি তাহার নাড়ী দেখতে চেয়েছিল? উ—মনে নাই।

প্রঃ—ক্যালভার্ট সাহেব যখন ডিনার খেতে চলে গেলেন, তখন কি নিবারণ বাবু ছিলেন? উ—ক্যালভার্ট সাহেব যাইবার পর নিবারণ বাবুকে দেখেছি, মনে আছে। প্রঃ—আশুবাবু কোথায় ছিলেন? ঐ বাড়ীতেই ছিলেন তবে সব সময় ঘরের ভিতর ছিলেন না। প্র—ক্যালভার্ট সাহেব কয়টার সময় ডিনার খেতে গেলেন? ৮-৮৷৷টার সময়। প্রঃ—ইহার আগে কি পরে হতে পারে কি না ঠিক বলতে পারেন? উঃ—সন্ধ্যার পরও তাহাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে। কারণ তখন তিনি রোগী দেখতে এসেছেন। সেখানে ৬৷৷-৭টায় সন্ধ্যা হয়। সন্ধ্যার পর ১-১৷৷ ঘণ্টার মধ্যে তিনি ডিনার খেতে চলে যান। প্রঃ—আপনার মনে আছে কি যে সত্যবাবু সন্ধ্যার দিকে একবার বাইরে গিয়াছিলেন? উ—বলতে পারি না। সেদিন সত্যবাবু বাইরে কি বাড়ীতেই ছিলেন, আমি মনে ক'রে বলতে পারি না। প্রঃ—যখন আপনার মামা ডাক্তার নিয়ে আসেন, তখন কি ডাঃ ক্যালভার্ট ঐ বাড়ীতে ছিলেন? উ—আমার তাই মনে হয়; তবে রোগীর ঘরে ছিলেন না, বাগানের দিকে বসিবার ঘরে ছিলেন।

প্র—আপনি কি একখানা ফটো দাখিল করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহা মেজকুমার তোলেন?—হাঁ। প্র—আমি বলি এটা আসল ফটো না। অন্য নিগেটিভ

থেকে তোলা ? উ—এটাই আসল ফটো। প্র—আমি বলি একটা গ্রুপ ফটো থেকে পৃথক করে নিয়ে এটা তোলা হয়। উ—না এটা একটা ভিন্ন ফটো। গ্রুপ ফটোও একটা ছিল, সেখানে আমি ও ইন্দুময়ী দেবী ছিলাম। কুমারই সেটা তুলেন। সে ফটো এনলার্জ্জ করা আছে। প্র—কর্ম্মচারী যামিনী বাবুকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীরা যামিনী কাকা বলে ডাকতেন, তাঁর কথা মনে আছে ? উ—যামিনী বাবুর নাম শুনেছি, তবে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীরা তাঁকে যামিনী কাকা বলতেন কিনা জানি না। প্র—এ মামলায় যামিনী চক্রবর্ত্তী সাক্ষ্য দিয়েছেন শুনেছেন ? উ—বলিতে পারি না। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সাক্ষ্যে ঐ নাম পড়েছি কিনা মনে নাই। অশ্বিনী দে নামে ফটোগ্রাফার জয়দেবপুরে থেকে নিয়ে যাই। সে আসল ফটোগ্রাফার ছিল। এনলার্জ্জ করা ফটোটা আমি জয়দেবপুরে থেকে নিয়ে যাই। আসল ফটোটা নাই। প্র—আপনি এনলার্জ্জ করা ফটোর কথা বলেছেন, (একটী এনলার্জ্জ করা ফটো দিয়া) এটা কি তাই নহে ? উ—হাঁ এটাও সেই ভাবের নকল। (ফটোখানা কোর্টে দাখিল করা হইল।) প্র—এটা দেখে বলুন, ইন্দুময়ী দেবী কি এইরূপ আপনার ডান পাশেই ছিলেন ? উ—যতদূর মনে হয় এইরূপই ছিলেন। প্র—এই ভাবেই যদি বসা হয়ে থাকে তবে হয় চেয়ারটা ঘুরিয়ে আনা হয়েছিল অথবা আপনিই অন্য দিকে গিয়ে ছিলেন। হাঁ। প্র—আপনি এটা নিশ্চয়ই শুনেছেন, আপনার মামী সরোজিনী দেবী এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছেন ? উ—হাঁ, তিনি বিবাহের পর, আমি জয়দেবপুর কতদিন ছিলাম সে সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুধু ভুল নয়—মিথ্যা। প্র—বিয়ের আগে বিবাহের জন্য একটা শুভদিন ধার্য্য হয়েছিল ইহা ঠিক না কি ?—হাঁ। প্র—শুভদিন ধার্য্যের ব্যাপারটা মনে পড়ে কি ? উ—কে ধার্য্য করেছিল মনে নহে, তবে বিয়ের আগে শুভদিন ধার্য্য হয়ই। সেই ব্যাপারটা আমার মনে নাই। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বিবাহের দিন ধার্য্য হয় তবে ইহা আমি হলপ করে বলতে পারি না।

প্রঃ—বিবাহের তারিখটা আপনার ঠিক মনে না থাকা অস্বাভাবিক নয় কি ? উ—স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক বলিতে পারি না। বিবাহের সময় আমার ১৩ বৎসর বয়স ছিল। প্র—বিবাহের দিন ধার্য্যের সময় কি কি কথাবার্ত্তা হয় তাহা মনে আছে ? উ—না। বিবাহের আগের দিন জয়দেবপুরে এসে পৌছাই। প্রঃ—কখন আপনি উত্তরপাড়া থেকে রওনা হলেন ? উ—সন্ধ্যা হয় হয় সময়ে। প্র—ভাল সময় দেখে রওনা হয়েছিলাম। প্র—যদি একথা

বলা হয় যে, আপনার বিয়ে ৮ই জ্যৈষ্ঠ হয়েছিল, তবে কি আপনি হলপ করে তাহা অস্বীকার করতে পারেন? উ—আমি হলপ করে বলিতে পারি না, তবে আমার মনে হয় ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বিয়ে হয়। প্র—আপনার মনে হয় কি যে আপনার শ্বশুর বাড়ীতে আপনার বিয়ের দিন ঠিক করে আপনার বাড়ী খবর দেওয়া হয়? উ—হাঁ লোক গিয়েছিল। দ্বারিকা মাষ্টার অন্যান্য লোক আশীর্ব্বাদ দিতে গিয়েছিল। বিবাহের দিন ধার্য্য করে পত্র দেওয়া হয় কি লোক গিয়েছিল অথবা দ্বারিকা মাষ্টারই দিন ধার্য্যের খবর লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা মনে নাই। মিঃ চাটার্জ্জি—আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না। উ—আমি প্রশ্ন বুঝিতেছি না। মিঃ চাটার্জ্জি—আপনি ইচ্ছা ক'রে আমার প্রশ্ন বুঝচ্ছেন না। (এই কথায় রায় বাহাদুর আপত্তি করেন)। প্র—বিবাহের পর জয়দেবপুর হতে কোন মাসে ফিরে আসেন? উ—জ্যৈষ্ঠ মাসে। প্র—জ্যৈষ্ঠ মাসের কোন অংশে হবে? উ—যদি ৮ই তারিখ বিয়ে হয়ে থাকে, তবে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি ১৭ই তারিখ বিয়ে হলে শেষভাগে ফিরে গিয়াছিলাম।

প্র—আপনি কি বলতে চান, বিবাহের দিন ঠিক মনে না থাকলেও তাঁহা যে এক সপ্তাহ পরে গিয়াছিলেন, তাহা আপনি হলপ ক'রে বলতে পারেন? উ—হাঁ। প্র—রাণী জয়মণি দেবী আপনার বিয়ের সময় জীবিত ছিলেন কি? উ—হাঁ। প্র—একখানা (তাং ৫ই মে ১৯০২) টেলিগ্রামে দেখা যাচ্ছে, জয়দেবপুর থেকে রাণী জয়মণি দেবী উত্তর পাড়ার প্রতাপনারায়ণের নিকট টেলিগ্রাম কচ্ছেন যে ৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার বিবাহের দিন ধার্য্য হইল, তবে তাহা কি আপনি অস্বীকার করেন? উ—এরূপ টেলিগ্রাম আসা অসম্ভব নয়), (টেলিগ্রাম কোর্টে দাখিল করা হইল)। প্র—রাণীদের মধ্যে জয়মণি দেবীই জ্যেষ্ঠ ছিলেন? উ—হাঁ। প্র—তাহার পক্ষে এমন খবর পাঠান তবে অসঙ্গত অথবা অস্বাভাবিক নয়? (একখানা চিঠি দেখাইয়া) প্রথম পাতার লেখাটী কি আপনার চেনা? উ—না। প্র—নীচে "শ্রীবিলাসমণি দেবী' লেখা নয় কি? উ—হতে পারে। এখানে বিবাহের দিনের কথা উল্লেখ আছে এবং ৪ঠা রাত্রে দিন ভাল ঐ সময় পাত্রী লইয়া রওনা হইবে' ইহা লিখা আছে। প্র—চিঠি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আছে? উ—ইহা লেখা হইতে পারে। তবে আমি জানি না। প্র—ইহা প্রকৃত কিনা সে বিষয়ে আপনার কোনও সন্দেহ আছে? উ—তাহা বলিতে পারি না। ইন্দুময়ী দেবীর লেখা

আমি বেশ জানি। ইন্দুময়ী দেবীর লেখা বলে ইহা মনে হচ্ছে। (চিঠি দাখিল করা হইল) আমি বলেছি যে, বিবাহের মাসখানেক পর বাপের বাড়ী ফিরে এসেছি। বোধ হয় আষাঢ় মাসে হইবে। মনে হয় উত্তর পাড়ায় দিন ২০ ছিলাম, সেখানে ঐ সময় আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছিল। প্র—তখন আপনাকে কবিরাজ দেখান হয়? উ—মনে নাই। ডাক্তার দেখেছিল মনে আছে। প্র—কবিরাজের চিকিৎসা করান হয় বলে আপনার শাশুড়ী ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাইবার জন্য টেলিগ্রাফ করেন? উ—মনে নাই। একখানা টেলিগ্রাফ (বিশেষ চিন্তিত, কবিরাজ ছেড়ে দিন, বিভাকে যে কোনও ডাক্তার দিয়া দেখাইবেন) দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করা হয়,—এরূপ টেলিগ্রাম রাণী বিলাস মণি দেবী ৺প্রতাপ নারায়ণ মুখার্জ্জির কাছে করেছিলেন,— এ কথা কি আপনি অস্বীকার করেন? উ—এরূপ টেলিগ্রাম করা অসম্ভব মনে করি না। আমার অসুখে শাশুড়ীর চিন্তা স্বাভাবিক। প্র—তিনি চিন্তিত হলে এরূপ টেলিগ্রাম যাওয়া স্বাভাবিক নয় কি? উ—হাঁ। প্র—তবে এরূপ টেলিগ্রামও স্বাভাবিক? উ—হলেও হতে পারে (টেলিগ্রামখানি দাখিল করা হইল)। প্র—না খুলে এই এনভেলপটা দেখুন ত? উ—(দেখিয়া) কিছুই বুঝিতেছি না। প্র—হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্টের কথা শুনিয়াছেন কি? উ—এই মামলার ব্যাপারে অনেকের কথাই শুনেছি। কথাটার মানে হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ। প্র—আপনাকে হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ বলে অভিহিত করা যায়? উ—না। রায় বাহাদুর অথবা চৌধুরী সাহেব যে কতকগুলি পত্র আমাকে দেখান এবং যাহার কতকগুলি তাঁহার নয় বলেছিলাম, তাহা মনে আছে। প্র—সাক্ষ্য দেবার পূর্ব্বে এসব চিঠির কোন ফটোগ্রাফ আপনাকে দেখান হয়েছিল? উ—না। প্র—ছোট কুমারের লেখা যাহা আপনি সনাক্ত করেছেন এবং যাহা করেন নাই, তার মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখেছিলেন? উ—এ দুটা আমার এক বলে মনে হয় নাই। এই চিঠিগুলি নিয়ে কোন বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া হয়েছে কিনা তাহা জানি না। ফটো বিশেষজ্ঞ মিঃ পি, ঘোষ উল্লিখিত ফটোগুলি পরীক্ষা করেন।

প্র—আমার কি এই বুঝে নিতে হবে যে ছোট কুমারের দুই সেট লেখার মধ্যে কোনই সাদৃশ্য নাই? উ—আমি তো কিছুই পাই না। প্র—আপনার কথা এই যে এক সেট যদি ছোট কুমারের লেখা হয়, তবে অন্য সেট তার লেখা হতে পারে না? উ—যেটা আমি ছোট কুমারের না বলেছি সেটা

কুমারের লেখার চেয়ে পাকা লেখা। উ—আমার ত মনে হয়, সেই সেট তাঁর হাতের লেখা হতে পারে না। প্র—আপনি কি কাজ পর্য্যন্ত অবগত আছেন, প্রফেসার রাধাকুমুদ মুখার্জ্জি, প্রফেসার হীরালাল রায়, প্রফেসার স্থরেন্দ্র মৈত্র এবং অন্যান্য ভদ্রলোকেরা এই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তাহাদের কাছে একদিন রাত্রে দার্জ্জিলিংএ ডিনার খাওয়ার আগে খবর এসেছিল যে মেজকুমার মারা গেছেন, এ খবর রাখেন কি? উ—হঁ। আমি কাগজে পড়েছি। প্র—আপনি কি কোর্টকে এই কথা বল্‌তে চান যে তাঁর, যে ডিনার খাওয়ার আগে মেজকুমারের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন তা মিথ্যা কথা? উ—আমি বলছি না যে তাঁরা মিথ্যা কথা বলেছেন। তারা ভুল করছেন। প্র—আমি কি আপনাকে বল্‌তে পারি যে আপনার স্বামী বিষয়ে ১৯০৮ সনে মে মাসে স্মৃতি যে রকম তাজা ছিল এখনও সেই রকম তাজা আছে? উ—হঁা, আমার তো তাই ধারণা। খুঁটিনাটি সব মনে নাও থাক্‌তে পারে। 'আপনি কি বল্‌তে পারেন ১৯০৮ সনের ৮ই মে শনিবার নিবারণ বাবুর প্রথম কখন এলেন? উ—সকাল বেলা, ৮।৯ টায়। ডাক্তার সাহেবের একটু আগেও আসতে পারেন, একটু পরেও আসতে পারেন, আমি ঠিক বল্‌তে পারবনা, তবে দুজনের একত্র দেখা হয়েছিল। প্র—আপান কি মনে করে বলতে পারেন কে আগে এসেছিল?—না। প্র—আপনি কি বলতে চান ডাক্তার সাহেব ও নিবারণ বাবুকে একসঙ্গে দেখেছেন? উ—হঁা, একসঙ্গে দেখেছিলেম। প্র—আপনি কি এই বল্‌তে চান দুজনের দেখা হওয়ার আগে একজন নীচে ছিলেন? উ—আমার মনেহয় আমি দুজনকেই একত্র দেখেছি উপরে স্বামীর ঘরে। প্র—আপনি কি ঠিক করে এই কথা বলতে পারেন? উ—এতদিনের কথা ঠিক নিশ্চিত করে বলা কঠিন তবে যতদূর মনে হয় একসঙ্গে দেখেছি। প্র—তাঁরা দুইজনই কি একসঙ্গে ঘর থেকে গিয়াছেন? উ—হঁা তারা ৫।৭।১০ মিনিট ঘরে ছিলেন। প্র—আপনি কি শপথ করে বলতে চান আধঘণ্টা সেখানে ছিলেন না? উ—তারা আধ ঘণ্টা ছিলেন না? প্র—তাঁরা যখন ছিলেন তখন কুমার বসা ছিলেন না শোওয়া ছিলেন? উ—খাট থেকে যদি নামিয়ে মেজের পাতা ছিল। প্র—ডাক্তাররা যখন এলেন তখন আপনি ছাড়া ঐখানে আর কেউ ছিল? উ—তাঁরা এলে আশুবাবু বা অন্য কেউ খবর দিল যে ডাক্তার সাহেব আসচেন, এ কথা শুনে আমি পাশে দাঁড়ালুম। আশুবাবু, দাদা, মুকুন্দ গুণ ও চাকর বাকব

ছিল। প্র—চাকর বাকবদের নাম বল্‌তে পারেন ? উ—না। কোর্ট প্রশ্ন করেন—যখন খবর পেলেন ডাক্তার এল তখন কি আপনি একা ছিলেন ? উ—হাঁ। আমি একা ও চাকর বাকর। প্র—ডাক্তার আসার পর আপনি যেখানে দাঁড়ালেন, সেখান থেকে কি দেখতে পচ্ছিলেন ডাক্তার রা কি করছিল ? উ—হাঁ, দেখতে পাচ্ছিলাম। প্র—প্রথমে কি করলেন ? উ—পরীক্ষা করলেন ও জিজ্ঞাসা পত্র করলেন। তবে নিবারণ বাবু কি করছিলেন বল্‌তে পারব না। সকলেই কথা বলছিল। প্র—আপনার কি মনে পড়ে সেই দিন সকাল বেলা ডাক্তার কালভার্ট কোন প্রেসক্রিপসন করেছিলেন ? উ—সেই ঘরে কিছুই করেন নি, বাইরের ঘরে গিয়ে যদি করে থাকেন। প্র—আপনি বলেছেন ৫।৭।১০ মিনিট থাকার পর রোগীর ঘর থেকে চলে গেলেন, তারপর তাঁরা বাড়ী কতক্ষণ ছিলেন, মনে আছে ? উ—তা আমি বল্‌তে পারব না। প্র—তাঁরা নীচে না কোথায় গেলেন বলতে পারেন ? উ—সাম্‌নে যে বসবার ঘর ছিল সেখানে গেলেন। সেদিকে গেলেন, কোথায় গেলেন বলতে পারব না। প্র—৮ই মে'র আগে ৬।৭ই তারিখে কুমারের পেট ফেঁপেছিল কি পেটের অসুখ হয়েছিল তা জানেন কি ? উ—তা জানিনা। তবে কোষ্ঠ কাঠিন্য ছিল জানি। প্র—যদি কেউ বলে যে ৭ই তারিখ শুক্রবারে পেটের অসুখ হয়েছিল, একথা কি সত্যি হবে ? উ—জানি না। প্র—যদি বৃহস্পতিবার দিনের কথা কেউ বলে পেটের অসুখ হয়েছিল, একথা সত্য হবে ? আমার মনে হয় সত্যকথা হবে না। প্র—যদি বৃহস্পতি বা শুক্রবার পেটের অসুখ হত আপনি কি জানিতেন না ? উ—আমার জানা সম্ভব ছিল। প্র—৮ তারিখে ১০টার ভিতর যদি কেহ বলে তাঁর পেটের অসুখ ছিল সেটা সত্য হবে না মিথ্যা হবে ? উ—একথা সত্য হবে না। প্র—আপনি কি বলতে চান যদি ৬।৭ তারিখ কুমারের পেটের অসুখ হত আপনি জানতে পারতেন না ? উ—হতেই পারেনা। প্র—শনিবার ১০টার আগে তাঁর পেটের অসুখ হয়েছিল, হয়ত আপনি জানতেন না একি সত্য হবে ? উ—না। প্র—কেউ যদি বলে শনিবার ৮টা থেকে তাঁর রক্তবাহ্য হচ্ছিল, একথা সত্য হবে না মিথ্যা হবে ? উ—ইহা ভুল। প্র—শনিবার ৮টা থেকে রক্তবাহ্য হওয়া আপনার জানা সম্ভব কি অসম্ভব ? উ—অসম্ভব। প্র—আশু ডাক্তার দার্জ্জিলিংএ প্রথম থেকে কুমারকে যত্ন করেছিলেন, না উপেক্ষা করেছিলেন ? উ—যত্নই করেছিলেন, উপেক্ষা করেন নি। প্র—যদি আশু ডাক্তার মানহানি মামলায় ১২ বৎসর আগে শপথ করে বলে থাকেন

যে শনিবারের দুইদিন আগে থেকে তাঁর পেটের অসুখ হয়েছিল তবে কি তিনি মিথ্যা বলেছেন? উ—মিথ্যা বলবেন কেন? তাঁর ভুল হয়েছে। প্র—১২ বৎসর আগে আশুডাক্তারের এবিষয়ে যে স্মৃতিশক্তি ছিল তার থেকে আজ আপনার স্মৃতিশক্তি বেশী বলতে চান? উ—আমার সব কথা বেশ মনে আছে। প্র—একথা আপনি বলতে চান যে এই অলৌকিক স্মৃতিশক্তি দাবী না কর্লে আপনার মামলা টেঁকে না? উ—একথা মোটেই ঠিক না। প্র—ডাক্তার কালভার্ট ও নিবারণবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর আশুডাক্তার ঘরেই রইলেন? উ—আমার ঠিক মনে নাই। প্র—আপনি তখন কি করলেন? উ—তারপর আমি কুমারের ঘরে গেলাম, তখন আশুডাক্তার ঘরে ছিলেন না—শুধু চাকর-বাকর ছিল। প্র—আশুবাবু যখন ঘরে থাকতেন তখন আপনি সেখানে থাকতেন কি? উ—কুমারের অসুখের সময় আশু ডাক্তার থাকতেও ঘরে ছিলাম। প্র—আপনি কি বলতে পারেন মেজ কুমারের ময়লাটা শনিবার দিন কখনও দেখেন নি? উ—হাঁ আমি দেখেছি। প্র—প্রথম ময়লা কখন দেখলেন? উ—বেলা ১২॥টায়। আপনি কি বলতে পারেন যে নিবারণ বাবুকে পুনরায় সেদিন কখন দেখলেন? উ—যখন রক্তবাহ্য আরম্ভ হইল, তখন কালভার্ট সাহেবকে ডাকতে গেলেন মুকুন্দ বাবু, কিন্তু তাঁকে না পেয়ে নিবারণ বাবুকে নিয়ে এলেন। প্র—একথা সত্য যে এগুলি আপনার স্পষ্ট মনে আছে বলে বল্‌ছেন? উঃ—হাঁ। প্র—নিবারণ বাবু কি উপরে এসেছিলেন? উ—হাঁ, আমি তখন পাশের ঘরে ছিলাম।

প্র—আপনি কি বলতে পারেন নিবারণ বাবু সেখানে তখন কতক্ষণ ছিলেন? উ—সবশুদ্ধ মিনিট ১৫ ছিলেন। সেই ঘর থেকে বেরিয়ে বসবার ঘরে গিয়ে বসলেন। প্র—নিবারণ বাবু যখন বেরিয়ে গেলেন, আপনি তখন আবার কুমারের ঘরে এলেন?—হাঁ। প্র—আপনি কি বলতে পারেন কুমার প্রথম কোন ঘরে ছিলেন? উ—যে ঘরে আমরা শুতাম সেই ঘরে কুমার প্রথম ছিলেন। প্র—এই ঘরটা পরের ঘরের কোন্‌দিকে আপনি বলতে পারেন? উ—ঠিক করে বলতে পারব না। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বরাবর তৃতীয় ঘরে কুমার আগে ছিলেন। প্র—কেউ যদি একথা বলে যে ডাক্তাররা যখন দেখতেন তখন কুমার নীচে যেতেন একথা কি সত্য হবে? উ—মাঝে মাঝে নীচেও যেতে পারেন। প্র—আপনার মামা সূর্য্যনারায়ণ বাবু

১৯০৯ মে হইতে ১৯২০ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীর জীবন

এই সময় মধ্যে কুমারের নাম শোনা যায় নাই বা কোথায় আছেন তাহাও জানা যায় নাই। কুমার জীবিত আছেন এই গুজব থাকা সত্ত্বেও কেহ তাহাকে জীবিত বলিয়া মনে করে নাই। আমি উপরে এই সময়ের যে বর্ণনা দিয়াছি তাহাতে দেখা যায় যে কুমারের মৃত্যু সর্ব্বজন স্বীকৃত ঘটনা। বাদী নিজের এই সময়ের যে বর্ণনা দেয় তাহা কেবল তাহার নিজের ও দর্শনদাসের কথার উপরই নির্ভর করে। ইহাতে অন্য ভাবে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি করে না। তাহার এই বর্ণনার জন্যই সে মেজ কুমার বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা নহে—সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা এইরূপ।

পাহাড়ের মধ্যে—জঙ্গলের ভিতর এক কুটীরের মধ্যে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে, এবং নিজেকে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখেন—এই চারিজন সন্ন্যাসীর নাম তিনি বলিয়াছেন। 'আমি এই স্থানে ১৫।১৬ দিন ছিলাম। এই সময় সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আমার কোনও কথা হয় নাই। তারপর কি হইয়াছিল তাহা আমার মনে নাই। আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গেই চলিলাম। আমরা হাঁটিয়া ও রেলে করিয়া গিয়াছিলাম। তারপরে যাহা আমার মনে পড়ে তাহা এই যে—আমি বারাণসীতে অসিঘাটে ছিলাম। সন্ন্যাসী চারিজন তখনও আমার সঙ্গে ছিলেন। অসিঘাটে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে বাস করিতাম। এখানে আমাদেব পশ্চিমা ও বাঙ্গালী সাধুদের সঙ্গে দেখা হয়। দুই জন বাঙ্গালী সাধুর সঙ্গে দেখা হয়। আমি তাহাদেয় সঙ্গে কথা বলিয়াছিলাম, বাঙ্গালাতেই কথা বলিয়াছি। পশ্চিমা সাধুর সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলিয়াছি। আমি ঐ সাধু চারি জনের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলিতাম—তাঁহারা আমার সঙ্গে হিন্দিতে বলিতেন। সেই সময় আমি কে, সে স্মরণ শক্তি আমার ছিল না।

তাঁহার ভ্রাম্যমান জীবনের বাকী অংশ—এক তীর্থ হইতে অন্য তীর্থে ঘুরিয়াই কাটাইয়াছেন। ঘুরিতে ঘুরিতে কাশ্মীরে অমরনাথে পৌছেন। ইহা অসিঘাটের চারি বৎসর পরে। এখানে তিনি মন্ত্র লইয়া গুরু ধরমদাস নাগার শিষ্য হন। যে চারিজন সন্ন্যাসীর সহিত তিনি ঘুরিতে ছিলেন ধরমদাস তাহাদের একজন। শ্রীনগর বাজারের এক উল্কী ওয়ালাকে দিয়া তাঁহার গুরুর নাম বাহুতে লিখাইয়া

লন। শ্রীনগর হইতে বহু স্থান ঘুরিয়া নেপালে আসেন। নেপালে পশুপতি নাথ হইতে তির্ব্বতে যান এবং পুনরায় নেপালে ফিরিয়া আসেন,—এখানে এক বৎসর বাস করেন। কিন্তু নেপাল ত্যাগের পূর্ব্বে ব্রাহ্মোচ্ছত্তরে একটা কিছু ঘটনা হয়—এখানে তিনি সেই চারিজন সন্ন্যাসীর সহিত বাস করিতে ছিলেন। "এখানেই মনে হয় যে আমার বাড়ী ঢাকায়।"

এখানে তাঁহাকে এর পূর্ব্বের মানসিক অবস্থার কথা বর্ণনা করিতে বলা হইল। তিনি যাহা বলিলেন তাহা এই যে—অসিঘাট পর্য্যন্ত তিনি অজ্ঞান ছিলেন। "এমন কি অমরনাথেও আমি মনে করিতে পারি নাই যে, আমি কে, আমার বাড়ী কোথায় এবং আমার আত্মীয় স্বজনই বা কোথায়"? মন্ত্র লওয়ার পরে তাঁহার গুরুর সঙ্গে এবিষয়ে কথা হইয়াছিল এবং তিনি (গুরু) বলিয়াছিলেন যে তাঁহাকে ভিজা অবস্থায় দার্জ্জিলিংএর শ্মশানে পাওয়া গিয়াছিল। যখন তিনি নিজে চিন্তা করিতেন তিনি কে, তাঁহার আত্মীয়েরা কোথায়, তখন তাঁহার মন আকুলিত হইয়া উঠিত এবং তিনি গুরুকে একথা বলিতেন,—তখন গুরু বলিতেন ঠিক সময় আসিলে আমি তোমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব। তিনি বুঝিয়া ছিলেন যদি তিনি সংসার ও বাড়ীর মায়া ত্যাগ করিয়া গুরুর কাছে ফিরিয়া যান তাহা হইলে তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়া হইবে। তারপর ব্রাহ্মোচ্ছত্তরে যখন তাঁহার এইটুকু স্মৃতি ফিরিয়া আসিল যে, তাঁহার বাড়ী ঢাকায় তখন তাঁহাকে বাড়ী যাইতে বলা হইল, এবং তিনি একাকী রওনা হইলেন। তারপর বহু স্থান ঘুরিয়া ঢাকায় পৌছেন। "যখন ঢাকা ষ্টেশনে নামিলাম তখন আমার মনে হইল যে এস্থানে আমি বহুবার যাতায়াত করিয়াছি এবং জিজ্ঞাসা না করিয়াই বাকুলাও বাঁধের রাস্তা ধরিলাম।"

তারপর যে সকল ঘটনা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—তাহা আরম্ভ হইল। জয়দেবপুরে তাঁহার প্রথম আগমনের সময়—যখন তিনি ঘুরিতে ছিলেন—"তখন আমার কাছে সমস্তই পরিচিত বোধ হইল"।

এর পূর্ব্বে বাকুলাও বাঁধে যে সমস্ত লোক তাঁহার কাছে আসিয়া বলিত, 'এই ভাওয়ালের মেজোকুমার' তাহাদের কোন কোন লোককে তিনি চিনিতে পারিতেন। জয়দেবপুরে প্রথমবার যাওয়ার সময়ই তাহার পূর্ণস্মৃতিশক্তি ফিরিয়া আসে।

এই সমস্তই অদ্ভুত মনে হয়—কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এই সম্বন্ধে যে সকল দৃষ্টান্ত পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণা করিয়া তাঁহাদের প্রামাণ্যগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,

সেগুলিও এই ঘটনা অপেক্ষা কম অদ্ভুত নয়। যুদ্ধের পর এই রকম রোগীর চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল। এইগুলিকে ওয়ার নিউরোসিস নামে অভিহিত করা হয়। বসন্ত বা চুলকানি প্রভৃতি রোগে যেমন কোনও রহস্য নাই ইহাতে তেমনি কোনও রহস্য নাই। উভয় পক্ষ হইতেই এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ চিকিৎসক আনা হইয়াছে। বাদীর পক্ষে রাঁচীর ইউরোপীয় পাগলা গারদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লেঃ কঃ হিল, আই এম, এস, এম, ডি, এম, এ, জবানবন্দী দিয়াছেন যে তিনি ত্রিশ বছর ধরিয়া মানসিক বিকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেছেন। বিবাদিপক্ষে মেজর ধুনজি ভাই আই, এম, এস, এম-বি, বি, এস, (বোম্বাই) এবং মেজর টমাস আই. এম, এস, জবানবন্দি দিয়াছেন। শেষোক্ত জনের কথা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি ইংলণ্ডে শেল 'শকের' অনেক রোগী চিকিৎসা করিয়াছেন। মেজর ধুঞ্জি ভাই যে সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে একখানা Dr. Taylor's Reading in Abnormal Psychology and Mental Hygiene (১৯২৭ সংস্করণ)। এই বইএর কথা উভয় পক্ষই বলিয়াছেন এবং ইহাতে বিপুল পর্য্যবেক্ষকের দেখা অনেকগুলি দৃষ্টান্তের কথা আছে। এই বই হইতে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি একত্র করা দরকার দেখিনা। কারণ যে সকল বিশেষজ্ঞকে এখানে জেরা করা হইয়াছে—তাহাদের মতানৈক্য দেখা যায় না। যেখানে তাঁহারা একমত নন সেইগুলিই আমি দেখাইব। এই স্মৃতিভ্রংশদোষ বা এ্যমনেসিয়ার কোন বাহ্যিক বা শারীরিক হানি না করিয়াও ঘটিতে পারে। •এই গোলমালটাকে মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে,—ইহা অসংখ্য প্রকারের। ইহার গবেষণা পর্য্যবেক্ষণে ছাড়াইয়া বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। ইহার কতকগুলি ব্যাবহারিক শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। ইহার এমন কোন মূল সূত্র নাই যাহাদ্বারা পূর্ব্বে হইতেই বলা যাইতে পারে যে কোন একটি অস্বাভাবিক মানসিক বিকৃতি—কিরূপে আরম্ভ হইবে, বৃদ্ধি পাইবে ও শেষ হইবে।

তবে কতকগুলি বিভাগ মোটামুটি ভাবে দেখা যায়। এইগুলি (১) Regression or পশ্চাদ্বর্ত্তন (২) Double or multiple personality অর্থাৎ একই লোকের বিভিন্ন সময়ে দুই বা ততোধিক লোক বলিয়া ভ্রান্তি। প্রথমোক্তটির সুপরিচিত দৃষ্টান্ত রেভারেণ্ড 'হানা'র (Hanna) ঘটনা। একদিন সকালে উঠিয়া তিনি মনে করিলেন যে তিনি সদ্যপ্রসূত শিশু। স্নান·

কাল পাত্রের সমস্ত ধারণাই তাহার চলিয়া গেল। ইহাকে Baby state বা শৈশবাবস্থা—প্রাপ্তি বলা যাইতে পারে। এই ঘটনাটি Sidis and Goodheart's Multiple Personality তে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। পুনরায় সদ্যপ্রসূত শিশু অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন, সম্পূর্ণ স্মৃতি ভ্রংশের একটি দৃষ্টান্ত। এইরূপ ঘটনা খুবই বিরল এবং বোধ হয় এই একটি দৃষ্টান্তই এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় রকমটিকে দ্বৈতীভাব বা double personality বলা যাইতে পারে। ইহাও এক রকমের পশ্চাদ্বর্ত্তনই বটে। ইহাতে মানুষ সাধারণতঃ স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরা করে—কিন্তু সে যে কে তাহা ভুলিয়া যায়। ইহার পরিচিত দৃষ্টান্ত রেভারেণ্ড এনসেল বোর্ণ (Rev. Ansel Bourne) এবং শেলশকের কতকগুলি রোগী। ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত আছে যেখানে আমরা দেখিতে পাই এই লোক এক সময় মনে করে যে সে একজন, আবার অন্য সময় মনে করে সে আর একজন। কিন্তু এই যে কল্পিত দুইজন ইহাদের কেহই কাহাকে চিনেনা। জেমসের Principle of psychologyতে ফেলিডা লিওলিনের ঘটনা ডাঃ প্রেথের গ্রন্থে মিস্ রোকাম্পএর ঘটনা এই রকম ব্যাপার। এই সমস্ত কথা ছাড়িয়া দিলেও মেজর টমাসের অভিমত এই যে বাদীর ব্যাপারটা তাঁহার নিজের বর্ণনা অনুসারে double personalityর ব্যাপার—অর্থাৎ তিনি অন্য অন্য ব্যাপারে স্বাভাবিকই ছিলেন, কিন্তু কিছুদিনের জন্য তিনি কে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। Rev. Ansel Bourne একদিন হঠাৎ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, এবং দুই মাস পর Pensylvania সহরে Brown নামে এক দোকান খুলিয়া বসিলেন। (Morton Princeএর Dissociation of Personality র ১৮৬ পৃঃ) ঐ গ্রন্থেরই ২৩৪ ও ২৩৫ পৃষ্ঠায় মিঃ চার্লসের ঘটনা উল্লিখিত আছে। তিনি একটি ট্রেণ সংঘর্ষের ১৭ বৎসর পরে (যখন তিনি বিবাহিত ও ৪টি সন্তানের পিতা) কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না যে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর নয়। (২৪ বৎসর বয়সে এই রেলওয়ে একসিডেণ্ট হইয়াছিল) Tennetএর বইয়ে আছে Roy যথার্থ কে তাহা ভুলিয়া গেল এবং নানা রকম কাজকর্ম্ম করিয়া ৪ মাস পর তাহার জ্ঞান হইল। বাদীর বিবরণ এই যে তিনি তাঁহার প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃত হইয়া ১২ বৎসর সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বাস করিলেন;

তারপর একদিন তাঁহার মনে হইল তাঁহার বাড়ী ঢাকা এবং ঢাকা আসিয়া তিনি ধীরে ধীর তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন।

মেজর টমাস মনে করেন বাদীর বিবৃতিতে এমন কতগুলি জিনিষ আছে যাহা অসম্ভব। প্রথম বৎসর দার্জ্জিলিং হইতে অসীঘাট যাওয়ার সময় তিনি যে অবস্থায় ছিলেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—"জ্ঞান ছিলনা—বা এই রকম কিছু" —উহা পশ্চাদ্বর্ত্তন—উহা dissociation এবং adoptation এর সহিত একসঙ্গে চলিতে পারে না, তাহা হইলেই বলা যায় Rev. Hannaর ন্যায় তিনি শিশু হইয়া গিয়াছিলেন— Ansel Bourne এর মত তিনি দোকান করিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়তঃ তিনি আশা করিতে পারেন না যে আদিম বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার স্মৃতি আরও ভালরূপে ফিরিতে পারে। তৃতীয়তঃ এইরূপ মানসিক ভাবের একত্য (dissociation) সাধারণ রকমের নয়। প্রায়ই ইহা হিষ্টিরিয়ার ন্যায় স্নায়বিক রোগীদের হইয়া থাকে। মেজর ধুঞ্জি ভাই কার্য্যতঃ এই মতই দেন। লেঃ কঃ হিলের মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে বেশী অভিজ্ঞতা আছে তিনি বলেন বাদীর বর্ণনায় কিছুই অসম্ভব নয়।

বাদী শৈশব অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন, এই অভিমত সম্বন্ধে বলা যায়—যদি তাহাই হইত—তাহা হইলে তিনি প্রকৃতিস্থ না হইয়া অপ্রকৃতস্থ হইতেন, ইহাই টঠোলজির মত। তিনি যে শৈশবাবস্থায় ফিরিয়া ছিলেন, বাদী একথা বলেন না। সেটা যে কি অবস্থা তাহা তিনি বলিয়াছেন- তিনি ইহাকে অজ্ঞান অবস্থা বলিয়াছেন। এবং জিনিষ পত্র চিনিতে পারিতেন—পাহাড় গাছ, সন্ন্যাসী ঘাট এইরূপ জটিল পদার্থ গুলিও চিনিয়াছেন—কেবল দার্জ্জিলিং হইতে অসিঘাট পর্যান্ত বিষয়ের অভিজ্ঞতার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বা অন্য কেউ যে তাহার মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিতে পারেন এ আশা আমি করি না। তাঁহার বিবরণ হুবহু ও কঠোরভাবে মানিয়া লওয়া অস্বাভাবিক, তবে তিনি যে ভাবে বিবরণ দিয়াছেন ঠিক সেই ভাবে দেখিলে— ইহা যে শৈশবাবস্থাতে ফিরিয়া আসা বলা যায় না। ইহা পশ্চাদ্বর্ত্তনের শেষতম দৃষ্টান্ত। ইহাতে যে ক্রমবিভাগ নাই এ বিষয়ে আমি মেজর ধুঞ্জি ভাইয়ের সহিত একমত নহি। মেজর টমাস বলেন "স্মৃতিভ্রংশের সময়ে পারিপার্শ্বিক ঘটনা হইতে উদাসীনতা অনেক রকমের হইতে পারে। অর্থাৎ এরূপ লোক দেখা যায়, মানসিক সুস্থতা যে ন্যূনাধিক বিশৃঙ্খল চিত্ত হইয়াও সম্পূর্ণ উদাসীন নহে, আবার এই রকম

লোকও আছে যে অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াও মানসিক জীবনে বড়ই বিশৃঙ্খল। এই দুই অবস্থার মধ্যে অনেক রকম মানসিক অবস্থা দেখা যায়। এমন কোন নিয়ম নাই যে এক জনই এ সকল অবস্থার মধ্যে দিয়া যাইতে পারে না। টেলারের বইয়ের৩০৮ পৃষ্ঠায় সৈন্যদের পশ্চাদ্বর্ত্তনে"র চারিটি দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম দৃষ্টান্তটিতে একটি ১৫ মাস বয়স্ক শিশুর অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছিল কিন্তু সে সিগারেট ধরাইতে পারিত, এই সমস্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে "পশ্চাদ্বর্ত্তনের" ও কমবেশী আছে। হানার (Hanna) মত দৃষ্টান্ত অতি অল্প। এ বিষয়ে আমি একটা অনুচ্ছেদ তুলিয়া দিতেছি।

"বিগত যুদ্ধে সৈন্যদের মধ্যে সম্পূর্ণ" স্মৃতিভ্রংশ দোষ" সাধারণ ব্যাপার ছিল। আমার চিকিৎসাধীনে এরূপ অনেক রোগী পাইয়াছি। সাধারণ রকমটিকে এই বলিয়া বুঝান যাইতে পারে যে, রোগী তাহার পূর্ব জীবনে অভিজ্ঞতার অনেক কাজই ভুলিয়া যাইত, চেষ্টা করাইয়াও কাজ করান যাইত না, এই অবস্থায় একটি সৈনিক তাহার নাম, রেজিমেণ্টের নম্বর, সে বিবাহিত কিনা— কোথায় বাস করিত, কি কাজ করিত অথবা পূর্ব্বজীবনের কোন ঘটনা বলিতে পারিত না। অথচ পারিপার্শ্বিক বিষয় সমূহে তাহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল— সাধারণ লোকের ন্যায় সাধারণ জিনিষ ব্যবহার করিত—এবং সাধারণ লোকের ন্যায় লিখিত ও কথা ও ভাষা বুঝিতে পারিত। কতকগুলি বিষয়ে তাহার স্মৃতি ভ্রংশতা ছাড়িয়া দিলে সে এমনি সাধারণ লোকের ন্যায় ব্যবহার করিত যে কোন অপরিচিত লোক তাহার আচার ব্যবহার দেখিয়া তাহাতে কোন কিছু অদ্ভুত আবিষ্কার করিতে পারিত না।' আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এসকল দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন মূলসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। দর্শনদাস যে বৈশিষ্ট বা বোকা বোকা ভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছে তাহা পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারের মত সামান্য উদাসীনতার ফল যে নহে তাহা আমি খুজিয়া পাইনা। এই সকল ব্যাপারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত গুলি সংখ্যায় খুব কম। বেশীর ভাগ দৃষ্টান্তই মাঝামাঝি রকমের। দৃষ্টান্ত গুলি নানা প্রকৃতির। একটি নিয়মের দ্বারা ইহাদিগকে ভাগ করা যায় না। স্মৃতিভ্রংশের কাল কয়েক দিনও হইতে পারে, আবার কয়েক বৎসরও হইতে পারে। চার্লসের ব্যাপারে তাহা ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে, এবং যখন মানুষ পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে তখন তাহার পূর্ব্ব অস্বাভাবিক অবস্থার কথা কিছুই মনে থাকে না—এই অভিমতটি সর্ব্বথা স্বীকার্য্য নহে। রেভারেণ্ড হেনা (Rev Hanna) তাহার

স্মৃতিভ্রংশের কাল সম্বন্ধে আত্মজীবনী লিখিয়াছেন। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থার এ ব্যবধান চিন্তা দ্বারা অতিক্রম করা যায়। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে এমন কোন নিয়ম বা সূত্র নাই যাহা দ্বারা বাদীর বিবৃত ঘটনাকে অস্বিকার করা যায়। (মধ্যাকর্ষণ আছে বলিয়া বাদীর শূন্যে উড়িয়া যাওয়া যেমন অসম্ভব এই নিয়ম এমন নহে): সচরাচর দেখা গেলেও স্নায়বিক রোগ যে থাকিবেই এমন কোন কথা নাই, এবং কুমারের সম্বন্ধে—এ সম্বন্ধে কেহই কোনও প্রশ্ন তুলেন নাই। মিঃ চৌধুরী সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন তুলিয়া ছিলেন যে বাদীর ব্যাপারে এই সমস্ত অস্বভাবিক ঘটনা ঘটিয়া ছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার কি কারণ থাকিতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, দার্জ্জিলিং হইতে এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য বাদীর যথার্থ পরিচয় করা নয়,—কিন্তু অন্যান্য ঘটনার সাহায্যে বাদীর পরিচয় যে ভাবে সাব্যস্ত হইয়াছে ইহা তাহার বিরোধী কি না?

ইহা যদি একবার প্রমাণিত হয় তাহা হইলে দার্জ্জিলিং হইতে ঢাকায় আগমন পর্য্যন্ত এমন কিছুই ঘটে নাই যাহাতে এই সিদ্ধান্ত অন্যথা হইতে পারে এবং একবার পরিচয় প্রমাণিত হইলে প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী বলিয়া তাহা অস্বীকার করিবার কোনও কারণ নাই। বস্তুতঃ ইহা কোন নিয়মেরই বিরোধী নহে।

বাদী কি হিন্দুস্থানী?

আমার ইহা মনে হয় না দেখিতে মেজকুমারের মত, তাঁহারই শরীরের চিহ্নগুলি লইয়াও ঢাকা আসিবার পূর্ব্বে মধ্যমকুমার কি রকম করিয়া নাম সেই করিতেন তাহা অভ্যাস করিতে থাকে। এ সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে সেইগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার।

বলা হইতেছে যে বাদী একজন পাঞ্জাবী। বিবাদী পক্ষ ইহার অধিক কিছু প্রমাণ করিতে বাধ্য নহেন। বাদীর যথার্থ পরিচয় কি তাহা প্রমাণ করিতে তাঁহারা বাধ্য নহেন, তবুও এই মকোদ্দমায় বাদী যে পাঞ্জাব লাহোর জেলার—আজলা গ্রামের মালসিং তাঁহার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু এই ব্যাপারের উপর তেমন জোর দিয়া কিছু বলা হয় নাই এবং বাদী আজলা গ্রামের মালাসিং কিনা; অথবা ধর্ম্মদাস নাগা তাহাকে সন্ন্যাসী করার পর তাহার নাম সুন্দরদাস হয় কিনা ইহা বাদীকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। এ সম্বন্ধে প্রমাণ বুঝিতে হইলে ১৯২১ সালের কি ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে

আলোচনা করা দরকার। বাদী ৪ঠা মে তাঁহার পরিচয় প্রকাশ করিলেন। ঐ মাসেরই ৬ই হইতে ৯ই তারিখের মধ্যে সত্যবাবু মিঃ লেথব্রিজের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। সেখানে মৃত্যুর এফিডেভিড্ তাহাকে দিয়া মৃত্যু সম্বন্ধীয় প্রমাণ তাঁহাকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। মৃত্যুর এফিডেভিটের একখানা নকল ঢাকার কালেক্টার মিঃ লিণ্ডসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং মিঃ লিজের পরামর্শ অনুসারে ইংলিশ-ম্যান পত্রিকায় একখানা চিঠি লিখিলেন, ৯ই মে উহা ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং খুব বিলম্ব হইলেও ৮ই মে তিনি উহা পত্রিকায় পাঠাইয়াছিলেন। তারপর ১৫ই মের পূর্ব্বেই তিনি দার্জ্জিলিং গিয়া ১৯০৯ সালের ৯ই তারিখে যে শবদাহ হইয়াছিল তাহার সাক্ষী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ২৯শে মে বাদী মিঃ লিণ্ডসের নিকট উপস্থিত হইয়া তদন্তের প্রার্থনা জানান্। ৩১শে তারিখে সাব্ ইনস্পেক্টার মমতাজউদ্দিন এবং সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে ষ্টেটের একজন আম্‌লা বাদীর পরিচয় বাহির করিবার জন্য পাঞ্জাবে চলিয়া গেলেন। মিঃ লিণ্ডসে ইহা জানিতেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি এই তদন্তের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

১৯২১ সালের ২৭শে জুন সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী পাঞ্জাব হইতে ভাওয়ালের অ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যানেজারের নিকট এক রিপোর্ট পাঠান। (একজিবিট ৩৪৭) ঐ রিপোর্টে তিনি বলেন।

তাঁহারা (সুরেন্দ্র ও মনোমোহন বাবু)—সাব ইন্‌স্পেক্টার মমতাজউদ্দিন মনোমোহনবাবু নাম লইয়াছিলেন) এই তদন্তের জন্য কলিকাতায় আসেন এবং সেখান হইতে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া হরিদ্বারে পৌছেন। হরিদ্বারে সুরেন্দ্রবাবু শুনিতে পান যে কনখলে হীরানন্দ নামে একটী সাধু আছে। "আমি তাঁহাকে ফটো দেখাই। ফটো দেখাইবামাত্রই তাঁহার চেলা বলিয়া উঠে যে ইহা ধরমদাসের একজন চেলা সন্তদাসের ফটো।" ঐদিন মমতাজউদ্দিন এবং তিনি অমৃতসর চলিয়া যান এবং অমৃতসর সংগওয়ালা আখড়ায় এ ফটো হীরানন্দ ও তাহার চেলা সন্তরামকে দেখান ইহা দেখিয়া সন্তরাম বলে যে ইহা ধরমদাসের শিষ্য সুন্দরদাস বাবাজীর ফটো।

তারপর তাঁহারা অমৃতসর হইতে ২০ মাইল দূরে "ছোট সংসার" গেলেন এবং সেখানে ধরমদাসের সহিত দেখা হইল। তাঁহারা পূর্ব্বেই জানিয়া ছিলেন যে ধরমদাস সেখানে আছেন।

জয়দেবপুরের সাধুর ছবি দেখিবামাত্রই ধরমদাস চিনিলেন এবং ধরমদাসের

আর একজন চেলা দেবদাস, তিনিও চিনিলেন। তাঁহারা উভয়েই বলিলেন যে ইহার নাম সুন্দরদাস।" প্রায় ১৫ বৎসর আগে লাহোর আজলা গ্রামের নারায়ণ সিং সুন্দরদাসকে ধরমদাসের নিকট লইয়া আসে। তখন তাহার বয়স ১৫। সে ধরমদাসের শিষ্য হয়। সুন্দরদাসের পিতামাতা কেহই জীবিত নাই। নারায়ণ সিং "মণ্টগোমারী জেলায় ৪৭নং চকে বাস করে। "২৭-৬-২১ তারিখে, ধরমদাস, দেবদাস, বিসণ দাস, চিরণদাস, সন্তদাস—৭।৮ জন লোককে ম্যাজিষ্ট্রেটের সাম্‌নে উপস্থিত করিয়া সুন্দরদাসের ছবি সনাক্ত করিতে বলা হয়। জয়দেবপুরের সাধু যে একজন পাঞ্জাবী এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

রিপোর্টে বলা হয় যে "সংসারে" আসিয়া ধরমদাস সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতে পারিলাম তাহা এই—তাহার অনেক চেলা আছে—তাহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া টাকা রোজগার করে ও পাঠাইয়া দেয়; ধরমদাস নিজেও নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার বয়স প্রায় ৫৫, গায়ের রং কালো—মাথায় জটা আছে ও দাড়ি আছে। ধরমদাস আমাকে বলে যে প্রয়াগের কুম্ভমেলা হইতে ৩।৪ বৎসর আগে সুন্দরদাস কলিকাতার দিকে রওনা হয়। তাহার বয়স প্রায় ৩০ তাহার কটা গোঁফ ও কটা দাড়ি আছে। সুন্দরদাশ তাহার সঙ্গেই থাকিত।

রিপোর্টে একটি পুনশ্চ দিয়া বলা হইয়াছে "সুন্দরদাসের আসল নাম ও তাহার পিতা মাতার নাম জানা যায় নাই, কেবল তাহার বাপের নাম জানিতে পারা গিয়াছে। ফনিমোহন বসু ল্যাঠিপরা সাধুর যে ফটো দিয়াছিলেন তাহা যদি জয়দেবপুরের সাধুর ফটো হয় তবে এ নিশ্চয়ই সুন্দরদাস।"

এইত রিপোর্ট—তদন্তের ফল, মেজরাণী ৪।৭।২১ তারিখে ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম করিয়া জানান। টেলিগ্রাফটি এইরূপ—"যাহা আশা করা গিয়াছিল সেই ভাবেই পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।"

২।৭।২১ তারিখে ম্যানেজার মি, লেগুসের নিকট সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তির রিপোর্টের ইংরেজী অনুবাদ পাঠাইয়া দিয়া লেখেন তাহারা লোকটির প্রকৃত পরিচয় খুজিয়া বাহির করিবার সূত্র আবিষ্কার করিয়াছে। আরও লেখা হয় যে "বোর্ড শবদাহ সম্পর্কে ভাল প্রমাণ পাইয়াছেন এবং সাধুর প্রকৃত পরিচয় সত্বরই জানা যাইবে। নোটিশের অংশ বিশেষ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য যদি কোন সংকল্প হইয়া থাকে তবে তাহা পুনরায় বিবেচনা করা দরকার" (একজিবিট ৩৮৮)

উল্লিখিত নোটিশ বাদীকে জাল বলিয়া ঘোষণা করার—৩।৬।২১ তারিখের

নোটিস। বাদীর পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া যে তার করা হইয়াছিল তাহার কারণ মমতাজ উদ্দিন—১।৭।২১ তারিখে আজলা গিয়া বাদী মালাসিং বলিয়া—ধরমদাস ২৭।৬।২১ তারিখে যে খবর দিয়াছিল তাহার সত্যতা করিয়া আসিয়াছেন। এই টেলিগ্রামের পরেও ইহা কিছুতেই বলা চলে না যে সত্যবাবু এই তদন্তের কথা কিছু জানিতেন না। তাঁহার নিকটই তদন্তের ফল প্রথম আসিয়াছিল—আর ইহা অস্বাভাবিকও নয়।

২৭।৬।২১ তারিখে ধরমদাস নাগা নামে একজন লোক (ইহাকে আমি ২নং ধরমদাস বলিব—এবং বাদীর গুরুকে ১নং ধরমদাস বলিব) অমৃত সহরের ৭।৮ মাইল দূরে রাজাসংসী নামক স্থানে লেঃ রঘুবীর সিংহ নামক একজন অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছে।

হরনাম দাসের চেলা ধরমদাস—সম্প্রদায় উদাসী, বয়স ৪৫—ঠিকানা সংসার, ব্যবসা সেবাদার। আমি অমৃতসহর জেলায় আজলা থানায় সংসার মৌজায় বাস করি। যে ছবি আমাকে দেখান হইয়াছে তাহা আমার চেলা সুন্দরদাসের ছবি—আগে তাহার নাম ছিল মালসিং। সে লাহোর জেলার আজ্‌লা মৌজায় বাস করিত। তাহার খুড়তুত ভাই নারায়ণ সিং মণ্টগোমারী জেলার ৪৭ নং চকে বাস করে। প্রায় ১১ বৎসর পূর্ব্বে সে মাল সিংকে লইয়া নান্‌কানা সাহেব'এ আমার সঙ্গে দেখা করে। তখন মাল সিংএর বয়স ২০ বৎসর। মালসিংএর 'পর বারেশ'—(যাহারা তাহাকে লালনপালন করিয়াছিল) অজিলা-গ্রামের তাহার কাকা মঙ্গল সিং ও লাভসিং ছয় বৎসর পূর্ব্বে সুন্দর দাস আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। সুন্দরদাসের চোখ "বিল্লি" ও রং করমা। চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি তাহাকে প্রয়াগে কুম্ভ মেলায় দেখিয়াছি। তার পরে আর তাহাকে দেখি নাই। এই তসবীর (একজিবিট পি—১) আমার চেলা সুন্দরদাসের তসবীর (ফটো) (পড়িয়া শোনান হইল এবং ঠিক বলিয়া স্বীকৃত হইল।

২৭-৬-২১

লেঃ রঘুবীর সিং এই বিবৃতি প্রমাণ করিয়াছেন। এবং ইহা যে ২৭-৬-২১ তারিখে (পি ১নং লেখা ফটো) দেখিয়া রঘুবীর সিংহের সম্মুখে ধরমদাসের বিবৃতি এ সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই। ঐ সময় ও ঐস্থানে ঐ ফটো দেখিয়া আরও তিনজন লোক বিবৃতি দিয়াছে—তাহারা সংসারের দেবদাস, কালা সিং, ভগত সিং ও কর্ত্তার সিং। সাবইনসপেক্টার মমতাজ উদ্দিন এই কয়জনের নাম দিয়া একটি দরখাস্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি সেই দরখাস্ত ১৬৪

ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডের ধারা মূলে এই ছয় জনের বিবৃতি লইয়াছেন এবং পুলিসের কর্ম্মচারীর হাতে দিয়াছেন।

লোক না দেখিলে এগুলিকে জমানবন্দী বলা যাইতে পারে না।

ধরমদাসের বিবৃতিতে মালসিংহের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। তার বাড়ী আজলা, সে নারাণ সিং ও লাভ সিংএর ভাইপো—ইহাতে দুজনেরই ঠিকানা আছে। ১৯১০ সালে মাল সিং ধরমদাসের চেলা হয় ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত এক সঙ্গে ছিল—এবং ১৯২৭ সালেও এলাহাবাদে কুম্ভ মেলায় দেখা হইয়াছিল। এখন ১৯২০ সালে তাহার বয়স ২০ বৎসর হইলে এখন তাহার বয়স ৪৬ বৎসর হওয়া উচিৎ। সে লেঃ রঘুবীর সিংএর কাছে পি—১ লেখা ফটোতে এই লোকটিকে দেখিয়াছে।

আমি বলিয়াছি—১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে বাদীর গুরু ধর্ম্মদাস নাগা ২৬শে তারিখে ঢাকা আসেন এবং ৩০শে তারিখে চলিয়া যান। মিঃ লিণ্ডসে তাঁহাকে তাঁহার সহিত দেখা করার জন্য লিখিয়াছিলেন কিন্তু তিন চলিয়া যান। বাদী তাহার জবানবন্দীতে বলেন পুলিসের ভয়েই তিনি প্রস্থান করেন। তাহার বিবৃতিতে বাদী স্বীকার করিয়াছেন যে বিপক্ষদলের চক্রান্তে পুলিশের নিকট তিনি একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন।

মোকদ্দমার সময় বাদী, ধরমদাস ঢাকায় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা প্রমাণ করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিতে দেওয়া হয় নাই। কারণ সাক্ষ্য দিতে না আসিলে এমন কি আসিলেও—এই বিবৃতিকে জবানবন্দি বলিয়া নেওয়া চলে না—কোন পক্ষ হইতেই তাহাকে সাক্ষী হিসাবে ডাকার প্রস্তাব আসে নাই—যে দশ জন সাক্ষী তাহার ফটো দেখিয়া কমিশনারের সম্মুখে বাদী মঙ্গল সিং এই বিবৃতি দিয়াছিল কেবল তাহাদের কমিশনে জবানবন্দি নেওয়ার কথা হইয়াছিল না।

ছুটির পাঁচদিন পূর্ব্বে ২১-৯-৩৫ তারিখে একজন লোককে আমার সম্মুখে আনা হয়—এই লোক নিজকে ধরমদাস নাগা বলিয়া পরিচয় দেয় এবং বলে সেই লেঃ রঘুবীর সিং এর নিকট বিবৃতি দিয়াছিল। সে বলে—বাদী (তখন আদালতে উপস্থিত ছিলেন) আমার চেলা সুন্দরদাস। সাক্ষী কখনও দার্জ্জিলিং যায় নাই এবং বাদী লাহোর জেলার আজলা গ্রামের মালসিং।

বাদীর বক্তব্য এই যে, যে লোকটি তাহার গুরু বলিয়া পরিচয় দেয়—সে জাল। সে যে জাল এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই, তাহার জবানবন্দি

দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে যে দশজন সাক্ষী লাহোরে বাদীকে মাল সিং বলিয়া জবানবন্দি দিয়াছে তাহাদের কথা আলোচনা করিব ; কারণ কোর্টে যে ধরমদাস আসিয়াছিল তাহার উপর ইহাদের কথার মূল্য আছে।

এই সকল সাক্ষীর নাম :—

মহর সিং ৪৫, আজলার লাভসিং ৪৮, আজলার উজাগসিং ৪৪, আজলার মজ্জা সিং ৬৫-ডাল্‌মুলতানী ওয়াসন সিং ৬৫—আজলার, হুকুম সিং ৫০—আজলা ওয়াজির সিং ৫২—আজলার মহন সিং ৪৬ অজুল ইকুমাসিং ৫০ আজুলা ১৯৩৩ সনের অক্‌টোবরে ইহাদের জবানবন্দি নেওয়া হয়। তাহাদের জবানবন্দিতে দেখা যায় যে এই জবানবন্দি দেওয়ার দুই বৎসর পূর্ব্বে অরুণসিং বিদেশী বলিয়া একজন লোক তাহাদের নিকট আসিয়া বাদীর ফটো দেখায় ; তাহারা ঐ ফটো মালসিং এর ফটো বলিয়া সনাক্ত করে। ছেদুর্সিং ও করম সিং ছাড়া আর সকল সাক্ষীই একথা স্বীকার করে। ১৯৩৩ সালে ৫ই অক্‌টোবর যখন তাহারা জবানবন্দি দিতে আসে, তখন ঐ দুজন লাহোরে গুরুদ্বারায় অরুণসিং এর সহিত দেখা করে। তাহাদিগকে বাদীর দুইখানা ফটো দেখান হয়,—একখানায় ডি ১ লেখা বাদীর ২৪ বৎসর বয়সের লুঙ্গী পরিয়া বসিয়া তোলা ছবি,—অন্যটী ডি ২ লেখা বাদীর বিকৃত ছবি। সাক্ষীরা এগুলিকে লালসিং এর ছবি বলিয়া সনাক্ত করে। তাহারা আর কতকগুলি ছবিকেও এই একই কথা বলিয়াছে—এই ছবি গুলির মধ্যে পি ৪, পি ১ পি২ প্রভৃতি ছবি ছিল। একজন সাক্ষী মেজ কুমারের পি ৬ লেখা এক ফটোকে সন্দেহ থাকিলেও মালসিং এর ফটো বলিয়া বলিয়াছে।

তাহাদের জবানবন্দিতে দেখা যায় যে, তাহার পিসী আক্কির ছেলে সুন্দর দাস সিং ছাড়া তাহার আর কোন আত্মীয় নাই। সুন্দর সিং থাণ্ডিওয়ালাতে বাস করিত, ওয়াজির সিং এর এখানেই বাস। ওয়াজির আসিলেও সুন্দর সিং কেন আসিল না তাহা বুঝা কঠিন।

মালসিংহের বিষয় যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ—

সে অতি দরিদ্র রাঠোর শিখ শ্রেণীর আতর সিংএর ছেলে। তার মায়ের নাম স্বানী। যখন তার বয়স ৪।৫৹বৎসর তখন মা মারা যায় এবং ৭।৮ বৎসর বয়সে বাপ মারা যায়। তখন সে তাহার পিসি আক্কির কাছে তাহার কুটীরের পাশে এক কুটীরে গিয়া থাকে। আক্কি মারা গেলে তাবির কাছে থাকে—

জয়মল সিং ইহার স্বামী। যখন ইহারাও মারা যায় তখন আক্কির ছেলে সুন্দর দাসের সঙ্গে বাস করে, সুন্দরদাস থাণ্ডিওয়ালা গ্রামে বাস করে এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাল্যে সে গরু চড়াইত এবং ষোল বৎসর বয়সে সাধু হইয়া যায়—তার পরে চারিবার গ্রামে আসে—একবার তাহার গুরু সঙ্গে আনে। সে নাকি একবার তাহার হাতে উল্কিতে লেখা তাহার গুরুর নাম দেখাইয়াছে—ইহা সুন্দরদাস ধরমদাস বলিয়া লেখা ছিল। তাহাকে নানকানা সাহেবে দেখা যাইত, নানকানা খুনের ২।১ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আর দেখা যায় নাই। রঘুবীর সিং বলেন—১৯২১ সালের জানুয়ারীতে এই দুর্ঘটনা হইয়াছে।

নানকানা লাহোর হইতে ৪০ মাইল দূরে। আজলার সাক্ষীরা বলে নানকানার মেলা দেখিতে যাইয়া তাহারা বাদীকে সেখানে দেখিয়াছে। বাদী ১৯২০ সালে নানকানা হইতে সোজা ঢাকা আসিয়াছে—কাজেই অতুল বাবুর সঙ্গে অবোধ্য হিন্দিতে কথা বলিয়াছে।

তাহার যে দুই খুড়া ও খুড়তুত ভাইয়ের কথা রঘুবীর সিংএর নিকট জবানবন্দিতে বলা হইয়াছে তাহারা কোথায়! তাহারা উড়িয়া গিয়াছে—তাহারা কখনও বর্ত্তমানই ছিল না। যে সকল সাক্ষীকে ইনস্‌পেক্টর মমতাজ উদ্দিন ১৯২১ সালের জুলাই মাসে আজলায় দেখা পাইয়াছিল এবং যাহারা ভূভনদাস ও নালসিং এর বাড়ীর পরিচয় সম্বন্ধে কথা বলিয়াছিল—এবং যাহাদের কথা মেজরাণী ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়া ছিলেন—তাহাদিগকে ডাকে নাই।

ফটো দ্বারা সনাক্ত করণ সন্তোষ জনক নয় বলিয়া প্রতিবাদী পক্ষ খুঁটি নাটিতে গিয়াছিল—যে মাল সিংহের বাহুতে একটা উল্কিচিহ্ন ছিল। ধরমদাস কোর্টে সাক্ষ্য দিতে আসিয়া এবিষয়ে পূর্ব্ব হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত ছিল না—কারণ সে কখনও উহা দেখে নাই, যদিও সে আবার বলিয়া ছিল যে যখন এলাহাবাদে তাহার সহিত শেষ দেখা হয় তখন সে ঐ উল্কিচিহ্ন দেখিয়াছিল। জেরায় লাহোরের সাক্ষীগণ অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছিল, রঙ গৌর বর্ণ, চুল তাহার পিতার মত কালো, ছোট ছোট বাদামী গোঁফ; স্থূলকায়, লম্বা দাড়ি—, চোখ কালো নয় কিন্তু বিড়ালের চোখের মত, নাক চ্যাপ্টা; নাসারন্ধ্র প্রশস্ত ইত্যাদি। পিতার মত কালো চুল এই কথাতেই যেন এই ব্যাপারের

শেষ হইয়া গিয়াছিল। এবং রঘুবর সিংহের সামনে প্রদত্ত বিবৃতিতে যে আত্মীয়গণের উল্লেখ করা হইয়াছিল, সেরূপ আত্মীয় তাহার ছিলনা এই ঘটনায় ব্যাপারটী আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল এবং স্থূলকায় কথাটী ১৯২১ সালে বাদীর পক্ষে আদৌ প্রযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং ইহা আদৌ আশ্চর্য্যজনক নহে যে মিষ্টার চৌধুরী বাদীকে সে যে অজ্‌লার মাল সিংহ এই উক্তি আরোপ করেন নাই।

কালো চুল তেল না মাখিলে ও যত্ন না লইলে কটা হইয়া যাইতে পারে। সাক্ষীগণের নিকট এই উক্তি উপস্থাপিত করিয়া—এই ব্যাপার আবার তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে ইহা স্বীকৃত হইল যে—বাদীর চুল পিঙ্গল বর্ণ বা রক্তবর্ণ এবং সাক্ষীগণ স্বীকার করিল যে বাদীর চুল দ্বিতীয় কুমারের চুলের মত।

বাদীকে কোন প্রশ্ন না করিয়া সে যে মালসিংহ ইহা প্রমাণ করা—এবং তাহাকে সর্ব্বপ্রকার স্থানে স্থাপন করা এবং তাহার মুখে সর্ব্ব প্রকার উক্তি আরোপ করা—প্রতিবাদীর পক্ষে যে সম্ভব হইতে পারে উহা আমার নিকট অদ্ভুত বোধ হয়, কিন্তু তৎ সত্ত্বেও এই ব্যাপারের গুরুত্ব দেখিয়া আমি—সাক্ষ্য সমুদয় বিবেচনা করিয়াছি। এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে এই মালসিংহের আদৌ কোন আত্মীয় নাই, তাহার পূর্ব্ব আবাসের কোন খবর নাই—কারণ আমি ইহা আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি যে—মেন্দুলওয়ালীতে তাহার এক আত্মীয় ভ্রাতা আছে। কারণ সেরূপ হইলে তাহাকে সাক্ষী ডাকা হইত। এবং এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে লাহোরের সাক্ষীগণ—একদল কৃষক এবং তাহাদিগকে আনা হইয়াছিল যে ফটো সম্বন্ধে তাহারা কিছুই জানিত না সেবিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এবং তাহাদিগের দ্বারায় এমন কতকগুলি বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে বাদীর সনাক্ত নির্দ্ধারিত হয়। ধর্ম্মদাস নাগা (প্রঃ সাঃ ৩১৭) যে মোকদ্দমা বাস্তবিক পক্ষে শেষ হইয়া গিয়াছিল তাহাই পুনর্জীবিত করিবার জন্য আদালতে আসিয়াছিল। অজ্‌লার সাক্ষীগণ যাহা বলিয়াছে; রঘুবর সিংহের নিকটে যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে এবং যে প্রকৃত ধর্ম্মদাস নাগা ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় আসিয়াছিলেন তাঁহার কার্য্যাবলী এই সমস্ত গুলির সহিত যাহা মিল থাইবে এইরূপ বিবরণ এই সাক্ষীকে দিতে হইয়াছে।

এই লোকটীকে কিরূপে যোগাড় করা হইল—এ সম্বন্ধে একটী চমৎকার বিবরণ আছে।' ইনস্‌পেক্টর মমতাজ উদ্দিনকে পাঞ্জাবে গিয়া—এই সাধুকে

যোগাড় করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং ঢাকা বিভাগের কমিশনারের নিকট হইতে তিনি একখানি পত্র লইয়া গিয়াছিলেন যাহাতে তিনি স্থানীয় পুলিশের নিকট হইতে সাধুর সন্ধান করিতে যাহা কিছু দরকার সমস্ত পাইতে পারেন। ১৯।৭।৩৫ তারিখে ইনসপেক্টার মমতাজ উদ্দিন অমৃতসর হইতে যাত্রা করেন। ১।৮।৩৫ তারিখে তিনি তাঁহার ভ্রাতার সহিত দেখা করিতে কোনও এক স্থানে গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া অর্জ্জুন সিং পরদেশীর নিকট হইতে সাধু কোথায় আছে তাহা শুনিলেন, এই লোকটী অজুলার সাক্ষীদিগকে যোগাড় করিয়া দিল। সাধু কোথায় আছে তাহা জানিয়া তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া অর্জ্জুন সিং তাহাকে প্রস্তুত রাখিয়াছিল -সে— আমি পত্রের উল্লেখ করিয়াছি সেই পত্রটি উপস্থিত করিতে দার্জ্জিলিং গিয়াছিল, এবং সাধুকে বাহির করিবার জন্য তাহাকে স্থানীয় পুলিশ যাহাতে সাহায্য করে এই মর্ম্মে ডি, আই জি র একটি আদেশ করাইয়া লইয়াছিল। ইনসপেক্টার সাধুকে আদৌ না দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন, যদিও একমাত্র তিনিই বলিতে পারিতেন যে সেই লোকটা আসললোক কি না, যে লোককে রঘুবর সিংহের নিকট হাজির করা হইয়াছিল। ইনসপেক্টার মমতাজ উদ্দিনের সমস্ত ব্যাপারটাই—একটা ছল মাত্র এবং যে পুলিশ কর্ম্মচারী ১৯২১ সালের সাক্ষীকে বাহির করিয়াছিল তাহাকেই পাঠান হইতেছে। এবিষয়ে রাজকর্ম্মচারীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইহাকরা হইয়াছিল।

সাধু স্বীকার করিতেছে যে সে অর্জ্জুন সিংহের সহিত আসিয়াছিল এবং তিনদিনের জন্য সত্য বাবুর বাড়ীর নিকটে একটা বাড়ীতে বাস করিয়াছিল (সত্যবাবু ও ইহা স্বীকার করিতেছেন), এবং তারপর সে ঢাকা আসিয়াছিল এবং ছুটীর পাঁচদিন পূর্ব্বে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসিয়াছিল। তাহার কাঠগড়ায় আসিবার পূর্ব্বে আমাকে বলা হইয়াছিল যে সাক্ষী কেবল পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলে, হিন্দী বা উর্দ্দু বুঝিতে পারে না, সুতরাং একজন দোভাষীর আবশ্যক হইয়াছিল। মেজর পাটনী দয়া করিয়া দোভাষীর কাজ করিতে রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা প্রতিপন্ন হইল যে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা ছল, লোকঠা উর্দ্দু বলিতে ও বুঝিতে পারিত, তাছাড়া ছোট ছোট বাংলা কথাও বুঝিত এবং জেরার সময় যে হিন্দী, উর্দ্দু মিশাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারিত, যদিও সে এইরূপ ভাণ করিতে চেষ্টা করিতে ছিল যে

সে কেবল মাত্র পাঞ্জাবী ভাষা বুঝিত। যদি ইহা ছল না হইবে তাহা হইলে যে ধরমদাস রঘুবর সিংহের সামনে বিবৃতি দিয়াছেন বলে
সে ধরমদাস হইবে না, কেবলমাত্র এই সংক্ষিপ্ত কারণ এই যে ধরমদাস সহজ উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার বিবৃতি দিয়াছিলেন এবং ঐ ভাষা বড় সহরে যে বাস করে এরূপ বাঙালী বুঝিতে পারিত; এবং যখনই ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে স্থরেন্দ্রনাথ একজন ঢাকার লোক, তাহার রিপোর্টে অনেক সংবাদ দিয়াছিল যাহা, সে ১৯২১ সালে সাংশ্রাতে ধরমদাসের সহিত সাক্ষাতের ফলে জানিতে পারিয়াছিল, এখনই কেসটী এইরূপ দাঁড়াইল যে এই ধরমদাস (প্রঃ সাঃ ২২৭) স্থরেন্দ্রের বিবৃতিমত সাংশ্রাতে এইরূপ আধ হিন্দী আধা বাংলায় কথা বলিয়াছিল যাহাতে সে তাহার কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। আপাততঃ এরূপ আশা করা হইয়াছিল যে পাঞ্জাবী ভাষা ও তাহার ব্যাখ্যারূপ অন্তরায় এবং ছুটীর পূর্ব্বে পাঁচদিন এবং তাহাও আবার একটা রবিবার দ্বারা সংক্ষিপ্ত হইবে এবং অস্থখের অজুহাতে তাহার বাড়ীতে সাক্ষীগ্রহণ এই সকলের দ্বারা সে রক্ষা পাইবে। কিন্তু ইহা তাহাকে রক্ষা করে নাই।

সে প্রথমে এই বলিল যে সে রঘুবর সিংহের সম্মুখে বিবৃতি দান করিয়াছে এবং তাঁহার সামনে এ (২৪) নং ফটো ও উহার একটা কপিতে তাহার চেলা স্থন্দরদাসের ফটো বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে। ফটোটীর উপরে রঘুবর সিংহের দ্বারা প্রদত্ত একজিবিট পি (১) এই চিহ্নটা নাই, এবং ফটো না দেখাইলে বিবৃতির কোনই মূল্য নাই। আমি জিজ্ঞাসা করায় মিঃ চৌধুরী বলিলেন যে রঘুবর সাক্ষীকে যে ফটোর দেখাইয়াছিলেন তাহা উহার কাছে নাই কিন্তু তিনি ইনসপেক্টার মমতাজউদ্দিন ও স্থরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট এই উপদেশ পাইয়াছেন যে ২৭।৬।২১ তারিখে রঘুবর সিংহের সামনে সাক্ষীদের যে ফটো দেখান হইয়া ছল এ ২৪নং একজিবিট সেই ফটোর একখানি কপি (২৫।৯।৩৫ তারিখের ১২৪৩ নং অর্ডার দ্রষ্টব্য) সেই ব্যাপারের সহিত মিল রাখিয়া ধরমদাস বলিয়াছে যে—রঘুবর সিংহের সম্মুখে এ (২৪) ফটো দেখান হইয়াছিল। এই ফটোতে বাদী একটা লুঙ্গি পরিয়া বসিয়া আছে। প্রতিবাদীপক্ষের কে একজন যেন লক্ষ্য করিয়াছিল যে, স্থরেন্দ্রবাবুর রিপোর্ট আছে যে রঘুবর সিংহের সামনে সাক্ষীদিগকে যে ফটো দেখান হইয়াছিল উহা খাড়া ফটো (দণ্ডায়মান ফটো)। ইহা পরে এবং খুব দেরীতেই লক্ষ্য করা হইয়াছিল কিন্তু সাক্ষী তখনও কাঠগড়ায় ছিল এবং সে বলিল যে—রঘুবীর সিংহের সামনে তাহাকে যে ফটো

দেখান হইয়াছিল তাহা আদৌ বসিয়া থাকা ফটো নহে দণ্ডায়মান অবস্থার ফটো। পূর্ব্বে সে এ (২৪) নং বাসয়া থাকা ফটোটীর সম্বন্ধে হলফ করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছে কি না প্রশ্ন করায় সে বলিল যে সে উহা বলে নাই, অধিকন্তু আরও বলিল যে তাহার সাক্ষ্য লইবার উদ্দেশ্যে এক উকিল যখন তাহার বিবৃতি লইয়াছিল তখন তাহাকে এই ফটো দেখান হইয়াছিল এবং রঘুবর সিংহের সামনে যে এই ফটো দেখান হইয়াছিল—ইহা সে অস্বীকার করিয়াছিল। অর্থাৎ ইহা সত্বেও তাহার প্রামাণিক জবানবন্দীতে সাক্ষী তাহাকে এ (২৪) ফটো দেখান হইয়াছিল এবং সে স্বীকার করিয়াছিল যে এই ফটোই তাহাকে দেখান হইয়াছিল ; এবং মিঃ এ. চৌধুরী এই পরামর্শ পাইয়াছিলেন যে এ (২৪) ফটো ২৭৬'২১ তারিখে প্রদর্শিত ফটোর একটী কপি।

আসল ব্যাপার কি ঘটিয়াছিল, তাহা বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। রঘুবর সিংহের নিকটে যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছিল তাহাকে বিবৃতিকারীর কোনও সহি বা টিপসহি নাই। ফটো না দেখাইলে উহার কোন মানেই নাই, এবং ঐ ফটোতে রঘুবর সিংহের একজিবিট পি (১) এবং তাহার সহি ছিল এবং খুব সম্ভবতঃ বিবৃতিকারীর টিপসহি ছিল অথচ তাহাতে সহি বা টিপসহি লওয়া হয় নাই। সাব ইন্‌স্‌পেক্টার মম্‌তাজউদ্দিন্ অবশ্যই উহা লইত এবং সাধারণ ভাবে উহা সূচিত করে। একজিবিট পি ৮ সম্বলিত ফটো অন্য কোন লোকের ফটো হইবে, নিশ্চয়ই বাদীর ফটো নহে, কিংবা উহা ৩২৭ নং প্রঃ সাঃ ধর্ম্মদাস নাগার না হইয়া অন্য কোন লোকের সহি বা টিপসহি সংযুক্ত হইবে কিংবা একজিবিট্ এই ফটো সরাইয়া না লইলে বিবৃতিদ্বারা বাদীর কোন ক্ষতি হইবে না, এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা বিবৃতির অংশ স্বরূপ ফটো যোগার করা হইয়াছিল। একজিবিট এ (২৪) এক উদ্দেশ্যে উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল কিন্তু সুরেন্দ্রের রিপোর্ট দ্বারা উহা ব্যাহত হইল এবং তখন এই গল্প সৃষ্টি হইল যে দাঁড়ান ছবি দেখান হইয়াছিল।

আমি বিশ্বাস করি না যে—পি (১) চিহ্ন কারা ফটো হারাইয়া গিয়াছে, এমনকি ২৫।৯।৩৫ তারিখেও উহা বলা হয় নাই ; উহা কৌঁসুলীর অধিকারে ছিল না। পরবর্ত্তীকালে কোন সাক্ষীর দ্বারা নহে পরন্তু কৌঁসুলীর দ্বারা উক্ত হইয়াছিল যে উহা পাওয়া যাইতেছে না। যদিও ইন্‌সপেক্টার মম্‌তাজউদ্দিন বলিয়াছেন যে তিনি বিবৃতি ও ফটো মিঃ লিণ্ডসেকে প্রদান করিয়াছেন, এবং ইহা সকলেই জানে যে সাধু-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ পত্র বিশেষ ফাইলে রাখা

হইয়াছে। বিবৃতিটি পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু ফটোটি পাওয়া যাইতেছে না। যে ফটোটী দেখান হইয়াছিল তাহার পরিবর্ত্তে এই যে অপর একটী ফটো স্থাপন ইহাকে আমি কেবলমাত্র অতি জঘন্য ধরণের কৌশল বলিনা, ইহাকে জুয়াচুরী বলি।

যে ধর্ম্মদাস বিবৃতি দান করিয়াছেন তাঁহাকে যে ফটো দেখান হইয়াছিল সেই ফটো ব্যতীত বিবৃতির কোনই দাম নাই এবং এটী উপস্থিত না করা এবং তাহার পরিবর্ত্তে জুয়াচুরী করিয়া অন্য ফটো স্থাপনের চেষ্টা করা এবং উহা ব্যহত হইলে তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করা এই সমস্ত হইতেই এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে—ফটোর লোকটী সুন্দরদাস, এই বিবৃতি বাদীর ফটোর পরিবর্ত্তে অন্যের ফটো দেখাইয়া লাভ করা হইয়াছিল, এবং বাদীকে যে পরে সুন্দরদাস বলা হইয়াছে এই সুন্দরদাস নামের উৎপত্তি উক্তরূপে ঘটিয়াছিল।

বিবৃতিটি গেল বটে কিন্তু লোকটি রহিল। যে যদি রঘুবর সিংহের সামনে বিবৃতিদান না করিয়া থাকে তাহা হইলে সে বাদীর গুরু ধর্ম্মদাস নাগা নহে। নিম্নলিখিত বিবেচনা মতে মাত্র একটী সিদ্ধান্ত সম্ভব।

১। ইহা স্বীকার হইয়াছে যে ২৭।৬।২১ তারিখে এ (২৪) একজিবিট বিবৃতিকারীকে দেখান হয় নাই, কিন্তু এই লোকটী জুয়াচুরীর মতলবের একটা অংশ স্বরূপ হলফ করিতেছে যে উহা দেখান হইয়াছিল। সে পরে হলফ করিতেছে যে খাড়া ফটোটী দেখান হইয়াছিল, যাহা আদৌ দেখান হয় নাই, সেরূপ হইলে উহাতে একজিবিটি চিহ্ন থাকিত।

২। সে যদি সেই একই লোক হইত, তাহা একজিবিটি মার্ক বিশিষ্ট ফটোটি উপস্থিত করা হইত।

৩। অজুলার সাক্ষীগণ যে ভুল করিয়াছিল যে সে ভুল করিবে না। সে বলিতেছে যে মালসিংহ স্থুলাকায় ছিল না। তাহার চুল আমার মত সোনালি ছিল—যেমন পাঞ্জাব হইতে আহৃত একজন সাক্ষী বলিয়াছিল যে তাহার চুল ছিল 'কাক্‌কা ভুরা' এবং আর একজন সাক্ষী বলিয়াছিল কাক্‌কা অর্থাৎ তাহার ব্যাখ্যা মতে ফিকে সোনালী।

৪। এই বিবৃতিকারী বলিয়াছে যে তাহার পেশা সেবাদার অর্থাৎ সে এক গুরুদ্বারের পুরোহিতের ব্যবসাধারী। এই সাক্ষী বলিতেছে যে সে কোন স্থানে সেবাদার নহে এবং সে সেবাদার এ কথা কখনও বলে নাই। দেবদাস সহ পাঁচজন সাক্ষী রঘুবর সিংহের সামনে ২৭।৬।২১ তারিখে বিবৃতি দিয়াছিল কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত ঘটনা জানে না। অবশ্য সে বিবৃতির মধ্যে এই বর্ণনা

করিতেছে কিন্তু নারায়ণ সিং ব্যতীত কোন আত্মীয়ের উল্লেখ করিতে সাহস করিতেছে না। সে বলিতেছে যে অজুলার সাক্ষীগণ মিথ্যা প্রমাণিত করিতেছে। সে বলিতেছে যে বহুবর্ষ পূর্ব্বে একদিন এক বাঙালী বাবু—ও একটী পুলিশের লোক তাহার কাছে গিয়াছিল এবং তাহাকে একটী ফটো দেখাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—সে কে? তাহারা আসিয়াছিল বেলা ৩টার সময় যখন সে ছোট সংগ্রার সংলগ্ন গ্রামে গুরুকাবাস মন্দিরে অবস্থান কবিতেছিল। তাহারা তাহাকে একটী ফটো দেখাইয়াছিল, যে ফটোটি আদালতে তাহাকে দেখান হইল—একজিবিট এ (২১)—এবং পরে খাড়া ফটো। সে ফটো দিখিয়া বলিয়াছিল—আমার চেলা সুন্দরদাসকি হ্যায়। আমার চেলা সুন্দরদাসের ফটো। আগন্তুকেরা ইহা লিখিয়া লইল এবং আর কোন কথা বলি ন। তারারা গুরুকাবাসে রাত্রি যাপন করিল এবং পরদিন প্রাতে তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রের নিকট লইয়া গেল এবং তথায় সে এই বিবৃতি করিল। ছুটীর পূর্ব্বে উহাই ছিল সমগ্র বিবরণ, এই বিবৃতি লইবার পূর্ব্বে ফটো দেখান ছাড়া আর কোন কথা হয় নাই এবং "উ লেক কে চুপ্"। ধরমদাসের সহিত সুরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল সে তাহার চেলা সেবাদাসের সহিত ফটোটা চিনিয়াছিল এবং তাহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল সুতরাং সে যে সংবাদ আনয়ন করিতেছিল তাহার সবটা না হইলেও কতকটা ধরমদাসের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। ছুটীর পরে ৩২৭ নং প্রঃ সাঃ কিছু কিছু কথা আরম্ভ করিল এবং রাত্রে দেবদাসের নিকট আসিল সুতরাং এরূপ বলা যাইতে পারে যে দেবদাস তথায় এবং তাঁহার সহিত ফটো দেখিয়াছিল। সে বলিতেছে যে তাহার সর্ব্বসমেত ৪।৫ জন চেলা আছে এবং পূর্ব্বে সর্ব্বসমেত ১২ জন চেলা ছিল এবং টাকা পাঠানের কথা দূরে থাকুক তাহারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিত না। তাহার সাক্ষ্যে যে সব মিথ্যার ছাপ রহিয়াছে সেগুলি নির্দ্দেশ করা বিরক্তিকর। একজিবিট পি (১) এর পরিবর্ত্তে অন্য একটা ফটো স্থাপন করিবার চেষ্টা এবং উহা ব্যাহত হইলে তৃতীয় ফটো স্থাপনের চেষ্টায় সে সহযোগিতা করিয়াছিল এবং উহাই চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিতেছে যে—একজিবিট পি (১) তাহাকে নষ্ট করিবে। রঘুবীর সিংহের সমানে যে বিবৃতি দান করিয়াছিল সে সে-লোক নহে, সুতরাং বাদীর গুরু নহে।

তাহার সাক্ষ্য শেষ হইলে তাহাকে খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করা হইয়াছিল। একজন উকিল বরাবর পঞ্জাব গিয়াছিল, তাহাকে

রঘুবর সিংহকে দেখাইয়াছিল এবং রঘুবর সিংহ সত্যবাবুর পরিচিত সুন্দর সিংহের চিঠি পাইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহার যে ফটো রাখা হইয়াছিল সেটীকে তাঁহার সমক্ষে বিবৃতিদানকারী ধরমদাসের ফটো বলিয়া সনাক্ত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে—তিনি পূর্ব্বে তাঁহাকে জানিতেন না। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে তাহার সাক্ষ্যদানের পরদিন উকিল তাহাকে তাহার গৃহে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে—তিনি একদিনের জন্যও তাহাকে দেখেন নাই এবং তাহার সাক্ষ্য হইতে ইহা পরিষ্কার জানা যায় যে ছয়জন লোকের বিবৃতি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাদের সম্বন্ধে তাহার আদৌ কোন স্বতন্ত্র স্মৃতি নাই এবং সুরেন্দ্রের রিপোর্টে উল্লিখিত বিষান দাস প্রভৃতি আর তিনজনের কিছুই স্মরণ নাই।

এই ধরমদাসকে ১৯২১ সালে ঢাকায় সে কি করিত জিজ্ঞাসা করায় সে বলিতেছে যে সে সুন্দরদাসকে (বাদাকে) সে যে ঘরে বাস করে সেই ঘরে দেখিয়াছিল কিন্তু তাহার সহিত বাক্যালাপ হয় নাই। সে নন্দ্রের বাড়ীতে গিয়াছিল (আনন্দ রায়কে সে নন্দ্র বলিত)—তাহাকে একটি ফটো দেখান হইয়াছিল এবং তাহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারে নাই বলিয়া সে আবার গিয়াছিল। এবারে একজন শিখ দোভাষী ছিল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল ফটোটি কাহার, এবং সে বলিয়াছিল যে সেটা সুন্দরদাসের, কুমারের নহে ইহাই সব। আপাততঃ এরূপ অনুমান করা হইয়াছিল যে সে এই বলিয়া ঢাকার ব্যাপার হইতে রক্ষা পাইবে যে সে কাহারও সহিত কথা বলে নাই—সে কাহারও কথা বুঝিতে পারে নাই, কেহই তাহার কথা বুঝিতে পারে নাই এবং এই জন্যই সে দোভাষীর জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে সকলেই তাহার কথা বুঝিতে পারিত এবং সুরেন্দ্রবাবু বলিতেছেন যে ১৯১১ সালে জুন মাসে সাংগ্রারায় তিনি তাহার আধাবাংলা ও আধা হিন্দি কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আরও যদি কিছু প্রয়োজন থাকিত তাহা হইলে সেটা ছিল তাহার তলপেটের স্ফীতি—একটা প্রকাণ্ড জিনিষ—এবং সে উহা লম্বা সার্ট দ্বারা ঢাকিতেছিল, সে বলিতেছে যে সে যখন ঢাকায় আসিয়াছিল তখনও উহা ছিল, কিন্তু কেহ উহা দেখিতে পায় নাই, কারণ সে ভোর চারটার সময় স্নান করিত, এবং তাহার আসিবার পূর্ব্বে সাক্ষীরা বলিয়াছে যে গুরু সর্ব্বদা মালা জপিতেন, কিন্তু উহা না জানিয়া ঐ সাক্ষী ভুল করিয়া বলিল যে সে কখনও মালা জপে নাই।

শিখ উকিল আবার সাংগ্রায় ছুটিলেন এবং গুজ্জর সিং, চন্দ্র সিং, বুর সিং ও ভগত সিং নামে চারজন সাক্ষী যোগাড় করিয়া আনিলেন, সে যে ২৭।৬।২১ তারিখে সাংগ্রায় ছিল তাই সামঞ্জস্য করিতে, এবং বহু পরে আসিলেন ইন্‌সপেকটার মমতাজুদ্দীন ও সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তাঁহারা যে বিবরণ দিতেছেন তাহা এই ইনস্‌পেক্টার ও সুরেন্দ্র ২৬শে জুন তারিখে সংগ্রারায় গেলেন এবং গুজ্জর সিং নামক তৎকালীন এক ডাক্তারের ছাত্র, এক দোভাষী ও তাহার পিতার সহিত গুরুকাবাদে ধরমদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তারপর সেই রাত্রি ধরমদাস সাংগ্রারায় গুরুদ্বারে গমন করিলেন। তথায় দেবদাস সেবাদার ছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে—তিনি বিবৃতি করিবার নিমিত্ত একা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে গেলেন এবং তারপর অন্যান্য সাক্ষীরা গেল, সুতরাং তিনি বাকী সকলকে দেখেন নাই। এমনকি তাঁহার চেলাকেও দেখেন নাই। সুরেন্দ্র বাবু তাহাকে দেখার পর তাঁহার বিবৃতি আরম্ভ করিলেন এবং তাহাকে খাড়া ফটো দেখান হইয়াছে, দেখিয়া তিনি জুন মাসের গরমে পাঞ্জাবে চলিয়া গেলেন এবং অমৃতসর হইতে ৮ মাইল দূর হইতে একদল সাক্ষী পাঠাইলেন এবং তাহাদের বিবৃতি অনুমান করিয়া তাহার রিপোর্ট পাঠাইলেন কিন্তু উহা ঘটিল না। আমি এই বিবরণের একটী কথাও বিশ্বাস করিনা, কারণ প্রঃ সাঃ ৩২৬ ধরমদাস যে যে বিষয়ে অজ্ঞতা দেখাইয়াছিল সেই সকল জ্ঞান ধরমদাসের ছিল না ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য এবং অগত্যা একবার তাহাকে দেবদাসের সংস্পর্শে আনিবার জন্য যাহাতে তাহারা একসঙ্গে ফটোটা দেখিতে পায় এই সকল উদ্দেশ্যে রিপোর্টটা বুদ্ধি করিয়া রচিত হইয়াছিল, কিন্তু রিপোর্ট অনুসারে তাহাকে নির্ব্বাক করিয়া রাখাও সম্ভবপর ছিলনা। এই দেবদাস ছোট সাংগ্রারার সেবাদার। এই ছোট সাংগ্রার হইতে যে সাক্ষীগুলি আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ভগত সিং একজন। ভগত সিং বলিতেছে যে সে সেই ভগত সিং যে একটা অপরিচিত ফটো দেখিয়া রঘুবরের সম্মুখে বিবৃতি দিয়াছে এবং সে সুন্দর দাসকে জানিত বলিয়া প্রকাশ করিতেছে, কারণ ধরমদাস নাগা তাহার চেলা দেবদাসকে দেখিতে ছোট সাংগ্রায় আসিতেন। দেবদাস ২০ বৎসর ধরিয়া সেই গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। শিখ উকিল এই একদল সাক্ষী আনিতে গেল কিন্তু তথাকার গুরুদ্বারে সেবাদার দেবদাসকে আনিলনা, ইহা বোধ হইতেছে যে দেবদাস রঘুবর সিংহের সামনে কি ফটো দেখান হইয়াছিল

তাহা বলিয়া দিত এবং এই ধরণের লোক আদাসতে কিছুতেই এই লোকটাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন না।

এই দলের সহিত আর তুইজন লোক আসিয়া ছিল, উহাদিগকেও শিখ উকিল আনিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজনের ধরমদাসের গুরু হরনাম দাস। তিনি ৩২৭ নং প্রঃ সাঃ ধরমদাসের ফটোকে তাহার দেশী ধরমদাস বলিয়া সনাক্ত করিয়াছিলেন এবং বাদীকে তাহার চেলা চেলা সুন্দরদাস বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন। ধরমদাস ও হরনাম দাসের সমস্ত বিবরণ বাদীর সাক্ষী দর্শনদাসের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু একটী কথা পাওয়া যাইতেছে না। দর্শনদাস বলিয়াছেন যে তাঁহার গুরু লুধিয়ানা জেলার বিলু নামক স্থানের এক গৌর ব্রাহ্মণ। লোকটী দর্শনদাস ওরফে গোপালদাসকে চেনা বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, দিলুকে গ্রহণ করিতেছে কিন্তু সে জানেনা যে সে একজন গৌর ব্রাহ্মণ। সে বলিতেছে যে ধরমদাস ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে সুন্দরদাসকে তাহার চেলা করিয়াছিল এবং সে নিজে ধরমদাসকে ২০ বৎসর পূর্ব্বে দীক্ষা দিয়াছিল। সে যখন বলিয়াছেন যে সে বাকী দলের সঙ্গে আসে নাই, পরন্তু ঢাকা আসিবার পূর্ব্বে প্রায় তিনদিন কলিকাতায় ছিল তখন সে ইচ্ছা পূর্ব্বক মিথ্যা বলিয়াছিল। গুর্জ্জর সিং ও চন্দন সিং তাহাকে লুকাইতে ছিল কিন্তু ভগত স্বীকার করিতেছিল যে এই লোকটী সমেত সমস্ত দল কোথাও না থামিয়া একসঙ্গে ঢাকায় আসিয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে হালসা দেওয়ানের লোক অর্জ্জুন সিং এই জাল ধরমদাস নাগাকে সংগ্রহ করিয়াছিল, যাহাতে সে আসিয়া বলিতে পারে যে যে ব্যক্তি ১৯২১ সালে রঘুবর সিংহের সমক্ষে বিবৃতি দিয়াছিল সে সেই লোক। সে আসিল এবং তারপর এই বিবৃত যাহাতে বাদীর বিপক্ষে যায় ফটো বদলাইয়া সেই চেষ্টা আরম্ভ হইল। এবং তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ভান করিবার জন্য যে ইনসপেকটার মমতাজ উদ্দিন পাঞ্জাবে গিয়াছিলেন এবং যে সাক্ষী দিতে আসিবার পূর্ব্বে কখনও তাহাকে দেখে নাই—তাঁহাকেই আসিতে হইল এবং তিনি ১৯২১ সালে যে সাধুকে দেখিয়াছিলেন সেই সাধু বলিয়া এই লোকটীকে সনাক্ত করিতে হইল এবং কৌশুলীকে ফটোটী উপবিষ্ট ফটো পরামর্শ দেওয়ার পর বলিতে হইল যে তাহাকে খাড়া ফটো দেখান হইয়াছিল। ইহাকে ভুল হইয়াছিল বলা চলে না, পরন্তু রঘুবর সিং যে ফটোটীতে একজিবিট পি (১) চিহ্ন দিয়াছিলেন সেইটীর পরিবর্ত্তে বাদীর একটী ফটো স্থাপন করার নীচ ষড়যন্ত্রের অংশ বলা চলে।

পেতাম। বাৎসরিক কত সারপ্লাস পেয়েছি তা মনে নাই। প্র—সবার চেয়ে বেশী সারপ্লাস কত পেয়েছেন? উ—এক লাখ কয়েক হাজার টাকা। প্র—ঠিক তার পরে কতটাকা পেয়েছিলেন? উ—৬০।৬৫ হাজার। প্র—মোটমাট কত সারপ্লাস পেয়েছেন? উ—ঠিক মনে নাই। প্র—সারপ্লাসের কি কোন হিসেব নেই?—না। প্র—একটা মোটমাট বলতে পারেন সারপ্লাস কত পেয়েছেন? উ—৩॥—৪॥ লাখ মোটমাট পেয়েছি কিম্বা তার বেশীও হতে পারে। প্র—আপনার পিতা এক বিয়েই করেছিলেন কি? উ—হাঁ। প্র—যখন আপনার পিতার মৃত্যু হয় তখন আপনি কোথায়? উ—কলকাতায় মারা যান, আমি কলকাতায়ই ছিলাম। পিতা যে মারা গেছেন এ আমার মনে আছে। তখন ছয় মাস সেখানে ছিলাম, অবিশ্যি ঠিক মনে নাই, তবে শুনে শুনে মনে আছে। বাবার নাম তুলসীপদ বন্দোপাধ্যায় তিনি মারা গেছেন।

প্র—এটা ঠিক কিনা যে আপনার বাবা আপনার মামা বাড়ী থেকে সাহায্য নিয়েছেন? উ—জানি না। প্র—আপনার পিতার হাতের লেখা মনে আছে? উ—আমার পিতার হাতের লেখা মনে নাই। প্র—আপনি সত্যবাবুর চন্দন নগরের বাড়ীতে গিয়াছেন? উ—১৮।১৯ বৎসর আগে একবার গিয়েছি। প্র—চন্দননগরের বাড়ীতে একাই গিয়েছিলেন না আর কেউ গিয়াছিল? উ—ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, আমার ছোট বোন, আমি। আমরা বাড়ী দেখেই চলে এলাম, তখন বাড়ীর খানিকটা ভাড়া দেওয়া ছিল? প্র—আপনি জয়দেবপুরে স্বামীর সঙ্গে টম্‌টমে গিয়াছেন?—না। প্র—আপনার বোনেরা কখনও টম্‌টমে আপনার স্বামীর সঙ্গে গিয়াছেন? উ—গিয়াছেন কিনা জানিনা। প্র—আপনি স্বামীর সঙ্গে কোন বৎসর টম্‌টমে কলকাতায় বেরিয়েছেন। উ—কলকাতায় প্রথম কোর্ট অব ওয়ার্ডের সময় গিয়াছি, তখন ২।১ বার উঠেছি। ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটে উঠেছি। প্র—আপনার মোকদ্দমার বিরুদ্ধে যে বল্‌বে সেই মিথ্যাবাদী? উ—সে আমি বলছি না। কেউ ভুল করে বল্‌তে পারে, কেউ স্বার্থের জন্য বলতে পারে। ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে বলতে পারে। প্র—আপনি কোন সম্ভ্রান্ত ধারণাও করতে পারেন না কিম্বা আপনি কোন স্বার্থ প্রণোদিতও হন না? উ—আমি আমার নিজের স্বার্থ যে দেখি না তাও বলি না এবং আমি যে ভুল বলিনা তাও বলিনা। প্র—আপনি কি দেখিয়াছিলেন যে (শনিবার দিন ৮ই মে) মেজকুমারের হাত

পা যেরূপ ঠাণ্ডা হয়েছিল শরীরটাও কি ঐ রকম ঠাণ্ডা হয়েছিল তাঁর তথাকথিত মৃত্যু পর্য্যন্ত? উ—আমি তো দেখি নাই। প্র—যখন আপনার মামা সূর্য্যনারায়ণ বাবু এসেছিলেন তখন মেজকুমারের শরীর গভীর হিমাঙ্গ হয়েছিল কিনা? উ—কাকে গভীর হিমাঙ্গ বলে জানিনা। প্র—যখন তাঁহার শরীর ঠাণ্ডা হয়েছিল, তখন তাঁর শরীর শুক্‌নো ছিল না একটু আঠা আঠা হয়েছিল? উ—আমার তো মনে হয় শুক্‌নোই ছিল। প্র—আপনি কি এখন একথা স্মরণ করে বল্‌ছেন? উ—হাঁ, স্মরণ করেই বল্‌ছি। প্র—আপনি সাক্তা নামে কোন গ্রামের নাম শুনেছেন? উ—শুন্‌তে পারি, মনে নাই। প্র—আপনি যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কাউকে জানেন? উ—তিনি কুমারদের ভাই হন সম্পর্কে। সত্যভামা দেবীর বাপের বাড়ীর সম্পর্কে সম্পর্কিত—কি সম্পর্কে তা বলতে পারি না। প্র—আপনি তাঁর স্ত্রীকে দেখেছেন? উ—হাঁ দেখেছি। প্র—তাঁর নাম মনে আছে? উ—শৈলবালা তাঁর নাম। প্র—আপনাদের তিন বোনের হাতের লেখার ধরণটা কি অনেকটা একরকম ছিল? উ—আলাদা আলাদা ধরণ বলিয়াই মনে হয়। প্র—আপনি মলিনা দেবীর হাতের লেখা চেনেন? উ—হঁ। চিনি। (এই সময় মিঃ চাটার্জ্জি একখানি চিঠি বিবাদিনিকে দেখাইয়া প্রশ্ন করেন)—এই খানা মলিনা দেবীর চিঠি কিনা? তার হাতের লিখা কিনা? উ—হঁ। আমার বড বোনের হাতের লেখা। (এই চিঠি খানা এক্‌জিবিট করা হয়)। প্র—শৈলবালা দেবীর সঙ্গে আপনার চিঠিপত্র লেখা হত। উ—আমার মনে নাই। (এই সময়ে শৈলবালা দেবীর লিখিত একখানা চিঠি বিবাদিনীকে দেখাইয়া প্রশ্ন করেন)—এই চিঠিখানা শৈলবালা দেবীর লিখিত কিনা? এটা কার লেখা আমি বলতে পারব না। প্র—আপনি কি এটা বলতে পারেন যে এটা শৈলবালা দেবীর লেখা চিঠি নয়? উ—তার হাতের লেখা ছেলেবেলায় হয়ত দেখেছি এখন মনে নাই। আমি কি করে বলব যখন তার লেখা চিনতে পারিনি। প্র—ইহা কি সত্য যে আপনার কাকা তুলসীবাবু কোন সময় আপনাদের ল্যান্সডাউন রোডের বাসায় ছিলেন?—তাঁর স্ত্রী ও ছিলেন? উ—হাঁ, ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম হেমনলিনী দেবী। প্র—তুলসীবাবু কখন আপনার বাড়ীতে আসেন? উ—ল্যান্সডাউন রোডে আমাদের আসার ২।১ বৎসর আগে। তার স্ত্রীও এসেছিলেন। ইদানীং তিনি বেশীর ভাগ আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন। তাঁর

স্ত্রীও থাকিতেন। প্র—হেমনলিনী দেবী কি এখনও জীবিত আছেন? উ—হাঁ, এখন আমার বাড়ীতেই আছেন। আমার কাকা বছর কয়েক আগে মারা গেছেন। প্র—আপনার কাকা আপনার কোন কাজ কর্ম্ম দেখতেন? উ—না, কোন বৈষয়িক কাজকর্ম্ম দেখিতেন না। কারণ ষ্টেট কোর্ট অব ওয়াডর্সে। আমার কাকা ল্যান্সডাউন রোডেই মারা যান। তিনি আমার বাড়ীর বাজার করতেন না। প্র· এটা কি অন্যায় হবে যে আপনি তাদের ভরণ পোষণ করছেন? উ—তিনি ও তাঁর স্ত্রী আমার বাড়ীতেই খেতেন। তাঁর এক মেয়ে আছে, আমার বাড়ীতে আসবার আগেই ওর বিয়ে হয়েছে। এখন শ্বশুর বাড়ী আছে। প্র—আপনার মা মামীরা, খুড়ী কখনও টমটমে গিয়েছেন? উ—আমি দেখি নাই। প্র—কুমারের বোনেরা কখনও টমটমে গিয়েছেন? উ—আমার মনে পড়ে না। প্র—কুমারের সঙ্গে ছাড়া আপনি আর টমটমে উঠেন নি—ইহা ধরতে পারি কি? উ—না, মামার বাড়ী টমটমে উঠেছি আমার বিয়ের আগে। কুমারের সঙ্গে রাত্রিকালে টমটমে উঠেছি। প্র—আপনি নিজে টমটম হাঁকাতে জানতেন? উ—না। প্র—আপনি যখন জয়দেবপুরে অসুস্থ ছিলেন, তখন আপনার মা অনেক সময় অনুরোধ করে লিখতেন যাতে আপনি জুতো মোজা পরেন—একথা সত্যি কি না? লিখতে পারেন মনে পড়ে না। প্র—আপনার মৃগী রোগ (এপিলেপসি) ছিল কিন? উ—না, আমার মৃগী রোগ ছিল না। প্র—আপনার কখনও মূর্চ্ছারোগ হয় নি? উ—না, তবে বিয়ের পর ম্যালেরিয়া হয়ে খুব দুর্ব্বল হয়েছিলাম তাতে হাত, পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল—কথা বার্ত্তা বলিতে পারিতাম না। ডাক্তার বলত ইহা হিষ্টিরিয়ার পূর্ব্বলক্ষণ। প্র—আপনার কি এপিলেপসি (মৃগী রোগ) ছিল? উ—না। প্র—আপনার যে এপিলেপসি ছিল এটা অস্বীকার করছেন এই জন্য যে শনিবার দার্জ্জিলিংএ আপনি মূর্চ্ছা যান এবং আপনাকে আপনার মামার বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয়। উ—না। প্র—আমি আরও বলছি যে ঐ শনিবার দিনে যে আপনাকে মামারবাড়ী নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর আর আপনি আপনার স্বামীকে দেখতেই পান নি? উ—সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। প্র—আপনি তারপর দিন সকাল বেলা দেখেছেন একটা আচ্ছাদিত দেহ? উ—না। (এই সময় মিঃ চাটার্জ্জী বিবাদিনীকে তাঁর মার লিখিত পত্র দেখান এবং প্রশ্ন করেন) এখানা মেজ রাণীর মার চিঠি কিনা। বিবাদিনী স্বীকার করেন যে ঐ চিঠি তাঁর মার লেখা। (চিঠিখানা একজিবিট হয়।) প্র—আপনি কি

জজ সাহেবকে একথা বলতে চান যে আপনার মা যত চিঠি লিখেছেন জয়দেবপুরে তাতে সব মিথ্যা কথা লিখেছেন ? উ—না, তবে আমার মা আমাদের সম্বন্ধে অল্পতেই বিচলিত হয়ে পড়তেন এবং সদাসর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে (এই সময় মিঃ চাটার্জ্জী মেজ রাণীকে চিঠির শেষাংশ দেখাইয়া বলেন) এই চিঠিতে আপনার মা লিখেছেন যে আপনার এপিলেপসিস হয়েছে। উ—হাঁ। প্র—আপনি সাক্ষ্য দিবার আগে উকীলের নিকট নিশ্চয়ই একটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন ? উ—হাঁ। প্র—কতদিন লেগেছিল ষ্টেটমেণ্ট দিতে ? উ—৫।৭ দিন, অর্দ্ধোদয় যোগের স্নানের পর এসে ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছি। প্র—অর্দ্ধোদয় যোগে স্নান করতে যাওয়ার আগে কতদিন যাবৎ ঢাকায় আছেন। উ—বছর খানেক হল এখানেই আছি, তবে রামনারায়ণের বিয়ের সময় জয়দেবপুর গিয়াছিলাম। তা ছাড়া মাঝে মাঝে কলকাতায়ও গিয়েছি। (এই সময় মিঃ চাটার্জ্জি আরও তিনখানা মায়ের লেখা চিঠি বিবাদিনীকে দেখান। বিবাদিনী বলেন—হাঁ, আমার মায়েরই চিঠি।) দুইখানি চিঠি ১৩১৩ সনে লেখা, যে বৎসর আমার শাশুড়ী মারা যান। আর একখানা চিঠি কলিকাতায় পাই। তখন আমার শাশুড়ী জয়দেবপুর ছিলেন, আমার ননদরা আমার সঙ্গে কলিকাতায় ছিলেন। কোর্টের প্রশ্নে বলেন—এ চিঠি বম্মহলার বাড়ীতে পাই। প্র—১৩১৯ সনে রক্তহীনতা রোগ ছিল কিনা ? উ—না। প্র—আপনি কি বলছেন ১৩১৬ সনে আপনার শরীর একেবারে সুস্থ ছিল ? উ—না, আমার কোন অসুখ ছিল না। (আর একখানা চিঠি বিবাদিনীকে দেখাইয়া)—এই চিঠিখানা আপনার মার স্বাক্ষরিত, আপনার শাশুড়ীর নিকটই লিখা (আরও তিনখানি পত্র বিবাদিনীকে দেখাইয়া বলেন—এগুলি প্রভাবতীর লেখা কিনা উ—একখানা চিঠি আমার ছোটবোনের লেখা। অন্য দুইটায় নামের সই নাই। অন্য একটায় প্রভাবতী নাম লেখা আছে। আমি বলতে পারব না, কারণ ছেলে মানুষের হাতের লেখা। এই সময়ে মিঃ চাটার্জ্জী প্রভাবতী দেবীর লেখা চিঠি, এবং ছেলেমানুষের হাতের লেখা চিঠি—এই দুইপ্রকার চিঠি বিবাদিনীকে মিলাইয়া দেখিতে বলেন ও জিজ্ঞাসা করেন একজনের লেখা কিনা, তাতে কোন সন্দেহ আছে কিনা ? উ—আমার নিকট মনে হয় না। এই সময় আর একখানা চিঠি দেখাইয়া বলেন, এই চিঠি আপনি ছোট রাণীকে লিখেছিলেন মনে আছে ? উ—হাঁ আমার লেখা। প্র—দার্জ্জিলিং ছেড়ে আসার পরে না আগে ? উ—পরে। (এই সময় আর একখানা চিঠি তড়িন্ময়ী

দেবীর নিকট লিখা দেখাইয়া মি চাটার্জ্জি বলেন) দেখুন এই চিঠিখানাও আপনার হাতের লিখা কিনা? উ—হাঁ এই চিঠি দার্জ্জিলংএর পরে লেখা। প্র—আপনার হাতের লেখা কি এখন একরকমই? উ—কতকটা এইরকমই। (এই সময় মি চাটার্জ্জি বিবাদিনীকে দুছত্র লিখে দিতে বলিলেন—পূর্ব্বের লেখা চিঠি হইতে—উকীল সুরেন্দ্র বাবু পড়িয়া বলেন এবং বিবাদিনী লেখেন ও নাম সই করেন।) প্র—প্রথমবার যখন বৃদ্ধ বাদীকে নিয়ে ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীর নিকট দিয়া যায় এবং বৃদ্ধ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ইত্যাদি এই সমস্ত সত্যবাবুকে বলিয়াছিলেন? এবং এই রকম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যে বাদীকে দেখেছেন প্রত্যেক বারেই তা কি সত্যবাবুকে বলেছিলেন? উ—প্রথমবার বলেছি। অন্যান্য বারও বলেছি তবে কোনবার বলেছি না বলেছি তা মনে নাই। প্র—মনে করুন কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার আপনার ভাইয়ের নামে আপনার নিকট কোন একটা অভিযোগ করিলেন, আপনি অনুমানের পর জানিলেন যে আপনার ভাই নির্দ্দোষ—তখন আপনি ম্যানেজারকে লিখলেন, "আপনার অভিযোগ মিথ্যা" আপনি খোলা তদন্ত করুন। উ—আমি বলব আমার দাদা নির্দ্দোষ। প্র—কেউ যদি পুলিশকে খবর দেয় যে আপনার বাড়ীতে এনার্কিষ্ট আছে কিন্তু আপনি জানেন উহা মিথ্যা এবং পুলিশকে আপনি খোলা তদন্তের জন্য লেখেন, তখন আপনি এই বিশ্বাসের উপর লিখবেন না যে আপনার বাড়ীতে আনার্কিষ্ট নাই। (কোর্ট বলেন—এই প্রশ্নে কোন পয়েণ্ট আছে বলে মনে হয় না)। উ—আমি শুধু পুলিশকে বলব তদন্ত করতে, পুলিশ তার কর্ত্তব্য করবে। প্র—আপনি কি জানেন বাদীকে আত্মপরিচয় দেবার পর নিডহ্যাম সাহেব কলেক্টরের নিকট একটা যথাযথ তদন্তের জন্য লিখেছিলেন?—হাঁ। প্র—এই তদন্ত চাওয়ার ভিতর কোন বদমতলব ছিল কি? উ—না বদ মতলব থাকবে কেন, নিডহাম সাহেব সত্য নির্দ্ধারণের জন্যই তদন্ত চেয়েছিলেন। প্র—আপনি কি জানেন যে সত্যভামা দেবী কালেক্টর সাহেবের নিকট এই বলিয়া এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন "আমি এবং অন্যান্য আত্মীয়বর্গ রমেন্দ্র বলিয়া চিনতে পেরেছি—আপনি একটা তদন্ত করুন।" উ—অপর পক্ষ একটা দরখাস্ত করেছিল আমি জানি। রাণী সত্যভামা দেবীর সই ছিল কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিয়া সই করিয়াছিলেন কিনা জানি না। আপনি কি বলতে চান সত্যভামা দেবী যে অনুসন্ধানের জন্য কালেক্টর সাহেবকে লিখিয়াছিলেন

ইহাতে কি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যাতে অনুসন্ধান না হয়? উ—আমি বলতে পারব না। প্র—এপ্রকার যখন এন্‌কুয়ারীর জন্য কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল তখন কি তাদের বিশ্বাস ছিলনা যে এই মেজকুমার? উ—আমি কি করে বলব। প্র—আপনি কি ঐ দরখাস্তটা দেখতে চান? না। প্র—সত্যভামাদেবী দরখাস্তে কালেক্টরের নিকট লিখিয়াছিলেন—আমি চিনেছি এই মেজকুমার, অন্যান্য আত্মীয়েরাও চিনেছে, এখন আপনি একটা তদন্ত করুন? উ—এথেকে কি করে বুঝা যাবে যে প্রকৃতই বাদীকে কুমার বলিয়া বিশ্বাস করিত কিনা।

আপনি কি জজ সাহেবকে বলতে চান সত্যভামা দেবী ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়েরা উপরোক্ত দরখাস্ত উপরোক্ত কারণে কালেক্টর সাহেবের নিকট করিবার সময় তাঁদের এই বিশ্বাস ছিল না যে ইনিই কুমার রমেন্দ্র? উ—তাঁদের কি বিশ্বাস ছিল কি না ছিল আমি কি করে বলবো। প্র—আপনি ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় নামে কোন ভদ্রলোককে জানেন? উ—মনে পড়েনা প্র—দার্জ্জিলিংএর ব্যাপারের পর কখনও কাশীতে গিয়াছিলেন? উ—হাঁ। অনেকবার। প্রথমবার ১৩১৮ সনে কাশীতে বাঙ্গালীটোলা ভাওয়াল রাজের যে বাড়ী আছে সেখানে ছিলাম। প্র—আপনি সেবার কাশীতে কতদিন ছিলেন? উ—৩।৪ সপ্তাহ হইবে। প্র—তারপর দেশে ফিরে এসেছিলেন উ—অন্যান্য তীর্থস্থানেও গিয়াছিলাম, আমার মা, ভাই, ভায়ের স্ত্রী, আমলা কর্ম্মচারী, ঠাকুর চাকরও সঙ্গে গিয়াছিল, মনমোহন ভট্টাচার্য্য ও গিয়াছিল। তীর্থ পর্য্যটনে ২॥ মাস ঘুরিয়া ছিলাম। প্র—তীর্থ পর্য্যটনে একবারই গিয়াছেন না আরও গিয়াছেন? উ—আরও গিয়াছি। প্র—কোনবার আশু ডাক্তার সঙ্গী হইয়াছিলেন? উ—না, ৪।৫ বার তীর্থে গিয়াছি, বাদী আসবার পরও ২।১ বার গিয়াছি। প্র—কাশীতে সর্ব্বশুদ্ধ কতবার গিয়াছেন? উ—৪।৫ বার। প্র—দ্বিতীয়বার কাশীতে কোথায় ছিলেন? উ—মিশ্রীপোকরায় ছিলাম। প্র—সঙ্গে কে কে গিয়াছিলেন? উ—আমার ভাইয়ের স্ত্রী, ভাইপো, কাকা সঙ্গে গিয়াছিলেন। প্র—তার পরের বার? উ—পরের বার ২৭ সনে গিয়াছিলাম। সেবার রামাপুরায় ছিলাম। প্র—সেবার কতদিন ছিলেন? উ—মাস দুই ছিলাম। সেবারও আমার ভাইয়ের পরিবারের সবাই গিয়াছিল, আমার মামা সূর্য্যনারায়ণ বাবুর স্ত্রী অশ্রুমণি দেবীও গিয়াছিলেন। তিনি এখনও বেঁচে আছেন। প্র—কোন বছর? উ—১৩২৩

সালে, যতদূর মনে হয় কার্ত্তিক মাসে, তখন আমরা ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ী গিয়েছি। দ্বিতীয় বার আমার ছোট বোন, ভাই চাকর সঙ্গে ছিল। প্র—তৃতীয় বার কোথায় ছিলেন? উ—মিশ্রীপোকড়ায় ২৪ সালে। প্র—কতদিন ছিলেন? উ—সেবার বেনারস থেকে অন্যান্য জায়গায়ও গিয়াছিলাম। মোটামোট ২॥• মাস ছিলাম। প্র—তার পরের বার? উ—আব বোধহয় যাই নাই। ঠিক মনে নাই। প্র—আপনি বলতে পারেন কাশীতে যতবার গিয়াছেন কখনও কোন ধাত্রী কিম্বা লেডি ডাক্তারকে দেখাইতে হইয়াছিল? উ—কখনও না। প্র—সত্যভামা দেবীকে যে অন্য লোকেরা বাদী সম্বন্ধে ঐসব কাজ করিয়েছিলেন যা কালকে বলেছেন—বলতে পারেন সে অন্য লোক কারা? উ—হাঁ, আমার ননদ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও ভাগ্নেরা। বড় ননদের ছেলেরাও। প্র—কালকে আমাকে আপনি বলেছেন—তারা যে চিঠি পাঠাইয়াছিল তাতে বাদীকে "কুমার" বলে বিশ্বাস তারা করছেন কি করেন নাই—তা আপনি বলতে পারেন না—আমাকে এও কি বিশ্বাস করতে হবে যে যদি ঐ ব্যক্তিরা যাঁহারা কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা ভুল করিয়াছেন? উ—যে আসল কুমারকে যথার্থ চিনত সে কখনও এরূপ বলত না। প্র—কালকে আপনি যা বলেছেন আজ কি অন্য রকম বলতে চান? —না। আপনি সত্যভামা দেবীর সম্বন্ধে যা যা বলেছেন—তা কি আজও বলেছেন? হাঁ। প্র—আপনি জানেন কি সত্যভামা দেবী কুমারকে মেনে নিয়েছেন, আর বিপক্ষ পক্ষের লোকেরা এই কথা তুলেছিল যে তাঁর কোন জ্ঞান বুদ্ধি ছিল না ও দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল—একথা শুনেছেন কি? উ—হাঁ শুনেছি এবং আমিও জানি। তার নিজের মত প্রকাশ করবার ক্ষমতা তখন ছিল না। প্র—আপনি ১৪-১৫ বৎসর তাঁর কাছে ছিলেন না—আপনি নিশ্চয়ই লোক মারফত এসব শুনেছেন? উ—হাঁ আমি জয়দেবপুরের লোকের কাছ থেকে শুনেছি। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও ছোটরাণীর কাছ থেকেও শুনেছি। কোর্টের প্রশ্নে বলেন—হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জয়দেবপুরের ভগীবাবু ও চাকর বাকরদের কাছ থেকে শুনেছি, আর নাম মনে নাই। প্র—হরেন্দ্রবাবু কি মারা গেছেন? প্র—আপনি কি আজ পর্য্যন্ত একথা জানেন সত্যভামা দেবী ড্রামণ্ড সাহেবের নিকট চিঠি লিখিয়াছিলেন আপনার স্ত্রীকে পাঠাইয়া পরীক্ষা করুন আমার দৃষ্টি-শক্তি কেমন?" উ—আমি ত আজ পর্য্যন্ত তা শুনি নাই। প্র—সত্যভামা দেবী যে ড্রামণ্ড সাহেবকে লিখে

জানাইয়া ছিলেন বাদীই আমার দ্বিতীয় পৌত্র রমেন্দ্র এ কথা জানেন ?" উ—দরখাস্তের কথা শুনেছি—চিঠির কথা শুনি নাই। প্র—সত্যভামা দেবী যে ড্রামণ্ড সাহেবের নিকট একখানা চিঠি লিখিয়াচেন, আমি আজ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে আছি, এই আমার দ্বিতীয় পৌত্র কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ"—একথা শুনেছেন কি ? উ—শুনেছি বলে মনে হয় না। কোর্টের প্রশ্নের উত্তরে বলেন—প্রকাশ্যে তদন্ত করার জন্য যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন সেই দরখাস্তের কথা জানি, চিঠির কথা জানি না। প্র—আপনি যদি সত্যভামা দেবীর অবস্থায় থাকিতেন এবং সত্য সত্যই আপনার দৃষ্টীশক্তি থাকত তাহলে আপনি কি কালেক্টারের স্ত্রীকে দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করিতে আহ্বান করিতেন ? উ—আমি যদি সত্যভামা দেবী হইতাম তাহলে আগে কুমারের স্ত্রীর নিকট জানিয়া লইতাম। প্র—আপনার কি উচিত ছিলনা সত্যভামা দেবীর নিকট আসা ? না। প্র—তাঁর উচিত ছিল আপনার নিকট যাওয়া ? উ—সত্যভামা দেবীর যদি জ্ঞান বুদ্ধি থাকত তাহলে তাঁর উচিত ছিল আমাকে লেখা যে এই জনরব শুনছি তুমি এসে দেখ।" প্র—আপনি এই চিঠি পাইলে যাইতেন কি ? উ—নিজে যাইতাম না, তাঁর সন্দেহ চিঠি লিখেই হউক কি অন্য যে ভাবেই হউক সন্দেহ ভঞ্জন করতাম। যদি দরকার হত ঢাকায় আসতাম কিন্তু বাদীকে দেখতে যেতাম না। প্র—সত্যভামা দেবী যদি বলতেন, এস তুমি-আমি দেখি তাতেও আপনি রাজি হতেন না ? উ—নিশ্চয়ই না। আমি বুঝিয়ে দিতুম যে তাঁর ভুল হচ্ছে। প্র—সত্যভামা দেবীর দৃষ্টীশক্তি আছে বলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে যে লিখেছিলেন যে তাঁর স্ত্রী এসে পরীক্ষা করুন এটা অসঙ্গত কাজ করেছিলেন ? উ—আমি তা জানিনা। সত্যভামা দেবী সম্বন্ধে এই উক্তি যদি সত্য হয় তাহলে মিথ্যাটা যাতে নষ্ট হয় তার জন্য কিছু করা দরকার হত এটাত বুঝিতে পাচ্ছেন ? যদি কেউ বলে আপনার দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে সেই জন্য বাদীকে চিনতে পাচ্ছেন না, এই গুজব না রটে তার জন্য কিছু করতেন নাকি ? উ—আমি বলতাম দৃষ্টিশক্তি আছে।

প্র—আপনি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কোন কর্ম্মচারীকে একথা বলতেন নাকি ? উ—যদি এই রকম মিথ্যা উক্তি উঠত তা হলে আমি বলতাম আমার চক্ষু ভাল আছে। প্র—যদি কলেক্টর সাহেব বলতেন মেজরাণীর চক্ষু ভাল না, আপনি এই কথা লিখিলে অসঙ্গত হইত যে আপনার স্ত্রী এসে চক্ষু পরীক্ষা করে যাক ? উ—তিনি লিখলে হয়ত লিখতাম। প্র—আপনি

বলতে চান সত্যভামা দেবী যদি এরূপ লিখে থাকেন যাঁরা তার পেছনে আছেন তারাই তো করিয়েছেন? উ—হাঁ। প্র—আপনি কি এই কথা বলিতে চান যে সত্যভামা দেবী যদি বাদীকে কুমার বলিয়া চিনে থাকেন তবে তা অসাধু মতলবে করিয়াছিলেন? উ—আমি তো বলিতে চাইনা তবে তখন তার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। তিনি কখন কখন সন্দেহ প্রকাশ করতেন কিন্তু ঐসব লোক তাঁকে অন্যরূপ বোঝাত। প্র—তাহলে আপনার কথা এই যদি সত্যভামাদেবীর বুদ্ধিশুদ্ধি থাকত ও দৃষ্টিশক্তি থাকত তাহলে তিনি বাদীকে কুমার বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতেন না। উ—যদি তার জ্ঞানশক্তি থাকত তাহলে কিছুতেই বাদীকে কুমার বলে স্বীকার করতেন না। প্র—তাহলে আপনি নিশ্চয়ই বলছেন না যে সত্যভামা দেবী মিথ্যা শঠতা করে বাদীকে কুমার বলে নিয়েছেন? না।

প্র—আপনি বলেছেন বুদ্ধ বাদীকে নিয়ে ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে গিয়েছিল—আচ্ছা, আপনি প্রথম দিন কি করে জানলেন যে এই বাদী উ—আমি মাথায় লম্বা চুল দেখে চিনে নিলাম। প্র—যদি বুদ্ধ ছাড়া আর কেউ সঙ্গে থাকত তাহলে কি বাদী বলে চিনতে পারতেন? না। যদি বুদ্ধ না থাকত তাহলে বাদী বলে চিনতে পারতাম না। তখন বুঝতাম একজন লম্বা চুলওয়ালা লোক। প্র—আপনি কি এই কথা বলতে চান বুদ্ধ নিয়া গিয়া আপনার বাড়ীর কাছে আপনাকে দেখাল তখন বুদ্ধর মনোভাব ছিল কি যে বাদী কুমার নয়? উ—বুদ্ধ নিশ্চয়ই জানত যে বাদী কুমার নয়। প্র—আপনি আজ পর্য্যন্ত এই কথা জানেন বাদীর আত্ম পরিচয় দেবার কয়েকদিন পরে গোবিন্দবাবু জ্যোতির্ম্ময় দেবী—তড়িন্ময়ী দেবী কালেক্টর সাহেবের কাছে এক দরখাস্ত করেছিলেন আমরা বাদীকে মেজকুমার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি আপনারা গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে একটা খোলা তদন্ত করুন। উ—বাদী আসার কিছুদিন পরে কালেক্টরের নিকট এক দরখাস্ত হইয়াছিল—কিন্তু কে কে দরখাস্ত করিছিলে জানিনা। প্র—আপনি কি বলতে চান যখন তারা এই দরখাস্ত করলেন তখন তাঁরা পূর্ণভাবে জানতেন যে বাদী কুমার নয়?—আমার তো তাই বিশ্বাস। প্র—আপনার স্বামীর মাথায় অনেক চুল ছিল কি? উ—দস্তুর মত চুল ছিল। প্র—আপনি কি বলিতে চান আপনার স্বামীর মাথায় চুলের ভিতর হাত দিয়ে দেখেছেন যে তাঁর মাথার কোনও উচু আছে না নীচু আছে? উ—আমি খুঁজে কখনও দেখিনি,

আমি তাঁর মাথায় হাত বুলাইয়াছি। আমার শাশুড়ী যখন মারা যান তখন তাঁর চুল কামানো মাথা দেখিয়াছি—কিন্তু কখনও তাঁর মাথায় উচুনীচু দেখি নাই। প্র—আপনি কি কখনও আপনার স্বামীর দাঁত একটা একটা করে পরীক্ষা করে দেখেছেন? উ—ধরে দেখবার দরকার হয় নাই। প্র—আপনি কি হলপ করে বলতে চান যে ছোটকুমারের বিয়ের সময় মেজকুমার খুড়াইয়া হাঁটিতেন না? উ—আমারত মনে পড়ে না। আমার যতদূর মনে হয় মেজকুমার খুঁড়িয়ে হাটতেন না। প্র—আপনি কি জজসাহেবের কাছে হলপ করে বলতে পারেন—মেজকুমার ছোটকুমারের বিয়ের সময় খুড়িয়ে হাটতেন না? উ—আমার যখন মনে নাই আমি হলপ বলতে পারিনা। প্র—আপনি কি স্মরণ করে বলতে পারেন আপনার স্বামীর বাঘের বাচ্চা ছিল কি ছিলনা? উ—আমার বিয়ের আগে ছিল কিনা জানিনা, তবে আমার বিয়ের পর আমি দেখি নাই। প্র—আপনি কি কখনও আপনার স্বামীর দেহ আপাদমস্তক পরীক্ষা করে দেখেছেন? উ—পরীক্ষা করে কখনও দেখি নাই। প্র—আপনি কি বলতে চান, কোন সময়ে আপনি আপনার স্বামীর কোমর পাতি পাতি করে দেখেছেন? উ—পরীক্ষা হিসাবে দেখি নাই তবে এমনি চোখে যা দেখেছি। প্র—আমি কি ধরে নিতে পারি যে সিফিলিস সম্বন্ধে আপনার স্বামীর সঙ্গে আপনি আলাপ করেছেন? উ—এই বিষয় জিজ্ঞাসা না করাই ভাল। (এই সময় মিঃ চ্যাটার্জ্জি ইন্দুময়ী দেবীর ও ও বিবাদিনীর একত্রে একখানা ফটো বিবাদিনীকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করেন) এটায় দেখা যাচ্ছে কি না ইন্দুময়ী দেবীর ডানদিকে নীচের ঠোঁটটা একটু বাকা আছে? উ—হতে পারে, বুঝতে পারছি না। প্র—আপনি কি কখনও আপনার স্বামীর ঠোঁট পরীক্ষা করে দেখেছেন? উ—আমার যতদূর দেখবার সম্ভব দেখেছি। প্র—আপনার স্বামীর উপরের ঠোঁট নীচের ঠোঁটে লাইন টানলে কোন্ যায়গায় মিশবে পরীক্ষা করে দেখেছেন কি? উ—আমি তো লাইন টেনে দেখি নাই। (হাস্য) (এই সময় মিঃ চাটার্জ্জি কোর্ট রুমের ছোট কুমারের ফটোখানা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করেন) আপনি কি ছোট কুমারের ফটোখানা ওখান থেকে ভাল করে দেখেছেন?—না। প্র—আপনি কি মেজকুমারের গলার কন্ঠি ও হাড়টা ভাল করে দেখেছেন? উ—যখন তিনি রোগা ছিলেন তখন দেখা যেত, তারপর আর দেখা যেতনা। প্র—আপনি কি আপনার স্বামীর কোন হাতের মধ্যমা ও তর্জ্জনী পাশাপাশি রেখে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেছেন?

উ—আমি ঠিক করে বলতে পারবনা দেখেছি কি না। প্র—ছোট কুমারের এনলার্জ্জ করা ফটোটার অরিজিন্যাল কোন ফটো আছে ?—হাঁ। প্র—আপনি যে বলেছেন মেজকুমারের কান দস্তুর মত ছিল এটা কি পরীক্ষা করে দেখে-ছেন ? উ -পরীক্ষা করিনি তবে সর্ব্বদা দেখছি। (এই সময় ছোট কুমারের একখান ছোট ফটো বিবাদিনাকে দেখাইয়া প্রশ্ন করা হয়) আপদি যদি উপরের ঠোট থেকে নীচের ঠোঁটে একটা লাইনে টানেন তাহলে দেখবেন যে একটু বাঁকা। উ—আমি ফটো সম্বন্ধে ভাল বলতে পারি না।

প্র—কেউ যদি একথা বলে মেজ কুমারের রং ধবধবে সাদা, তার সঙ্গে ঈষৎ একটু লালাভ ছিল, এই কথাটা সত্য হবে না মিথ্যা হবে? উ—ঠিক হবে না। প্র—কেউ যদি বলে বাদীর রং মেজকুমারের রং এ পার্থক্য নাই। একথা মেনে নিবেন ?—না। প্র—কেউ যাদ বলে মেজ কুমার দেখতে বাদীর মত মোটা একথা কি মেনে নিবেন ?—না। প্র—মেজ কুমার ছোট কুমারের ভিতর কে মোটা ছিল ? উ—ছোট কুমার। প্র—কেউ যদি বলে বাদী এবং মধ্যম কুমার বলে মেনে নেওয়া যাইতে পারে না এ কথা ঠিক কি না ?—না। প্র—কেউ যদি বলে দুটী দেখতে যেন যমজ ভাই একথা কি আপনি মানবেন ? উ—কিছুতেই না। প্র—কেউ যদি বলে বাদীকে দেখে মেজকুমারের মুখ মনে পড়ে একথা আপনি মানবেন না ? উ-না। প্র—আপনি কি বলছেন এই দুজনের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই। উ—না—আমি কোন সাদৃশ্য দেখি না। প্র—কোন ভদ্রলোক যদি বলে এই দুজনের ভেতর বিশেষ সাদৃশ্য আছে আপনি সেটা একেবারে অন্যায় বলবেন ? উ—আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। প্র—কেউ যদি বলে বাদীর সঙ্গে মেজকুমারের সাদৃশ্য আছে—আপনি কি বলবেন ? উ—আমি বলব—সাদৃশ্য কিছুই নাই। প্র—আপনি বলেছেন মেজকুমারের নাকটি টিকোলা ছিল—যদি ফটোগ্রাফে দেখা যায় তার নাক টীকোলা নয় তবে আপনার স্মৃতিই ঠিক, ফটোগ্রাফই ভুল ? প্র—কিছুতেই হইতে পারে না ফটোগ্রাফই ভুল। প্র—এমন ফটো নিশ্চয়ই ভুল হবে ? উ—তা হতে পারে। প্র—মেজকুমারের চুল কি ঢেউ খেলানো ছিল ? হাঁ। প্র—আপনাকে চোখের রংএর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে ?—না। প্র—জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর রং কি রকম বলতে পারেন ? একটু হলদে ভাব দেখেছেন ? উ—আমি তাঁর চোখ হলদে ভাবের দেখেছি। প্র—ছোটকুমারের চোখ কি রকম ছিল ? উ—ব্লু (নীল)

প্র—কি রকম ব্লু বলবেন ফিকা—না গাঢ়? উ—চোখের রং খুব গাঢ় ব্লু ছিল। প্র—তড়িন্ময়ী দেবীর চোখের রং কি রকম ছিল? উ—ফিকে ব্লু ছিল। প্র—তড়িন্ময়ী দেবীর চোখের রং কি রকম? উ—তাড়ন্ময়ী দেবীর চোখ একবারে কালো লালচে-হলদে। প্র—আপনি কি বলেছেন যে চোখের রংএর যে বর্ণনা আপনি দিলেন তা ভুল হইতে পারে না?—না। প্র—মেজকুমারকে খালি গায়ে বেশী দেখেছেন কি? উ—দেখেছি বৈ কি! প্র—তিনি যখন কামাতেন আপনার সাম্‌নে কামাতেন? উ—নীচে কামাতেন আমি সাম্‌নে থাকতাম না। প্র—নীচেই তিনি সময়টা বেশী কাটাতেন? উ—বৈঠকখানা নীচে ছিল কাজেই বেশীর ভাগ সময় বৈঠকখানাতেই কাটাইতেন, তবে তিনি বাড়ীর সর্ব্বত্রই যাওয়া আসা করতেন। প্র—আপনার বোন আপনাকে এক রকম চিঠি লিখোছলেম কিনা মনে পড়ে 'তোমার স্বামী যদি নীচেই শোয় তুমিও নীচেই শুইও'। হাঁ। প্র—মায়ার সাহেবকে কখনও দেখেছেন? উ—হাঁ, শাশুড়ীর কাছে অন্দর মহলে এসেছেন তাই দেখেছি। আপনার শাশুড়ীর মায়ার সাহেবের সঙ্গে কি রকম বনিবনা হইত? উ—তা আমি কেমন করে বল্‌ব, আমি জানি না। প্র—আপনি কি এই সম্বন্ধে কিছুই জানেন না? উ—আমার তো কিছুই মনে পড়ে না। প্র—র‍্যাঙ্কিন সাহেব রাজবাড়া যখন দখল নিয়াছিলেন তখন আপনি কোথায় ছিলেন? উ—জয়দেবপুর। প্র—সেই দিনের ঘটনা কিছু মনে আছে? উ—কোন্ ব্যাপার বলুন! সেই দিন সোনার জিনিষ পত্র সরিয়ে রাখা হয়েছিল। প্র—শাশুড়ীর সেদিনের অবস্থা মনে আছে? উ—শাশুড়ী কাগজ পত্র পুড়িয়ে ছিলেন। তার মেজাজ খারাপ ছিল—তিনি কান্নাকাটী করেছিলেন। প্র—শাশুড়ী আর কিছু অন্যায় কাজ করেছেন মনে পড়ে? উ—কি অন্যায় কাজ বুঝতে পাচ্ছি না। প্র—শাশুড়ীর যে কাগজ পোড়ানর কথা বল্‌ছেন, সেটা কি তাঁর ভাল কাজ না মন্দ কাজ বলছেন? উ—আমি কি করে বল্‌ব ভাল কি মন্দ? প্র—দরকার পড়লে আপনিও কাগজ পোড়াতেন? হাঁ। শাশুড়ী অজ্ঞান হন্‌নি কান্নাকাটি করছেন। প্র—কখন কান্নাকাটী করলেন? উ—আমার মনে হয় যেদিন সাহেব এসেছিলেন, সেদিন বিকালবেলা শাশুড়ী কান্নাকাটী করেছিলেন—অনেক দিনের কথা, ভাল মনে নেই। প্র—কোন্ সময় ম্যাজিষ্ট্রেট দখল নিয়েছিলেন মনে আছে? উ—না। প্র—যেদিন মায়ার সাহেব এসে'ছলেন মনে পড়ে? উ—না। মায়ার সাহেব আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন জানেন?

উ—শুনেছি। প্র—মায়ার সাহেব কি রকম লোক বলিয়া মনে হয়? উ—আমার ব্যক্তিগত কোন ধারণা নাই। প্র—আপনার স্বামীর সঙ্গে কি রকম ভাবছিল? উ—আমি জানি না। প্র—আপনার বিয়ের পর যখন এলেন তখন কে ম্যানেজার ছিলেন? উ—সুরেন্দ্র মতিলাল। হোয়ার্টন সাহেবকে দেখেছি। আন্দাজ আমার বিয়ের পর ৭৷৮ মাস ছিল।

প্র—গোবিন্দবাবু কি সৎলোক ছিলেন না? উ-আমি তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতাম না। তবে যতদূর জানতাম তিনি সৎলোকই ছিলেন। প্র—জ্যোতির্ম্ময়ীর চুলের রং কি রকম ছিল? উ—চুলের রং লাল্‌চে ছিল। প্র—মেজোকুমারের মত নয় কি? উ—কতকটা এক-রকমই। প্র—মেজ কুমারের হাত পায়ের গড়ন কি রকম? উ—ছোট ছোট। আমার শাশুড়ীর হাত পায়ের গড়নও ছোট ছিল। কৃপাময়ীর দেবীর পাও বড় ছিল না। প্র—আপনি নিশ্চয়ই কৃপাময়ী দেবীকে প্রণাম করেছেন? উ—হাঁ। প্র—তাঁর পায়ের চামড়া কোমল ছিল না খসখসে ছিল? উ—আমি লক্ষ্য করিনি যে চামড়া কি রকম ছিল। প্র—আপনি জানেন র‍্যাঙ্কিন সাহেব আপনার দিকে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন?—তাঁর বাবদ কত টাকা খরচ গিয়াছিল? উ—হাঁ, শুনেছি। আমি বলতে পারব না। ম্যানেজার জানে। প্র—র‍্যাঙ্কিন সাহেব স্বীকার করেছেন মেজকুমারের সঙ্গে বাদীর সাদৃশ্য আছে যারা বলেছেন তারা মিথ্যা কথা বলেন নি, আপনি কি তাঁহাদের উক্তি মিথ্যা বলবেন? যাঁরা সাক্ষ্য দিতে বলেছেন বাদীর সঙ্গে মেজ কুমারের বিশেষ সাদৃশ্য আছে তারা মিথ্যা কথা বলেছেন বলতে চান? উ—মিথ্যা নয় ভুল বলেছেন। প্র—আপনি এই কথা বলতে চান ঐ ভদ্রলোকের মেজ কুমারের মুখ ভুলে গেছেন, কিন্তু কোর্টে আসিয়া মিথ্যা কথা বলেছেন? উ—কে কি মনে করিয়া বলেছেন কি করিয়া বলিব! হয়ত তারা ভুল করেছেন, না হয় শুনে শুনে তাঁদের একটা ভুল ধারণা হয়েছে। প্র—বড়কুমার, মেজ কুমার ও ছোট কুমার এই তিনের ভিতর কে বেশী লেখা পড়া জানতেন? উ—বড়কুমার। তবে তিনের ভিতর খুব বেশী তফাৎ ছিল না। প্র—আপনি বড়কুমারকে ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা বলতে শুনেছেন? উ—হাঁ। প্র—কি রকম লোকের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা বলতে শুনেছেন? উ—সাহেব সুবাদের সঙ্গে আলাপ করতে শুনেছি। প্র—আমি কি এই বুঝব যে বড়কুমার ও মেজ কুমার দরকার হলে ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা চালাইতে পারতেন? উ—হাঁ, প্র—

এটা বুঝা যাচ্ছে যে বড়কুমার ও মেজকুমার দরকার হইলে বাংলাও বলতে পারতেন? উ—সর্ব্বদা বাংলাই বলতেন, কিন্তু কখনও বাংলার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করতেন। প্র—আপনি নিজের কানে বড়কুমার ও মেজকুমারকে প্রয়োজন হইলে সাহেবদের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা বলতে শুনেছেন? উ—হাঁ। প্র—আপনার কথাতে এই বুঝা যাচ্ছে যে তারা ইংরেজীতে সব কথা বুঝতে পারতেন? হাঁ আমি কোন অসুবিধা লক্ষ্য করি নাই। কোর্ট প্রশ্ন করেন—হোয়ার্টন সাহেব কি খুড়িয়ে চলতেন? উ—বোধ হয় একটু খুড়িয়ে চলত। প্র—আপনার স্বামীকে কি রেল ষ্টীমারে ইংরাজীতে অনর্গল কথা বলতে শুনেছেন? উ—সর্ব্বদা শুনি নাই, তবে কখনো শুনেছি। প্র—জয়দেবপুরে যে সব সাহেব দেখা করতে আসত তারা কি রাজবাড়ীর অন্দরমহলে আসত? না। প্র—আপনি জানেন কি মেমসাহেবের ইংরাজী বুঝা আমাদের পক্ষেও একটু শক্ত? উ—আমি তো বুঝতে পারি না কি করে বলব। প্র—যদি মেম সাহেবরা আপনার শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করতে আসত আপনারা কাছে থাকতেন কি? উ—হাঁ, কুমারেরা ভেতরে এসে পরিচয় করিয়ে দিতেন। প্র—আপনি কোন সাহেবের সঙ্গে আপনার স্বামীকে অনর্গল ইংরাজীতে কথা বলতেন শুনেছেন? উ—আমি অনর্গল কথা বলতে শুনি নি ২।১ টা কথা বলতে শুনেছি। তিন মিনিট কালও হইতে পারে। প্র—এটা সত্যি কি দার্জ্জিলিং এর দুর্ঘটনার পর আপনি নূতন করে লেখাপড়া শিখেছিলেন?—না। প্র—আপনি যেরূপ সুন্দর করে ইংরাজী শব্দ উচ্চারণ করছেন—বড় কুমার কি এই রকম সুন্দর করে ইংরাজী বলতে পারতেন? উ—নিশ্চয়ই। কোর্ট প্রশ্ন করেন আপনি প্রথম যখন জয়দেবপুর এলেন তখন ওদের কথা বুঝতে পারতেন? উ—হাঁ। প্র—আপনার বিয়ের সময় থেকে এখন কি বেশী শিক্ষিতা নন? উ—না, লেখাপড়ার দিক থেকে বেশী নই, তবে বয়সের অনুপাতে যদি ধরেন, তাহলে বেশী। প্র—মেজকুমারের হাতের লেখা কি আপনার চেয়ে ভাল ছিল? উ—খারাপ ছিল না কিন্তু ভাল ছিলও বলতে পারি না। প্র—এই কথা কি আপনি হিন্দু পত্নী হিসাবে বলছেন? উ—না, তাঁর হাতের লেখা আমার চেয়ে খারাপ ছিল না। প্র—আপনারা যে সোমবার দার্জ্জিলিং থেকে চলে এলেন, ষ্টেশনে কিসে চড়ে এসেছিলেন মনে আছে? উ—পাল্কীতে। প্র—এটা সত্যি কিনা পাল্কীতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন? উ—না। প্র—আপনি কি হলপ করে বলতে পারেন

আপনি পাল্কীতে মূর্চ্ছিত হন নাই ? উ—ঠিক যাকে অজ্ঞান বলা হয় তা হই নাই। প্র—তাহলে আপনার কি রকম হয়েছিল ? উ—আমি খুব অধৈর্য্য হয়ে পড়ে ছিলাম। প্র—আপনার ভাই যদি বলেন বিভাবতী পাল্কীতে মূর্চ্ছিত হয়েছিল' তাকি আপনি মেনে নিতে রাজি আছেন ? উ—তিনি কি ভাবে বলেছেন কি করে বলব,—তবে তিনি যদি উহাই ফেইন্টীংফিট (মুর্চ্ছা) মনে করে থাকেন তাহলে বলতে পারেন। প্র—আপনি বল্‌ছেন বাদীর মুখের সঙ্গে আপনার স্বামীর মুখের সাদৃশ্য নাই। তার কারণ আপনি আপনার স্বামীর মুখ ভুলে গেছেন ? উ—তা কি সম্ভবপর ! প্র—সত্যবাবুকে সুপুরুষ বলা যাইতে পারে ? উ—হাঁ। প্র—তাঁর ঠোঁট কি রকম ? উ—পুরু। প্র—তার ভ্রূ মোটা না সরু, সোজা না বাঁকা ? উ—মোটা। সোজা নয় বাঁকা বলা যেতে পারে। প্র—সত্য বাবুর চোখ কি রকম ? উ—বড় এবং ভাষা। প্র—কুমারের ভ্রূ কি কালো, বাঁকা লাইনের মতো যেমন আপনি বলছেন তুলি দিয়ে আঁকা সেটা আপনি বুঝিয়ে দেন। উ—ভ্রূর শেষ দিক্‌টা ও চোখের দিক্‌টা বাঁকা ছিল, কিছুটা ধনুকের মত। প্র—টিকোলো নাকটা কি ? উ—টিকোলো নাক সরু আর উচু হয়—থেতো ও চওড়া হয় না। প্র—সত্য বাবুর নাক টিকোলো না কি ? উ—হাঁ, টিকোলো কিন্তু খানিকটা বড় বেশী। প্র—আপনার ভাইয়ের কোন কান বড় না ছোট ? উ—দস্তুর মত। প্র—সত্যবাবুর গায়ের রং কি রকম ? উ—হলদে ধরণের ফর্সা। (এই সময় A (50) চিহ্নিত কুমারের ফটো বিবাদিনীকে দেখাইয়া মিঃ চাটার্জ্জি জিজ্ঞাসা করেন) ঠোঁট্‌টা কি রকম ? উ—এই ছবির ঠোঁট একটু মোটা দেখা যাচ্ছে। প্র—ঐ ছবির উপরের ঠোঁটটা কি পাতলা দেখ্‌ছেন ? উ—আমি একে মোটা ঠোঁট বলতে পারি না। (কুমারের আর একখানা ফটো দেখাইয়া বলেন)—এই ফটোতে ঠোঁট কি পাতলা দেখ্‌ছেন, না মোটা দেখছেন ? উ—মোটাও বলতে পারি না খুব বেশী পাতলাও বলতে পারি না। প্র—আপনাকে যদি এই ফটো দেখাইয়া কেউ জিজ্ঞাসা করে আপনি পাতলা ঠোঁট বলবেন ? উ—না, মাফিক মত। আমি পাতলাও বলবনা, মোটাও বলবনা, স্বাভাবিক মত বলব। প্র—আপনি কি এই ঠোঁট পাত্‌লা বলবেন ? উ—না পাতলা বলবনা সমান মত বল্‌ব। প্র—আপনি ফটোতে যে কান দেখছেন তাকি ছোট বলবেন ? উ—আমি বড় বলবনা মাফিক মত বলব। (ঐ ফটোর নাক দেখাইয়া মিঃ চাটার্জ্জি বলেন)—ফটোর নাকের ডগা দেখে কি টিকোলো বলবেন ? (এই সময়

কুমারের আর একখানা ফটো দেখাইয়া মিঃ চাটার্জ্জি জিজ্ঞাসা করেন ;—এই খানা কি আপনার স্বামীর ফটো? উ—এই ফটোখানা ঠিক নয়। আর একখানা কুমারের ফটো দেখাইয়া বলেন)—এখানা আপনার স্বামীর ফটো কিনা? উ—হাঁ। প্র—ঐ ফটোর নাককে কি টিকোলো নাক বলবেন? উ—ছবি দেখে ঠিক বুঝছিনা টিকোলো কিনা। প্র—ফটোতে নাক কি রকম দেখাচ্ছে? উ—ফটোতে ভাল উঠে নাই, ছবির নাক টিকোলো তবে খেঁতা নয়। (কুমারের আর একখানি ফটো দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করেন)—এই ফটোর ভ্রূ কি সরু? উ—হাঁ। (অন্য একটী ফটো দেখাইয়া) প্র—আপনি এই ফটোগ্রাফ কি আগে দেখেছেন? উ—না। প্র—দুজনের কাউকে চেনেন? উ—না। প্র—আপনার জবানবন্দীতে কুমারের ভ্রূ চোখ নাক, কান, এক রকম বলেছেন, ফটোতে অন্য অন্য রকম দেখাচ্ছে, তাহলে কি ফটোগ্রাফ ভুল বলবেন? উ—ফটোগ্রাফ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। প্র—আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে দুর্ভাগ্যবশত ২৫।২৬ বৎসর থাকেন নি ঐ ২৫।২৬ বৎসর আপনার ভাইয়ের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকছেন, তাতে এটা কি বোঝা যাচ্ছে না যে আপনার ভাইয়ের মুখ আপনার স্বামীর মুখের স্মৃতি ভুলিয়ে দিয়াছে? উ—এ একটা অস্বাভাবিক কথা বলেছেন। প্র—আপনি জানেন প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বিশেষ ধরণ ধারণ থাকে যা তাদের বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত থাকে? উ—হাঁ। প্র—আপনি বাদীর সঙ্গে কথা বলেন নি কিম্বা তাকে কারো সঙ্গে বলতে শোনেনও নি? উ—না। প্র—লোককে গলার আওয়াজে চিনা যায়—ঠিক কি? উ—হাঁ। প্র—আপনার জবানবন্দী যেদিন আরম্ভ হইল, যেদিন এখানে বাদীকে দেখলেন—তখন তার নাকটা টিকোলো কিনা—মুখ, ঠোট, কান, ভ্রূ এইগুলি ঠিক করে দেখেছিলেন মেজকুমারের মত কিনা? উ—আমি মুখ ভাল করে দেখেছিলাম। আর আর সমস্তও দেখেছি। আমি এই লোকটা কিরকম তাই দেখেছি।—মেজকুমারের মত কিনা তা দেখি নাই। প্র—আপনি কি বিবেচনা করে বলতে পারেন যদি আপনার স্বামী এতদিন জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর গায়ের রং কি রকম হত? উ—বেঁচে থাকলে ফর্সাই থাকতেন। প্র—আপনার গায়ের রং বিয়ের সময় যেমন ছিল সে রকমই আছে না পরিবর্ত্তন হয়েছে? উ—বলতে পারিনা। প্র—আপনি কি জজসাহেবকে বলতে চান আপনার বিয়ের সময় যে রকম রং ছিল এখনও সেই রকম আছে? উ—পূর্ব্ববঙ্গে এসে আমার গায়ের রং ময়লা হয়ে গেছে। (কোর্ট বলেন—পশ্চিম

বঙ্গের লোকের সাধারণ ধারণাই এই রকম!) প্র—বিয়ের সময় যে রকম রং ছিল এখন কি সেইরকম রং আছে? উ—আমি লক্ষ্য করে দেখি নি। (A 50 চিহ্নিত ফটোটি আবার দেখাইয়া মিঃ চাটার্জ্জি বলেন)—উপরের ঠোঁটের মধ্য দিয়া নীচের ঠোঁটের দিকে যদি একটা লাইন টানা যায় তবে এটা বাহিরের দিকে থাকে? উ—আমি বলতে পারি না। প্র—আপনি শুনেছেন আপনার স্বামীর নীচের ঠোঁট ডান দিকে একটু বাঁকা ছিল? উ—আমি দেখিও নি, শুনিও নি। প্র—আপনার শ্বশুরের পরিবারের আর কারও ঐরকম ছিল? উ—হাঁ আমার ভাসুরের ছিল তবে তার বাঁদিকে বাঁকা ছিল। ডান দিকে বাঁকা কারও ছিল না। প্র—আপনি আজ পর্য্যন্ত শুনেছেন বাদীর ঠোঁট ডান দিকে বাঁকা? উ—না। প্র—আপনার স্বামীর কানের লতিটা আল্‌গা ছিল কিনা? উ—একথা ঠিক নয়, তবে একটু ফাঁক ছিল। (কুমারের ফটো দেখাইলেও বিবাদিনী বলেন) ঐ রকমই ফাঁক ছিল। প্র—আপনার স্বামীর এই ফটো কত বয়সের তোলা বলতে পারেন? উ—১৮।২০ বৎসর বয়সের আমার মনে হয়। প্র—আপনি কি পরীক্ষা করে কখনও দেখেছেন ২০ বৎসর পরে যেমন ছিল ৩০ বৎসর পরেও সেই রকম আছে? উ—হাঁ আমার ভাইয়ের আমি তাই দেখছি। প্র—আপনি আপনার ভাইয়ের কান দেখে আসছেন কিন্তু পরীক্ষা করে দেখেন নি? উ—আমি লক্ষ্য করিনি, তবে রোজই দেখছি একভাবেই আছে। প্র—আপনার ভাইয়ের মুখ ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যা দেখেছেন, এখনও সেই রকম দেখেছেন? উ—মুখের আদল বদলায়নি। একেবারে চিরযৌবন থাকা অসম্ভব। মুখের চামড়া একটু ঢিলা হয়েছে, বয়সের সঙ্গে সাধারণ যে রকম পরিবর্ত্তন হয় সেই রকমই হয়েছে। প্র—আপনি আগের চাইতে মোটা হয়েছেন কি? উ—হাঁ। বাদীর শরীরে কতকগুলি চিহ্ন আছে বলিয়া বাদীপক্ষ বলিয়াছেন। মিঃ চৌধুরী কোর্টে সিভিল সার্জ্জন দিয়া এই চিহ্নগুলি পরীক্ষা করাইতে চান। তাহাতে মিঃ চ্যাটার্জ্জি বলেন যে বাদী বর্ত্তমানে অসুস্থ। ১৫ দিনের পূর্ব্বে তাঁহাকে পরীক্ষা করান সম্ভব হইবে না। চিহ্নগুলি নীচে দেওয়া গেল—১। মাথায় ফোড়ার দাগ, ২। জিহ্বার নীচে মাংসপিণ্ড, ৩। সিফিলসের দাগ, ৪। পিঠে ফোড়ার দাগ, ৫। ভাঙ্গা দাঁত, ৬। হাতে বাঘের থাবার চিহ্ন, ৭। পায়ে গাড়ীর চাকার দাগ, ৮। পুরুষাঙ্গে তিল, ৯। বাম্বী অস্ত্র করার দাগ, ১০। জীবনবীমার কাগজে লিখিত চিহ্ন।

প্র—আপনি জানেন বাদী পক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও বিল্লুবাবু সাক্ষ্য দিয়েছেন? উ—হাঁ কাগজে পড়েছি। প্র—মিঃ চৌধুরী যখন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও বিল্লুবাবুকে জেরা করেছেন তখন খোঁজ খবর না নিয়েই জেরা করেন নি? উ—না, সেকথা বলতে চাই না। প্র—জয়দেবপুরে কুমারগণ বিলাতী কায়দায় থাকতেন বলতে চান? উ—একেবারে বিলাতী কায়দায় নয় তবে কতক পরিমাণে। প্র—মেজকুমার কাপড় জামা কোথায় পরতেন? উ—নীচে। প্র—যখন নীচে কাপড় জামা পরতেন তখন আপনি সেখানে কখনও থাকতেন কি? উ—হাঁ। প্র—কাপড় জামার জন্য বেয়ারা ছিল? উ—বেয়ারা কাপড় চোপড় নিয়ে আসত, উনি পরতেন, তবে বেয়ারা জুতোর ফিতে টিতে পরিয়ে দিত। প্র—মেজকুমার ট্রাউজার আপনার উপস্থিতিতে পরেছেন? উ—হাঁ। প্র—প্রর্ব্বদাই কি আপনার উপস্থিতে পরতেন? উ—সব সময়েই থাকতাম না। প্র—উত্তরপাড়ার উপেন মুখাজ্জীর নাম করেছেন, তিনি কি আপনার মোকদ্দমার সাক্ষী? উ—দরকার হলে দিবেন। প্র—আমি বলছি আপনি আপনার স্বামীর মুখই শুধু ভুলেননি, তাঁর ধরণ ধারণ ভুলে গেছেন? উ—এ কখনও সম্ভবপর হয়! প্র—রাজবাড়ীতে বাড়াত বাথ রুম ছিল কি, যা সচারাচর ব্যবহার হতনা, অতিথি অভ্যাগত আসিলে ব্যবহার হত? উ—সে রকম বাথ রুম ছিল বলে মনে পড়েনা। প্র—মেজকুমার মঝে মাঝে যে বারান্দায় যেতেন আপনি বলেছেন সে বারান্দার উত্তর দিকে বাথ রুম ছিল? উ—হাঁ। প্র—আমি বলছি সেই বাথরুমই মেজকুমার ব্যবহার করতেন? উ—পায়খানা হিসাবে ব্যবহার করতেন। প্র—বড়কুমারের বাথরুমের নীচে মেজকুমারের বাথরুম ছিল, আপনি বলছেন, তাহাতে সর্ব্বদা তালা চাবি দেওয়া থাকত? উ—না। প্র—আপনি কোন অপরিচিত লোক, ষ্টেটের অফিসার কিম্বা বড়কুমারের সাম্‌নে বেরোতেন? উ—বড়কুমারের সঙ্গে কথা বলতাম না। বাড়ীর ভিতরে তাঁর সামনে বেরোতাম। শাশুড়ীর নিকট কর্ম্মচারীরা এলে, সেখানে আমরা যেতাম না। প্র—বিল্লুবাবুর কোন্ বছরে বিয়ে হয়েছিল মনে পড়ে? উ—২৮শে বৈশাখ ১৩১৫ সনে, তখন আমি উত্তরপাড়ায় ছিলাম। ১৯শে বৈশাখ সত্যবাবুর বিয়ে হয়েছিল। প্র—বিল্লুবাবুর যখন বিয়ের জন্য স্থলে যায় তখন তিন কুমারই জয়দেবপুর ছিলেন। একথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন? উ—মেজকুমার ছিলেন না জয়দেবপুরে এ আমি হলপ করে বলতে পারি। প্র—

আপনি প্রত্যেক বছরেই জয়দেবপুর থেকে মিছিল দেখতে ঢাকা এসেছেন একথা অস্বীকার করতে পারেন? উ—না। প্র—মেজকুমার যদি কখনও কোন অন্যায় কাজ করেন, কোন খারাপ স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে সেটা নিশ্চয়ই আপনার অজ্ঞাতে করিতেন কি? উ—হাঁ। প্র—আমি বলছি, আপনি এ কথা জানতেন যে মেজকুমারের শ্রাদ্ধের আগে কুশ-পুত্তলিকার কথা, ঝড়বৃষ্টির জন্য কুমারের শব দাহ হয় নাই, কুমার বেঁচে আছেন, মাধব বাড়ীতে মৌনী সন্ন্যাসীর কথা, বড় কুমারের নিকট বেনামী চিঠি—এ সমস্ত কথা আপনি শুনেছেন? উ—মিথ্যা কথা, আমি শুনিনি এ সমস্ত কথা। প্র—কৃপাময়ী দেবীর নিকট মেজকুমারের সন্ধান নেওয়া সম্বন্ধে শুনেছেন? উ—না। প্র—এটা মোটেই ঠিক নয় যে কমলকামিনী দেবীর সঙ্গে দার্জ্জিলিং যাওয়ার পর দেখা হয় নাই? উ—জয়দেবপুর যখন আমি ছাড়ি তখন কমলকামিনী দেবীর সঙ্গে দেখা হয় নাই একথা মিথ্যা নয়। প্র—অনন্ত কুমারী দেবী, তারক রায়ের মাতা, মোক্ষদা দেবী সর্ব্বদা রাজবাড়ীতে আসতেন এবং আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতেন? উ—মোটেই ঠিক নয়। এলেও আমরা বৌ'রা সামনে যেতাম না। প্র—দার্জ্জিলিংএর ঘটনার পর আপনি কখনও গয়না পরেছেন? উ—কখনও না। প্র—বাদী ফিরে আসবার পর আপনি কখনও গয়না পরেছেন কি? উ—অসঙ্গত প্রশ্ন করছেন কেন? তাকি কখনও সম্ভব হয়। প্র—আপনার হাতে কয়টা আংটি আছে? উ—দুইটা। প্র—এটা সত্যি কিনা আপনার কর্ম্মচারী মনোমোহন ভট্টাচার্য্যকে ফণীবাবু আপনার কলিকাতার ল্যান্সডাউন রোডের বাসায় নিয়া গিয়েছিল কখনও? উ—না, কখনও নিয়া যায় নাই। প্র—আমি বলছি তিনি চাকুরী থেকে ডিস্‌মিস্ হন নাই, তিনি নিজে রিজাইন দিয়েছেন? উ—আমি তাকে বরখাস্ত করেছিলাম। উকিলের চিঠি দিয়াছিলাম। কোন উকিল তাহা মনে নাই।

এই সময় মিঃ চাটার্জ্জী বিবাদিনীকে একখানা চিঠি দেখাইয়া বলেন—"এই লেখা কার বলুন দেখি?" উ—আমি ধারণা করতে পাচ্ছিনা (পুনরায় চিঠি বিবাদিনীর হাতে দিয়া) প্র—আপনি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর লেখা চেনেন? হাঁ। প্র—আমি যদি বলি ওটা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর লেখা, আপনি অস্বীকার করবেন? উ—'জ্য'টা তার মত, 'তি'টা তার মত নয়। এই দুইটা অক্ষর দেখে বলতে পারিনা তাঁর লেখা কিনা। প্র—জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী কলিকাতায়

যে বাড়ীতে ছিলেন আপনি সেই বাড়ীতে তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন কিনা? উ—হাঁ, বুদ্ধুর অসুখের সময় গিয়াছিলাম। প্র—যখন বুদ্ধুর সম্মুখে দেখতে গিয়েছিলেন তখন বুদ্ধুর বউকে ত প্রজাপতি কাঁটা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন একথা অস্বীকার করবেন কি? উ—না, আমার বাড়ীতে দিয়াছিলাম। প্র—আপনি কি বলতে চান জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বিলাসমণি দেবীর ব্রেসলেট নিয়েছিলেন,—একটু সোণা বেশী বলে? উ—সেকথা আমি বলতে চাইনা, তিনি সেটা পছন্দ করিতেছিলেন। বাদীর দাগ সমূহ এখন পরীক্ষা করা যাইতে পারে কিনা এবং তাহা একজন ডাক্তার দ্বারা হউক এই মর্ম্মে মিঃ চৌধুরী এক দরখাস্ত করেন। মিঃ চ্যাটার্জ্জি বলেন, ডাঃ গুরুপ্রসাদ মিত্র বাদীকে চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনি এখন ঢাকা নাই, কাজেই তাঁহার বিনা উপস্থিতিতে আমি কিছু বলিতে পারি না।" প্র—আপনি এই মোকদ্দমা অন্যের উপর ন্যস্ত করিয়া আছেন? উ—ম্যানেজার করছেন। প্র—বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ীতে আপনার পেটে ব্যথা হত মনে পড়ে? উ—আমার তো মনে পড়ে না। প্র—আপনার মনে পড়ে কি না সুশীলা বলে একজন লেডী ডাক্তার আপনাকে দেখতেন? উ—না। প্র—মেজকুমারের সঙ্গে কোন কর্ম্মচারী শিকারে যাইতেন? উ—এণ্টনি সাহেব, মেকবিন সঙ্গে যেত। প্র—দার্জ্জিলিং যাওয়ার কথা সত্যবাবুই প্রথম এসে জয়দেবপুরে উত্থাপন করেন একথা সত্য কিনা? উ—না, কলিকাতায় থেকে কথা হয়েছিল। প্র—যামিনী কুমার দে নামে খানসামার কথা মনে পড়ে? উ—কোন্ যামিনী। প্র—কোন যামিনী দার্জ্জিলিং গিয়াছিল? উ—তার নাম যামিনী ঠিকাদার। প্র—বাদী ফিরে আসার খবর শুনে আপনার খুব ইন্টারেষ্ট হয়েছিল? উ—না, ব্যাপারটা আমি বুঝতেই পেরেছিলাম। প্র—আপনাকে জয়দেবপুর, ঢাকা, কিম্বা পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ জায়গা থেকে খবর দেওয়া হয়েছিল? উ—নিডহাম সাহেব জানিয়েছিলেন, কর্ম্মচারীরা চিঠি লিখেছিলেন, রায় সাহেব জে, সি, বানার্জ্জি চিঠি লিখেছিলেন। লোকমুখে শুনেছি। প্র—আপনি কিংবা আপনার অজ্ঞাতসারে সত্যবাবু ঢাকা জয়দেবপুরে কিম্বা পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে চিঠি দিয়াছিলেন? উ—কালেক্টর সাহেব ও বোর্ড অব রেভিনিউর নিকট চিঠি দিয়াছিলাম, আমি কিম্বা সত্যবাবু। প্র—বোর্ডে কেউ গিয়াছিলেন মনে পড়ে? সত্যবাবু কিম্বা আপনার তরফ থেকে? উ—নিডহ্যাম সাহেব গিয়াছিলেন আর কেউ গিয়াছিলেন কিনা মনে পড়ে না। প্র—বড়কুমারের বাংলা কম্পোজিসন (রচনা)

দেখেছেন? উ—হাঁ, চিঠিপত্র দেখেছি, যেগুলি বড়রাণীর কাছে লিখতেন। প্র—মেজকুমারের বাংলা হাতের লেখা আপনার চেয়ে খারাপ ছিল না ভাল ছিল এই শেষবার জিজ্ঞাসা করছি? উ—আমার চেয়ে খুব ভালও ছিল না মন্দও ছিল না। প্র—আপনি বিয়ের পর যা বাংলা জানতেন তাতে সাহিত্যিক ভাষায় কি বাংলা লিখতে পারতেন, দার্জ্জিলিংএ যাওয়ার আগ পর্য্যন্ত? উ—সাধারণ ভাষায় লিখতে পারতুম। প্র—বড়কুমারের চিঠি কি সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় লেখা দেখেছেন? উ—না, সাহিত্যিক ভাষায় দেখিনি। প্র—যে চিঠিগুলি দাখিল করেছেন যদি তা সত্য হয় তাহলে আপনার অনুপস্থিতিতে লেখা হয়েছে? উ—হাঁ। প্র—সেই চিঠিগুলি কার সামনে লিখিয়াছিলেন বলতে পারেন? উ—স্ত্রীর নিকট লিখিত চিঠি অন্যের উপস্থিতিতে না লিখাই সম্ভব। (এই সময় প্রভাবতীর নিকট মেজকুমারের লিখিত চিঠি দেখাইয়া মিঃ চাটার্জ্জী প্রশ্ন করেন) বলুন তো এই লেখা আপনার লেখার চেয়ে ভাল কিনা? উ—আমার চেয়ে বেশী যে ভাল তা আমার মনে হয় না। প্র—আপনি কি বলছেন আপনার জাতীয় লেখা না অন্য জাতীয় লেখা? উ—এক জাতীয় লেখা বলে মনে হয়। এই সময় মেজরাণীর হাতের লেখা চিঠি দেখাইয়া মিঃ চাটার্জ্জী প্রশ্ন করেন—ভালকরে বিচার করে দেখুন আপনার চেয়ে এই লেখা ভাল কিনা? উ— আমার তো মনে হয় এক জাতীয়ই।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি বিবাদিনীকে একখানা চিঠির ফটো দেখাইয়া প্রশ্ন করেন—রমেন্দ্র নামটার 'দ্র' এর শেষ টানটা কিছুদূর এসে তারপর সেটাকে লম্বা করে দিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন? উ—'দ' এর শেষ টানটা একটু লম্বা। প্র—আপনি দেখতে পাচ্ছেন "দ" এর শেষ টানটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানটায় তার মাঝখানে একটু সরু হয়েছে? উ—আমি বুঝতে পাচ্ছি না। এই সময় মিঃ চাটার্জ্জী কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন—এখানে 'রমেন্দ্রের' 'দ' এর শেষ টানের মাঝখানে যেখানে ভাঙ্গা রহিয়াছে সেইখানে কালি দিয়া নষ্ট (temper) করা হইয়াছে, অথবা ইহা জাল হইতে পারে কিম্বা অন্যভাবে এই দাগ পড়িতে পারে। কেননা কোর্টে দাখিল হওয়ার পর এই চিঠির ফটো নেওয়া হয়েছিল, পূর্ব্বে এইরূপ দাগ থাকিলে ফটোতেও ঐরূপ উঠিত। ইহাতে মিঃ চৌধুরী বলেন—"আপনি কি এই বুঝাইতে চান যে ইহা আমাদের দ্বারা করা হইয়াছে?" মিঃ চাটার্জ্জী হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—নিতান্তই ছেলে

মানুষী—সেই 'ঠাকুর ঘরে কে, কলা খাইনে'র অবস্থা। আমিতো আর সে কথা বলছিনে?" (হাস্য) তখন কোর্ট নোট করেন যে ঐ খানে একটা কালীর দাগ পাওয়া গেল। প্র—("দ" এর সে দাগটা বিবাদিনীকে দেখাইয়া) শেষ বিন্দুটীর সেই খানে "দ"র টানটা একটু ভাঙ্গা কিনা? উঃ—আমার ভাঙ্গা মনে হয় না। আমার মনে হয় নিবে কালী না থাকায় এই যায়গায় আবার কালি দিয়া " " ফলা দিয়াছে। [লেখাটা কোর্টে দাখিল করা হয়। কোর্ট বলেন—"আমি এটাকে ফটো হিসাবে ফাইল করব।', এই সময় মিঃ চাটার্জ্জী xE 42 (7) মেজরাণীর নিকট মেজকুমারের লিখিত চিঠিতে দেখাইয়া প্রশ্ন করেন]—"এই লেখাও আপনার লেখা এক জাতীয় কি না? উ—আমি তো এই লেখা আমার চেয়ে খারাপ দেখছি না। এই লেখা কি আপনার চেয়ে ভাল? উ—আমার লেখার চেয়ে এই লেখা ভাল—তা আমি বলিতে পারি না। [এই সময় রায় বাহাদুর কে, পি, ঘোষের নিকট লিখিত তিনখানা চিঠিতে তিনটা সই দেখাইয়া মিঃ চাটার্জ্জী প্রশ্ন করেন] এই সই কটা চিনেন? উ—হাঁ। প্র—এই সই তিনটা আর চিঠির অন্য লেখার মধ্যে কোনটা ভাল দেখা যায়? উ—চিঠির মধ্যের লেখাই ভাল দেখা যায়। প্র—নাম সই তিনটার ভিতর কোনটা ভাল দেখা যায়? উ—বড় কুমারের।

প্র—অন্য দুইটার ভিতর কোনটা ভাল? উ—মেজ কুমারের। প্র—আপনার নিকট যেটা লিখেছেন ও প্রভাবতী দেবীর নিকট যেটা লিখেছেন এই দুইটার লেখা কি একই রকম মনে হয়? উ—হাঁ। প্র—আপনার দাদা কোন সনে বি-এ পাশ করেছেন মনে আছে? উ—যে বছর তাঁর বিয়ে হয়েছে। প্র—এটা সত্যি কি না ১৩১১ সনে প্রভাবতী দেবী ও মেজকুমারের কোন চিঠি পত্র লেখা হয় নাই? উ—প্রভাবতী দেবীর বিয়ের আগেও লিখত, বিয়ের পর এক বৎসর পর্য্যন্তও লিখেছে। প্র—কেউ যদি বলে প্রভাবতী দেবীর ভয় হ'ত পাছে আপনার স্বামী কিছু মনে করেন তার কাছে চিঠি লিখেছে, একথা কি ঠিক হবে? উ—না, একথা ঠিক হবে না। প্র—আপনার বিয়ের পর এসে দেখলেন কি আপনার স্বামী খুব সাহিত্যিক বাংলা লিখতে পারতেন? উ—আমি বুঝতে পাচ্ছি না। প্র—বিয়ের পর মেজকুমার কি সাধারণ বাংলা লিখতেন না সাহিত্যিক বাংলা লিখতেন? উ—আমার কাছে যে সব চিঠি লিখেছেন তাতে সাধারণ বাংলা লিখেছেন, তবে আমার বোনের কাছে যে চিঠি লিখেছেন তাতে সাহিত্যিক বাংলাই

লিখেছেন। আমার অন্য বোনের কাছে যে সমস্ত চিঠি লিখেছেন তাতে শুদ্ধ ভাষাই লিখেছেন। প্র—সাহিত্যিক ভাষায় মেজকুমারের কোন লেখা দেখেছেন? উ—সাহিত্যিক যাকে বলে সে রকম দেখেছি বলে তো মনে হয় না। প্র—প্রভাবতী দেবীর নিকট লিখিত ভাষার মত ভাষায় লেখা মেজ কুমারের অন্য চিঠি দেখেছেন? উ—হাঁ এই জাতীয় লেখা দেখেছি। প্র—আপনি বোধ হয় বিয়ের পর থেকেই দেখেছেন এরকম লিখেছেন? উ—বিয়ের কিছুদিন পর। ১৩১০ সালে ফাল্গুন চৈত্র মাসে উত্তরপাড়া ফিরে আসার পর। প্র—বড় কুমার কখনও উত্তরপাড়া গেছেন একবার কি, একাধিকবার? উ—গিয়েছেন, একাধিকবার। প্র—প্রভাবতী দেবীকে চিঠি লিখতেন কুমার আপনার সামনেই কি? উ—সব সময়ে যে আমার সামনে লিখতেন তা নয়, অনেক সময় আমার লিখিত চিঠিতেও তিনি লিখে দিতেন। প্র—কখন সাহিত্যিক ভাষায় লিখতেন? উ—সব সময়েই যে সাহিত্যিক ভাষায় লিখেছেন তা নয়। কোন্ ভাষায় লিখেছেন বলা শক্ত, তবে শুদ্ধ বাংলাই লিখতেন। প্র—তাকে সদাসর্ব্বদাই সাহিত্যিক ভাষায় লিখতে দেখতেন?—না। প্র—আপনি কি আজ পর্যান্ত জানেন দার্জ্জিলিংএ যে আফিসে মৃত্যু খবর দেওয়া হয়। সেই অফিসে আপনার স্বামীর মৃত্যু খবর দেওয়া হয়নি?—উ—জানিনা। প্র—স্বামীর মৃত্যুর পর সদ্য বিধবার থান কাপড় পরা হয় কি? উ—হাঁ। প্র—আপনি দার্জ্জিলিং কি স্নানের পর থান কাপড় পরেছিলেন? উ—স্নানের পর থান কাপড় এনে দেয়নি। প্র—আপনি যতীন সেন নামে কাউকে জানেন—যার ভাই নরেন সেন আপনাদের বাড়ী থেকে পড়ত? উ—নরেন বলে একজন কে জানি সে আমাদের বাড়ীতে থেকে পড়ত। যতীন সেন বলে কাউকে জানিনা। তিনি আমার কোন কাজ করেছেন বলেও জানিনা।

এই সময়ে মিঃ চাটার্জ্জি একখানা ফটো দেখাইয়া বিবাদিনীকে প্রশ্ন করেন—এই ফটোখানা চিনেন? উ—হাঁ, আমার স্বামীর ফটো। প্র—মেজকুমারের কত বয়সের ফটো বলতে পারেন? উ—বিয়ের আগের ফটো। প্র—যদি কেউ বলে যে শনিবার খুব ভোরের দিকে কুমারের পেটে ব্যথা হল, তারপর বাড়ল সেটা কি সত্যি হবে? উ—সেটা সত্যি হবেনা।—বীরেন বানার্জ্জি হলপ করে একথা বলেছেন কোর্টের কাছে একথা জানেন কি? উ—না। প্র—আপনি কি আজ পর্য্যান্ত অবগত আছেন যে এই কথা আশু ডাক্তার হলপ করে কোর্টে বলেছেন? উ—না, আমি অবগত নই।

প্র—কেউ যদি বলে ৮ই মে ভোর বেলা তীব্র ব্যথার দরুণ মেজকুমারের অবস্থা খারাপ হয়েছিল এবং তিনি বিছানায় গড়াগড়ি খাইতেছিলেন—একথা সত্যি হবে? উ—ব্যথা সকালবেলা ছিল না। প্র—আপনি আজ পর্য্যন্ত জানেন কি যে আশু ডাক্তার হলপ করে এই কথাও কোর্টে বলেছেন? উ—জানি না। প্র—কেউ যদি বলে কুমার যেই ঘরে মারা গেছেন, সেই ঘরে আপনি রাত্রি ৯টার পর গেলেন, ইহার পূর্ব্বে আপনি তার পাশের ঘরে ছিলেন একথা কি সত্য হবে? উ—এ একটা ভুল কথা হবে। প্র—দার্জ্জিলিং যাওয়ার পূর্ব্বে আপনারা কুমারের চিকিৎসার জন্য কলিকাতা গিয়াছিলেন· সেই সময় আশু ডাক্তার সঙ্গে ছিলেন? উ—হঁা, আশু ডাক্তার কুমারের অসুখের কথা জানত। প্র—কেউ যদি বলে ডাঃ সর্ব্বাধিকারীকে আশু ডাঃ কুমারের কলিক পেনএর বিষয় কিছু বলেননি, একথা মানতে রাজি আছেন? উ—না। প্র—যদি আশু ডাক্তার মশায় বলেন ডাঃ সর্ব্বাধিকারীকে আমি বলি নাই কুমারের কলিক পেন্-এর কথা, একথা ঠিক হবে? উ—আমি বল্‌ব তিনি ভুলে গেছেন। প্র—আপনি আজ পর্য্যন্ত জানেন মানহানি মোকদ্দমায় আশু ডাক্তার হলপ করে এই কথা বলে গেছেন? উ—জানিনা। প্র—কেউ যদি বলেন, শুক্রবার দিন নিবারণ বাবু ষ্টেপ-এসাইডে যান্‌নি—একথা সত্য হবে?—উ—না। প্র—আপনি জানেন কি আশু ডাক্তার হলপ করে একথা বলে গেছেন? উ—জানিনা। প্র—আপনার কি এখন এই পজিশন যে এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনি যা বলছেন তার সঙ্গে অন্য সাক্ষীর মিল হচ্ছেনা—তাহলে কি বুঝব আপনিই অভ্রান্ত আর সকলেই ভুল বলছেন? উ—অন্যে কে কি বল্‌ছেন জানিনা, তবে আমার স্বামীর ব্যারাম সম্বন্ধে আমি যা বলতে পারব অন্যে তা পারবেনা।

প্র—আপনি কি শাশুড়ীর আচার ব্যবহার অনুসরণ করতেন? উ—তিনি যা বলতেন তাই করতাম। প্র—আপনি কি সব সময়ই তাঁর দৈনিক আচার ব্যবহার অনুসরণ করতেন? উ—তখন তাঁর বয়স হয়েছিল, বিধবা হয়েছিলেন, সব আচরণ অনুসরণ করতাম না। প্র—৮ই মে রাত্রিতে আপনি শোকে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, একথা ঠিক কি? উ—কুমার মারা যাওয়ার পরে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। প্র—মারা যাওয়ার আগে চিন্তায় অভিভূত হন নি? উ—না। প্র—বড়কুমারের মৃত্যুর কিছু আগে ব্রজলাল বাবু একখানা চিঠি নিয়ে এসেছিলেন, যা দেখে

বড়কুমার ও আপনারা সবাই রাগান্বিত হয়েছিলেন। এবং একটা হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল—একথা মনে আছে? উ—আমি থাকতে এ রকম হয়েছিল বলে মনে হয় না। প্র—নিডহাম সাহেব চিঠিতে আপনার কলিকাতা যাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন মনে পড়ে?—না। প্র—আপনার কি মনে পড়ে না নিড্হাম সাহেব সত্যবাবুকে বলেছিল আগে কর্ণেল হলকে দিয়ে রোগীকে দেখাও তারপর কল্‌কাতা নিয়ে যেও? উ—আমার মনে পড়ে না। প্র—এরকম চিঠি লিখলে কার কাছে থাকবার কথা? উ—আমার কাছে নাই। আপনি কি এ রকম বলতে চান যে নিডহাম সাহেব এ রকম চিঠি লিখেন নি? উ—আমি যখন পাইনি কি করে বল্‌বো। প্র—এই যে কেস্ চলছে এই জন্য আপনার পক্ষে যোগেন্দ্র বাবুকে তদ্বিরকারক নিযুক্ত হয়েছে,—একথা সত্য কি? উ—একথা আমি কখনও শুনিনি। তিনি এখন এ ষ্টেটের কর্ম্মচারী নন জানি। প্র—(বিবাদিনীকে কুমারের চিঠি দেখাইয়া) আমি কি এই বুঝব, আপনি যদি আপনার স্বামীর এ রকম ১ডজন ২ডজন সই ছাড়া আর কিছু লেখা না দেখতেন তাহলে কি আপনি তাঁকে শিক্ষিত বলতেন? উ—তা কি করে বলব? প্র—আপনি কি মানবেন এই সইটা ছেলে মানুষের সইয়ের মত? উ—খুল ভাল লেখা যে তা বলছিনা। প্র—আপনি কি বলতে চান—আপনার স্বামী আপনাকে ছেড়ে ২।৪ দিন থাকতেও কষ্ট বোধ করতেন? উ—এরকম কথা তো আমি বলিনি। প্র—কুমারের আপনার প্রতি যেরূপ আচরণ ব্যবহার ছিল তাতে তাঁর আপনাকে ছেড়ে থাকতেও কষ্ট হত? উ—আমি আপনাকে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করব না। প্র—আপনি কি বলবেন মেজকুমার খুব পত্নী-পরায়ণ, পত্নী-প্রাণ ছিলেন? উ—এ বিষয়ে তাঁর খুব বাহুল্য দেখি নাই। প্র—আপনি জানেন অনেক বিবাহিত পুরুষ স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখিতে বড়ই ব্যস্ত থাকে, আপনার স্বামী সেই রকম ছিলেন? উ—অপরের কে কেমন থাকে আমি বলতে পারি না। প্র—তিনি কি সব বিষয়েই আপনার পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন? উ—সব সময়ই যে পরামর্শ নিতেন তা নয়। প্র—জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে কি আপনার পরামর্শ নিতেন? উ—না। প্র—তিনি কি লাটসাহেব, কমিশনার, কালেক্টর, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গেলে নিজেকে ধন্য মনে করতেন—যেমন অনেকে মনে করেন? উ—তা আমি কি করে বলব।—প্র এক রকম লোক আছে—সর্ব্বদাই স্ত্রী, সংসারের কথাই ভাবছেন, মেজকুমারকে

এইরূপ গৃহানুরাগী লোক বলা যায় কিনা? উ—গৃহানুরাগী বলা যায় না। প্র—আপনি যে চিঠিগুলি কোর্টে দাখিল করেছেন তা দেখে কি মনে হয় না আপনার স্বামীর জীবনের প্রধান চিন্তা ছিল 'স্ত্রী'? এইরূপ মনে হয় কি? উ—না! প্র—আপনার স্বামী যে পত্নীবৎসল ছিল তাই কি আপনি জবানবন্দীতে ফুটিয়ে তুলতে চেয়ে ছিলেন? উ—না, সেই কথাতো আমি একবারও বলিনি। মিঃ চাটার্জ্জী তখন বলেন—যে চিঠিগুলো দাখিল করেছেন সেগুলি কোথা থেকে লেখা হয়েছিল এবং আপনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন। প্রথম চিঠিখানা দেখাইলে পরে বিবাদিনী বলেন—এই চিঠিখানা ঢাকা থেকে জয়দেবপুর পাঠিয়েছিলেন, তারপর পর পর ৫ খানা চিঠি দেখাইলে বিবাদিনী বলেন, "কুমার ঢাকা থেকে লিখেছিলেন আমি জয়দেবপুর ছিলাম।" তারপর একখানা চিঠি দেখাইলে বিবাদিনী বলেন, জয়দেবপুর থেকে কলিকাতা আমার নিকট লিখেছিলেন। চিঠি ডাকে গিয়েছিল। তৎপরবর্ত্তী চিঠি কুমার জয়দেবপুর থেকে আমার নিকট উত্তরপাড়া পাঠিয়েছিলেন, এন্টনি সাহেবের মারফতে তার হাত দিয়া। প্র—প্রভাবতী দেবীর চিঠিখানা ডাকে না হাতে পাঠানো হয়েছিল জানেন?—উ—ডাকেই পাঠানো হয়েছিল। প্র—মেজ কুমার কি হামেশাই জয়দেবপুর থেকে ঢাকায় আসতেন? উ—দরকার হলে মাঝে মাঝে আসতেন। প্র—ঢাকা আসলে সচরাচর ক'দিন থাকতেন? উত্তর—কোনবার যেইদিন আসতেন সেইদিনই চলে যেতেন, আবার কোনবার ২।৩।৪ দিনও থাকতেন। প্র—যখনই কুমার এখানে থাকতেন তখনই আপনিও চিঠি লিখতেন, মেজকুমারও চিঠি লিখতেন? উ—হঁ্যা। প্র—চিঠিগুলি পেয়েই কি এনভেলাপ ফেলে দিতেন? পঙ্কজ বাবুকে যখন চিঠিগুলি দিলেন তখন কি লেপাফা ছিল? উ—না। প্র—পঙ্কজ বাবুকে কোন বছর ঐ চিঠিগুলি দিয়েছিলেন? উ—বছর চারি হবে। প্র—আপনার বর্ণনা লিখবার আগে না পরে? উ—সেটা আমার ঠিক মনে নাই। প্র—আপনি এই মোকদ্দমার সমন পেয়েছিলেন? উ—মনে নাই। প্র—এই মোকদ্দমা রুজুর কত পরে পঙ্কজ বাবুকে চিঠিগুলি দিয়েছিলেন বলতে পারেন? উ—কিছুদিন পর। প্র—ঢাকা থেকে জয়দেবপুর চিঠিখানা পেয়েই এনভেলাপখানা ছিঁড়ে ফেলেছেন?—হঁ্যা। প্র—প্রভাবতী দেবীর চিঠি এনভেলাপ ছাড়া পেয়েছিলেন? উ—আমার কাছে যখন দিল, এনভেলাপ ছাড়াই ছিল। আমি বছর দেড়েক আগে ঐ চিঠি পঙ্কজ বাবুকে দিয়াছিলাম। প্র—আপনি তাকে

কোন চিঠি লিখেছিলেন ? উ—মুখে বলেছিলাম। প্র—আপনি প্রভাবতী দেবীর স্বামীর নিকট কি বলেছিলেন মনে আছে ? উ—আমি আমার ভগ্নিপতিকে প্রভার নিকট লিখিত চিঠির কথা বলেছিলাম, আমি জানতাম আমার স্বামী প্রভার নিকট লিখতেন, প্রভা তাহা যত্ন করে রাখত। প্র—মেজকুমার লাট-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে যে চিঠি দাখিল করেছেন তাহার মধ্যে যে তারিখ লেখা আছে সত্যি সত্যিই কি ঐ সব তারিখে মেজ কুমার দেখা করতে গিয়াছিলেন, এবং ঠিক তারিখ মতই দেখা করতে গিয়াছেন ? উ—তারিখ মত দেখা করতে গিয়াছিলেন, তা না হইলে কেন লিখবেন ? প্র—(কুমারের একখানা চিঠি বিবাদিনীকে দেখাইয়া) এই চিঠিখানা কত তারিখের বলুনত ? উ—১৩।৯।২৫ শ্রাবণ। প্র—২৬শা লাট সাহেব কলিকাতা লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে প্রিসাইড্ করেছেন কিন্তু চিঠিতে লেখা আছে লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা ২৫শা শ্রাবণ।

আমার কথা তাহলে কি আপনি আপত্তি করবেন না ? উ—আমি কি করে বলতে পারি। প্র—লাট সাহেব যখন টুরে বেরতেন তার অনেক আগে টুর প্রোগ্রাম স্থির করেন জানেন কি ? উ—তা আমি জানিনা। প্র—এটা কি সত্যি কথা বাদী আসবার পর জয়দেবপুরে ১৯২১ সনে আপনি ঘটা করে যে রকম স্বামীর 'তিথি' করেছিলেন এ রকম আর কখনও করেন নি। উ—প্রথমবারে ঘটাকরে হয়েছে—অন্যান্য বারও করেছি। প্র—সেবার তিথি শ্রাদ্ধে জয়দেবপুরে ৩০ লোককে খাওয়ানো হয় নি ? উ—টাকা আমি এক-রকমই পাঠিয়েছি, আমি তো তখন জয়দেবপুরে উপস্থিত ছিলাম না, কর্ম্মচারীরা বলতে পারে। প্র—আপনি জানেন কি ১৯২১ সনে তিথিশ্রাদ্ধে যাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাদের নিকট হতে একটা সই করিয়া নেওয়ার হুকুম ছিল ? উ—আমি সেইওনি জানিওনা। প্র—১৯২৯ সনে, কেউ যদি বলত, সত্যবাবু আপনার কাজকর্ম্ম দেখত, একথা কি সত্য হবে ? উ—তিনি বরাবরই আমার কাজকর্ম্ম করিতেন। প্র—১৯২১ সনে বাদী ফিরে আসার পর আপনি কিম্বা সত্যবাবু কাউকে চিঠি লিখেননি খবর জানবার জন্য ? উ—আমি লিখিনি, সত্যবাবু লিখেছেন কিনা জানিনা। প্র—ব্যাপারটা আপনার জানবার জন্য কৌতূহল হয়নি। উ—কৌতূহল হয়নি, আমি খবর পেয়েছিলাম। প্র—কোর্ট অব ওয়াডসএ ষ্টেট যাবার পরে আপনার মনোমত হয়নি এরূপ কোন প্রপোজেল যদি কেউ করতেন তাতে আপনি প্রতিবাদ করতেন কিনা ? উ—কখনও

যে প্রতিবাদ হয়নি এমন কথা নয়—তবে হলেও হতে পারে। প্র—আপনি কি বলেন, বাদী যদি প্রকৃত কুমার হত তাহলে ১৯ বৎসর পরে দেখলে তাকে চিনতে পারতেন ? উ—যদি প্রকৃতই ফিরে আসা সম্ভব হত তা হলে বয়সের দরুণ মোটা হতে পারতেন রং ময়লা হত, কিন্তু তাহার মুখের কাট বদলাতো না।

প্র—৪০ বৎসর বয়সে মুখের চামড়া কি ঢিলা হয় না ? উ—৫০।৫৫ বৎসরে হয় ৪০ বৎসর বয়সে বিশেষ কিছু হয় না। প্র—অনেক সময় বয়সের দরুণ গালের ও পরিবর্ত্তন হয় ? উ—দাঁত পড়ে গেলে গাল বসে যায়। প্র—মাংস হলে মোটাও হয় ! উ—হাঁ। প্র—১৫ বৎসর পরে গালের পরিবর্ত্তন অনেক কারণে হতে পারে ? উ—হাঁ তবে গঠনের পরিবর্ত্তন হয় না (এই সময়ে বাদীপক্ষ হইতে দাখিল করা কুমারের আর একজনের সঙ্গে তোলা একখানা গ্রুপ ফটো এবং অপর একটি ফটো দেখাইয়া মিঃ চাটার্জ্জি প্রশ্ন করেন—দুটো মুখ কি বিভিন্ন রকম দেখছেন না একরকমই দেখছেন ? উ—নাক টাক একরকম কিন্তু মুখ একরকম নয়। প্র—দুটো দেখেই বুঝতে পারছেন এক রকম ফটো ? উ—তা আমি বলতে পারব না। প্র—আপনাকে বলছি, আপান ও আপনার ভাই নিশ্চিত জানতেন যে বাদী মেজকুমার কিন্তু আপনাদের যদি কিছু মাত্র সন্দেহ থাকত যে বাদী মেজকুমার নন তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই বোর্ডকে লিখতেন খোলা তদন্তের জন্য। উ—আমি এবং আমার ভাই জানতুম এ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বোর্ডকে আমি আমার ভাই লিখেছে, আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি। প্র—আপনি বোর্ডকে কখনও বলেছেন, একটা খোলা তদন্ত করতে ? উ—না। প্র—আপনি কি বলবেন আপনার ভাই বোর্ডকে বলেছে একটা খোলা তদন্ত করতে ? উ—ভাই কি করেছে জানিনা। প্র—আপনি এবং আমার মক্কেল পাশাপাশি জজ সাহেবের নিকট বসবেন, বসে আপনি বিবাহিত জীবনের যে কোন ঘটনার প্রশ্ন করবেন, তিনি উত্তর দিবেন—আপনি রাজি আছেন ? উ—আমি এর কোন আবশ্যকতা বোধ করি না, তবে যদি জজ সাহেব বলেন করিতে পারি। [এই সময় মিঃ চাটার্জ্জি কোর্টকে অনুরোধ করেন আপনি এই বিষয়ে একটা তারিখ নির্দ্দিষ্ট করে দিন। কোর্ট বলেন আপনি এ বিষয়ে একটী লিখিত দরখাস্ত দাখিল করুন, তাহার উপর আমি আমার মন্তব্য প্রকাশ করিব]।

প্র—এটা সত্য কিনা বাদী আসার পর দার্জ্জিলিং এর লুইস জুবিলী স্যানি-

টারিয়াম এ একটা ডোনেশন দিতে চেয়েছিলেন—মেজকুমারের স্মৃতি রক্ষার জন্য? উ—না।

অতঃপর রায় বাহাদুর শশাঙ্ক কুমার ঘোষ বিবাদিনীকে পুনরায় প্রশ্ন করেন। প্র—আপনার বিয়ে কোন বার কোন সময় হয়েছিল বলতে পারেন? উ—শনিবার। ১০টার সময় হবে। প্র—জয়দেবপুরে কবে পৌছেন? উ—বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময়। স্পেশাল ট্রেণে গিয়াছিলাম বিকাল বেলা, বার বেলা বলে সন্ধ্যার পর নামিয়া ছিলাম। প্র—আপনার ভগ্নি প্রভার বিয়ে কবে হয়েছিল? উ—১৯১১ সনে। প্র—কুমার মারা যাওয়ার পর আপনার মা কিম্বা ভগ্নীরা জয়দেবপুর কখনও এসেছিলেন? উ—না, আমার বিয়ের সময় মা জয়দেবপুরে এসেছিলেন। প্র—দার্জ্জিলিংএ কুমারের বাহের কি রকম রং হয়েছিল? [এ প্রশ্নে মিঃ চাটার্জ্জি আপত্তি করেন] প্র—আপনার ভাই সত্যবাবু নিজের কোন আয় আছে? উ—তিনি শেয়ার মার্কেটে স্পেকুলেশন করেন। প্র—আপনি এই সম্বন্ধে কিছু জানেন? উ—না। প্র—আপনি জানেন এতে তার কোন আয় হয়? উ—আমার ভাইঝি যখন হয়েছিল তখন তিনি অনেক টাকা লাভ করেছিলেন। প্র—সুরেন্দ্র মতিলাল আপনাকে যে উপদেশ দিতেন তা দেখাবার কোন দলিলপত্র আছে? উ—আমার কাছে ছিল আমি "দত্তক গ্রহণ মামলায়" সে সব দাখিল করিয়াছি। প্র—আপনি যে দুই কুমারের বিরুদ্ধে বেশী টাকা নেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন তাতে আপনি কোন টাকা পেয়েছিলেন? উ—২৫।৩০ হাজার টাকা পেয়েছিলাম। প্র—দার্জ্জিলিংএ আপনাকে কুমারের মৃত্যুর পর দিন সূর্য্যনারায়ণ বাবুর বাঁড়ী নিয়ে গিয়াছিল। সেখানে কোন স্ত্রীলোক ছিল। উ—তাঁর বাড়ী কোন স্ত্রীলোক ছিল না। কাশীশ্বরী দেবী আমাকে নিয়া গিয়াছিলেন। প্র—ঢাকা থেকে জয়দেবপুরে সরকারী কাজ কর্ম্মের চিঠি, পার্সন্যাল (ব্যক্তিগত) চিঠি ডাকে আসত না নম্বরীতে আনত? উ—ডাকে আসতনা নম্বরীতে আনত, এখনও নম্বরীতে আনে। প্র—আপনি কি বলিতে পারেন আপনার স্বামীর মুখের রং কি রকম ছিল। (এই প্রশ্নে মিঃ চাটার্জ্জি আপত্তি করেন) উ—যাকে সানবার্ণ্ট্ (আগুনজালা) সেই রকম ছিল, রোদে পুড়ে যে রকম রং হয়, লালচে মত। প্র—বাদী আসার পর আপনি নিডহ্যাম সাহেবের মারফত কালেক্টর বা বোর্ড অব রেভিনিউকে কোন চিঠি লিখেছিলেন? (মিঃ চাটার্জ্জি এই প্রশ্নে আপত্তি করেন। এই সময় মিঃ চাটার্জ্জী

দাঁড়াইয়া তাঁহার আপত্তির সমর্থনে ব্যস্ততার সহিত কাগজপত্র ঘাটিতে ছিলেন, তাহাতে মিঃ চৌধুরী বলেন—"আপনি লাফিয়ে উঠলেন কেন?' মিঃ চাটার্জ্জী—"আপনার ভদ্র ভাষা ব্যবহার করা উচিত। "লাফিয়ে ওঠা" বলছেন কেন?" মিঃ চৌধুরী—"আপনি আগাগোড়াই ধমকাচ্ছেন কেন?" মিঃ চাটার্জ্জী—"আপনি একজন মহিলার সামনে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলছেন।" You are making a fool of yourself before a lady.)

প্র—আপনি যে বলেচেন আপনার স্বামী আপনার বোনের কাছে চিঠি লিখতেন,—"বোনের বলতে আপনি কি বোঝাতে চান? (মিঃ চাটার্জ্জী এই প্রশ্নে আপত্তি করেন) উ—প্রভা ও আমার মেজ মামার দুই মেয়ে। (মিঃ চ্যাটার্জ্জির আপত্তিতে কোর্ট তাঁহাকে বলেন—এই সম্বন্ধে আপনি পুনরায় জেরা করিতে পারেন। সাক্ষী "বোন" বলতে সহোদরা বোনই বলেছেন এবং কোর্ট ও সিষ্টার (sister) বলে লিখেছেন।) রায় বাহাদুর—না, সে রকম লেখা হয় নি বা সে রকম অর্থে বলাও হয়নি। মিঃ চাটার্জ্জি—রায় বাহাদুর ভুল কচ্ছেন। মিঃ চ্যাটার্জ্জি এ কি! যখনই আমি রায় বাহাদুরকে কিছু বলি তখনই তার ছেলে আমাকে আক্রমণ করে! মিঃ পঙ্কজ ঘোষ—আমি কেবল রায় বাহাদুরের পুত্র হিসাবেই আপত্তি কচ্ছি না,—মিঃ চ্যাটার্জ্জির এরূপ বলা অন্যায়। তিনি বার বার এমনিই করে আসছেন, এখন আর সহ্য করতে পারি না। তিনি কৌঁসুলী বলেই কি যা তা বলবেন? তিনি কে? তিনি কেউ না। (He is nobody) মিঃ চাটার্জ্জি—এমনিই করেই আমাকে আক্রমণ করা হয়। আমি দেখেছি রায় বাহাদুর ও তাঁর পরিবারবর্গ আমাকে আক্রমণ করবার জন্য বদ্ধপরিকর। এ অবস্থায় আমি জেরা করতে রাজী নই। আর আমি এখানে আসতেও ইচ্ছা করি না। কারণ, রায়বাহাদুরকে কিছু বললেই তাঁর দুই ছেলে আমাকে অপমান করে—এ সহ্য আর করা যায় না। আমি এক মুহূর্ত্তে ওকে ছিঁড়ে টুক্‌রা টুক্‌রা করে ফেলতে পারি। (break him into pieces) মিঃ পঙ্কজ ঘোষ—আমিও আপনাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারি। মিঃ চাটার্জ্জি—বেশ বেশ, এস চল বাইরে যাই (come along, let us go outside) বাইরে চলুন—এখানকার যে কেউ একজন একজন করে বাইরে আসুন, আমি সকলকে ছিড়ে ফেলবো। দেখুন পারি কিনা।

তখন কোর্ট উভয় পক্ষকে শান্ত করিতে চেষ্টা করেন। এমন সময় বিবাদিনী পক্ষের উকিল শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বসু মিঃ চাটার্জ্জীকে বলেন —চাটুজ্যে মশাই, এখন সাক্ষ্য শেষ হয়ে গেছে, শান্তি স্থাপিত হলেই ভাল হয়। ইহাতে কোর্ট ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন—আপনার অনেক সিনিয়র এখানে উপস্থিত আছেন, আপনি এখানে কথা বলার কে? আপনি কি মনে করেন এটা একটা বৈঠকখানা—এখানে যার যা খুসী বলতে পারেন? তখন মিঃ চৌধুরী বলেন—বীরেন বাবুর কোন দোষ নেই। কোর্ট—আপনিও কি ওকে সমর্থন কচ্ছেন? আমি আর এখানে আসব না। তখন মিঃ চাটার্জ্জি বলেন—আমার পক্ষে অন্য কেউ কিছু বলে নি, আর বীরেনবাবুও কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে বলেন নি। কোর্ট ইচ্ছা করলে বীরেনবাবুকে ক্ষমা করতে পারেন। তখন বীরেনবাবু ও মিঃ পঙ্কজ ঘোষ উভয়েই কোর্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তখন কোর্ট মিঃ চাটার্জ্জিকে পুনরায় জেরা করিতে বলায় তিনি বলেন—আমার মন এত চঞ্চল হয়েছে যে আমি এখন জেরা করতে পারব না, আমি এখানে আর আসবও না। তখন মিঃ চৌধুরী বলেন— আমরা কথা দিচ্ছি এরকম আর হবে না। মিঃ চাটার্জ্জি তাহাতেও জেরা করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় কোর্ট বলেন -আমি কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আর এমন হতে দিব না। অতঃপর মিঃ চাটার্জ্জি বুধবারে জেরা করিবেন বলেন।

প্র—কাল যে দুই মামাত বোনের কথা বলেছেন এই দুজন কিম্বা এই দুয়ের একজন আপনার সাক্ষী? উ—একজন মারা গেছেন। অন্য একজনকে আমি সাক্ষ্য দিতে বলি নাই। প্র—আপনি কি এদের নিকট হতে কোন কাগজপত্র দাখিল করতে চান? উ—যিনি মারা গেছেন, তাঁর স্বামী পুনরায় বিবাহ করেছেন, সেখানে কোন কাগজপত্র আছে কিনা জানিনা। যে বোন জীবিত আছে, তাঁর কাছেও কোন কাগজপত্রের খোঁজ নিজে করিনি। প্র—যদি তাদের কোন কাগজপত্র আনতে হয় এই ভেবে আপনার তরফ থেকে কেউ জিজ্ঞাসা করছেন কি? উ—আমি যতদূর জানি আমার তরফ থেকে কেহই বলেন নাই। প্র—দুইজন মামাত বোনের নাম কি? উ—যিনি মারা গেছেন তাঁর নাম সাবিত্রী। আর যে বেঁচে আছে তার ডাক পাম আলতা ভাল নাম সুকুমারী। প্র—সান্‌বার্ণট (Sunburnt) কথাটা কবে শিখলেন? উ—বহুদিন থেকে জানি। কোর্ট প্রশ্ন করেন—

আলতার বয়স কত। উ—আমার ছোট বোনের বছর দুই ছোট—আমার থেকে বছর পাঁচের ছোট।

কোর্ট প্রশ্ন করেন—আলতা সাবিত্রী আপনার মেজমামার মেয়ে? উ—হাঁ। প্র—আলতা সাবিত্রী হতে ক'বছর ছোট। উ—প্রভার থেকে আলতা দু'বছরের ছোট। প্র—আলতার বিয়ে হল কবে? উ—১৩১৩ সনে। প্র—প্রভা কবে মারা গেছেন? উ—বছর ছয় হবে। প্র—আপনার দার্জ্জিলিংএর বাসায় বারান্দার ভিতরের সিঁড়িটা কি কাঠের ছিল? উ—হাঁ। প্র—আর ঢালু রাস্তায় কোন সিমেণ্ট করা নাই? উ—ঢালু রাস্তা ধাপে ধাপে উপরে উঠেছে কোন সিঁড়ি নাই। প্র—যে ঘরে মেজকুমার মেজেতে বিছান করেছিলেন সেই ঘরে আর বসবার ঘরের ভিতর কোন দরজা ছিল কি? উ—দরজা ছিল খোলা হত না। কুমার যখন ওঘরে ছিলেন তখন দরজা বন্ধ থাকত ডাক্তার বারান্দা দিয়ে ঘুরে আসত। অতঃপর রাণী বিভাবতী দেবীর জেরা শেষ হয়।

স্থানাভাবে আমরা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে বাধ্য হইলাম।

পরিশিষ্ট—২

আশুডাক্তারের জেরা

প্র—আপনি বাদীর অত্যন্ত বিরোধী? উ—হাঁ, আমি তাঁহার আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি। প্র—একথা কি সত্য যে, জয়দেবপুরের রাস্তায় চলিবার সময় আপনি প্রায়ই ছড়ি দিয়া নানা জিনিসের উপর আঘাত করিয়া বলেন যে, পাঞ্জাবীর মাথা ভাঙ্গিতেছি? উ—না। আমি জানি যে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী জবানবন্দী এবং মেজরাণীর জবানবন্দীর মধ্যে কতকটা অসামঞ্জস্য আছে। প্র—সেই অসামঞ্জস্যের হাত এড়াইবার জন্যই কি আপনার সাক্ষ্য যথাসম্ভব সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে? উ—জানি না। প্র—আপনি যে ব্যবস্থা-পত্রের কথা বলিলেন, ডাঃ ক্যালভার্টের সাক্ষ্যে ইহার কথা অস্বীকার করিয়াছেন, উহা আপনি জানেন? উ—না, জানি না। আমি কখনও ডাঃ ক্যালভার্টের সাক্ষ্য পাঠ করি নাই। তবে সংবাদপত্রে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছি। আমি জানি যে, কমিশনে ডাঃ ক্যালভার্টের জবানবন্দী লইবার জন্য রায় বাহাদুর শশাঙ্ক ঘোষ ইংলণ্ডে গিয়াছেন। ইংলণ্ডে রওনা হইবার পূর্ব্বে তিনি আমার নিকট হইতে কোন উপদেশ গ্রহণ করেন নাই।

প্র—আপনি স্বীকার করেন কি যে, এই ব্যবস্থাপত্রে "এলম্বন" আছে এবং উদরাময়ের রোগীকে উহা দিলে উদরাময় বৃদ্ধি পায় বলিয়া উদরাময় ও পিত্তশূল বেদনায় রোগীর জন্য এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায় না? উ—হাঁ, কিন্তু ম্যালেরিয়া ঘটিত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এই ঔষধ দেওয়া যায়। প্র—ডাক্তারী শাস্ত্রে আপনার এই পর্য্যন্ত যতদূর জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তাহাতে ৬ই, ৭ই ও ৮ই তারিখে আপনি কুমারের জন্য এই ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন? উ—হাঁ। প্র—আপনি বেশ জানেন যে, মেজরাণী এই কোর্টে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, শ্রীপুর মামলায় আপনার সাক্ষ্য দ্বারা তাহা মিথ্যা হইয়া যায়? উ—হাঁ। বি, সি, চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী আরও বলেন, তিনি যখন মেজরাণীর সাক্ষ্য

পাঠ করেন, তখন তিনি এই গরমিল বুঝিতে পারেন এবং এই সম্পর্কে ভাবিতে থাকেন। শ্রীপুর মামলায় সাক্ষী বলিয়া থাকিতে পারেন যে, মেজকুমার বেদনায় এপাশ ওপাশ করিতেছিলেন। সাক্ষীর এই উক্তি এবং মেজরাণীর সাক্ষ্যের মধ্যেও গরমিল আছে কি না, সাক্ষী তাহা বলিতে পারেন না। প্র - ৮ই তারিখে ভোর ৭টার কি ৮টার সময় ডাঃ কালভার্ট আসিয়াছিলেন এই কথা কি সত্য? উ—হইতে পারে। যদি শ্রীপুর মামলায় একথা বলিয়া থাকি তবে সত্যই, কিন্তু আমার স্মরণ নাই।

প্র—বৃষ্টি হইলে শ্মশানের নিকটবর্ত্তী টিনের চালায় আশ্রম নেওয়া যায়? প্র—আমি বলিতে পাবি না। টিনগুলো রং করা ছিল কি না সাক্ষীর তাহা স্মরণ নাই। প্র—আপনি রাত্রিতে গিয়াছিলেন, সুতরাং আপনার স্মরণ থাকিতে পারে কি করিয়া? উ—আমি রাত্রিতে যাই নাই। প্র—আপনি সারদা ঘোষকে বলিয়াছিলেন যে শ্মশান ক্ষেত্র হইতে টিনের চালা ২।৩ মিনিটের রাস্তা। বৃষ্টির সময়ে লোকজন যাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে তারই জন্য ঐ টিনের চালা। উ—হাঁ। সাক্ষী যখন উহা বলেন তখন তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, বৃষ্টিতে আশ্রয় লইবার জন্য ঐ টিনের চালা ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্র—আপনি কি এখন বলিতে চান যে, ৯ই দার্জ্জিলিং শ্মশানক্ষেত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল? উ—না। সাক্ষী বলেন, কুমারের শব পাকা চুলায় কি কাঁচা চুলায় দাহ করা হইয়াছিল সাক্ষী তাহা মনে করিতে পারিতেছেন না।

প্র—আমি আপনাকে বলিতেছি যে, ১৯১০ সালে কুমারের অনুসন্ধানে আপনি সত্যবাবুর খরচে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছেন। উ—নিশ্চয়ই নহে। প্র—যদি অপনি মেজকুমারকে পাইতেন, তাহা হইলে তখন তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হইত? উ—না। প্র—তাহা না হইলে সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঢাকা ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধে ৫ জন সাধুর ফটো তুলিবেন কেন? উ-জানি না। ১৯১০ সালে ভ্রমণ করিবার সময় সাক্ষীর সহিত কোন সাধুর সাক্ষাৎ হয় নাই। প্র—সাধু দেখিলে কি আপনি চোখ বুজিয়া থাকেন? (হাস্য) উ—না। ১৯০৯ সালের পূর্ব্বে সাক্ষী প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের নাম শুনিয়াছিলেন। তিনি ডাক্তার ছিলেন কি না সাক্ষী তাহা জানেন না। ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ৯ই তারিখ ষ্টেপ এসাইডে গিয়াছিলেন কি না সাক্ষী আজ পর্য্যন্ত তাহা শুনেন নাই। কৌমুদী চৌধুরীর উদ্বোধন বক্তৃতায় তিনি ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের নাম শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু সাক্ষীর তাহা স্মরণ নাই।

জেরার উত্তরে সাক্ষী আরও বলেন যে মেজকুমার মৃত্যুর পুর্ব্ব পর্য্যন্ত কথা কহিয়াছিলেন। সাক্ষী মেজকুমারকে ভালবাসিতেন এবং শ্রদ্ধাও করিতেন। মেজকুমারের শেষ কথা সাক্ষীর মনে নাই। এই মামলার শুনানি আরম্ভ হওয়ার পরে সাক্ষী শুনিয়াছেন যে, সত্যবাবুর ডাকনাম আল্লাপদ। সাক্ষী পূর্ব্বে ইহা জানিতেন না। ৭ই রাত্রিতে কুমারের যখন বাথা হইয়াছিল তখন মেজরাণী অথবা সত্যবাবু অথবা সাক্ষী অথবা অন্য কেহ কুমারের ঘরে ছিলেন কি না সাক্ষীর মনে নাই। ৭ই প্রাতঃকালের ঘটনার কথা সাক্ষীর মনে নাই। কিন্তু তুপুর বেলায় যে মেজকুমারের জ্বর হইয়াছিল, তাহা সাক্ষীর মনে আছে। তখন মেজরাণী বা অন্য কোন লোক ক্যালভার্টকে ডাকিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিনা সাক্ষীর তাহা মনে নাই। তখন মেজরাণী পতিপরায়ণা ছিলেন। প্র—আমি বলিতেছি মানহানির মামলায় আপনি বলিলাছিলেন যে, কুমারের মৃত্যু আসন্ন, এই কারণে কুমারের লোকেরা বাহিরের লোকজন ডাকিতে গিয়াছিল, সুতরাং সন্ধ্যার সময় বহু লোক ষ্টেপ-এসাইডে সমবেত হইয়াছিল? উ—না।

প্র—ডাঃ ক্যালভার্ট বিলিয়ারী কলিকের জন্য ঔষধ দেন। "তিনি নিজে প্রেসক্রিপশন লেখেন, তাঁহার নির্দ্দেশ মত আমি ২।১ খানা প্রেসক্রিপশন লিখেছিলাম" এই কথা আপনি বলেছিলেন? উ—হাঁ। প্র—বীরেনবাবুর কাছে বলেছিলেন কিনা সেদিন ১২।১ টার সময় নিবারণ সেন কুমারকে দেখিতে আসিয়াছিলেন? ক্যালভার্ট যখন ২টার সময় আসিলেন তখন নিবারণ সেন সেখানে ছিলেন? উ—হাঁ। প্র—এস, সি, ঘোষের কাছে বলেছেন—৪।৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি বিলিয়ারী কলিকে ভুগিতেছিলেন ইহাতে অসহ্য যন্ত্রণা ও পাতলা বাহ্য হইত। একবার বাহ্যের সঙ্গে রক্ত পড়িয়াছিল? উ—হাঁ।

প্র—বিলিয়ারী কলিকে কি করে রক্তদাস্ত হয় তাহা আজ বলিতে পারিবেন কি? উ—না। প্র—৪।৫ বৎসর আগে যে বল্লেন তাহা তো লিউকিসের চিকিৎসার সময়ের কথা? উ—হাঁ, তবে আমি জানি না। প্র—টিপটেনের বোতলে যে লেখা আছে এমেলিশাস ডিস্পেপসিয়া ইহা কি বিলিয়ারী কলিক? উ—না। প্র—বিলিয়ারী কলিকের রক্তদাস্ত হওয়ার উদাহরণ যখন দিতে বলেছিলাম তখন কি মেজকুমারের কথা ভুলে গিয়াছিলেন? উ—হাঁ। প্র—আপনি কখনো রক্তদাস্তের জন্য মেজকুমারের চিকিৎসা করেছেন? উ—না। প্র—দার্জ্জিলিংএ যাইবার পূর্ব্বে কুমারের যখন রক্তদাস্ত হয় তখন আমি

জয়দেবপুরে ছিলাম।" প্র—দার্জ্জিলিং যাওয়ার কত বৎসর পূর্ব্বে উহা হয়েছিল? উ—মনে নাই। আমি তখন কুমারের চিকিৎসা করি নাই, বা তাহার আলোচনা করিতাম না।

প্র—যদি রক্ত অন্ত্রে পড়িয়া গুহ্যদ্বার দিয়া বের হয়ে যায় তবে তাহা অবশ্য 'কাল রং' হবে, তাহা জানেন কি? উ—আমি জানি না। আমি জানি না ঐরূপে রক্ত আসিলে তাহার সঙ্গে অন্য কিছু মিশে কি না। জেরার উত্তরে সাক্ষী আরও বলেন—কুমারের ঐ অসুখের সময় রাণী বিলাসমণি জীবিত ছিলেন। একবার না বেশীবার রক্ত পড়েছিল মনে নাই। তখন শীতকাল কি গ্রীষ্মকাল ছিল তাহা মনে পড়ে না। আমার পিতা আমাকে ডাকিয়া রক্ত দেখাইলেন না 'আশু আমার রক্ত পড়েছে' বলে কুমারই আমাকে ডেকে দেখাইলেন মনে নাই। প্র—চোখ বুজলে আপনি কি দেখেন—খালি রক্ত? উ—হাঁ, রক্ত দেখি, মনে পড়ে তাঁর রক্ত পড়ছে আমি দাঁড়িয়ে আছি। প্র—(একটা পোষ্টকার্ডে সই দেখাইয়া) এটা কি আপনার সই? উ—হাঁ। "প্রণত; আশুতোষ দাসগুপ্ত" লেখা আমার হাতের।

প্র—৪ঠা মে (আত্ম পরিচয়ের দিন) আপনি বাড়ী ছিলেন? উ—ছিলাম। জেরার উত্তরে সাক্ষী আরও বলেন—সেদিন আত্ম পরিচয়ের কথা শুনিয়াছি কিনা মনে নাই, পরদিন শুনিয়াছি। তখন বাদী "অলকা ঝির" নাম করিয়াছেন ইহা শুনিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। প্র—আপনার কানে ইহা গিয়াছিল কি না যে আত্ম-পরিচয়ের দিন তিনি বলেছিলেন—"আমি মধ্যমকুমার, নাম রমেন্দ্রনারায়ণ রায়।" উ—মনে নাই। "প্রত্যহ ৪।৫ হাজার করিয়া লোক সাধুকে আসিয়া দেখিতেছে" ইহা শুনিয়াছিলাম কি না—মনে নাই। কেহ কেহ আসিয়া নজর দিতেছে একথা ৫ তারিখে শুনেছিলান কি না মনে নাই। প্র—৪।৫ তারিখে আপানার অভিমত ছিল কি না "প্রত্যেক নরনারীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে মধ্যমকুমারই আসিয়াছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই?" উ—মনে নাই। প্র—প্রজারা দুই লাখ টাকা চাঁদা তুলিয়া দিবে একথা ৫ই তারিখে জানিতেন কি? উ—মনে নাই। প্র—৫ই তারিখে এবিষয়ে হৈ চৈ হইয়াছিল তাহা মনে আছে? উ—মনে নাই। প্র—এই কথা সত্য হইবে কি না? উ-বলিতে পারিব না। প্র—আত্মপরিচয়ের পরে এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে বাদীকে দেখিতে যাওয়ার আগে বলেছিলেন কি না যে ইনি "মধ্যমকুমার নয়"? উ—আগে বলি নাই। আত্মপরিচয়ের পর বলিয়াছিলাম যে, তিনি মধ্যমকুমার

নহেন। প্র—বাদী নিজেকে রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলিয়া পরিচয় দিবার পর আপনি অশান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন কি? উ—হাঁ, লোকের উপহাসের অশান্তিতে পথ দিয়ে চলা যায় না। প্র—দেখুন! এই চিঠিখানি আপনি শৈলেন্দ্র মতিলালের কাছে লিখিয়াছেন কি না? উ—হাঁ, আমি যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাই লিখিয়াছিলাম। 'আমি শুনিয়াই লিখিয়াছিলাম' ইহা চিঠিতে ত নাই। (চিঠিখানা দাখিল করা হইল।)

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মতিলালের নিকট লিখিত।

ডাঃ আশুতোষ দাস-গুপ্তের পত্র

"জয়দেবপুর ৫ই মে, ২১ সাল

শ্রীচরণেষু—

ভাওয়ালে একটী অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছে, যাহা কখনও উপন্যাসে শুনি নাই। এখানে বুদ্ধু বাবুদের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী সাধু আসিয়াছে, তিনি প্রকাশ করিয়াছেন 'আমি মধ্যম কুমার, নাম রমেন্দ্রনারায়ণ রায়' এবং অলকা ঝির নাম বলিয়াছে। প্রজারা ২০০০০০৲ দুই লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিবে। প্রত্যহ ৫.৬ হাজার টাকা নজরও দিতেছে এবং ভাওয়ালের প্রত্যেক নরনারীর মনে স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে মধ্যমকুমারই আসিয়াছে। এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ব্যাপার নিয়া মহা হৈ চৈ আরম্ভ হইয়াছে। 'আমি আসিয়া মিথ্যা বলিয়াছি' এইজন্য ভাওয়ালের লক্ষ লক্ষ লোক আমাকে দোষারোপ ও নানাপ্রকার ঠাট্টা, বিদ্রূপ করিতেছে। এজন্য বড়ই অশান্তিতে দিন কাটাইতেছি।"

প্রণতঃ—আশুতোষ দাসগুপ্ত

পরিশিষ্ট—৩

সত্যেন ব্যানার্জির জেরা

মিঃ চাটার্জ্জির জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন, তিনি বিভাবতীর স্বার্থই বরাবর দেখিয়া আসিতেছেন এবং সাক্ষী এই মামলায় বিভাবতীরই স্বার্থ দেখিতেছেন। বিভাবতীর স্বার্থ থাকায় সাক্ষীও এই মামলা সম্পর্কে আগ্রহ দেখাইতেছেন। প্র—বিভাবতী এই আদালতে সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, আপনি এই মামলায় তাহার উকিলকে উপদেশ দিয়াছেন—আপনি তাহার এই উক্তি স্বীকার করেন কি? —উ—হাঁ!

প্র—আপনি কি জানেন যে বাদী বলিয়াছেন বিভাবতীর পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের সংলগ্ন আঙ্গুলটা অস্বাভাবিক বড় এবং আরও অন্যান্য নানাস্থানে চিহ্নও আছে? উ—হাঁ। প্র—আপনি কি জানেন যে মিঃ এ, এন, চৌধুরী আমার মক্কেলকে বলিয়াছেন যে বিভাবতী দেবীর শরীরে ঐ সব চিহ্ন নাই? উ-চিহ্ন সবগুলি নাই, আমি একটা চিহ্নের কথা শুনিয়াছি।

প্র—আপনি কি জানেন যে উকিলদের এই বিষয়ে বলিবার জন্য তিনি আপনাকে খবর দিয়াছেন? উ—আমি এ বিষয় পড়িয়াছি। প্র—আপনি এ বিষয়ে কাহাকেও কোন উপদেশ দিয়াছেন? উ—দিয়াছি। হয় আমি লিখিয়াছিলাম অথবা এ বিষয়ে মুখে বলিয়াছিলাম। প্র—আমি বলছি যে আপনাদের আশা ছিল যে আপনার বা বিভাবতী দেবীর সাক্ষার কাঠগড়ায় আসিতে হইবে না। উ—না। প্র—আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন যে যদি তিনি সাক্ষ্য দিতে না আসিতেন তবে তাহার চক্ষুর নীচের পাতা যে বসা আর পায়ের আঙ্গুল যে বড তাহা জজ সাহেব দেখিতে পাইতেন না? উ—ঐ গুলি কোন চিহ্ন নয়। প্র—আপনি কি জানেন যে বিভাবতী দেবীর যে সন্তান সম্ভাবনা হইয়াছিল সে বিষয়ে মিঃ চৌধুরী বিল্লুবাবুকে পুনরায় ডাকাইয়া জেরা করিয়াছিলেন? উ-আমি জানিতাম। প্র—আপনি কি জানেন কেন মিঃ চৌধুরী ঐ বিষয়ে বিল্লুবাবুকে জেরা করিয়াছিলেন? উ—আমি জানিনা। এ বিষয়ে আমি কোন পরামর্শ দেই নাই। সম্ভবতঃ বিভাবতীই ঐ বিষয় পরামর্শ দিয়াছিল। প্র—ইহা কি সত্য নয় যে আপনি এবং আপনার পক্ষের অন্য লোকে বাদীর বড় পায়ের কথা বলিয়াছেন? উ—আমি বলি নাই। বাদীর পা দেখিবার সুযোগ পর্য্যন্ত আমার হয় নাই।

প্র—এস পি, ঘোষালকে মিঃ চৌধুরী উপদেশ ছাড়া জেরা করিয়াছেন, এ কথা বলিবেন কি? উ—না। যখন ঘোষালের জেরা হয় তখন আমি কলিকাতায় ছিলাম। প্র—আপনি কি জানেন যে মিঃ চৌধুরী ঘোষালকে জেরা করিবার সময় বলিয়াছিলেন যে মেজকুমারের পা মেয়েদের মত ছোট ছিল এবং তিনি ৬নং জুতা পরিতেন? উ—জানিতে পারি। মেজকুমারের পা যে ছোট ছিল ইহা সত্য কথা। মেজকুমার ৬নং জুতা পরিতেন তাহা আমি জানি না। প্র—মেজকুমার ৬নং জুতা পরিতেন তাহা আজই কি প্রথম শুনিলেন? উ—এ বিষয়ে কোনও আলোচনা পূর্ব্বেও শুনিয়া থাকিতে পারি। ঐ সময়েই অথবা পরেও শুনিতে পারি। প্র—ঐ সময়ে মানে কি? উ—ঘোষালের

সাক্ষ্যের সময়। কোথায় এই বিষয় আলোচনা হইয়াছিল ঠিক মনে নাই, তবে কলিকাতায়ই হইয়াছিল। যখন এখানকার উকিলেরা যায় তখন হইয়াছে। আবার বাড়ীতেও হতে পারে। শিশির বাবুর বাড়ীতেও হতে পারে। শিশির-বাবু দমদমে থাকেন।

জেরার উত্তরে সাক্ষী আরও বলেন—৬নং জুতা সম্বন্ধে কে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। আমার পরিচিত কেহ দেয় নাই। ইহার মধ্যে আমি বিভাবতীকেও অন্তর্ভুক্ত করিতেছি। বহুপূর্ব্বে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস কর্ত্তৃক মুচি এবং দর্জ্জিদের কাছে অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। মিঃ চৌধুরী নিশ্চয়ই সেই সব কাগজ পত্র দেখিয়াছেন। বহু পূর্ব্বে মানে বাদী আসিবার পরই ঐ অনুসন্ধান করা হয়। এই অনুসন্ধান যতদূর শুনিয়াছি গত ২।৩ বৎসর যাবৎ চলিয়াছে। আমি নিজেও এই অনুসন্ধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। অনেক ব্যাপারে আমি পরামর্শ দিয়াছি তবে কোন তুলনামূলক ব্যাপারে কিছু বলি নাই, কারণ এই সব উকিলের ব্যাপার। এই সব উকিলের মধ্যে রায় বাহাদুর এস্. কে ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন। প্র—আপনি কি বলিতে চান এই মামলায় গভর্ণমেণ্ট বিবাদী? উ—না, তাহা জানি না। প্র—আপনি কি হলপ করিয়া অস্বীকার করিবেন যে রাণী বিভাবতীই বোর্ড অফ রেভিনিউকে জানাইয়াছেন যে মেজকুমার ৬নং জুতা পরিয়াছেন? উ—বিভাবতী দেবী কখনও বলে নাই। তবে বিভাবতীর পক্ষে কোন কর্ম্মচারী জানাইতে পারে। প্র—আপনি কি বলিতে চান যে মেজকুমার ৬নং জুতা পরিতেন না। উ—ইহা আমি বলি না, আমি জানি না। প্র—ইহা কি সত্য নয় যে আপনি এবং আপনার দল মিঃ চৌধুরী জেরায় ইহাই বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন যে মেজকুমার ৬নং জুতা পরিতেন? উ—না।

প্র—আপনি কি জানেন যে মিঃ চৌধুরী ঘোষালকে জানাইলেন যে বাদীর পা মেজকুমারের চেয়ে বড়? উ—হতে পারে মনে নাই, আমি বলি না মিঃ চৌধুরী কিছু বানাইয়া বলিয়াছেন। আমি জানি যে মিঃ এ, এন, চৌধুরী আমার বোনের পক্ষে জেরা করিয়াছেন।

প্র—আপনি কি জানেন যে বাদীর পা কোর্টে জুতা পরাইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে? উ—হাঁ কাগজে পড়িয়াছি। প্র—আপনাদের মামলাই হচ্ছে যে বাদির পা মেজকুমারের পায়ের চেয়ে বড় ছিল? উ—হতে পারে। প্র—আপনি মেজকুমারকে কখনও খালি পায়ে দেখেছেন? উ—হাঁ নিশ্চয়ই।

প্র—আমি বলিতেছি আপনি বড় কুমার ও ছোট কুমারকে কি ভাবে সন্তুষ্ট রাখিতেন তাহা আপনি গোপন করিয়াছেন? উ—না। প্র—আপনি কি স্বীকার করিবেন যে ছোটকুমারের রক্ষিতা সম্পর্কে ডায়েরীতে আপনি যাহা লিখিয়াছেন কোন সৎলোক তাহা লিখিতে পারিতেন না? উ—উহা আমার "প্রাইভেট ডাইরী।" প্র—ডাইরীর ঐ সব লেখা দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে আপনি কিরূপ লোক? উ—আমি তাহাদের আচরণ সমর্থন করিতাম না। আমি তাহা সমালোচনা করিয়াছি। প্র—আমি বলিতেছি যে, কামুক লোক ভিন্ন এইরূপ কেহ লিখিতে পারে না। (প্রশ্ন অগ্রাহ্য করা হয়)। প্র—ঐ সব লেখার দ্বারা কি ইহাই বুঝাইতেছে না যে আপনি বারবনিতা সম্পর্কিত প্রশ্ন আলোচনা করিতে মোটেই কুণ্ঠা বোধ করিতেন না? (প্রশ্ন অগ্রাহ্য করা হয়)। প্র—আমি বলিতেছি যে, ঐ সব লেখা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে আপনার মত লোকের পক্ষে কুমার দুই জনের জন্যই বারবনিতা আনা সম্ভব ছিল। উ—না ইহা অপমান জনক প্রশ্ন। ইহা সংবাদ পত্রে সস্তা বাহবা পাওয়ার মত প্রশ্ন।

ইহাতে মিঃ চাটার্জ্জী রাগিয়া যাইয়া বলেন 'পুনরায় বেয়াদবি করিবেন না।' চাটার্জ্জী সাক্ষীকে কয়েকটী অত্যন্ত কড়া কথা বলেন।

প্র—কলিকাতা যাইয়া আপনি টাকার জন্য খুব তাগিদ দিতে থাকেন? উ—প্রয়োজন যাহা তাহাই চাহিতাম। সাক্ষী ভাবিতেন যে, এষ্টেটের এরূপ কতগুলো পাওনা টাকা ছিল যাহা আদায় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। নীডহাম সাক্ষীকে বলিয়াছিলেন অথবা এই মর্ম্মে চিঠি লিখিয়াছিল, যে, সাক্ষীর ভগিনীর চিকিৎসা এখানেই হইতে পারিত, এবং তাহাদের কলিকাতা যাইবার দরকার ছিল না। ঢাকার সিভিল সার্জ্জেন কর্ণেল হল এক চিঠিতে বিভাকে ঢাকায় চিকিৎসা করাইলে ভাল হইবে এইরূপ কিছু লিখিয়াছিলেন কি না সাক্ষী তাহা জানেন না। মনোমোহন ভট্টাচার্য্য ঢাকা নলগোলা হইতে সাক্ষীর সমস্ত চিঠি চুরি করিয়াছিলেন।

সাক্ষী স্বীকার করেন যে, ১৩১৪ সনের ৩০শে আষাঢ় তিনি ও বিভা কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ সময় বড়কুমারের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। বড় কুমারের মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে সাক্ষী ও বিভাবতী কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

'প্র—আপনি কি অবগত আছেন যে ঢাকা কালেক্টরের অভিমত এই যে

আপনি কোন গূঢ় উদ্দেশ্যের জন্য বিভাবতীকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিলেন? উ—না। ইহা কি সত্য নহে যে, ১৯০৯ সালের মে মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত বড় কুমার তাঁহার হিসাবের টাকা হইতে ৭১১৪ টাকা এবং বিভাবতী তাঁহার হিসাবের টাকা হইতে ১১৮৯৪ টাকা আদায় করেন? উ—বলিতে পারি না। বিভা যে পরিমাণ টাকা আদায় করে তাহা চেকমুড়ি হইতেই নির্দ্ধারণ করা যাইবে। সাক্ষী ঐ সব চেকমুড়ি দাখিল করিতে পারেন।

জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন—কোর্ট অব ওয়ার্ডস হইতে তাঁহার অংশ মুক্ত করিবার জন্য বিভাবতী রেভিনিউ বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন। ঢাকায় ঐ দরখাস্ত সম্পর্কে শুনানী হয়। এস, পি, সিংহ বিভাবতীর পক্ষে ছিলেন, সাক্ষী সিংহকে লইয়া ঢাকায় আসেন। প্র—আপনি কি জানেন যে, কোর্ট অব ওয়ার্ডস ছোটকুমারের এবং আপনার ভগিনীব দরখাস্তের বিরোধিতা করিবার প্রধান কারণ, বিভাবতী আপনার হাতের ক্রীড়া পুত্তলিকা ছিলেন এবং আপনি এষ্টেটের আয় ভোগ করিতেন? উ—না। আপনার কি স্মরণ আছে যে, বিভাবতী তাঁহার দরখাস্তে বলিয়াছিলেন যে, আপনি গ্রাজুয়েট এবং তাহার পক্ষে আপনি এষ্টেট পরিচালনা করিতে পারিবেন? উ—হাঁ।

প্র—এখন আপনি দেখিতে পাইতেছেন যে, তাহাকে (বিভাকে) প্রতি মাসে ১১ শত টাকার বেশী দেওয়া হয় নাই বলিয়া দরখাস্তে যে সব অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সত্য নহে। উ—ব্যক্তিগত খরচ সম্পর্কে যে সব অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সত্য। প্র—আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, জনষ্টোন বলিয়াছেন, নিজের স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যেই বিভাবতীর ভাই এষ্টেট পরিচালনার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। ফলে অবস্থা আরও খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং তাহার (বিভার) এষ্টেট পরিচালনা সম্পর্কে তাঁহার ভাইকে বিশ্বাস করা যায় না? উ—না।

প্র—আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাত হইতে ষ্টেট মুক্ত করিবার জন্য বিভাবতী যে দরখাস্ত করেন তৎসম্পর্কে জনষ্টোন দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই যে বিভাবতীর ভাতা'র অধিকাংশ টাকা এবং অন্যান্য টাকা তাহার ভাইয়ের হাতে যায়। উ—না। সাক্ষী মাঝে মাঝে বহু টাকা তাহার ভগ্নীর নিকট হইতে পাইয়াছেন। কিন্তু তাহার অধিকাংশ টাকাই তিনি গ্রাস করিয়াছেন এ কথা সত্য নহে। গত ২—৩ বৎসর যাবত বিভাবতী মাসিক ২০০০ টাকা করিয়া ভাতা পাইতেছে। ইহার পূর্ব্বে কয়েক

বৎসর পর্য্যন্ত তাহার ৭০০০ টাকা মাসিক ভাতা ছিল। ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেটের মোট আয় প্রায় ৮ লক্ষ টাকা হইবে। ১৯১৪ সালে সাক্ষীর নামে ৬০ হাজার টাকা মূল্যে ১৯নং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ী ক্রয় করা হয়। সাক্ষী ২০ হাজার টাকা দেন এবং অবশিষ্ট ৪০ হাজার টাকা বিভাবতী দেয়।

প্র—আপনি কি অবগত আছেন যে, আপনি এখানে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাতে আপনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে, ৭ই সন্ধ্যাকালে কুমারের প্রথম আর্সেনিক বিষ প্রয়োগের লক্ষণ দেখা যায়। উ ইহা আদালতের বিচার্য্য বিষয়।

প্র—আপনি কি অবগত আছেন আপনি এখানে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে আপনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে আপনি ক্যালভার্টের নিকট এমন সব বিষয় গোপন করিয়াছেন, যাহা গোপন রাখা না হইলে আর্সেনিক বিষ প্রয়োগ হইয়াছে এইরূপ সন্দেহ তিনি করিতে পারিতেন? উ—কোর্ট তাহা বিচার করিবেন। দার্জ্জিলিংএর ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষী যাহা বর্ণনা দিয়াছেন, সাক্ষীর রোজনামচার দ্বারা উহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে সাক্ষী তাহা মনে করেন না। প্র—রিক্সা ভিন্ন বেলা ২টার সময় শ্মশান ক্ষেত্র হইতে ষ্টেপ এসাইডে যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব ছিল? উ—রিক্সা করিয়া যাই নাই। প্র—আপনি যদি দিনে ২টার সময় ষ্টেপ এসাইডে পৌছিয়া থাকেন, তাহা হইলে কখন শবদাহ শেষ হইয়াছিল? উ—তাহার ১ঘণ্টা পূর্ব্বে। প্র—আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন যে, আপনার জবানবন্দীতে শব সৎকারের যে সময়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এখন তাহা অনেক আগে হইয়াছিল বলিয়া বলিতেছেন? উ—আমার ধারণা ছিল যে, অপরাহ্নে শবদাহ শেষ হইয়া থাকিবে।

প্র—বেলা ১টার মধ্যে যদি শবদাহ শেষ হইয়া থাকে তাহা হইলে শবদাহ সম্পর্কে নিশ্চয়ই কোন অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। উ-শবদাহ ১টার মধ্যে শেষ হইয়াছিল, একথা আমি কখনও বলি নাই। শব সৎকারের সময় পৌরোহিত্য কে করেছিল তাহা আমার স্মরণ নাই। স্থানীয় কয়েক জন লোক মন্ত্র পাঠ করে।

সাক্ষী বলেন, বিভার কখনও ফিট হইয়াছিল কিনা তাহা এখন তাঁর স্মরণ নাই। সাক্ষী জানেন যে বিভাবতী তাঁহার ফিট হইবার কথা অস্বীকার করিয়াছেন। প্র—আপনি কি বুঝিতে পারেন যে, যদি বিভাবতী দেবীর ফিট হইয়া থাকে, তবে আপনার বক্তব্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়? উ—আমার মনে

হয় না। প্র—আপনি বলিয়াছেন বিভাবতী দেবী বরাবর শবের পাশে ছিলেন, আপনার এই উক্তি সমর্থনের উদ্দেশ্যেই কি আপনি অস্বীকার করিতেছেন না যে, তাঁহার ফিট হইয়াছিল?—উ—না।

পরিশিষ্ট—৪

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর আত্মকথা

আমার নাম কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায়, পিতার নাম ৺রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়। আমার বয়স ৫০ বৎসর, ব্যবসা জমিদারী।

আমার ঠাকুরদাদার নাম রাজা কালীনারায়ণ রায়। আমার ঠাকুরমার নাম সত্যভামা দেবী। মার নাম রাণী বিলাসমণি। আমি বাদী। আমরা তিন ভাই, তিন বোন। আমি মধ্যম ভাই, আমার বড় ভাইয়ের নাম রণেন্দ্র, ও ছোট ভাইয়ের নাম রবীন্দ্র, তাঁহারা মারা গেছেন। আমার বড় বোনের নাম ইন্দুময়ী দেবী, তিনি সকলের চেয়ে বড়। মধ্যম বোনের নাম জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী। ইন্দুময়ী দেবী মারা গেছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী বেঁচে আছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী আমার বড় ভাইয়ের বড়। আমার তৃতীয় বোনের নাম তড়িন্ময়ী দেবী। তিনি বেঁচে আছেন, তিনি ছোট কুমারের ছোট. আমি ও ছোট বলিয়া ডাকিতাম। ছোট কুমার বড় কুমারকে বড়দা বলিয়া ডাকিত। আমার জিহ্বা মোটা হইয়া গেছে, তাই অস্পষ্ট। আমার জিহ্বার নীচে একটা মাংসপিণ্ড আছে। দার্জ্জিলিং যাইয়া অসুখের কথা মনে আছে, জিহ্বার ঐ দোষ দার্জ্জিলিং যাইয়া অসুখের পর হইয়াছে। আমার মাতৃভাষা বাংলা।

আমি বাংলা ভাষায় কথা কহিতেছি। আমার ভাষার টান আছে কি না বুঝি না, বাহিরের লোক বুঝিতে পারেন। আমার ভাষার টানের কারণ আমি ১২ বছর সন্ন্যাসীদের কাছে ছিলাম ও এই ১২ বছর হিন্দুস্থানীতে কথা বলিয়াছি,

তাহারাও আমার সাথে হিন্দিতে কথা বলিত। এই জন্য হিন্দির একটু টান থাকিতে পারে। বিবাহ হইয়াছিল ১৩০৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে, আমার স্ত্রীর নাম বিভাবতী। আমার বিবাহ জয়দেবপুরে হইয়াছিল। আমার বিবাহের সময় আমার বয়স ১৮।১৯ বছর হইয়াছিল, আমার স্ত্রীর তখন ১৩ বছর ছিল। আমি সত্য ব্যানার্জ্জিকে চিনি। তিনি আমার স্ত্রীর ভাই। যখন আমার বিবাহ হয় তখন সত্যেন আমার সমবয়সী ছিল, সে তখন পড়তো। আমার বিবাহের সময় আমার শ্বাশুড়ী, দুইটী শালী বেঁচে ছিল, তাহারা থাকিত উত্তর পাড়া। উত্তরপাড়া রামনারায়ণ মুখার্জ্জির বাড়ী, রামনারায়ণ মুখার্জ্জি আমার মামাশ্বশুর। আমার পিতা ১৩০৮ সনে মারা যান্ ১২ই বৈশাখ। আমার মা ১৩১৩ সনের ৭ই মাঘ মারা যান, আমার ছেলেবেলার কথা মনে আছে। ছেলেবেলা পশুপক্ষী নিয়া জীবন কাটাইয়াছি। কবুতর, হাঁস, পাঁঠা খাসীর গাড়ী, গাড়ীতে খাসী জুড়িয়া চালাইতাম। খাসীর গাড়ী আমি নিজে চালাইতাম। লেখা-পড়ায় আমার মন যাইত না। আমার মাষ্টার ছিল। আমার দ্বারিক বাবু মাষ্টার ছিল। দ্বারিক মাষ্টার আমায় ৭।৮ বৎসরের সময় আসেন। দ্বারিকমাষ্টারের কাছে ক, খ, গ ঘ লিখিয়াছি A, B, C শিখিয়াছি। লেখাপড়ার দিকে মন দেই নাই।

দ্বারিক মাষ্টার বলিত 'তুমি রাজার ছেলে. নাম দস্তখত করিতে শেখ'। দ্বারিক মাষ্টারের কাছে নাম দস্তখত করিতে শিখিয়াছি; ই রাজী ও বাঙ্গলা দস্তখত ছাড়া আর কিছু…। (The witness is asked to write and the written paper as tendered and marked.)

A document is filed in court on behalf of the plaintiff and marked Ext. 3 series the singuatures of the plff. tendered and marked Ext. 3 (5—6)

জয়দেবপুর চিড়িয়াখানা ছিল, তাহা আমার পিতার মৃত্যুর পরে হয়। চিড়িয়াখানা হওয়ার পূর্ব্বে পশু, পাখী আমার বৈঠকখানার বারান্দায় থাকিত; চিড়িয়াখানা আমি করি; সমস্ত পশু, পাখী চিড়িয়াখানায় নেওয়া হয়; চারিটী বাঘ, দুইটা বড় ও ছোট বাঘ। বারান্দার পশু-পাখী আনা হয়। চারিটি বাঘ একটা শিয়াল আমাকে কৈলাশ চক্রবর্ত্তী দেন। কৈলাস চক্রবর্ত্তী বলধার কর্ম্মচারী ছিল। ২টা বনমানুষ, একজোড়া শম্বর, একজোড়া ছোট হরিণ, একজোড়া কৃষ্ণসার, একটা উট ছিল, একটা কুমীর ছিল, একটা গাধা ছিল, কুমীরটা পুষ্করিণীর মধ্যে ছিল, একজোড়া শালিক, ১৫।১৬টা ময়ুর

ছিল, রাজহাঁস ছিল, উটপাখী একজোড়া, ধনেশ পাখী ছিল, একজোড়া তিতির পাখী ছিল, কেনারী পাখী ছিল !

আমাদের Estateএর ও আমার নিজের হাতী ছিল। আমার নিজের চারিটা হাতী ছিল। আমার প্রধান মাহুত দিলবর ছিল। Estate-এর ১৪।১৫টা হাতী ছিল, ৪০।৫০টা ঘোড়া ছিল। অনেক গাড়ী ছিল, একটা রূপার গাড়ী ছিল। ব্রুহাম, টমটম্ ছিল। আমি হাতী চড়িতে পারিতাম, কানে ধরিয়া শুঁড় দিয়া উঠিতাম, আমি ঘোড়া চড়িতে পারিতাম; আমি গাড়ী চালাইতে পারিতাম, আমি সর্ব্বদা নীচ লোকের সাথে—যথা সহিস, কোচয়ান ইত্যাদির সাথে শীকার করিতে যাইতাম। বাঘ, ভল্লুক, হরিণ শিকার করিয়াছি; অনুকূল ঘোষ মাষ্টার ছিল আর একজন ছিল নাম মনে নাই। তার বাড়ী পশ্চিমবঙ্গে। Westen সাহেব মাষ্টার ছিল। তাহার কাছে কিছু শিখি নাই। তারপরে সে ঘোড়া হাতীর ম্যানেজার ছিল। সে আমাদের চেয়ে ঘোড়া হাতী ভাল manage করিতে পারিত। আমি Collegiate school-এ ১০।১৫ দিন পড়িয়াছিলাম। নিজেদের Camp ছিল। সেখানে চা বিস্কুট খাইতাম। জয়দেবপুরে Polo ground ছিল। সেই জায়গা পরিষ্কার করার সময় সেখানে বড় বড় গাছ ছিল, তালগাছ প্রভৃতি ছিল, আমি ও ছোট ভাই Polo খেলিতাম। বড় ভাই খেলে নাই। আমি ভোরে চা খাইয়া হাতী, ঘোড়া দেখিতাম। ঘোড়ার দানাটানা দলামলা ইত্যাদি দেখিতাম। হাতীকে স্নান করাইতাম ও খাওয়াইতাম। তার-পর চিড়িয়াখানায় বাঘ, ভল্লুক, হরিণ ইত্যাদিকে খাওয়া দিতাম। এই সমস্ত ব্যাপারে ২।৩টা বাজিত, তারপর স্নান করিয়া খাইতাম। তারপর কখনও শিকারে যাইতাম, কখনও হাতীতে ঘুরে বেড়াইতাম। এই রকম করিয়া সন্ধ্যা ৬টায় বাড়ী ফিরিতাম। বাড়ী ফিরিয়া তাস পাশা খেলিতাম, তারপর খাওয়া দাওয়া করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। আমি একবার লর্ড কিচেনার সাহেবের সাথে শীকারে গিয়েছিলাম, দার্জ্জিলিং যাওয়ার দেড়মাস আগে। Lord Kitchner এক হাতীতে যান, আমি ভিন্ন হাতীতে গিয়াছিলাম। দার্জ্জিলিং যাওয়ার আগে তিন ভাই কলিকাতায় গিয়াছি। বাবার মৃত্যুর পর আমরা কলিকাতায় বড় দিনের সময় যাইতাম। আমার শরীর অনুযায়ী আমার পা ছোট, আমার পা চিরকালই ছোট আছে।

আমার মার হাত পা ছোট ছিল। আমাদের রাজপরিবারের মধ্যে মেজ বোনের, ছোট ভাইর, বদ্ধুর হাত পা ছোট ছিল। বুদ্ধু জ্যোতির্ম্ময়ীর ছেলে।

বুদ্ধু মারা গিয়াছে। তিনি ভাদ্র মাসে মারা যান। আমার হাতের কব্জায় "রেখা" আছে।

আমি ১৪৪ ধারার মোকদ্দমায় Mr. Martin সাহেবের কাছে জবানবন্দী দিয়াছি। তখন হইতে এখন আমি মোটা হইয়াছি। তখন আমার হাতের ঐ রেখা আরও ভাল দেখা যাইত। আমাদের পরিবারে আমার, বাবার, আমার ছোট ভাইর, মেজ বোনের, বুদ্ধুর হাতে এই রকম রেখা ছিল, আমার ঠাইন পিসিরও ছিল। ঠাইন পিসির নাম কৃপাময়ী দেবী। আমার পায়ের পাতার চামড়া পুরু ও খসখসে। আমার পিতার, ছোট কুমারের, ঠাইন পিসির, মেজ বোনের, বুদ্ধু, মণির পায়ের চাম এই রকম ভারী ও খসখসে ছিল। জ্যোতির্ম্ময়ীর এক ছেলেই ছিল, নাম বুদ্ধু। আমার গায়ের রং-এর মত জ্যোতির্ম্ময়ীর, আমার ছোট ভাইরও ছিল। আমার চক্ষুর মত জ্যোতির্ম্ময়ী ও বুদ্ধু ও ছোট কুমারের কটা ছিল। তাহাদের চুলও কটা ছিল। আমায় গায়ে, হাতে ও পায় দাগ আছে। আমার ডান হাতে বাঘের থাবার দাগ আছে। বাঘ চিড়িয়াখানায় ছিল। ছোট বাঘের বয়স ৫।৬ মাস হইতে পারে। এই ঘটনা দার্জ্জিলিং যাওয়ার ৩।৪ বছর আগে হয়। সেই থাবলার দাগ আছে। আমার একটা দাঁত ভাঙ্গা। (Broken tooth shown to the Court) দুই আনী আছে, চৌদ্দ আনী গেছে। রাজবাড়ীর পশ্চিম দিক দিয়া Railway station-এর দিকে একটা রাস্তা, আমার ছোট ভাই হাতীতে আসিতেছিল। আমি টমটমে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে আসিতেছিলাম। ঘোড়া হাতী দেখিয়া ভয় পায়, তাহাতে পড়িয়া দাঁত ভাঙ্গে। আমাকে অশ্বিনী ডাক্তার দেখে। পড়িয়া যাইয়া যে দাঁত ভাঙ্গে সেই ভাঙ্গা দাঁত পাওয়া যায় নাই। আমার ছোট ভাই ও বোনের বিয়ের কথা মনে আছে। তাহাদের বিয়ের সময় আমি কাঁকের নীচে (বোগল দাবায়) লাঠি দিয়া হাটিতাম। আমার বাঁ পায়ের উপর দিয়া গাড়ীর চাকা চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া ঐ রকম ভাবে হাটিতাম, ছোট ভাইয়ের বিয়ের ৬।৭ দিন আগে ঐ ঘটনা আস্তাবলে ঘটে। ফিটন গাড়ীর চাকা চলিয়া গিয়াছিল। তাহাতে পা কাটিয়া গিয়াছিল (Shown to the Court) পা কাটিয়া যাওয়ায় আমি হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। তারপরে কাপড় ছিড়িয়া তেনা (নেকড়া) জলে ভিজাইয়া রাখিয়াছিলাম। আমার ৭।৮ বছরের সময় মাথায় একটা ফোট হইয়াছিল। দাগ আছে (Shown to the Court) আমার আরও একটা ফোট হইয়াছিল। তখন আমার ৮।৯ বৎসর বয়স। এই ফোটের

দাগ আছে। (Shown to the Court) আমার সিফিলিস্ হইয়াছিল, দার্জ্জিলিং যাওয়ার ৪।৫ বৎসর আগে হয়। মেয়ে মানুষ হইতে এই রোগ হয়। এই অসুখ আমার লিঙ্গে হয়। ত্রৈলক্য ডাক্তার এই অসুখ চিকিৎসা করে। বাড়ীর লোকেরা এই অসুখ জানিত, ঐ স্থানে ঔষধ লাগাইত দুইজন, বোচা ও নৈসা চাকর। আমার লিঙ্গে একটা তিল আছে। লিঙ্গের চামড়ায় তিল আছে, লিঙ্গের অসুখ সারিতে ২।১ মাস লাগে। তারপর আমার বাগী হয়, বাম দিকে। লিঙ্গের অসুখের ১ মাস পরে বাগী হয়। ডাক্তার দেখে, তাহা কাটান হয়। এলাহী ডাক্তার বাঘিটা অস্ত্র করে। বাগীর অস্ত্রের চিহ্ন আছে। ঘা শুকাইয়া ছিল, তারপর পা ও হাতে সিফিলিসের ঘা হইয়াছিল। সিফিলিসের দাগ হাতে পায়ে আছে, (Shown to the Court).

আমার পিতার মৃত্যুর পর আমার মা Estateএর charge নিয়াছিলেন, আমার বাবা মাকে trustee করিয়া গিয়াছে, তখন আমাদের Estateএ রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ ম্যানেজার ছিল। মায়ের আমলে তিনি dismissed হন। মা তাহাকে ডিসমিস্ করিয়াছিলেন। অনেক টাকা ভাঙ্গিয়াছিল। এই জন্য dismissed (ডিসমিস্) হন।

তিনি কাগজ-পত্র পুষ্করিণীর মধ্যে ও কিছুটা কূয়া-পায়খানায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যান। পুষ্করিণী ও কূয়া-পায়খানার কাগজপত্র সম্বন্ধে আমি জানি। আমার হুকুমে উঠান হয়। জালওয়ালা আনিয়া জাল খেও দিয়া ৭।৮ বস্তা কাগজ পুকুর হইতে উঠান হয়। যখন কূয়া-পায়খানা হইতে কাগজ উঠান হইয়াছিল তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কূয়া-পায়খানার উপরে খের ছিল। খের তোলা হইলে দেখা যায় খাতাপত্র। তারপরে টেটা মারিয়া কাগজের বস্তা তোলা হয়। পায়খানায় ময়লা ছিল বলিয়া টেটা দিয়া তোলা হয়। আমরা টাকা ভাঙ্গতির জন্য কালীপ্রসন্নের নামে ১০।১১ লক্ষ টাকার নালিশ করি। এই মোকদ্দমা ডিক্রি হইয়াছিল। ডিক্রি হওয়ার আগে কালীপ্রসন্ন ঘোষের সাথে ঢাকা নলগোলা আমার বাসায় দেখা হয়। তখন সেখানে আমার বড় ভাই ও ছোট উপস্থিত ছিল। কালীপ্রসন্ন ঘোষ আমাদের বলিল, "আমি পুরাণ কর্ম্মচারী, মাকে ব লয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও।" আমাদের কাছ থেকে কালীপ্রসন্ন ঘোষ একটা চিঠি নিয়া আসে। .তাহাতে আমরা দস্তখত করিয়া সেই চিঠি জয়দেবপুর মার নিকট পাঠাইয়া দিই। ৫০০০০৲ টাকায় আপোষ ডিক্রি হয়।

কালীপ্রসন্ন ঘোষের পরে আমার বড় ভায়ের শ্বশুর সুরেন্দ্র মতিলাল ম্যনেজার হন। তিনি এক বৎসর ম্যানেজার থাকেন। তারপর Mayer সাহেব manager হয়।

(Ext. B is shown and he identified his signature.

The signature is marked Ext. 2.)

Mr. Mayer দুই বছর manager ছিল। আমার মা তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। আমার ভাইকে দিয়া সে Estate court of Wards দেওয়াইয়া ছিল। যখন court of wards এ দেয় তখন আমার বড় ভাই কলিকাতায় ছিল। Mayer সাহেবের চাকুরী যাওয়ার পরে সে জয়দেবপুর ছাড়িয়া যায়। তাহার পর আমি সংবাদ পাই যে আমার বড় ভাই দার্জ্জিলিং গিয়াছেন। আমার দাদার সাথে দার্জ্জিলিং Mayer সাহেব ছিল। এই সংবাদ শুনিয়া আমি কলিকাতা যাই। আমার মা ছোট ভাই জয়দেবপুরে থাকে। যাহাতে Estate court of ward এ যাইতে না পারে এইজন্য আমি কলিকাতা যাই। court of wards Estate দখল লইতে পারিয়াছে কি না তাহা আমি তখন জানি না, তার পরে আমার ছোট ভাই ও মা কলিকাতা আসে। Estate যাহাতে court of wardsএ যাইতে না পারে সেই জন্য আমি ও ছোট ভাই একসঙ্গে ও মা অপর এক দরখাস্ত boardএ দেই। তখন আমাদের উকীল হরেন্দ্র মিত্র ছিল, বড় পিউ সাহেব ও Jacason ব্যারিষ্টার ছিল, board এ কোন ফল পাইলাম না। তারপরে আমার মা High Courtএ মোকদ্দামা করে। "Borss" attorny ছিল। ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার ছিল। আর একজন ছিল, মনে নাই। তারপরে court of wards estate ছাড়িয়া দিল আমার মা মোকদ্দমা তুলিয়া নেন। তারপর আর Mayer সাহেব আমাদের estateএ ম্যানেজার ছিল না। তারপর আমি আমার ছোট ভাই, বড় ভাই ও মা সকলেই জয়দেবপুর ফিরিয়া আসিলাম। তারপরে যোগেশ মিত্র ম্যানেজার হয়। তারপরে জ্ঞানশঙ্কর সেন ম্যানেজার হয়। দার্জ্জিলিং যাওয়ার আগে শেষবার কলিকাতা তিন ভাই, তিন বৌ কলিকাতায় যাই। বড় ভাই আগে যায়, লাভচাঁদ মতিচাঁদের বাড়ী থাকে।

লাভচাঁদ মতিচাঁদের বাড়ী ভাড়া করে। সেই বাড়ীতে আমরা প্রথম যাই। তারপরে আমরা ভিন্ন বাসা করি। বড় ভাই জলের কলের কাছে একটা বাসা করেন। আমরা ঐ বাসার দক্ষিণ দিকে একটা বাসা করি। দিগেন্দ্র বানার্জ্জি

আমার পুত্র। আমার বড় বোনের মেয়েকে ভাগার ভাই বিবাহ করিয়াছে। এই সময় দিগেন্দ্র বানার্জ্জি আমার সাথে ছিল। সেই সময় আমার সিফিলিস অসুখও ছিল। তখন আমার দুই হাতে ঠেংএ সিফিলিসের ঘা ছিল। তখন আমার চিকিৎসা হইয়াছিল, ব্রহ্মচারী চিকিৎসা করে। আর কোন ডাক্তার আমাকে দেখিয়াছিল কি না মনে নাই। আমার পিত্তশূলের ব্যথা জীবনে কখনও ছিল না।

কলিকাতা হইতে আমরা মাঘ মাসের শেষে শৈলেন্দ্র মতিলালের সহিত ফিরি, শৈলেনবাবু আমার বড় ভাইর শালা হয়। শৈলেন বাবু কলিকাতা হইতে আমাদের সঙ্গে আসেন। আমরা যখন কলিকাতা হইতে আসিলাম, তখন আমার শালা সত্যেনবাবু কলিকাতা ছিল। আমরা কলিকাতা হইতে আসবার পরে সত্যের সহিত আমার জয়দেবপুর দেখা হইয়াছিল। দার্জ্জিলিং যাওয়ার কথা আমার শালাই উত্থাপন করে। দার্জ্জিলিং যাওয়ার আগেও Lord Kitchner এর সঙ্গে শীকারে আমার শালা সত্য, যতীন মুখার্জ্জি যায়। আমি ও সত্য এক হাতীতে যাই। বাঘ শীকার করিয়াছিলাম, শীকারের সময় সত্যবাবু ছিল না। যখন বাঘ ভাগিছিল তখন সত্যবাবু ভয় পাইল ও তাহাকে এক বাড়ীতে রাখিয়া আসিলাম।

দার্জ্জিলিং যাওয়ার কথা বাড়ীর সকলেই জানিতে পারিয়াছিল। তখন আমার ঠাকুর মা ও আমার বোন জ্যোতির্ম্ময়ী যাইতে চাহিয়াছিল। রাজবাড়ীতে বৌদের কেবল স্বামীর সঙ্গে কোথাও যাওয়ার প্রথা ছিল না। দার্জ্জিলিংএর বাড়ী দেখিতে যাওয়ার আগে আমার শালা ও মুকুন্দ গুণ জানিতে পারিয়াছিল বাড়ীর কে কে দার্জ্জিলিং যাইবে। দার্জ্জিলিংএর বাড়ী ঠিক করা হইয়াছিল। সত্যবাবু ফিরিয়া আসিয়া এই খবর দেয়। বাড়ীর নাম মনে আছে। বাড়ী ঠিক করে আসার পরে আমার ঠাকুর মা বোনেরা যায় নাই। সত্যবাবু আসিয়া বলিল যে সেখানে বিধবাদের থাকিবার অসুবিধা আছে ও বাড়ী ছোট। আমি, আমার স্ত্রী, আমার শালা সত্য, আশু ডাক্তার, আমার কেরাণী বীরেন বানার্জ্জি ও Clerk দুইজন ছিল। চাকর যামিনী, বিপিন, ঝগড়া, প্রসন্ন, জব্বর, গিয়াছিল। ঝগড়ার মা তীর্থদাই গিয়াছিল। আমরা যখন দার্জ্জিলিং যাই তখন দীগেন্দ্র বানার্জ্জী জয়দেবপুর ছিল। দিগেন্দ্র বাবু সচরাচর জয়দেবপুর থাকে। আমরা যখন কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলাম তখন দিগেন্দ্রবাবু জয়দেবপুর ছিলনা, আমি তাহাকে টেলিগ্রাফ করাইয়া জয়দেবপুর আনাই।

দার্জ্জিলিং যাওয়ার জন্য আনাই। তিনি দার্জ্জিলিং যান নাই। কারণ সত্যবাবু বলিল যে মুকুন্দইত আছে, তাহার যাইবার কোন কাজ নাই। দার্জ্জিলিং যাইয়া শরীর ভালই ছিল। ১৪।১৫ দিন পর আমার অসুখ হয়। রাত্রে পেট ফাঁপা ছিল। তার পরদিন আশু ডাক্তারকে কইলাম (বলিয়াছিলাম)। আশু ডাক্তার ভোরে একজন সাহেব ডাক্তার আনে। সাহেব ডাক্তার আমাকে ঔষধ দিয়াছিল। সেই ঔষধ আমি খাইয়াছিলাম। তার পরের দিনও সাহেব ডাক্তারের ঔষধ খাই। তাহাতে কোনও উপকার হয় নাই। তার পরে আশু ডাক্তার রাত্রে ঔষধ দিয়াছিল, ঔষধটা কাঁচের গ্লাসে করিয়া দিল। এই ঔষধ খাইয়া আমার কোন উপকার হয় নাই। বুক জ্বালা করিয়াছিল, বমি হইয়াছিল। শরীর ছট ফট করিয়াছিল। এই সব আশু ডাক্তার আমাকে ঔষধ খাওয়াইবার ৩।৪ ঘণ্টা পরে হয়। চিৎকার (চীৎকার) পাড়তে লাগলাম। সেই রাত্রে আর কোন ডাক্তার আসে নাই। তার পরদিন আমার রক্ত বাহ্যি হইতে লাগিল। শরীর খুব দুর্ব্বল হইতে লাগিল। তারপর আমি অজ্ঞান হইয়া গেলাম। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়া পর্য্যন্ত কোন ডাক্তার আসিয়াছিল কিনা জানি না। তার পরে জ্ঞান হইয়াছিল। তখন আমি পাহাড়ে জঙ্গলে। তখন আমি খাটিয়ার মধ্যে শুইয়া আছি। খাটিয়া মাটীর উপর ছিল, উপরে টীনের ছাপরা, সেখানে ৪ জন সন্ন্যাসী ছিল। আমার জ্ঞান হইলে আমি বলিলাম, "কোথায় আসিলাম আমি?" সন্ন্যাসীরা বলিল, "তোমার শরীর দুর্ব্বল, কথা কইও না" এই কথা তাহারা হিন্দিতে বলিয়াছিল। তখন আমি হিন্দি বুঝিতাম। আমার বাড়ীর সহিস, কোচোয়ান, দারওয়ান, মাহুতের কাছে হিন্দি শিখিয়াছি। তারপরে আমি কোন কথা কই নাই।

আমি ছাপরায় ১৫।১৬ দিন ছিলাম। তখন সন্ন্যাসীদের সাথে আমার কোন কথা হয় নাই। ১৫।১৬ দিন পরে আমি সেখান হইতে চলিয়া যাই। ঐ ৪টী সন্ন্যাসীদের সাথে যাই, হাটিয়া গেছি ও Train এ গেছি ; তার পরের কথা আমার মনে আছে যে আমি কাশীতে গেছি। কাশী অশীঘাটে ছিলাম। তখনও ঐ ৪টী সন্ন্যাসী সাথে ছিল। অশীঘাটে সাধুর আশ্রমে ছিলাম। সেখানে আরও লোকের সঙ্গে দেখা হয়। বাঙ্গালী ও পশ্চিমা সাধুর সাথে দেখা হইয়াছিল। বাঙ্গালী সাধু দুই জনের সাথে কথা হইয়াছিল। তাহাদের সাথে বাঙ্গালা, হিন্দি সাধুর সাথে হিন্দিতেই কথা হইয়াছিল। ঐ সাধু ৪ জনের সাথে আমার কথাবার্ত্তা হিন্দিতে হইয়াছিল।

অশীঘাটে থাকাবস্থায় আমি কে, আমার বিষয় কিছুই স্মরণ ছিল না। আমি অশীঘাটে ৪।৫ মাস রহিলাম। আমার সাথের ৪ জন সাধুও রহিলেন। দার্জ্জিলিং হইতে অশীঘাট পর্য্যন্ত ১ বছর সময় যায়। অশীঘাট হইতে বিন্ধ্যাচল যাই। সাথে ৪ জন সাধুও ছিল। বিন্ধ্যাচল হইতে চিত্রকুট যাই। সেখান হইতে এলাহাবাদ, সেখান হইতে বৃন্দাবন। বৃন্দাবন হইতে হরিদ্বার'। তারপর হৃষিকেশ। সেখান হইতে লছমনঝোলা। তার পর কাশ্মীর। কাশ্মীরে করামুলা Sub-division শ্রীনগর রাজধানীতে যাই। সেখান হইতে অমরনাথ পৌছি, এই স্থান হইতে হেঁটে ও Trainএ গিয়াছি। হাঁটিয়া যখন যাই তখন পাহাড় জঙ্গল দিয়া যাই। অশীঘাট হইতে অমরনাথ যাইতে ৪বছর লাগে। অমরনাথ একটা তীর্থ। যাহারা অমরনাথ যায় তাহারা নীচে যে গ্রাম আছে সেখানে থাকে। অমরনাথে ২৩ দিন থাকি।

অমরনাথ থাকাকালীন আমি শিষ্য হই ও মন্ত্র লই। ধর্ম্মদাসের শিষ্য হই ও তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র লই। ধর্ম্মদাস ঐ ৪ জনের মধ্যে একজন। মন্ত্র আমার মনে আছে। মন্ত্র লওয়ার পরে সাধুরা আমাকে ব্রহ্মচারী বলিয়া ডাকিত। মন্ত্র নেওয়ার পর আমি কোথা হইতে আসিয়াছি এই সম্বন্ধে আমার ধারণা হইয়াছিল। মন্ত্র নেওয়ার পরে আমার গুরুর সাথে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। এর পরে আমার ধারণা হয় যে আমাকে দার্জ্জিলিং শ্মশানে ভিজা অবস্থায় সন্ন্যাসীরা পায়। তাহাদের সাথে যাওয়া পর্য্যন্ত আমি কে, বাড়ী কোথায় ইত্যাদি আমার কিছুই মনে নাই। আমি মাঝে মাঝে মনে করিতাম আমার বাড়ী ঘর আত্মীয় কোথায় আছে এই কথা মনে করিতাম। আমার আত্মীয় স্বজনের কাছে বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়ার আলাপ হইত। গুরু বলতেন, সময় হইলে তোমাকে বাড়ীতে যাইতে দিব। সময় হওয়া মানে কি আমি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমি এই বুঝিলাম যে, যদি সংসারের মায়া, আত্মীয় স্বজন বাড়ী ঘরের মায়া ছাড়িয়া আসিতে পারি তাহা হইলে আমাকে সন্ন্যাস দিবে। ইহা আমি অমরনাথ ছাড়িবার পরে হইল। এই কথা আমি বাড়ী ফিরিয়া আসার ১ বছর আগে হয়। অমরনাথ হইতে আমি ঐ ৪ জন সন্ন্যাসীর সাথে আবার উত্তরে গেলাম। চম্বা পাহাড়, চাম্বা রাজধানী, বুল্লু পাহাড় তারপর শুচেতমুণ্ডী গেলাম। সেখান হইতে নেপাল যাই। অমরনাথ হইতে শুচেতমুণ্ডী যাওয়া পর্য্যন্ত ২।৩ বছর লাগে। হাটিয়া ও Trainএ গিয়াছি। শুচেতমুণ্ডী হইতে নেপাল যাইতে ২।৩ বছর লাগলো। নেপাল পশুপতিনাথ তীর্থে গিয়াছি,

পশুপতিনাথে একজন বড় সাধু আছেন। তাহার নাম বাঙ্গালীবাবা। তাহার কাছে আমি গিয়াছিলাম। বাঙ্গালীবাবা হিন্দি বলে। নেপাল হইতে আমরা তিব্বত যাই। তিব্বত হইতে ফিরিয়া আবার নেপাল আসিলাম। নেপাল হইতে তিব্বত ও তিব্বত হইতে নেপাল যাইতে আসিতে ৩।৪ মাস লাগে। তারপর নেপাল হইতে নীচে আসি এক বছর পরে। নেপাল হইতে যখন নামি তখন ঐ ৪ জন সন্ন্যাসী আমার সাথে ছিল। নেপাল হইতে বরাহছত্তর আসি। বরাহছত্তরে যখন আসি তখন আমার মনে হইল যে আমার বাড়ী ঢাকা; তখন আমি এই বিষয়ে গুরুকে বলিয়াছিলাম। গুরু বলিল, যাও, তোমার সময় হইয়াছে। আমি বুঝিলাম দেশে বাড়ীঘরে যাইতে হইবে। বাড়ী হইতে ফিরিয়া যদি আসি তাহা হইলে তাঁহার সহিত হরিদ্বারে দেখা হইবে, একথা সে বলিল। বরাহছত্তর হইতে অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি। তখন আমি একা ঘুরিয়াছি: বরাহছত্তর হইতে প্রথম পূর্ণিয়া জেলায়, তারপর রংপুর, তারপর কামাখ্যা, তারপর গৌহাটী। গৌহাটী হইতে Trainএ উঠিলাম, Trainএ ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে উঠিলাম। তারপর ফুলছড়ি হইয়া ঢাকা আসিলাম। সন্ন্যাস নেওয়ার পর হইতে পরনে কৌপিন ছিল। চুল জটা ছিল, হাতে করঙ্গ ছিল। কমণ্ডলু লাউর তৈয়ারী, করঙ্গকে কমণ্ডলু বলে।

আমার দাড়ি ছিল। আমি ঢাকায় রাত্রি ১২টা ১টার সময় আসিয়া পৌছিলাম। সেই রাত্রে ঢাকা ষ্টেশনেই রহিয়া গেলাম। ভোরে ষ্টেশন হইতে সদরঘাটে আসিলাম। নিজেই সদরঘাটে চলিয়া আসিলাম। ষ্টেশনে নামিয়া আমার মনে হইল যে আমি এখানে বহুদিন চলাফেরা করিয়াছি। সদরঘাটে যাইয়া নদীর মধ্যে যে চর আছে সেখানে গেলাম। সেখান হইতে বেলা ১০টার সময় ফিরিয়া আসিলাম ব্যকল্যাণ্ডবাণ্ডে। সেই দিন Bukland Bandএ রহিলাম, রঘুবাবুর বাড়ীর গেটের সামনে থাকি। এই রকম ২।৩ মাস ছিলাম। ওখানে থাকার সময় বহু লোকজন আমার কাছে আসিত। তাহাদের এই রকম কথা হইত যে "এই ভাওয়ালের কুমার, এই মেজ কুমার"। তাহাদের মধ্যে আমার বহু চেনা লোক দেখিয়াছি। তাহাদের সাথে আমার এমনি বাজে কথা হইয়াছে। তাহারা আমার সাথে বাংলায় কথা বলিত। আমি হিন্দিতে কথা বলিতাম। আমার গুরুর নিষেধ ছিল, বাংলায় কথা বলা। আত্মপরিচয় দেওয়া নিষেধ ছিল। আমি কাশীমপুরের প্রসাদ রায়কে চিনি। যখন আমি Bukland Bandএ ছিলাম তখন অতুল প্রসাদকে দেখিয়াছিলাম। তাহার

সাথে আমার ২।৩ দিন কথা হইয়াছিল। তিনি আমাকে বলিতেন "মেজ কুমার।" তিনি আমাকে ২।৩ বার কাশীমপুর লইতে চাহিয়াছিলেন।

তিনি আমাকে মেজ কুমার বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। আমাকে বলিলে আমি কাশীমপুর train-এ গিয়াছিলাম। সঙ্গে ভুলু ছিল। ভুলুই অতুলপ্রসাদ রায়। Train-এ জয়দেবপুর গেলাম, সেখান হইতে হাতীতে কাশীমপুর গেলাম। দার্জ্জিলিং যাওয়ার পূর্ব্বে সারদা বাবু ও ভুলুর সাথে বহু চিনা ছিল। সেখানে ৫।৬ দিন ছিলাম। সেখানে খাওয়া দাওয়া করিয়াছি। তখন সেখানে সারদা, তার বড় ও ছোট ভাইয়ের ছেলেরা ছিল। অতুল সারদা বাবুর বড় ভাইয়ের ছেলে। যখন খাওয়া করি তখন অতুলও ছিল। অতুলের পিতার নাম অন্নদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী। আমার জিহ্বা ভার থাকায় মাঝে মাঝে কথা বাহির হয় না। আমার খাওয়ার সময় খাওয়ার ঢং দেখিয়া সারদাবাবু বলিয়াছিলেন এ মধ্যম কুমার, মধ্যম কুমারও এইভাবে খাইত। তর্জ্জনী উঠাইয়া সাক্ষী বলেন—আমি বরাবরই এইভাবে খাইয়াছি। দার্জ্জিলিং যাওয়ার আগে আমি অনেকবার সারদা ও অতুলের সাথে খাইয়াছি, আমার খাওয়া দেখিয়া সারদাবাবু বলিয়াছে যে, "এই রকমে মেজকুমার খাইত। আমার সন্দেহ হয় এই মেজকুমার।"

কাশীমপুর হইতে জয়দেবপুর আসি। যোগেন্দ্র বানার্জ্জির ছেলে রাম আমাকে হাতীতে জয়দেবপুর লইয়া যায়। তখন রাম কাশীমপুর Estate-এ সারদাবাবুর কর্ম্মচারী ছিল। যোগেন্দ্রবাবু তখন রাজ বাড়ীতে কাজ করে। রাম এখন কোথায় কাজ করে জানি না। ঐ হাতী রাজবাড়ীর। জয়দেবপুরে সন্ধ্যা ৬টা ৬॥টায় পৌঁছি। রামের সাথে ২৩ জন লোক আসিয়াছিল। জয়দেবপুরে আসিয়া সেদিন মাধববাড়ীতে থাকি। রাজবাড়ীর মধ্যে নামি।

সেখান হইতে মাধববাড়ী যাই। তখন আমার এই সব জায়গা চিনা মনে হইত। মাধব বিগ্রহ আছে। আমাদের জয়দেবপুরের রাজার ঐ বিগ্রহ। আমি সেই রাত্রে মাধব বাড়ীতে যে কামিনী ফুলের গাছ আছে সেই গাছের নীচে থাকি। কাশীমপুরের লোকেরা আমার সাথে হিন্দিতে কথা বলিত। আমিও হিন্দিতে কথা বলিতাম। আমি তাহাদের হিন্দিতে বলিয়াছি কারণ আমার গুরু আমাকে আত্মপরিচয় দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই রাত্রিতে কামিনী ফুল গাছের নীচে বহু লোকজন আসিয়াছিল। সেই রাত্রে সেখানেই বসিয়াছিলাম। তারপর দিন মাধববাড়ীর উত্তর দিকে একটা গলি আছে,

বাড়ীর মধ্যে যাওয়ার সেই গলি দিয়া বাড়ীর মধ্যে গেলাম। সেই রাস্তা মেয়েদের যাওয়ার রাস্তা। ঐ গলি দিয়া গিয়া খাজাঞ্চিখানার পায়খানা, আমি নিজেই চিনিয়া গেলাম। পায়খানা হইতে আসিয়া স্নান করিলাম। পায়খানার মধ্যে কল আছে, সেই কলে স্নান করিলাম। সেই পায়খানাটা Under drain এর। সেই drain চিলাই নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। স্নান করিয়া মাধববাড়ীতে আসিলাম। তার পরে একটা গোল বারান্দা আছে সেইখানে আমার ছোট ভাই থাকিত, সেখানে গেলাম ও বসিলাম। সেদিন দুপুর পর্য্যন্ত ওখানেই ছিলাম। তারপর সেখানে জয়দেবপুরের মেয়ে ছেলে স্ত্রীলোক বুড়া বহুলোক আমাকে দেখিতে আসে। তারপর বুদ্ধু সেখানে আসে। তারপর বৈকালে ৬॥ টার সময় আমাকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বাড়ীতে নিয়া যান। সেখানে যাইয়া আমার ঠাকুরমা রাণী সত্যভামা, বোন জ্যোতির্ম্ময়ী, ভাগিনা, (বোনের ছেলে) বড় বোনের ছেলে সেখানে ছিল।

তাহাদের চিনিলাম। সেখানে একটা ঘরে ছিলাম। রাজবাড়ীর অন্যান্য জায়গা দেখিয়া সমস্ত চিনিলাম, করণ ২৫ বৎসর ছিলাম। আমার আত্মীয় স্বজনকে চিনিতে পারিয়াছিলাম। সেখানে আমার বোন ও ঠাকুরমার সঙ্গে অনেক কথা হয়। আমি তখন তাদের সহিত হিন্দিতে কথা বলিয়াছি। আমার বোন হিন্দিতে কথা বলিতে পারে। তিনি আমার সহিত কথা বলিয়াছেন। ঠাকুরমা দাঁড়াইয়াছিল। আমি সেদিন আত্মপরিচয় দিই নাই। আত্মীয় কুটুম্ব দেখিয়া মায়া হয় না? আমারও মায়া হইয়াছিল। এক ঘরে থাকিয়া তারপরে আবার রাজবাড়ীতে ঐ গোল বারান্দায় গেলাম। সেই রাত্রে সেই গোল বারান্দায় রহিলাম। তারপর দিন বুদ্ধু আমাকে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। আমি গোটা ১২টার সময় নিমন্ত্রণ খাইতে যাই। আমি সমস্ত আত্মপরিচয় দেই নাই।

পরিশিষ্ট--৫

মেজরাণীর শরীর পরীক্ষার জন্য বাদীর দরখাস্ত

মেজরাণীর শরীরের বিশেষ স্থানে যে ফোড়া'র চিহ্নের কথা বাদী তাঁহার জবানবন্দিতে বলিয়াছেন, তাহা এখনও আছে কিনা এবং মেজরাণীর গর্ভ হওয়ার বা সন্তান প্রসবের কোন চিহ্ন আছে কি না, এবং তাহা চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করিবার প্রার্থনা জানাইয়া বাদী এক দরখাস্ত করেন। এই দরখাস্ত করার কারণ সম্বন্ধে বাদীর বক্তব্য এই যে, মেজরাণী সৎ ও নৈতিক জীবন যাপন করেন নাই। এই সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া বাদী বিল্লুবাবুর দ্বারা এই প্রমাণ দেন যে, স্বামীর রক্ষণাধীন অবস্থায় মেজরাণীর গর্ভ হয় নাই। বিবাদি পক্ষের কৌঁসুলি মিঃ চৌধুরী জেরায় বিল্লুবাবুকে এই প্রশ্ন করেন যে, মেজরাণী স্বামীর রক্ষণাধীন অবস্থায় গর্ভবতী হইয়াছিলেন, বিল্লবাবু তাহা অস্বীকার করেন। মেজরাণী তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, প্রকৃত ব্যাপার এই যে একবার তাঁহার কলিকাতাতে থাকা কালে কয়েক মাসের জন্য তাঁহার মাসিক ঋতু বন্ধ ছিল। মিঃ চ্যাটার্জ্জির জেরার উত্তরে মেজরাণী বলেন যে, মাসিক ঋতু বন্ধ হওয়ার জন্য তাঁহার শরীরে গর্ভের কোন চিহ্ন দেখা দেয় নাই। মিঃ চ্যাটার্জ্জি মেজরাণীকে জেরায় ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বারাণসীতে থাকা কালে তাঁহাকে লেডি ডাক্তার বা ধাত্রী দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হইয়াছিল কি না! মেজরাণী তাহার উত্তরে 'না' বলেন। দরখাস্তকারি বলেন যে, বিশ্বস্তসূত্রে এই সংবাদ পাইয়া বিল্লুবাবুর জবানবন্দি ও মেজরাণীর জেরা করা হইয়াছিল যে, মেজরাণী গর্ভবতী হইয়াছিলেন এবং তাহা মেজকুমারের তথাকথিত মৃত্যুর পরেই শুধু হইতে পারে।

পরিশিষ্ট—৬

কুমারের জীবনের স্মরণীয় দিন।

কুমারের জন্ম—১৮৮৪ খৃঃ। কুমারের বিবাহ—১৩০৯ বঙ্গাব্দ। কুমারের দার্জ্জিলিং গমন—১৭ই এপ্রিল, ১৯০৯ খৃঃ। কুমারের উল্লিখিত মৃত্যু—৮ই মে, ১৯০৯ খৃঃ। ঢাকা বাক্ল্যাণ্ড বাধে সন্ন্যাসী কুমারের প্রথম আবির্ভাব—১৯২০ খৃঃ। ভাওয়ালের মধ্যম কুমার বলিয়া আত্মপরিচয় দান—৪ঠা মে, ১৯২১ খৃঃ। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লিণ্ডসের নিকট জবানবন্দী দান—৫ই মে, ১৯২১ খৃঃ। সন্ন্যাসী প্রতারক বলিয়া ঘোষিত ৬ই জুন, ১৯২১ খৃঃ। বাবা ধর্ম্মদাস নাগার আগমন—২৬শে আগষ্ট ১৯২১ খৃঃ। মুকুন্দ গুণকে হত্যা—২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ খৃঃ। রাণী সত্যভামার মৃত্যু ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২২ খৃঃ। রেভিনিউ বোর্ডে স্মারকলিপি দেওয়া হয়—১৯২৭ খৃঃ। বড়রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরিচয়—১৯২৭ খৃঃ। পুণ্যাহ উৎসব দর্শন—১৯২৯ খৃঃ।

মোকদ্দমা রুজু করা হয়—২৩শে এপ্রিল, ১৯৩০। আদালতে মামলার শুনানী এবং বাদী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ ও বিবাদী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ আরম্ভ—৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ খৃঃ। বিবাদী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ—১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ খৃঃ। বিবাদী পক্ষের ব্যারিষ্টার শ্রীযুত এ, এন, চৌধুরীর সওয়াল শেষ ও বাদী পক্ষের ব্যারিষ্টার শ্রীযুত বি, সি, চট্টোপাধ্যায়ের সওয়াল আরম্ভ—৩১ মার্চ্চ, ১৯৩৬ খৃঃ। বাদী পক্ষের সওয়াল শেষ—২০শে মে, ১৯৩৬ খৃঃ। মামলার রায় এবং বাদীকে ভাওয়ালের মধ্যম কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ বলিয়া বিচারকের রায় প্রদান—২৪শে আগষ্ট, ১৯৩৬ খৃঃ।

পরিশিষ্ট—৭

[১৯২১ সালে মধ্যম কুমার ফিরিবার পূর্ব হইতেই বহু কবিতা পুস্তক বাহির হইতেছিল। ইহার অধিকাংশ ঢাকা হইতে প্রকাশিত। আমরা এস্থলে ঢাকা ও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত অনেকগুলি পুস্তক হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে জজ রায় দিবার পূর্ব্বেও কতকগুলি স্বার্থান্ধ লোক ছাড়া সকলেই সন্ন্যাসীকে কুমার বলিয়া স্বীকার করিত।]

অতি ছোট রাজ্য এক ভাওয়াল নাম,
ঢাকা জেলা মাঝে তাহা ছিল পুণ্যধাম।
যতদিন রাজা বাঁচে প্রজার আনন্দ,
অমরার সুখভোগ সুরভির গন্ধ।
একে একে রাজা মরে কুমার সকল,
তিন পুত্রবধূ রাজ্য করিল দখল।
তিন রাণী ভাওয়ালে তিন অংশীদার,
কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ শুনি কর্ণধার
পতিহীনা পুত্রহীনা তিন রাণী হয়,
রাজবংশে বাতি দিতে কেহ নাহি রয়।
বড়রাণী মেজরাণী ভবে বংশ নাশ,
ছোটরাণী পুষ্যি নিয়ে করে সুখে বাস।

*　　*　　*　　*

ভাওয়ালে আজ আগুন জ্বলেছে কপাল পুড়েছে কার ?
মামলা বেধেছে রাণী সন্ন্যাসীর রহস্য চমৎকার।
বহুদিন আগে মৃতদেহ যার পুড়ে হয়ে গেল ছাই,
কোথাকার এক সাধু এসে বলে সেই আমি মরি নাই।
ভাওয়াল রাজ্যে আমি পরিচিত মধ্যমকুমার হই,
মিথ্যা আমার মৃত্যু রটনা—জাল প্রতারক নই।
যাবে দার্জ্জিলিং ষ্টেপ-এসাইড রোগের কারণে যাই,
সে রোগে এমন মরণ হইবে কভু তাহা ভাবি নাই।

যদি মরে থাকি বেঁচেছি আবার ভূত প্রেত নহি দানা,
আমারে যাহারা চিনিয়া চেনেনা নিশ্চয় তাহারা কানা।

* * * *

কোর্টে গিয়ে জানায় সাধু রাজার ছেলে সে,
মরেনি তবু মরার ক্ষত ফেলে দিয়েছে কে ?
বাধিয়া উঠিল বিরাট মামলা দুই দলে রেষোরিষি,
উভয় পক্ষের জবর সাক্ষী সন্ন্যাসীর কিছু বেশী ;
দুই পক্ষে হয় কত অর্থবৃষ্টি উকীল চুষিয়া খায়,
কাহার ভাগ্যে কে জানে কি ঘটে জগতে দেখিতে চায়
তিনটী বছর মামলা চলিল কোর্টে শুধু হুড়োহুড়ি,
কত অসামাল হয়ে গেছে চাপে ছিল যার মোটা ভুঁড়ি

* * * *

পাগ্‌লা হয়েছে বাঙ্‌লা দেশটা ধৈর্য্য থাকে না আর,
এখনও রায় বার হয় নাই ভাওয়াল মামলার।
কেন মানুষের এত আগ্রহ 'কি হবে' 'কি হবে' বল,
চারিদিকে এই নিয়ে হৈ চৈ উন্মাদ হয়েছে সব।
কি রহস্য ভরা মামলার মাঝে ঠিক নাহি বোঝা যায়,
কুমারের বেশে অদ্ভূত সন্ন্যাসী ফেলিয়াছে সমস্যায়।
যদি রায় দেয় সন্ন্যাসী কুমার জগতে পড়িবে সাড়া,
কত ঢাক ঢোল বজিয়া উঠিবে সহর নগর পাড়া।
শুধু নহে রাণী শিক্ষিতা নারীরা মাথা নীচু করি' রবে,
এমন জঘন্য লজ্জার কাহিনী কে শুনেছে বল কবে ?
বাংলা দেশে কেউ দেখেনি এমন নারীর রূপ,
কেচ্ছার কথা শুন্‌লে কানে সবাই বলে চুপ।
পিশাচিনীর মূর্ত্তি দেখে উঠছে কেঁপে বুক,
সারা দুনিয়ার পুরুষজাতির শুকিয়ে গেছে মুখ।
টাকার বলে মামলা বাধায় হয়কে করে নয়,
হিন্দুনারীর কীর্ত্তি দেখে মরতে ইচ্ছা হয়।

বিচারকের খরদৃষ্টি এড়িয়ে যাবে কে ?
ধরা পড়্‌ল মেজরাণীটী অপরাধিনী সে।

* * * *

ডাক্তার হ'ল হাতের পুতুল গোপন কথা কতই চলে,
প্রাণের রাজা হাঁফিয়ে মরে বিষের জ্বালায় পড়্‌ল ঢলে।

* * * *

ইডেন গার্ডেনে, লেক, সরোবরে মধুপ্রীতি গুঞ্জরণে।
পাশাপাশি চলে কত হাসাহাসি আবেগ-মাখানো সুখ,
বিচ্ছেদ ব্যথায় আকুল হৃদয় আঁখি জলে ভরপুর।

ভাইকে দেখে চিন্‌তে পারো স্বামীকে দেখে বললে নাগা,
দরোয়ান ডেকে বললে হেঁকে আপদটারে লাঠিতে ভাগা।
গর্ব্বে বেড়াও বুক ফুলিয়ে সর্ব্বহারা স্বামীর বাড়ী,
যার শিল তার নোড়া দিয়ে তারই ভাঙো ভাতের হাঁড়ি।
সয়তানীতে বুদ্ধির ধাড়ি কীর্ত্তি রবে চমৎকার !
বিচার হ'লে পড়বে ধরা নাগা সাধু স্বামী তোমার।
গর্ব্ব গেল কোথায় এখন তেজ দম্ভ দেখাও নারী,
আর কেন গো বিধবা বেশ পর একবার সিঁদুর শাড়ী।

* * * *

শত শত প্রজা সাক্ষী নিয়ে কোর্টে দাঁড়ালো সন্ন্যাসী বাদী,
রণং দেহি ব'লে রাণীও দাঁড়ালো, কে জানে কে অপরাধী ?
আড়াই বছর মামলা চলিল আইনের জাল ঘেরা,
কীর্ত্তি রহিল বাদী ব্যারিষ্টার বি, সি. চ্যাটার্জ্জীর জেরা।

* * * *

বাঙাল রাজা কাঙাল করে' উঠল হেসে সর্ব্বনাশী,
সধবা রাণী বিধবা সেজে বাজিয়ে যায় বিষের বাঁশী।
দিনে খায় কাঁচকলা ভাতে রাত্তিরেতে পাঁঠার ঝোল,
বাইরে চলেন ডিঙ্গি মেরে, ঘরের ভেতর গণ্ডগোল।
পাপ কি কখন ঢাকা থাকে আপনি ওঠে ফুঁড়ে,
ধরা পড়'ল সর্ব্বনাশী কোথায় যাবে উড়ে ?

বাঙ্গালী মেয়ের সাহস দেখে চম্‌কে ওঠে পিলে,
হাসি মুখে দিচ্ছে বিষ স্বামীর মুখে ঢেলে।

*　　　*　　　*

ভাওয়ালেতে ছুটল হাসি সাত সাগরের বান,
হাজার হাজার প্রজার মুখে হাসির কত গান।
চাপা হাসি মুচকি হাসি বিকট অট্টহাসি,
গোম্‌ড়া মুখে পোড়ার হাসি দেখতে ভালবাসি।
কপট হাসি উদ্ভট হাসি হাসির কত ঢেউ,
এমন হাসি ভাওয়ালেতে দেখেনি কভু কেউ।

*　　　*　　　*

'ঘোম্‌টা দেওয়া খেম্‌টা নাচের খেইড় টপ্পা চলে,
রাজ পথেতে মাতাল নাচে বেতাল পড়ে ঢলে'।
চায়ের দোকানে টেবিল ফাটে মজলিসেতে ধুম্‌,
ভাওয়ালবাসী ভুলেই গেছে রাত দুপুরের ঘুম।
শুন্‌ছি নাকি ও ঠাকুরঝি ! বল্‌ছে ঘরের বৌ,
কার হাঁড়িতে লুকিয়ে নাকি কে খেয়েছে মৌ।
কোন্‌ সাধু এক জুট্‌লো এসে বলছে হেসে হেসে,
রাজার বাড়ীর মজার কথা—দেশ গিয়েছে ভেসে।
বউ কথা কও পাখীর ডাকে শিউরে ওঠে প্রাণ,
কপালপোড়া বিধবার কে ঘোম্‌টায় দেবে টান।
রাত্তিরেতে চাঁদের হাসি সুধার ধারা ঢালে,
ঘুম পাড়ায় না চুম্‌ দিয়ে কেউ আমার দুটী গালে।

*　　　*　　　*

দম্ভভরে রাণী বলে ওই সাধু জুয়াচোর জটাধারী,
জয় হ'লে মোর একটী লাথিতে পাঠাব যমের বাড়ী।
আমার নামেতে কলঙ্ক আরোপ উহু জ্বলে যায় প্রাণ,
চাপ দাড়ী ধরে দেব ঘুষ্‌ পাক ছিঁড়ে নেব দুটী কান।
দেশটা জুড়ে কেচ্ছা বেরোয় ভাওয়াল রাণীর কীর্ত্তি বটে
কুলবধূরা লজ্জায় মরে—ঘৃণায় তাদের ন্যাকার ওঠে।

কেউ বলছে দূর দূর দূর মুখে আগুন ঐ রাণীটার !
দেশ মজাল কলঙ্কিনী এমন কাণ্ড দেখিনি আর ।
ছাই ভস্ম মেখে গাঁজা-গুলি খেয়ে লালসা আমার পরে,
ঠ্যাংয়ে দড়ি বেঁধে আকাশে ঝুলাবো ভণ্ড সাধু ঠিক তোরে ।
দেখিব প্রজারা বিপক্ষে যাহারা সাক্ষী দিয়েছে গর্ব্বে,
ভিটে মাটি চাটি করিব তাদের খাজনা আদায় পর্ব্বে ।
প্রজারা শুনায় বেশ ! বেশ ! বেশ ! আগে হও তুমি জয়ী,
তারপর রাণী রাঙ্গাইও আঁখি বিভিষিকা মূর্ত্তিময়ী ।

* * * *

তবু শোন রাণী সন্ন্যাসী রাজার নহে তাহা পরাজয়,
রাজার প্রজার অন্তরে যেজন গরবে বসিয়া রয় ।
আজি শুনি কত শিক্ষিতা নারীর চরিত্র ফুটেছে বেশ,
আপনার হাতে বিষ দিয়ে মুখে স্বামীরে করিছে শেষ ।

* * * *

কোথা গেলে বিভা ! প্রাণের বনিতা জীবনের চিরসাথী,
ছাড়িয়া আমারে থাকিও না দূরে আজি এ মরণ রাতি ।
অপরাধী আমি করিও না ঘৃণা ভুগিযাছি বহু রোগে,
আপনার পাপে আপনি হয়েছি বঞ্চিত সুখভোগে ।
অপদার্থ আমি মুর্খ স্বামী তব কত না দিয়াছি ব্যথা,
আজিকার মত সব ভুলে যাও হেসে কও দুটী কথা ।
কুসুম কোমল হাত দুটী দাও একটু বুলায়ে বুকে,
এত জ্বালা কেন ? কি ওষুধ ঢালি দিয়াছ আমার মুখে ?
বিষের মতন জ্বলিছে নিয়ত রুদ্ধ হ'য়ে আসে শ্বাস,
শুধু হেরি চোখে সরিষার ফুল ঘটে বুঝি সর্ব্বনাশ ।
কোথায় ডাক্তার ! তীব্র হলাহল ভুলে ত দাওনি তুমি ?
সামান্য একটু পেটের অসুখে মরিতে বসেছি আমি ।
কোথা বিভাবতী জীবনের সাথী প্রেয়সী রূপসী রাণী,
এস প্রিয়া কাছে রূপ দেখে ভুলি যন্ত্রণা একটুখানি ।
কে আমার কণ্ঠে ঢেলেছিল বিষ একটু কাঁপেনি হাত,
কাঁপেনি বক্ষ টলেনি চরণ বিবেকের কষাঘাত ।

*　　*　　*　　*

মরণের পরে লভিয়া জীবন চিনিলাম আজি তারে,
সে আমার প্রাণে বড় দাগা দেছে কেমনে বুঝাব কারে।
সে আমার বুকে ভীম পদাঘাত করিয়াছে সুকৌশলে,
অতুল কীর্ত্তি রেখেছে জগতে কুটীল বুদ্ধির বলে।
সন্ন্যাসী বলে, আশ্চর্য্য ব্যাপার সকলে চিনিছে যারে,
কি লজ্জার কথা! আপন বনিতা চিনিতে পারে না তারে?
মরিলেও স্বামী জীবনে ভোলেনা পতির মুরতি সতী,
হিন্দু-নারী আজ একি কথা কয়, কেন হেন মতি গতি?
সন্ন্যাসী বলে, মরি নাই আমি বেঁচেছি পুণ্যের বলে,
আমার মৃত্যুর গোপন রহস্য প্রকাশিতে ধরাতলে।
গুরুজী যখন কহিল কুমারে পরিচয় তব দাও,
কাহার সন্তান কোথায় নিবাস ঘরে ফিরে আজি যাও।
হলাহল পান করেছিলো তুমি কিসের কারণে শুনি,
পাহাড়ের নীচে মৃতের সমান পড়েছিল দেহখানি।
সেদিন আকাশে প্রলয় গর্জ্জন লয় হবে যেন সৃষ্টি,
ভীষণ দুর্য্যোগ প্রকৃতির খেলা মুসলধারায় বৃষ্টি।
বিষে জর জর ছিলে মর মর আহত বিক্ষত দেহ,
সেচ্ছায় তোমার এ দুর্দ্দশা কিংবা অপরে করিল কেহ।

*　　*　　*　　*

ললাটে তোমার রাজার চিহ্ন চেহারা রাজার মত,
সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমি দেশে দেশে বহুদিন হ'ল গত।
যাও ফিরে এবে ঘরের সন্তান আত্মীয় স্বজন বুকে,
বনিতা সংসার যদি থাকে হেথা কাটাও কিসের দুঃখে?
কহিল কুমার গুরুজী আমার পরিচয় তবে শোন,
ভাওয়ালে মোর জনম হইল রাজার সন্তান কোন:

*　　*　　*　　*

মধ্যমকুমার আমি—হায়! ভাগ্যদোষে,
গৃহহীন দীনহীন বিধাতার রোষে।

পরীক্ষা করিতে চাও চিহ্ন আছে তার,
বন্দুকের গুলী বিদ্ধ উরুতে আমার।
শীকার সন্ধানে গিয়ে এ বিপদ ঘটে,
এ কথাটা দেশময় রটেছিল বটে!
প্রজারা চিনিয়া রাজা আনন্দে উতল,
জয় জয় নাদে তব কাঁপে দিঙমণ্ডল।
ঢাক ঢোল বাজে শাঁক উলু উলু ধ্বনি,
চারিদিকে ভারি গোল রহস্যের খনি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস সম্পাদিত "ভাওয়ালে রাণী সন্ন্যাসী লড়াই সিরিজের পুস্তকাবলী হইতে কোন কোন কবিতার অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়াছি। এজন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ।

প্রকাশক

"মা তোর লীলাক্ষেত্র ভারত ভূমে কাল ক্রমে
কত লীলা হয়।
মা তোর পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গ স্থল, অমঙ্গলে সুমঙ্গল
হতেছে কত লীলার অভিনয়।
(মাগো) শুনলেম অতি প্রিয় পুত্র তোমার
জয়দেবপুরের মধ্যম কুমার, মরেছিল দার্জ্জিলিং পাহাড়ে,
সৎলোকেরা শ্মশান ঘাটে এলো সৎকার করে।
শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে গেল, আবার মরা মানুষ ফিরে এল
বার বৎসর পরে।
দেশের রাজা প্রজা জমিদার সব কি উৎসাহে ছুটল,
ভাওয়ালের আকাশে উঠল অমাবস্যার পূর্ণ শশী,
রাজার স্বার্থের বন্ধু যারা যারা, স্বার্থ সাধন কর্ত্তে তারা
রাজ কুমারকে বিষ খাওয়াইয়েছিল,
শ্মশান বন্ধু হয়ে তারাই শব শ্মশানে নিল।
বিষম শিলা বৃষ্টি ঝড় বাতাসে, শব ফেলে সব পালায় ত্রাসে,
নাগা বাবা ধর্ম্ম দাসে, এসে পুনর্জ্জীবন দিল।

এখন সম্মিলনের মহাযজ্ঞে, দেখতে পাব যোগ্যাযোগ্যে
শালার ভাগ্যে রাণীর ভাগ্যে, জানি শেষ কালে কি হবে ?
এমন মায়া মোহে পেয়ে দাগা, কত রাজ্যের কত হতভাগা
কত রাজ্য করে দিল মাটী ? কত সোনার সংসার কর্লি ছারখার
তুই শ্মশানের বেটি।
আমরা হয়ে জীবন্মৃত, ছাইতে ঢালিয়ে ঘৃত
অন্ধকারে অবিরত কেবল ভূতের বেগার খাটি।

*　　*　　*　　*

অনেকের মন দেহ, সন্দেহের কেন্দ্র,
অঙ্গের চিহ্নদেখে, অনেকে কয়, এই সন্ন্যাসী সেই রমেন্দ্র
আবার বর্দ্ধমানের রাজার মত, হয়না যেন জাল প্রতাপ চন্দ্র।
দেখ্‌তে সে চাঁদ বদনখানি, সতী লক্ষ্মীর শিরোমণি, এলোনা সে
রাজাররাণী, রাজার শালা সত্যেন্দ্র।
শুন্‌লেন মুন্‌সেফ্‌পুরের মুকুন্দ গুণ,
দিন দুপুরে হয়েছে খুন, পাপের আগুন জলকে কি আর নিভে ?
হলো আশু বাবুর বাতব্যাধি—ধর্ম্মে কয়দিন সবে ?—(হরিচরণ)

*　　*　　*　　*

হায়, বিভাবতি !
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুইলো অভাগী,
সে কাল জয়দেবপুরে, কালকূট দিতে
তার মুখে,—নিয়ে কোন সুদূর পাহাড়ে
কিম্বা—সমুদ্রের পারে ?
কাণে কাণে পরামর্শ দিয়েছিলে মোরে
(আশু তার হইল সহায়)।
মজালে ভাওয়াল রাজ্য মজিলি আপনি !

*　　*　　*　　*

বৃথা গর্ব্ব, মোরে তুমি দাদা !
কণ্টকে কণ্টক দিব্য হইল উদ্ধার
কে মানিবে এ আদেশ ?

উড়াও ফুৎকারে দাদা—ও কাগজগুলা
চলুক চলুক রণ, বলুক জগত
কলঙ্কিনী মোরে, তবু—হব না বিরত।
সত্যেন্দ্র সোণার ভাই—আশু যে সারথী
মণি কাঞ্চণের মত রাখিবে আমারে
(তা'হলে) আমি কি ডরাই দাদা পাঞ্জাবী সাধুরে ?

* * * *

কিন্তু দাদা বড় সাধে ঘটিল বিষাদ,
কোন্ গৃহ-শত্রু কিম্বা, ত্রেতার দুর্ম্মুখ
গুপ্তভাবে গুপ্তমন্ত্র করিয়া প্রকাশ
সর্ব্বনাশ করেছে সাধন।
ভাগ্যবান সে মুকুন্দ গুণ,
দেখিল না পাপের আগুণ,
লাগিল না তাৎ তার গায়।
বল দাদা কি হবে উপায় ?
চল যাই উকীলের কাছে—
দেয় যদি ডিক্রীজারী—কি হবে তখন
ধরে যদি অস্থাবর বলে—রাখিবে কেমনে ?

* * * *

১। কহ রাণি !
কেমনে দেখাবে মুখ মানব সমাজে ?
কেন আজি মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে
কেন আজি নাগরিক সবে ধিক্ ধিক্ করিছে তোমারে ?
ব্যবস্থা আফিং দড়ি কলসীর কেন করিল সকলে ?
কার লাগি!?

* * * *

২। ভালই হলো, ভরসা হলো
আস্‌ল ভাওয়াল রবি,
কাঁপায়ে পাপী, দাপায়ে তাপী
ভাস্‌লো সোণার ছবি।

তাই ভাওয়ালে, দলে দলে
কু-চক্রী কাক শৃগাল
শকুন কুকুর জুট্‌ছে প্রচুর
কোত্থেকে এক পাল।

মাথা তুলি কুকুর গুলি
রাজার পানে চায়,
নাক দে' শেষে, মাটী ঘ'সে
খত দিতেছে পায়।

(লয়ে) বোচ্‌কা বগলে, কুকুর দলে
ইষ্টিশনে যায়।
পাপের বোঝা, নয়ত সোজা
পেছন পানে চায়।

খেংড়া খেয়ে, নেংড়া হ'য়ে
চেংড়া ছোট জাত
বাপের ভিটে, কেউবা ছুটে
কেউবা কুপোকাৎ।

এই বেলা, সুযোগ মেলা,
আশু সত্য.........লা
থাকতে কাণ, বাঁচা প্রাণ
জলদি করে পালা।"—(কু—চ—ভ)

৩। হায় কি কর্লি সর্ব্বনাশী ভায়ের সাথে মিশে
লাজের মাথায় বাজ হানিলি—মুখ দেখাবি কিসে ?
মনে যদি না-ই ছিল তোর কর্ব্বি না তুই বিয়া,
কে নিছিল কলাতলায় গামছা গলায় দিয়ে।
তোর লাজেতে ছার কপালি বাঙ্গলা মরে লাজে,
কেমন ক'রে ভাব্‌ছি ওমুখ খুল্‌বি লোকের মাঝে ?
যা কর্লি তুই বেদ পুরাণে তার তুলনা নাই,
ভাত মুখে দিস্, আর কেউ হলে মুখে দিত ছাই।
শাড়ী পরে, গাড়ী চ'ড়ে লেকে মারিস্ পাড়ি
ছুত্তোরি তোর বাবুগিরির, মুখে খেংরামারি।
লজ্জা হীনের গোষ্ঠি তোরা দড়ি বজ্জাতিতে চাই
ভাবিস্ কিগো এর পর তোদের মিলবে কোথা ঠাঁই ?
বাপের বেটা ঘুচায় লেঠা জানল সেটা দেশ
গলায় দড়ি গলায় দড়ি নাইকো লাজের লেশ !
দেশে করে কাণাকাণি আসলে নাই (তোর) মূল
গুরু লিখ্‌তে প্রথমেই তোর হ্রস্ব উকার ভুল।
তোর ভুল, তোরই থাক্ আরও সাপটে ধর্
শুন্‌গো কথা, বলছি ভাল, জলে ডুবেই মর্।
আর করিস্ না দেরী—তোর মুখ দেখাবার আগে
ডুবে মর্ গঙ্গায় গিয়ে ধার কি ধারি রাগে ?

৪। আমি তারে ভালবাসি, সেবেশী সুন্দর,
নারীর বৈধব্যে যার, প্রাণ করে হাহাকার
স্বজাতি সমাজে রহে করিয়া সমর,
লাজ ভয় করি ভস্ম, যে বলে 'সমাজ কস্য' ?

৫। বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি
আপাতত স্বামী নাম্ কহিবারে নারি।
যমালয় 'বিপরীত' সেই পাঁড়া খান,
আমার বাপের বিয়ে হয় সেই স্থান !—(কু—চ+ভ)

আরও বেশী পরিচয় পেতে যদি চাও,
খোলা আছে ট্রাম বাস, সেইখানে যাও।
লাট নামে পথ ধরে করিও নজর
কুড়ি উন দেখেনিও বাড়ীর নম্বর
কড়া নেড়ে সাড়া দিও সাধু না তস্কর
দেখা পাবে পায় সবে যথা পূর্ব্বাপর।—(কু—চ+ভ)